গজেন্দ্রকুমার মিত্র
রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬২

সম্পাদক

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদপট

অংকন : পূর্ণেন্দু রায়

মুদ্রণ : সিল্ক স্ক্রিন

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র
সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা	সুজিতকুমার সেনগুপ্ত	ক-ঞ

উপন্যাস

আদি আছে অন্ত নেই (প্রথম খণ্ড)	...	১-৩৩৭
ঐ (দ্বিতীয় খণ্ড)	...	১-১৬০
দহন ও দীপ্তি	...	১-১৩৬
বিধিলিপি (নাটক)	...	১৩৭-১৯০

আদি আছে অন্ত নেই

'কোই-না উমেদি মা রো, উমেদ হা অস্ত্।
সোই-এ-তারিকি মা রো, খুরশেদহা অস্ত্।'

নৈরাশ্যের পথে যেয়ো না, আশাও তো আছে,
অন্ধকারের দিকে যেয়ো না, সূর্যও আছেন।

॥ ১ ॥

ছেলেবেলায় সবাই বিনুকে পাগল বলত। আজও কেউ কেউ বলে। সামনে না হোক, আড়ালে যে বলে সে বিষয়ে ও নিঃসন্দেহ। তাদের দোষও দেওয়া যায় না অবশ্য। সেদিনও দেওয়া যেত না। এরকম ক্ষেত্রে বিনু অপরের সম্বন্ধেও হয়ত ঐ কথাই বলত।

পাগল না তো কি? অন্য সব ঐ বয়সের ছেলে থেকেই যেন আলাদা, গোত্র ছাড়া। ওর দাদাকেও দেখেছেন মা, পাড়ার ছেলেদেরও দেখছেন। অনেকদিন থেকেই দেখছেন—কত ছেলে, কত মেয়ে। তারা কেউই এমন নয়। ওর ধরন-ধারণ দেখে তিনিও ভয় পেতেন,'সত্যি সত্যিই ছেলেটা পাগল নয় তো বামুনদি? যত বড় হবে পাগলামি বাড়বে?…কোন ডাক্তার দেখাব নাকি?'

বামুনদি অবশ্য মুখে খুব জোর দিয়েই অভয় দিতেন—মুখ-সাপোট যাকে বলে, 'না না, পাগল আবার কোথায়? ও একো-একো ছেলে অমন হবে। ছেলেমানুষ সমবয়সী খেলার সঙ্গী কেউ নেই, একা একা খেলে—একটু না বকে কি করে বাপু?' কিন্তু মনে মনে তিনিও যে খুব ভরসা পেতেন তা নয়। মাঝে মাঝে আশংকাটা প্রকাশ করে ফেলতেন 'বদ্দমানে'র দিকে কোথায় যেন পাগলাকালী আছেন, খুব জাগ্রত শুনেছি, তাঁর কাছে মানত করব ভাবছি। বিনু যদি বড় হয়ে মন দিয়ে লেখাপড়া করে, ওর দশ বছর বয়সের সময় ওকে নিয়ে গিয়ে পুজো দিয়ে আসব।…কী বলো? মানে আর কিছু নয়, যদি অদ্দিন না-ই বাঁচি তোমাকেই গিয়ে সে মানসিক পুনু করে আসতে হবে। ঠাকুর দেবতার কাছে দেনা সোজা তো নয়।'

তার জবাবে মা হয়ত বলতেন, 'তা আমিই যদি না বাঁচি, কি মনে না থাকে। তার চেয়ে মানত যদি করতেই হয়—এখানে কালিঘাটের কালী আছেন, সেখানে করব, কি ঠনঠনেয়। আশাদি বলেন, ঠনঠনের কালী ডাকলে সাড়া দেন।…কালী কি আর আলাদা আলাদা? তবে শুনেছি ঘোড়সাহেবের দরগায় এসব অসুখের মানসিক করলে খুব ফলে—'

কথাটা হয়ত ঐ পর্যন্ত হয়েই থেমে যেত। কিন্তু দুশ্চিন্তাটা যেত না। অন্য দিন, অন্য প্রসঙ্গে অন্য প্রস্তাবে দেখা দিত আবার। দুশ্চিন্তার কারণও যে যেতে চাইত না, নিত্য নতুন চেহারায় দেখা দিত।

তিন-চার বছরের ছেলে, আপন মনে বকে অনেকেই কিন্তু এর বকুনি কিছু আলাদা রকমের। সে ঠিক আপন মনেও বকে না। দোতলার ভেতরের দিকের সংকীর্ণ বারান্দার রেলিং—তারাই যেন ওর শ্রোতা, তাদের সঙ্গেই কথাবার্তা ওর। রেলিংয়ের শিকগুলো।—শুধু যদি একতরফা বকত তাহলেও অত ভাববার কিছু ছিল না, ও তরফেরও যেন উত্তর আসছে এইভাবে বকত, উত্তর-প্রত্যুত্তর চলত সমানে।

কী বললি? কাপড় কাচতে পারবি না? কেন—কিসের জন্যে পারবি না

তাই শুনি? মাসে মাসে একরাশ টাকা মাইনে গুনে নিচ্ছিস না! মাগনা কাজ করছিস নাকি আমার? আলবৎ করতে হবে, কাপড় কেচে ছাদে শুকুতে দিয়ে তবে যেতে পাবে—এই বলে দিচ্ছি। নইলে সোজা পথ দ্যাখো, আর এমুখো হয়ো না। অমন ব্যাদড়া লোকে আমার দরকার নেই। তবে তাও বলছি, চলে গেলে এ কদিনের মাইনেও দোব না, যেমন ভাবে পারো—থানা পুলিস করে আদায় করো।

এ বাড়িতে যদি এ ধরনের কথা কেউ বলত তাহলে অবাক হবার কিছু ছিল না। শিশুরা শুনেই শেখে—একবার কোথাও কিছু শুনলেই তোতাপাখির মতো তুলে নেয় আর কপচায়—কিন্তু এ বাড়িতে এ ধরনের কথা কেউ বলে না। বিনুর মা মহামায়া অত্যন্ত মিতভাষী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, সেই পরিমাণ ভদ্রও। তাছাড়া, স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই কেমন যেন ম্রিয়মাণ, অপরাধী-অপরাধী ভাবে সসংকোচে থাকেন সর্বদা—এমন কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোবে না। স্বল্পবাক প্রকৃতির জন্যে ঝি চাকর বা ঐ শ্রেণীর মানুষরা তাঁকে সমীহ করে চলত, তাদের কাজে টিকটিক করাও ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ; যে কাজটা দেখতেন হয় নি—ভুলে গেছে বা ইচ্ছে করেই করে নি—সেটা নিঃশব্দে নিজেই করে নিতেন। বাসনে এঁটো লেগে থাকলে নিজে মেজে ধুয়ে নিয়ে ঝিয়ের সামনেই স্নান করে চলে আসতেন—তা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা কি ঝগড়াঝাঁটি চেঁচামেচির কথা মনেও আসত না তাঁর। আর গৃহিণীই যেখানে এই রকম উদাসীন নির্বিকার সেখানে বামুনদি তাদের সঙ্গে রাগারাগি চেঁচামেচি আর কতটা করতে পারেন?

এই অস্বাভাবিক কথাবার্তার সূত্রটা এঁরা ধরতে পারেন নি—বিনুই ধরেছে। তার মনে হয়েছে—অনেক পরে অবশ্য, মা বামুনমার মুখে বহুবার শোনার পরে ভাবতে ভাবতে—নিশ্চয়ই কোনদিন মা'র ছাদে বেড়াতে যাবার সময়, প্রায়ই যেতেন তো, বামুনদি বিকেলের দিকে দোকানে বাজারে গেলে মা ছেলেমেয়ে নিয়ে ছাদে উঠতেন—গায়ে গায়ে লাগানো বাড়ি, ও বাড়ির নয়নতারার সঙ্গে কথা কইছেন যখন তখন চন্নদের বাড়ির কলহকাজিয়া বিনুর কানে যেতে অসুবিধে হয় নি। সেই রকম কোন উৎস থেকেই এই শব্দগুলো, অনুযোগ তিরস্কারের এই ভঙ্গীটা শিখে নিয়েছে সে। সেটা ওঁরা ধরতে পারবেন না—মা-বামুনমা'রা, কারণ তাঁরা এ দিকটায় মনোযোগ দেন নি কখনও, ভাবেনও নি যে এমন হতে পারে।

কিন্তু সবচেয়ে যেটা প্রিয় ছিল বিনুর—সেটা হল মাস্টার-মাস্টার খেলা। এই, পড়া মুখস্থ হল তোর? বাবুর জন্যে কতক্ষণ বসে থাকব তাই শুনি? আমার কি, আমি চলে যাবো—কাল ইস্কুলে গিয়ে বেত খেলে তবে ঢিট হবে।…এই, এই ছোঁড়া, ভুগোলের বই বার কর। কই, শুনছিস নি! ছিঁড়ে গেছে? কি করে ছিঁড়ল শুনি। নিজেই ছিঁড়েছ তার মানে? কান ধর—কান ধর বলছি হতভাগা বাঁদর। ফের যদি বই নষ্ট করেছ তো চেয়ার করে রাখব এক ঘণ্টা—

আধো আধো কথা, বিনুর অনেক বয়স অবধি কথা পরিষ্কার হয় নি—তার শব্দ বা বাক্য যদি এরকম পাকা-পাকা হয় তাহলে হাসি পাবারই কথা। এদেরও পেত। কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ও করত। সে ভয়ে ইন্ধন যোগাবার লোকেরও অভাব ছিল না। ঝি পাখীর মা বলত, 'অন্যি দেবতা-টেবতার ভর করে নি তো বাপু, তোমাদের ভর-সন্ধ্যেবেলা ছাদে বেড়ানো?' পাশের বাড়ির শরৎ গিন্নী বলতেন, 'গেল জন্মে সাধনভজন কি খুব সৎ কাজ করে এসেছিল, সেই জন্যে এ জন্মে খানিকটা জাতিস্মর মতো হয়ে জন্মেছে—বুঝছ না?...মায়ের পেট থেকে পড়েই বুড়ো। তোমার এ ছেলে মহা, হয় সন্ন্যাসী হবে, নয়ত—মানে, সন্ন্যাসী না হলেও তোমার ভোগে আসবে না।'

শরৎ গিন্নী হয়ত ভাবতেন একথায় খুব খানিকটা গৌরব বোধ করবেন মহামায়া—'ছেলে ভোগে আসবে না' বা 'থাকবে না' কথাটার আসল অর্থ বুঝলে মায়ের মনের ভাব কি হয় সেটা মনে পড়ত না তাঁর। অথবা ভেবে বুঝেই বলতেন—কে জানে। তাঁর ছেলেমেয়েরা পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে কুচ্ছিত—মহামায়ার তিনতিনটে পদ্মফুলের মতো ছেলেমেয়ে তাঁর পছন্দ ছিল না।

মাস্টার-মাস্টার খেলার আনুষঙ্গিক হিসেবে একটা বেতও প্রয়োজন হত বৈকি। তবে বেত আর কোথায় পাবে, অনুকল্প দিয়ে কাজ সারতে হত। বাবার একগাছা ছড়ি ছিল, তার ওপরই লোভটা বেশী—কিন্তু সেটা নিয়ে খেলা করা মা বরদাস্ত করতেন না, হাত দিলেও প্রচণ্ড ধমক দিতেন। গায়ে বিশেষ হাত তুলতেন না মা—তবু ছেলেমেয়েরা যমের মতো ভয় করত তাঁকে, রাশভারী মিতবাক স্বভাবের জন্যে। সুতরাং মায়ের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি ছাড়া সেটায় হাত দিতে সাহস হত না, আর সে-রকম ঘটনাও ঘটত দৈবাৎ। অগত্যা ঝুড়ি-ভাঙা চ্যাঁচারি, রান্নার চেলাকাঠ পাৎলা দেখে—নিদেন একটা ঝাঁটার কাঠি দিয়েই কাজ চালাতে হত।

সেই বেত হাতে সারা দুপুর রেলিংগুলোকে শাসন করে বেড়াত বিনু। মুদী নীলকমল উটনোর মাসকাবারি ফর্দ আর গত মাসের টাকা নিতে নিজে আসত, সে একবার বলেছিল, 'বাপ রে বাপ, নিহাৎ নোয়ার ছাত্তর বলেই সইছে, নইলে যা কড়া গুরুমশাই, আর যা ওনার বেতের বহর, মানুষ ছাত্তর হলে কবে অক্কা পেত।'

কিন্তু শুধুই শাসন করত বললে গুরুমশাইয়ের ওপর একটু অবিচার করা হয়। কখনও প্রসন্ন মেজাজেও থাকত বৈকি। তখন আবার ছাত্রদের কত গল্প বলত। সে গল্পের মাথামুণ্ডু পারম্পর্য থাকত না, মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে রামায়ণের কাহিনী মিলে যেত অনায়াসে, রাবণের কি হনুমানের মুখে দত্তবাড়ির তিন সতীনের ঝগড়ার ভাষাও—তবু মহামায়া লক্ষ্য করে দেখতেন ঐটুকু ছেলে একটা গোটা গল্প খাড়া করারই চেষ্টা করছে, ওঁদের মুখে কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে শোনা টুকরো টুকরো খাপছাড়া গল্পের মধ্যের ফাঁকটা কল্পনায় ভরাবার চেষ্টা করছে। দেখতেন আর তাঁর হাত পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকে যেত—নামহীন আকারহীন একটা আশংকায়।

বামুনদি আশ্বাস দিতেন, 'একটু বড় হোক, লেখাপড়া শুরু করুক, এসব

আপনিই চলে যাবে।'

অনেক বড় হলে কলেজে-টলেজে পড়লে কি হবে তা কে জানে, কিন্তু দেখা গেল পাঁচ বছরে হাতেখড়ি হবার পরও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হল না—হয়ত একটু তারতম্য ঘটল মাত্র। অথচ লেখাপড়ায় খারাপ নয়, মহামায়ার বড় ছেলে গনু বা রাজেনের মতো দুর্দান্তও নয়। গনু পড়বার ভয়ে বইয়ের পাতা ছিঁড়ে নর্দমার ঝাঁঝরি খুলে নলে পুরে রাখে, কখনও বা সিন্দুকের ওপর উঠে তাকে রাখা লক্ষ্মীর ঝাঁপির আড়ালে লুকোয়। স্লেটখানা ইচ্ছে করে আনাগোনার পথে পেতে রাখে যাতে কেউ অজান্তে পা তুলে দিয়ে ভেঙে দিতে পারে। মেয়ে পারুল অতটা নয় কিন্তু তার মাথাতে পড়া ঢোকেই না, তাছাড়া তার ঝোঁক ঘরসংসারের দিকে, পড়ার চেয়ে কুটনো কোটা, দুধ জ্বাল দেওয়াতে উৎসাহ বেশী। বিনুর পড়াতে মাথাও আছে, দুষ্টুও নয়। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর পড়াতে বসেন মহামায়া। পড়া এবং দু'তিন স্লেট লেখা শেষ করতে তার আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। তারপরই বই স্লেট পেনসিল যত্ন করে নির্দিষ্ট কুলুঙ্গীতে তুলে রেখে চলে যায়। অনুযোগ করার কি শাসন করার কোন সুযোগই দেয় না।

কিন্তু বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ শেষ করে পদ্যপাঠ, বোধোদয় আর ফার্স্ট বুকে যখন প্রোমোশন পেল তখনও—লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাগলামিটা বাড়ল বৈ কমল না। শুরু করল জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে। রেলিংরা আর এখন শ্রোতাও নয়, ছাত্রও নয়—শ্রোতা অশরীরী অনুপস্থিত কেউ, তবে তুমি যেতে বলছ কেন?···তারপর কাউকে অথবা সকলকেই—টু হুম ইট মে কনসার্ন গোছের—কত কি ঘটনার কথা বলে যেত নিজেকে কেন্দ্র করেই, নিজেই যেন সে সব ঘটনার নায়ক বা কর্তা—যেন সেগুলো এখনই ঘটেছে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন সদ্য বর্তমানে রূপ নিয়েছে ওর সামনে।

তারপর, রাজামশাই আমাকে ডেকে পাঠাবেন, পেয়াদার পর পেয়াদা, নায়েব সরকার গোমস্তা, নীলকমল মায় ছোটলাট পর্যন্ত ডাকতে আসবে। আমি বলব, 'উঁহু, তুমি বললেই আমি যাব, কেন আমি কি ভিখারী? সে হবে না। নেমন্তন্ন করতে হয় এখানে এসে করে যান সতীশবাবুদের মতো, সরকারবাবুদের মতো, ব্রাহ্মণ সঙ্গে করে। নীলকমল, তুমি তো জানো, তুমি তো এসে নতুন খাতার নেমন্তন্ন করে যাও, তবে তুমি যেতে বলছ কেন? তারপর কি হবে জানো তো? রাজামশাই নিজে আসবেন, আমি বলব, আসুন আসুন রাজামশাই, যাই নি বলে যেন কিছু মনে করবেন না, ওভাবে যেতে নেই, মা বলে। গেলে মা খুব রাগ করত।···তা আসুন। বিয়ে, না রাজামশাই, বিয়ে আপনার মেয়েকে করতে পারব না। সুয়োরানীর মেয়েকে নয়। ও-রানী ভাল নয় আপনার, দুয়োরানীকে বিনি দোষে কষ্ট দেয়—বিয়ে করব আপনার দুয়োরানীর মেয়ে কাঞ্চনমালাকে, ঠিক করেছি।···দাঁড়ান আগে বড় হই, পাশ করি, চাকরি-বাকরি করে মায়ের দুঃখু ঘোচাই—বিয়ে তো পড়ে রইলই। এত্ত বড় বাড়ি করব, মল্লিকবাড়ির চেয়েও এক হাত উঁচু—তখন গিয়ে দুয়োরানীর মেয়েকে বিয়ে করে ঐ সুয়োরানীটাকে হেঁটে কাঁটা, ওপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলব, আপনি

দুয়োরানীকে নিয়ে মনের সুখে ঘরকন্না করবেন। তাই বলে আবার সুয়োরানীকে গিয়ে এই কথাগুলো বলবেন না যেন, মাথায় ওষুধের বড়ি টিপে দিয়ে টিয়াপাখী করে দেবে আমাকে, আপনাকে করবে কাক—'

আরও এক বছর পরে শশীভূষণের ভূগোল পরিচয় আর অক্ষয় দত্তর চারুপাঠের যুগ আসতে স্বপ্নের চেহারাটা গেল পাল্টে, কিন্তু স্বপ্ন দেখাটা বন্ধ হলো না। দাদা রাজেন তখন সেভেনথ্ ক্লাসে পড়ছে, তার মাস্টার আসেন একজন—তাঁকে ওরা বলে অমর্তমামা—বোধ হয় অমৃতলাল নাম ছিল, সেটা আর মাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি কোনদিন। তিনি পড়ানো শেষ করে বারান্দায় উবু হয়ে বসে কোনমতে দশবার জপটা সেরে নিয়ে মিছরির সুঁট আর বামুনদির হাতের পরোটা খেতে খেতে গল্পের বড় ঝুলিটা খুলতেন। এমন প্রসঙ্গ ছিল না—যা উঠত না। সদ্য অতীতের বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন, সুরেন বাঁড়ুয্যে, বিপিন পালের বক্তৃতা. রবি ঠাকুর আর নোবেল প্রাইজ; কালাপানিতে 'স্যার জন লরেন্স' জাহাজডুবি, স্বদেশী মিলের গুনচটের মতো কাপড়, সৈন্ধব নুন আর কর্কচ নুনে কি তফাৎ, গয়ালি পাণ্ডাদের দারুণ অত্যাচার, কামাখ্যার পাণ্ডাদের ভদ্র ব্যবহার, অমরনাথের উত্তরে কোথায় কি শিব আছেন সেখানে যেতে গেলে ষোল বছরের মেয়ের সঙ্গে তিন দিন তিন রাত একঘরে কাটানোর পর হাঁটু দিয়ে হাঁড়ি চেপে ধরে নিচে কাঠ জেবলে চরু রেঁধে খেতে হয় আগে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিনুর মা ছিলেন নীরব শ্রোত্রী, বামুনদির উৎসাহ অনেক বেশী সরব। বিস্ময় প্রকাশ করে তারিফও করতেন তিনি অমর্তমামার জ্ঞানের বিশালতার। কিন্তু মহামায়া এমনভাবে স্থির হয়ে বসে শুনতেন যে, অমর্তমামার মনে হত তিনি অখণ্ড মনোযোগে শুনছেন আর বুঝছেন—তাই তাঁকেই শোনাবার গরজ ছিল বেশী। কিন্তু আরও একটি শ্রোতা যে এঁদের পাশে বসেই এই সমস্ত কথাগুলি গিলত, তা কেউ অত লক্ষ্য করেন নি কোনদিন। এর ফলেই যে বিনুর স্বপ্ন ও কল্পনার পরিধি ও বিস্তৃতি সম্ভাব্যতার, ওর বয়সের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তাও বোঝেন নি। তাতেই আরও অবাক লাগত।

'জানো, বামুনমা, আমি বড় হয়ে ইঞ্জিনীয়ার হবো ঠিক করেছি।'

'বেশ তো, খুব ভালো কথাই তো বাবা। তবে তার জন্যে লেখাপড়াটাও তেমনি হওয়া চাই তো। এখনও হাতের লেখা সোজা হল না, গুণ-ভাগ মেলে না আঁকের – ইঞ্জিন হবে কি করে বলো। সে শুনেছি অনেক লেখাপড়া, অনেক আঁকজোকের ব্যাপার, অনেক ভারি ভারি বই পড়তে হয়—'

'আঃ, সে তো হবেই। বয়েস হলেই লেখাপড়া শিখে নোব তাড়াতাড়ি। ইঞ্জিনীয়ার হয়ে কি করব তাই শোন না। এখান থেকে একটা পুল তৈরি করব। সেটা সোজা গঙ্গার ওপর দিয়ে দিয়ে বদ্রীনাথ পর্যন্ত চলে যাবে। তাহলে আর ঐ অমর্তমামার শাশুড়ীর মতো পায়ে হেঁটে যেতে হবে না আমার মাকে, পিসু কামড়ে পায়ে ঘাও হবে না। পোলের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি চলে যাবে—ঝাঁ-ঝমঝম, ঝাঁ-ঝমঝম—মা চার টাকা দিয়ে টিকিট কেটে চড়ে বসবে।...

আর তাই বা কেন, অমনি ঐ ওদিকে কোথায় গঙ্গাসাগর আছে, ঐ তো তুমি বলছিলে গো—সে পর্যন্ত নিয়ে যাবো পোলটা—'

কোনদিন বলত, মাকে বলতে সাহসে কুলোত না, অথচ লোহস্রোতায় আর মন ভরত না—মানুষ দরকার, তাই বামুনদিকে ছাড়া গতি ছিল না, 'বুঝলে বামুনমা, আমি ঠিক করেছি মানে আর একটু বড় হলে আর কি—সোজা একদিন গিয়ে ঐ বড়লাটটাকে কেটেই ফেলব। ব্যাস, তাহলে তো আর ইংরেজরা থাকতে পারবে না—তখন সুরেন বাঁড়ুয্যে গিয়ে রাজা হয়ে বসবে।'

কিংবা, 'আমি বড় হয়ে শুধু লড়াই করব বামুনমা। যুদ্ধে যাবো, জার্মানীদের হয়ে যুদ্ধ করব, ইংরেজগুলোর মাথা কাটব বোঁ-কচাকচ বোঁ-কচাকচ। তারপর এদেশে ফিরে রাজা হয়ে বসব, সুরেন বাঁড়ুয্যেকে করব মন্ত্রী।'

কোনদিন বা প্রশ্ন করত, 'বামুনমা, আচ্ছা এই কলকাতাটাকে চাকা লাগিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া যায় না? রেলগাড়ির মতো? অমর্তমামাকে জিজ্ঞেস করো না একটু।···আমি না—আমি বড় হয়ে সেইটেই করব বরং। তাহলে তো আর কোন হাঙ্গামা থাকে না। কলকাতা ধরো কাশীতে চলে যাবে, আর কাশী কলকাতায় আসবে বেড়াতে?'

আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করেন ওর মা, ছোটদের সমবয়সীদের সান্নিধ্য বিনু তত পছন্দ করে না। এ-বাড়িতে ছোট ছেলেপুলে নেই সত্য কথা। তিনিও ওকে রাস্তায় বেরোতে দেন না, পেছনের বস্তির ছেলেদের সঙ্গে মিশে গুলি কি ডাংগুলি খেলবে আর যত খারাপ কথা শিখবে—কিন্তু আশপাশের বাড়িতে অনেক ছেলেমেয়ে আছে, তাদের সঙ্গে যেন ওর জমে না, খাপ খায় না। মিশতে বা ভাব জমাতে যে একেবারে পারে না তা নয়—জানলা দিয়ে সরকার বাড়ির রাঙাবাবুকে ডেকে গল্প করে, ন-বাবু অবশ্য নিজেই আলাপ করেন, ভাল পোশাকী নাম ধরে ডেকে বলেন, 'কী গো ইন্দ্রজিৎবাবু, আজকের কি খবর? কটা জার্মান কাটলে?···ও না—তুমি তো শুধু ইংরেজ কাটো, জার্মানরা তোমার তো বন্ধু—য়্যালী।' কিম্বা 'আজ সকালে কি ব্রেকফাস্ট করলে, রুটি না পরোটা? আচ্ছা খাবার সময় আমার কথা একবারও মনে পড়ল না?'

তাদের সঙ্গে সমানে বকে যায়, অমন হয়ত পনেরো-কুড়ি মিনিট কি আধঘণ্টাই। মানে যতক্ষণ না তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

বেশির ভাগ দিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই সোজা চলে যায় সদর রাস্তায়। সে সময়টায় সকলেই ব্যস্ত থাকেন বাড়িতে—মা ভোরে উঠে স্নান-আহ্নিক সেরে ছেলেমেয়েদের জলখাবারের ব্যবস্থা, দুধ জ্বাল দেওয়া ইত্যাদিতে লেগে যান, সে-পর্ব শেষ হলে কুটনো কোটা ভাঁড়ার বার করা আছে, অনেক সময় রান্নাটাও একটু এগিয়ে দিতে হয়, বামুনদি সকালটা খুব ছোটাছুটি করতে পারেন না, ফলে আটটার আগে পাগলের দিকে নজর দিতে পারেন না—সেই অমূল্য নিজস্ব সময়টা বাজে খরচ করে না বিনু। দরজার বাইরে পা দিতে সাহস হয় না, মা'র কড়া নিষেধ আছে, দরজায় দাঁড়িয়েই আলাপ চালায়। কিন্তু সেও কেবল বেছে বেছে প্রবীণদের সঙ্গেই। এই সময়টায় তাঁদের বাজার করতে যাওয়ার সময়—চারুবাবু হোমিওপ্যাথ ডাকতার, যদুবাবু রেলির বাড়ি চাকরি করেন—

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে একটু টালমাটাল অবস্থা, দক্ষবাবুর বড়বাজারে লোহার দোকান আছে—এঁদের এ-পথ দিয়ে হাঁটবার উপায় নেই, বিনু ডেকে আলাপ জুড়বেই। তাঁরাও দাঁড়ান, দু-পাঁচ মিনিট গল্প করে যান। ফেরার পথে সম্ভব হয় না, হাতে মোট থাকে, কিন্তু যাওয়ার সময় অত তাড়া নেই কোন বাবুরই।—এক চারুবাবু ছাড়া। আটটার মধ্যে বাইরের ঘরের দোর খুলে বসতে হয় তাঁদের রুগীর প্রতীক্ষায়। তবু তিনিও অন্তত মিনিট দুই দাঁড়িয়ে যান।

এক-একদিন ওঁরাই উপযাচক হয়ে কথা শুরু করেন, 'কী খোকা, কি করছ? জলখাবার খেয়ে এসেছ তো? না মা বসে আছেন খাবার নিয়ে?' এই রকম সাধারণ কথা থেকেই শুরু হয় আলাপ। বিনুও এক এক দিন মুরুব্বীর মতো প্রশ্ন করে, 'মাছ কি দর যাচ্ছে আজকাল ডাক্তার জ্যাঠামশাই? কিন্তু কি দর হয়ে গেছে বাজারে জিনিসপত্তরের দেখছেন তো? মানুষ বাঁচবে কি করে?'

ছোট ছেলের মুখে পাকা কথা শুনে হাসেন সবাই—তবু দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলেও যান। আহা, এই বয়েসে বাপটা গেল, খেলার সাথী কেউ নেই, কোথাও যেতে পারে না, কারও সঙ্গে মিশতে পারে না—কী করবে বেচারী।—এই বোধ হয় ভাবেন তাঁরা।

ছাদে যখন একা ওঠে তখনও তাই। ডানহাতি দত্তদের বাড়ি, শটীফুডের কারখানা তাঁর—ছাদে খানিকটা কাজ চলে। সে কারখানার যত বুড়ো বুড়ো কর্মচারী, তাদের সঙ্গে ডেকে ডেকে গল্প করে বিনু। কিম্বা দত্তমশাইয়ের তিন বৌয়ের মধ্যে বড় গিন্নীর সঙ্গে আড্ডা জমায়। অন্যদিকে যারা থাকে তাদের সঙ্গে বড় একটা ভাব নেই, দত্তদের বাড়ি এক দেওয়ালে—কথা কওয়া সহজ। তারা কেউ কেউ আলসেয় উঠে ওর গাল টিপে দেয়, কাগজের ঠোঙ্গায় খানিকটা শটি দিয়ে বলে, 'মাকে বলো দুধ ফুটিয়ে খাওয়াতে, গায়ে গত্তি লাগবে। নতুন গুড় দিয়ে শটির পায়েস করতে বলো—বেশ লাগবে।'

কিন্তু সবচেয়ে যেটা মুশকিল ওকে নিয়ে—সেটা এই ছ-সাত বছর হতে বেশ অনুভব করছেন মহামায়া—সেটা হচ্ছে দুমদাম কথা বলা, বড়দের কথার মধ্যে। ওর কথার মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই, উদ্দেশ্য তো কিছু নেই-ই—কিন্তু এক এক সময় এক একটা কথা বলে বসে যার কদর্থ বা কুটিলার্থ করা কঠিন নয়। প্রতিবেশিনীদের ঝোঁকটা সেই দিকে থাকবে—এও স্বাভাবিক। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বাঁকা পথে চলে গিয়ে ঠেসিয়ে ঠেসিয়ে কথা বলেন, কখনও স্পষ্টই দু'চার কথা শুনিয়ে দেন—বালক নারায়ণ সে যেমন শুনছে তেমনি বলবে, সে তো আর রেখেঢেকে মুখোশ পরিয়ে কথা বলতে শেখে নি, ভেতরে এমন কথা না হলে সে বলবে কেন?—এই হল তাঁদের যুক্তি।

এই কথার মধ্যে কথা বলার অভ্যাসটা কিছুতেই দূর করতে পারেন না মহামায়া, হাজার বকেঝকে শাসন করেও। কখনও যা করেন না—এক-আধদিন তাও করে ফেলেন, দু-চারটে চড়চাপড়ও কষিয়ে দেন। বিনু কিছুতেই বুঝতে পারে না, সে কী এত অন্যায় করল। কোন কথার কি মানে হতে

পারে তা তার জানার কথাও নয় সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। শাসন করার পর মায়াও হয়, তখন কোমল কণ্ঠে বলেন, বুঝিস না সুঝিস না যখন-তখন বড়দের কথার মধ্যে তোর কথা বলার দরকারটা বা কি ? চুপ করে থাকলে তো আর এত ক্ষোয়ার হয় না। বিনুও যে মধ্যে মধ্যে সে প্রতিজ্ঞা না করে তা নয়—কিন্তু কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারে না।

অথচ এক এক সময় সামান্য কথা থেকে তুমুল কাণ্ড হয়ে যায়।

একদিন হয়ত, অঘ্রাণ মাসের গোড়াতে চন্ননের মা বলছেন 'এখনকার ফুলকপি খাওয়া যায় না বাপু, যাই বলো। অখাদ্য। দুর্গন্ধ।' তখন আজকালকার মতো বারো মাস কপি মিলত না, অথবা পুজোর সময়েই ফুলকপিতে অরুচি ধরে যেত না, অঘ্রাণ মাসের গোড়াতেও দুর্লভ বস্তু ছিল, সেই হিসেবে মহার্ঘ্যও। মহামায়া তাঁর স্বভাবমতো নীরবেই শুনছিলেন, বিনু হঠাৎ বলে বসল, 'কেন দিদিমা, এই তো আমাদের কাল কপি হয়েছিল, খুব ভাল লাগল তো।'

চন্ননের মা'র চোখে যে বিদ্যুৎ ঝলসালো, তা মহামায়া টের পেলেন। বিনু কি বুঝবে ? তিনি টেনে টেনে বললেন, 'হ্যাঁরে, হ্যাঁ। তোরা যে খুব বড়লোক তা আমরা জানি, এখন কপি খাস, পৌষ মাসে এঁচড় খাবি, ফাগুন মাসে পটোলে অরুচি ধরে যাবে—তোদের সঙ্গে কি আর আমাদের তুলনা !···তবে সে যাই বলিস, অকালের জিনিস বলেই যে ধন্যি ধন্যি করব—আমরা তা পারি না। আমাদের জিভ তেমন নয়—দাম বেশি হলেই অমত্ত ঠেকে না আমাদের কাছে।'

এর জের যে এখানেই মিটবে না, মহামায়া তা জানতেন। মিটলও না।

পরের দিনই ছাদে উঠতে সে-জের কানে এসে পেঁছিল। ও-পক্ষ ছাদে ওঠেন নি, তবে তাই বলে দেখে নিতে অসুবিধে হবে কেন ? নিচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে যেন অদৃশ্য শ্রোতাকে উদ্দেশ করে—মহামায়ার শ্রুতিগম্য কণ্ঠেই বলতে লাগলেন—যেন আগে থেকেই কথা হচ্ছিল এমনিভাবে, 'ও অসময়ের জিনিস খাবে না তো খাবে কে বলো। বলি কারও খেটে খাওয়া পয়সা তো নয়। যতই নাকে কাঁদুক—বুড়োকে যতটা পেরেছে দুয়ে নিয়েছে তো। বেঁচে থাকলে সে হতভাগা বোকাটাকে আজ ভিক্ষে করতে হত বোধ হয়।···বেশ দু-পয়সা হাতে আছে। লোক-দেখানো মায়াকান্না কাঁদতে হয় অমন—যদি এর ওপরও সেই নাবালক ছেলেটার হক্কের ধনে ভাগ বসানো যায় তো মন্দ কি !'

ছেলেকে কি করে বোঝাবেন এই কুৎসিত সম্ভাবনাগুলো—মহামায়া ভেবেই পান না।

অমর্তমামা অনেকদিন ধরেই বলছেন, 'বাড়িতে বসিয়ে রেখো না দিদি, ওকে ইস্কুলে দাও—ভালো চাও তো। আর মেয়ে সুদ্ধু ইস্কুল যেতে শুরু করল, ওকে কেন বসিয়ে রেখেছো ?'

মহামায়া এখনও সোজাসুজি কথা কইতে পারেন না অমর্তমামার সঙ্গে—বামুনদির দিকে মুখ ক'রে বলেন, 'দেওয়া তো উচিত, কিন্তু ঐ পাগল-ছাগল ছেলে, এখনও ল্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়ায়, আবোল-তাবোল বকে—ইস্কুলে গিয়ে কি না কি করবে তাই ভেবেই তো আরও—'

'সেইজন্যেই তো আরও দেওয়া উচিত।' অমর্তমামা গলায় জোর দিয়ে বলেন, 'আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে না মিশলে বাইরের হাওয়া গায়ে না লাগলে ও-পাগলামি সারবে না। চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করে রেখেছ, চিড়িয়াখানার জানোয়ারের মতো—কীইবা দেখল, আর কীইবা বুঝলো বলো! পাগলামি যে করছে তাও তো বুঝতে পারে না। পাঁচটা বন্ধুদের পাল্লায় পড়লে—তারা যখন ক্ষেপিয়ে মারবে, তখনই বুঝতে শিখবে দুনিয়ার হালচাল।'

বামুনদি মুখ টিপে হেসে বলেন, 'আসল কথা তা নয় গো দাদা, তা নয়। কোলপোঁছা ছেলে, ওকে কোলে নিয়েই রাঁড় হল—চোখের আড়াল করতে মন চায় না। সবাই বেরিয়ে যায়—এত বড় বাড়িটা গিলতে আসে যে।'

'তা বললে তো চলবে না। ওর ভবিষ্যৎটা দেখতে হবে তো। বেটাছেলে যতই হোক, চাকরি-বাকরি করে খেতে হবে তো, রোজগার করতে হবে। আঁচল চাপা দিয়ে আর কদিন রাখবে?—না, না, ওসব কোন কাজের কথা নয়, ইস্কুলে দিয়ে দাও। সামনে এই জানুয়ারী মাস আসছে—আমাদের ইস্কুলেই ভর্তি করে দিই। নয় তো নিউ ইণ্ডিয়ান আছে কাছে, জেনারেল য়্যাসেম্বলী—যেখানে বলো।'

তবুও মন স্থির করতে পারেন না মহামায়া। দিতেই হবে একদিন জানেন—বাড়িতে পড়াশুনো ঠিক হয় না সবাই বলে—সেইজন্যেই আরও এত কাণ্ড করে মেয়ে পারুলকে দিলেন—মহাকালী পাঠশালায়। মেয়েটার মাথা বড় মোটা, তবু যদি ভাল ইস্কুলে দিলে কিছু হয়। কম কি করতে হয়েছে সেজন্যে, অজস্র মিথ্যের জাল বুনতে হয়েছে, নইলে ভর্তি করত না ওরা। তবু এই রাঙাবাবুরা অনেক বলা-কওয়া করেছিলেন তাই। ছেলেকে দেওয়া অত শক্ত হবে না বোধ হয়, যদি অমর্তবাবুর ইস্কুলে দেওয়া হয় তো কথাই নেই। এখানে অন্য সমস্যা।

আসলে ছেলেটার জন্যে দুশ্চিন্তার শেষ নেই। মাঝে মাঝে মনে হয়, শরৎগিন্নীর কথাটাই হয়ত ঠিক। এ-ছেলে থাকবার নয়, গত জন্মের ঋণ আদায় করতে এসেছে—নিজেরও বুঝি কোন দুষ্কৃতি ছিল, তার ফল ক্ষয় করতে।

সব চেয়ে একটা যা কাজ ক'রে বসেছে, আর তার যা যুক্তি দিয়েছে, তাতেই আরও মহামায়ার এ-ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়ে গেছে। চার বছরের ছেলের মুখে এ-যুক্তি শোনার কথা তো কেউ ভাবতে পারে না। কাজটা শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু তার সমর্থক যুক্তিটা যে আদৌ শিশুর মতো নয়—সে যে উকিলের যুক্তি।

সেদিন দুপুরবেলা গলির ওপারে সরকারবাবুদের বাড়ি কী একটা কান্নার রোল উঠেছিল। বেলা তখন তিনটে। কী ব্যাপার না বুঝতে পেরে মা আর বামুনদি দুজনেই ছুটেছিলেন। নিচে ভাড়াটে আছে একঘর, তাদের বেটাছেলেরা দশটায় বেরিয়ে যায়, গিন্নী দুবেলার রান্না, ক্ষার কাচা বা গুল-দেওয়া বা ঐ ধরনের কাজ সেরে বেলা দুটোয় খায়, তারপর দরজা বন্ধ করে ঘুমোয় পুরো তিনটি ঘণ্টা, যতক্ষণ না ছেলে ফিরে আসে।

অর্থাৎ বাড়িটা একদম খালিই ছিল সে সময়। কেবল বিনু যথারীতি

ভেতরের বারান্দায় বসে আপনমনে বকছিল রেলিংগুলোর সঙ্গে। অবশ্য ঝি আসারও সময় সেটা। কলে জল এলেই ঝি আসে, এই পাড়ায় সে থাকে, আগে এ-বাড়ির কাজ সেরে অন্য দূরের বাড়িতে যায়। কতকটা সেই ভরসাতেই—সেই আশংকাতেও, নইলে চাবি দিয়ে যেতে পারতেন। চাবি দেখলে ঝি বেঁচে যাবে—দরজা শুধু টেনে ভেজিয়ে দিয়ে গিছলেন ওঁরা। তাছাড়া বিনু আছে, আর কিছু না হোক চেঁচামেচি তো করতে পারবে। কে আর জানলই বা বাড়িতে কেউ নেই—দরজা খোলা?

ওঁরা ছিলেনও না বেশিক্ষণ, কারণ গিয়ে দেখেছিলেন এমন কোন গুরুতর বা শোকাবহ কাণ্ড কিছু নয়—সম্ভাবনা ছিল হয়ত, উপসংহার লঘুক্রিয়ার ওপর দিয়েই গেছে। ন'কর্তার ছোট নাতি হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে একটা খেজুর তুলে মুখে পুরেছিল, তার বিচিটা গলায় আটকে যায়, দম বন্ধ হবার জো, নীল হয়ে গিয়েছিল নাকি ছেলেটা। তাতেই উপস্থিত সবাই—ছেলের মা, দিদিমা বিশেষ করে, মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সহজেই মিটে গেছে ব্যাপারটা, বাড়ির ঝি ছুটে এসে ছেলের মাথাটা নিচের দিকে করে মাথায় গোটা দুই চাঁটি লাগাতেই—কান্নার চেষ্টাতেই সম্ভবত, বিচিটা বেরিয়ে গেছে।

যাওয়া আর আসা—এর মধ্যে পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশি যায়নি কিন্তু তার মধ্যেই চোর যেন হাত গুণে দেখে ওৎ পেতে ছিল কোথাও, এসে দোতলায় ওঁদের খাবার ঘর থেকে তাবৎ ভারি ভারি বাসন—খাগড়াই বগি থালা, ঠাকুরবাড়ির কাঁসি, জামবাটি, গ্যাসবাটি কতকগুলো—সব মিলিয়ে পাঁচ-ছ'সের কাঁসা—নিয়ে চলে গেছে।

বিনু দেখেছে বৈকি। সে নিখুঁত বর্ণনা দিলে। হলদে কাপড়-পরা একটা লোক একটা কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে এসেছিল। ঘরে এসে বাসনগুলো, এঁটো বাসনসুদ্ধু সব সেই পুঁটুলিতে পুরে বেঁধে পুঁটুলিটা আবার কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, কথাও বলেছে বিনু তার সঙ্গে। বলেছে, 'মাজা বাসনগুলো সকড়ি বাসনের সঙ্গে নিচ্ছ কেন, ওগুলোও তো সকড়ি হয়ে যাবে।' তার কোনো জবাব দেয় নি সে। শুধু বলেছে, 'খুব মজার ছোকরা আছ তুমি বটে!'

'তা তুই চেঁচাতে পারলি না 'চোর চোর' বলে। ঐ জানালা থেকে একটা হাঁক দিলেই তো সবাই এসে পড়ত। কি রে তুই! স্বচ্ছন্দে কিনা তার সঙ্গে এঁটো বাসন আর মাজা বাসনের বিচার করতে বসলি।' মা বলতে লাগলেন বার বার।

বিনু বললে, 'বা রে! সে যতক্ষণ না বাসন নিয়ে বাইরে যাচ্ছে ততক্ষণ সে তো আর চোর নয়, আমি 'চোর চোর' বলে চেঁচাব কী ক'রে?'

বামুনদি বললেন, 'বেশ তো, সে যখন নিচে নামছে তখনও তো চেঁচাতে পারতিস।'

'তা কখনও হয়। সে যদি তখন বাসনগুলো কলতলায় রেখে চলে যেত! তাহলে তো আর চোর বলা যেত না!'

একটা হিন্দুস্থানী লোক কিছুদিন হ'ল পিছনের বস্তিতে এসে ঘরভাড়া

করে ছিল, সে নাকি হাতিবাগানের হাটে ছেঁড়া কাপড়ের কারবার করে—সে-ই একটা হলদে রঙের কাপড় পরত, তারই খোঁজ করলে সকলে, কিন্তু তার কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। ঘরেও কিছু নেই, দরজার তালা ভেঙে দেখা গেল। কে যেন বললে, লোকটা আসলে চোরাই কোকেনের ব্যবসা করত, নেহাৎ অভাবে পড়ে বাসন চুরি করেছে।···

সে যাই হোক, লোকসান যা হবার তো হলই, কিন্তু তার চেয়ে বড় চিন্তা মহামায়ার ছেলেকে নিয়েই। ছেলের কথা ভাবতেই হাত পা হিম হয়ে আসে তাঁর। এ কি সত্যিই পাগল, না কি শরৎগিন্নী যা বলেন তাই? মাঝে মাঝে এই বালকের দেহে পূর্বজন্মের কোন প্রবীণ আত্মা আত্মপ্রকাশ করে? দুটো সত্তা ঐ দেহটায় বাস করে একসঙ্গেই?

॥ ২ ॥

কি যে তা বিনুও ভেবে পায় না।

বড় হয়ে এমন কি ষাট বছর পরমায়ু অতিক্রম করেও সে প্রশ্নের জবাব মেলেনি। আজও এখনও এই প্রশ্ন তাকে মাঝে মাঝে বিচলিত করে তোলে। এক এক সময় মনে হয়—সত্যি সত্যিই সে বোধ হয় একটু পাগল। বদ্ধ বা কাদামাখা চেঁচানো পাগল হয়ত নয়—আবার সহজ স্বাভাবিকও নয়, দুইয়ের মাঝামাঝি একটা সীমারেখায় সে দাঁড়িয়ে আছে জীবনভোর। কোথায় একটা স্ক্রু আলগা আছে তার মাথায়। কিম্বা কোন্ এক দুষ্ট সরস্বতী জন্মাবধি সব কিছু বানচাল করে দেন, ঝড়ের মুখে নৌকোর মতো দুলতে থাকে সব শুভবুদ্ধি, সব চিন্তা—পাগলের মতো জ্ঞানহীনের মতো আচরণ করে বসে সে সেই সময়গুলোয়।

তা যদি না-ই হবে—এই পরিণত বয়সেও তবে সে নিজের কার্যকারণের সম্বন্ধ বা অর্থ খুঁজে পায় না কেন মধ্যে মধ্যে?

মাঝে মাঝে গভীরভাবে ভাবতে চেষ্টা করে, কেন অমুক কথাটা বলল সে, কেন অমুক কাজটা করল? এর ফলাফল কি হবে—কী হতে পারে সবই তো জানা, সে সম্বন্ধে অবহিত হলেই তো এর নির্বুদ্ধিতা, অসারতা, অপরিণামদর্শিতা টের পেত সে; সেইটুকু—এক বা দু-মুহূর্ত সময় নিল না কেন? মন তো নাকি বায়ুর চেয়েও দ্রুতগামী—যুধিষ্ঠির যা বলেছেন, বায়ু কেন আলোর চেয়েও ঢের ঢের দ্রুত যায়—একবার প্রাক্তন অভিজ্ঞতার পৃষ্ঠপটে ভবিষ্যতের ছবিটা মিলিয়ে নিলেই তো হত, কথাটা কি কাজটার ফলাফল কি হতে পারে সে জবাব সঙ্গে সঙ্গে মিলে যেত?

অথচ, একবার তো নয়, এমন তো বারবারই ঘটেছে, সারা জীবনই ঘটছে। তবু তো সাবধান হতে পারে না, হবার চেষ্টাও করে না। এখনও তো এই পরিণত বয়সেও তেমনিই দুম করে কথা বলে বসে, তেমনিই ঝোঁকের মাথায় কাজ করে বসে। কোন অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে না, মুহূর্ত-পরে বাস্তবের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে—তার কথাটাও চিন্তা করে না।

অথচ সেই, বলে বা করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই তো অনুতপ্ত হতে হয়। চিরদিনই হচ্ছে। বিপদেও পড়ে বার বার, কঠিন সংকট দেখা দেয় ক্ষণিক আবেগের মাশুল যোগাতে—তবুও সংযত হতে পারে না, শাসন করতে পারে না নিজেকে।

একই প্রশ্ন বার বার করতে হয় নিজেকে—কোন ফল পাবে জেনে কাজটা করেছিল, কোনও লাভ হবে না এ তো জানাই ছিল তার—তবে কেন সতর্ক হতে পারে না, কেন পূর্বাপর নিজের জীবনের ইতিহাসটা একটু ভেবে দেখে না. কেন অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে না? এ প্রশ্ন সারা জীবনই করেছে নিজেকে, আজও করছে। প্রশ্নটাই বিদ্রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কোন উত্তর পায় নি কোনদিন, কারণ দেবার মতো কোন উত্তর ছিল না, নেইও। একমাত্র যুক্তি—সে তো পূর্ব মুহূর্তেও জানে না সে কি করবে, কী করে বসতে যাচ্ছে, কেন করছে। একমাত্র এটাকে পাগলামি আখ্যা দিলেই ওর দুর্বোধ্য স্বভাবের সামঞ্জস্যহীন আচরণের একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

সেই প্রশ্নই করে বার বার—সারাজীবনই হয়ত করে যেতে হবে—বিধাতা কি তাকে খানিকটা পাগল করেই পাঠিয়েছেন? নইলে একেবারে নির্বোধ বা বিচার-বিবেচনাহীন তো সে নয়, জীবনের বেশিরভাগ ঘটনাতেই সে প্রমাণ মিলিয়ে দিতে পারে, কখনও কখনও সূক্ষ্মবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছে বরং, অনেকে তাকে চতুর ধড়িবাজও ভাবে—সেই লোক এমন অর্থহীন আচরণ করে কেন, মাথার দোষ ছাড়া সে কেনর কোন কৈফিয়ৎই তো নেই।

সব মানুষের মধ্যেই দুটো সত্তা আছে, ডাঃ জেকিল আর মিস্টার হাইড, দেবতা ও দানব—সে তার মধ্যেও আছে, হয়ত একটু বেশীই স্পষ্ট, সে দুটোই—কিন্তু তা ছাড়াও কি আর একটা সত্তা অতিরিক্ত আছে—যে মাঝে মাঝে তার জীবনের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়, শুভবুদ্ধি দেয় ঘুলিয়ে, জীবনটাই নিয়ে ছেলেখেলা করে? কে জানে!

॥ ৩ ॥

ইন্দ্রজিৎ মুখুজ্জ্যের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে অর্থাৎ একষট্টিতম জন্মদিনে যাঁরা উপহার নিয়ে আনন্দ অভিনন্দন জানাতে এসেছিল, তারা ঐ প্রশ্ন করতে করতেই ফিরে গেল সেদিন—লোকটা কি পাগলই? এমনি তো তা মনে হয় না, তবে কি মাঝে মাঝে মাথা খারাপ হয়ে যায়? নইলে এমন এক একটা উদ্ভট ব্যাপার করে বসে কেন?

খুব বেশী লোক আসে নি এটা ঠিক। জন্মদিন নিয়ে সমারোহ পছন্দ করে না, তার কারণ অন্য লোকে নিজের সম্বন্ধে উচ্চধারণার মিথ্যা স্বর্গ রচনা করে যে আনন্দ ও তৃপ্তি পায়—ইন্দ্রজিতের সে মানসিক আশ্রয়টুকু নেই। সে জানে—অপরের এই রকমের জন্মোৎসবে গিয়ে দেখেছে যে কত ভুয়া ও অন্তঃসারশূন্য সে উৎসব; যারা ফুল মালা নিয়ে আসে আনন্দ জানাতে, তাদের আসল

মনোভাব কি। কারও চোখে থাকে চাপা বিদ্রূপ, কারও ভঙ্গীতে বিরক্তি। পয়সা খরচ হয় সেজন্য ক্ষোভও। কেউ কেউ—কতটা পয়সা খরচ করে, যার জন্মদিন তার কতটা খরচ করাতে পারল, মজুরী পোষাল কিনা—সেই হিসেব করতে বসে।…কোন কোন ক্ষেত্রে অপরকে দিয়ে জয়ন্তীসভার আয়োজন করানো হয়, যার জন্মদিন, সে বা তার ছেলে কি জামাই সেই সভার খরচ যোগায় গোপনে।

এতে করে কি তৃপ্তি লাভ করে মানুষ—তা ইন্দ্রজিৎ বোঝে না। নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে—যার যে ক্ষেত্রই হোক, লেখক অভিনেতা সঙ্গীতশিল্পী চিত্রকর—নিজের যে ধারণাই থাক, অপরের কি ধারণা, জনসাধারণ তাকে ঠিক কি চোখে দেখে, কতটা স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত, সেটা না জানা পর্যন্ত, নিশ্চিন্ত না হয়ে মানুষ এমন আত্মতৃপ্তি বোধ করে কী করে তা ইন্দ্রজিতের বুদ্ধির অগোচর।

ইন্দ্রজিৎ জানে—তার বিশ্বাস তার যতটা কৃতিত্ব ততটা স্বীকৃতি সে পায় নি। আর এ সম্বন্ধে চোখ বুজে থাকতেও রাজি নয় সে। চোখ যারা বোজে, যারা অস্তিত্বহীন খ্যাতির মিথ্যা বিবরণ প্রচার করে, তারা কি নিজেকে ঠকাতে পারে, ক্ষোভটা মন থেকে মুছে দিতে পারে? মনে তো হয় না। ইন্দ্রজিতের মনে হয়, সে আরও কষ্ট আরও গ্লানি। আশাভঙ্গের দুঃখের সঙ্গে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হবার অপমান যোগ হওয়া। তার চেয়ে সত্যকে মেনে নেওয়াই ভাল। সে একটাই ক্ষোভ—কিন্তু প্রতিনিয়ত ধরা পড়ার ভয় থাকে না তাতে, অপরে কে কতটা মিথ্যা বুঝে কতটা বিদ্রূপ ও ধিক্কারের চোখে দেখছে, সে-সম্বন্ধে সর্বদা শংকা-কণ্টকিত থাকতে হয় না।

সেইজন্যেই অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অতি অল্প দু-চারজন আত্মীয় ছাড়া কেউ ইন্দ্রজিতের জন্মদিনের খবর রাখে না। তথাকথিত জয়ন্তীসভার ও অভিনন্দন-সভার যে প্রস্তাব না-উঠেছিল তা নয়—সে-প্রস্তাবকে অংকুর অবস্থাতেই কঠিন হাতে উন্মূলিত করেছে সে। সত্যি সত্যিই যারা নিজের গরজে আসবে, সত্যিকার প্রীতি বা শ্রদ্ধা—যদি শ্রদ্ধা থাকা সম্ভব হয়, বহন করে, তারাই এদিনে সুস্বাগত, তারাই আপন। তাদের প্রীতির অর্ঘ্যে আনন্দ থাকে—জ্বালা বা গ্লানি থাকে না পিছনে, সংশয়ে তিক্ত হয়ে ওঠে না মন।

আজও তারাই এসেছিল, স্বল্প কজন লোক। সকালবেলাতেই এসেছিল—যেমন প্রতিবার আসে। অন্য অন্যবার তাদের সঙ্গে বসে গল্প করে, তাদের বসে খাওয়ায়—দুপুর কেন, সময়ে সময়ে ছুটির দিন হলে, মানে তাদের ছুটির দিন—সারাদিনই কাটায়। সেইরকমই আশা করেছিল সকলে, হয়ত একটু বেশিই। কারণ ষাট বছর পূর্তি অর্থাৎ হীরক জয়ন্তী—এ-আনন্দ করার দিন বহুলোকের জীবনেই আসে না। এদিনের উৎসব—সমারোহের না হোক, বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে বৈকি!

সে-দাবি পূরণ না করলেও, ইন্দ্রজিৎ অন্য দিনের মতোই স্মিতপ্রসন্ন বদনে সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। জলযোগের আয়োজনেও কোন ত্রুটি ঘটে নি, বরং এবার তাতে একটু আড়ম্বরই ছিল। তবু প্রথম থেকেই তাকে যেন একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। যেন কি ভাবছে সব সময়—যা শুনছে, যা বলছে,

সেটার সঙ্গে তার যেন মনের সম্পর্ক নেই। কিন্তু তারপর যে কাণ্ডটা করল, তা কখনও করে নি, এমন কি তার পক্ষেও অভূতপূর্ব, অস্বাভাবিক। হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমরা সব আরাম করে বসো, গান শুনতে হয় তো শোনো, অনেক নতুন রেকর্ড আছে—বেলায় খেয়েদেয়ে যেয়ো। আমার একটু জরুরী কাজ আছে বললেই ভাল শোনাত, কিন্তু জন্মদিনটা মিথ্যা দিয়ে শুরু করতে চাই না। আমি একটু একা থাকতে চাই এখন—একটু একা থাকা দরকার। অনেকদিন বাইরের দিকে তাকিয়েছি—আজ একটু নিজের দিকে তাকাব ভাবছি। জীবনের জমাখরচটা মেলানো দরকার। বেশি সময় তো হাতে নেই, ষাট বছর পেরিয়ে এলুম—আর দেরি করা উচিত নয়।...আশা করি কিছু মনে করবে না তোমরা, জন্মদিনের প্রিভিলেজ বলে ধরে নেবে। প্লীজ।'

কথাক'টা বলে আর মতামতের অপেক্ষা করে নি, ওদের মুখের দিকে তাকিয়েও দেখে নি। ওদের মুখভাবে বিরক্তি বিস্ময় এসব লক্ষ্য করে যদি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, বোধ হয় সেইজন্যেই। সোজা ওপরে নিজের পড়ার ঘরে গিয়ে দোর দিয়েছিল।

বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিল বৈকি। অনেকেই এটাকে একরকম অপমান বলে ধরে নিয়েছিল, বেশির ভাগই যজ্ঞেশ্বরহীন যজ্ঞে থাকতে রাজি হয় নি, অর্থাৎ মধ্যাহ্নভোজনের জন্যে অপেক্ষা করে নি, যে-যার বাড়ি চলে গিয়েছিল। বাকি যারা বসেছিল, তারা ভেবেছিল যে, খাবার সময় অন্তত নামবেই ইন্দ্রজিৎ, তাকেও তো খেতে হবে। কিন্তু তাদের সে-আশাও পূর্ণ হয় নি। ইন্দ্রজিৎকে ডাকতে গিয়ে বাড়ির লোক ফিরে এসেছে, সন্ধ্যার আগে সে কিছু খাবে না, দোরও খুলবে না বলে দিয়েছে।

ইন্দ্রজিৎ মুখুজে বসে বসে তার ছেলেবেলার কথাটা ভাবছে তখন—যখন সে মাত্র বিনু, ইন্দ্রজিৎ নাম কেউ জানে না, মায়েরও মনে আছে কিনা সন্দেহ—সেই যখন থেকে তার জন্যে উদ্বেগ ও আশংকার শুরু।

ছোটবেলাকার স্মৃতির সঙ্গে যে ছবিটা সব চেয়ে বেশি জড়িয়ে আছে, সেটা হল ওদের বাড়ি। যে যাই বলুক মানুষের জীবন গড়ে ওঠায় তার পারিপার্শ্বিক তো বটেই—বাসস্থানের প্রভাবটাও সামান্য নয়। সে-সময়কার জীবনের যে-কোন অধ্যায় যে-কোন ঘটনা মনে করতে গেলেই বাড়ির ছবিটা মনে থাকে সঙ্গে সঙ্গে। মা বসে বই পড়ছেন, তারা খাচ্ছে, বামুন-মা ওপর থেকে রান্না-করা তরকারি নিয়ে আসছেন—সেই সঙ্গেই মার শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপর বড় আলো, পিছনে লোহার সিন্দুক' ওদের খাবার ঘরে দুটো কাঁঠাল কাঠের তৈরি বাসনের বড় বাক্স, কুলুঙ্গীতে রাখা লক্ষ্মীর চুপড়ি—সিঁড়ির সঙ্গে পাশের অনুকল্প বাথরুম, এদিকে ওদের জুতোর তাক—সব মনে পড়ে যায়।

বাড়ি অবশ্য এমন কিছু নয়। তিন দিক চাপা ছোট বাড়ি একটা। উত্তর দিকের দিদিমার ঘরটা—যেটা পরে বামুনদির ঘরে পরিণত হয়েছিল—সেটার দুটো জানলা ছিল, কিন্তু সে ওই চন্দনদের বাড়ির উঠোনের ওপর, সামান্য এক-ফালি উঠোন—তাকে খোলা বলা চলে না কোন মতেই, খোলা শুধু রাস্তার দিকেই, পশ্চিমে রাস্তা—ছ'ফুট একটা ইঁটবাঁধানো গলি, বড় রাস্তা থেকে

বেরিয়েছে। ব্লাইন্ড লেন বা কানা গলিই বলা উচিত। তবে একেবারে নিরেট দেওয়ালে শেষ হয়নি, উত্তর দিকের চন্দনদের ও শরৎ গিন্নীর বাড়ির পিছনের বস্তিতে গিয়ে পড়েছে। সে বস্তির দক্ষিণে একটা এমনিই গলি আছে, কিন্তু সে পথও কিছু দূর গিয়ে এর চেয়েও একটা সরু গলিতে গিয়ে পড়েছে। বস্তির বাসিন্দারাও বেশির ভাগ এইখান দিয়ে যাতায়াত করে।

বাড়িওলার নিজের বাড়িটা দক্ষিণ খোলা। তার পিছনে এই অন্ধকূপ করা হয়েছিল ভাড়াটেদের কল্যাণের জন্যেই। যারা ভাড়া দিয়ে বাস করে, তাদের হাওয়া আলোর প্রয়োজন নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তেমন বাড়ি স্বাভাবিক নিয়মে হয়ে যায় উত্তম, ভাড়াটা বেশি মিলবে, না হয় তেমনি ভাড়াই দাও তোমার সামর্থ্য ও বাড়ির চাহিদা মতো—চোখ কান বুজে কোন মতে দিন যাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানি বহন করো। কুঁজোর চিৎ হয়ে শোবার শখ সংসার বরদাস্ত করে না।

তা হোক—তিন দিক বন্ধ বাড়ির অসুবিধা বোঝার বয়স সেটা নয়, বিনুও বুঝত না। তার কষ্ট হত, হাওয়া নয়—মানুষের জন্যে। মানুষের মুখ দেখার জন্যেই। ওদের যেটা শোবার ঘর, তার পশ্চিমে অর্থাৎ রাস্তার দিকে একটা দরজা ছিল। সদর দরজার ঠিক ওপরে—তার সামনে ছোট এক ফালি ঝুল বারান্দাও ছিল, বোধহয়, দু' ফুট চওড়া, সেখান থেকে বড় রাস্তাটা দেখা যায়, এ বড় রাস্তায় ট্রাম গাড়ি চলত না কিন্তু ঘোড়ার গাড়ি পালকি চলত—লোকজন যাতায়াত ছিল অবিরাম। সেখানটায় দাঁড়াতে পারলেও বেঁচে যেত বিনু। সেটুকু স্বাধীনতাও ছিল না। তার মায়ের ধারণা, ওখানে দাঁড়াতে দিলেই আলসের ওপর উঠতে চাইবে ছেলেমেয়েরা—ঝুঁকবে এবং পড়ে যাবে। এ অনিবার্য। এ ঘটনা পরম্পরা যেন তিনি চোখের সামনে সুস্পষ্ট দেখতে পেতেন। সেই কারণেই ওটা তালা বন্ধ থাকত বারো মাস, পুজোর আগে ও চৈত্র মাসে একদিন করে যখন ছ মাসের জমে থাকা ঝুল ও আবর্জনা সাফ হত তখনই একবার করে খোলা হত দরজাটা—এবং সেই সময় মায়ের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে অল্প কিছুক্ষণ বড় রাস্তা দেখার সুদুর্লভ সৌভাগ্য মিলত।

তবুও তিন দিক চাপা বাড়িতেও বাতাস আসত, একটু বড় হবার পর সেটা লক্ষ্য করেছে বিনু। অবশ্য অন্যরা বলাবলি করার পরই সে সচেতন হয়েছে—কিন্তু তারপর মিলিয়ে দেখেছে তাদের কথা—আলো না আসুক, বাতাস আসত। ফাল্গুন চৈত্র মাসে, বৈশাখ মাসেও কোথা থেকে দমকা বাতাস এসে দরজা জানলার কড়া শেকল নেড়ে দিয়ে চলে যেত। শুকোতে দেওয়া জামা গামছাগুলো উড়িয়ে নিচের উঠোনে ফেলে মায়ের কাজ বাড়াত, ওপরের টবের গাছগুলো তাদের শীর্ণ শাখা আন্দোলিত করে অভিনন্দন জানাত আতপ্ত সে বাতাসকে।

কলকাতার বাড়ির—পুরনো কলকাতার এই একটা বিশেষত্ব। পরে বড় হয়েও উত্তর কলকাতার বহু বাড়িতে গিয়ে এই আশ্চর্য জাদুর খেলা দেখেছে বিনু, হাওয়া আসার কোন পথ আছে বলে মনে হয় না যে বাড়িতে, সে বাড়িতেও আসে শীত গ্রীষ্ম দুই কালেই—উত্তুরে ও দক্ষিনে বাতাস।

আলোও আসত, ওদের শোবার ঘরটায় বিশেষ করে, বিকেলের দিকটা বেশ

আলো হয়ে উঠত, পশ্চিমের জানলা দিয়ে এক এক সময় রোদও এসে পড়ত একটু। বামুনদি উত্তুরে বাতাসের ভয়ে ওদিকের জানলা বন্ধ করে রাখতেন—নইলে ও ঘরেও আলো আসত। বিকেলের দিকে পড়ন্ত রোদ যখন কালী দত্তদের তেতলার চিলেকোঠার চুণকাম করা দেওয়ালে এসে পড়ত, তখন তার প্রতিফলিত আলো পড়ে ভেতর দিকটা অর্থাৎ উঠোনের দিকটাও বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠত, তবে সেই কারণেই সকালের আলো ফুটতে দেরি হত।

ছাতটাতেই ছিল ওদের মুক্তি। খোলার চালের একপ্রস্থ রান্না ভাঁড়ার ঘর ঐ ছাদেই—কিন্তু সে খুবই ছোট ছোট, তাতে বেশী জায়গা নেয় নি। ছাদটার কথা মনে পড়লে আজও কেমন একটা আনন্দ হয় বিনুর গায়ে কাঁটা দেয় এক এক সময়। ভেতরের বারান্দা মাত্র দু' হাত চওড়া, ঐ বারান্দা আর ঘর। সে ঘরও বিছানা আলমারি সিন্দুকে প্রায় সবটাই জোড়া—কাজেই সর্বদা একটা বন্দীদশার ভাব থাকত, খেলাধুলো তো দূরের কথা, চলাফেরাই কষ্টকর ছিল। ছাদে উঠলে ছুটোছুটি করা যেত, রথের দিনে এক পয়সার মাটির রথ দড়ি বেঁধে চালানো যেত। খেলা-ঘরের হাঁড়িকুড়ি সাজিয়ে কল্পনার সংসার পাতা চলত। কাশী থেকে কে যেন কাঠের ব্যাট বল এনে দিয়েছিল—সেও খেলার জায়গা ঐ ছাদই।

তা ছাড়াও ছিল।

মানুষের মুখ দেখা যেত ছাদে উঠলে।

অনেক মানুষ, অনেক রকমের। এই বাড়ির ক'জন ছাড়া—সেইটেই বড় কথা। কালী দত্তর সটির কারখানায় ছ' সাতজন লোক কাজ করত, সটি শুকোত, ভাঙ্গত, গুঁড়ো করত। কালী দত্তর তিন বৌ, ছেলে হয় নি বলে ভদ্রলোক তিন তিনটে বিয়ে করেছিলেন পর পর—তাতেও হয় নি। কলহকোজিয়া হলে তারা এক একজন গর গর করতে করতে উঠে আসত। ছাদ থেকে গালাগাল দিত অপরকে—আবার সদ্ভাব থাকলে তিনজনেও উঠত। এক দেওয়ালে বাস—আলসে ডিঙ্গোলেই ও ছাদে যাওয়া চলত। এছাড়া চন্দনদের বাড়িব শরৎ গিন্নীর বাড়ির লোকদের সঙ্গে ছাদে দাঁড়িয়েই গল্প করা চলত। তারা একটি করে পরিবার নয়। চন্দনদের ভাইবোনের দুটো সংসার এক বাড়িতেই। চন্দনের বর নিত না, তবে তার হাতে পয়সা ছিল, নিজের সংসার নিজে চালাত, ভাই বিয়ে করেছে, তার সংসার আলাদা। শরৎ গিন্নীর নিজের বাড়ি (শরৎ গিন্নী কেন তা বিনু আজও জানে না, শরৎবাবুর স্ত্রী বলে না মহিলার নিজের নামই শরৎশশী কি শরৎসুন্দরী—কে জানে), তাঁর সংসার তো ছিলই। তাছাড়াও দোতালা একতলায় এক এক ঘর ভাড়াটে ছিল, ফলে সেও তিনটি পরিবার। সরকার বাবুদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা হওয়ার উপায় ছিল না, রান্না ভাঁড়ার ঘর আড়াল পড়ত, তবে ওদের কথার আওয়াজ—কথাবার্তা শোনা যেত। যাদুবাবুদের বাড়িটা দূরে হলেও তার একটা কোণ দেখা যেত। এ-কটা ছাড়াও দূরে দূরে কত বাড়ি—তারা ছাদে উঠত, কাপড় শুকুতে দিত, বড়ি আধ-শুকনো হলে আলসেয় তুলে দিত কাপড় সুদ্ধ, ফলে বহু লোকের জীবনযাত্রার স্পর্শ পাওয়া যেত, প্রাণচঞ্চলতার ঢেউ এসে লাগত শিশু-মনে।

ওদের ছাদেও বড়ি দেওয়া হত। বড়ি আমসি কপি শুকনো হত তারের জালের ঢাকা চাপা দিয়ে। নইলে হয়ত কাকে মুখ দেবে। নয়ত নোংরা কিছু পড়বে। কাকের খাদ্য না হলেও অনেক সময় ঠোঁটে করে উলটে বা নেড়ে দেখে। রাজ্যের নোংরা জিনিসে মুখ দেয় ওরা। পচা ইঁদুর, ব্যাঙ খায়—ওরা মুখ দিলে সে জিনিস আর খাওয়া চলে না। আমের আচারও করতেন মা, ছোট ছোট ডুমো ডুমো করে কেটে নুন মাখিয়ে দুদিন শুকোবার পর তেলে ফেলতেন, তাকে নাকি 'ফকিয়া' বলে। আমতেলও হত, বড় ফালা ফালা আম ফেলে। আমড়ার কি জলপাইয়ের আচারের সঙ্গে এঁচোড় কপির আচার হত।

এসব তৈরী করার প্রক্রিয়া দেখতে খুব ভাল লাগত বিনুর, এক মনে লক্ষ্য করত। তাকে পাহারাও দিতে হত মধ্যে মধ্যে। তা হোক, সেটা অত কষ্টকর মনে হত না। ছাদেই তো থাকতে চায় সে। ছাদের আরও আকর্ষণ ছিল—কয়েকটা টবের গাছ। টগর, বেল, রজনীগন্ধা, দোলনচাঁপা। জেঁওজ ষষ্ঠী (এখন এ নাম বললে কেউ বোঝে না, ওর নাম নাকি আবার স্পাইডার লিলি) সব চেয়ে প্রিয় ছিল ওর। ফুলটা সম্বন্ধে ওর বিস্ময়ের অন্ত ছিল না যেন। কেশরের মাথার পাখীগুলোয় হাত দিলেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়ে রঙ লেগে যেত, আর কেমন একটা মিষ্টি মৃদু গন্ধ।

ফুল ছাড়া অন্য গাছও ছিল। ফলের গাছ ছিল কটা। আনারস আর লেবু গাছ। বছরে একটা কি দুটো আনারস হত—তিন চারটে টব ও টিনে লেবু হত দুটো কি তিনটে। ছোট গাছের ছোট্ট ছোট্ট ফল, কাজে আসার মতো কিছু নয়, তবু ঐ ফলগুলো কুঁড়ি ধরা থেকে পাকা পর্যন্ত ওর কৌতূহল ও বিস্ময়ের অবধি থাকত না। শুধু হাত বুলিয়েই কী আনন্দ। বাজার থেকে যে ফল কিনে থাকে, সেগুলো যে সত্যি সত্যিই গাছে হয়, ওদের বাড়ি, ওদের গাছেও হওয়া সম্ভব, হচ্ছে—এ যেন দেখেও বিশ্বাস হত না, বার বার দেখে, অনুভব করে দেখতে হত, দেখে আশ মিটত না।

বাড়ির কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির লোকের কথাও মনে আসে। তারা জন্মসূত্রে আত্মীয়, এক রক্তের। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত দেখেছে, অথবা শুধু তাদেরই দেখেছে বলা যায়। তাদের মধ্যে একজন আজও বেঁচে আছেন। আর একজন অল্প কিছুদিন আগে গেছেন। তবে এঁরা ঠিক তাঁরা নন—সেদিনের সে শিশু জন্মে যাদের দেখেছিল। মা, বামুন মা, দাদা আর দিদি—এই তো কটি প্রাণী, কিন্তু তারা যেন কোন স্বপ্নলোকের, সেখানে তারা এখনও সেই বয়সে সেই অবস্থাতেই আছে। তারা বাস্তবের থেকে বেশী সত্য—অস্থিতে মজ্জাতে মর্মে মিশে আছে তারা।

তবে ঐ কজন ছাড়াও লোক ছিল বাড়িতে। নিচে একঘর ভাড়াটে থাকত। সে অন্তত জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত দেখছে এই বন্দোবস্ত। প্রথম যারা ছিল—তিনজন, কর্তা, গিন্নী আর আঠারো উনিশ বছরের এক ছেলে। কর্তা বড়বাজারে কিসের দালালী করতেন, ছেলে কোথায় চোদ্দ টাকা মাইনেতে চাকরিতে ঢুকেছিল। ছেলের বিয়ে হতে শ্বশুর বৌবাজারে একটা বাড়ি দিলে—তারা সেখানেই চলে

গেল। পরে এল শিবুরা। শিবচরণ দত্ত, তার মা আর দুই বোন—চপলা ও সরস্বতী।

এই কটি প্রাণীর মধ্যেই জগৎ সীমাবদ্ধ ছিল বিনুর। ভাড়াটেদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল কম। পর পর দু'ঘর ভাড়াটেই এসেছিল—নিচের তলার দুটি পরিবারই বেনে—সুবর্ণবণিক। পাড়াটাই ছিল গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক আর তন্তুবায়দের পাড়া। মধ্যে মধ্যে দু-এক ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থ—সে যেন কতকটা প্রক্ষিপ্ত। তখনকার দিনের সংস্কারমতো মা এঁদের সান্নিধ্য এড়িয়ে যেতে চাইবেন—সেইটেই স্বাভাবিক। নেহাৎ অভাবে পড়েই ভাড়া দিতে হয়েছিল! বাড়িটার ভাড়া ত্রিশ টাকা। এ পাড়ার তুলনায় অনেক বেশী। বাবার অজস্র রোজগার ছিল—দরদস্তুর করেন নি, মুহুরীকে দিয়ে নাকি বাড়ি ঠিক করেছিলেন, সে হয়ত কিছু কমিশন খেয়ে থাকবে। এখন এত টাকা ভাড়া টানা মার সাধ্য নয়, সেই জন্যেই ভাড়াটে বসানো। তা-ই বা আর কত সাশ্রয় হয়েছে, আগে ছিল দশ টাকা, এবার অনেক টানাটানি করে বারো টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়েছে—নিচের তিনখানা ঘর। ওপরের কোণের ঘরটা পড়েই থাকে—একজন ভাড়া নিতে চেয়েছিল ছ টাকায়। মা রাজী হননি। কে-না-কে আসবে, পাশাপাশি ঘর, 'নেপ্‌চ' এড়ানো যাবে না। 'ওতে আমার কতটুকুই বা সুসার হবে। মিছি-মিছি জাতও যাবে পেটও ভরবে না।'—এই হল মায়ের বক্তব্য।

নিচের তলার ভাড়াটেদের জন্যেই মা সদা-সশঙ্ক থাকতেন। তাঁর আরও ভয় বিনুর জন্যে। পাগল ছেলে, কোনদিন না কিছু খেয়ে আসে ওদের ঘরে। তাঁর ধারণা—তাঁদের জাত মারবার জন্যে ওরা ওৎ পেতে বসে আছে, সর্বদাই ফাঁক খুঁজছে। আর এই পাগল ছেলেটি থেকেই তাঁদের সেই মহা সর্বনাশ হবে।

সুতরাং বাড়ির এই কটি প্রাণী ছাড়া আর কোন মানুষের সঙ্গেই মেশার সুযোগ হয়নি—মানে, মেশা যাকে বলে। আর কেউ ছিল না, ও অন্তত কাউকে দেখেনি। ওর দিদিমা নাকি ওর জন্মের আগেই মারা গিয়েছেন, তাঁকে ও দেখেনি। বাবার স্মৃতিও যেন ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ে—যদিও সে-কথা কেউই বিশ্বাস করে না। বিনুর তিন বছর বয়সে বাবা মারা গেছেন, তাও মরেছেন বিদেশে—মরবার সময় যে হৈ-চৈ হয়, দাহ ইত্যাদিতে, সেটা বরং মনে থাকা সম্ভব। এমনি মনে থাকবে কি করে? কিন্তু বিনু যেন বাবাকে দেখতে পেত বেশ—অস্পষ্ট হলেও একটা আদল ভেসে উঠত চোখের সামনে—স্নেহ-স্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বল একটা মুখও। কে জানে কল্পনা কিনা। বাবার কোন ছবি ছিল না ওদের বাড়ি, সত্য মিথ্যা যাচাই করার উপায় নেই।···

মেশা না হোক, দূর থেকে কথাবার্তা কারও কারও সঙ্গে চলত। সরকার বাড়ির দুই কর্তা জানলা দিয়ে ওর খোঁজ-খবর নিতেন, ওকে নিয়ে কৌতুকও করতেন একটু আধটু। ওদের শোবার ঘরের জানলা দিয়ে তাঁদের সিঁড়ির জানলাটা দেখা যেত, সেইখান থেকেই আলাপ করতেন তাঁরা। কখনও কখনও বিনু সদরে এসে দাঁড়ালেও তাঁরা ওপর থেকে ডেকে মজা করতেন। তাঁদের বাড়িতে বিনুদের যাওয়া-আসা ছিল না, কোন ক্রিয়া-কর্মেও ও বাড়িতে নিমন্ত্রণ হত না। বিয়ে-থা ইত্যাদিতে ওঁরা মাছ মিষ্টি ইত্যাদি পাঠিয়ে দিতেন। এদের

শুনিয়ে শুনিয়ে মুখে বলতেন—'অনাথা বিধবা বেওয়া মানুষ, নেমন্তন্ন করে শুধু শুধু বিব্রত করা উচিত নয়। নেমন্তন্ন করা মানেই লৌকিকতার ব্যাপারে গিয়ে পড়া, নিদেন একটা টাকাও তো খরচা হবে।'

কিন্তু, পরে বুঝেছিল বিনু, কারণটা ঠিক তা নয়। ও'দের বনেদী পরিবার, বিনুদের নেমন্তন্ন করে সামাজিক স্বীকৃতি দিলে ওঁদের আত্মীয়-স্বজনরা ভ্রূকুটি করতেন, কেউ হয়ত বা সামনেই অপমান করে বসতেন। ওঁরা হয়ত অত কিছু ভাবতেন না, এদের স্নেহের চোখেই দেখতেন—তবে সামাজিক ব্যাপারে নিজের মতামতটাই তো সব নয়। স্নেহ করতেন বলেই বেশ গুছিয়ে বেশি করে লুচি দই মাছ মিষ্টি দিয়ে ঝুড়ি সাজিয়ে খাবার পাঠাতেন। অবশ্য মা সে-খাবার ঘরে তুলতেন না, ওদের খেতেও দিতেন না। ভাড়াটেদের দিয়ে দিতেন কিম্বা ঝিকে বলতেন লুকিয়ে পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে যেতে। একবার ওরা সেটা জানতে পারেন, ভাড়াটেরাই বলে দিয়ে থাকবে—তারপর থেকে খাবার পাঠানোও বন্ধ হয়ে গিছল।

আজ এটাকে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি মনে হয়, কিন্তু সেদিনের সে-আবহাওয়ায় এটা অস্বাভাবিক ছিল না আদৌ। ভদ্রঘরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সকলেই অতিমাত্রায় সচেতন ছিল, শুধু জাত নয়—ওর ওপরেই আভিজাত্যের শ্রেণী বা পংক্তি বিচার হত, কে কতখানি অভিজাত কি সম্ভ্রান্তঘরের লোক বোঝা যেত। এইভাবে পাঠানো খাবার—সরকার-বাড়ি কেন, অন্য ব্রাহ্মণবাড়ি থেকে এলেও, মা খেতে দিতেন না। এমনকি কেউ কাঁচা আনাজ-কোনাজ কি ফলমূল পাঠালেও অনেক সময় ঐ গতি হত সেগুলোর। কেবল আনন্দময়ী-তলার যে ঠাকুরমশাই বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলে কালীপুজো করতেন, তার সেই প্রসাদ অড়র ডালের খিচুড়ি আর হলুদ-গন্ধ মাংস—রাত তিনটের সময় এসে দিয়ে যেতেন—ওদের ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গিয়ে তুলে খাওয়াতেন। প্রসাদ বলেই আর কোন বাছ-বিচার করতেন না।

সরকার কর্তারা বাদে বিনুর বেশির ভাগ ভাব ছিল কালী দত্তদের বাড়ির সঙ্গে। সটির কারখানার কর্মচারীদের সঙ্গেই প্রধানত। ছ'-সাতজন লোক, তারা সবাই বুড়ো বা মধ্যবয়সী, একটি কেবল ছোকরা ছিল ওদের মধ্যে। সে ওদিকে, সিঁড়ির ধারে থাকত, বোধহয় এদের কেউ তার সম্পর্কে গুরুজন হত—বিশেষ কথাবার্তা কইত না। হুঁকো কলকের ব্যবস্থা ছিল, সবাইয়ের একবার করে খাওয়া হয়ে গেলে সিঁড়ির কোণে রেখে আসত একজন। সে ছোকরা সেটা নিয়ে খানিকটা নিচে নেমে যেত, সেইখানে দাঁড়িয়েই একটু টেনে নিত বোধহয়।

সে ছাড়া বাকী সকলের সঙ্গেই বিনুর ভাব ছিল। ওর সঙ্গে তাদের সুখ-দুঃখের কথা হত বলা চলে। তারা কত কী খবর দিত ওকে, ওর কাছ থেকে ওর জগতের খবর নিত। তাদের নিজেদের মধ্যে যে কথা হত তাও মন দিয়ে শুনত বিনু। কতক বুঝত, কতক বুঝত না। বেশির ভাগই বুঝত না, তবু ভাল লাগত ওর—যেন বৃহত্তর জগতের একটা স্বাদ পেত ঐ ক'টি সামান্য প্রাণীর অতি তুচ্ছ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে। তখন এমনভাবে বুঝত না, এখন মনে হয় ওর ঐ অতি সংকীর্ণ জগতের সীমারেখার বাইরে যে বিশাল জীবন-স্রোত বয়ে

যেত—বিপুল বিশ্বের সেই প্রাণস্পন্দন অনুভব করত সে—কিছু না বুঝেও। সে-ই প্রথম মানুষের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে ওর পরিচয়।

তারাও ওকে ভালবাসত! কালী দত্তর স্ত্রী তিনজনও ওর সঙ্গে গল্পগুজব করত, কর্মচারীদের ভাষায় 'বাবুর পরিবাররা—কিন্তু তাতে ওর মন ভরত না। ঐ কর্মচারীদের ভাল লাগত ওর (তখন 'লেবার' কি 'শ্রমিক' এসব শব্দ চালু ছিল না, কর্মচারীই বলা হত, এমনকি অতি নিম্নস্তরের শ্রমিকদেরও) বেশী, তারাও সত্যিসত্যিই স্নেহ করত ওকে, সেটা সেই বয়সেই কতক বুঝেছিল। হীরু বলে একজন ছিল, হীরু প্রামাণিক, সবচেয়ে বৃদ্ধ ওদের মধ্যে, দড়ি দিয়ে বাঁধা পুরু পাথরের চশমা পরে কাজ করত—সে ওকে ঠোঙ্গা ভর্তি করে করে সটি দিত, ফলে এত সটি জমে যেত এক এক সময়—মা রাশি রাশি বিলিয়েও কুল পেতেন না। সটি দেবার সময় ওর গাল টিপে আদর করত, মুখে মুখে কত গল্প শোনাত হাতে কাজ করতে করতে। তার মুখেই শুম্ভনিশুম্ভর যুদ্ধ, ত্রিপুরাসুর বধ, বিক্রমাদিত্যের বেতাল-সিদ্ধির গল্প প্রথম শুনেছিল বিনু। হীরুই ওর মাকে মাঝে বলত, 'তোমার এ ছেলে মা একটা কেষ্টবিষ্টু হবে দেখে নিও। এর জন্যে আবার তুমি ভাবনা করো। দ্যাখো দিকি কেমন ঠায় একভাবে দাঁড়িয়ে গল্প শোনে, আর কী মিষ্টি কথা। ভগবানের দয়া থাকলে তবে এমন ছেলে মেলে মা।'

আর কিছু না হোক, শুধু এই জন্যেই চিরদিন হীরু প্রামাণিককে মনে থাকবে বিনুর। বহু ধিক্কার বহু সংশয়ের অন্ধকারের মধ্যে সে-ই প্রথম আশা ও আশ্বাসের আলো তুলে ধরেছিল সামনে।

॥ ৪ ॥

কি যে ওদের বলে বা কি যে বলছে—এ প্রশ্ন মনে ওঠার বয়স নয় সেটা। ও কথা পরে মনে এসেছে। তখন আগেকার অনেক রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেছে নিজের মনেই। তবে সবটা নয়, সম্পূর্ণ রহস্যটা পরিষ্কার হয়েছে অনেক পরে।

বিনুর যা মনে পড়ে, মাসের প্রথম দিকে—প্রতি মাসেই একটা বিশেষ ঘটনার কথা, প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বলা চলে—মা কোন একটা সন্ধ্যায় ক্ষীণ 'সেজ-এর আলোতে বসে দীর্ঘকাল ধরে চিঠি লিখতেন একখানা—সেই চিঠি নিয়ে পরের দিন ওদের বামুনমা কোথায় যেতেন, ফিরে এসে মায়ের হাতে কয়েকটা টাকা দিতেন—কোন মাসে পঞ্চাশ কোন মাসে ষাট। প্রতিবারই বিনু লক্ষ্য করত, মা টাকা গুনে নিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেন। কখনও কখনও একটা হতাশাসূচক মুখভঙ্গী করতেন। বিনু জ্ঞান হয়ে পর্যন্তই দেখছে তার স্বল্পভাষিণী মা কেমন যেন সর্বদা বিষণ্ণ ম্লান হয়ে থাকেন—সেটা যে বিষণ্ণতা, সে কথাটা বুঝতে দেরি হয়েছে অবশ্য, তবু তিনি যে আর পাঁচটা মেয়েছেলের মতো নন, এমনকি অন্যান্য বিধবাদের মতোও নন, সেটা তখনই লক্ষ্য করেছে বৈকি—কিন্তু এই টাকা চাইতে পাঠানোর (চাইতে তো বটেই নইলে বামুনমার হাতে চিঠি পাঠানোর অর্থ কি?) দিন ও পাওয়ার দিন সে বিষণ্ণতা আরও

বাড়ত। যেন মর্মান্তিক একটা অপমানে তাঁর সুগৌর মুখ আরক্ত হতে থাকত ক্ষণে ক্ষণে, দুই চোখ জলে ভরে আসত, সে জল সামলাতে রীতিমতো কষ্ট হত তাঁর।

কোন কোন দিন হতাশাটা গোপন করাও যেত না।

ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে সামনের দত্তদের বাড়ির শ্যাওলাধরা দেওয়ালটার দিকে চেয়ে বলে উঠতেন, 'ছেলেমেয়েদের জামা নেই, আমার সেমিজ চাই, লেপের ওয়াড় ছিঁড়ে ধুলোধাবাড়ি উড়ে গেছে—অন্তত পনেরোটা টাকা বেশী দিতে বলেছিলুম—তাও দিতে পারল না!

সঙ্গে সঙ্গে বামুনমা যেন চাপা গলার গর্জন করে উঠতেন, 'বেশ হয়েছে, তুমি যেমন তোমার তেমনি হয়েছে। বলে আপনার ধন পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞ বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে। তা তোমার হয়েছে তাই। যার আজ পাঁচটা প্রিতিপালিা নিয়ে থাকার কথা—আজ তাকে পরের কাছে হাত পাততে হয়। ভিক্ষের মতো করে। হাত্তোর কপাল রে!'

সঙ্গে সঙ্গে মা যেন সম্বিৎ ফিরে পেতেন, 'তুমি চুপ করো, চুপ করো বামুনদি! আর পাড়া মাথায় করো না—ব্যাগত্তা করি। শুধু শুধু—যে শুনবে সে হাসবে. টিটকিরি দেবে।'

এই নাটকই ঘটত প্রতিমাসে।

দিন যে খুব কষ্টে কাটছে সেটা কারও কাছেই চাপা থাকত না। বাড়িভাড়া মাসে ত্রিশ টাকা, সেটা ওর মা হাতে টাকা আসামাত্র মিটিয়ে দিতেন—তা যত কষ্ট যত অভাবই হোক। বলতেন, 'খাই না খাই বুকে হাত দিয়ে পড়ে থাকি, লোকে কথায় বলে। তা সেই পড়ে থাকার জায়গাটা ঘোচাতে চাই না। সব দুঃখই হয়েছে, এখন পথে গিয়ে বসাটাই বাকী—তা নিদেন যদ্দিন কাটে!'

ত্রিশ টাকার মধ্যে আসত নিচের তলার ভাড়াটেদের কাছ থেকে—দশ বা বারো, ঐরকম! ঠিক কে কত দিত তা বিনু জানে না, কখনও জিজ্ঞাসা করে নি। তবে অর্ধেকের কম এটা জানে। কারণ মা প্রায়ই ক্ষোভ প্রকাশ করতেন, 'জাতও গেল পেটও ভরল না, আমার হয়েছে সবদিকেই তাই। আদ্ধেকটা বাড়ি নিয়ে বসে আছে তাই বলে তো আর ভাড়া অদ্ধেক দেয় না। অথচ হাজাররকম ফৈজৎ তার জন্যে, হাজারো অসুবিধে!'

খাওয়া পরা—কষ্ট সব দিকেই। যুদ্ধ বেধেছে কোথায়—জার্মানি আর ইংরেজের মধ্যে—তার জন্যে এখানে জিনিসপত্তরের দাম আগুন হচ্ছে। কিছুতেই ঐ বাঁধা টাকায় আর সংসার চলে না—একথা মা বামুনমা দুজনেই বারবার বলতেন। দুধ কমিয়ে দিতে হয়েছে। চার সের করে দুধ টাকায়, রোজ একসের নিলেও মাসে সাড়ে সাত-পৌনে আট টাকা। তাই জলের অজুহাতে রোজের যোগান কমিয়ে আধসের করে দেওয়া হয়েছে, 'শুধু শুধু বাছা গুচ্ছের দাম দিয়ে উনশুনি জল কিনতে পারি না আর'—বামুনমা শুনিয়ে দিয়েছেন। আগে জল খাবার বাঁধা ছিল—পরোটা আর মিছরির শুট, * এখন সে জায়গায় হয়েছে রুটি

*গাঢ় চিনির রস একরকমের। মিছরির কারখানায় বিক্রি হত। হাতীবাগানের দিকে কুঁদো মিছরির কারখানা ছিল, সেখানে বাটি পাঠিয়ে আনাতে হত। সম্ভবত মিছরির

আর গুড়। রাতের জন্যে রোলার আটার রুটি হত, তাই বাসি থাকত। সকালে আর করা হত না, কাঠ-কয়লার দাম বেড়ে গেছে অনেক, সে খরচও কমাতে হয়েছিল। দুধের বদলে শটি ফুটিয়ে তাতে একটু দুধ দিয়ে খাওয়ানো হত। কিম্বা কাঠখোলায় সুজি ভেজে জলে সেদ্ধ করে তাতে দুধ আর গুড় মিশিয়ে খেতে দিতেন বামুনমা, (বর্তমানে অনেক আধা-বিলিতী হোটেলে 'পরিজ' বলে খেতে দেওয়া হয়), বলতেন, 'সুজি যে খুব পোষ্টাই, ঠিকমতো সেদ্ধ হলে ও দুধের ডবল কাজ করে। গরীব দুঃখীরা কি দিয়ে ছেলে মানুষ করে বলো। তারা কি আর দুধ কিনে খাওয়াতে পারে! জলে কাঁচা সুজি সেদ্ধ করে তাই গেলায় ছেলেপিলেদের।'

এত করেও তবু ঠিক ঐ পঞ্চাশ-ষাট টাকায় চলত না। প্রতি মাসেই কিছু কিছু ধারবাকী পড়ত। উটনোর দোকানেই বেশী, হাটখোলার এক কাপড়ের দোকান থেকে কাপড় কেনা হত—সেখানে ধার দিত, মা চিঠি লিখে পাঠালেই বামুনমার হাতে কাপড় দিয়ে দিত তারা, যা দরকার। এরা নাকি বিনুর বাবার আমলের লোক, 'অনেক খেয়েছে তাঁর' মায়ের ভাষায়, তাই কড়া তাগাদা কখনও করত না। তবু তিন চার মাস বাকী জমলে একবার করে গোমস্তা পাঠাত। মুদীর দোকানের নীলকমল নিজেই আসত অবশ্য। এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোত, আর মায়ের মুখের দিকে ছাড়া সর্বত্র তাকাত, বারান্দার লোহার থাম, শিকের রেলিং, ওপরের কাঠের কড়িবরগা, মায় বারান্দায় এক কোণে রাখা পেতলের গংগলটার দিকেও। তাতেই মা বুঝে নিতেন। আস্তে আস্তে বলতেন, 'আমার মনে আছে নীলকমল।' সঙ্গে সঙ্গে নীলকমল এতখানি জিত কাটত 'না না, সেকি কথা আজ্ঞে, ওকথা আমার মনেও আসে নি। ছি ছি, আপনাদেরই তো দোকান' বলতে বলতে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেত।

এই রকম ক্ষেত্রে তিন-চার মাস অন্তর মাকে লোহার সিন্দুক খুলতে হত। সোনা বেরুত একটু আধটু। মা তাঁর অভ্যস্ত ম্লান গম্ভীর মুখেই বার করে দিতেন কিন্তু বামুনমার অত ধৈর্য ছিল না। তিনি ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলতেন আর কপাল চাপড়াতেন। বলতেন, 'তারপর, আর? নশো পঞ্চাশ মণ সোনা তো আর নেই! কতকাল এমন তলাগুছি দিতে পারবে?'

মাও নিঃশ্বাস ফেলতেন তখন, বলতেন, 'কী করব বলো, তাই বলে তো আর দাঁড়িয়ে অপমান হতে পারি না! যারা কোনদিন পায়ের দিক ছাড়া মুখের দিকে তাকায় নি—তারা দুটো কথা বলে যাবে, সে সইতে পারব না। যদ্দিন ধুলো-গুঁড়ো থাকবে তদ্দিন মান বজায় রেখে চলব, তারপর মা গঙ্গা তো আর শুকোন নি—তাই যদি অদৃষ্টে থাকে, তাতে গা-ঢালা দোব। যতদূর পারছি টেনে চালাচ্ছি, এরপর টানতে গেলে ছেলেমেয়েদের উপোস করিয়ে রাখতে হয়। এই তাই তুমি আপিঙ খাও, তোমাকে একপল্য দুধ দিতে পারি না।'

বামুনমা চোখ মুছতে মুছতে ঝংকার দিয়ে উঠতেন, 'রেখে বসো দিকিন। বাচ্ছাগুলো এক ফোঁটা দুধ পাচ্ছে না। উনি বুড়ো মাগী আমার জন্যে চিন্তে

কুঁদো ছাঁচ থেকে বার করে থালায় রাখলে সেটা ঝরে পড়ত, সেটাই। ঠিক জানা নেই—কীভাবে আসত ওটা।

করতে বসলেন।'

প্রসঙ্গটা অন্য খাতে বওয়ার ফলে তখনকার মতো বামুনমার সানুযোগ ধিক্কার থেকে অব্যাহতি পেতেন মা, কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ-চিন্তা থেকে পেতেন না। অন্ধকারে বসে বসে দীর্ঘক্ষণ ধরে চোখের জল মোছার প্রয়োজন হত তাঁর—আর কেউ না জানুক, বিনু তার সাক্ষী আছে।

কিন্তু মার অসীম ধৈর্য আর অপরিসীম সহনশীলতা মাঝে মাঝে তাঁকে ত্যাগ করে। বামুনমার ভাষায় 'বাসুকি মাথা নাড়েন এক একবার'।—সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাখ্যা করে বলতেন, 'মা বাসুকি এই পৃথিবীটাকে ঠায় ধরে আছেন, সে কথা একবারও এক সময়ের জন্যেও জানতে দেন না, তবু অমর হোন আর যা-ই হোন, মানুষের শরীর তো—মাঝে মাঝে ঘাড় বদল করতে হয়—সেই সময়গুলোতেই ভূমিকম্প হয়, পাহাড় ফেটে কোথাও কোথাও আগুন বেরোয়।'

মাও যেন মধ্যে মধ্যে আগ্নেয়গিরির মতোই ফেটে পড়তেন। সবচেয়ে বিচলিত হতেন তিনি ছেলেমেয়েদের খাওয়ার দৈন্য কি পোশাকের একান্ত দুরবস্থা দেখলে। বলতেন, 'রাজার ছেলেমেয়ে ওরা, জন্মেছে গাড়িঘোড়া চাকর-বাকর লোকলস্করের মধ্যে, ঘটি ঘটি দুধ নর্দমায় গেছে—একটু কেউ দুখদরদ করেনি। ওদের কি এইভাবে থাকার কথা, না এত কষ্ট সহ্য হয় ওদের।'

কখনও বা বলেন, 'এই শহরে হাটের ফিরিঙ্গি ওদের চারদিকে, একডাকে চিনবে সবাই! আজ ওরা ছেঁড়া কাপড় পরে বেড়াচ্ছে। কী বলব, ভগবানের মার।'

বামুনমাও সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে ওঠেন, 'তা তুমিই বা চুপ করে থাকো কেন? দেবার মতো পরিচয় দাও না কেন? তুমি তো আর মিথ্যে বলবে না, তোমার ভয়টা কিসের? তাদের সাধ্যি থাকে তারা বলুক যে তুমি মিছে কথা বলছ!'

সঙ্গে সঙ্গে মা যেন চুপসে যান। জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো অবস্থা হয়। আবারও তাঁর সেই বিষণ্ণ স্তব্ধতার আবরণ নেমে আসে, নিজেকে যেন গুটিয়ে নেন শামুকের খোলের মধ্যে গুটনোর মতো।

তবু এভাবে যে চলবে না তা মাও বোধহয় বুঝতে পারছিলেন, এখানে থাকলে তাঁর ছেলেমেয়েরা মানুষ হবে না এ পাড়ায়।

পাড়াটা অদ্ভুত। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদেরও যেমন বাস, বনেদী নামকরা পরিবার—তেমন কিছু কিছু পতিতাদেরও। তাদের সে-আড্ডা ওদের বাড়ি থেকে এমন কিছু দূরেও নয়। তারা দিনের বেলা সাধারণভাবেই রান্না খাওয়া করত, চুল শুকোত—বিনুদের ছাদ থেকে দেখা যেত। রাত্রে সেসব বাড়ির চেহারা যেন পাল্টে যেত। হার্মোনিয়ামের শব্দ উঠত, গানের সুর ভেসে আসত; কিছু কিছু অবাঞ্ছিত কোলাহলও!

তাছাড়া পিছনে বস্তি ছিল, সেখানেও গৃহস্থ, হাফ-গৃহস্থ এবং পুরোপুরি অ-গৃহস্থে মেলানো ছিল অধিবাসীরা। এদের গয়লানী নীরদা দুধ দিতে আসত—তার বর দুধ কিনে আনত কোথা থেকে, তাতে আরও খানিক জল মিশিয়ে সেই দুধের যোগান দিত—তার সিঁথিতে সিঁদুর হাতে লোহা, এগুলোর সম্যকার্থ পরে বুঝতে পেরেছিল বিনু—কিন্তু শৈল ঝি বর বলত না, বলতো 'মানুষ'—

সেও ঐ বস্তিতেই নীরদাদের পাশের ঘরেই থাকত। একদিন বামুনমা বলছিলেন সরস্বতীর মাকে বিনুর মনে আছে—'ঐসব যে ঝি দেখছ ওখানে সবই ওই। সকলেরই ঐ 'মানুষ'—কারও বা বাঁধা শৈলর মতো, মাগ ভাতারের মতো বাস করছে—পালিয়ে এসেছে কোথাও থেকে—কিম্বা অনেকদিন ধরে জোড় বেঁধে আছে—কেউ বা দিনে বাসন মাজে বাড়ি বাড়ি, রাত্তিরে মুখে এরারুট মেখে লম্প হাতে দাঁড়ায়। জিনিস একই।'

বিনু তখন অনেক কথাই বুঝত না, বুঝত যা তাও ঝাপসা ঝাপসা। কিন্তু মনে ছিল প্রায় সব কথাই, এখনও মনে আছে। রাত গভীর হলে হামেশাই ঐদিক থেকে চেঁচামেচি কান্নাকাটির আওয়াজ পাওয়া যেত—বস্তির দিক থেকেই শব্দটা আসত। সুবিধে এই যে এরা তার আগেই বেশির ভাগ দিন ঘুমিয়ে পড়ত। তবু এক-একদিন, চিৎকার চরমে উঠলে শিশুদের ঘুমও ভেঙে যেত। ওরা চমকে উঠে শুনত অদূরেই কোথাও একদিকে পুরুষের প্রবল হুংকার আর একদিকে নারী-কণ্ঠের আর্তনাদ। তার সঙ্গে দুমদাম শব্দ। মারবার শব্দই যে সব তাও না, এক পক্ষ দরজা বন্ধ করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে অপর পক্ষ লাথি মেরে সে দরজা ভাঙ্গছে বা ভাঙ্গার প্রয়াস পাচ্ছে।

মা চাপা গলায় বামুনমার কাছে আক্ষেপ করতেন, 'এ পাড়ায় আর একদিনও বাস করা উচিত নয়। রাঙ্গাবাবুরা যে কি করে সহ্য করেন কে জানে। দিন-দিন ছোটলোকপনা বেড়েই যাচ্ছে। কবে যে রেহাই পাব এ নরক থেকে তা জানি না।'

'রেহাই আর পাবে কি করে বলো।' জবাব দিতেন বামুনমা। 'বলে আছে গরু, না বয় হাল, তার দুঃখু সব্বকাল। তোমার যে সব থেকেও নেই। কে বা উয্যুগ করে বাড়ি খুঁজছে আর কে-বা মাথার ওপর দাঁড়িয়ে অন্যত্তরে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!'

'যাবই বা কোথায়। একানে বাড়ি পঁচিশ-তিরিশ টাকায় পাওয়াও তো মুখের কথা নয়।'

'কেন নয়? এত বড় বাড়ি আমাদের দরকারই বা কি। দুখানা ঘর হলেই তো চলে যায়। মানিকতলা নারকেলডাঙ্গার দিকে শুনেছি দশ-বারো টাকায় ছোট ছোট বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়।'

মা সভয়ে উত্তর দিতেন 'না বামুনদি, সে অজ পাড়াগাঁয়ের মতো জায়গা! আমি দু-একবার গেছি। মার সঙ্গেও গেছি, ওর সঙ্গেও। সে আরও খারাপ খারাপ বস্তি সব আর দু পাশে কাঁচা নালা। · ঢেঁকের জ্বালায় পালিয়ে গিয়ে তেঁতুল-তলায় বাস—ওতে আর দরকার নেই।'

ছেলেমেয়েরা ঘুমোচ্ছে মনে করে তাঁরা চাপাগলায় কথা কইতেন, কিন্তু ওধারে যারা ক্ষেপে মহামত্ত হয়ে উঠেছে তাদের অত বিবেচনা থাকবে সে তো সম্ভব নয়—সুতরাং ঘুম ভেঙ্গে বিনুরা যেমন ওদিকের তর্জন-গর্জন আস্ফালন-প্রতিআস্ফালন শুনত—তেমনি এদিকের কথাও। ক্রমশঃ এ চেঁচামেচির কারণও জানতে বাকী রইল না। শৈলই এক-একদিন এসে বামুনমার কাছে কাঁদাকাটা করত, কাপড় সরিয়ে পিঠে বুকে বাহুতে মারের দাগ দেখাত। ওদের মানুষ'

সবাই নাকি সমান, শুধু ওর কেন, আর যারা যারা আছে সবাই ঐ এক ছাঁচে গড়া, মদ কি তাড়ি একটু পেটে পড়ল কি ওদের ভাষায়—'ভূতের নেত্য' শুরু হয়ে গেল। চেঁচামেচি বাসন ভাঙ্গাভাঙ্গি মারধোর। তারপর অবিশ্যি ঠাণ্ডা হলে আবার খোশামোদ করে, হাতে পায়ে ধরে অনেকে। কেউ কেউ তাও নয়—পরের দিন সে ঘটনার জের ধরে অনুযোগ করতে এলে আরও ঘা-কতক ঢিবঢিবিয়ে দেয়। যাদের 'বিয়োলা বর' অর্থাৎ যারা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী—তারাও নাকি এ নিয়মের বাইরে নয়।

এসব গা-সওয়াও হয়ে গেছে। তবে নাকি কোন কোন দিন যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখনই বাইরে এসে অপরের কাছে কান্নাকাটি করে। শৈলও করত, বলত, 'কেন কিসের জন্যে এমন পিচেশের মতো আচরণ (কয়েকটা বেশ শুদ্ধ ভাষা বলত শৈল, আজও বিনুর মনে আছে) করবে শুনি ? আমিই বা সইব কেন ? আমাকে ওজগার করে খাওয়ায় ? না পাঁচখানা গয়না গড়িয়ে দেয় ? উলটে আমি গতরে খেটে যদি বা দু-এক ভরি রুপো করি—সেগুলোও বেচে খেয়ে বসে থাকে। তবে কিসের এত দম্ভয্যি ? এই আমি বলে দিলুম বামুন মা, এই শেষ। আর যদি ওর ভিজে সলায় ভুলি তো কি বলেছি। ও না যায় আমিই অন্যত্তরে বাসা করে চলে যাবো। যত কালে গতরে খাটব ততকালে খাবো, এই তো ? তবে আমার কিসের মানুষ উনি ? ভাত দেবার ভাতার নয় নাক কাটবার গোসাঁই এলেন আমার। কাজ করতে না পারি রাজন্দর মল্লিকের চিড়িয়াখানায় * গিয়ে কাঁসি পেতে বসলেই হবে। একবেলা যে খাওয়াবে সে মুরোদও তো নেই।'

বামুনদি এসব কথাবার্তায় রস পেতেন বোধহয়। তিনি বিশেষ বাধা দিতেন না, কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি হলে মা ওপর থেকে ধমক দিয়ে বলতেন, 'কী হচ্ছে কি শৈল ? ছেলেপিলেরা শুনছে—ওসব কথা এখানে কেন ? যা করবার করো—মুখে গাবুজে লাভ কি ?'

ওতেই কাজ হত। মাকে ভয় করত শৈল, সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে যেত। শুধু কিছু পূর্বের তর্জনটা বর্ষণে পরিণত হত ; ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদত আর চোখ মুছত।

তাই বলে এ লীলা—বামুনমার ভাষায় 'দুপুরে মাতন' শুধু ঐ খোলার ঘরেই সীমাবদ্ধ ছিল ভাবলে ভুল করা হবে। ওদিকে যেগুলো মার্কা মারা বাড়ি ছিল সেগুলোতেও এক একদিন হার্মোনিয়মের সুর ছাপিয়ে অসুরের গর্জন উঠত। তবে সে কম। ওখানে নাকি বাঁধা বরাদ্দই বেশী। মাঝারি দরের পতিতালয় ছিল এগুলো। এসবও কান পেতে থাকার অভ্যাসের ফলে শুনেছে বিনু, তখন না বুঝলেও মনে করে রেখেছে—পরে জ্ঞান অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে পুরো অর্থটা ধরেছে। উঁচুদরের পতিতা-পল্লী বলতে তাদের পাড়ার উত্তরে রামবাগান বলে যেখানটা—সেই পাড়াটাকে বোঝায়। এগুলো

* চোরবাগানে রাজেন্দ্র মল্লিকের মার্বেল প্যালেসের চিড়িয়াখানা এককালে বিখ্যাত ছিল। তারই সংলগ্ন অতিথিশালায় আগে আগত সমস্ত প্রার্থীকেই খেতে দেওয়া হত। অতিথিশালার উল্লেখ না করে সাধারণ লোক চিড়িয়াখানাই বলত।

শুধুই বেশ্যা পল্লী, প্রায় অবিমিশ্র। এছাড়া দর্জিপাড়া থেকে জোড়াসাঁকো ওদিকে বৌবাজার লেবুতলায়—এমনি গৃহস্থে অগৃহস্থে মাখামাখি। চিহ্নিত পাড়া বলে কিছু নেই। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ওপরও এমনি কটা বাড়ি ছিল, জেনারেল য়্যাসেম্বলী কলেজের ছাত্ররা নষ্ট হত বলে নাকি লেখালেখি করে উঠিয়ে দিয়েছে অনেক, বাকী দু-একটা যা আছে, তাও উঠে যাবে।

যে বাড়ীটা ওদের ছাদের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে দেখা যেত, বিনুর দাদা রাজেন মাঝে মাঝে—অভিভাবিকাদের অনুপস্থিতিতে আলসের ওপর উঠে ভাল করে উঁকি মারত—সে বাড়ির পুরুষ আগন্তুকরা নাকি অধিকাংশই ছোটখাটো ব্যবসাদার। কারও কাপড়ের কারবার, কারও বা বড়বাজারে মশলা কি লোহার ব্যবসা। এদের উড়িয়ে দেবার মতো যথেষ্ট পয়সা নেই অথচ বাইরে একটি জলপাত্র (কথাটা সরস্বতীর মার মুখে প্রথম শোনে বিনু) না রাখলে নাকি চলে না, মানসম্ভ্রম বজায় থাকে না। সারাদিন খেটেখুটে এসে নাকি একটু ফুর্তি করা দরকারও। তারাই সব কেউ মাসে পঞ্চাশ কেউ চল্লিশ দিয়ে বাঁধা মেয়েমানুষ রেখেছে। দু-একজন ছাড়া সন্ধ্যায় কেউ আসে না, ওবাড়ি জাগতে আরম্ভ করে রাত নটার পর। কয়েকজন সারা রাত থাকে তবে বেশিরভাগই নাকি গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরে যায়—ধর্মপত্নী ও সন্তানদেব কাছে। এরা একটু-আধটু মদ খেলেও মাতাল হয় না বড একটা। কিন্তু কেউ কেউ—বিশেষ শনিবারে রেস খেলার ফলস্বরূপ (জিতলে ফুর্তি করতে, হারলে অর্থশোক ভুলতে) মাত্রা হারিয়ে ফেলে, সেদিনগুলোতে বস্তির কোলাহলের কিছু কিছু প্রতিধ্বনি ওঠে। দু-একটা ঘরে মারপিট কান্নাকাটি—'চোপরাও হারামজাদী জিভ টেনে ছিঁড়ব' এবং তার জবাবে—'ইঃ, কেন কিসের জন্যে চুপ করব, কত একেবারে পাঁচকুড়ি নব্বুই টাকা যেন ঢেলে দিচ্ছেন আমাকে তাই মাথা বিকিয়ে রেখেছি। যাও, যাও। তোমার মতো শানশাবাবু ঢের জুটবে আমার, এখনও দু-পায়ে জড়ো করতে পারি', ইত্যাদি শোনা যেত। তবে সে অশান্তি বাধত কমই। আর বাধলেও এতদূরে তার শব্দ ঠিক পিছনের বস্তির হাড়াই-ডোমাইয়ের মতো বিকটরূপে এসে কানে ঘা দিত না, ঘুম ভাঙ্গলেও পরক্ষণেই আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়তে পারত অনায়াসে।···

ও বাড়ির সকাল আরম্ভ হত বেলা দশটার পর। দাদা আর দিদি ইস্কুলে চলে গেলে মা যখন একটু ফুরসুৎ পেতেন, বড়ি দেওয়া বা আচার শুকনোরও কাজ থাকত না, বামুনদি বাইরে যেতেন খুচখাচ বাজারের প্রয়োজনে—তখন এক একদিন তিনিও চেয়ে থাকতেন, ঠিক কৌতূহলে বা কৌতুকে নয়, কতকটা অন্যমনস্কভাবেই চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন ওদিকের আলসেতে ভর দিয়ে।

তাঁর কোল ঘেঁষে এসে বিনুও দাঁড়াত। এটা যে ওর মনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হতে পারে এমন বোধ তাঁর তখনও হয় নি—তার কারণ বিনু একে অবোধ অর্থাৎ খুবই ছেলেমানুষ তায় পাগল গোছের, এসবের কোন প্রভাব ওর ওপর পড়া সম্ভব নয়। আর ও কীই বা বোঝে ?

কিন্তু বিনু তখনই অনেক জিনিস লক্ষ্য করেছে।

সেই সময়ে অর্থাৎ এগারোটায় ওদের পুরোপুরি সকাল হত। কেউ বা

স্নান সেরে এসে ভেতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুল ঝাড়ত ভিজে গামছার আছড়া দিয়ে, কেউ বা গামছা কাঁধে নিয়ে কলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করত—মুখের পান-দোক্তা শেষ হলে তবে কলে যাবে বলে। কেউ কেউ বাবুদের কল্যাণে চা বস্তুটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছে—তারা কাঁসার কিম্বা কলাইয়ের গেলাসে চা নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছে। পেয়ালা হয়ত আছে কিন্তু সে বাবু এলে তখন বেরোবে ; অনবরত ব্যবহারে ভেঙ্গে যাবে বলে তাতে কেউ ওসময় চা খায় না। কারও পাখী আছে, সে খাঁচার দোর খুলে পাখীকে জল আর ছোলা কি ধান কিম্বা পোকা দিচ্ছে। যার যেমন পাখী। ওপরতলার একজনের একটা হীরেমন ছিল, সেটা নানান কথা বলত, বিশেষ করে ওদেরই গলার নকল করে এক একসময় ভ্যাংচাত। তার ফলে এক এক সময় তুমুল ঝগড়াও বেধে যেত পাখীর মালিকের সঙ্গে।

গল্প কি হত—তারও দু-চারটে শব্দ বা বাক্য কানে আসত বৈকি। বেশীটাই বিগত রাত্রির অভিজ্ঞতার রোমন্থন। কার বাবু কি আজব খবর এনেছে ; কে পেলিটির বাড়ি থেকে চপ এনেছিল—তার সঙ্গে আবার সর্ষেবাটা দেয় বেটারা ; কে রাত-দুপুরে ইলিশমাছ নিয়ে হাজির—খোড়োঘাটের ইলিশ ; যে এসব প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করতে পারে না সে হয়ত বলে তার বাবু তার জন্যে পাশা ঝুমকো গড়াতে দিয়েছে, একভরি একেকটা—খুব ভারি হবে কিনা, কান কেটে যাবার আশংকা আছে কিনা সরলভাবে প্রশ্ন করে। বাবুরা তাঁদের সংসারের বিচিত্র কাহিনী ও গল্প করতেন এইসব রক্ষিতাদের কাছে, অনেক সময় দুঃখ-অশান্তির কথাও—তা শুনে কখনও বিস্মিত হত সবাই, কখনও মুখে চু-চু ধরনের একটা আওয়াজ করে সমবেদনা প্রকাশ করত। কখনও বা হাসা-হাসিও হত বাবুদের সংসারের কেচ্ছা নিয়ে—যেমন এক বাবুর বৌ টাকার নোট ধুয়ে আগুন-তাতে শুকিয়ে নেয়, কে মুসলমান ধুনুরীর তৈরী বলে নতুন লেপ চৌবাচ্চার জলে ভিজিয়ে দিয়েছিল। তুচ্ছ উপলক্ষে ঝগড়াও বেধে যেত এক একদিন। কার বাবু কার দিকে নজর দিয়েছে—কে অপরের বাবু ভাঙ্গিয়ে নেবার জন্যে ছলাকলার ফাঁদ পেতেছে—এসবও প্রকাশ হয়ে পড়ত সেইসব বাগ্‌বিতণ্ডায়।

এর পর বাজার এসে পড়ত। শৈলর বোন আদুরী এ বাড়ির বাজার করে দিত—ঘর প্রতি মাসিক চার আনা বা আট আনার বিনিময়ে। রোজ যাদের বাজার করতে হত তারা আট আনা বা ছ-আনা দিত, যাদের একদিন অন্তর—তাদের সঙ্গে চার আনা বন্দোবস্ত। শেষোক্তদের পয়সা কম, তাদের রোজ মাছ খাওয়া সম্ভব নয়। কেউ কেউ রোজ রাঁধতও না। একদিন রেঁধে পরের দিনের জন্যে পান্তা রাখত—ফুলুরি কি বেগুনি আনিয়ে কিম্বা কাঁচা পিঁয়াজ লংকা ও তেঁতুল দিয়ে তার সদ্গতি হত। আধ পয়সায় দুটো ফুলুরি এনে তা চটকে তাতে নুন পিঁয়াজ লংকা ও কাঁচা তেল মাখলে পান্তাভাতের উৎকৃষ্ট উপকরণ হয়। রাত্রের জন্যে কেউ কেউ পরোটা করে রাখত, কারও বাবু নিত্যই কচুরি বা চপ-কাটলেট ইত্যাদি নিয়ে আসেন বলে তার দরকার হত না।

মাইনে ছাড়াও দু-এক পয়সা বা আধলা এদিক-ওদিক করে মাসকাবারে প্রায় ঐ রকমই বাড়তি আয় হত আদুরীর। হয়ত বা এক-আধ আনা বেশীই। শৈলর মুখে—তার মন প্রসন্ন থাকলে, অর্থাৎ মানুষ স্বাভাবিকভাবে কাজ-কর্ম করে যখন দু-চার পয়সা আনত, তখন—ও-বাড়ির অনেক খবরই পাওয়া যেত। কে কী খায়, কি রকম বাজার হয়, কার ক-ভরি সোনা আছে, কে এর মধ্যে কাশী থেকে বারাণসী কাপড় আনিয়েছে, কার বাবু বদল হল—ইত্যাদি ইত্যাদি! বোনের হিসেবে কারচুপির বাহাদুরীও বলে হাসা-হাসি করত। কুমড়োর আধ পয়সার* ফালি দু-পয়সায় পাঁচখানা পাওয়া যায়, তা প্রত্যেকের—চুরিও ঠিক নয়—কাছে আধ পয়সার হিসেব মিলোলেই তো একফালির দাম বেরিয়ে আসে। ও বাড়ির কথোপকথন থেকে আদুরী মারফৎ অন্য কাহিনীও কিছু কিছু জানা যেত। ওদের মধ্যে যারা অভিজাত—তাদের কথাও, যেমন রামবাগানের বসন্ত, দর্জিপাড়ার কাঁচকামিনী ইত্যাদি। বড়লোকের কথা আলোচনা করেও সুখ—সেই হিসেবেই গল্প চলত—সত্যে-মিথ্যায় মিশে। কার প্রত্যহ শোলমাছের কালিয়া খাওয়া চাই, কে পুরো দু চৌবাচ্ছা জলে স্নান করে। একজন চুপচুপে করে সর্ষের তেল মেখে বেসম দিয়ে তা তুলে সর মাখে, তারপর সে সর ময়দা দিয়ে তুলে সাবান মাখে, দামী বিলিতী সাবান, তারপর গায়ে গন্ধ তেল মেখে গামছা দিয়ে রগড়ে স্নান করে উঠে আসে—তাতেই নাকি ভেলভেটের মতো তার গায়ের চামড়া। এই সব তুচ্ছ-তুচ্ছ—ওদের কাছে অসামান্য কথা।

ও বাড়ির বাসিন্দাদের রান্না-খাওয়ার পাট সংক্ষিপ্ত। হয় মাছের তরকারি একখানা আর কিছু ভাতেপোড়া, নয়ত নিরিমিষ একটা ঝোল কি আলুর দম। তার মানে বেশীবেলা পর্যন্ত ওদিকে ব্যস্ত থাকলে চলবে না। একটা দেড়টার মধ্যে খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ত সবাই। তখন খাঁ খাঁ করত বাড়িটা। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ। শুধু পাখীগুলো নিজের নিজের খাঁচায় বা দাঁড়ে বসে যা ডাকত কি কপচাত। টানা ঘুম দিয়ে একেবারে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় আবার জাগত সবাই। এঁদেরও ছাদে এসে দাঁড়াবার সময় সেটা। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে যেত। চুল বাঁধা, গা-ধোওয়ার পালা। তখন আর সকালের ধীর-মন্থর ভাব থাকত না, কলে জল থাকতে থাকতে গা-ধোওয়া কাপড় কাচা না সারলে জল পাবে না। তাছাড়া সন্ধ্যার আগেই—দিনের আলোতে প্রসাধনপর্ব শেষ হওয়া প্রয়োজন। অনেকের ঘরেই রেড়ির তেলের পিদীম বা সেজ ভরসা। বড় জোর কেরোসিনের চিমনির আলো। তাতে পরিপাটি প্রসাধন হয় না। আর, সকাল সকাল প্রস্তুত হয়ে থাকাও দরকার—কার মালিক কখন এসে পড়ে ঠিকও তো নেই।.........

দূর থেকেই আবছা আবছা ছবি চোখে পড়ত। ওদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কথা মা ভাবতেও পারতেন না, হয়ত ওরাও নয়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা অতি নোংরা ব্যাপার নিয়ে সে অঘটনও ঘটে গেল। আর তাইতেই মা ও-

* চার আনা—বর্তমান ২৫ নয়া পয়সা। আট আনা—৫০। আগেকার ৬৪ পয়সায় ১ টাকা হত—এখন ১০০ নয়া পয়সায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আধ পয়সা কল্পনা করুন।—যাঁরা তামার আধলা দেখেননি।

বাড়ি ছাড়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সত্যি-সত্যিই উঠে-পড়ে লাগলেন যাকে বলে। বামুনমাকে বললেন, 'ওদের কাকাকে লিখছি, সে না করে আমিই ব্যবস্থা করব যেমন করে পারি।'

॥ ৫ ॥

বিনুদের নিচের তলায় তখন যে ভাড়াটে ছিল—মানে যার নামে ভাড়া—তার নাম শিবু। শিবচরণ দত্ত। শিবু, শিবুর মা ভবতারিণী, মেয়ে চপলা আর সরস্বতী। ছোট সংসার, ঝঞ্ঝাট কম—এই ভেবেই মা ভাড়া দিয়েছিলেন। এর আগে ছিল যারা—তারা তিনজন, এরা চার। আগে লক্ষ্মী সরস্বতীই নাকি নাম রেখেছিলেন ভবতারিণীর শ্বশুর, কিন্তু শাশুড়ি তা পাল্টে দেন। বলেন, 'ওমা, মেয়ের নাম লক্ষ্মী রাখতে আছে। মেয়ে তো পরের বাড়ি যাবে, ঘরের লক্ষ্মী পরের বাড়ি দেবো? না, না, ও নাম চলবে না।' তিনি নাকি অনেক নাম রেখেছিলেন, নিজে সেই সব নামেই ডাকতেন কিন্তু তার কোনটাই চালু হয়নি। ভবতারিণীর বাপের বাড়ি থেকে চপলা নাম দিয়েছিল সেইটেই বহাল আছে, হালফ্যাশানের নাম বলে।

শিবু কোন এক সাহেবের অফিসে কাজ করত, মাইনেও মোটা—মাসে চল্লিশ টাকা পেত। দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ জমা রেখে ক্যাশিয়ারের চাকরি পেয়েছে। অবশ্য তার সুদ আলাদা পায়—যেমন পাবার।

এমন ভাল ছেলে এতদিনে তিনটে বিয়ে হয়ে যাবার কথা—ভবতারিণীর ভাষায়। হয়নি তার কারণ চপলা। শিবুর বাবা শেয়ার মার্কেটের দালাল ছিলেন, একবার লোভে পড়ে নাকি নিজেই কিছু টাকা লগ্নী করেন—তাতে অনেক টাকা ডোবে, পৈতৃক-বাড়ির অংশ ভাইদের বিক্রী করে দিতে হয়। সেই সময়ই চপলার সম্বন্ধ আসে। সে ছেলেও ভাল! মুর্গিহাটায় দোকান আছে, ভাইদের সঙ্গে এজমালি, তবে ভাল আয়—এ সব খোঁজখবর নিয়েই বিয়ে ঠিক হয়। ছেলের বয়স কম, দেখতে ভাল, এখন থেকেই দোকানে বেরুচ্ছে—এক কথায় হীরের টুকরো।

সেটা তার বাবাও জানতেন। জেনে বুঝেই দর হেঁকে ছিলেন, দশ হাজার টাকা নগদ, একশো কুড়ি ভরি সোনা। অনেক বলে কয়ে, বলতে গেলে হাতে-পায়ে ধরে নগদটাকে সাত হাজার আর সোনাটাকে নব্বুই ভরিতে দাঁড় করান শিবুর বাবা। বিয়েও হয়ে যায়। প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েই বিয়ে দেওয়া—কিন্তু বিয়ের ছ-মাসের মধ্যেই সন্ন্যাস রোগে চপলার শ্বশুর মারা গেলেন, হঠাৎ একেবারে। সমস্ত দোষটা পড়ল চপলার ওপর। অলুক্ষুণে অপয়া সর্বনাশী বৌ বলে শাশুড়ি লোক দিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এ নিয়ে নালিশ মকদ্দমার কথা তখন কেউ ভাবতেই পারত না। আর করলেই বা কি, বড় জোর চার টাকা কি পাঁচ টাকা মাসিক খোরাকী হুকুম হত আদালত থেকে। সে টাকা ঠিকমতো না দিলে আবার নালিশ করতে হবে। কে অত-শত ঝামেলা করে?

তখনও চপলার বিয়ের দেনা শোধ হয়নি। ঐ আঘাতে শিবুর বাবাও মারা গেলেন বছর না ঘুরতে। ভাগ্যে শিবুর চাকরিটা তার আগেই হয়ে গিছল তাই কারও কাছে হাত পাততে হল না। কম ভাড়ার বলে ওরা আগের বাড়ি ছেড়ে এখানে চলে এল। ভবতারিণীর প্রতিজ্ঞা—দেনা শোধ না হলে তিনি সরস্বতীর বিয়ে দেবেন না। তাঁর হাতে যে কিছু নেই তা নয়, বেনের-মেয়ে, বেনের ঘরের বৌ, কিছু কোম্পানির কাগজ আর গহনা থাকবেই—তবে সে রাখা অবরে সবরে কাজে লাগবে বলেই—মানুষের বিপদ-আপদ কখন কি হয় কেউ তো বলতে পারে না। এখন বিয়ে দিতে গেলে আবার দেনা করতে হবে। আর আগের শোধ না হলে আবার দেনা দেবেই বা কে, তিনিই বা নেবেন কোন সাহসে? আর বোনের বিয়ে না হলে শিবুর বিয়ের তো প্রশ্নই উঠছে না।

'তবে তাও বলে দিচ্ছি, আমি ঠিক করেছি, যদি তেমন ঘর-বর পাই, অন্যি জাতের মতো আমিও পরিবর্ত বে দোব। মানে আর এক জোড়া ভাইবোন দেখে ভাইটার সঙ্গে আমার মেয়ের বে দোব, বোনটাকে ঘরে তুলব বৌ করে। তাহলেই জব্দ থাকবে। টিপোছো কি টিপেছি। আমার মেয়েকে তারা কষ্ট দেয়—তাদের মেয়েও আমার হাতে থাকবে—শোধ তুলতে হয় কি করে তা আমিও দেখব।'

বিনু পরে দেখেছিল, ওঁদের কাছে স্বজাতি ছাড়া সবাই অন্যি জাত বা ভিন্নি জাত, তা সে ব্রাহ্মণই হোক আর খুব নিচু কোন জাতই হোক—এবং ভাল-মন্দ নির্বিশেষে তাদের আচরণ সমান অবজ্ঞেয়।

এই অযথা বিলম্বে শিবু বা সরস্বতী কেউই খুশী ছিল না—বলা বাহুল্য। সরস্বতীর বয়স—তার মা বলতেন, 'এই ষেটের বারো পুন্নু হয়ে তেরোয় পা দিয়েছে। বের বয়েস এই সবে হয়েছে ধরো। অরক্ষণা তো আর হয়ে যায়নি। এখন তো এমনিতরোই চল হয়েছে, আজকালকার দিনে তো আর সে পাঁচ বছর ছ' বছর বয়সে কেউ বে দেয় না, সেকাল নেই। পাড়াগাঁ অঞ্চলে হয়ত আছে—আমাদের কলকেতা শহরে বড় না করে কেউ বে দেয় না।'

সরস্বতী আড়ালে গজরাত; 'তেরো! তেরো আবার আসছে জন্মে হবে। কত আর বয়েস নুকুবে বুড়ী। ষোল পার হয়ে এইচি কবে। দাদা বাইশ, চপলার উনিশ, আমি এই সতোরোয় পা দিলুম।'

কখনও কখনও ছাদে কাপড় তুলতে এসে চাপা গলায় বলত - মার প্রাণপণ চেষ্টা ওদের কাপড়ের ছোঁয়াচ বাঁচাবেন, আর ওরা কেবলই আমাদের কাপড়ের পাশে কাপড় দিত, তাই নিয়ে অশান্তির অন্ত থাকত না, 'ঐ বুঝি কাক বসল, মাথাটা খেলে আমার' এই বলতে বলতে ভিজে গামছা জড়িয়ে নিয়ে সে কাপড় আবার কেচে নিতেন—'মা কি কম কঞ্জুষ নাকি! মার হাতে বড় দিদমার দরুণ বেশ চাটটি কোম্পানীর কাগজ আছে; সেগুলোয় কিছুতে হাত দিতে চায় না। বাবা যার কত দুঃখ পেয়ে মল। চিকিচ্ছেটা পজ্জন্ত করাল না একটু ভাল করে। কোম্পানীর কাগজ যেন স্বগ্গে যাবে ওর সঙ্গে। দাদাকে দিয়েছে আপিসে জমা দেবার জন্যে, তা-ই রসিদ নিখিয়ে নিয়েছে যে ধার বলে নিলুম। কেন, পরিবর্ত করবে তাই করোনা। তাতে তো আর নগদ টাকা লাগবে না। আর সোনা—তা মা দিতে পারে না? টাকাই মার কাছে স্বগ্গ, টাকাই ইষ্টি।'

ছিলেন না। বিশেষ ঐটুকু মেয়ের মুখে, তিনি অবাক হয়ে চেয়ে থাকতেন।

আগে যারা ছিল তাদের কথা বিশেষ মনে নেই বিনুর, এদের কথা এখনও সব স্পষ্ট মনে আছে। এদের কাছ থেকে শিখেছেও অনেক। ভবতারিণী বিনুর মাকে বলতেন, 'বড় বামুন দিদি' আর বামুনমাকে বলতেন 'ছোট বামুন দিদি'—যদিচ বামুন মা মার চেয়ে বয়সে বেশ বড়ই ছিলেন। ভবতারিণী বলতেন, 'জানো বড়-বামুনদি, আমাদের নিয়ম হচ্ছে টাকা হাতে এলে—তা মাইনেরই হোক আর কারবারের লাভের টাকাই হোক, আগে কিছু সরিয়ে বাঙ্কয় ফেলব। তারপর যদি সংসার না চলে মাসের শেষে খুব ঠেকে পড়ি—কুছ পরোয়া নেই—বাঙ্কর কাছ থেকে ধার করব আবার। পরের মাসের টাকা পেলে সুদসুদ্ধ কড়ায়ক্রান্তিতে শোধ ক'রে দোব।…এ নইলে ঘরে লক্ষ্মী থাকেন না। ভিন্নি জাতের মতো যথাসব্বস্ব পেটটায় নমো করলুম—আর মাসের শেষে ছুটলুম পরের দোরে ঘটিবাটি বাঁধা দে টাকা ধার করতে—মাগো, ঘেন্না করে!'

কখনও বলতেন, 'আমাদের জানো বাপকে খাওয়ানোর তত রেওয়াজ নেই। হ্যাঁ—মাকে খাওয়ায়, ওটা হ'ল গে গুদোম ভাড়া, পেটে ছেল ন মাস দশ দিন—তারই ভাড়া; ওটা দিতে হবে। সবটাই আমাদের কারবারের হিসেবে দেখা আর কি—ছেলে মানুষ করা হ'ল দাদন দেওয়া, পরে রোজগার ক'রে টাকা আনবে, দাদন উশুল হবে।' ইত্যাদি।

শিবুদের রান্না হ'ত একবার। সকালে শিবু খেয়ে বেরিয়ে গেলেই রাত্রের রান্না সেরে ফেলতেন গিন্নী। গরমের দিন হলে তরকারী জলে বসিয়ে রাখা হ'ত, না হলে এমনিই থাকত। 'কী রান্না হল', বামুনমা প্রশ্ন করলে ভবতারিণী আঙুলের কর গুনে গুনে ফিরিস্তি দিতেন, 'এই একটু ভাজামুগের ডাল হল, একটু পালংগোড়ার চচ্চড়ি (কি নটেগোড়া, কি সজনে ডাঁটা—যে সময়ের যা) আর এই আলু ভাজ্‌জা, বেগুন ভাজ্‌জা (অথবা পটল), উচ্ছে ভাজ্‌জা, ডুমুর ভাজ্‌জা (ভাজা শব্দটার জ অক্ষরে অতিরিক্ত জোর দেওয়ায় ঐ রকম শোনাত), কাঁচকলা ভাজ্‌জা, কুমড়ো ভাজ্‌জা—আর ধরো গে বড়ি ভাজ্‌জা—'

ভাজার ফর্দ শেষ হতে চাইত না। বামুনমা আড়ালে বলতেন, 'মরণ দশা! তার চাইতে বললেই হয় নতুন বাজার ভাজা। ন্যাটা চুকে যায়।'

অবশ্য তাই বলে মিথ্যেও বলতেন না। সত্যিই অত রকম ভাজা হ'ত—আড়াল থেকে দেখেছেন এঁরা। অঘ্রাণ মাসের নতুন কড়াই আলু, তাও একটা আট টুকরো ন টুকরো করে ভাজা হ'ত, একটা পটোল ছ'খানা কি আটখানা, কাঁচকলা আঁশ-পাতলা করে কাটা হ'ত—একটা কাঁচকলায় মাস কাবার। এই ভাজাই গোনাগুনতি এক টুকরো ক'রে পাতে পড়ত এক এক রকম। চচ্চড়ি গোটা সংসারের জন্যে যা রাঁধা হ'ত—এঁদের এক জনের মতো।

রাত্রের খাওয়ার বিবরণটা ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। রুটি আর একটা ঘণ্ট। গরমের দিনে কুমড়োর ঘণ্ট কি লাউয়ের ঘণ্ট, ভাদ্র মাসে পাঁড়শসার ঘণ্ট, শীতের দিনে কপির ঘণ্ট। এঁরা যাকে ডালনা বলেন—হয়ত সেইটেকেই ওঁরা বলতেন ঘণ্ট। কে জানে, বিনু তো কখনও খেয়ে দেখে নি।

এই রুটি করা হ'ত গুনে গুনে। কার কখানা জানা আছে ভবতারিণীর। তার বেশী একখানাও হ'ত না। বিকেলে ছেলের দুখানা জলখাবারের জন্যে, এদের একখানা ক'রে। এরা বেলায় খায়—আর মেয়েছেলের বেশী খেতেও নেই, ওতে লক্ষ্মী থাকে না। তাছাড়া গুচ্ছের খেলে মোটা হয়ে যাবে, বাড়নশা গড়ন হবে—বে হতে চাইবে না।

জলখাবারের রুটিও যেমন গোনা, তেমনি রাত্রেরও। শিবুর ছ'খানা, চপলার পাঁচখানা, সরস্বতীর চারখানা। গিন্নীর নিজের পাঁচ। এর বেশী একখানাও কেউ চাইলে পাবে না। কম খাও, তোলা থাকবে পরের দিন জলখাবারে লাগবে। বিকেলের জলখাবারের উপকরণও ছিল বিচিত্র। ভবতারিণী বলতেন, 'রুটি আর ফল খায় ওরা—চিরদিনের অব্যেস তো, একটু ফল না খেলে ওদের শরীর থাকবে না।' নিচের রকের মেঝে মুছে তার ওপরই—বিনা পাত্রে—রুটি দেওয়া হ'ত, তার ওপর অল্প কয়েকদানা মুগের ডাল ভিজে, একটা পয়সায় আটটা দরে চাঁপা কলার আট ভাগের এক ভাগ তাই এক চাকা, ঠিক তেমনিই আঁশের মতো এক চাকা শসা। এই দিয়েই রুটি খেয়ে উঠে যেত ওরা। তার সঙ্গে গুড় চিনি কি এক চিমটি নুনও দিতেন না ভবতারিণী। রাত্রের জন্যে করে রাখা ঘণ্টে হাত দিলে—ঘাঁটাঘাঁটি হলে খারাপ হয়ে যাবে, সম্ভবত সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা। গরমের দিনে—আম উঠলে এসব অন্তর্হিত হ'ত। লিচু বা জামরুল চার টুকরো হ'ত, বড়গোছের হলে ছ টুকরো হতেও বাধা নেই। আমের বরাদ্দটা বেশী, ওর বেলায় হাত দরাজ হ'ত গিন্নীর। আঁটিটা নিজের জন্যে রাখতেন, বাকী দু চাকলার একটা গোটা পেত ছেলে, অন্যটা দুখানা ক'রে কেটে দুই মেয়েকে দিতেন। ভাল কলমের আমের এই ব্যবস্থা। চার আনা ছ আনা শয়ের দিশী আম গোটা-গোটাই পাতে পড়ত, এমন কি রাত্রে রুটির সঙ্গেও মিলত এক-আধটা।

পাছে ওদের ঘরে বিনু কিছু খেয়ে ফেলে কোনদিন—পাগল ছেলে ওর তো হস্বই দীর্ঘই জ্ঞান নেই—সেই ভয়ে মহামায়া সর্বদাই কাঁটা হয়ে থাকতেন। কিন্তু ভবতারিণী সে চেষ্টাও করতেন না কখনও। না করবার কারণ যা-ই হোক, মুখে বলতেন, 'না বাপু, যেকালে চেরদিনের ভার নিতে পারব না, সেকালে এক টুকরো কিছু খাইয়ে জাত মারব বামুনের ছেলের—তা পারব না।'

তবে একেবারে যে কিছু খায় নি, তা নয়। ওর মা জানেন না, অন্তত জানতেন না। পরবর্তীকালে বিনু বলেছে। তখন তো বিনু সর্বভুক, দেশে-বিদেশে হোটেল রেস্তোরাঁয় খাচ্ছে—তখন শুনে একটু হেসেছেন মা, বলেছেন, 'দ্যাখো, লুভী ছেলের কাণ্ড!' ভবতারিণী অনেক রকম আচার করতেন, আচার করা একটা নেশা ছিল। মোরব্বাও করতেন, তবে সে কম, আম আমলকী আর বেল ছাড়া কিছু করতেন না। কিন্তু আচার হ'ত অন্তত কুড়ি রকমের। এই আচার তৈরীটা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতো ছিল ভবতারিণীর কাছে। দিনক্ষণ পাঁজিপুঁথি দেখে করতেন, বিশেষ কাসুন্দীর হাঁড়ি যেদিন বাঁধা হ'ত সেদিন হাঁড়ি তাকে তুলে শাঁক বাজাতেন।

সে যেন একটা পর্ব। নিচে যে কোণের ঘরটা চিরদিন খালি পড়ে থাকত,

সেইটেই ধুয়ে-মুছে, 'গোবরগঙ্গা' ক'রে—মানে গোবরজলে ধুয়ে সেটা শুকিয়ে গেলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে উনি আচারের ঘর ক'রে নিয়েছিলেন। বুকে ক'রে বয়ে বয়ে ছাদে নিয়ে গিয়ে একপাশে ভিন্নজাতের ছোয়াচ বাঁচিয়ে (এতে বামুনমার উষ্মার সীমা থাকত না, 'আমরা বামুন, আমাদের দায় পড়েছে ওদের আচার ছুঁতে। আর আমরা ছুঁলে ও'দের আচার নষ্ট হবে! আস্পদ্দার কথা শোনো একবার!)—রোদে দিতেন, তারপর 'চৌপরদিন' যাকে বলে—পাহারা দিতেন ও দেওয়াতেন। রান্নার সময়টা হয় চপলা নয় সরস্বতীকে বসে থাকতে হ'ত, বাকী সময়টা নিজেই একটা ছাতা নিয়ে বসে আচার সামলাতেন। ছাতার কালো কাপড়ে নাকি কাক ভয় পায়। উড়ন্ত পাখী ওপর থেকে পাছে কিছু নোংরা ফেলে দিয়ে যায়—এ নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত থাকত না।

এই আচার আর মোরব্বাই, অভিভাবিকাদের অজ্ঞাতসারে, ওদের ঘরে খেয়েছে বিনু।

ভবতারিণীও আড়ালে ডেকে চুপি চুপি খেতে দিতেন, বলতেন, 'এইখেনে খেয়ে যা রে ছোঁড়া। এসবে দোষ নেই। আমি তোর জাত মারব না। আচার আমরা দেবতাকেও দিতে পারি। দেখছিস তো গতর পাত করি—তবু একটু ছোঁয়াচ লাগতে দিই নে কিছুর।'

তা দেখেছে বিনু। সত্যিই এত শুদ্ধভাবে কিছু করা সম্ভব তা ওদের পরম শুদ্ধাচারিণী মা বামুনমাকে দেখা সত্ত্বেও বিশ্বাস হ'ত না। বাইরের কাপড়ে আচারের ঘরে ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল। ভবতারিণী নিজেও ঢুকতেন না। সে জন্যে তিনি যা কাণ্ড করতেন, তা দেখে মহামায়া ও বামুনমা লজ্জায় সারা হয়ে যেতেন। বিকেলের দিকে কখনও ও ঘরে যাবার দরকার হলে দরজার বাইরে এক আঁজলা জল দিয়ে তাইতে পা ঘষে, এদিক ওদিক চেয়ে পরনের কাপড়খানা খুলে একপাশে রেখে ভেতরে ঢুকতেন। ওপর থেকে যে কেউ দেখতে পারে তা তাঁর মাথাতে যেত না। ওঁদের ওখানে থাকার মধ্যে দুই মেয়ে—তাদের কাছে লজ্জার প্রশ্নই উঠত না।

তবু এ-ইই চরম নয়। সময়ে সময়ে তেমন দরকার পড়লে মেয়েদেরও ঐভাবেই ও ঘরে ঢুকতে হ'ত। এইটে একদিন দেখে ফেলে মা আর থাকতে পারেন নি, একটু অনুযোগ করেছিলেন, 'ও কি দিদি, সোমত্থ মেয়ে আপনার—?' ভবতারিণী অপ্রতিভ হয়ে আমতা আমতা ক'রে জবাব দিয়েছিলেন, 'না, তা নয়। ওদের বলি না, মানে আমার জ্বরভাব হয়েছে কিনা, সোৎখানায় গিয়ে নাই নি আজ—তাই আর—। আর, কে-ই বা দেখছে, তুমিও যেমন।'

এরা দুই বোনই দেখতে ভাল—কিন্তু সরস্বতী ছিল রীতিমতো সুন্দরী। সুগৌর বর্ণ, টানা চোখ, পাতলা লাল ঠোঁট—আলতা দিয়ে আরও লাল ক'রে রাখা—অনধিক টিকলো নাক এবং সুগঠিত দেহ—সৌন্দর্যের সব লক্ষণই ছিল তার। বিনুর এমনভাবে দেখার বয়স নয় সেটা—মা আর বামুনমার আলোচনাতেই শুনত, সেইটে মনে আছে। সরস্বতীর প্রসাধনেরও কিছু পারিপাট্য ছিল, অবশ্য অল্প উপকরণে যতটুকু হয়। সে উপচারের বড় অঙ্গ একটা ছিল আলতা। পা এবং ঠোঁটে-গালেরই শুধু নয়—দেহের কোন কোন

অপ্রকাশ্য স্থানেও তার প্রয়োগ চলত। ওরা কেউই শেমিজ ব্যবহার করত না (সায়ার অত চল হয়নি তখন, আধুনিকারা পেটিকোট এবং বাকী সবাই শেমিজে কাজ চালাত)—ফলে সে আলতার রহস্য কারও অগোচর থাকত না। বামুনমারই এতে আপত্তি যেন বেশী, তিনি গজগজ করতেন, 'ঐ জন্যেই ওরা শেমিজ পেটিকোট পরে না, রঙের বাহার দেখাবে বলে! কে জানে বাবা এদের কী রকম আচার-আচরণ, এমন তো কখনও দেখি নি!'...

সরস্বতী যে সুন্দরী সে বিষয়ে সে নিজেও যথেষ্ট সচেতন ছিল। চপলা নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যেই হোক বা যে কারণেই হোক—সাজত-গুজত কম। সংসারের কাজেও সে-ই বেশী সাহায্য করত মাকে। সরস্বতী আইবুড়ো মেয়ে বলেই বোধ হয়—রান্না কি রান্নার যোগাড়ের কাজে ভবতারিণী বড় একটা ডাকতেন না। সুতরাং প্রায় সর্বদাই সে টিপ পরে, চুলে পাতা কেটে, ঠোঁট গাল লাল ক'রে ঘুরে বেড়াত। ওপরেও আসত মাঝে মাঝে—কিন্তু মা হয় কাজে ব্যস্ত থাকতেন, নয়ত হাতে তেমন কাজ না থাকলে এক-আধটা মোটা বই নিয়ে বসতেন। মহাভারত ছিল তাঁর প্রিয় বই—বামুনমা এসে বসলে চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতেন। অন্য বইও দু-একখানা বাড়িতে ছিল, তাছাড়া একখানা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ নিতেন, সেটাও দুতিনদিন ধরে পড়া চলত। শুধু শুধু বসে অর্থহীন গল্প করা মার ধাতে পোষাত না।

এখানে আড্ডা দেওয়ার চেষ্টা বিফল হলে আর প্রায়ই সেটা হ'ত—সরস্বতী নিচে নেমে গিয়ে নিজেদের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে থাকত। এতে তার ক্লান্তি ছিল না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি কাটিয়ে দিত। শুধু যখন মনে হ'ত প্রসাধন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কি ঘাম মুছতে গিয়ে পাতাকাটা বা কলমকাটা চুল বিস্রস্ত হয়ে পড়েছে তখন একবার আয়নার সামনে গিয়ে সেটা ঠিক করে নিত। ভবতারিণী দেখতে পেলে বকাবকি করতেন। বলতেন, 'অমন বার দিয়ে দাঁড়াস কেন লা? বেশ্যে মাগীদের মতো! তারা দরজায় দাঁড়ায়—তুই জানলায় দাঁড়াচ্ছিস। ও কি ব্যাপার?' কিন্তু তাঁর সহস্র কাজের মধ্যে এদিকে অত নজর দিতে পারতেন না।

আসলে কর্মহীন এবং বিবাহের-আশু-সম্ভাবনাহীন জীবনে একতলার এই অন্ধকার ঘরের চারটে দেওয়াল সরস্বতীকে বোধ হয় গিলতে আসত। দুটো লোকের মুখ দেখতে পেলেও শান্তি। সামান্য পাঁচহাত চওড়া গলি, তবু লোকজন চলত অনেক। ঐ যে বিশেষ বাড়িটা বস্তির পশ্চিমদিকে—তার অন্য রাস্তা ছিল, উত্তরদিক দিয়ে—তবু অনেক সময় তার 'বাবু'রা এই গলিই ব্যবহার করতেন। তার কারণ বোধ হয় বস্তির বাসিন্দাদের তাঁরা পুরোপুরি মানুষ বিবেচনা করতেন না। তাদের কাছে লজ্জার কারণ আছে বলে মনে হ'ত না তাঁদের। তাছাড়া এ পথে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

জ্ঞানবাবু বলে এক ভদ্রলোকও নাকি এই পথে যাতায়াত করতেন। বয়স খুব বেশী না, বত্রিশ-তেত্রিশ হবে—কি আর দু-এক বছর বেশী। সুপুরুষ চেহারা। হাটখোলা অঞ্চলের কী একটা বড় ওষুধের দোকানের মালিকদের এক

সরিক। পৈতৃক ব্যবসা ভাল চলে। ব্যবসা দাদাই দেখেন। জ্ঞানবাবুর পয়সা এবং অবসর দেদার। শোনা যায়—শৈলর মুখেই—আগে রামবাগানে কোন বাড়িতে যেতেন। সেখানে ভাগ্যস্রোতে ভাসা একটি অল্পবয়সী মেয়ে এসে পড়ে। তাকে নিয়ে এসে এখানে এই বাড়িতে রেখেছেন, নতুন নেশার আড্ডা হিসেবে।

কী যেন নবতারা না শশীতারা, কি নাম ছিল মেয়েটার—উনি আদর ক'রে গোলাপী বলে ডাকতেন। দেখতে ভাল, অল্প বয়স, জ্ঞানবাবুও শাড়ি গয়নায় ডুবিয়ে রেখেছিলেন। ও বাড়িতে একমাত্র ওরই বাসন মাজার ঝি আছে নাকি। রান্নাও ঐ বাড়ির অন্য একটি মেয়েছেলে মধ্যে মধ্যে এসে ক'রে দেয়, যেদিন গোলাপীর 'আলিস্যি' আসে—তার বদলে সে মেয়েটিরও খোরাকী টানে। অর্থাৎ দুজনের রান্না একসঙ্গেই হয়।

এ সব খবর শৈলই দেয়। মার অনুপস্থিতিতে বামুনমার কাছে সালংকারে গল্প করে। কখনও কখনও ভবতারিণী বা চপলাও শোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এবং ভবতারিণী 'ওমা, কী হবে মা' বলে গালে হাত দেন, 'পঞ্চাশ ষাট টাকা ক'রে দেয় মাস মাস, আবার কাপড় গয়না আলাদা! বড় বড় হৌসের বাবুরাও তো এত রোজগার করতে পারে না। দুটো কেরানীর মাইনে। আমার শিবু তো এই—বলতে নেই, মা লক্ষ্মী অপরাধ নিও না মা—চল্লিশ টাকা ক'রে মোটে পাচ্ছে, তা ধরো তাই তো দশ-বারো হাজার দিয়ে মেয়ে দেবার জন্যে সাধাসাধি করছে মেয়ের বাপেরা। একটা গতরবেচা মেয়েছেলের এই আয়! কলি ঘোর হচ্ছে যে বলে লোকে—তা তো মিথ্যে নয়।'

এই জ্ঞানবাবু যাতায়াতের পথে সরস্বতীকে দেখে থাকবেন। সরস্বতীও দেখেছে তাঁকে, চিনতেও অসুবিধে হয় নি। শৈলর নিখুঁত বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে। আধ হাত চওড়া ধাক্কাদেওয়া সিমলের ধুতি, চুনোটকরা কোঁচানো, গিলেকরা আদ্দির কিম্বা গরদের পাঞ্জাবি, হাতে সরু একটি ছড়ি, পাম্পশু জুতো, আট আঙ্গুলে আটটা আংটি—রোদ পড়লে তার পাথরগুলো ঝলসে ওঠে, চোখ ধেঁধে যায়। এ গলিতে এমন কোন বাসিন্দে নেই, এমন কি ও বাড়ির বাবুদের মধ্যেও এমন শাঁসালো আর কেউ নেই।

জ্ঞানবাবু সরস্বতীকে দেখার পর এ গলি দিয়ে যাতায়াত যে একটু বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তা গোলাপীর জানার কথা নয়। কারণ তিনি এ গলি একবার পার হয়ে গিয়ে আবার যে ফিরতেন—সে ওবাড়ি পর্যন্ত নয়, তার আগেই বস্তির প্রান্ত থেকে ঘুরে আসতেন। আগে আড়ে চাইতেন, পরে সোজাই দেখতে দেখতে যেতেন। এখানটা দিয়ে যেতেন আস্তে, গতি কমিয়ে কখন বা অকারণেই ছড়িটা হাত থেকে পড়ে যেত ঐ জানলার সামনে এসে, সেটা পায়ে ক'রে কুড়িয়ে নেবার বৃথা চেষ্টা করতেন খানিকক্ষণ, তাতে কিছুটা সময় কাটত।

সরস্বতীও চেয়ে থাকত। চেয়ে থাকতে ভাল লাগত তার। জ্ঞানবাবুর চেহারা ভাল, বেশভূষা আরও ভাল। তারপর শৈলর মুখে শোনা গোলাপীর শাড়ির পর শাড়ি, গয়নার পর গয়না-র বিবরণ অন্য এক মহিমা আরোপ করেছে ওঁর চেহারায়, কল্পনার জ্যোতিতে মণ্ডিত করেছে। (গোলাপীর সোনা নাকি

কাঁটায় ফেলে ওজন করতে হবে, নিক্তিতে কুলোবে না)। সেই জ্ঞানবাবু যে ওকে দেখবার জন্যেই অকারণে যাতায়াত করেন, বাজে ছুতোয় খানিকটা ক'রে সময় কাটান—সেটা না বোঝার মতো নির্বোধ সরস্বতী নয়, তার মায়ের দৌলতে সাংসারিক জ্ঞান অনেক বয়স্কর থেকে বেশী হয়ে গিয়েছিল ঐ বয়সেই—তাতে তার নিজের রূপের অহংকারও চরিতার্থ হ'ত।

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। জ্ঞানবাবুও, বহুদর্শিতার ফলে, এই বয়সেই মেয়েদের চাহনির অর্থ-বিধানে পরিপক্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সরস্বতীর দৃষ্টিতে প্রশ্রয়ের ভাষা বুঝতে বিলম্ব হয় নি তাঁর। একদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে—যখন গলিতে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে অথচ বাড়িতে সন্ধ্যা দেবার প্রয়োজন হয় না এমনি সময়ে—ইশারা করে সরস্বতীকে বাইরে ডেকেছিলেন, সরস্বতীও গিয়েছিল। সে যাওয়া অন্য কেউ লক্ষ্য না করলেও সরকারদের রাঙা গিন্নি নাকি ওপর থেকে দেখেছিলেন। তবে বিনুরাই অপাংক্তেয়, তাদের ভাড়াটে—তারা কি করছে না করছে তা নিয়ে ব্যস্ত হবার কি ওপরপড়া হয়ে মাকে ডেকে সাবধান ক'রে দেবার প্রয়োজন বোঝেন নি। পরে গোলমাল হতে সেটা প্রকাশ পেয়েছিল।

এইভাবে হয়ত আরও দু'চার দিন কথাবার্তা আলাপ-ইশারা হয়ে থাকবে। জ্ঞানবাবু ওকে নিয়ে গিয়ে নাকি ব্রাহ্মমতে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—সরস্বতীর মুখে অনেক পরে শুনেছিলেন মা। তবে তেমন কোন প্রতিশ্রুতি না দিলেও সরস্বতী তাঁর সঙ্গে যেতে প্রস্তুত ছিল। এবং চলেও গেল একদিন। একেবারে একবস্ত্রে বেরিয়ে গেল অমনি সন্ধ্যার ঝোঁকে।

প্রথমটা বুঝতে কিছু দেরি হয়েছিল ভবতারিণীর। উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজাখুঁজি করেছিলেন; কিছু চেঁচামেচিও করেছিলেন। সে সময় মা বামুনমাও ব্যস্ত হয়েছিলেন। তবে বামুনমা ওর জানলার বার দিয়ে দাঁড়ানোর কথা জানতেন, তিনিই সম্ভাবনাটার দিকে প্রথম ইঙ্গিত দিলেন, 'তোমারও দিদি একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল, অত বড় সোমথ মেয়ে, দেখতেও সোন্দর—দিনরাত অমন সেজেগুজে রাঁড়েদের মতো রাস্তার ধারে দাঁড়াতে দেওয়া ঠিক হয় নি।'

'সে তো আমি দিনরাতই বকতুম ছোট বামুনদি, তোমরাও তো শুনেছ—' করুণ কণ্ঠে বলতে চেষ্টা করেন ভবতারিণী।

'অমন সোহাগের বকার কাজ নয় দিদি। এসব জিনিসের গোড়া থেকেই—জোর ক'রে জড়সুদ্ধু মারতে হয়। কেন, টেনে এনে হেঁসেলে জুতে দিতে পারো নি? তাও না হয়—আমি হলে জানলা একেবারে ছুতোর ডেকে ইসকুরুপ দিয়ে বন্ধ ক'রে দিতুম। যেমন কে তেমনি। ঐ পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা—হুদো হুদো লোক যায়, যত সব নোচ্চার আনাগোনা, কে দ্যাখো ইশারা ক'রে ডেকে ভুলিয়ে নে গেছে—'

সেটা ক্রমে ভবতারিণীও দেখলেন। সম্ভাবনাটা বোঝার পর—বোধ হয় শিবুর পরামর্শেও—একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আর একটা কোন মেয়ে যে তাঁর ছিল—এ তথ্যটা তাঁর জীবনযাত্রা থেকে যেন একেবারে মুছে ফেললেন। এমন কি তার জন্যে একটু হাহুতাশ করতে কি চোখের জল বা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেও দেখল না কেউ।...

কিন্তু তিনি চুপ ক'রে গেলেই যে সবাই চুপ ক'রে থাকবে তার কোন অর্থ নেই। ভদ্রতা বা ভদ্রলোকের ইজ্জৎ রক্ষার জন্যে পড়ে মার খেতে যারা অভ্যস্ত নয়, সে বস্তু বিসর্জন দিয়েই যারা জীবনের পথে নেমেছে, সংসার ও সমাজের বাইরের জীব—তারা কেন পড়ে মার খাবে, কীল খেয়ে কীল চুরি করবে ?

গোলাপী প্রথমটায় অত বুঝতে পারে নি। বাবুর অসুখবিসুখ করেছে ভেবেছিল। তাও একটু চিন্তা ছিল, কেননা এর আগে না আসার কারণ ঘটলে জ্ঞানবাবুই যেমন ক'রে হোক খবর পাঠিয়েছেন। তিন দিন কাটার পরও, কোন খবর না আসাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তখন খোঁজ ক'রে ক'রে খবর আনবারও লোক বার করল। এলোকেশীর বাবু হাটখোলার বাঙ্গাল মহাজন, তাঁর হাতেপায়ে ধরতে কাকুতিমিনতি করতে তিনিই ব্যবস্থা করলেন। খবর যা পাওয়া গেল, তাতে গোলাপীর মনে হ'ল পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে।

জ্ঞানবাবু নাকি কে একটি অল্পবয়িসী মেয়েকে নিয়ে পশ্চিমে কোথায় গেছেন। কোথায় গেছেন তা কেউ জানে না। বৌকে বলে গেছেন, একটু কাজে যাচ্ছি, ফিরতে মাসখানেক দেরি হবে। দাদাদের বলেছেন, এক সাহেব সস্তায় অভ্রের খনি লীজ দিতে চাইছে—কিন্তু সাহেব নিজে কেন ছাড়ছে সেখান থেকে খবর নেওয়া দরকার। রেজিং-এর খরচ কত, কী পরিমাণ মাল ওঠে, কত মুনাফা থাকে—তা না দেখে নেওয়া উচিত নয়। যদি সত্যিই সুবিধা হয়—নিতে দোষ কি ? একটা ব্যবসায় সব কজন গুঁতোগুঁতি ক'রে লাভ নেই তো। তবে হাড়হদ্দ না জেনে এ কাজ সে করবে না। তাই গোপনে যাচ্ছে, কাছাকাছি কোথাও থেকে খবর যোগাড় করবে। অবিশ্বাস যে করছে তা সাহেবকে জানানো চলবে না।

সে জায়গাটা কোথায়—জিজ্ঞেস করতে বলেছে, হাজারিবাগের কাছে কী কোডারমা বলে জায়গা আছে, সেখান থেকে ষোল-সতেরো মাইল ভেতরে। পোস্টমাস্টার হাজারীবাগের কেয়ারে চিঠি দিলেই পাবে সে। এঁদের বলে গেছে সব খোঁজখবর নিতে দু-তিন মাস হওয়াও বিচিত্র নয়। ওর খবর না পেলে এঁরা যেন বেশী চিন্তা না করেন। খনি অঞ্চলে ডাকঘরের অত সুবিধে নেই—চিঠি যাওয়া-আসার খুব অব্যবস্থা।

ইনিও ঘুঘু মহাজন, আসল খবরটা বার করেছেন অন্য সূত্র থেকে। দোকানের বুড়ো দারোয়ান অনেক দিনের লোক, বিশ্বাসী। সে-ই বাড়ি থেকে মালপত্র নিয়ে স্টেশনে গিয়েছিল। জ্ঞানবাবু তাকে মাল কুলির জিম্মা ক'রে দিয়ে চলে যেতে বলেছেন, হঠাৎ দুটো টাকা বকশিশও ক'রে দিয়েছেন। তাতেই সন্দেহ হয়েছে দারোয়ানের। সে তখনই চলে যায় নি, একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখেছে গাড়ি এলে বাবু ওয়েটিং রুম থেকে ঘোমটা দেওয়া একটা মেয়েকে এনে গাড়িতে ওঠালেন। ছোট্ট একটা সেকেন্ড ক্লাস কামরা, তাতে উঠেই বাবু প্ল্যাটফর্মের দিকের জানলা বন্ধ ক'রে দিলেন, কামরার দোরও বন্ধ করলেন ভেতর থেকে। দারোয়ান কুলীকে পাকড়াও করতে খবর পেল, ও কামরা নাকি ঠিক দুজনের মতোই ছোট্ট, সাহেব আগে থাকতে 'রিজার্ভ' করিয়েছেন।

গোলাপীর ভবিষ্যৎ চিন্তার চেয়ে অপমানবোধটাই বেশী। তার বয়স অল্প,

রূপ না থাক—চটক আছে। বাবুর অভাব হবে না। তবে এমন দরাজ হাত 'দেনেওলা' বাবুও চট ক'রে মিলবে না, এও ঠিক। সে যেমন ভেতরে ভেতরে আরও খবর নিতে লাগল তেমনি 'খুব অসুখ—শিগ্গির এসো' বলে কেয়ার অফ পোস্টমাস্টার টেলিগ্রাম ক'রে দিল, চিঠিও লেখাল অপরকে দিয়ে। পোস্ট-মাস্টারকেও একটা অনুনয় ক'রে চিঠি দিল, তিনি যেন দয়া ক'রে একটু ঐ নামের চিঠিগুলো যাতে পেঁছিয় তার ব্যবস্থা ক'রে দেন।

তখন টেলিগ্রাম নেবার লোক না থাকলে ফেরত আসত, তিন দিন পরেই ওর পাঠানো তার ফেরৎ এল, চিঠিটা এল কদিন পরে—পোস্ট মাস্টারের উত্তর সুদ্ধ। এমন কোন লোক এখানে চিঠি পাবার ব্যবস্থা করে নি, কেউ এ চিঠি চাইতেও আসে নি। আরও কখানা চিঠি এই নামে তাঁর কেয়ারে এসেছিল। তাও ফেরত যাচ্ছে।

অর্থাৎ নতুন মানুষ নিয়ে নতুন জীবনস্রোতে ভেসেছেন বাবু, এখুনি ফেরার সম্ভাবনা অল্পই।

গোলাপীর কিছুই বলার নেই। সেও একজনের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিল। কিন্তু বলার নেই বলেই যে মন এত সহজে এই নিদারুণ অপমান মেনে নেবে তা সম্ভব নয়। ওর মাথায় আগুন জ্বলতে লাগল। কে সে—গোলাপীর চেয়েও যার আকর্ষণ বেশী—এই চিন্তাতেই ছট্‌ফট করতে লাগল। তার আত্মবিশ্বাসে আঘাত লেগেছে, 'ফেলে চলে গেছে'—এই জ্বালাটা কিছুতে ভুলতে পারছে না।

খোঁজ-খবর করছিল অনেক দিন থেকেই, অনেক লোককে বলেছিল ঃ জ্ঞানবাবুদের বুড়ো দারোয়ানকে দশ টাকা বকশিশ ক'রে ছিল—শুধু কাছের লোককেই কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

খবরটা দিলে আদুরী, বাজার করার ঝি। গোলাপীর নিত্য বাজার, সে আট আনা ক'রে মাইনে দেয়, পুজোতে একখানা কাপড়ও দিয়েছে। উপযাচক হয়েই খবরটা দিল আদুরী। বললে, 'দিদিবাবু, আমার দিদি বলছেল, ঐ যে উদিকে যে বামনুরা থাকে—বলে তো বামুন ভদ্দরনোক, আবার শুনিও তো অনেক কথা—ওখেনে আমার দিদি কাজ করে তো, ওই যে গো শৈলি, ও আমার দিদি হয়। ওর মুখে শুনলুম বামুনদের যে ভাড়াটেরা আছে তাদের ছোট মেয়েটাও নিউদ্দিশ হয়েছে সেই ওদিন থেকেই, যে দিনে—'

বলতে বলতেই থেমে গেল আদুরী। গোলাপীর মেজাজ সর্বজনবিদিত। বিশেষ বাবুর ছেড়ে চলে যাওয়াটা যে খুব অপমানকর—সেটা আদুরীও জানে। 'ছোট মুখে বড় কথা' বলে যদি ধমক দেয় ? এক ঘা চড় কষিয়ে দেওয়াও আশ্চর্য নয়।

কিন্তু এসব সূক্ষ্ম মান-অপমানের কথা চিন্তা করার মতো অবস্থা নয় গোলাপীর। সামান্য ঝিয়ের এই গায়েপড়া সহানুভূতি যে একেবারেই অশোভন, সেকথা ভুলে গিয়ে সাগ্রহে আরও কাছে এগিয়ে এসে বললে, 'কে রে সে মেয়ে—কি রকম দেখতে ? বয়স কত ? আমার মাথা খাস কিছু লুকোস নি, ঠিক ক'রে বল্—'

ঠিক ক'রেই বলল আদুরী। সে মেয়ে যে নিচের ঘরের ঐ জানলায় দাঁড়িয়ে

থাকত দিনরাত পটের বিবি সেজে 'বার' দিয়ে—আর জ্ঞানবাবুও যে এদান্তে ঐ গলিতে ঘুর-ঘুর করত—সে খবর সুদ্ধই। এ কদিনে আরও খবর সংগৃহীত হয়েছে, তাও জানাল। বেস্পতির মা রাঙ্গাবাবুদের দিনরাতের ঝি—কিন্তু বেরিয়ে এসে শৈলর সঙ্গে গল্প করতে তো বাধা নেই—তার মুখেই শুনেছে শৈল, গিন্নী জানলা থেকে দেখেছেন সন্ধ্যার মুখে সরস্বতীকে বেরিয়ে গিয়ে জ্ঞানবাবুর সঙ্গে গুজগুজ করতে।

গোলাপীর মুখ কঠিন শুধু নয়, ভয়ংকর, বীভৎস হয়ে উঠল। সে মুখ দেখে আদুরীর উৎসাহ নিভে এল। 'হেই দিদি, দোহাই তোমার বাপু, আমার নাম যেন করো নি—এসব ঝগড়াঝাঁটি কেলেংকার ভজা-ভজির মধ্যে আমি যেতে পারব নি—'

গোলাপী ধমক দিয়ে উঠল, 'তুই চুপ কর দিকি! ভজাভজি! ভজাভজি আবার কিসের? ভজাভজির কি ধার ধারি আমি।'

বলতে বলতেই ছুটে বেরিয়ে এল সে। গায়ে জামা সেমিজ নেই, মাথার চুল আলু-থালু, সেসব কোন জ্ঞানই ছিল না তখন। নাম-ধাম আদুরীর মুখ থেকে আগেই শোনা ছিল, একেবারে দোরের কাছে এসে চড়াসুরে হাঁক দিল, 'বলি এ বাড়িতে সরস্বতীর মা কে আছে, একবার এদিকে বেরিয়ে এসো দিকি। এসো, এসো—'

আর যা-ই হোক—এ আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না ভবতারিণী।

আঘাত লাগার অপমানিত হবার যা কিছু কারণ তাঁরই—তাঁদেরই ঘটেছে এই রকমই ধারণা ছিল তাঁর। যে ক্ষতি তাঁদের হয়েছে তার চেয়ে বেশী কারও হতে পারে তাঁদের মেয়েকে কেন্দ্র ক'রে—একথা কল্পনাও করতে পারেন নি ক'দিনের চিন্তার মধ্যে।

তাই একটু বিস্মিত হয়েই জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন ভবতারিণী। হুট্ বলতেই সদরে যাওয়া অশোভন, কোন অন্তঃপুরিকাই সে সময় তা যেতেন না—একেবারে বাইরে বেরোবার প্রয়োজন ছাড়া।

'কী গা বাছা—কী বলছ? ওমা ষাট-ষাট, এ কী চেহারা! কোন বিপদ আপদ নাকি? কোথায় থাক গা, কী হয়েছে?'

বিকেলের স্বল্প আলো, সময়ও পান নি সিঁথির দিকে কি বাঁ হাতের দিকে লক্ষ্য করার, নইলে কোথায় থাকে বা কি হয়েছে প্রশ্ন করতেন না। এ ধরনের উদ্‌ভ্রান্ত আকুল ভাব ও উচ্চকণ্ঠে উদ্বিগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক, উদ্বিগ্নই হয়েছেন। কিন্তু সে উদ্বেগ গোলাপীর কর্কশ উদ্ধত কণ্ঠে মুহূর্তে উবে গেল।

গোলাপী কদর্য একটা মুখভঙ্গী ক'রে বললে, 'থাক থাক। আর গায়ে দুধ তুলতে হবে না কচ্‌ছেলের মতো। বলি এই কারবারই যদি করার ঝোঁক এত—সোজাসুজি খাতায় নাম লেখালেই তো হ'ত। ভদ্দরনোকের বাড়ি বামুনের বাড়ি বাস ক'রে এ-মেয়ে-বেচা কারবার কেন? মেয়ে বেচে খাওয়া ছাড়া গতি নেই তা বলো নি কেন, আমি ঘর ভাড়া ক'রে ফার্নিচার দে সাজিয়ে দিতুম, এক পয়সা দস্তুরী লাগত না!'

অপমানে ভবতারিণীর ঠোঁট দুটো কাঁপছে তখন। বিস্ময়েও নির্বাক হয়ে

গেছেন। কণ্ঠস্বর ফিরে পেতে বেশ একটু দেরি হ'ল। কথা বলার মতো অবস্থা হতে বিহ্বলভাবেই বললেন, 'কী বলছ তুমি, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। তোমাকে তো কৈ দেখিচি বলেও মনে পড়ে না। তুমি এমনভাবে ঝগড়া করতে এসেছ কেন খামকা। মাথা খারাপ নাকি তোমার?'

'মাথা খারাপ! হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি বলবে, বলার মুখ আছে কিছু! কার মাথা খারাপ তা বুঝিয়ে দিতেই তো এইচি। ব্যবসা করবে ব্যবসা করবে—তা আমার সব্বনাশ করার কি দরকার ছিল। জগৎসংসারে আর বাবু ছিল না!··· আমরা তো কসবীর ঘরের কসবী—কৈ আমাদের মধ্যে তো এ পিরবিত্তি নেই। এই তো এক বাড়িতে এতগুলো মেয়েমানুষ আছি—যার যা অদেষ্টে জুটেছে তাই নিয়েই আমরা তুষ্টু—কৈ কেউ তো কারও মানুষ ভাঙ্গিয়ে নিই নি।·· ভদ্দর গেরস্ত বলে পরিচয় দিয়ে এমনভাবে মেয়েকে সাজিয়েগুজিয়ে জানলার ধারে দাঁড় করিয়ে পুরুষধরা ফাঁদ পাততে লজ্জা হ'ল না একটু। এত লুভী মেয়েছেলে তোমরা। হাত্তোর ভদ্দরনোক রে। কেন, মা গঙ্গায় কি জল ছিল না, না দড়ি-কলসী জেটে নি? আমাদের বলো নি কেন—চাঁদা তুলে কিনে দিতুম।'

এবার ভবতারিণীও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনিও এক পর্দা গলা চড়িয়ে বললেন: 'বলি তোমার সাহস তো কম নয়, নিজেই তো কসবী বলে পরিচয় দিলে—ভদ্দরলোকের পাড়ায় এসে ভদ্দরলোকের মেয়েছেলের সঙ্গে ইতর কথা বলে ঝগড়া করছ—এতবড় আস্পদ্দা তোমার। আমার জ্ঞাতগুষ্টি যদি শোনে, বুকে পা দিয়ে জিভ টেনে ছিঁড়বে তা জানো। তোমার কথার জবাব দিচ্ছি তাই ঘেন্না হচ্ছে। এর জন্যে গঙ্গায় গে ডুব দিয়ে আসতে হবে।'

অতঃপর যে বাক্-যুদ্ধ শুরু হ'ল—তা এ পাড়াতেও কেউ কখনও শোনে নি।

গোলাপীর মুখচোখের চেহারা বীভৎসতর এবং সে মুখের ভাষাও কদর্যতর হয়ে উঠল। সে যেসব কথা বলতে লাগল, যেসব বিশেষণে অভিহিত করতে লাগল ভবতারিণী, তাঁর মেয়ে ও চোদ্দপুরুষকে—তা শুনে কানে আঙ্গুল দিতে হয়। অনেকে সত্যিই দিল, এমন কি বস্তির লোকরাও। ভবতারিণীর কথার লাগামও খসে পড়েছিল—তবু তিনি যতই নিচে নামুন গোলাপীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ তখন পথে কাতার দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে গেছে, আশপাশের বাড়ির জানলায় জানলায় লোকের ভিড়। অন্য কোন চেঁচামেচি কি কলহকেজিয়া হলে রাঙাবাবুরা কি বোসবাবুরা ধমক দিতেন, বেরিয়ে এসে শাসন করতেন—কিন্তু বাজারের মেয়েছেলেকে দমন করতে এসে তাঁদেরও হয়ত অপমানিত হতে হবে এই ভয় চুপ ক'রে রইলেন।

বাকী সাধারণ লোক—যারা ঠেলাঠেলি করে গোলাপীর চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করছিল, তাদের ও বস্তির বাসিন্দাদের উৎফুল্ল হবারই কথা, অনেকদিন এমন কৌতুকরস উপভোগ করেনি তারা। তাছাড়া তথাকথিত 'ভদ্দরলোক'দের সম্বন্ধে তাদের বিদ্বেষের ভাব সহজাত, ওদের লাঞ্ছনায় দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই। আর ঐ মেয়েটার দিনরাত পটের বিবি সেজে দাঁড়িয়ে থাকাটা সকলেরই দৃষ্টিকটু লেগেছে—ফলে বেশিরভাগেরই একটা 'বেশ হয়েছে' ভাব।

ভবতারিণী যখন কথায় পারলেন না তখন কেঁদে কেটে, পাড়ার ভদ্দরলোকদের

আক্কেল বিবেচনার ওপর দোষারোপ করতে করতে রণে ভঙ্গ দিলেন। বিনুর মাকেও তিনি বারকতক ডেকেছিলেন সাক্ষী হিসেবে—তিনি লজ্জায় ঘেন্নায় কাঠ হয়ে ওপরে দাঁড়িয়ে, স্বভবতই নেমে আসেন নি—তাঁর ওপরও অনুযোগ ও বক্রোক্তি বর্ষিত হ'ল কিছুটা।

ততক্ষণে অবিরাম চেঁচিয়ে গোলাপীও শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এতক্ষণ চেঁচাবার পর বোধ করি সহজ সত্যটা তার মাথাতে গেল যে গালাগাল দিয়ে মনের ঝাল মেটানো মাত্র যেতে পারে, আসল ক্ষতিপূরণের কোন সম্ভাবনা নেই। বরং এভাবে একটা কেলেঙ্কারি ক'রে সরস্বতীর মাকে বিশ্বিষ্ট না ক'রে কৌশলে সরস্বতীর ঠিকানাটা জানার চেষ্টা করাই উচিত ছিল। অবশ্য ভবতারিণীকে যে সরস্বতী ঠিকানা দিয়ে যাবে অথবা পরেও চিঠি লিখে জানাবে—এ সম্ভাবনা কম, তবু চেষ্টা করতে দোষ ছিল না। এখন আর সে আশাও রইল না।

ইতিমধ্যে ও-বাড়ির অন্য মেয়েও দু-একজন এসে গিয়েছিল, তারা তাদের সামান্য সাধ্যমতো তাকে সংযত ও নিবৃত্ত করার যা হোক কিছু চেষ্টাও করেছে, এখন তারাই ওর স্খলিত বেশবাস কিছু সুসম্বদ্ধ ও সুসম্বৃত করার চেষ্টা করতে করতে একরকম টেনে নিয়ে ও বাড়ির দিকে চলে গেল।

রাত্রে বাড়ি ফিরে সব শুনে শিবু মাকে বোনকে এমনকি চপলাকেও একদফা গালিগালাজ করল। ভবতারিণীও আর এক দফা কান্নাকাটি করলেন, ছেলের সামনে মাটিতে ঢিবঢিব ক'রে মাথা খুঁড়লেন। সেরাত্রে কেউই কিছু খেল না। বকাবকি চেঁচামেচির পর যে যার শুয়ে পড়ল।

শিবু পরের দিন আর আপিসে গেল না। সকালবেলাই বেরিয়ে পড়ে ঘুরে ঘুরে বৌবাজার অঞ্চলে দুখানা ঘর ভাড়া ক'রে বিকেলবেলায় মালপত্র নিয়ে সে বাড়িতে উঠে গেল। যাবার সময় ভবতারিণী মহামায়াকে কোন সম্ভাষণ পর্যন্ত ক'রে গেল না। শুধু সে মাসের ভাড়ার টাকাটা বামুনমার কোলে ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল।

॥ ৬ ॥

মা আগে থেকেই কথাটা চিন্তা করছিলেন, চিন্তিতই হয়ে উঠছিলেন বলতে গেলে—এবার এই কদর্য ঘটনাটা ঘটে যাবার পর—একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন।

এ পাড়ায় আর কিছুতে থাকবেন না তিনি, এখানে থাকলে ছেলেমেয়েরা অমানুষ হয়ে উঠবে—এ তিনি দিব্যচক্ষে দেখছেন।

কিন্তু শিবুদের মতো এপাড়া থেকে উঠে অন্য পাড়ায় গেলেই তাঁদের সমস্যা যে মিটবে না, এটাও ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে। হয়ত খুব উঠেপড়ে লাগলে এই ভাড়ায় আলাদা কল-পাইখানা সুদ্ধ দুখানা ঘর পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু এ ভাড়াও টানা ক্রমশঃ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে। এখানে, এ শহরে বাস করাই

বোধ হয় আর সম্ভব হবে না।

যুদ্ধের জন্যে ক্রমশ সব জিনিসের দাম বাড়ছে। কাপড়চোপড় তো বটেই—খাদ্যবস্তুও অগ্নিমূল্য হয়ে উঠছে। নিত্যপ্রয়োজনে নুন চিনি—যা চিরদিনই সহজলভ্য দেখে আসছে সকলে, যার জন্যে কখনও কোন চিন্তাই করতে হয় নি—সে দুটো জিনিসও যে এমন দুর্লভ হয়ে উঠবে—তা কে জানত!

ব্যয় বাড়ছে, আয় বাড়ছে না। বরং কমছে। শুধু যে ভাড়াটে ছেড়ে গেছে তাই নয়—যে অজ্ঞাত উৎস থেকে মায়ের খরচ আসে সেখানেও ভাঁটা পড়েছে। আজকাল প্রতি মাসেই বরাদ্দের কম আসছে বোধহয়। কোন মাসে পঞ্চাশ, কোন মাসে চল্লিশ। বামুনমা বেজারমুখে যান, বেজারমুখেই ফেরেন। নিঃশব্দে এসে মার সামনে টাকা ক'টা নামিয়ে দেন। নিঃশব্দ বলা ভুল, মুখে কিছু বলেন না, কিন্তু অস্বাভাবিকরকমের দুমদুম ক'রে পা ফেলে আসেন, তাতেই বোঝা যায় রাগে গরগর করছেন। এই কাজে যাওয়ার আগেও তাঁর মনোভাব প্রকাশ পায় এক এক দিন, মা চিঠি লিখে হাতে দিতে গেলে বলেন, 'আর ও চিঠি লেখার ধাষ্টামো কেন? যা দেবার তারা ঠিক ক'রেই রেখেছে, তাই দেবে। তার বেশী এক পয়সাও বেশী না।...তোমার ও চিঠি পড়েও না তারা—তার কথাও নেই। মিছিমিছি গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাওয়া। যেচে অপমান হওয়া।'

মা সে সময় আর বেশী প্রতিবাদ করেন না। মৃদুকণ্ঠে বলেন, 'তবু একবার গিয়ে দ্যাখো। বলো চিঠিটা পড়তে—দেখতে হিসেব যেটা দিয়েছি সেটা নেয্য না অনেয্য। দেখলেই বুঝতে পারবে।'

'হুঁ।' বলে ব্যঙ্গমিশ্রিত একটা অবজ্ঞার হাসি হেসে তখনকার মতো চলে যান বামুনমা।

ফিরে এসে টাকাগুলো ফেলে দিয়েও কোন কথা বলেন না। গায়ে জড়ানো বোম্বাই চাদরখানা খোলার কথাও মনে থাকে না—কোমরে হাত দিয়ে এক ধরনের অনুকম্পার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন মার দিকে।

মাও প্রথম খানিকটা টাকাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, কোন কথা বলতে সাহসে কুলোয় না। তারপর হয়ত খানিকটা ভরসা সংগ্রহ ক'রে নিয়ে বলেন, 'কী বললে?'

'কি আবার বলবে। আমার মতো ভিখিরীর সঙ্গে তাদের কথা বলার অবসর আছে—না তোমার ঐ ইনিয়ে-বিনিয়ে ভিক্ষের চিঠি পড়ারই টাইম আছে তাদের!'

'তুমি একটু বললে না কেন'—মা হয়ত বলতে যান, বামুনমা কথা শেষ করার আগেই ঝেঁঝে ওঠেন, 'তোমার ঐ এক একঘেয়ে কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে।...এঁড়ে গরু না টেনে দো। অধিক বিরক্ত করতে গেলে হয়ত সোজা পথ দেখিয়ে দেবে। তাদের যা বলবার তা তো বলেই দিয়েছে—সাফ কথা—এর বেশী আর দিতে পারব না। যুদ্ধ বেধে খরচ বেড়েছে, আমাদের রোজগার কমেছে, কাজ-কারবার অচল হয়ে উঠছে দিন দিন। এই তাই আমাদের দিতে কষ্ট হচ্ছে। তার ওপর আবার কি বলব? গলায় গামছা দোব? এই

তাই অপমান হতে যাওয়া।'

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এবার বলেন, 'ভিখিরীর আর অত মান-অপমান বাছতে গেলে চলবে কেন। তুমিই তো ভিখিরীর উপমা দিলে, ভিখিরীর কি মান-অপমান আছে?'

বামুনমা এই সময়গুলোতে ধৈর্য হারান।

এক-একদিন খুব দু' কথা শুনিয়ে দেন বিনুর মাকে।

কিন্তু সেটা ঝগড়া কি অপমান নয়। তাঁকে বামুনমা ভালবাসেন, এদের সকলকেই ভালবাসেন, এদের সুখ-দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন বলেই এঁদের দুঃখ অপমান তাঁর বাজে, আর তাই এমনভাবে বলেন—সেটা বিনুর মা কেন, ঐ বয়সেই কেমন ক'রে বিনুও বোঝে।

একদিন হয়ত বলেন, 'তুমি যেমন নেকু। আপনার ধন পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞ বেড়ায় মাথায় হাত দে। তা তোমার হয়েছে তাই। কেন ওদের ফাঁদে পা দিতে গেলে। নালিশ করাই উচিত ছিল তোমার—তা হলেই জব্দ হ'ত। সুড়-সুড় ক'রে বাপের সুপুত্তুর হয়ে দিতে হ'ত।'

মা জবাব দেন, 'কে নালিশ-মকদ্দমার হ্যাঙ্গাম করত দিদি? কে আমার হয়ে আদালতে গিয়ে দাঁড়াত? সে কি এক-আধ দিনের কাজ, না চাট্টিখানি কথা! ঐ তো ওপক্ষ নালিশ করেছে, ওঁর কে অংশীদার ছিল—তাঁর সঙ্গে, সে মামলা তো চলছেই এই এতদিন ধরে, তার তো কোন নিষ্পত্তিই হ'ল না এখনও পর্যন্ত। এই ভাইয়েরা সবাই মিলে এক মাথা হয়ে চালাচ্ছে বলেই তাই। একরাশ খরচ, সোজা কথা তো নয়। আমার হয়ে কে অত খরচা টানত?'

এবার আর কোন জোর কথা বামুনমার গলায় বেরোত না, গজ-গজ করতে করতে কলতলার দিকে চলে যেতেন—হাত-পা ধুয়ে কাপড় কেচে আসতে।

বিনু এসবের কোন অর্থই বুঝত না, অবোধের মতো প্রশ্ন ক'রে যেত, নানান প্রশ্ন—'কে মা, কার কথা বামুনমা বলছেন? নালিশ কি মা? মামলা কাকে বলে? কার ভাইয়েরা মামলা চালাচ্ছে?'

মা বিব্রত হতেন, বিরক্ত হতেন। তাঁর দুঃখের মধ্যে দুশ্চিন্তার মধ্যে অস্বস্তিকর এই সব প্রশ্ন। কখনও দু-একটা ভাসা ভাসা উত্তর দেন, কখনও বা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতেন ওকে। কখনও মার চোখে জল দেখে বিনু নিজেই চুপ করে যেত।

টাকা আসা বন্ধ হয়েছে—একেবারে বন্ধ না হলেও বন্ধের মতই, এত কম তার অংক—অথচ এদিকে বাজার দর চড়ছে হু-হু ক'রে, এই দুইয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। গয়না বলতে কুবেরের ভাণ্ডারের মণিরত্ন কিছু ছিল না—বিক্রী করতে করতে ছোটখাটো যেগুলো—দেড় ভরি, দু ভরির—সেগুলো প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। যা আছে বড় বড় দু-চারখানা—কোমরের আশি ভরির চন্দ্রহার, গলার সাতনরী আর গিনির মালা। এ ছাড়া ফারফোরের বালা, মিছরি-বেঁকী চুড়ি—সব জড়িয়ে হয়ত দেড়শ ভরি হবে, বড়জোর আর

সামান্য কিছু বেশী।

এখনও সামনে অনন্ত সময় পড়ে। ছেলেরা লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি করতে, পয়সা আনতে অনেক দেরি। সে প্রয়োজনের তুলনায় ও সোনা কিছুই নয়। তাছাড়া মেয়ের বিয়ে আছে। ছেলেরাও—যত বড় হবে তত খরচা বাড়বে তাদের। এখন থেকে সর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে গেলে ওঁদের মানুষ করবে কি ক'রে। সত্যিসত্যিই কি শেষে বিড়ি পাকিয়ে খেতে হবে ছেলে দুটোকে—কিম্বা মোট বয়ে ?

সুতরাং এবার অন্য জিনিসে টান পড়েছিল।

অনেক দিনের পাতা সংসার। তার কোণে কোণে অপ্রয়োজনের সম্ভার জমে উঠেছে। খুব টানাটানির দিনে সেগুলোই কাজে লাগত। শিশিবোতল, টিনের কৌটো, ক্যানেস্তারা, পুরনো পাঁজি, ছেলেমেয়েদের পুরনো বই-খাতা। তাতে অবশ্য কটা পয়সাই বা আসে, এক পয়সা দু পয়সা সের হিসেবে তো বিক্রী। তবু, সময়বিশেষে দু আনা পয়সাই ঢের। একদিনের বাজারখরচ চলে যেত দুর্দিনে।

এও ফুরল একসময়। তখন আসবাবপত্রে টান পড়ল। প্রথমেই গেল টানা পাখাটা। এ জিনিসটা একেবারেই অনাবশ্যক এখন। বাবার আমলে তাঁর বিছানার ওপর ঝোলানো ছিল। তখন একজন মাইনে-করা বেয়ারা থাকত টানবার জন্যে। এখন কেউই টানে না কোন দিন। টানবেই বা কে, নিজে টেনে কিছু হাওয়া খাওয়া যায় না। মাত্র চার টাকায় বিক্রী হ'ল—ছত্রিশ টাকায় নাকি কেনা ছিল সেকালে, তাও কোন সাহেববাড়ির পুরনো জিনিস। আসল সেগুন কাঠের ফ্রেমে সিঙ্গাপুরী মাদুর লাগানো, তাতে ভেলভেটের কোঁচ দেওয়া পাড়। তাহোক, চার টাকার অনেক দাম ওদের কাছে। তবু, ঐ অপ্রয়োজনীয় জিনিসটাও যখন খদ্দের নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মা দাঁড়িয়ে দেখতে পারলেন না। বামুনদিকে দাঁড় করিয়ে রেখে চোখ মুছতে মুছতে ছাদে চলে গেলেন।

পাখার পর গেল একটা বত্রিশ বাতির ঝাড় আলো। একটা জামা-কাপড় রাখা টানা দেরাজ। বাড়তি আলনা একটা, সেগুন কাঠের আলনা, মিস্ত্রী ডাকিয়ে তৈরী করিয়েছিলেন বাবা, দুদিকে হাতীর মুখ খোদাই করা। কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক ছিল দুটো বাসন রাখার—সব বাসন একটাতে পুরে একটা সিন্দুকও বেচে দেওয়া হ'ল একদিন।

বাসনও ইতিমধ্যে দু-একখানা ক'রে যেতে শুরু হয়েছিল। এককালে ভাঙা বাসন জমলে তার বদলে নতুন বাসন কেনা হ'ত—পুরনো বাসনের সঙ্গে কিছু পয়সা যোগ ক'রে—ইদানীং কানাভাঙা কাঁসি কি ফাটা সাগুরী বা শ্রীক্ষেত্রের বাটি—চোখে পড়লেই বাসনওলা ডেকে বেচে দিতেন মা। তারা মায়ের অজ্ঞতার সুযোগ নিত। অর্ধেক দাম দেবার কথা, সিকি দাম দিয়ে চলে যেত। কখনও কখনও নানা অজুহাতে আরও কম। ঠকাচ্ছে বুঝেও মা কোন প্রতিকার করতে পারতেন না। এক আধখানা বাসনের জন্যে বড় দোকানে পাঠাতে লজ্জা করত তাঁর। আর সে বড় জানাজানি। অথচ না বেচলেও নয়, এক-একদিন ঐ দেড় টাকা পাঁচসিকের জন্যেই ঠেকে যেত।

এর পর বাকী রইল বুক-কেস, আলমারি, পাথরের টেবিল আর লোহার সিন্দুক।

একদিন—এর আগে যারা দেরাজ আলনা নিয়ে গিয়েছিল তারাই এসে সিন্দুকটা কিনতে চাইলে। চল্লিশ টাকা দর দিলে।

এতদিন মনে কষ্ট হলেও মহামায়া বিচলিত হন নি—এবার যতটা হলেন। এই প্রস্তাবে প্রচণ্ড একটা আঘাত লাগল যেন তাঁর। জিনিসটা কতখানি প্রিয় অথবা কোন প্রিয় ব্যক্তির স্মৃতি জড়ানো আছে—সে কথা ছাড়াও অন্য প্রশ্ন আছে, অপমানের প্রশ্ন। সবাই যেন জেনে গেছে যে তাঁদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, খেতে পাচ্ছেন না তাঁরা—ঘরের আসবাব তৈজস বেচে খেতে হচ্ছে।

দেখতে দেখতে মায়ের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল, কপালে ঘাম দেখা দিল। বিনুর মনে হ'ল মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই টলছেন একটু…

অনেকক্ষণ পরে মা কথা বললেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'এখন না। আমরা বোধ হয় এ বাসা ছেড়ে চলে যাবো। তখন খবর দোব। তখন এসে নিয়ে যাবেন। এখন বেচতে পারব না।'

সেটা বেচতে পারলেন না ; তার বদলে একটা ডবল-গদি একটু ছিঁড়ে এসেছিল, তার রেশমী শিমুল তুলোগুলো বেচে দিলেন—পাঁচ টাকা না ছ টাকায়। বামুনমার মতে অন্তত দুমন তুলো ছিল।

ঐ প্রথম শুনল বিনু যে ওরা এ বাসা ছেড়ে চলে যাবে।

বিষম একটা আঘাত লাগল ওর, মনে মনে একটা সজোর ধাক্কা খেল যেন।

এটা যে আঘাত তা বোঝার বয়স নয় ওর, শুধু সমস্তটা যেন ওর চার পাশে বিস্বাদ বিবর্ণ হয়ে গেল।

বিশ্বাসও হতে চায় নি প্রথমটা। ভাড়াটে বাড়ি কাকে বলে, ভাড়া দেওয়ার ফলে ঠিক কতটুকু অধিকার জন্মায়—এ বিষয়ে কোন ধারণা থাকার কথা নয়—ছিলও না। এ বাড়ি যে ওদের নয়, এই সাজানো গৃহস্থালী যে কোনদিন অন্যরকম হতে পারে, এখান থেকে যে চলে যাবার প্রয়োজন হওয়া সম্ভব—সে কথা কখনও ভাবে নি—মাথাতেও গেল না ঠিক। সে বার বার প্রশ্ন করতে লাগল, 'কেন যাবো আমরা এ বাড়ি ছেড়ে ? কোথায় যাবো ? সে কোন জায়গা ?'

মা নীরব হয়ে থাকেন, উত্তর দেন না। বামুনমাকে জিজ্ঞাসা করলে ঝেঁঝে ওঠেন, 'অত কৈফেতে তোমার দরকার কি বাছা। সব তাইতে কেন কী বিত্তেন্ত—হাজারো জবাবদিহি ! আমরা মরছি নিজের জ্বালায়—এখন বসে বসে ওর সঙ্গে ভ্যান ভ্যান করো !'

কেন যেতে হবে তার একটা কারণ অবশ্য বার বার শুনেছে। অন্য সকলকে বলছেন মা, বামুনমা। কলকাতার বাইরে অনেক সস্তাগণ্ডার জায়গা আছে। কাশী আছে, নবদ্বীপ আছে—তীর্থকে তীর্থ, শহরকে শহর। ইস্কুল কলেজ হাসপাতাল সবই আছে, অথচ জিনিসপত্র জলের দাম, বাড়ি ভাড়া সস্তা। নবদ্বীপে নাকি চার আনা সের রসগোল্লা, পাঁচ আনা সের মোণ্ডা। এক একটা বড় কুমড়ো দু পয়সা তিন পয়সা, বড় বড় ফুটি পয়সায় দুটো। শীতের দিনে মুক্তকেশী বেগুন আনা-আনা কুড়ি।

কাশীতে নাকি আরও সস্তা। টাকায় আট সের খাঁটি দুধ, বাজারের ঘাঁটা পাঁচমিশেলী দুধ বারো সের করে। চার আনার বাজার করলে সেখানে এক সপ্তাহ চালানো যায়। মতির মাসিমা গেছলেন, আধ পয়সার ছোলার শাক দুদিন ধরে খেয়েছেন নাকি। বাড়ি ভাড়াও অনেক কম। আট দশ টাকায় বড় বড় বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। কোন ঠাকুরবাড়ির ভার নিয়ে থাকলে এক পয়সাও লাগবে না।

অন্য যে কারণ—সেটাও কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারল বিনু, ঝাপসা ঝাপসা রকমের—'এরা পরিষ্কার না বললেও। এঁদের কথাবার্তা কানে যেতে যেতেই একটা ধারণা হয়ে গেল।

পাড়া ভাল নয়। ছোটলোকের পাড়া। বস্তি তো আছেই, ঐসব অন্য বাড়ির প্রভাবও কম নয়। দিন দিন সে ছোটলোকবিত্তি' বাড়ছে। এই যে কাণ্ডটা হয়ে গেল সরস্বতীকে নিয়ে—এতেই আরও চঞ্চল হয়ে উঠলেন মা। ভাড়াটে তো গেলই—এখন আর এ বাড়িতে সহজে কোন ভাড়াটে আসবে না—তা ছাড়া, যে কেলেঙ্কারীটা হল, পাড়াসুদ্ধ লোকের সামনে যে বেইজ্জৎ, তাতে আর কারও সামনে মুখ দেখাবার উপায় নেই ওঁদের। অপমান ছাড়াও, একটা আঘাতও পেয়েছেন। বহুদিনের বিশ্বাস ভেঙে গেছে। পাড়ার অন্য ভদ্রলোকদের ভরসায় এখানে বাস করা—তাঁদের মনোভাব তো স্পষ্টই দেখা গেল। শুধু যে নিরাসক্ত দর্শক হয়ে ছিলেন বলেই না, যা দু একটা কথা তাঁর কানে গেছে, তাতেই বুঝেছেন—এঁদেরও ওঁরা ঐসব মেয়েছেলেদেরই কতকটা সগোত্র বলে ভাবেন। 'ওরা যেমন তেমনিই হয়েছে—এদের ঘরে তো এসব হবেই'—এইরকমই ভাব কতকটা।

এইটেই সবচেয়ে লেগেছে মহামায়ার।

পাড়ার ভদ্রলোকেরা যে তাঁদের সমশ্রেণীর বলে মনে করেন না—সেটা এতকাল এমনভাবে প্রকট হয় নি। একটা না একটা কারণ খাড়া করে রাখতেন—সামাজিক ক্রিয়াকলাপে নেমন্তন্ন না করার। দৈবাৎ একবার গুরুদাসবাবুদের বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন হয়েছিল—সম্ভবত ভুল করেই—যে ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে নেমন্তন্ন করেন ওঁরা তিনিই বুঝতে না পেরে বা অতটা খেয়াল না করে বলে গিছলেন। সেটা অনুমান করেই মা যান নি, রাজেনের সঙ্গে বামুনদিকে দিয়ে 'নৌকতা' পাঠিয়েছিলেন। বামুনদি বলেন, 'তুমিই ঠিক বলেছেলে আমাদের দেখে ওরা যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো, তখনই কৈলেসবাবু নেমন্তন্ন করার বামুন ক্ষীরোদগোপালকে আড়ালে ডেকে নে গে কি গুজগুজ করলেন, আমি দেখলুম ক্ষীরে বামুন মাথা চুলকোচ্ছে। আমরা খাবো না শুনে যেন বেঁচে গেল। দ্বিতীয়বার বললে না যে, অন্তত খোকা খেয়ে যাক।…তাছাড়াও দেখলুম, বৌয়ের মুখ-দেখানি দুটো টাকা মেজগিন্নী খপ করে তুলে নিয়ে নিজের মুঠোয় রাখলে, যে রুপোর থালায় জমা হচ্ছিল তাতে ফেলল না। বোধহয় ওটা নাপতিনী কি মিতুয়া-বৌকে বকশিস করবে।'

তা করেন নি গুরুদাসবাবুরা। থালা ভরে সন্দেশ পাঠিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে দুটো টাকাও—'যে বামুন মেয়ে সঙ্গে গিছলেন তাঁর পাওনা' বলে। সে-ই

দুটো টাকাই। পঞ্চম জর্জের করকরে নতুন টাকা—একটার কোণে পোড়ামতো কি একটু দাগ, সেইটে দেখেই চেনা গেল।

এসবের ওপরেও মহামায়ার যা চিন্তা, ছেলে মানুষ করা।

সত্যি সত্যিই এ পাড়ার ছেলেদের প্রভাব কিনা তা জানে না বিনু, আজও তার সন্দেহ আছে, এর মধ্যে দাদা বেশ কদিন ইস্কুল কামাই করেছে। সেটা মাস্টার মশাইরা এসে জানিয়ে গেছেন। অথচ যেমন খেয়েদেয়ে বইখাতা নিয়ে বেরোয় তেমনিই বেরিয়েছে। মা মারধোর করেন না, এর জন্যে অন্য শাস্তি দিয়েছেন। কান ধরে চেয়ার করিয়ে রেখেছেন, নাকে খৎ দিইয়েছেন। কিন্তু তার পরেও একদিন ধরা পড়ল, চার পাঁচ মাসের মাইনে দেয়নি দাদা, সে টাকায় বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে তেলেভাজা খেয়েছে। অন্য লোক নেই বলে ওর হাতেই মাইনের টাকা দিতেন। দীর্ঘকাল ধরেই দিচ্ছেন। অমর্তমামা আজকাল আর ও ইস্কুলে পড়ান না, তাঁকে দিয়ে দেওয়ানোও যায় না, খবরটাও চট করে পাওয়া যায় না। ঠিক ঠিক দেয় দেখে ইদানীং আর রসিদও দেখতে চাইতেন না মা। সেই সুযোগই নিয়েছে দাদা।

অনেকদিন মাইনে জমা পড়ছে না দেখে হেডমাস্টার মশাই লোক পাঠিয়েছেন। নাম কেটে দেওয়া হয়েছে, তবুও টাকা জমা পড়ছে না। এর পর তো আর ক্লাসে বসতে দেওয়াও সম্ভব হবে না।

মার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছিল। কেঁদে-কেটে অনুনয়-বিনয় করে জরিমানাটা মকুব করিয়েছিলেন। বাকী মাইনের টাকা ধার করে সবটা জমা দিতে হয়েছিল।

যিনি খবর দিতে এসেছিলেন তিনি সহানুভূতি জানিয়ে বলেছিলেন, 'বিধবার ছেলে, মাথার ওপর কেউ নেই—একটু হুঁশ-কান খোলা রাখবেন মা।···আর আপনি তো চেষ্টা করলেই পুরো ফ্রী করিয়ে নিতে পারতেন। দরখাস্ত দেন নি কেন ?'

নিতান্তই সাধারণ, সহজ কথা। কিন্তু অপমানে কান পর্যন্ত রাঙা হয়ে গিয়েছিল মার। অক্ষম বলে ফ্রীশিপের জন্যে ভিক্ষা চাইবার কথা তখনও তিনি ভাবতে পারেন না।

ছেলের দুচারজন বন্ধুকে ডেকে জেরা করতে জানা গেল টাকাটার কি গতি হয়েছে। দেড়দিন নিচের কোণের ঘরটায় বন্ধ করে রেখেছিলেন মা—যেটা মাঝে আচারের ঘর করেছিলেন ভবতারিণী—কিছু খেতে দেননি। খেতে দেননি শুধু নয়—সেই সঙ্গে বামুনমাও মুখে অন্নজল তোলা বন্ধ করেছেন দেখে ঘরের সামনের রক ধুয়ে মুছে নিজে ভাতের বড় কাঁসিটা এনে খেতে বসেছেন এবং ধীরে সুস্থে পুরো ভাত খেয়ে উঠে গেছেন, যাতে ছেলে বুঝতে পারে যে, সে উপোস করে থাকার জন্য ওঁর কিছু যায় আসে না।······অনেক কান্না, অনেক নাক-কান মলার পর ঘরের তালা খুলেছেন মা।

এসব যা শাসন করবার তা করলেও—মা কিন্তু এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেন—এ পাড়া উনি ছাড়বেনই, সম্ভব হলে এ শহরও। কারণ শুধু ঐ একটা ছেলেই নয়। মেয়ের প্রশ্ন আছে। মেয়েকে এখনও স্কুলে দেন নি—ঝি দিয়ে

পাঠাতে হবে বলে। দিন কতক মহাকালী পাঠশালায় পাঠিয়েছিলেন, কে সঙ্গে যাবে বলেই পাঠানো বন্ধ করতে হয়েছে। তবে চিরকাল ঘরে বসিয়ে রাখা যাবে না। পড়াতেই হবে। বাড়ির বাইরে গেলে এ পাড়ার প্রভাব লাগবে হয়ত। সে ভয়টাই বড়। বেটা-ছেলে লেখাপড়া না শিখলেও মুটেগিরি করে খেতে পারে। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। আজকাল লেখাপড়া জানা মেয়ে চায় লোকে।

বড় ছেলেমেয়ে ছাড়াও বিনু আছে। ঐ তো পাগল ছেলে, ওকে মানুষ করা আরও শক্ত।

এদের যদি মানুষ করতে হয় এ পরিবেশ ছাড়তেই হবে।

॥ ৭ ॥

যাবো যাবো কথাটা অনেকদিন ধরেই উঠেছে কিন্তু সে একটা বহুদূরের ঘটনা। ওর জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্করহিত—এই রকমই ধরে নিয়েছিল বিনু। অথবা প্রসঙ্গটা ঠিক ভাল লাগত না বা ধারণা করতে পারত না বলেই সেটাকে দূর ভবিষ্যৎ বলে ভাববার চেষ্টা করত, ওর মন সেই অ-প্রকৃত ধারণার মধ্যে আশ্রয় ও আশ্বাস খুঁজত।

কিন্তু সে মিথ্যা আশ্বাসের আশ্রয় বেশীদিন টিকল না।

হঠাৎই একদিন শুনল সে দুর্ঘটনার দিন আসন্ন।

ওরা নাকি এ পাড়া শুধু নয়, কলকাতা ছেড়েই চলে যাবে। নবদ্বীপে গিয়ে বাস করবে। ওর কাকারা নাকি ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে সস্তাগণ্ডা, অথচ শহর বাজার জায়গা, ইস্কুল হাসপাতাল আছে। কলকাতা থেকে খুব একটা দূরেও নয়। সকালে বেরোলে বিকেলে পৌঁছনো যায়।

এই প্রথম শুনল বিনু ওদের কাকা কেউ আছে। 'কাকারা' যখন বলেছেন বামুনমা, তখন একাধিক কাকাই আছে নিশ্চয়।

ও অবাক হয়ে মাকে প্রশ্ন করল, 'আমাদের কাকা আছে মা? মানে বাবার ভাই?'

'আছে নয় বাবা, আছেন বলতে হয়। কাকা হলেন বাবার ভাই, সম্মানের পাত্র। বাবা মা মামা মামী, কাকা কাকী—এমনকি দাদা দিদিও—সামনে 'তুমি' বললেও আড়ালে বা অন্যকে বলার সময় 'তিনি' 'তাঁর' এইভাবে বলতে হয়। চিঠি লিখতে হয় 'আপনি আজ্ঞে' করে। দাদাকে তুমি বলো, আমাকে তুমি বলো—কিন্তু চিঠি যখন লিখবে 'আপনি আমার প্রণাম নেবেন'—এই ভাবে লিখবে, বুঝেছ?'

অসহিষ্ণু বিনু, এটা যে মায়ের পাশ কাটিয়ে যাওয়া তা না বুঝেও সে প্রসঙ্গ থামিয়ে বলে, 'আমাদের কাকারা আছেন, কখনও বলো নি তো!'

'বলব আর কি। কথা কখনও ওঠেনি বলেই—'

কেমন যেন আড়ষ্ট শোনায় মহামায়ার গলা।

'বা রে। পাড়ার ছেলেরা কত কি বলে, বলে ওরা নিমুড়ো নিছুড়ো, কেউ

কোথাও নেই—। নানান কথা বলে—তুমি জানো না।…খুব খারাপ লাগে।… এই কাকারা কোথায় থাকেন মা, তাঁদের নাম কি? আমাকে বলো না—ওদের বলব—?'

'না না, কাউকে কিছু বলতে হবে না।…যারা আপনার হয়েও সম্পর্ক রাখে না—তাদের পরিচয় দিয়ে কি হবে বল। হয়ত কেউ বলতে গেলে বলবে, কৈ, আমরা তো চিনি না।'

'কেন মা, সম্পর্ক রাখে না কেন?'

মহামায়া চুপ করে থাকেন অনেকক্ষণ। তারপরে বলেন, 'সে এখন বললেও ঠিক বুঝতে পারবে না বাবা। পরে বলব। বড় হও, তখন সবাই জানতে পারবে।'

বিনুও একটু চুপ করে থেকে বোধ হয় কথাটা ভাবতে চেষ্টা করে। ঠিক ধারণায় আসে না। কেন যে সোজা করে বললে বুঝতে পারবে না তা ভেবে পায় না। খানিক পরে একধরনের ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, 'তা তাঁরা যখন আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না, তখন আমরাই বা তাঁদের কথা মানতে যাবো কেন? কেন আমরা নবদ্বীপ যাবো? কোত্থাও যাবো না।'

এই ঘাড় বাঁকানোর ভাবটা নাকি বিনুর বাবার কাছ থেকে পাওয়া। মা বলেন, 'ওদের গুষ্টির ধারা।' বলেন, 'ওর গুষ্টির আর কিছু না পাক ঘাড় বাঁকানোটা ঠিক পেয়েছে। আমাদের দারোয়ান শিউনন্দন বলত শিরতেড়া। ওদের শিরতেড়ার বংশ। ঘাড় বাঁকল তো ব্যাস, সে জেদ আর কেউ ভাঙতে পারবে না। শির কেন কাৎ—না আমরা একজাত।'

কিন্তু আজ সেসব কথা কিছু বললেন না মা। শুধু কেমন একরকমের অসহায় করুণ গলায় বোঝাবার ভঙ্গীতে বললেন, 'তাঁরা সম্পর্ক না রাখুন—তাঁরাই যে খরচ চালাচ্ছেন বাবা। ভিক্ষের মতো করে দিলেও যেটুকু দিচ্ছেন তাতেই তো জীবনধারণ হচ্ছে। তাঁদের কথা শুনতে হবে বৈকি। তাঁরা আর এখানের খরচ টানতে পাচ্ছেন না। তাঁদের নিজেদের রোজগার নাকি কমে গেছে—অসুবিধে হচ্ছে খুব।'

তাঁর গলার স্বরে আর বলবার ভঙ্গীতে, কে জানে কেন, বিনুর চোখে জল এসে পড়ে। সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে যায়।

কিন্তু, ওকে বোঝালেও মহামায়ার নিজের মনই বোঝে না শেষ পর্যন্ত।

কদিন একরকম গুম খেয়ে থেকে বোধহয় মনে মনে কথাটা তোলাপাড়া করছিলেন, শেষ পর্যন্ত হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। সাধারণত যারা শান্ত চাপা ধরনের মানুষ হয় তারা বিদ্রোহী হলে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক কঠিন হয়ে ওঠে। মহামায়ারও তাই হল। তিনি পরিষ্কার বামুনমাকে দিয়ে জানিয়ে দিলেন, নবদ্বীপে তিনি কোন মতেই যাবেন না, কিছুতেই না। অনেকের মুখেই তিনি শুনেছেন ওটা নেড়ানেড়ির জায়গা, ওখানে গেলে জাতধর্ম থাকে না। যাদের স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়, যাদের জাতগোত্তর খোয়া যায়—তারাই ঐখানে গিয়ে গা-ঢাকা দেয়। তিনি কিসের জন্যে যাবেন? গুরু

গোঁসাই আছেন—কিছু কিছু দু'চারজন উঁচুদরের সাধকও—তাঁরা যে মহামায়াকে দেখবেন তা সম্ভব নয়। আর—তাঁদের সঙ্গেও মহামায়ার বনবে না। উনি শাক্ত, চিরদিনের শক্তি উপাসকের বংশ ওঁদের। যারা সাধারণ ভেকধারী বৈষ্ণব, তাদের মধ্যে জাতকুলের বিচার নেই, কে যথার্থ সাধু কে না, চেনাও মুশকিল। তাছাড়া ধর্মের জায়গা তীর্থের জায়গা—অনেক বদলোক গিয়ে জোটে, বৈরাগী সাধুর ছদ্মবেশে দলে ভিড়ে থাকে। ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়। উনি কাকে চিনবেন—কে কি মতলবে ঘুরছে? টকের জ্বালায় পালিয়ে গিয়ে তেঁতুলতলায় বাস করতে রাজী নন উনি।

বিনুর কাকারা এই জেদে অসন্তুষ্ট হবেন তা বলাই বাহুল্য। তাঁরা সোজা বলে দিলেন, 'এতই যখন বুঝদার হয়েছেন উনি—তখন যা ভাল বোঝেন তাই করুন। আমাদের বলে লাভ কি?'

তা-ই করলেন মহামায়া। বেশী কথা, কলহকোঁদল করা ওঁর স্বভাব নয়। বললেন, 'বেশ আমিই করব। ডুবেছি না ডুবতে আছি, দেখি পাতাল কহাত জল।'

আজকাল আর অমর্ত মামা রাজেনকে পড়ান না। মাইনে দিয়ে মাস্টার রাখার ক্ষমতা নেই এঁদের। তবু মাঝে মাঝে তিনি আসেন, খবর নিয়ে যান। নীলকমল দোকানীর মারফৎ তাঁকেই খবর দেওয়া হল।

তিনি আসতে মহামায়া অভ্যাস মতো বামুনদিকে উপলক্ষ করে বললেন, 'ওঁকে আমার একটা উপকার করতে হবে বামুনদি। একবারটি দু পাঁচদিনের জন্যে কাশী যেতে হবে। খরচপত্র যা লাগে সব আমি দোব।'

অমর্ত মামা বারান্দার ওপরই তাঁর ছোঁড়া বিবর্ণ ছাতাটি দুহাতে ধরে উবু হয়ে বসলেন। বললেন, 'না না, সেসব কথা আগেই উঠছে কেন? আপনি বললে, আপনার উপকার হলে যাবো বৈকি। তার জন্যে নয়—কিন্তু ব্যাওয়াটা কি, হঠাৎ কাশী?'

বিনুর মা সব সংকোচ ত্যাগ করে সোজাসুজিই কথা বললেন, নত মুখে মেঝের একটা ভাঙা জায়গায় আঙুল দিয়ে বিলিতিমাটির চাবড়া খুঁটতে খুঁটতে বললেন, 'এখানে আর থাকব না দাদা। কলকাতাতে—বিশেষ এ পাড়ায় থাকলে ছেলে মানুষ হবে না। অন্য পাড়ায় গিয়ে বাড়ি ভাড়া করব, কত ভাড়া, খরচা বাড়বেই হয়ত। আসলে খরচাতেও আর পেরে উঠছি না। কাশী বড় তীর্থস্থান, বড় শহর অথচ সস্তাগণ্ডা, ইস্কুল কলেজ আছে, সব দিক দিয়েই সুবিধে। অনেক বাঙালীও থাকেন শুনেছি, আমাদের ব্রাহ্মণের ঘরও ঢের। তাই ভাবছি ওখানে গয়েই থাকব। আপনি শুধু গিয়ে একট দেখে আসবেন সত্যি সত্যিই জায়গা কমন। চোরগুণ্ডা বদমায়েশ আছে শুনেছি, তা সে তো কলকাতাতেও আছে —বরং কাশীতে অনেক বড় বড় পণ্ডিতও আছেন, আমাকে অনেকে বলেছে। হয়ত সে রকম বড় পণ্ডিতের জায়গা আর নেই—তবে সে দূরের কথা—এমনি দেখা, ইস্কুল টিস্কুল আছে কিনা, লেখাপড়ার সুবিধে কি—দেখে বুঝে যদি অমনি সস্তায় একটা বাড়ি দেখে আসেন—। একানে বাড়ি যদি না-ও হয়, আলাদা বন্দোবস্ত একটু দরকার। দু-একটা দিন কোন হোটেলে টোটেলে থেকে একটু

ঘুরে ফিরে দেখে আসবেন। আমার তো কেউ নেই। আপনার ওপরই সব ভরসা।'

কাশী মানেই ভাল ভাল খাওয়া। মাছ-মাংস-মিষ্টি-রাবড়ি। তবু কপি-বেগুনের সময় এটা নয়। তা হোক। বিনুর মনে হল কাশঝোপের মতো অমর্তমামার লোমবহুল ভুরু দুটোর নিচে কোটরগত চোখ দুটো আসন্ন ঐসব সুখাদ্যের আশায় জবলে উঠল। বিরাট গোঁফের মধ্যে খুশির আভাসও চাপা রইল না। মহামায়ার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলেন, 'বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! এর আর এত করে বলবার কি আছে! আপনার কাজ আমি প্রাণ দিয়েই করব। আর এ-তো তুচ্ছ ব্যাপার। হোটেল কেন, অকারণ খচ্চা। আমি ধম্মশালাতেই উঠব। ধম্মশালাও তো আছে। না হোক পান্ডাদের যাত্রীতোলা ঘর আছে। অনেকদিন আগে একবার গেছলুম—আমার দিদি-শাশুড়ির কাজে—সে অবিশ্যি হলও ঢের দিন। বছর কুড়ির কথা। তা হোক, মোটামুটি মনে আছে সব। তোফা জায়গা, মা গঙ্গা আছেন, বাবা বিশ্বনাথ। খাবার দাবার খুবই সস্তা। চার আনা সের মাংস, তিন আনা সের মাছ। দুধ ঘি অপর্যাপ্ত। জলের দাম দুধের থেকে বেশী। চলে যান। সেই ভাল। ছেলেমেয়ের গায়ে গত্তি লাগবে। দেখি। দেখব, আমি ভাল জায়গাই খুঁজে দেখব। ইস্কুলও কি আছে দেখব। খোট্টার দেশ, হিন্দী মিন্দী পড়ায়। বাঙালীর ছেলের কি ব্যবস্থা সেটা দেখতে হবে বৈ কি! দু-একটা দিন ঘুরে সব দেখতে হবে; গোড়া গেড়ে বসে থেকে।··· তা হোক, ছুটি আমি পাবো। এই সময়টাই ভাল। ইস্কুলে তত কাজ নেই। এগজামিন নেই কিছু সামনে। দেখি। কালই কথা কইব হেড-মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে—। আপনাকে জানিয়ে যাবো—কবে ছুটি পাবো না পাবো। কিছু ভাববেন না।'

এক নিঃশ্বাসে সব কথা বলে থামলেন অমর্ত মামা। ঐরকমই বলার ধরন ছিল তাঁর। খাব্‌লা খাব্‌লা কথা বলতেন, দ্রুতবেগে। কথা বলার সময় অকারণেই উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, ছোট ছোট—বামুনদি বলতেন উচ্ছেচেরা—চোখ দুটো বুঁজে যেত, ঘাড় নেড়ে ও হাত নেড়ে মনের আবেগ প্রকাশ করতেন।

মা কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললেন, 'কী আর বলব। বুকের ওপর থেকে একটা পাথর যেন সরে গেল। অনাথা অনাথা বিধবা আর এই গুয়ের গোবলা বাচ্ছা সব—কে আছে বলুন আমার মাথার ওপর!···ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন—আমার তো এ ঋণ শোধের কোন সাধ্যই নেই।'

'কিছু না, কিছু না। আপনি অত কিন্তু হবেন না। এ তো আমার কর্তব্য। ঢের খেয়েছি আপনার এখানে। না টাকা শুধু নয়, টাকা তো অনেকেই দেয়, কিন্তু সে দেওয়া কি জানেন—পৈতৃক গুরু জুতো মারব মন্তর নেবো—এই ভাব। আপনার এখানে সম্মানের সঙ্গে পড়িয়েছি, এমন আর কোথাও পাব না।······না না, সব ঠিক করে দোব, কিচ্ছু ভাববেন না। তবে, তবে জানেন তো, চল্লিশ টাকা মাইনের মাস্টারী করি—তাই বিশ বছরে এই চল্লিশ টাকা দাঁড়িয়েছে, ছাপোষা মানুষ, খরচ করতে পারব না।···করাই উচিত, একশোবার উচিত। শক্ত সমর্থ পুরুষমানুষ—মেয়েছেলের কাছ থেকে হাত পেতে

টাকা নে উগ্‌গার করব—মাথা কাটা যায়। উপায় নেই। টাকা খরচ করতে পারব না, গতরে যতটা হয় করে দোব—প্রাণপণ খেটে।'

সেদিন আর টাকাটা নিলেন না অমর্ত মামা। বললেন, 'তাহলে আদ্ধেক এখানেই খরচ হয়ে যাবে। অনটনের সংসার। যাবার দিন নেবো।'

পরের দিনই জানিয়ে গেলেন, শনিবার সর্বশুদ্ধ ত্রয়োদশী পড়েছে—সেদিনই যাত্রা করবেন। ও-ই সুবিধে, রবিবারের ছুটিটা মারা যাবে না। সোমবার থেকে শনিবার ছ'দিনের ছুটি নিয়েছেন, 'দুই রববার মিলিয়ে ধরুন গে আটদিন—অঢেল সময় হাতে থাকবে। ধীরে সুস্থে ঘুরে দেখে খোঁজখবর নে আসতে পারব। কোন চিন্তা নেই, সব মঙ্গলমতো হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়। শ্রীহরি শ্রীহরি।'

শুক্রবার রাত্রে এসে হিসেব করে টাকা নিয়ে গেলেন তিনি।

'না, ইন্টার কেলাস টেলাস আমার চলবে না। অত আমীরী চাল পোষাবে না। ঐ তিন দাঁড়িই আমার ঢের। আমার ঐ গেলাডস্টোনের মতো ফোর্থ কেলাস থাকলে তাতেই যেতুম। আমার বাপ ঠাকুদ্দা হাঁটা-পথে গয়া কাশী করেছিলেন। এ তো পায়ের ওপর পা দিয়ে তোফা ঘুমিয়ে যাওয়া। এক রাত্তিরে পেঁাছে যাবো। তা ধরো চার টাকা ছ' আনা না অমনি কতো ভাড়া—একো পিঠের-ও কুলিভাড়া-টাড়া নিয়ে পুরো পাঁচ টাকাই ধরা ভাল। পাঁচ পাঁচ দশ। আর খাওয়া। খাওয়া আছে গাড়িতে, আমার একটু দুধ দরকার, আপিং খাই। একটাকা এক টাকা দু টাকা—আসা যাওয়ায়, সেখেনের খরচ তো আছেই, কত লাগবে তা তো জানি না, তা দিন তিরিশটে টাকাই দিন। অত লাগবে না অবিশ্যি, কাছে রাখব। রাখা ভাল। বিদেশ বিভুঁই জায়গা।...অবিশ্যি হ্যাঁ, চোর ডাকাতের ভয়ও আছে, পকেটমার তো চারদিকে। তা আমি এক জায়গায় রাখব না, গেঁজেতে রাখব কিছু। যদি দরকার হয় তেমন ভাল বাড়ি পাই, দু-চার টাকা আগাম বায়না দিয়ে আসব।'

মা তার আগেই বিকেলে বামুনদিকে গরানহাটায় পাঠিয়ে রাজেনের অন্নপ্রাশনের রুপোর থালাবাটি গ্লাস বিক্রী করিয়েছেন, অমর্ত মামা আসবেন জেনেই। একত্রিশ টাকা পাঁচ আনা পেয়েছেন মোটে! তা থেকেই নীরবে ত্রিশটি টাকা অমর্ত মামার সামনে মেঝেতে রাখলেন।

বামুনমা শুধু মন্তব্য করলেন—'গেরো! গেরো একেই বলে। গেরো না হলে এমন কাঠবোকা হবেই বা কেন! এত বই পড়ে এই বিদ্যে! আর ঐ এক রাঘব বোয়ালের হাতে অত টাকা পড়ল।'

অমর্ত মামা ফিরলেন পুরো আট দিন কাটিয়ে সোমবার সকালে। কাশীর জলহাওয়া যে ভাল সেটা এমনকি বিনুর চোখেও এড়াল না। এই কদিনেই—অমর্ত মামার নিজের ভাষাতেই—গায়ে বেশ 'গত্তি' লেগেছে তাঁর। কুলুঙ্গী-কাটা টেপা রগ সমান হয়ে গেছে। তোবড়া গাল পুরুন্ত মনে হচ্ছে।

খুব দুঃখ করলেন অমর্ত মামা। টাকা কিছু ফেরাতে পারেন নি। ধর্মশালায় থাকা হয়নি। বিষম নোংরা, সেকেলে সব ধর্মশালা—খোট্টারাই

থাকতে পারে, বোধহয় সেই শেরশা'র আমলের বাড়ি সব। সেখানে থাকা যায় না। যাত্রীতোলা বাড়িতে উঠতেও ভরসা হল না। অনেকেই ভয় দেখালে, তারা নাকি মিষ্টি কথায় গলিয়ে বাড়িতে তুলে জুলুম করে টাকা আদায় করে শেষ পর্যন্ত—'বুকে জোল' দিয়ে। এমনিও নাকি চুরি করে নেয়। হোটেলেই উঠতে হয়েছিল তাই। পার্বতী আশ্রম, খুব ভাল হোটেল, পার্বতী ঠাকুর লোকটিও ভাল। চার্জটা একটু বেশী, দেড় টাকা রোজ, সবাই বললে ঠকিয়েছে —তা তেমনি দুবেলা খাওয়া থাকা জলখাবার। ভাল, রাস্তার ওপর ঘর—ওর কম হয় না। 'তা এই ধরো, হোটেলেই তো দশবারো টাকা বেরিয়ে গেল, গাড়িভাড়া, একটু দেবতা ধম্মও তো আছে। একাভাড়াও ধরো গে তিন পয়সার কম সওয়ারী নেয় না। ব্যাটারা পয়সাকে বলে ঢেবুয়া।···টাকা সবই খচচা হয়ে গেছে, বরং আমার পকেট থেকেও কিছু গেছে। তা হোক, তাতে দুঃখু নেই। একে গচ্ছা বলব না, দেবতা বামুনেও তো কিছু গেছে সেটা তো আমারই দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, যা বলব নেয্য কথা।'

অবিশ্যি এদের জন্যে এনেওছেন কিছু। অসময়ের গোটা চারেক কাশীর বিখ্যাত পেয়ারা—পেঁড়া প্রসাদ ক'খানা, কালভৈরবের ডোর আর বিভূতি।

'এইটেই আসল, বুঝলেন না। কালভৈরবের হুকুম না হলে কাশীতে বাস করার উপায় নেই। আপনি যান, মাথায় ডাণ্ডা মেরে তাড়িয়ে দেবে। উনি খুশী থাকেন তো সবদিক বজায় থাকে।'

টাকাপয়সা ফেরৎ না আনুন, খবর অনেক এনেছেন। বাঙালীর ছেলের পড়বার মতো দুটো ইস্কুল আছে, সামনাসামনি। বেঙ্গলটোলা আর য়্যাংলো বেঙ্গলী। চিন্তামণি মুখুজ্জে খুব বড় চাকুরে ছিলেন, দিল্লী সিমলে করতেন, পণ্ডিত—তিনি সব ছেড়ে এসে নিজের যথাসর্বস্ব দিয়ে বাঙালীর ছেলের জন্যে এই ইস্কুল করেছেন। ক্লাশ এইট অবধি এখন আছে, মানে এখানের থার্ড ক্লাশ, তা এখন পড়ুক না ওরা ঐ পর্যন্তই। ততদিনে ওপরের ক্লাশ দুটোও স্যাংশন হয়ে যেতে পারে। না হয় নাইন টেন—মানে সেকেণ্ড ক্লাশ ফাষ্ট ক্লাশ য়্যানি বেসান্তের হিন্দু ইস্কুলে পড়বে এখন। ইউনিভার্সিটিও হচ্ছে—হিন্দু ইউনি-ভার্সিটি—মদনমোহন মালব্য বলে এক বড় উকীল উঠে পড়ে লেগেছে—নিচের ধাপটা পেরিয়ে গেলে পড়ার কোন অসুবিধে নেই, তখন তো সব ইংরিজীতে পড়া, হিন্দীর জন্যে আটকাবে না।...এসব ইস্কুলেও অবিশ্যি হিন্দী পড়ায় একটু বাংলার সঙ্গে সঙ্গে—যস্মিন দেশে যদাচার—তবে হিন্দীতে আসল পড়া পড়তে হয় না।

য়্যাংলো বেঙ্গলীই ভাল, গেরস্ত-পোষা ইস্কুল। চিন্তামনি নিজে দেখেন—তাঁর সঙ্গে কথাও বলে এসেছেন অমর্ত মামা। উনিও ইস্কুলমাস্টার শুনে খুব খাতির করেছেন নাকি। বলেছেন আপনার যখন ভাগ্নে তখন অবিশ্যি নেব, কিছু ভাববেন না। আমি নিজে নজর রাখব। না না সে কি কথা, বামুনের বিধবা, মাথার ওপর কেউ নেই, কাঁচ কাঁচ বাচ্ছা নিয়ে আসছেন—তাঁর ছেলে মেয়েরা যদি মানুষ না হয় খুবই দুঃখের কথা হবে। আপনি নিয়ে আসুন। এই সামনের জুলাই থেকেই সেসন শুরু, তার আগে মে মাসেই যদি এসে পড়ে

বুকলিস্ট দেখে বই কিনে বাড়িতে পড়াশুনো খানিক এগিয়ে রাখে তো খুব ভাল হয়।'

বাড়িও দেখে এসেছেন অমর্ত মামা। অগস্ত্য কুন্ডু বলে কি জায়গা আছে এখানেই।

'তোফা বাড়ি, বুঝলেন দিদি। নিচের তলাটায় তত আলো বাতাস নেই, তা নেই বা রইল, দোতলায় কল পাইখানা, দুখানা শোবার ঘর রান্নাঘর ছাদে ছোট কুটরী—একতলার ঘরে দরকারই বা কি আপনার? চাবি—স্রেফ চাবি দিয়ে রাখবেন। পাড়া ভাল, বাঙালীই বেশীর ভাগ, সব বামুন-কায়েতের বাস, এক আধঘর বেনেও আছে বোধহয়—বাজার বিশ্বনাথ দশাশ্বমেধ সব কাছে। ইস্কুলও এমন কিছু দূরে নয়। ব্রাহ্মণের বাড়ি. ঠাকুর আছে বাড়িওলার—শালগ্রাম শিবলিঙ্গ নিত্যি পুজো ভোগ হয়—মানে দেবোত্তর সম্পত্তি, এমন উত্তম আশ্রয় আর কোথায় পাবেন ?

'ভাড়া কত ?' অনেক কষ্টে একটু ফাঁক পেয়ে মহামায়া প্রশ্ন করেন।

'সাত টাকা। মোটে সাতটি টাকা। বিশ্বেস হয় ? এনটায়ার বাড়ি—মানে একানে, নিজস্ব। সব আলাদা। যাওয়া-আসার পথে পর্যন্ত বাড়িওয়ালা সঙ্গে কোন নেপচ নেই।'

এই বলে যত রকম সম্ভব অভয় ও আশ্বাস দিয়ে অমর্ত মামা বাড়তি যে দেবতা বামুনের জন্যে একটা টাকা খরচা হয়েছিল সেটাও বুঝে নিয়ে আনন্দ করতে করতে চলে গেলেন।

॥ ৮ ॥

চিন্তামণিবাবু বলে দিয়েছিলেন মে মাসে যাবার কথা, তা হয়ে উঠল না।

এতদিনের বাস তুলে এক কথায় চলে যাওয়া যায় না। টাকার প্রশ্নও আছে। যাঁরা খরচা দেবেন, তাঁরা বলেছিলেন, নবদ্বীপ যাবার কথা—মহামায়া যান নি, তাতে স্বভাবতই তাঁদের কর্তৃত্বাভিমানে কিছু আঘাত লেগেছিল, তাঁরা চটে ছিলেন। সে কঠিন ঔদাসীন্য ভাঙতে কিছু সময় লাগল। তবে শেষ পর্যন্ত এঁরা যে চলেই যাচ্ছেন, এইটেই মন্দের ভাল মনে করে একটু নরম হলেন। ওঁরাও প্রথমে কাশী নবদ্বীপ দুটো নামই করেছিলেন, সেটাও স্মরণ করিয়ে দিতে কিছু কাজ হল।

এখানে এই এতদিনের বাস তুলে যাওয়া ও সেখানে বাসা পত্তন করার জন্যে গাড়িভাড়া, বাড়ি ভাড়া, এখানের উটনোর গয়লার দেনা, ইস্কুলের মাইনে বই খাতা ইত্যাদি বাবদ মা দুশো টাকা চেয়েছিলেন। অনেক টালবাহানা করে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে ঘুরিয়ে মোট একশোটি টাকা দিলেন। বলে দিলেন যে এঁরা কাশী পেঁছে চিঠি দিলে ইস্কুলের মাইনে বই খাতা বাবদ আর কিছু বাড়তি টাকা তাঁরা ওখানেই পাঠিয়ে দেবেন।

আবারও সেই অমর্ত মামাকে ধরতে হল, সঙ্গে গিয়ে থিতু করে আসার জন্যে।

এবার আরও বিপদ, বামুনমা যাচ্ছেন না। মার দীর্ঘ দিনের নিত্য সঙ্গী, বিপদে-আপদে নিত্য নির্ভর। বামুনমা নিজেই আপত্তি করলেন, বললেন, 'আবার সেই তোমাদের ঘাড়ে চেপে থাকা তো, এখানে থাকলে যা হয় একটা রাঁধার কাজ জুটিয়ে নিতে পারব—একটা পেট বেশ চলে যাবে। বলি, এখানেও তো তোমার একটা নিজের লোক থাকা দরকার।'

সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা। মহামায়াও তা বুঝলেন। অনেক ভেবে-চিন্তে দেখে তাই আর বামুনমাকে পেড়াপীড়ি করলেন না সঙ্গে যাবার জন্যে। এত জিনিস নিয়ে যাওয়া যাবে না, সব বেচে দিয়ে যেতেও মন সরে না। যদি শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ছেলেরা মানুষ হয় বিয়ে-থা করে সংসার পাতে—এ সবই লাগবে। মেয়ের বিয়েতেও লাগবে। বিক্রী করলে আর কটা পয়সাই বা হবে। কিনতে গেলে তখন অনেক বেশী পড়বে। তা ছাড়াও, সত্যিই, এই তো এদের টাকা দেওয়ার ছিরি। এখানে থেকে দুবেলা হাঁটাহাঁটি করেও আদায় হয় না সময় মতো, চোখের বাইরে চলে গেলে শুধু চিঠি লিখে কি আদায় হবে? চিঠির জবাবই দেবে না হয়ত। যদি বামুনমা এখানে থাকেন তাঁদের সঙ্গে ওঁকেও একটা চিঠি দিলে তিনি হাঁটাহাঁটি তাগাদা করতে পারবেন।

বামুনমাই খোঁজাখুঁজি করে রামহরি না হরিরাম ঘোষের লেনে একখানা ঘর দেখে এলেন। একতলার ঘর, এক পাশে—কতকটা একানে-মতো। মাত্র সাত টাকা ভাড়া। কথা রইল বামুনমা দু বাড়ি ঠিকে রান্না করবেন—এক বাড়িতে শুধু খাওয়া অন্য বাড়িতে শুকো মাইনে, যা পাঁচ-দশ টাকা দেয়—এখানে ওঁর ঘরে মার দু' সিন্দুক বাসন, আলমারী, টেবিল থাকবে। তার জন্যে মা মাসে চার টাকা করে দেবেন বাকী তিন টাকা বামুনমাই চালিয়ে নেবেন, যে করে হোক।

এইবার আসল তোড়জোর শুরু হয়ে গেল। একদিন মা বামুনমা গিয়ে ওবাড়ির ঘরখানা ধুয়ে মুছে রেখে এলেন। পরের দিন থেকে মাল চালান শুরু হল। যা কাশীতে যাবে তার বাঁধাছাঁদাও। পড়ে থাকবে ঘরে ঘরে ধুলো ঝুল ছেঁড়া-খোঁড়া কাগজ, ভাঁড়ারের পরিত্যক্ত হাঁড়িকুঁড়ি আর এটা-ওটা, বাতিল করা জুতো, ভাঙা ছবির ফ্রেম, যার কোন মূল্যে নেই।

সেদিকে চেয়ে চেয়ে মন খারাপ হয় বৈকি। দাদা বিষণ্ণ, দিদি শুকনো মুখে অকারণেই এঘর ওঘর করছে। সে এর মধ্যেই মার হাত-নুড়কুৎ হয়ে উঠেছিল, সব ছোটখাটো তৈজশ সেও নাড়াচাড়া করেছে। মা কাঁদছেন না, কিন্তু কাঁদলে ভাল হত। বামুনমায়ের দুঃখ সরব—প্রকাশ্যেই ভাগ্যকে ধিক্কার দিচ্ছেন তিনি।

বিনু প্রথমটা অত ঠিক বুঝতে পারেনি। তার এখানে বন্ধুবান্ধবের দল গড়ে ওঠেনি রাজেনের মতো। আত্মীয়-স্বজনও কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নেই। পরিচিত বলতে কালী দত্তর কারখানার কর্মচারীরা। সুতরাং তীব্র কোন বিচ্ছেদ-বেদনা অনুভব করার কথা নয়।

কিন্তু এবাড়ি ছেড়ে যাবার দিন যত আসন্ন হয়ে আসে ততই যেন বুক থেকে কান্না ঠেলে উঠতে চায়। কেন—তা সে জানে না, অত বিচার করে দেখার

বয়স নয় তার। কেন যে এমন একটা কষ্ট তা তো বোঝেই না, কষ্ট হচ্ছে বলেও অনুভব করতে পারে না ঠিক, শুধু তার অবর্ণনীয় যন্ত্রণাটা অনুভব করে।

কার জন্যে কিসের জন্যে তার এমন চোখে জল এসেছিল বুকটা ভেঙে যাবার মতো হয়েছিল তা আজও জানে না বিনু। কী বা কাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে? সে কি এই বাড়িটা—জন্মাবধি যেটা দেখছে? আশপাশের বাড়ির লোক? ছাদের টবগুলো? নাকি শুধুই আজন্ম অভ্যস্ত পরিবেশ?

আজ বোঝে এ সবই তার প্রিয় ছিল সেদিন। ধীরে ধীরে এদের সঙ্গে নাড়ির যোগ গড়ে উঠেছিল—শুধু সে সম্বন্ধে সচেতন হবার মতো বয়স হয়নি ওর। এ সব তার প্রিয় ছিল। সব সব। জ্ঞান হয়ে অবধি যে বাড়ি, যে আসবাব, যে ঘরদোর দরজা জানলা দেখছে, যেখানে প্রত্যুষের প্রথম আলো অপরাহ্নের অস্ত রবির শেষ আভা এসে পড়ে, কার্ণিশের জল পড়ে পড়ে পাশের বাড়ির চিলেকোঠার দেওয়ালে যে বেড়ালের মতো দেখতে শ্যাওলার দাগ পড়েছে, বর্ষার সময় রাঙাবাবুদের ছাদের জল পড়ে পাশের গলির ভাঙা গর্তে যে টুপটাপ শব্দ হয়, কালী ঘোষেদের আস্তাবলে ঘোড়া ডাকে সহিস ঝগড়া করে, বস্তিতে যে মধ্য রাত্রে কর্কশ কলহ বাধে, ওই ও পাশের বাড়িটা থেকে যে গানের সুর ভেসে আসে, চন্ননের মার ঠেস পেড়ে কথা, ভোরবেলা গলি দিয়ে মুড়ির চাক ছোলার চাক হেঁকে যায়—এসব সবই তার প্রিয়, এর সঙ্গে ওর সমস্ত অস্তিত্বই যেন বাঁধা।

আসলে এখানেই যে তার অনুভূতির পদ্ম একটি একটি করে তার দল মেলেছিল, এখানেই এ পৃথিবীতে জন্ম নেবার আনন্দ-বিস্ময় অনুভব করেছে সে, জ্ঞান হয়েছে একটু একটু করে—মন জেগেছে নব নব ঘটনায় ও অনুভূতিতে —এখান ছেড়ে সে যাবে কেমন করে? অন্য কোথাও গিয়ে কি বাঁচবে সে।

শেষ পর্যন্ত চোখের জল আর বাধা মানল না। একা খালি শোবার ঘরটার মেঝেতে পড়ে হু-হু করে কাঁদতে লাগল সে। মা বামুনমা যতই কেন না প্রবোধ দিন, 'এই দ্যাখো পাগল ছেলে, এখানের জন্যে হেদিয়ে পড়লি, কী আছে এখানে? সেখানে গেলে সে শহর দেখলে অবাক হয়ে যাবি। কত উঁচু উঁচু বাঁধানো গঙ্গার ঘাট, মন্দির বেণীমাধবের ধ্বজা, কত শো সিঁড়ি—সে সবে তোর চোখ ধেঁধে যাবে। সেখানে এক্কা চলে, একটা ঘোড়ায় দু চাকায় গাড়ি টেনে নিয়ে যায়, সেখেনে গেলে আর কোথাও যেতে চাইবিনি।' ইত্যাদি—বিনুর মন কোন সান্ত্বনা বা আশ্বাসেই পায় না। এক এক সময় মনে হয় সে মরেই যাবে। আবার এমনও ভাবে—এর চেয়ে মরে গেলেই বোধ হয় ভাল হত।

কিন্তু সেসব কিছুই হল না। কোন অঘটনই ঘটল না। নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে—আষাঢ়ের এক মেঘলা দিনে এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হল। পড়ে রইল চিরপরিচিত অতি প্রিয় বাড়ি, পড়ে রইল তার কত খেলার কত চিত্তবিনোদনের ছোটখাটো অকিঞ্চিৎকর উপকরণ—ভাঙা কাঠের পুতুল, ভাঙা এক পয়সানে মাটির রথ, শ্লেটের ভাঙা টুকরো। ছাত্র শাসনের চুবড়ি ভাঙা চ্যাঁচারি। কিছু বাড়তি ঘুঁটে ও কাঠ পড়ে রইল। বিনুর মনে হল তারা করুণ মুখে ওর দিকে চেয়ে মিনতি জানাচ্ছে, আমাদের ফেলে যেও না, যদি

থাকতে না পারো আমাদেরও নিয়ে যাও।

সে সব কিছুই হল না। গাড়িতে তুলে দিয়ে বামুনমা ডুকরে কেঁদে উঠলেন, জানলা থেকে রাঙাবাবুর স্ত্রী বললেন, 'দুর্গা দুর্গা। বামুন মেয়ে ওরা ভালয় ভালয় সেখেনে পেঁছেছে চিঠি পেলে, একটা খবর দিয়ে যেও বাছা।' কালী দত্তরা একটিন শটি তুলে দিলেন, চন্ননের মা একঠোঙা সন্দেশ দিয়ে গেলেন। সকলেরই চোখে জল। চিরধৈর্যশীলা মহামায়াও আকুল হয়ে কাঁদছেন। এর মধ্যেই এক সময় কোচোয়ান গাড়ি ছেড়ে দিল।

বিনুর জীবনে এই প্রথম ভাগ্যের আঘাত। এই প্রথম একটা প্রবল বিচ্ছেদ-বেদনা অনুভব করল সে। স্পষ্টভাবে না হলেও আজকে প্রথম বুঝল—তারা কত অসহায়, কত অসমর্থ।

॥ ৯ ॥

এবারেও খরচা দিয়ে অমৃত মামাকে নিয়ে যেতে হল। তিনি ছাড়া হেপাজত পোয়াবে কে? একজন মাথা হয়ে না দাঁড়ালে একটা অল্পবয়সী বিধবা তিনটে শিশু নিয়ে অত দূর দেশে যাবে কোন ভরসায়, ঝঞ্ঝাট তো কম নয়! ভারী ভারী বিস্তর মাল—যেমন বিছানা গদি, বাসন বোঝাই তোরঙ্গ—এসব আলাদা লগেজে নিতে হবে, সে গরুর গাড়ির সঙ্গে হেঁটে গিয়ে হাওড়ায় জিম্মে করে দেওয়া, যেসব জিনিস এদের সঙ্গে যাবে সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া, টিকিট কাটা, ট্রেনে খালি জায়গা দেখে তুলে থিতু করে বসানো, কুলির সঙ্গে তকরার করা, সেখানে নেমেও কুলি আছে, ব্রেকভ্যান থেকে রসিদ দেখিয়ে মাল নামানো, গাড়ি ভাড়া, নতুন বাড়িতে সংসার পাতার হাজারো খুঁটিনাটি—এত হ্যাঙ্গাম করবে কে এক অমর্ত মামা ছাড়া?

প্রথমটা অমর্ত মামা ইতস্তত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মার কান্নাকাটি দেখে রাজী হয়ে গেলেন। করলেনও সব। বামুনমার বিশ্বাস গাড়ি ভাড়া, হাওড়ায় মাল দিয়ে আসার খরচা, কুলিদের মজুরী—ইত্যাদি থেকে তাঁর বেশ দু পয়সা থাকছে—কিন্তু মা সে কথা মনে করেননি। বলেছেন 'না না ছিঃ। ওকি বলছ। উনি কি সেই প্রকৃতির লোক? আর নিলেও দোষ হত না—পরের জন্যে এত ঝঞ্ঝাট কে পোয়ায় বল দিকি?'

এবার ইণ্টার ক্লাসের টিকিট হয়েছিল। মামা বললেন, 'থার্ড কেলাসে বড্ড ভীড় হয় এ গাড়িটায়, কাবুলিওয়ালারা পর্যন্ত উঠে ঠেলাঠেলি করে। সে দিদি আপনি সহ্য করতে পারবেন না, বাচ্চারা যাচ্ছে। চিরদিন সেকেন কেলাসে চড়ে বেড়ালেন, একবার তো শুনেছি কোথায় যাবার সময় ফাস্টো কেলাসেও গিছলেন। খুব একটা বেশীও তফাৎ নয়। দেড়া তো। থার্ড কেলাসের ভাড়ার ওপর আর অর্ধেক। তেমনি মালও তো আমাদের ঢের। টিকিট পেছু পাঁচ সের করে বাড়তি ছাড় মিলবে।'

করলেনও অনেক মেহনত। একটা ছোট দু'বেঞ্চির কামরা বেছে নিয়েছিলেন। আর কাউকে উঠতে দেননি। কোথা থেকে রেলের চাবি একটা যোগাড়

করেছিলেন—নিজেরা উঠেই দরজা চাবি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কেউ উঠতে এলেই অনাবশ্যক হিন্দীতে বলেছিলেন—'ইয়ে রিজার্ভ হ্যায়, আগে যাইয়ে।'

মালগুলো সব ওপরে নিচে থিতিয়ে সাজিয়ে অমর্ত মামা নিচে গাড়ির গদির ওপর শতরঞ্জি পেতে বিছানা করে দিলেন। তারপর ট্রেন ছাড়তেই মাকে বললেন, 'নিন আর দেরি না। বসে বসে যত ভাববেন তত মন খারাপ। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

কলঘর থেকে মুখ হাত ধুয়ে এসে সস্তার পাম্প-শু জুতো খুলে গাড়ির মেঝেতে উবু হয়ে বসে যথাসম্ভব স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে দশবার জপ সেরে নিলেন। বললেন, 'আহ্নিক পুজো গাড়িতে হয় না। এখানে ঐ দশবার জপ। মুসাফিরিতে বেশী দরকারও হয় না গুরুদেব বলে দিয়েছেন।' তারপরই হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'কৈ রে। যাযা তোরা সব হাত ধুয়ে আয়। কৈ দিদি, এই বিছানা সরিয়ে দিচ্ছি এখানেই পাতা পাতুন। না না আর মোটে দেরি না—'

বামুনমাই গাড়ির খাবার করে দিয়েছেন। ওবাড়ি থেকে করে এনেছিলেন ডালপুরী আর আলুচচ্চড়ি। টক দেওয়া আলুচচ্চড়ি যাতে খারাপ না হয়। বামুনদি বলতেন বিন্দাবনী আলুচচ্চড়ি। কে ওঁকে এটা শিখিয়ে ছিল, বৃন্দাবনে নাকি এমনি হয়। আবার আলু সেদ্দ করে ঘি মরিচ দিয়ে আলুর টুপো করতেন, তাতেও লেবুর রস কি আমচুর দিতেন—বলতেন বিন্দাবনী টুপো।

আলুচচ্চড়ি ডালপুরী ছাড়াও অনেক কী সব করেছিলেন বামুনদি। পটল ভাজা চন্দ্রপুলি—ওঁর স্বামীর নাম ছিল বুঝি চন্দ্রনাথ উনি বলতেন চিনিরপুলি। যত মন কেমন করেছে এদের জন্যে ততই এটা-ওটা তৈরী করেছেন কে কি ভালবাসে মনে করে করে। ওদেরও যে মনে আছে এদেরও মন কেমন করতে পারে ওঁর জন্যে এখানের জন্যে সে ক্ষেত্রে ঐ সব খাবার এদের মুখে উঠবে কিনা—সে কথা ভেবে দেখেননি। কিন্তু অমর্ত মামার এসব কোন কারণ ছিল না আহারে অনিচ্ছার—মা যখন পুঁটুলি খুলে কলাপাতার ওপর একে একে সব বার করছিলেন সেই বিচিত্র সব আহার্যের দিকে চেয়ে তাঁর জপের আঙুল বোধহয় এক নিমেষে দশবার ঘুরে এল।

অমর্ত মামা খেলেন বেশ গুছিয়ে তৃপ্তি করেই। এরা কেউই কিছু খেতে পারল না। দিদি পারুল তো কেঁদেই ফেলল 'মা বামুনমাকে কি আর কোন দিন দেখতে পাবো না?' মা বললেন, 'ষাট ষাট! উ কি কথা। তা কেন, এক্টু গুছিয়ে বসতে পারলে—তোর দাদা কিছু কিছু ঘরে আনবার মতো হলেই তোদের বামুনমাকে আনিয়ে নোব—কিম্বা আমরাই আবার কলকাতায় ফিরে আসব।'

দাদাও খাবার নিয়ে খানিকটা শুধুই যেন নাড়াচাড়া করল, পুরো একখানা ডালপুরীও পেটে গেল কিনা সন্দেহ। বিনু প্রকাশ্যে কাঁদল না—লজ্জাতেই আরও প্রাণপনে চোখের জল চেপে রইল, তবে তার গলা দিয়েও কিছুতেই ঐ খাবারগুলো নামল না। অনেকক্ষণ ধরেই একটা গা-বমি ভাব বোধ হচ্ছিল, সে

ভাবটা এখন ঐ খাবারগুলোর দিকে চেয়ে যেন আরও বেড়ে গেল। ঐ বাড়ি ঐ পাড়া এই শহর—বিশেষ জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত যাকে দেখছে—তাদের এবং মায়েরও অভিভাবক সেই বামুনমাকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছে তারা কোন নির্বাসনে—আর কোন দিন এখানে ফিরতে পারবে কিনা এসব আর কোনদিন দেখতে পাবে কিনা কে জানে। এইভাবে কোথায় কোন দূর দেশে গিয়ে পড়ছে, সেখানের লোকের কথাই নাকি বুঝতে পারবে না ওরা—রাঙাবাবু বলছিলেন সেদিন—সেখানে গিয়ে কি ওরা বাঁচবে? জীবনে এই প্রথম ট্রেন চড়ল মস্ত বড় গাড়ি, শুনল কি পাঞ্জাব মেল না কি হু-হু করে যেন বাতাসের বেগে ছুটছে বাইরের দিকে চেয়ে কিছুই চোখে পড়ছে না—এ অভিজ্ঞতায় অভিনবত্বও ওর মনে ওদের মনে কিছুমাত্র উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করতে পারল না।

মা ওদের অবস্থা বুঝে কাউকেই খাওয়ার জন্যে বিশেষ পেড়াপীড়ি করলেন না। শুধু মৃদুকণ্ঠে মেয়েকে বললেন, 'রাত উপোসী থাকতে নেই মা, একটা মিষ্টি অন্তত খা। বামুনমেয়ে চিনিরপুলি করে দিয়েছে একটু খেয়ে জল খা। চোখ মোছ, এমন কান্নাকাটি করলে যাত্রাটাই খারাপ হয়ে যাবে। যা হোক একটু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়।'

বিনুকে কোলের মধ্যে টেনে নিজেই একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে দিলেন। কিন্তু এই সস্নেহ সহানুভূতিটুকুতেই হিতে বিপরীত হল—বিনুও এবার ওঁর বুকে মুখ রেখে হু-হু করে কেঁদে উঠল। তার ফলে চন্দ্রপুলির টুকরোটা পড়ে গেল মেঝেতে—কেউ লক্ষ্যও করল না। মা নিজে কিছু খাওয়ার চেষ্টাই করলেন না। যা ছিল গুছিয়ে আবার পুঁটুলি বেঁধে তুলে রাখলেন।

বামুনমেয়ের অমানুষিক পরিশ্রমের মান রাখলেন শুধু অমর্ত মামাই। ভারী ভারী পুরু ডালপুরী খান দশেক, আধ সেরটাক আলুচচ্চড়ি ও গোটা দুই বড় চন্দ্রপুলি, ছাঁচের অভাবে কলাপাতায় রেখে দু হাতের চাপ দিয়ে তোলা—ফলে বড় বড়ই হয়েছে। খেয়ে উঠে প্রাচুর্যের উদ্গার তুলতে তুলতে বললেন, 'এঃ এরা যে কিছুই খেল না। দ্যাখো কাণ্ড।...দিদি আপনিও কিছু মুখে দিলেন না? গাড়িতে তো বাইরের লোক কেউ ওঠে নি, ছোঁয়া ন্যাপাও তো হয় নি। আর হলেও দোষ ছিল না, শাস্ত্রে আছে বৃহৎ-কাষ্ঠে দোষ নেই। না না, এসব ভাল না। বলে রাত উপোসী হাতী পড়ে।...একটু কিছু খান। অন্তত মিষ্টি একটা। খাসা করেছে বামুন মেয়ে—।'

বললেন, কিন্তু এ অনুরোধের ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করলেন না! ওপরের দুটো বাঙ্কই মালে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল—এখন টানাটানি করে রাজেনের সাহায্যে কিছু নামিয়ে কিছু সরিয়ে তার মধ্যেই একটু জায়গা করে নিয়ে উঠে পড়লেন এবং কোনমতে বেঁকেচুরে শুয়েই নাক ডাকাতে শুরু করলেন। শুধু 'শয়নে পদ্মনাভঞ্চ শয়নে পদ্মনাভঞ্চ' বলতে বলতে একবার তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে কর্তব্যটাও পালন করে নিলেন, 'শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়ো—তোমরা এবার। আর দেরি নয়। কাল সক্কালবেলাই গোছগাছ করে নামতে হবে আবার।'

অগস্ত্য কুণ্ড জায়গাটা কোথায় জানা ছিল না। তবে যেখানেই হোক— দশাশ্বমেধ, বিশ্বনাথ কাছে আর একানে বাড়ি, এই জেনেই মহামায়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু নেমে বাড়ির চেহারা দেখে তাঁর বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে গেল। যে বাড়ি ছেড়ে এলেন, গত পনেরো বছর যেখানে কেটেছে—এক এক সময় মনে হত সে বাড়িটাই তাঁর বুকে চেপে বসেছে, তিনদিক চাপা বাড়ি— নিঃশেষ নিতে পারছেন না। নিজেই বলতেন 'জরাসন্ধর কারাগার'। আজ এই প্রথম মনে হল—এর তুলনায় সে স্বর্গ। এ বাড়িটার সামনের দিক— যেদিকে বাড়িওয়ালারা থাকেন—সেটার গলি তবু সহনীয়। কিন্তু ওদের ভাগে পড়েছে পিছনের দিক, ঠিক আড়াই হাত একটা গলি, তাও এ গলিতে কোনদিন কোনো সময়েই সূর্যের আলো পড়ে না—ওপরতলার দিকে সামনাসামনি দুটো বাড়ির কার্নিশে ঠেকে আছে, একটা বাড়ির ওপর আর একটা। ফলে দিনের বেলাও এ গলিতে রাত্রের অন্ধকার প্রায়।

দরজার মরচে ধরা, বহুকাল অব্যবহৃত তালা খুলে কপাট ঠেলতেই নাকে এল একটা ভ্যাপসা গন্ধ। দীর্ঘকাল হাওয়া-বাতাস না ঢুকলে যেমন গন্ধ হয় তেমনিই। নিচের তলায় চলনের পাশে ও একফালি উঠোনের ওদিকে মোট দুখানা ঘর আছে। তাতে একটি করে জানলা, সেও উঠোনের দিকে—অর্থাৎ সে জানলা না খুললেও কোন ক্ষতি হয় না। কারণ খুললেও তাতে বিন্দুমাত্র আলো ঢোকবার সম্ভাবনা নেই—এই সংকীর্ণ উঠোনেই একটা কল, কলঘর বলে আলাদা কিছু নেই। কেউ কলে থাকলে অপর কারও ওপরে ওঠা কি বাইরে বেরনোর ব্যাপারে কিছুটা ভিজতেই হবে। মেয়েছেলেরা এ কল কি করে ব্যবহার করে মহামায়া অনেক ভেবেও সে কৌশলটা অনুমান করতে পারলেন না! পাইখানা আছে, সেও কতকটা সিঁড়ির নিচে—তার দরজার কপাট ভাঙা—তবে তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই—ভেতরটা এমন অন্ধকার কোথায় কি আছে, দিনমানে—এই বেলা দশটার সময়ও কিছু বোঝা গেল না। একমাত্র সদর দরজা খোলা থাকলে পাইখানা অস্তিত্বটা বোঝা যায়।

এই উঠোন কলতলা, ভেতরের ঘরের সামনে একফালি দেড় হাত একটা রক, সিঁড়ি সবটাই ঘন পুরু মাকড়শার জালে সমাচ্ছন্ন, লাঠি দিয়ে সরাতে গেলেও ছেঁড়া যায় না। বোধ করি তলোয়ার দরকার। 'মৌরসীপাট্টা' কথাটা পরে শুনেছিল বিনু; আজ মনে হয় মাকড়শাগুলোর অমনি কোন অধিকার বর্তে ছিল ওখানে।

অমর্ত মামা একবার চোখ বুলিয়েই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিলেন, তিনি আর বিনুর মাকে ভাববার কি দ্বিধা করবার অবসর দিতে রাজী নন। প্রচণ্ড এক তাড়া লাগালেন মুটেগুলোকে। বহু দূরে সেই বড় রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামতে হয়েছে—এরা বলে 'টাঙ্গা'—এ সব গলিতে কোন কালেই গাড়ি ঢোকে না, মুটেরাই ভরসা। বললেন, 'হাঁ করকে কি দেখতা হ্যায়?' উপরে লে চলো সামান। হিয়াঁ কে রহে গা? ই সব ঘর তো খালি গরমকালকা লিয়ে হ্যায়।'

আসলে তাঁর অপ্রস্তুত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। দু-একটা কথাতেই

মহামায়া বুঝে নিলেন অমর্ত মামা এ বাড়ি চোখেও দেখেন নি ইতিপূর্বে। কে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—তার মুখেই যা বাড়ির বিবরণ শুনেছেন, ক'খানা ঘর ইত্যাদি—তার কাছে সাত টাকা নয়, পাঁচ টাকা আগাম দিয়ে আর একটি টাকা ঘর-বাড়ি ধুইয়ে রাখার মজুরী হিসেবে আলাদা দিয়ে চলে গিছলেন, বলা ছিল গোধুলিয়ার মোড়ে পানওয়ালার কাছে চাবি থাকবে। চাবিটা ছিল ঠিকই, তবে সে আর কিছুই করে নি বা করায় নি। হয়ত ঠিক কবে আসবেন জানান নি অমর্ত মামা, অথবা জানালেও কোন ফল হত না।

মুটেরা কিন্তু ওঁকে খাতির করল না। 'আরে কেয়া চিল্লাতা হ্যায় বাবু, ঝুটমুট হামলোককা উপর তং করতা হ্যায়। কাঁহাসে আউর ক্যায়সে যায়গা বাতাইয়ে না। হিয়াঁসে আদমী কোই যা সকতা? আপ পহলে যাইয়ে রাস্তা কর দিজিয়ে—তব না। হামলোক ইসব ভারী সামান লেকে ক্যায়সে যায়গা?'

কোথা থেকে ফস করে একটা পুরনো কাঠ, বোধহয় কোন ঘরের ভাঙা খিল যোগাড় করে যদি বা মাকড়শার জাল কিছুটা সরালেন অমর্ত মামা—সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত যেতেই চোখে পড়ল একটা বিপুলায়তন ব্যাঙ—নিঃশব্দে একদৃষ্টে ওঁদের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে। এতবড় ব্যাঙ যে জীবনে কখনও দেখেন নি তা অমর্ত মামাকেও স্বীকার করতে হল। পুরো দুটি সের ওজন হবে, কমপক্ষে। যেন, মনে হল, আজ অন্তত সে দৃশ্যটা মনে পড়লে মনে হয়—কোন অশরীরী আত্মা এই অভিশপ্ত মৃতপুরী পাহারা দিচ্ছিল এতকাল। এদের এই আকস্মিক স্পর্ধিত প্রবেশে ক্রুদ্ধ হয়ে এদের সতর্ক করে দেবার জন্যেই এই অস্বাভাবিক অদৃষ্টপূর্ব এক জীবিত প্রাণীর আকার ধারণ করে পথ রোধ করেছে।

কিন্তু অমর্ত মামার ভয় পেলে চলবে না। অন্তত মুখে খানিকটা সাউখুড়ি বজায় রাখতেই হবে। তিনি বললেন, 'ভয় কি। এ সোনা ব্যাঙ, খুব সুলক্ষণা। ইস, চীনে কি পাকা সায়েবরা পেলে মোটা দাম দিয়ে কিনে নিত!'

এতক্ষণে মন স্থির হয়ে গেছে মহামায়ার। তিনি দৃঢ় স্বরে বললেন, 'না, ওপরে উঠে আর দরকার নেই। যা দেখার আমার দেখা হয়ে গেছে। ও বাবা মুটিয়া লোগ, তোমরা বাইরে চলো, ঐ বড় রাস্তায় যেখান থেকে এসেছ ঐখানে ফিরে গিয়ে মাল নামাও। এ-বাড়িতে আমি থাকতে পারব না। তার চেয়ে পথে বসে থাকব সেও ভাল—'

'দ্যাখো মা, এটা কি—' পারুলই হঠাৎ এবার আঙুল দিয়ে উঠোনের একটা অংশ দেখায়।

সকলেরই চোখ পড়ে তখন। ধুলো আবর্জনা কালো মাকড়শার ঝুল—তার মধ্যেও একমাত্র সচল প্রাণী বলেই বোধহয় দেখতে কোন অসুবিধে হল না—একটা কি একে বেঁকে চলেছে। এরা কেউ চেনে না, অমর্ত মামাই চিনতে পারলেন, আর চিনল মুটেরা।

'আয়ে বাপু! বিচ্ছু! মাজি ইধার আইয়ে জলদি, ও কাটনেসে মর যায়েঙ্গে।'

বিচ্ছু অর্থাৎ কাঁকড়া বিছে।

অমর্ত মামা সদা সক্রিয়। এক লাফে সিঁড়ির প্রথম ধাপ থেকে উঠোনে পড়ে জুতোসুদ্ধ পা চাপিয়ে দিলেন—'ভয় কি, এই তো। এই তো মেরে দিলুম। আসলে পোড়ো হয়েছিল তো—এসব তো দু-চারটে থাকবেই। সাফ সুতরো হলে কি কারও দেখা পাবেন? আরে, এখনই চললেন কোথায়? সত্যি সত্যিই কি আর রাস্তায়—ঐ ঐ ব্যাটা মতে চক্কোত্তী, বলে কয়ে খরচা দিয়ে গিছলুম, একটি রাশ পয়সা এমন তিনটে বাড়ি ধোওয়ানো চলত—কিচ্ছু করেনি হারামজাদা। তা বেশ তো, এখানে না হয় নাই রইলেন, আপাতক মালপত্তর নামিয়ে চান করে মুখে কিছু দিয়ে নিন—হীরু সরকারকে বলা আছে, অন্নপূর্ণার পেসাদের কথা, হীরুবাবু মহাশয় ব্যক্তি। বড় বড় তিন চারটে বাসনের দোকান ঐ বিশ্বনাথের গলিতেই। লোকে বলে হীরু কাঁসারি—এখানের মাথা মাথা লোক ওর হাতের মুঠোয়। অন্নপূর্ণার বুড়ো মোহান্ত ছেলের মতো দেখেন—সে পেসাদ এসে গেল বলে। আজ তো এমনিও রান্নাবান্না হত না—সেই জন্যেই বলে রেখেছিলুম। খাওয়া-দাওয়ার পর অন্য বাড়ি খুঁজে দেখি না হয়। ঐ মতেকে যদি পাই সামনে—গুনে গুনে সাতটি জুতো লাগিয়ে তবে কথা কইব।'

মহামায়া এমনি শান্ত ও বিনম্র স্বভাবের মানুষ—কিন্তু কোন ব্যাপারে মন স্থির করলে ইস্পাতের মতোই শক্ত হয়ে ওঠেন। সে চেহারা অমর্ত মামাও দেখেছেন এর মধ্যে বেশ কয়েকবারই—তাঁরই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তিনি বললেন, 'না এখানে আমি পাঁচ মিনিটও থাকব না। এই তুমলোক চলো।'

মুটেরা ভারী মাল মাথায় নিয়ে আছে অনেকক্ষণ। বাড়ির চেহারা বিশেষ ঐ বিচ্ছু দেখার পর তারাও এখানে আর দাঁড়াতে রাজী নয়—তারা গজগজ করতে করতে এবং নিজেদের অনবদ্য ভোজপুরী ভাষায় এই বাবুটাকে বেইমান প্রভৃতি বিশেষণে আপ্যায়িত করতে করতে বেরিয়ে পড়ল। অগত্যা অমর্ত মামাকেও ব্যাকুল ও ব্যস্ত হয়ে তাদের পিছু নিতে হল।

॥ ১০ ॥

সেদিনের পরিস্থিতিটা একরকম বাঁচিয়ে দিলেন অমর্ত মামার সেই মহাশয় ব্যক্তি হীরু কাঁসারিই।

বিনুরা বড় রাস্তার মোড়ে নাট-কোটার ছত্রের কাছে এসে পেঁছেছে···দেখা গেল তিনিও উল্টো দিক, দশাশ্বমেধ রোডের দিক থেকে ঢুকছেন। পরনে পাট করা ধুতি, গায়ে একটা মেরজাই, হাতে মোটা লাঠি—সামান্য একটু যেন খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। পরে শোনা গিয়েছিল ফাইলেরিয়া না কি একটা অসুখে পা অশক্ত হয়েছিল।

একটা হাত কপালে কার্নিশের মতো করে বাগিয়ে ধরে—যেন আলো আড়াল করছেন এইভাবে যদিও সেখানে তখন রোদের নাম গন্ধও নেই—হীরুবাবু বলে উঠলেন, 'কে, আমাদের সেই মাস্টার মশাই না? আরে, আমি যে আপনার সন্ধানেই ঘুরছিলুম যদি দৈবে দেখা হয়ে যায়। কী ব্যাপার। ও, ইনিই

আপনার সেই ব্রাহ্মণ দিদি ? প্রাতপ্পেন্নাম। তা কি খবর—কোথায় উঠেছেন ? এই এলেন নাকি ? এধারে কোন বাড়ি ?'

আমতা মামার গলা কাঠ হয়ে এসেছিল বোধহয়, কোন মতে ঢোক গিলে ঠিকানাটা উচ্চারণ করতেই হীরুবাবু বলে উঠলেন, 'রাধেমাধব। ও বাড়ি।... ওখানে কেউ থাকতে পারে ? আজ কুড়ি বাইশ বছর ও বাড়িতে কোন ভাড়াটে আসেনি। বাড়িওলার এমন ক্ষ্যামতা নেই যে ওর পেছনে এক পয়সা খরচ করে। আর ও ঝেড়ে মেরামত না করলে ওখানে মনিষ্যি কেউ বাস করতে পারে। ছি ছি! আপনি ঐখানে এই ভদ্দরলোকের মেয়েকে তুলতে যাচ্ছেন! বাড়ি দেখেছেন আপনি একবারও ? না ? জানি দেখলে কেউ ওবাড়ি ভাড়া করার কথা ভাবত না। তা এমন শানশা দালালটি কে যার ওপর বিশ্বাস করে না দেখে বাড়ি ঠিক করেছেন ? মতে ? রামো, রামো, আপনি আর লোক পেলেন না। গাঁজাখোর মাতাল, জুয়াড়ি—কী নয় ও! কলকাতার ছেলে হয়ে ওর ভোচকানিতে ভুললেন! ছ্যা ছ্যা !'

এবার মহামায়া নিজেই কথা কইলেন। তিনি গত এক মাসের বিভিন্ন ঘটনায় বুঝে নিয়েছেন—যে অগাধ সমুদ্রে ভাসতে চলেছেন, সেখানে পুরনো দিনের মানসম্ভ্রমের ধারণা কি লজ্জা এসব মানলে চলবে না। নিজেকেই পুরুষ হয়ে দাঁড়াতে হবে—একাধারে এ ছেলেমেয়েদের বাবা ও মা দুই ভূমিকা চালাতে হবে—সংসারের এই রূঢ় বাস্তব রঙ্গমঞ্চে।

তবু একেবারেই সোজাসুজি একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কওয়া যায় না। মহামায়া মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দিয়ে বললেন, 'খোকা ওঁকে বলো যে মাস্টারমশাই বাড়ি না দেখে কোন খবর না নিয়েই আগাম ভাড়া দিয়ে ঐ বাড়ি ঠিক করেছিলেন। একটু আগে ঐখানে গিয়ে তুলেও ছিলেন। থাকতে পারব না বলে বেরিয়ে এসেছি। এখন এই রাস্তা ছাড়া কোন আশ্রয় নেই। উনি যদি ওরই মধ্যে একটু ভদ্রগোছের একটা বাড়ি সন্ধান করে দিতে পারেন তো আমাদের প্রাণ রক্ষা হয়।'

হীরু কাঁসারি কাশীর ঘুণ ব্যবসাদার, বহু মানুষ চরিয়ে খান। সে পরিচয় পরে সবই পেয়েছিলেন মহামায়া। তবে টাকা সব চেয়ে বেশী চিনলেও অমানুষ নন। এখানের বহু অসহায় নিরাশ্রয় বিধবার দেখাশুনো খোঁজ খবর করেন—ক্ষেত্রবিশেষে দু-এক টাকা দিয়েও সাহায্য করেন। তিনি চোখের নিমেষে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। গালে হাত দিয়ে বললেন, 'সব্য রক্ষে! এইসব গুয়ের গোবলা ছেলেমেয়ে—এতখানি তেতপ্পর বেলা হয়ে গেল একটু দাঁড়াবার ঠাঁই পেলে না। আপনিও তো বোধ হচ্ছে গাড়িতে এক ফোঁটা জলও মুখে দেননি। আর দেবেনই বা কি করে—হাজার হোক বামুনের বিধবা। না না, ওবাড়িতে ভূতও থাকতে পারবে না। সাপ বিছে, কী নেই। এক কাজ করুন দিদি, দিদিই বলছি—আপনি আমার সবচেয়ে ছোট বোনের চেয়েও বোধহয় বয়সে ছোট হবেন—এই কাছেই, খোদাই চৌকি থানার সামনে মাখাউ সাহেব দোকানীর একটা বাড়ি খালি আছে, আমার এক কুটুম আসবে বলে আমি ভাড়া নিয়েছি—দাঁড়িয়ে থেকে আগাপাস্তলা ওপর নিচ মায় স্যেৎখানা ইস্তক সে বাড়ি

ধুইয়ে এই আসছি সেখান থেকে। মাস্টার বলে গেছল পেসাদের কথা, আন্দাজে এই তারিখই বলে গেছল। আমি তো ঠিকানা জানতুম না, কথা ছিল ওই এসে দেখা করবে আমার দোকানে। তা আমি তো এখানে জোড়া ছিলুম—ফিরে গেল কিনা ভাবতে ভাবতে আসছি—হঠাৎ নজরে পড়ল মুটের মাথায় গাদা মাল। বুঝলুম দুদিনের চেষ্টার নয়—তাহলে এত মাল থাকত না—এ সেই মাস্টারের দল হতে পারে, দেখি একবার।...তা বলছিলুম দিদি, এখন সবসুদ্ধ সেখানেই চলুন, আমার সে কুটুম—বোনের নন্দাইরা আসবে পরশু দিন, দুদিন সময় হাতে আছে। পোস্কার করা বাড়ি, বিশেষ অসুবিধে হবে না। দুদিন বেশ থাকতে পারবেন। দুদিনও লাগবে না। তা'সে পরের কথা, এখন মালপত্র নিয়ে গিয়ে তো নাবান—নাবানো ওঠানো মুটে ভাড়া বেশী পড়বে—তা হোক একটা হোটেলে উঠলে মাথা পিছু কোন না দেড়টা করে টাকা নেবে, তাতেও মুটে ভাড়া তো লাগছেই। সত্যিই কোন রাস্তায় তো ফেলে রাখা যায় না—চোরের জায়গা—নিজেদেরও চান খাওয়া আছে, টা-টা করছে প্রাণ। এসব এখন ছিষ্টি মেলে বসবার দরকার নেই, যেটুকু খুব দরকার লাগে সেইটুকুই শুধু বার করে নিন। অন্নপূর্ণার—বারোটার মধ্যে পেসাদ বাঁটা সারা হয়। ওখানে গিয়ে যত খুশি যা ইচ্ছে পেট ভরা খেতে পারবেন—আর যদি বোঝেন এইভাবে এত বেলায় মোটমাটারি নামিয়ে চান আহ্নিক করে আর খেতে ভাল লাগবে না—বামুন দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থাও হতে পারবে। গণ্ডা চারেক পয়সা তাকে দিতে হবে অবিশ্যি, আর পাতা ভাঁড় সব মিলিয়ে আর দুটো পয়সা বাড়তি।

এক নিঃশেষে এত কথা বললে থামতেই হয় একটু, হীরুবাবুও থামলেন, তবে সে একবার ঢোঁক গিলতে যেটুকু সময় লাগে, আবার বকুনি শুরু হল পরক্ষণেই, 'যাক সে পরের কথা। চলুন চলুন, রাস্তার মধ্যিখানে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, সবাই হাঁ করে দেখছে।... সে বাড়িও অবশ্য এমন কিছু নয়—তবু এখনই ধুইয়ে মুছিয়ে আসছি তো।...এই, তুমলোক হাঁ করকে কি দেখতা হ্যায় ? মাল উঠাও, জলদি জলদি !'

বলে এই বার মুটেদের এক প্রচণ্ড ধমক লাগালেন।

মাখাউ সাহেবের বাড়িও বাসস্থান হিসেবে বাঞ্ছনীয় বা লোভনীয় নয় আদৌ। একতলার বাইরের দিকের ঘরে একটা দোকান, ভেতরের ঘর এখানকার পুরনো বাড়ির ধরনে ঐ রকমই অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে এবং অব্যবহার্য। তবে ওপরের দুটো ঘরে আলো-বাতাস আছে। সেখানেই মালপত্র রেখে একতলার উঠোনের কলে এসে একে একে স্নান সারতেই বেলা বারটা গড়িয়ে গেল। অমর্ত মামা বোধ করি লজ্জা ঢাকতেই গঙ্গায় যাবার নাম করে সরে পড়েছিলেন, 'একটা ডুব দিয়ে আসি চট করে গঙ্গা থেকে—এখানে এতজন একে একে নাইতে তিন-চার দণ্ড বেলা গড়িয়ে যাবে।'

সকলের স্নান শেষ হবার আগেই প্রসাদ এসে গেল। পাতা খুরি ভাঁড়—এরা বলে পুরুয়া, এর মধ্যেই বিনু লক্ষ্য করেছিল—ধুয়ে পেতে পাঁচজনের ভাত ডাল তরকারি পায়েস সব পরিবেশন করে লোকটি সাড়ে চার আনা পয়সা

নিয়ে খুশী মনে চলে গেল।

অমর্ত মামার ইচ্ছে ছিল খাওয়ার পরে একটু গড়িয়ে নেন, তা আর হল না। খাওয়ার আগে মা হীরুবাবুর কাছে হাত জোড় করে ছিলেন, 'দাদা কিন্তু বাড়ির কথাটা ভুলে থাকবেন না। আমার এখানে কেউ নেই, কাউকেই জানি না।'

এতখানি জিভ কেটে হীরুবাবুও হাত জোড় করেছিলেন, 'ছি ছি, অমন করে আমার অপরাধ বাড়াবেন না দিদি। আপনি বামুনের মেয়ে, জাতসাপ। আমি আপনার পায়ের ধুলোরও যুগ্যি নই।···বাড়ি যেয়ে কোন মতে দুটো মুখে গুঁজেই চলে আসব এখেনে। ইরি মধ্যে লোকও লাগিয়ে দোব চার দিকে —আপনার বাপ-মার আশীর্বাদে সে জোর আমার আছে কিছু—কোথায় কি ভাল বাড়ি খালি আছে দু দণ্ডের মধ্যে খুঁজে বার করবে তারা।'

সেই কথা মতোই হীরুবাবু বেলা দেড়টা নাগাদ এসে পেঁছিলেন। বাড়ির খোঁজ পেয়েছেন, দিদি যেমন চান তেমনই। মিশরি পোখরার সুর্যিকুণ্ডতে বাঙালীর বাড়ি। অনেকগুলো বাড়ি আসলে—একটা বড় উঠোন ঘিরে, উঠোন কেন বাগানই—খোলা, গাছপালাও আছে—উঁচু জমির ওপর, রাস্তার দিক থেকে হিসাব ধরলে বাগানটা দোতলায়। একটানা চকমিলান গোছের বাড়ি, মাঝে মাঝে পার্টিশান। এমন ভাবেই তৈরী—মাঝের দরজাগুলো খুললেই একটা বাড়ি হয়ে যাবে। আবার মাঝে মাঝে সিঁড়ি, একেবারে হালফ্যাশানে সাহেবী ধরনে করা, যাতে—ঐ সাহেবরা যাকে বলে ফেলাট —এক-একতলা একেবারে আলাদা, সিঁড়ির দিকের দরজা বন্ধ করলে একানে বাড়ি—সেইভাবে তৈরী। বাড়ীওলা মাথা খাটিয়ে করেছিল, ওতে আলাদা বাড়ির মতো বেশী ভাড়া পাওয়া যাবে। কারও সঙ্গে কোন নেপচ নেই তো। আলাদা ছাড়া কি? নন্দু মুখুজ্যে মিলিটারী কমিসারিয়েটে কাজ করে অনেক টাকা কামিয়েছিলেন, সায়েবরাও খুব ভালবাসত, তাদেরই পেলানে এ বাড়ি তৈরী। ছটা বুলক, চোদ্দটা ফেলাট। এ ছাড়া রাস্তার ওপরের ঘরে আলাদা ভাড়া—দোকান আছে, টিকের কারখানা, টিন মিস্তীর হাপর—এই সব। ভেতরের দিকের বাড়িগুলোর একতলার এক-এক ঘরে এক-এক বুড়ি ভাড়া থাকে। তা সে অবশ্য যে যা দেয়, নন্দ মুখুজ্জে কোন জুলুম করে না। কেউ এক টাকা, কেউ আট আনা—তেমন অনাথা অবীরে বুঝে চার আনাও নেয়। তিন টাকার মণি অর্ডার আসে দেশ থেকে, তাতেই মাস চালাতে হয়—চার আনার বেশী ভাড়া দেবে কোত্থেকে? অথচ দিকধাউড়ে বাগানের ওপর ঘর, একতলার হলেও বাঙালীটোলার ঐ সব বাড়ির মতো অন্ধকূপ নয়।

এক নিঃশেষে বলে গেলেন হীরু কাঁসারি তাঁর অভ্যাস মতো—যেতে যেতেই। খোদাইচৌকি থেকে সুর্যকুণ্ড বেশী দূর নয়, মহামায়ার অনভ্যস্ত পা বলেই পনেরো-কুড়ি মিনিট লাগল।

বাড়ির এ অংশ বা ব্লক বড় রাস্তার ওপর। বড় রাস্তা মানে এক্কা চলে বা চলতে পারে, কষ্টেসৃষ্টে হয়ত টাঙ্গাও আসবে, কষ্টেসৃষ্টে মানে পাশাপাশি দুখানা ধরা শক্ত—তবে এ বাড়ি পেঁছিবার আগে তিনচার ধাপ সিঁড়ি আছে বলে ঠিক সামনে পর্যন্ত কোন গাড়ি আসবে না। ডুলি পালকি আসতে পারে। বিনুর অবশ্য এইটেই বেশী পছন্দ, এখানে নেমেই ডুলি দেখেছে —ঘেরাটোপ দেওয়া এক রকম যান—দুজনে বইছে। পালকীর মতোই অনেকটা, তবে তার চেয়ে ঢের ছোট, চার চৌকো দড়ি বোনা খাটুলি (খাটিয়ার অপভ্রংশ),

একজন অতি কষ্টে বসে যেতে পারে, তাও, যাকে প্রথম দেখল, বেশ লম্বা মেয়েছেলেটি—ঘাড় হেঁট করে বসতে হয়েছে তাকে।

বাড়ির সামনে গাড়ি আসবে কিনা সে চিন্তা পরে। বাড়ি পছন্দ হল মহামায়ার। তিনতলায় দুখানা ঘর, সামনে খোলা অনেকখানি চওড়া বারান্দা, তারই একপাশে একটু ঘেরা কলঘর। বাইরেও একটা থামের সঙ্গে লাগান একটা কল আছে। অসুবিধার মধ্যে রান্না-ভাঁড়ার চারতলায়, খাপরার ঘর। চারতলায় জল-কল নেই, নিচে থেকে জল বয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাসনও নিচে এনে মাজতে হবে।...তা আর কি করা যাবে, নিজেকেই বোঝান বিনুর মা, সব সুখ হয় না। এতকাল তিন দিক চাপা বাড়িতে কাটিয়ে এসে দক্ষিণ খোলা এতখানি বারান্দা দেখেই মহামায়ার প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

'তবে ভাড়াটা একটু বেশী হয়ে গেল দিদি,' হীরুবাবু বললেন, 'বারো টাকার কম রাজি নয় বাসুদেব মুখুজ্জে—বাসুদেব বললে কেউ চিনবে না অবিশ্যি: কেষ্টা, কেষ্ট বলেই ডাকি আমরা—নন্দ বুড়ো হয়েছে সে অত দেখে না, এই কেষ্টই দেখে। পয়সার খাঁই ওর বেশী। হবেই তো, একেই সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশী হয়, তার ওপর পুষ্যিপুত্তুর যে, গিন্নী নিজের ভাইপোকে পুষ্যিপুত্তুর নিইয়েছেন। কালো বামুন কটা শুদ্দুর—কী সব বলে না,—সব বেটাই সমান! তার মধ্যে পুষ্যিপুত্তুরও পড়ে যে। কেষ্টার বুলি কত, বলে এই দুটো ফেলাটই আমার তুরুপের তাস। দোতলায় ঐ তো দক্ষিণেবাবুরা ভাড়া রয়েছেন সাত টাকায়, আমাদের জ্ঞাতি—তা হলেও এমন কিছু দয়া করে রাখি নি, ওঁরা উঠে গেলে বড় জোর আট টাকা পাব। তেতলা চারতলা বলতে গেলে তো দুটো দিচ্ছি, বারো টাকার কম পারব না।'

বারো টাকা!

মাসে পঞ্চাশটি টাকা মণি অর্ডার আসার কথা। তাতেই সব খরচা চালাতে হবে। খাওয়া পরা, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া, বাড়ি ভাড়া আলোর খরচ, জামা-কাপড় অসুখবিসুখ হলে ডাক্তার খরচা পর্যন্ত। পঞ্চাশ টাকা থেকে মাসে মাসে বারো টাকা চলে গেলে থাকে কি!

বুকের মধ্যেটায় হিম হিম ভাব বোধ করেন মহামায়া। পা দুটো যেন অকারণেই ভেঙে আসে। তবু মন স্থির করেই ফেলেন, 'আপনি নিয়ে নিন। তবে এখনই আগাম কিছু দিতে পারব না, ওখানে অতগুলো টাকা গেল। এখন আবার আগাম কিছু দিতে গেলে হাতে কিছুই থাকবে না। মাসে মাসে ঠিক দোব, ওঁরা না ভাবেন।'

'সে ঠিক আছে। আমি বললে এক বছর ফেলে রাখবে নন্দু মুখুজ্জে। দায়ে-আদায়ে দেখতে টেকস কমাতে এই হীরু কাঁসারির কাছেই ছুটে আসতে হয় না! তা হলে আপনি থাকুন, মাষ্টার মালপত্তর সব গুছিয়ে নিয়ে আসুক, আপনি আর এত হাঁটাহাঁটি করবেন কেন বেফায়দা!'

অমর্ত মামা একবার মাথা চুলকে আপত্তি জানাতে গেলেন, 'মাসে মাসে এতগুলো টাকা ভাড়া চলে গেলে—খরচা চালাতে পারবেন?...আর দু-এক জায়গা দেখলেন না কেন?'

'না। লোকে বলে খাই না খাই বুকে হাত দিয়ে পড়ে থাকি—সে জায়গাটুকু ভাল চাই। তাছাড়া কোথায় আর কে এর থেকে সস্তায় বাড়ি দেবে

—সে খবরই বা কে করছে। আর আমি পারছিও না, হটং হটং করে ঘুরতে! তিনি ওরই মধ্যে একটু পরিষ্কার জায়গা দেখে সত্যিই বসে পড়লেন।

॥ ১১ ॥

অমর্ত মামা রাজেনকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে গেলেন একেবারে। অনেক দূরের স্কুল—মিশরি পোখরা থেকে পাঁড়ে হাউলি, কম করেও আধ ক্রোশ পথ—বিনু অতটা হেঁটে যেতে পারবে না। তাছাড়া বিনুকে যেন তখনও একা স্কুলের ছেলেদের মধ্যে পাঠাতে ভরসা হয় না মহামায়ার। বললেন 'আর একটা বছর থাক, আমিও একেবারে একা এই বাড়িতে থাকব, আশপাশে একজনও চেনা লোক নেই—ভাবতেই যেন কান্না পাচ্ছে। ওখানে বামুন দিদি ছিল—বল-বুদ্ধি-ভরসা, একটা দাঁড়া পুরুষের মহড়া নিত। আপনি বরং খুকীকে কোথাও ভর্তি করে দিয়ে যান—ওরই কিছু হচ্ছে না পড়াশুনো, একেবারে আবর হয়ে আছে।'

বাংলা পড়ার তেমন কোন ভাল মেয়েস্কুল ধারে-কাছে নেই কোথাও। যা আছে তাতে পাঠশালার মান-এ পড়ান হয়—আর দুটো ক্লাশ হয়তো বাড়বে সামনের বছরে। কয়েকজন পাড়ার বাঙালী ভদ্রলোক করেছেন, এখনও সরকারী স্বীকৃতি পায় নি। অন্য কোন উপায় নেই বলে আপাতত সেখানেই ভর্তি করা হল। বয়সের অনুপাতে পারুল সত্যি সত্যিই অনেকখানি পিছিয়ে আছে, যা হোক একটু ব্যবস্থা করা দরকার—আর সেই কারণেই এখানে খুব অসুবিধা হবার কথা নয়।

ফলে বিনুর দিন আর কাটতে চায় না। মা সকাল থেকে রান্নাবান্না নিয়ে থাকেন। সংসারের বিচিত্র বিভিন্ন খুঁটিনাটি কাজ, বাসনমাজা ঘর-বারান্দা মোছাও তাঁকেই করতে হয়—বাড়ি ভাড়ায় অনেক টাকা চলে গেল, অন্যত্র হাত সামলে চলা উচিত। তবু প্রথম মাসটায় এক ঠিকে মজুরনী বা ঝি রেখেছিলেন, এক টাকা মাইনেতে দুবেলা বাসন মেজে দিয়ে যেত। কিন্তু দেখা গেল, সে মাজায় বাসনের তেল, কড়া-বোগনোর কালি কিছুই যায় না। কলকাতায় থাকতে এসব দেখতে হত না, যা করতেন দেখতেন বামুনদিই, সেখানেও হয়ত এমনিই বাসন মাজা হত, অন্তত রাজেন তাই বলে—কিন্তু মহামায়া তাতে কোন সান্ত্বনা পান না, দেখে-শুনে এমন নোংরা কাজ তিনি নিতে পারবেন না। ঐ এক মাস দেখেই ঝি ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

তিনি ব্যস্ত, এরা স্কুলে চলে যায়—বিনুর অফুরন্ত সময়। লেখাপড়া যেটুকু মায়ের কাছে করে—সে সেই বিকেলে, তাতে এক ঘণ্টাও পুরো লাগে না। পড়া আর দু সেলেট লেখা। চারুপাঠ, পদ্যপাঠ, আখ্যানমঞ্জরী, ইংরিজী ফার্স্ট বুক—এই তো পড়া, তার সঙ্গে একটু ইংরিজী আর বাংলা হাতের লেখা। সে সবই ঐ এক ঘণ্টায় সারা হয়ে যায়। বাকী সময়টা নিয়ে কি করবে তা যেন ভেবে পায় না। ভাগ্যে এখানের বারান্দাতেও রেলিং আছে, তাদের ছাত্র মনে করে পড়ানো বা শাসন করা যায়, গল্পও শোনানো যায় মধ্যে মধ্যে শ্রোতা মনে করে। কিন্তু সব সময় এসব ভাল লাগে না। বিশেষ দিদিটা দেখতে পেলে বড্ড খেপায়।

আসলে অভাব যেটা—মানুষের, চলমান জীবনের। এখন বিনু এসব

বোঝে—তখন বুঝত না। শুধু বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগত, দিন যেন কাটতে চাইত না। কলকাতার সেই তিনদিক চাপা বাড়ির জন্যে মন কেমন করত।

এখন বোঝে কলকাতায় কি ছিল যা ওখানে গিয়ে পায় নি। প্রধানত মানুষ। এ বাড়ির বারান্দাটার সামনে কার একটা—কোন রাজা কি জমিদারের বিরাট একটা পাঁচিল ঘেরা পোড়ো জমি ছিল—পুকুর বুজনো—অনেকখানি। তাতে না কেউ বাস করত, না বাগান করত।…সম্ভবত কোন দিন এই বাড়ি থেকে ফেলা বীজ পড়ে একটা কুল গাছ হয়েছিল, তাতে শীতকালে কুল হয়ে থাকত, তাও কেউ পাড়তে আসত না, কদাচিত কোন ডানপিটে ছেলে ছাড়া, আর হয়ে থাকত বর্ষাকালে কিছু বুনো আগাছা ও ঘন ঘাস। গরু ঘোড়ার জন্যে ওদিকের ফটক দিয়ে ঢুকে ঘেসেড়ারা মাঝে মাঝে এসে সে ঘাস কেটে নিয়ে যেত, সেই সময়ই আগাছা ও ছোট ছোট নিম বা কুলের চারা পরিষ্কার হত।

বাড়ির সামনেব রাস্তা সংকীর্ণ, তা দিয়ে তখন লোকজনও বিশেষ চলত না। বছরে একবার—দশ-বারো দিনের জন্যে কি মেলা বসত—সেই সময় বেশ কিছু লোকজন আসা-যাওয়া করত, রূপকথার ঘুমন্ত পুরী যেন হঠাৎ জেগে উঠত, গম গম করত প্রাসাদ। কিন্তু সে সবই প্রায় স্থানীয় লোক, তাদের কথা কিছু বোঝা যেত না। আর কথাই বা কে কত বলতে বলতে চলে—তেতলা থেকে মিশ্রিত বাক্যের অস্ফুট একটা কোলাহলই মাত্র কানে আসত। মাঝে মাঝে কোন কোন পুজার্থিণী মহিলারা দল বেঁধে ওরই মধ্যে বাঁশী আর ডুগি তবলার সঙ্গে গান গাইতে গাইতে পাড়ার এক ছোট মন্দিরে পুজো দিতে যেতেন. বৈচিত্র্যের মধ্যে ছিল ঐটুকুই।

বাড়ির পিছন দিকে অবশ্য মাঝারি ধরনের একটু বাগান ছিল। বলকে, টগর ও শিউলি ফুলের গাছ ছিল দু-একটা—বাকী সবই ঘাসের জঙ্গল। হ্যাঁ. আর একটা আশ্চর্য জিনিস ছিল, ওদের শোবার ঘরের জানলার ধার ঘেঁষে এক ঝাড় কলা। কি কলা তা মনে নেই, ফল ধরতে দেখেছে বলেও মনে পড়ে না, বোধহয় কাঁচকলাই। তাহোক, গাছটাই বড় কথা। রাস্তা থেকে দেখলে এ ঘরটা তেতলা কিন্তু ভেতরের দিক থেকে দোতলা। কটা সিঁড়ি ভেঙে বাগানে পেঁছিতে হত—সুতরাং মধ্যে মধ্যে সুদুর্লভ সৌভাগ্যের মতো একটা-আধটা পাতা জানলার কাছে ওর প্রাণপণ-আয়াসে-আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়ত। একটা গাছের পাতা হাত দিয়ে ধরার যে কি আনন্দ তা ভুক্তভোগী ছাড়া কাউকে বোঝান যাবে না। বার বার হাত দিয়ে নেড়ে, টেনে, খানিকটা কাছে আনতে পেরে যেন আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়ত।

ওদিকের মহলগুলোয়—হীরুবাবুর ভাষায় 'ফেলাট'-এ যে সব বাসিন্দারা থাকত, তারা যেন বড় সুদূরে, তাদের কথাবার্তার টুকরো-টাকরা যা কানে আসত তা থেকে ওদের জীবনযাত্রার খেই ধরতে পারত না—এই কলাগাছ ও বলকে গাছের ফাঁক দিয়ে সব দেখাও যেত না। নিচের ঘরগুলোর বাসিন্দা বুড়ি ভাড়াটেরা ভোরে উঠে কিছু কথাবার্তা কচকচি জুড়ত কিন্তু তখন নিশ্চিত হয়ে বসে শোনার সময় নয়। তা ছাড়া তারা খুব চেঁচামেচি করতেও পারে না, বাড়িওলা নন্দ মুখুজ্জে ধমক দেন, ভোরবেলা ঘুমের সময়, আর-পাঁচটা ভাড়াটে বিরক্ত হবে—এমন চেঁচামেচি করলে তুলে দেবেন বলে ভয় দেখান।

কলকাতায় এদিক দিয়ে প্রচুর খোরাক ছিল। সামনে রাঙাবাবুদের বাড়ির জানলা ছিল মাত্র চার-পাঁচ হাত ব্যবধানে। কত লোক, তাদের কত আলোচনা,

সব কথার মানে না বুঝলেও আবছা-আবছা তাদের জীবনের একটা ছবি পড়ত মনে। ছাদে উঠলে তো কথাই নেই। একদিকে শটি ফুডের কারখানার তের-চোদ্দজন লোক তাদের সঙ্গে অফুরন্ত গল্প—অন্য দিকে এক এক বাড়িতে বহু বিচিত্র অধিবাসী—তাদের ঈর্ষা দ্বেষ শোক দুঃখ আনন্দর মেলা সাজিয়ে বসে আছে, বোঝা-না বোঝার মধ্যে সে এক অনন্ত কৌতুক ও কৌতূহলের উৎস। নিচের বস্তির কথাও অনেক কানে আসত—সেখানেও জীবনরসের অন্তহীন খোরাক। বেশির ভাগই ছিল ওর জ্ঞানবুদ্ধির অতীত, তবু তীরে বসে নদীর স্রোত দেখার আনন্দটা পেত, বহমান জীবনস্রোতের একটা অস্পষ্ট আভাস পেত, পেত বৈচিত্র্যের অপরিচিত আস্বাদ। আর সেই কুখ্যাত বাড়িটা —তার অজানা রহস্য নিয়ে—সে তো ছিলই।

এ ছাড়াও ছিল গোপন নিঃশব্দ সঙ্গী কিছু। মূক তাকে বলবে না বিনু, অন্তত এখন বলবে না। তাদেরও ভাষা ছিল, সে ভাষা ওর অন্তরে পেঁাছত। টব আর ক্যানেস্তারার গাছগুলো, বড় ফুটো হাঁড়িতে আনারসের গাছ। এখনও বেশ মনে আছে, স্পষ্ট দেখতে পায়। বেল ফুলের গাছ ছিল তিনটে, একটা মল্লিকা, একটা টগর, একটা শিউলি (গন্ধরাজটা মরে গিছল তাতে বামুনমা চাঁপা লাগিয়ে ছিলেন আগের বছর), দুটো মালসায় ছিল রজনীগন্ধা। সবচেয়ে ওর প্রিয় ছিল ঐ আনারসের গাছটা, আর একটা ক্যানেস্তারায় লেবু গাছ। লেবু হত না—কিন্তু ফল ধরত ফুল থেকে, তাতেই বিস্ময় উত্তেজনা আর আনন্দের শেষ থাকত না। একটা আনারস সত্যিই ফলেছিল ওর চোখের সামনে।

এরা ছিল বলেই নিঃসঙ্গতা ছিল না। প্রতিবেশীদের কথাবার্তা ঝগড়াঝাঁটি কিছু বুঝত না বিশেষ—এদের কথা বুঝত। ওর সীমিত মননশক্তির মধ্যে এরা ছিল অনেকখানি স্থান জুড়ে। এখানে এসে তাই কেবলই মনে হত সে মরুভূমিতে এসে পড়েছে, বহুজনের মধ্যেও সে নিঃসঙ্গ। ভাগ্যে মা এখানেও একটা টব আর মাটি কিনে একটা তুলসী গাছ বসিয়ে ছিলেন, বারান্দার পুব-দক্ষিণ কোণে ঐ শীর্ণ ক্ষুদ্র তুলসী গাছটুকুই তার জীবনের অবলম্বন, সঙ্গী মনে হত তবু। তার একটি একটি পত্রোদ্গমের আনুপূর্বিক ইতিহাস আজও ওর মনে আছে—নতুন আর দুটি পাতা বেরোবার জন্যে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা।

আনন্দ উত্তেজনা যে ছিল তা ওখানে থাকতে অত বোঝে নি, এখানে তার অভাবটা বুঝল, বুঝল অন্তরের পিপাসায়, শূন্যতায়। কিন্তু সেটা যে তবু কিছুই নয়—তা জানল আর মাস কতক যেতে। ঐ বয়সেই আর একটা অনুভূতিও ওর হল—তীব্র একটা বেদনা-বোধ। সে বেদনার আঘাতই ওর জীবনের ইতিহাসে প্রথম সচেতনতা—সে দুঃখ কাউকে বোঝাবার জানাবার ভাগ দেবার উপায় ছিল না বলেই আরও যেন দুঃসহ।

তবে সেদিন আঘাতটাই শুধু অনুভব করেছিল, কারণটা বুঝেছিল অনেক পরে—ঘটনাগুলোর পারম্পর্য ও তাৎপর্য মিলিয়ে।

পাড়ায় একজন মাষ্টার মশাই ছিলেন, শৌখিন ধরনের মানুষ, প্রবোধবাবু নাম। কোন্ ইস্কুলে তিনি পড়াতেন তা বিনু আজও জানে না, শুনেছিল ভদ্রলোক বি-এ ফেল। নিচের ক্লাসের দিকে পড়ান, টাকা কুড়ির মতো মাইনে পান—কিংবা আরও কম। পৈতৃক বাড়ি আছে, তার নিচের তলা থেকে টাকা

সাত-আট ভাড়া ওঠে, দিদিমারও কিছু টাকা পেয়েছেন—তাতেই শখ-শৌখিনতা বজায় দিতে পারেন। বিয়ে করেছেন—ছেলেপুলে হয় নি, সেই কারণেই কাপড় জামায় খরচ করেন খুব, ফুরফুরে ভাব। এই গলিতেই তিন-চারটে বাড়ির পরে থাকেন। এই পথ দিয়েই আসা-যাওয়া। পোশাকে-আশাকে কেশবিন্যাসে কতকটা প্রতিমার কার্তিকের মতো, মাঝে সিঁথি, দু দিকে সুবিন্যস্ত কোঁকড়া চুল, সরু গোঁফ, দাঁতও বেশ সাজানো, তবে পান খাওয়ার ফলে তার ঔজ্জ্বল্য অত বোঝা যায় না। মাঝারী গড়ন, উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ। মেয়ে মহলে বলত সুন্দর—কিন্তু বিনুর ভাল লাগে নি কোন দিনই।

যাওয়া-আসার পথ ঠিকই, কিন্তু দেখা গেল সে প্রয়োজনটা হঠাৎ বেড়ে গেছে। সময়ে-অসময়ে কারণে-অকারণে এই বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করেন। ওপরের বারান্দার দিকে তাকান, শিশ দেন! জামা-কাপড় এবেলা ওবেলা বদলাতে হচ্ছে—যা নাকি এখানকার জীবনযাত্রা ও ওঁর আয়ের সঙ্গে একান্ত বেমানান।

মা লক্ষ্য করেছিলেন বলেই বিনুর লক্ষ্য পড়েছিল। মা একদিন এক গাছা ঝাঁটা দেখিয়েছিলেন বারান্দা থেকে, তাও মনে আছে ওর, যদিও এ রূঢ়তার কারণ তখন বোঝে নি, অবাক হয়ে গিয়েছিল। তবে মার মুখের স্বভাববিরুদ্ধ উগ্র ভাব দেখে কোন প্রশ্ন করতেও সাহসে কুলোয় নি।

কিন্তু দেখা গেল প্রবোধবাবু একাই মহামায়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন নন। পালে-পার্বণে গঙ্গা স্নান বিশ্বনাথ দর্শন করতে যেতেন তিনি, বিশেষ একাদশীর দিনগুলো বাঁধা ছিল। ছেলেমেয়ে স্কুলে চলে গেলে বিনুকে খাইয়ে রাত্রের খাবার করে রেখে—দুবেলা উনুন জ্বালার বিলাস সম্ভব ছিল না—বেরিয়ে পড়তেন। বেলায় যাওয়ার একটা সুবিধাও ছিল—ঘাটে বা মন্দিরে ভিড় থাকত না বেশী।

দশাশ্বমেধের কাছে বাঙালীটোলার মুখে যে কালীবাড়ি—তার সামনে বড় রাস্তার কোণে একটা ছোট্ট মনোহারীর দোকান ছিল। যাঁর দোকান—তাঁর নাম বিজয়বাবু, বয়স বেশী নয়—এখন যে স্মৃতিটুকু মনে আছে—বোধহয় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে—তিনিও, দেখা গেল, দোকান ফেলে মার সঙ্গ ধরছেন। অকারণে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামেন, হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকেন ঘাট-পাণ্ডা সয়ুর পাটাতনের ধারে—আবার স্নান সারা হলে পিছু পিছু বা পাশাপাশি সঙ্গে সঙ্গে ওপরে ওঠেন। এক একদিন বিশ্বনাথের গলির মোড় পর্যন্ত সঙ্গে যেতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন একটা সাবানের বাক্সর মতো কি নিয়ে দোকান থেকে লাফিয়ে পড়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুখে এক ধরনের অর্থপূর্ণ হাসি, বললেন, 'দেখুন এটা বোধহয় আপনি সেদিন ফেলে গিছলেন। ঠিকানা তো জানি না, তাই পৌঁছে দিতে পারি নি। অপেক্ষা করছিলুম আবার কবে এদিকে আসেন—'

প্রায় পথ রোধ করেই দাঁড়ানো, তবু মহামায়া সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে মন্দিরের সিঁড়িতে দু ধাপ উঠে দাঁড়িয়ে কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'আমি বা আমার ছেলেমেয়েরা কেউ সাবান মাখি না, গন্ধ তেল সাবান এসেন্স কোন কিছুরই দরকার হয় না। বেশী হয় অন্য কাউকে দিয়ে দেবেন।'

চারি দিকে—হিন্দুস্থানী দইওলা, ছোটখাট পথে-বসা-ফলওলা-শাকওলার দল মুচকি হাসছে। এই গায়ে-পড়া কথোপকথনের উদ্দেশ্য ওদের অজানা নয়।

বিজয়বাবুও, বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে যেন বেশ মজা করেছেন এই ভাবের হাসির সঙ্গে 'অ-তাই নাকি' বলে আবার দোকানে গিয়ে উঠলেন।...

ব্যাপারটা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠল একদিন, যখন অকস্মাৎ এক পরিপাটী বেশভূষাধারিণী বিধবা মহিলা সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে দরজা ঠেলে আলাপ করতে এলেন। ভাল দেশী থান ধুতি, তার ওপর বেলদার চাদর, হাতে এক গাছা করে মোটা বালা, মুখে পাউডারের আভাস, চোখে সুর্মা (এসব পরে বুঝেছে বিনু, তখন চিনত না), নাকে একটি সূক্ষ্ম রসকলি।

মা ভুরু কুঁচকে চেয়েই রইলেন। দরজা খুললেও ভেতরে আসবার কথাও বলতে পারলেন না। একেবারেই অপরিচিত ব্যক্তির এমন আকস্মিক অভিযানে থতমত খেয়ে গিছলেন। নানা রকম কুটিল সন্দেহ ও বিপদের সম্ভাবনাও মনের মধ্যে ভিড় করে এসে পড়েছিল।

কিন্তু যিনি এসেছিলেন ভ্রূকুটিতে ভয় পাবার লোক তিনি নন, স্পষ্ট বিরক্তিও গায়ে মাখলেন না। অমায়িকভাবে হেসে বললেন, 'একটু ভেতরে ঢুকতে দেবেন না—দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই কথা কইব ? এতখানি সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে পাও ভেঙ্গে আসছে। বাতের দেহ তো, দু মিনিট না বসলেও পারছি না।'

অগত্যা ভেতরে আসতে দিতে হয়, আসনও পেতে দিতে হয় একটা। অন্য আসন আনা হয় নি, মা জপ-পুজোর জন্যে এখানে এসে একটা কুশাসন কিনেছিলেন, জন্মাষ্টমী শিবরাত্রিতে যে ব্রাহ্মণ কথা শোনাতে আসতেন, জল খাবার খেয়ে পারণ করতেন—তাঁকেও ঐ আসন পেতে দেওয়া হত। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেটাই পেতে দিতে হল। বিনুর মনে আছে মেয়েছেলেটি চলে যাবার পর মা অস্ফুট কণ্ঠে কী সব কটু কথা বলতে আসনটা গঙ্গা জলে ধুয়ে নিয়েছিলেন।

'আসি-আসি করে ভাই আসা আর হয়ে উঠছে না'—মহিলাটি আত্মীয়তার হাসি হেসে বললেন, 'ইদিকে গুরুদেব নিত্যি তাগাদা দিচ্ছেন, তাই বলি আর দেরি নয়—আজই যাব।'

'গুরুদেব ?' মা অবাক হয়ে বলেন, কি বলতে হবে তাও যেন ঠিক মাথায় যায় না।

'হ্যাঁ, নাম শোন নি ?' কী একটা প্রকাণ্ড গালভারি নাম করে বললেন, 'মস্ত বড় সাধু যে, হাজার হাজার শিষ্যি, কত জায়গায় মঠ মন্দির করেছেন, এদেশে খোট্টারা বলে বহুত ভারী মহাৎমা। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব দেখতে পান চোখের সামনে—রাত্তির বেলা আসনে বসলে দেব-দেবীরা এসে কথা বলেন ওঁর সঙ্গে। সব জানেন বলেই তো তোমার জন্যে এত ব্যস্ত, বলেন, মেয়েটা ভারী দুঃখী রে, বড্ড নাটাঝামটা খাচ্ছে সব দিক দিয়ে, ওকে ডেকে নিয়ে আয়। আমি ওকে দীক্ষা দিয়ে দিই, মনটা শান্ত হবে, এহ লোকের দায় দায়িত্বেরও সুরাহা হয়ে যাবে। এ তো তোমার পরম ভাগ্যি ভাই, কত লোক এসে দীক্ষা নেবার জন্যে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে, প্রভুর কৃপা হয় না।'

'তা আমি তো তাঁকে চিনি না। আমি, দুঃখী একথাই বা তাঁকে কে বললে ?' বিরস কণ্ঠে মহামায়া বলেন।

'অই দেখ! তবে আর বলছি কি! তিনি যে সাক্ষাৎ ভগবানের পর্শ পেয়েছেন, তাঁর কি কিছু জানতে বাকী থাকে। কার সুকৃতি আছে, ভাল আধার, জানতে পারলে তাঁকে সেই পর্শ দেবার জন্যে তাই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তিনি যে সব দেখতে পান আর তেমনি বুক-ভরা করুণা, যে যেখানে আছে দুঃখী ব্যথী—সকলের জন্যেই তাঁর প্রাণ কাঁদে যে! তাঁর দয়া হয়েছে যেকালে—আর দেরি নয়, গিয়ে পায়ে পড়, এহলোকে-পরলোকে কোন অভাব কি দুঃখ থাকবে না। উনি পরলোকেরও কাণ্ডারী—আবার এহলোকের অভাব-অভিযোগও ধর নিমেষে দূর করে দেবেন।...টাকা-পয়সা, চাই কি বাবুয়ানির ইচ্ছে হলেও—কোনটার জন্যে আটকাবে না। উনি মনে করলে এই ঘরখানা সোনায় বাঁধিয়ে দিতে পারেন, হুকুম করলে আকাশ থেকে হীরে-জহরৎ বিষ্টি হয় যে। এসব আমাদের চোখে দেখা। এই তো—বিশ্বেস না কর পাছে, পেত্যয় করবার জন্যে এই জড়োয়া বালাজোড়া আমার সঙ্গে দিয়ে দিলেন, বললেন, 'রেখে আয়, তাহলে বুঝবে আমার ছায়ায় এলে কোন কিছুর অভাব থাকবে না।'

এই বলে সত্যি সত্যিই মহিলা শেমিজের মধ্যে হাত গলিয়ে পাতলা তেল-কাগজে মোড়া এক জোড়া বালা বার করলেন। সোনার তো বটেই—কী সব রঙীন পাথর বসান—বিকেলের আলোতেই ঝকমক করে উঠল, বিনুর মনে হল চোখ ধেঁধে যাচ্ছে।

এবার মহামায়া উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ঢের হয়েছে। আমার দুঃখু দূর করার জন্যে তোমার গুরুদেবকে অত ব্যস্ত হতে হবে না। এখন উঠে পড় দিকি। আজ শুধু মুখের কথায় বিদেয় করছি—আবার কোন দিন এই রকম কুটনীপনা করতে এলে ঝ্যাঁটা খেয়ে যেতে হবে। স্যেৎখানার ঝ্যাঁটা তুলে রাখব।'

মেয়েছেলেটি মুখ অন্ধকার করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তোমার যা অভিরুচি। তবে এও বলে যাই, এ তেজ দম্প বেশী দিন রাখতেও পারবে না। এই আগুনের খাপরা চেহারা—কেউ তো ছেড়ে কথা কইবে না। শেষে কোন আঘাটায় গিয়ে পড়তে হবে, জাতও যাবে পেটও ভরবে না। এ-মানুষের কৃপা পেলে দিন কিনে নিতে পারতে!...সে বরাত চাই তো। হরিবোল, হরিবোল।'

বলতে বলতেই মহামায়ার চোখের দিকে চেয়ে যেন সামনে এক মহা-আগ্রাসী আগুন দেখেই ত্রস্তে ব্যস্তে বেরিয়ে গেলেন।।

এর পরের দিনটাই কি একটা পার্বণ পড়েছিল, মহামায়ার উপবাসের দিন। স্নান-দর্শনে যাবেন। বিনুকে নিয়ে যাবার কথা। বিনুরও মনে উৎসাহের অন্ত ছিল না। এই দিনগুলোতেই তার জীবনের রুদ্ধ বাতায়ন যেন খুলে যায়—দোকানপাট বাজার, মানুষের ভিড়ে সে একটা মুক্তির আস্বাদ পায়। কিন্তু আজ কোথায় একটা প্রাত্যহিক জীবন-ছন্দের মাত্রাচ্যুতি ঘটেছিল—সেটা পরিষ্কার না বুঝেও মনের মধ্যে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিল বিনু সকাল থেকেই। সকাল থেকেই লক্ষ্য করেছিল ও মার মুখে একটা কঠিন সংকল্পের দৃঢ়তা। দৃষ্টি প্রজ্বলন্ত, যেন কোন অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন। মহামায়ার পক্ষে এটা অস্বাভাবিক কিন্তু এখানকার পরিবেশে বার বার আঘাত খেয়ে ওঁকে শক্ত হতে হচ্ছে—এটা ঐ বয়সেই কেমন করে বুঝতে পেরেছিল বিনু। শুধু আজ কোথায় কি হবে সেইটেই ধরতে পারছিল না।

রান্না খাওয়ার পাট চুকিয়ে মহামায়া বললেন, 'বিনু বাবা, আজ একটু একলা থাকতে পারবি ? এই ঘণ্টাখানেক, যাব আর আসব। দরজা দিয়ে বসে থাকবি, আমার কি খুকীর কি দাদার গলা পেলে খুলবি ?…বেশী দেরি হবে না, আজ আর কেদার যাব না—চান করে বিশ্বনাথ দেখে ফিরে আসতে যেটুকু দেরি, এদিকে হাউজকাটরা দিয়ে বেরিয়ে আসব, বেশীক্ষণ লাগবে না।'

'তা আমিও সঙ্গে যাই না ?' বিনু ঠিক বুঝতে পারে না কথাটা।

'না রে, আজ বোধ হয় খুকী সকাল করে ফিরবে। কে যেন ওদের মরেছে—স্কুলের কে—প্রয়াগবাবুর বাড়ি বলাবলি করছিল কানে গেল। হয়ত এখুনি ছুটি হয়ে যাবে। যদি আসে কোথায় দাঁড়িয়ে থাকবে এতটা সময়—একা, তাই ভাবছি। তুই থাক না ?'

বিনু রাজী হয়ে গেল। একা থাকা এই প্রথম নয়। আগেও দু দিন এমন থেকেছে। একদিন তো মা-দাদা সকলে গিয়েছিল কী একটা ব্যাপারে, ফিরতে সন্ধ্যে উতরে গিয়েছিল, বিনু অন্ধকারে রেলিং ধরে প্রাণপণে রাস্তার দিকে চেয়ে মনে জোর রেখেছিল। আজ এ তো ভরা দুপুর, সবে বারটা।

মহামায়া কাপড় গামছা মটকার চাদর নিয়ে বেরিয়ে গেলেন অন্য দিনের মতো, ফিরলেনও এক ঘণ্টার মধ্যেই—কিন্তু তার গলার আওয়াজ শুনে লাফিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে কাঠ হয়ে গেল। এ কে। এ তো তার মা নয়।

মহামায়াও ম্লান হাসলেন। মনে হল সে হাসি কান্নারই রূপান্তর। ধরা ধরা গলায় বললেন, 'কী রে, চিনতে পারছিস না ?'

সত্যিই চিনতে পারে নি বিনু। মা ন্যাড়া হয়ে এসেছেন, সম্পূর্ণ মাথা কামিয়ে। সামান্য একটু পরিবর্তনেই তার অমন দেবী-প্রতিমার মতো মার চেহারা যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে—নিচের তলার ঐ বুড়িদের দলে চলে গেছেন, মনে হচ্ছে বয়সের অন্ত নেই।

রেশমের মতো উজ্জ্বল চুল, ঘন, কোঁকড়ান—পিঠ ভর্তি। খুলে দিলে দুর্গা প্রতিমার মতোই স্তরে স্তরে পড়ে থাকত। তেল মাখেন না, তবু কি কালো আর চকচকে। সেই চুল কামিয়ে এলেন মা।

একটা সামান্য ঘটনায় আঘাত এমনভাবে লাগতে পারে—এই জীবনে প্রথম বুঝল বিনু। কিসের আঘাত, কেন, তা বোঝার বয়স নয়, শুধু মনে হল বুকটায় কে যেন কি দিয়ে পিষছে, এখুনি বুঝি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে। যেন নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে—

সে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে আছড়ে গিয়ে বিছানায় পড়ল। অনেক দিন পরে এমন কাঁদল, বুক ফাটা কান্না। অনিবার, সান্ত্বনাহীন।

জল বুঝি মহামায়ারও চোখে এসেছিল। তার মধ্যেই কেমন যেন অপ্রতিভ-ভাবে, 'এই দেখ, ও কি রে। পাগল ছেলের পাগলামি দেখ একবার। ঐ জন্যেই তো তোকে নিয়ে যাই নি। জানি তো তোকে, সেখানেই কি শুরু করতিস তার ঠিক নেই।' বলতে বলতে ঘরে এসে ওর মাথাটা জোর করে তুলে ধরে বুকে টেনে নিলেন।

তাঁরও চোখের জল এবার আর বাধা মানল না।

ধারায় ধারায় বিনুর মাথায় ঝরে পড়তে লাগল।

এ কি মাথায় অমন চুলের জন্যই আক্ষেপ। না, আজ বোঝে বিনু—অপমান বোধ, আর নিজের এই অসহায় অবস্থার জন্য ক্ষোভ।

॥ ১২ ॥

এখানে আসার পরে একে একে দুচার জনের সঙ্গে মহামায়ার আলাপ হয়েছিল। তবে তিনি কোথাও যেতেন না বলে সে আলাপ অন্তরঙ্গতায় পৌঁছয়নি। সেটা হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগল। কিন্তু যারা তাঁর স্বভাব-সংকোচ বা আপাত-ঔদাসীন্য ভেদ করে এল, তারা এল কতকটা নিজের গরজেই, বেশির ভাগই দুঃখের সঙ্গী। তারা এল ব্যথার ভাগ দিতে, সমব্যথীর কাছ থেকে সহানুভূতি পাবার আশায়।

প্রথম ঘনিষ্ঠতা হল কমলা দিদিমাদের সঙ্গে। নিচে প্রয়াগবাবুদের অংশের একতলায় চারখানা ঘর—বাঙ্গালীটোলার বাড়ির একতলার মতো অন্ধকার আর স্যাঁৎসেঁতে নয়, তবে এও তিনদিক চাপা, পূর্বদিকে একটি করে এক হাত জানলা বা শুধুই শিকের দরজা—ঘরের আকার বুঝে। অত অন্ধকার নয় বলেই ভাড়াও বেশী। মাসে এক টাকা। এমন কি রাঙা দিদিমার ঘরখানার দু টাকা ভাড়া ছিল। তিনি আর তাঁর চেয়েও বয়সে বড় এক ননদ থাকতেন, দুজনের মিলিত মাসিক আয় ছিল ষোল টাকা, একজনের দশ আর একজনের ছ টাকা মনিঅর্ডার আসত—কাজেই এ ভাড়াও খুব একটা গায়ে লাগত না। রাঙাদিদিমা পাশের ঘরের ভাড়াটেদের শুনিয়ে বলতেন, 'না বাপু, সেই কথায় বলে না, খাই না খাই বুকে হাত দে শুয়ে থাকি—তা আমিও তাই বুঝি। মাসে দুটো একাদশী করি, না হয় ঐ সঙ্গে আরও দুদিন ওপোস করব—তাই বলে অন্ধকূপ-হত্যে হতে পারব না। দুটো পেরাণী থাকি, ঘোরাফেরা করতে দিনে দশবার ধাক্কা খাব—সে আমার পোষাবে না। একবেলা এক ঘণ্টা বিশ্বনাথ গেলুম সে এক রকম। দিনরাত ঘষটানি লাগবে চামড়ায় চামড়ায় অসহ্যি।' পরে বিনু মনে করে করে আন্দাজে যা হিসেবে পেয়েছে—অন্য ঘরগুলো হয়ত দশ বাই দশ, ওঁরটা বারো বাই দশ হবে।

এই আক্রা ভাড়াতেও বাড়িওয়ালা নাকি অত বড় ঘরটা—ঘরটা রাঙাদিদিমার মাপেরই ঘর হবে, জানলাওলা—মোটে এক টাকায় ভাড়া দিয়েছিলেন ; তাও নাকি সব মাসে আদায় হত না। তবে কমলা দিদিমাকে পালে-পার্বনে গতরে খেটে, অসুখ বিসুখে গিয়ে রান্না করে দিয়ে আসতে হত। কমলা দিদিমার (মহামায়া 'মা' পাতিয়েছিলেন সেই সুবাদে ছেলে মেয়েদের দিদিমা) হাতের রান্না চমৎকার। মানুষটার রূপের মাপেই যেন গুণ, বরং গুণের হিসেব দিতে গেলে অনেক বেশী হবে,—অফুরন্ত। যেমন চটপটে তেমনি পরিচ্ছন্ন। তেমনি তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও মিষ্টি হিসেব-করা কথাবার্তা। কমলা দিদিমার স্বামী সত্য মুখুজ্জ্যের যত না বয়স তত বুড়ো হয়ে পড়েছিলেন, বাষট্টি বছরেই মনে হত নব্বুই পেরিয়েছেন—এমনই স্থবিরত্ব এসে গিছল। তবু ঐ বিধবাদের পুরীতে উনিই একমাত্র পুরুষ এবং ব্রাহ্মণ বলে আশপাশের বাড়ি বা এদের এই ফ্ল্যাট থেকে পুজোআচ্চায় ওঁকেই ডাকতে হত—সধবা করতে বা একাদশীর কি সাবিত্রী-চতুর্দশীর ব্রতে কমলা দিদিমাকেও। তাতেই যা উপার্জন, সত্য দাদামশাইয়ের অন্য রোজগার ছিল না বিশেষ।

এই সংবাদেই মহামায়াও ডেকেছিলেন। বিশেষ কটা পূর্ণিমায় সিধে দেওয়া, ব্রত উপবাসের পারণে জল খাওয়ানো 'কথা' শোনানোর জন্যে ব্রাহ্মণ চাই। বাড়িওলার স্ত্রীই একদিন এসে ওঁর কথা বলে গিয়েছিলেন। তা কমলা দিদিমা মহামায়াদেরও দায়ে-অদায়ে দেখতেন। জ্বরজাড়ি হয়েছে খবর পেলে নিজে এসে সাবু বার্লি কি চালডাল আলু পোস্ত চেয়ে নিয়ে যেতেন, রান্না করে আবার পৌঁছেও দিয়ে যেতেন—তিন মহল পেরিয়ে তেতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে।

সে বাবদে নগদ কোন পারিশ্রমিক নিতেন না, মাকে অন্য রকমে পুষিয়ে দিতে হত।

এঁরও দুঃখের কান্না ছিল বৈকি। কলকাতার কোন ছাপাখানায় নাকি চাকরি করতেন সত্যবাবু, মাসে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা রোজগার ছিল। পরপর দুবার নিমোনিয়া একবার টাইফয়েড হয়ে অমনি অথর্ব হয়ে পড়েছেন, হাত ধরে ওঠালে তবে উঠতে পারেন—এমন অবস্থা। দেশেঘাটে কেউ নেই, যা জমি আছে তাতে চলবে না, সেই বা দেখে কে। আর সেও—জ্ঞাতিরা দীর্ঘকাল ভোগ করছে তারা কি সহজে ছাড়বে? কাশীতে সস্তাগণ্ডা, অন্নপূর্ণার রাজত্বে অন্নের অভাব হবে না, এইসব আশ্বাসেই কাশী এসেছিলেন, কিন্তু এখানে এক দোকানে খাতা লেখার পাঁচ টাকার চাকরি ছাড়া কিছু জোটাতে পারেন নি। তাও অর্ধেক দিন হাজরে দিতে পারেন না, তারা মাইনে কাটে, কোন মাসে দুটাকা কোন মাসে আড়াই টাকা পান। দিদিমাকেই যোগেযাগে চালাতে হয়।

তবু, তাঁকে ঠিক দুঃখী বলা চলে না, দুঃখ-বিজয়িনী বলাই উচিত। দুঃখী হল আর দুটি মেয়ে—যাদের এমনি কোন অভাব অভিযোগ থাকার কথা নয়, বাইরে থেকে দেখলে যাদের ঈর্ষাই করবে অপর মেয়েরা।

এরা অবশ্য একদিনে মনের দোর খোলে নি, খোলা সম্ভব নয়। সংকোচ ছেড়ে আসা-যাওয়া করতে করতে মার সহানুভূতিতে তাদের লজ্জার বরফ গলেছে দুঃখের বোঝা নামিয়ে কেঁদে শান্তি পেয়েছে। আজ বিনুর যেমন অখণ্ডভাবে সবটা মনে পড়ছে—তাদের ইতিহাস, তাদের বেদনা ও হাহাকার—সেভাবে জানে নি, বোঝেওনি। ছ'সাত বছরে জেনেছে, একটু একটু করে, অনেকদিন পরেও জেনেছে পরিসমাপ্তি বা পরিণাম, মার সঙ্গে বা একান্তে, যখন বেশী বয়সে কাশীতে এসেছে—তখন যেটুকু জেনেছে সেটুকু জড়িয়ে এই পরিপূর্ণ কাহিনীগুলো গড়ে উঠেছে, তাদের দুঃখের বিপুল চেহারাটা দেখতে পেয়েছে।

প্রথমেই আজ যার কথা মনে আসছে—সে বাড়িওলা নন্দ মুখুজ্জের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ—রাধারাণী বা রাধা।

এরা এবাড়ি আসবার মাস কতক পরে একদিন দুপুরবেলা—কী একটা উপবাসের দিন ছিল সেটা—মা স্নান-দর্শনে যান নি, রান্নাবাড়া সেরে দুপুরবেলা রোদে পিঠ দিয়ে বসে ছিলেন। কলে জল এলে উঠে বাসন মাজা ঘর-বারান্দা মোছা সেরে আর একবার স্নান করবেন। হঠাৎ অসময়ে কড়া নড়তে একটু যেন ভয়ে ভয়েই উঠে এসেছিলেন, 'কে' প্রশ্নের উত্তরে নারীকণ্ঠে 'আমি দিদি, আমি রাধা' শুনেও খুব আশ্বস্ত হতে পারেন নি। ভুরু কুঁচকে মুখভাব যথাসাধ্য কঠোর করেই দোর খুলেছিলেন, এ আবার নতুন কোনো আক্রমণ কিনা এই আশঙ্কায়, যদিও মাথা কামাবার পর ঐ ধরণের উপদ্রব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল

একেবারেই। মহামায়া আর চুল বড় করতে দেন না, দুমাস তিনমাস অন্তরই ঘাটে গিয়ে ইঁটপাতা নাপিতের কাছে কামিয়ে নেন একবার করে।

কিন্তু দোর খুলতে যা বা যাকে দেখলেন—আর যাই হোক তা দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এক অপূর্ব সুন্দরী পূর্ণ-যৌবনা অল্পবয়সী মেয়ে। বিবাহিতা—সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে চুড়ির কোলে শাঁখা লোহা দুইই আছে। কিন্তু ঐ চারগাছা করে চুড়ি আর একটি সরু ঘষাগোটহার বাদ দিলে সম্পূর্ণ নিরাভরণ, পরণেও কালাপাড় শাড়ি—গিন্নিবান্নি ধরনের।

বিনুও মার সঙ্গে সঙ্গে দরজা অবধি এসেছিল। অবাক সেও হয়েছে। এমন রূপ সে আগে দেখে নি, তার তখনও পর্যন্ত জানার জগতে অন্তত এমন চেহারা চোখে পড়ে নি। সরস্বতীও সুন্দরী ছিল তবে এর কাছে লাগে না।

'রাধা' নামটা শোনা ছিল মহামায়ার—নতুন পাতানো মা কমলার কাছেই শোনা। এখন চেহারাতেও মিলিয়ে পেলেন। নামই শুধু নয়, ইতিহাসও কিছু কিছু শুনেছেন বৈকি! কণ্ঠস্বর আপনিই কোমল হয়ে এল, 'এসো ভাই এসো, দাঁড়াও মাদুরটা পেতে দিই—'

'না না দিদি, আমি এই মেঝেতেই দিব্যি বসতে পারব। পুঁছে পুঁছে যা চকচকে করে রেখেছেন মেঝে, আয়নার মতো—মুখ দেখা যায়। কারুক্কে আমি বাড়িঘর এত পোস্কার রাখতে দেখি নি। অসময়ে এসে বিরক্ত করলুম না তো দিদি?' বলতে বলতে সত্যিই সে মেঝেতে বসে পড়ল।

'না না, অসময় কি—এইতো দুপুরের দিকটাই সময়। আজ তো এমনিতেই উপোস—অবিশ্যি হ্যাঁ, এই উপোসের দিনগুলোতে প্রায় দর্শনে যাই এ সময়টায়—তা আজ আর হল না, বাধা পড়েছে। তবে সে গেলেও আমার মেয়ে থাকত অবিশ্যি। আমার এই পাগলা তো আমার সঙ্গেই যায়।'

এই প্রথমপালা সম্ভাষণের পর দুজনেই মিনিট দুই চুপ করে রইলেন। রাধা ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছিল, কিন্তু তারপর এখন কি কথা দিয়ে বার্তা শুরু করবে সে খেইটা মনের মধ্যে ধরতে পারছিল না। একেবারে প্রথম পরিচয়ে ঘরের কেলেঙ্কারি পরের কাছে বলা উচিত হবে কিনা সে সংশয় ও সংকোচটা তখনও তার ছিল, মানসিক এত বিপর্যয় সত্ত্বেও।

ওর অবস্থা মহামায়ার জানা বৈকি। শুনেছেন—এবং মনেও আছে। মনে আছে আরও নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যেই, এর দুঃখ ব্যথার বিপুলতা কিছুটা অনুভব করতে পারেন। তবু তো তিনি কিছু পেয়েছেন, তিনটে সন্তানও হয়েছে। এ যে কিছুই পেল না, পাবার সমস্ত রকম যোগ্যতা ও আয়োজন সত্ত্বেও।

রাধা বাড়িওলা নন্দ মুখুজ্জের পুত্রবধূ। নন্দ মুখুজ্জের কিন্তু এই একটিই ছেলে, কেষ্ট—সে যদি শুধু কেষ্ট অর্থাৎ কালোই হত তো কিছু বলবার ছিল না, নন্দবাবুর চেহারার, কিছুই পায় নি, সবটাই মায়ের মতো হয়েছিল। বেঁটে চেহারা, তেমনি বিশ্রী মুখ।

দেখতে ভাল নয় বলে একমাত্র সন্তানের আদর কম হবে তা সম্ভব নয়। প্রথম বয়সে পর পর দুটি মেয়ে হয়ে মারা যাবার পর অনেকদিন ছেলেপুলে হয়নি, বলতে গেলে শেষ বয়সে নেওয়া 'পুষ্যি', ফলে আরও বেশী আদর পেয়েছে সে চিরকাল। পয়সার অভাব যেখানে নেই—সেখানে একমাত্র ছেলে চাঁদ হাতে

ধরতে চাইলেও মা বাবা মরি-বাঁচি করে একবার চেষ্টা করে দেখতেন হয়ত। তবে চাঁদ সে চায় নি—চাইল চাঁদের মতো বৌ একটি! এক নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে ছ'বছরের কেষ্ট পাঁচ বছরের ফুটফুটে রাধাকে দেখে বলে বসল, 'ওকে আমি বৌ করব।'

অন্য দুঃসাধ্য প্রস্তাব হলেও তাঁরা রাজী হলেন—এ প্রস্তাবে রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে উঠলেন কর্তা ও গিন্নী—দুজনেই। ছেলের এ আবদারে তাঁদের সায় শুধু নয়—সাধও জাগল। নতুন সাধ নতুন পথে চরিতার্থ হতে পারবে। বালক ছেলে, শিশুই ভাবতেন তাঁরা, আর বালিকা বধূ নিয়ে ছেলেখেলা পুতুল-খেলার সাধ মিটবে।

বাধা ছিল না, সজাতি, পালটি ঘর। রাধা ঠিক হাঘরের মেয়েও নয়। দেশে বেশ কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল তাঁদের।

সুন্দরী মেয়ে এই বয়সেই ঐ রকম একটা ঘটোৎকচ মার্কা ছেলের হাতে দেবার ইচ্ছা ছিল না মায়ের। লেখাপড়া কিছু শিখবে কিনা তার ঠিক নেই, বাপ-মায়ের যা অতিরিক্ত প্রশ্রয়—হবার কথা নয়, এরপর যদি অমানুষ হয়ে ওঠে! কিন্তু মেয়ের বাবা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলেন না, তাঁর তিনটি মেয়ে দুটি ছেলে, মেয়েদের বিয়ে দেওয়া তাদের লেখাপড়া শেখানো—সবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। দেশ থেকে যে পরিমাণ টাকা আসার কথা তা আসছে না। এ বয়সে নতুন কোন উপার্জনের পথ খুঁজবেন—সে সম্ভাবনা নেই, যোগ্যতাও নেই কিছু।

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে চিন্তা করছেন—বহুদর্শী বিচক্ষণ নন্দ মুখুজ্জে ঝোপ বুঝে কোপ মারলেন। মেয়ের মার কাছে গিয়েই প্রস্তাব দিলেন, তাঁদের এক পয়সাও খরচা লাগবে না, গা ভর্তি সোনা আর জড়োয়া গহনা দিয়ে ওঁরাই সাজিয়ে নিয়ে যাবেন; দান-সামগ্রী খাট বিছানা কিছুই লাগবে না। এর পর ভবিষ্যৎ ভেবে রাধার মাও আর না বলতে সাহস করে নি।

রাধারও খারাপ লাগে নি। রূপ কি যোগ্যতা ভবিষ্যতের চিন্তা, এসব ওর সে বয়সে মাথায় যাবার কথা নয়। ঐটুকু মেয়ে এই সমারোহ ও আদরটাই বুঝেছিল। পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো মারপিট দাঙ্গা করেছে, খেলা করেছে, মার কোলে বসার অগ্রাধিকার কার—তা নিয়ে ঝগড়া, বাবার কাছে নালিশ করেছে —মা বাবার ভালবাসার ভাগ নিয়ে মান-অভিমান করেছে। খেলায় সাথী হিসেবেই মানুষ হয়েছে ওরা, কেষ্টও সেইভাবেই নিয়েছে, তারও খারাপ লাগেনি তখন।

কিন্তু কেষ্ট আবদার ধরেছিল, তার বয়সে সেটা স্বাভাবিক—নন্দবাবুর একটা কথা ভেবে দেখা উচিত ছিল যে রাধার যখন ষোল বছর বয়স হবে তখন সে পূর্ণ যৌবনা, সতেরো বছরের কেষ্ট তখনও হয়ত স্কুলের ছাত্র থাকবে, দৈহিক বয়স তার যাই হোক, মনের দিক থেকে সে কিশোর থাকবে তখনও। বিশেষ রাধা স্বাস্থ্যবতী, তেরো বছরেই তাকে ষোল বছরের মতো দেখাত। তখন কেষ্ট ক্লাস সেভেন-এ পড়ছে, একবার ফেল করেছে অবশ্য, না হলেও ক্লাস এইটে উঠত। তার সঙ্গীসাথী কারও বিয়ে হয় নি—তাদের বিয়ের কথা কারও কল্পনাতেও যায় নি। তারা এই বৌ আর বিয়ে নিয়ে ঠাট্টা তামাশায় ধিক্কারে কেষ্টকে পাগল করে দিত। এক একদিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত সে—লাঞ্ছনায়

রাগটা পড়ত বেচারী রাধার ওপর গিয়ে। তাকে এই বয়সেই দুড়দাড় মার লাগাত, 'মুখপুড়ী, কেন এলি—কি জন্যে এসেছিলি' ইত্যাদি বলে।

সেই শুরু। কেষ্টর মা আর একটি ভুল করলেন—তেরো বছরের রাধা যৌবনে টলমল করছে দেখে তিনি ওকে স্বামীর বিছানায় শুতে পাঠালেন। প্রথম বছর চার পাঁচ ওরা তাঁর সঙ্গে বড় খাটে শুত, কখনও পাশাপাশি, কখনও বা দু পাশে দুজন, মধ্যে মা। বছর দুই হল—এটা অশোভন এ জ্ঞান তাকে কে দিয়েছে কে জানে—কেষ্ট তার ঘরে আলাদা শোবার ব্যবস্থা করেছে। সেখানে রাত্রে বধূকে পাঠানোর অর্থ খুব পরিষ্কার। লক্ষ্মীরাণীর মনের মধ্যে সে ইচ্ছাও হয়ত ছিল, তাড়াতাড়ি একটা নাতি-নাতনী হয়ে গেলে মন্দ কি। বহু সন্তানের অপূর্ণ সাধও মেটে তাঁর।

কেষ্টর এসব চিন্তা বা বিবেচনার বয়স নয়। অকস্মাৎ একদিন সালংকারা সুসজ্জিতা বধূবেশিনী রাধাকে এক গ্লাস দুধ হাতে রাত্রে ঘরে আসতে দেখে কেষ্ট জ্বলে উঠল একেবারে। এ আসার অর্থ সে বুঝেছে—তার সহপাঠী বন্ধুরা আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে—ওদের দাম্পত্য-লীলার গল্প শোনার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছে। শুনতে শুনতে কেষ্টর কালো মুখ বেগুনি হয়ে উঠত—সেই সঙ্গে এই সর্বজন-ঈপ্সিত রসাস্বাদনের সাধও হয়ত জাগত, যা তখনও পর্যন্ত আবছা অস্পষ্ট ওর মনের মধ্যে—কিন্তু তার সঙ্গে রাধাকে মেলাতে পারত না। ওর কথা ভাবতে গেলেই মনে হত শুধু বোনই নয়—দিদি। সে তাই এই বিশেষভাবে ঘরে আসার ইঙ্গিতটা বুঝেই এরকম দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে রাধাকে—'যা যা, কে পাঠিয়েছে এখানে, মা? মার ঐরকম বুদ্ধি। যা দূর হয়ে যা বলছি, যেখানে শুচ্ছিলি সেখানেই শুবি।'

তবু তখনও নন্দবাবু লক্ষ্মীরাণী কি রাধা কেউ অত ব্যস্ত হন নি। কিন্তু এক সময় রাধা যখন ষোল বছরে পড়ল, তখন আর সে কিছুতেই কোন সান্ত্বনা পায় না কি শান্ত হয় না। পূর্ণ যৌবনে টলটল করছে সে, সাধারণ হিসেবে তাকে কুড়ি বছরের মেয়ে বলে বোধ হয়। সে যে দৈহিক কামনায় ছটফট করছে, সে কামনা দেহের পাত্র উপছে পড়তে চাইছে—দুকূলপ্লাবী বন্যার চিহ্ন তার চলনে বলনে কথায় চাউনিতে—তা এদের কারও বুঝতে বাকী থাকে না।

ছেলের যে লেখাপড়া আর হবে না, তাও তাঁরা বুঝেছেন। তিনবার ক্লাস এইটএ ফেল করেছে সেও আর ইস্কুলে যেতে চায় না, মাষ্টার মশাইরাও নিষেধ করেছেন লেখাপড়া শেখার চেষ্টা করতে। বিড়ি সিগারেট—ওঁদের ভাষায় 'বার্ডসাই' খেতে শিখেছে, সন্ধ্যেবেলা সিদ্ধি খায় একটু তাও টের পেয়েছেন এঁরা। এখুনি সংসারে বাঁধতে না পারলে গাঁজাগুলি বা মদ ধরবে হয়ত। লেখাপড়া শেখা যেজন্যে দরকার তা ওর নেই। চাকরি করতে হবে না। এসব কথা নন্দবাবু অনেকদিনই ভেবে দেখেছেন—তিনি যা রেখে যাবেন তাই নাড়াচাড়া করলে খেতে পারলে যথেষ্ট। ভাড়া যা ওঠে তাতে কাশীতে একটা বড় পরিবারও চলবে, এছাড়াও ওঁদের হাতে নগদ টাকা বা কোম্পানীর কাগজ যা আছে তাও ও-ই পাবে, ছেলে মেয়ের বিয়ের জন্যে বাড়ি বেচতে হবে না। লক্ষ্মীরাণী পাড়াঘরে কিছু কিছু বন্ধকী কারবার করেন, ছেলে যদি সেটুকুও বজায় দিতে পারে, সে-ই অনেক লাভ। আর যদি কিছু না পারে—একটা একটা করে বাড়ী

বেচে খেতে খেতে ওর জীবন কেটে যাবে।

সুতরাং এখন যেটা দরকার ওঁদের নাতি নাতনীর, ঘরের দিকে ছেলের টান। তাতেই ওঁরা খুশী। বিষয়-আশয়গুলো বুঝে নিক, সংসার চালাতে শিখুক।

তবে সে জন্যে আগে দরকার ঘরমুখো হওয়ার। না হলে বন্ধু-বান্ধব বা মোসাহেবের যে দলটি জুটেছে—বোকা ছেলেটাকে অধঃপাতে নিয়ে যেতে তাদের বেশী দেরি হবে না।

একটু চেপে-চুপেই ধরলেন ওঁরা এইবার। কিন্তু দেখা গেল ঘরবাসী হতে ওর আপত্তি নেই, তার প্রধান উপকরণ সম্বন্ধেও যথেষ্ট ঔৎসুক্য জেগেছে এই বারে—কিন্তু ওঁরা যাকে ঠিক করে রেখেছেন তাকে নিয়ে ঘরবাসী হতে ও পারবে না। ওর সাফ কথা।

বকা-ঝকা, কান্নাকাটি, অনুযোগ—কিছুতেই কেষ্ট রাজী হল না বৌকে পাশে নিয়ে শুতে। এঁরা জোর ক'রে রেখে এলে মারধোর করে, গলাধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দেয়। ফলে চেঁচামেচি কান্নাকাটি—কিছু কিছু গালি-গালাজ—সে এক ইতরকাণ্ড। এই ছ' মহলা বাড়ির এত ঘর ভাড়াটে সবাই বাঙালী। উচ্চারিত বাক্যেই অনুক্ত বা অশ্রুত কথাগুলোর অর্থ বুঝতে পারেন তাঁরা। ঘটনাটার অভাবনীয়ত্ব তাঁদের কাছে 'রগড়' বা 'মজা'। তা নিয়ে কৌতুক বোধ করবে, কৌতূহলী হয়ে উঠবে সে স্বাভাবিক।

তবু এঁরা ঠিক মজা উপভোগ করতে চাইলেন না, বরং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে ব্যাপারটার মীমাংসা করতে চেষ্টা করলেন। বুঝিয়ে বলতে গেলেন মেয়েটার অবস্থা, তার ভবিষ্যৎ। হিন্দুর মেয়ে, তালাক কি ডিভোর্স হয় না, তাছাড়া কেষ্টই তাকে পছন্দ করে জেদ করে ঘরে এনেছে। নইলে এত অল্প বয়সে তো তাঁরা বিয়ে দিতে চান নি। সুন্দরী মেয়ে, কত ভাল ঘরে বিয়ে হতে পারত। ওর বোনেদের ভাল বিয়ে হয়েওছে, দুজনেই লেখাপড়া জানা, ভাল চাকরে।

যে যতই বলুক—কেষ্ট সেই একবগ্‌গা ঘোড়ার মতো—এদের ভাষায় 'শিরতেড়া'—ঘাড় বাঁকিয়ে মুখ গোঁজ ক'রে বসে থাকে। অবশ্য এরাও নাছোড়বান্দা—শেষ পর্যন্ত অনেক দিন পরে এদের কাছেই মন খুলল। কাউকে বলে, 'ওকে আমার দিদি মনে হয়', কাউকে বলে, 'ওকে দেখলে ভয় করে'। শেষে স্পষ্টই বলে দিলে, 'ওঁরা জোর করেন, পাশে নিয়ে শুতে পারি—তবে ওঁরা যা চাইছেন তা পারব না। ছেলেপুলে হবে না পরিষ্কার কথা। ওকে বৌ বলে ভাবতে পারব না।...আর সে ক্ষেত্রে আমাকে বাইরে যেতে হবে, আমার শরীরের ধর্ম তো একটা আছে। আমাকে কি ওঁরা রেণ্ডী-মহল্লা ডালকো-মণ্ডীতে ঠেলে দিতে চান?

এই শেষ কথাটাতেই কাজ হল। নন্দবাবু ও লক্ষ্মীরাণী দুজনেই ভয় পেয়ে গেলেন। তবু আশা ছাড়েন নি, বছর দুই আরও বসে রইলেন চুপচাপ, যদি ছেলের মতি ফেরে এই ভরসায়। পূর্ণ-যৌবনা রূপসী বৌ চোখের সামনে নিত্য ঘোরাফেরা করছে, এক বাড়ি এক দোর—যদি কোন দিন মতি বদলায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন ছেলে সত্যিই বন্ধুদের বাড়ির নাম ক'রে বাইরে রাত কাটাতে শুরু করল তখন লক্ষ্মী আড় হয়ে পড়লেন, 'ছেলের আবার বিয়ে দোব, তুমি ঘটক দ্যাখো—'

মেয়ে পাওয়াও গেল—কেষ্ট যেমন চাইছিল—ছিপছিপে ছোটখাটো সুশ্রী মেয়ে, রংটাও উজ্জ্বল, একমাথা চুল অর্থাৎ সুন্দরী বলাই উচিত। গোরখপুরের মেয়ে, ইস্কুল-মাষ্টার বাপের তেরোটি সন্তানের একটি—ছেলের বাপ এক পয়সাও নেবেন না শুনেই রাজী হয়ে গেলেন। কথা হল কাশীতে আর ঘটা করবেন না, নন্দর এক শালী থাকে এলাহাবাদে—সেখানেই বৌ-ভাত সেরে চুপিচুপি এখানে ফিরবেন।

রাধা প্রথমটা খুবই কান্নাকাটি, মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি করেছিল—কিন্তু লক্ষ্মীরাণী যখন ওঁর হাত ধরে কাঁদতে লাগলেন, বললেন, 'আমার বংশ থাকবে না যে মা, নইলে এ-কাজ করতুম না'—তখন আর না বলতে পারল না। দীর্ঘকালে শাশুড়িকেই মা বলে জেনেছে, ভালও বেসেছে। নন্দবাবু একখানা গোটা বাড়ি ওকে দানপত্র ক'রে দিলেন এখনই—তিনতলা মিলিয়ে চল্লিশ টাকার মতো ভাড়া ওঠে—বলে দিলেন, 'আমি যতদিন আছি, ওর খাজনা কি মেরামতির জন্যে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না মা, তারপর অবিশ্যি কেষ্টর বিবেচনা।' সেই দলিল আর গয়নার বাক্‌স দিয়ে ওকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে ওঁরা ছেলে নিয়ে গোরখপুরে রওনা হলেন।

এসব শুনে ছিলেন মহামায়া, কমলাদিদিমা'র কাছে। এছাড়াও—রাঙাদিদিমা, তাঁর ননদ, পাশের ঘরের গোসাঁই গিন্নি, প্রয়াগবাবুর মা—এঁরাও আসেন আজকাল মধ্যে মধ্যে। মহামায়া যান না, তা নিয়ে অনুযোগ করলে হাতজোড় ক'রে বলেন, 'একলা এক হাতে সংসার, জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—দেখছেন তো, একদম সময় পাই না। যেটুকু বা বিকেলে কাজ কম থাকে, ছেলেটার মেয়েটার পড়াও তো একটু দেখতে হয়।'

অগত্যা, মহামায়া যান না বলেই এঁরা আসেন, এক আধ দিন না এসে পারেন না। নতুন লোককে এসব খবর দেবার তাগিদ তো আছেই, তাছাড়াও এঁদের অস্তোন্মুখ মৃত্যু-প্রতীক্ষারত জীবনেও দুঃখ-বেদনা আছে; কারও ছেলে ভাল, বৌ খারাপ, কেউ বা পরের মেয়ের তত দোষ দেখতে পান না, আসলে তাঁর ছেলেই বদ, কুলের মুষল, মহাকঞ্জুষ, হাত দিয়ে এক পয়সা বেরোয় না, মার খরচাই 'বড্ড' হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাজে খরচা—মা মলে হরির লুট দেয়; এসব কথাও আলোচনা হওয়া দরকার, শুধু নিজের মনে বহন করলে তো জগদ্দল পাথরের মতো ভারী বোধ হয়। রাঙামাসীর নিজের টাকার সুদ আসে—সে চিন্তা নেই, কিন্তু অন্য অভাব আছে। কেউ কোন দিন খোঁজ খবর নেয় না। 'একখানা এক পয়সার পোষ্টকার্ড লিখে উদ্দিশ করে না' সে দুঃখও কম না। তাছাড়াও আছে। প্রাধান্য নিয়ে নিজের বাপের বাড়ির শ্বশুরবাড়ির আভিজাত্যর স্বীকৃতি নিয়ে তুচ্ছ তুচ্ছ মান অভিমান—কল সরবার অগ্রাধিকার—কে কার আগে কাকে নেমন্তন্ন করেছে সে অমর্যাদাবোধ—নানা কারণে কলহ-কেজিয়া—এসব কথাও কোন নিরপেক্ষ—নীরব বলেই তাঁরা ধরে নেন নিরপেক্ষ—শ্রোতাকে শোনানো প্রয়োজন।

ওঁরা এসে নিজেদের কথার ফাঁকে ফাঁকে বাড়িওলাদের এ কেচ্ছা কিছু শোনাবেন না—তা সম্ভব নয়। মহামায়া তাই এ পর্যন্ত একটু একটু ক'রে সমগ্র চিত্রটাই পেয়েছেন—যেটুকু শোনেন নি, সেটুকুও শোনাল রাধা। বলতে

বলতে কখনও হাউ-হাউ ক'রে কাঁদে, কখনও নিঃশব্দে—কিন্তু তার চোখের জলের ধারা কখনও বন্ধ হয় না।

এঁরা টাকাকড়ি দিয়ে, বাড়ি লিখে দিয়ে ভবিষ্যতের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন—অর্থাৎ ভবিষ্যতের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা—কিন্তু একটা কথা কেউ ভেবে দেখেন নি, অথবা ভাবতে গেলে এঁদের চলত না বলেই চোখ বুজে ছিলেন ওদিকটায় ; খাওয়া-পরা ছাড়াও মানুষের কিছু প্রয়োজন আছে—বিশেষ অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের। রাধা যে কেষ্টকে ভালবেসে ফেলেছে এই দীর্ঘ দিনে—কেষ্ট ছাড়া অন্য কিছুতে তার সুখ বা শান্তি নেই, একথাটা অবশ্যই ওঁরা জানতেন—কিন্তু ওঁদের বংশধর চাই, সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যৌবনধর্মের কথা ভাবা দরকার ; রাধা স্বামীকেই চায়, মনে-প্রাণে—সমস্ত অন্তরের ঈপ্সা বা তৃষ্ণা ঐ একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত। স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক সম্পর্ক না থাক, একটু সান্নিধ্য পেলেই সে কৃতার্থ বোধ করে। সেই কথাই বলতে এসেছিল একদিন, কিছুদিন পরে যন্ত্রণা অসহ্য হওয়াতে—আরও যন্ত্রণা 'কাটাঘায়ে নুনের ছিটের মতো' একা বাপের বাড়িতে সকলের সহানুভূতির পাত্র হয়ে থাকা—এমন তো দুই বৌ নিয়ে কতজন ঘর করছে, এই কাশী শহরে এমন দৃষ্টান্ত অনেক, যেমন মার কাছে ছিল তেমনিই থাকবে, কাজকর্ম করারও তো লোক দরকার, না হয় মজুরণী ছাড়িয়ে দিন ওঁরা, সে বাসন মাজা ঘর মোছা সব করবে—একটু শুধু এই বাড়িতে থাকতে চায়—তাতে আপত্তি কি ?

আপত্তি নন্দ মুখুজ্যে বা লক্ষ্মীরাণীর আদৌ ছিল না, প্রকৃতপক্ষে রাধা চলে যাওয়াতে ওঁদের অসুবিধেই হচ্ছিল, তাছাড়াও এতকাল মেয়ের মতো ছিল, ভালবাসা না হোক একটা মায়া পড়ে যাবে বৈকি ! তাঁরা সাগ্রহে রাজী হচ্ছিলেন—ফোঁস ক'রে উঠল সত্যভামা—'ইস ! তা আর নয়। তার কম আর নেশা জমবে কেন ! ঝি ! অমন ঢের ঝি দেখেছি শুনেছি। ছুঁচ হয়ে ঢোকে ফাল হয়ে বেরোয়। আজ ঝি কাল রাজ্যেশ্বরী হয়ে বসবে। ওঁদের তো ঐ বৌই বুকের মণি—সে কি আর আমি বুঝিনি এতদিনে—সে ওঁদের কথাবার্ত্তারাতেই দিবেরাত্তির টের পাচ্ছি—ওঁরা তো রাজী হবেনই—তবে আমি তা হতে দিচ্ছিনি, সাফ কথা। অত রস চলবে না, বাপ-মা সতীন আছে জেনেও বে দিয়েছিল সে বৌকে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করা হয়েছে এই কথা দিব্যি গেলে বলাতে। সতীনকাঁটা নে ঘর করব—তেমন মেয়ে আমি নই। ও বৌ যদি এসে ফের জেঁকে বসে—এই আমি সোজা বলে দিচ্ছি—আগে আঁশবঁটি দে তোমাকে কাটব, তারপর ঐ বুড়োবুড়ির নাককান কেটে সোজা থানায় চলে যাবো, বলব, হ্যাঁ, খুন ক'রে এইচি কী করবে করো আমার !'

ঐটুকু মেয়ে, ওঁরা বলেছিলেন ষোল—এখন নন্দবাবুর মনে হয়, বানখুরে গড়ন, আঠারোর কম নয়, হয়ত বা কেষ্টর এক-বয়িসীই হবে—কিন্তু একটি আস্ত ভীমরুল। কেষ্ট যে কেষ্ট সেও যেন কেঁচো হয়ে গেছে। ওঁদেরও এ মেয়েকে ঘাঁটাতে সাহস হয় না, মনে হয় এ সব পারে। তাঁরা সেই জন্যেই রাধাকে অভয়-আশ্বাস কিছু দিতে পারেন না, দিতে সাহস করেন না। রাধাও নিজের জন্যে যত না হোক, স্বামী ও শাশুড়ির অমঙ্গল আশংকায় ম্লান মুখে ফিরে আসে।...

এই রাধার জন্যেই মহামায়ার সবচেয়ে বেশী দুঃখ চিরদিন—এটা বিনুর মনে আছে। অভাগী মেয়েটার ইতিহাস দিনে দিনেই রচিত হয়েছে, তার কিছু রাধার মুখে, কিছু অন্যের মুখে, কিছুবা নিজের কানেই শুনেছে ওরা।

রাধা স্বামীর জন্যে পাগলই হয়ে গেছে বলতে গেলে—ক্রমে ক্রমে। শেষের দিকে পাগলের মতোই এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরে বেড়াত, বলত, 'আমায় আজ দুটি খেতে দেবে ?' ওর নিজস্ব বাড়ির নিচের তলার এক বুড়ি ভাড়াটে মারা যেতেই সেই ঘরে এসে নিজে উঠেছিল। বলেছিল, 'বাপের বাড়িতে দিনরাত আহা-উহু, এমন মেয়ের এই বরাত, এসব শোনবার চেয়ে এ ঢের ভাল। যেদিন ইচ্ছে হবে সেদিন খাবো, না হলে খাব না। ওখানে মা বাবার দিনরাত পাহারা, কোনও সোমত্ত মেয়ের এমন করে নাকি ঘুরতে নেই, কাশী শহর গুণ্ডা বদমাইশের জায়গা—কেউ চুরি করে নয় তো ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রী ক'রে দেবে নাকি ! আমি তো ভুলতেই চাই দিদি, কেউ যদি ভুলিয়ে নিয়ে যায় যাক না !'

তা নয়—মহামায়া বোঝেন, এখানে এসেছিল তবু মাঝে মাঝে কেষ্টকে দেখতে পাবে বলে। কী না করেছিল সে—প্রেম নয়, প্রেমের আশা আর সে করে না—স্বামীর একটু দয়া পাবে বলে। কিছুদিন পর থেকেই নিজের জন্যে তিন-চার টাকা রেখে ভাড়ার সব টাকা কেষ্টর কাছে পাঠিয়ে দিত, ভাড়াটেদের কাউকে দিয়ে কিম্বা রাঙাদিদিমাকে দিয়ে—কেষ্টও অম্লানবদনে হাত পেতে নিত, নিজের হাত খরচের জন্যে। পাছে নেশা-ভাঙ করে এই ভয়ে সত্যভামা টাকাকড়ি, খরচ, হিসেব, সব নিজের হাতে নিয়েছিল। শাশুড়িরও সাহস হত না সে টাকার হিসেব চাইবার। কেষ্ট বাড়িটাই লিখিয়ে নেবার তালে ছিল, ভাগ্যে মরার আগে আগে নন্দ মুখুজ্যে রাধাকে ডেকে তাঁর পৈতে ছুঁয়ে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছিলেন যে, কখনও সে বাড়ি না কাউকে লিখে দেয়। মরার পরে তো কেষ্টই পাবে কি কেষ্টর ছেলেরা—এত তাড়া কি ? এর জন্যে সত্যভামা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মৃত্যুপথযাত্রী শ্বশুরকে তাঁর বড়বৌয়ের ওপর অন্য রকম আসক্তি—এমন ইঙ্গিত করতেও ছাড়ে নি।

শ্বশুরের মৃত্যুর পর রাধা এক রকম জোর ক'রেই এসে শাশুড়ির কাছে ছিল দিনকতক, হবিষ্যি করা, ঘাট করার অজুহাতে। শ্রাদ্ধ মিটে যেতেও দু-এক দিন ছিল—একদিন তুচ্ছ একটা ছুতোয় সত্যি সত্যিই সত্যভামা ঝ্যাঁটা-পেটা ক'রে তাড়িয়েছে। তারপরও, এ-বাড়ি আসায় একটু সুবিধেও হয়েছিল, শাশুড়ি নিজের হেঁসেল থেকে লুকিয়ে বামুনদিকে দিয়ে ভাত-তরকারি পাঠাতেন মধ্যে মধ্যে, একদিন দেখতে পেয়ে তার হাত থেকে কাঁসিখানা কেড়ে নিয়ে একেবারে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল, চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় ক'রে বলেছিল, 'এত যদি রস তো বেটার আবার বে দিয়েছিল কেন চোখখাকী কুটনী ! মা-বেটায় এখন চাইছেন আমাকে তাড়িয়ে ওকে এনে ঘরে বসাতে, তা আর জানি না !...এককে এককে দিন ইচ্ছে ক'রে সব সুদ্ধু আগুন নাগিয়ে দিই—সপুরী এক গাড়ে যাক !...তোমাদের অদেষ্টে আছে আমার হাতে অপোঘাত মিত্যু—এ জেনে রেখো। ঐ বৌকে আবার ভাতারের খাটে শোয়াবে—এই তো ? চেরদিনের মতো একখাটে শুইয়ে ব্যাসকাশীতে পাঠাবো, মণিকর্ণিকাও যাতে না পায় দেখব।'

শাশুড়ি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে যান। নিজেরই কৃতকর্মের ফল—এখন নীরবে কপাল চাপড়ানো ছাড়া কোন পথ কোথাও খোলা নেই। ছোট বৌ সংসার হাতের মুঠোয় নিয়েছে—সে বজ্রমুষ্টি—তাঁর নিজের কোন স্বাধীনতাই নেই, নিজের টাকাও নিজে খরচ করতে পারেন না। যে নাতি-নাতনীর এত শখ, যার জন্যে এই বিয়ে দেওয়া, সেই নাতি-নাতনীকেই ওঁর কাছে আসতে দেয় না। বলে, 'ও বুড়িকে বিশ্বেস নেই, বড় বৌয়ের ওপর আন্তরিক টান, আমার ছেলেমেয়েকে হয়ত বিষ দিয়েই মারবে।'

এই রাধাকে উপলক্ষ ক'রেই বিনু একদিন মার মনের চেহারাটাও দেখতে পেয়েছিল। রাধা বলেছিল, 'দিদি, সবাই বলে স্বামীর ওপর এই ভালবাসাটা জগৎস্বামীকে দাও, ভগবানকে ভালবাসো, তিনি ঠকাবেন না। এই ভালবাসা তাঁকে দিলে তিনি নিজে এসে ধরা দেবেন। কিন্তু বলো দিদি, স্বামীর ওপর থেকে ভালবাসা ফিরিয়ে নিয়ে ভগবানকে দেওয়া যায় ?'

মা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, 'না, যায় না। এ আমি নিজেকে দিয়েই জানি ভাই। সে আর কাউকেই দেওয়া যায় না। যারা বলে দিয়েছি—তারা হয় মিথ্যে বলে, না হয় নিজেকেই ঠকায়।'...

অনেক বছর পরে, মহামায়ার মৃত্যুরও বেশ কিছু দিন পরে বিনু একবার কাশীতে গিয়ে ওদের খবর নিয়েছিল। তখন সত্যভামা মারা গেছে—অত সাধের সংসার ছেড়ে, কিন্তু তাতে রাধার কোন সুবিধা হয় নি আর। সে তখন সত্যিই পাগল হয়ে গেছে, ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরণে—মাথায় অতখানি চুল জট পাকিয়ে গেছে, গা-ময় মাটি ধুলো—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, বিজ বিজ ক'রে বকে। তাকে এনে আর সংসার বাঁধা যায় না। বড় মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলের জন্য পাত্রী খুঁজছে কেষ্ট—এইটুকুই খবর পেয়েছিল।

।। ১২ ।।

আর একটি যে দুঃখিনী মার মনের অনেক কাছে এসেছিল—ওদের কাশীবাসের শেষের দিকে, বোধহয় বছর দুই থাকতে, সে হল সরমা।

কমলা দিদিমারই কী একটা সম্পর্কে ভাইঝি, কুড়ি বছরের মেয়ে—বর হারানের বয়স তখন চল্লিশ, কি একটু হয়ত বেশিই হবে। দোজবরে, তবে প্রথম পক্ষের কোন ছেলেমেয়ে নেই। সরমারই এর মধ্যে দুটি ছেলেমেয়ে কোলে এসে গেছে।

বরের বয়স বেশি, তাতে সরমার কোন দুঃখ নেই, সে-কথা তার মনেও পড়ে না বোধহয়—বস্তুত কোন দুঃখই থাকত না তার, বরকে যদি সে পেত। হারান ডাক্তার এখানের একটা হাসপাতালে চাকরি করে, সন্ধ্যায় একটা ডাক্তারখানায় বসে। মধ্যে দীর্ঘকাল কোন স্ত্রী ছিল না—ঘর বলতে যা বোঝায় তাও ছিল না, সেই সময়ই, বাড়ি ফেরার তাগাদা না থাকায়, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে রাত ক'রে বাড়ি আসার অভ্যাস হয়ে গেছে। যে বন্ধুরা অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দেয়, তাদের সঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সৎসঙ্গ হয় না—হারানেরও হয় নি। এই সময়টায় অনেক কিছু কুঅভ্যাস হয়ে গেছে তার—মদ এবং ফ্ল্যাশ খেলা তো বটেই—সরমার ধারণা অন্য স্ত্রী-সংসর্গও। ফলে যে আয়ে সচ্ছলে চলবার কথা, সে-আয়ের কিছুই প্রায় হাতে আসে না। সরমাকেই কচি ছেলেমেয়ে সামলে এক হাতে বাসনমাজা, বাড়িমোছা, রান্না—সব করতে হয়।

তাও সইত হারান যদি অবস্থাটা বুঝত বা অহোরাত্র যে বিপুল পরিশ্রম করছে, সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকত। রাত বারোটা সাড়ে বারোটার কম কোনদিন ফেরে না—আর যত রাত্রেই ফিরুক, স্নান করার গরম জল চাই, খাবার প্রত্যেকটি জিনিস গরম চাই। কাঠ-কয়লার উনুন জেবলে তরকারি গরম করা, সেই অত রাত্রে রুটি সেঁকা—সব করতে হবে। নইলে, পান থেকে চুন খসলেই যাকে

বলে—সব ছুঁড়ে ফেলে দেবে, গালিগালাজ করবে। এক-আধদিন সরমা উত্তর দিতে গিয়ে বেশী লাঞ্ছিত হয়েছে, হাতও উঠেছে। এছাড়া অন্য খোয়ার তো আছেই। কোন কোন দিন, নেশা বেশি হলে এসেই বমি করে। নিজের গা-কাপড়-জামা তো মাখামাখি হয়ই, সরমারও কাপড়-জামা নষ্ট হয়। তখন আবার সেসব সাফ করে ওকে ধুইয়ে মুছিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজে স্নান ক'রে এসেই রুটি-তরকারির ব্যবস্থা করতে হয়। একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই খেতে চাইবে। দিনের পর দিন একই ব্যবস্থা।

বিনুরা যখন কলকাতায় চলে আসে তখনও ঐ একই ভাবে চলছে। ভয়ে সিটিয়ে থাকে মেয়েটা, কাউকেই কিছু বলে না, কেবল যা মহামায়ার মধ্যেই একটু সহানুভূতির প্রশ্রয় পেয়েছিল। আসবার সময় যেন কান্নায় ভেঙে পড়ল, মনে হল জীবনের একমাত্র অবলম্বন চলে যাচ্ছে। আসবার আগে তার একটি দুঃ-সংবাদ শুনে এসেছিলেন মহামায়া, মাসে দশ টাকা ভাড়া তাও ছ-সাত মাসের বাকী পড়েছে, কেষ্ট ভয় দেখাচ্ছে নালিশ করবে। নিচে থেকে চেঁচিয়ে গালাগাল দেয়—সবকটা বাড়ির ভাড়াটেদের শুনিয়ে।

কলকাতায় আসার পর আর দীর্ঘকাল খবর পায় নি।

'মেয়েটার জন্যে বড় মন কেমন করে। আহা!' মা প্রায়ই দুঃখ ক'রে বলতেন। কিন্তু খবর আসারও কোন উপায় ছিল না। 'কমলাদিদিমা কেন চিঠি দেয় না মা?' বিনুই কথাটা তুলেছিল একদিন। মহামায়া উত্তর দিয়েছিলেন, 'মা যে তেমন লেখাপড়া জানেন না, পড়তে পারেন অবশ্য, কিন্তু না লিখে লিখে লেখার অব্যেস গেছে, হাতের লেখা ভাল না। বাড়িতে তো লেখার পাট নেই, অবস্থা এমন নয় যে সংসারের হিসেব লিখতে হবে, মাসে চার-পাঁচ টাকা আয়; কেউ কোথাও এমন আত্মীয় নেই, যাকে চিঠি লেখা দরকার।…না, উনি পারবেন না। তাছাড়া এক পয়সায় একখানা পোস্টকার্ড, এক পয়সার তেমন দেখেশুনে আনাজ কিনলে একবেলার রান্না চলে যাবে।'

খবর অবশ্য পাওয়া গিছল বছর দুই-তিন পরে—অপ্রত্যাশিতভাবেই।

বামুনদির কিছু কুটুম্ব ছিল হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে, তাদের সঙ্গে হারানের কিরকম আত্মীয়তা, সেই সূত্রেই খবর এসেছিল। হারানের নাকি কী লিভারের অসুখ করেছিল, তিনমাস হাসপাতালে থেকে যদিবা সারে, এক নতুন ব্যাধি দেখা দেয়—হাত-পা কাঁপা। এর মধ্যে বাড়িওলা উচ্ছেদের নালিশ করেছিল, চারিদিকে অন্ধকার দেখে সরমা ওর দেওরকে এক চিঠি দেয় প্রায় কান্নাকাটি ক'রে। এই দেওরের সঙ্গে হারান তুচ্ছ কারণে এমন ঝগড়াঝাঁটি করেছিল একবার, যে দীর্ঘকাল মুখ-দেখাদেখি ছিল না। সরমার বিয়েতেও আসে নি, এ-বৌদি কি ভাইপো-ভাইঝিকেও দেখে নি। তবু চিঠি পেয়ে শেষ পর্যন্ত সে-ই গিয়ে সকলকে এখানে নিয়ে এসেছে। সেও ভাড়া-বাড়িতে থাকে, তবু তারই একখানা ঘর ছেড়ে দিয়ে ওদের রেখেছে। আয় প্রায় কিছুই নেই, এখানে কি একটা ছোট ডাক্তারখানাতে বসছে, তবে শরীর খারাপের জন্যে বেশি কিছু করতে পারে না। খুব বেশি যদি হয় মাস গেলে তো শ'খানেক টাকা। তাতেও চৈতন্য হয় নি, উসখুস করে মদ খাবার জন্যে। দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের চিঠি দেয় সাহায্যের জন্যে, দু'-পাঁচ টাকা হাতে পেলেই লুকিয়ে মদ খেয়ে আসে। পাছে ভাই টের পেলে তাড়িয়ে দেয় সেই ভয়ে কোন

বকাবকিও করতে সাহস করে না সরমা, হয়ত এই শেষ আশ্রয়টুকুও যাবে। তবে ভরসার কথা এই, আজকাল বেশি খেতে পারে না—একটুতেই লিভারের ব্যথা ওঠে।

অর্থাৎ একেবারেই পরের গলগ্রহ হয়ে থাকা। ফলে জায়ের সংসারে ভূতের মতো খাটতে হয় সরমাকে। রান্নার ষোল আনা ভার তো এসে গেছেই ওর ওপর, ঝিয়ের কাজও বেশ খানিকটা ক'রে নিতে হয়। এক ঠিকে ঝি আছে, সে বাসন মাজে আর বাটনা বাটে, বাকি সব কাজই সরমাকে সারতে হয়। জা যে মধ্যে মধ্যে এটা-ওটা করে না একেবারে তা নয়—তবে সে নামমাত্র। প্রথম প্রথম দেওর এ-ব্যবস্থার কিছু প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল, কিন্তু স্ত্রী অন্য রকম সন্দেহ করে দেখে—সরমার ভবিষ্যৎ ভেবেই সে কোন সুপারিশ কি অনুযোগ করা ছেড়ে দিয়েছে, উদাসীন থাকে, একরকম চোখ বুজেই। ছোট জা, কিন্তু বয়সে অনেক বড়, দেখতেও ভাল না, সে যদি তরুণী বৌদি সম্বন্ধে এই টানকে সন্দেহের চোখে দেখে—দোষ দেওয়াও যায় না।

এই আকুল অন্ধকারে একটি মাত্র আশার প্রদীপ অবলম্বন ক'রে আছে সরমা—যাকে বলে 'কাদায় গুণ ফেলে দিন কাটানো' তাই আছে—ছেলেটা যদি মানুষ হয় কোনদিন মাকে নিয়ে আলাদা সংসার পাড়তে পারে। বীরু বুঝি নাম, লেখাপড়াতে নাকি ভাল, মাস্টার রাখার তো সামর্থ্য নেই—তবু প্রতিবারেই ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়। মেয়েটার মাথা নেই তবে চাড় আছে পড়ায়। কী ভাগ্যি এই খরচাটাতে জা আপত্তি করে না। করে না সম্ভবত এই কারণে যে, তার দুটো ছেলে—দুজনেই ভাল লেখাপড়া করে, ঈর্ষার কারণ নেই।

মহামায়া সব শুনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'যে-মেয়ের স্বামী থেকে সুখ হয় না, তার কি ছেলে থেকেই হবে? মনে তো হয় না। ওর যা কপাল। ঐ ছেলে বড় হয়ে মাথাধরা হয়ে উঠতে এখনও ঢের দেরি, ততদিনে কুসংসর্গে মিশে বদখেয়ালি ধরতে কতক্ষণ! বাপের রক্ত তো আছেই—আকরে টানে যে।'

কে জানে কী হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। নিজেদের সমস্যাই এত, অপরের খবর রাখে কে? হয়ত মানুষ হয়েছিল ছেলেটা, হয়ত হয় নি। মেয়েটার বিয়ে হল কিনা তাই বা কে জানে। হলেও যদি সরমার মতোই কোন অপাত্রে পড়ে? এ-সব প্রশ্নই ওঠে মনের মধ্যে—উত্তর মেলে না। বামুনদি মারা যাবার পর সংবাদ সংগ্রহের যোগসূত্রও গেছে ছিঁড়ে। মা অবশ্য মাঝে মাঝেই বলতেন বিনুর দাদা রাজেনকে, 'হ্যাঁরে, শিবপুরের কেউ কাজ করে না তোদের আপিসে? সরমাটার একটা খবর যোগাড় করতে পারিস না?'

রাজেন উত্তর দিত, 'হ্যাঁ! তুমি যেমন, শিবপুর একটুখানি জায়গা কিনা। আর হারান চক্কত্তিও মহামাননীয় ব্যক্তি—যাকে বলব সে-ই খবর যোগাড় করে দেবে।'

মা চুপ ক'রে যেতেন।

বিনুকেও বলেছেন কয়েকবার—কিন্তু বিনুর অত সময় ছিল না হাতে, আর কার কাছেই বা খোঁজ করবে? রাস্তার নামটাও তো জানা নেই, কোন ডাক্তারখানায় বসত তাই বা কে জানে।

॥ ১৩ ॥

এক বছরের বেশি বিনুকে ঘরে বসিয়ে রাখা সম্ভব হল না। সকলেই বার বার এক কথা বলে, 'এত বড় ছেলে হয়ে গেল এভাবে ওকে বাড়িতে বসিয়ে রাখা উচিত হচ্ছে না। এবার ইস্কুলে দাও। একা তো থাকতেই হবে তোমাকে, মিছিমিছি মায়া বাড়িয়ে লাভ কি?

অগত্যা, দোতলার বাসিন্দা ভদ্রলোক বামাচরণবাবু, পেন্সনভোগী মুতদার এক বৃদ্ধ—ভাইপো-ভাইঝি, নাতি-নাতনি নিয়ে থাকেন, কেউই বেশিদিন থাকে না, একটি ভাইঝি ছাড়া—সে ইস্কুলে পড়ে—এক ঠিকে ঝি আর রাত-দিনের হিন্দুস্থানী বামুন নিয়ে সংসার, তাঁকেই বলে কয়ে; ভাইঝি 'জ্যেঠাই' নাম, তাকে দিয়ে বলিয়ে, কাছাকাছি একটা ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হল। অগস্ত্য-কুণ্ডুতে নতুন ইস্কুল হয়েছে গোধুলিয়ায় গাড়ির আড্ডার পিছন দিকে (সেও এক ভয় মহামায়ার—এক্কা কি টাঙ্গা না চাপা পড়ে) পুঁটের রানীদের কোন এক শরিক মন্মথবাবু আর বীরেনবাবু দু' ভাই মিলে করেছেন—প্রধানত বাঙালী ছেলেদের জন্যে, নাটকোটাদের ছত্রের পাশেই মস্ত উঁচু তেতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে। সেইখানেই ক্লাস থ্রিতে ভর্তি করে দিয়ে এলেন বামাচরণবাবু।

সাধারণত এই বয়সের ছেলেদের স্কুলে যেতে আনন্দই হয়, যাদের প্রথম দিকে একটু ভয় ভয় করে, তারাও বন্ধু-বান্ধব সাহচর্যের রসাস্বাদ করলে আর বাড়িই থাকতে চায় না, ছুটি থাকলে ভাল লাগে না তাদের। কিন্তু বিনুর ভাল লাগে নি, তখনও না—কিছুদিন পরেও নয়। ভয়ে ভয়েই গিয়েছিল, সে-ভয়ও সহজে কাটে নি। পরে ভয় কাটলেও বীতরাগ একটা থেকেই গিয়েছিল। বন্ধুদের সাহচর্য ও খেলাধুলোর জন্যে যে আসক্তি জন্মায় সে-আসক্তির কারণটাও ঘটে উঠল না ওর এই প্রথম ছাত্রজীবনে। প্রথমই বা কেন, সমস্ত ছাত্রজীবনেই। ওর দু-একজন বিশেষ বন্ধু ছাড়া, সাধারণ সহপাঠীদের সঙ্গে ওর সখ্য গড়ে উঠতে পারে নি, কোথায় একটা দুস্তর ব্যবধান থেকে গিয়েছিল। দোষ ওরই, স্বভাবের দোষ, পরিবেশের দোষ, ওর নিজের পারিবারিক জীবনের দোষ। 'যত সব উনপাজুরে বরাখুরে হাড়হাভাতে বন্ধুর দল নিয়ে বাড়িতে আসবে না—এই বলে দিলুম। পড়তে যাচ্ছ, গরিবের ছেলে, পড়াশুনো করবে, চলে আসবে। ইয়ার-বক্সী নিয়ে হল্লহল্ল করে বেড়াবার জন্যে এত অসুবিধে করে তোমাকে ইস্কুলে দেওয়া হয়নি।' গোড়াতেই এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন মহামায়া এবং এর বহুদিন পরেও, বিনু বড় হয়েও, কোনদিন কোন বন্ধু ডাকতে এলে—সহস্র কৈফিয়ৎ চাইতেন তিনি, কেন এসেছে, কী এত দরকার যে, বাড়ি আসতে হল ইত্যাদি। তাঁর কাছে অপরাধী হয়ে থাকা, বন্ধুর কাছে কুণ্ঠিত হয়ে। মার এই সন্দেহ এবং বিরক্তি যদি তারা টের পায়, লজ্জার অবধি থাকবে না যে।

ওর নিজের মনে যে একটা অস্বস্তির ও অনভ্যস্ততার প্রাচীর ছিল, তাও বড় কম নয়। সে একটু বেশি বয়সে এসেই ভর্তি হয়েছে। তার দৈহিক গঠনও ভাল। মহামায়া নিজেই বলতেন, 'আমার ছেলেরা বাপের ধাতে গেছে। দেখো ওদের সব লম্বা-চওড়া চেহারা দাঁড়াবে বয়সকালে। এখনই কি রকম

ছেয়ালা গড়ন দেখছ না।'

বয়স যত না—ওর এই দৈহিক স্বাস্থ্যই যেন সহপাঠীদের সঙ্গে সহজে মেশার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। তারা প্রায় সকলেই রোগা ও বেঁটে ধরনের—বামুনদির ভাষায় 'বানখুরে গড়ন'—বয়সে হয়ত দু-একজন বিনুর থেকেও বেশি—সমবয়সী তো বেশির ভাগই, কিন্তু ঐ শুকনো পাকানো চেহারার জন্যে তা বোঝার উপায় নেই। খাতায় বয়েস সকলের কমই লেখানো হয়ে থাকে—বামাচরণবাবু সেসব তঞ্চকতার ধার দিয়ে যাবেন না, সে তো জানা কথাই। সেকেলে ইংরেজি জানা সরকারী চাকুরে, কমিশারিয়েটে চিরদিন সাহেবদের তাঁবে কাজ ক'রে এসেছেন—মনের নৈতিক গঠন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। ফলে, এসব তথ্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বিনু নিজেকে কেমন যেন অপরাধী ভাবে, অকারণেই—এবং সর্বদা কুণ্ঠিত থাকে।

আরও সে কুণ্ঠায় ইন্ধন যোগান মাস্টারমশাইরা। সেক্রেটারি বীরেনবাবু নিজেই একদিন বললেন, 'শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে এসেছ—আরও কি পিছিয়ে পড়তে চাও? মন দিয়ে পড়ো, বাজে খেলাধুলো ক'রে সময় নষ্ট করা তোমার সাজে না।' এ-অভিযোগও সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন কিন্তু নিরপরাধ বিনু সে-কথাটাও উঠে দাঁড়িয়ে বলতে পারল না, সাহসে কুলোল না। বীরেনবাবুর সাহেবের মতো রং, কটা চোখ, এতখানি বগিথালার মতো মুখ এবং বাঘের মতো গলা—ওঁকে দেখলেই বুকের মধ্যে হিম-হিম ভাব জাগে। না হলেও অন্য মাস্টারমশাই কেউ বললেও প্রতিবাদ করার সাহস হত না।

আসলে বীরেনবাবুদের সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল, তাঁর দুই ছেলে রবীন ও বারীন বোধহয় নাম—তারাও, দেখতে খুব বড় না হলেও মোটামুটি স্বাস্থ্যবান। বিনুর এ বলিষ্ঠতা সম্পূর্ণ বয়সোচিত, অস্বাভাবিক আদৌ নয়, এই রকমই হওয়া উচিত—বাকী যারা তাদের কারুরই বরং সাধারণ স্বাস্থ্যের চেহারা নয়—প্রধানত অপুষ্টির জন্যেই শরীর তার স্বাভাবিক গঠনে পেঁাছতে পারে নি, যা বয়স তাদের, থেকে ঢের কম দেখায়। বিনুর এতটা বোঝার মতো জ্ঞান অভিজ্ঞতা হবে তা সম্ভব নয়—বীরেনবাবুও বোধহয়, কাশীর এই সামান্য আয়ের সংসার থেকে আসা ছেলেদের গঠন যে অস্বাভাবিক, এ দেখে ওদের বয়স অনুমান করা যায় না—এ কথাটা জানতেন না। তাঁর চোখেও তাই এদের কাঁচ বলেই মনে হয়েছে।

এসব ছেলেরাও মনে করে বিনুর বয়স অনেক বেশি, তা নিয়ে প্রকাশ্যেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। সেসব বিদ্রূপের কোন কোনটা তীক্ষ্মধার। তবে সুবিধা এই—বিনু তার সব কথা বুঝতে পারে না, বোকার মতো চেয়ে থাকে। সহপাঠীরা আরও মজা পায়, বোকাই মনে করে। বিনু যে সদাকুণ্ঠিত থাকে তাই নয়, কেমন যেন—ইংরেজিতে যাকে বলে অকওয়ার্ড—মনে করে নিজেকে। সে যে এদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না, সেটা যেন ওরই দোষ।

অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা নিষ্ঠুর হয়—দয়ামায়া বিবেচনা—এসব মানসিক বৃত্তি আসে অভিজ্ঞতা থেকে, নিজেরা ঘা খেয়ে খেয়ে অপরের ব্যথা বোঝে—কিন্তু অপরের নিষ্ঠুরতা অনুভব করে, যন্ত্রণা পায় তারাই বেশি। একটা ঘটনা আজও বিনুর মনে—এই অর্ধশতাব্দী পরেও, একটা গভীর ক্ষত একটা ব্যথাবোধের উৎস হয়ে আছে। সেই সঙ্গে একটা দুর্বোধ্য সবিস্ময় প্রশ্নও জাগিয়ে রেখেছে।

ভবেশ বলে একটি ছেলে, খুবই গরিব, বিধবা মায়ের ছেলে, একরকম

ভিক্ষে-দুঃখ করেই মা পড়ায়, বোধহয় সেইজন্যই সে একটু অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ছেলেদের সঙ্গে, বিশেষ ক'রে সেক্রেটারি বীরেনবাবুর যেসব ছেলেরা বা ভাইপোরা বা অন্য আত্মীয়ের ছেলেরা ঐ স্কুলে পড়ে—তাদের সঙ্গে মেশার আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে। স্পষ্টই তোষামোদ করে তাদের। অথচ, খালি পায়ে উড়ুনি গায়ে দিয়ে আসে বলে বিনুর একটু বেশি মায়া বা আগ্রহ তার সঙ্গে মেশবার—ওদের অবস্থা কমলাদিদিমার কাছে অনেকবার শুনেছে, কেষ্টদেরই কী রকম দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয়—নিজের অবস্থার সঙ্গে কিছুটা মিলিয়ে পায় বলেই একটু সহানুভূতি অনুভব করে নিজের অজ্ঞাতেই। সেই ভবেশই একদিন ওকে—সম্পূর্ণ বিনা কারণে—এক অপরিসীম লজ্জা ও অপমানের পাত্র ক'রে তুলল।

বিনু ওর পাশেই বসবার চেষ্টা করে। সেদিনও বসেছিল। সুবোধবাবুর ক্লাস সেটা, তিনি তখনও আসেননি। কোঁকড়া চুল, সরু গোঁফ, সোনার চশমা, পায়ে পাম্প-শু জুতো—একটু শৌখিন মেজাজের মানুষ, ওপর ক্লাসের ছেলেরা বলত প্রতিমার কার্তিক—বয়সও অল্প। সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে, হয়ত সেইজন্যেই স্কুলে আসতে প্রায় দেরি হয়। সুবোধবাবুর অবস্থা ভাল, মিশ্রীপোখরায় একটা, খোদাই চৌকিতে একটা বাড়ি আছে। কতকটা সময় কাটাবার জন্যেই—এদের ছোটকর্তা গিরীনবাবুর অনুরোধেও বটে—পড়াতে আসেন। পনেরো টাকা পান হাতখরচা হিসেবে। অবশ্য বিনু পরে জেনেছিল ঐরকমই মাইনে ছিল তখন, এইসব বে-সরকারি ইস্কুলে—বিশেষ বাঙালী ছেলেদের জন্যে যেসব ইস্কুল করা হত, যেমন এখানকার য়্যাংলো বেঙ্গলী স্কুল ইত্যাদি—সাধারণের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর ক'রে যার খরচা চালাতে হত।

আর একজন, অংকের মাস্টার সুধীরবাবু—মাত্র আঠারো টাকা মাইনে পেতেন। তিনি ওকে স্নেহ করতেন খুব, মনে রেখেছিলেন। মনে রাখাটা উল্লেখযোগ্য এই জন্যে যে, তিনি পরে খুব বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। বেশি বয়সে দেখা করতে গিয়ে বিনু শুনেছিল, ঐ মাইনের কথা। বলেছিলেন, 'তা তাতেই তো চলে যেত। আমি মা, স্ত্রী—তিনটি তো প্রাণী। তা থেকেই টাকা জমিয়ে গুধড়ি বাজারে গিয়ে 'দু' পয়সা চার পয়সায় পুরনো বই কিনে কিনেই না আজ এই এতবড় পণ্ডিত হতে পেরেছি!' তাঁর মুখেই শুনেছিল, বীরেনবাবুরা কেউ মাইনে নিতেন না, ঐ অল্পস্বল্প হাতখরচা হিসেবে যা নিতেন। যাঁরা মাইনে পেতেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পেতেন যিনি—তিনি ত্রিশ টাকা সই ক'রে বাইশ টাকা পেতেন।

সুবোধবাবুর সেদিনও দেরি হচ্ছে দেখে, হঠাৎ ভবেশ বলল, 'এই ইন্দ্র, এই কথা দুটো বোর্ডে লিখে আয় দেখি, ঠিক এমনি করে—বেশ মজা হবে।'

কথা নয়—বিনু দেখল দুটো নাম। হাইবেঞ্চের কাঠে ছোট একটা খড়ির টুকরো দিয়ে লিখেছে ভবেশ। দুটো নাম, মধ্যে একটা যোগ চিহ্ন। নাম দুটো কদিন বারবার আলোচিত হতে শুনেছে বিনু, যদিও কারণ কিছু জানে না। ওদের অনেক ওপরে, ক্লাস সিক্স-এ পড়ে দুজনেই, একজন মন্মথবাবুর ভাগ্নে, আর একজন এই পাড়ার ছেলে, একটু বখা ধরনের। অবশ্য তাও—অনেক পরে, অভিজ্ঞতা আর একটু হতে নিজের মনের মধ্যে মিলিয়ে দেখে বুঝেছিল বিনু।

সে ভয়ে ভয়ে বলল, 'না ভাই, বোর্ডে লিখব, মাস্টারমশাই যদি রাগ করেন।'

'দূর বোকা। কে লিখেছে তা তিনি কি ক'রে জানবেন! আমরা সব চুপ করে থাকব—তাহলেই হবে।'

তবু বিনু ইতস্তত করছিল—দু' পাশের আরও দু-তিনজন ছেলেও ওকে তাতাতে শুরু করল, 'যা না, যা না—দ্যাখ না কত মজা হবে।'

এর মধ্যে মজার কথা কি হতে পারে তা বুঝল না বিনু, কিন্তু সে যে এর গূঢ়ার্থ কিছু বুঝল না তা স্বীকার করতেও লজ্জা বোধ হল। তবে এদের অনুরোধও এড়াতে পারল না। আরও, ওরা যে তাকে বন্ধুত্বের গণ্ডীর মধ্যে নিতে চাইছে—তাতেই যেন কৃতার্থ হয়ে গেল সে। টেবিল থেকে মাস্টার-মশাইয়ের জন্যে রাখা চকখড়ি নিয়ে গিয়ে যথাযথ—ভবেশ যেমনভাবে দেখিয়েছে—লিখে ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে সারা ক্লাসে যে একটা চাপা হাসির লহর উঠল—তা টের পেলেও, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার আর সময় ছিল না, বিনু ফিরে এসে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুবোধবাবু এসে গেছেন।

সুবোধবাবু ঘরে ঢুকে বোর্ডের দিকে চেয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। অভ্যস্ত হাসি-হাসি ভাব মিলিয়ে গিয়ে মুখ লাল, দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল। কেমন এক ধরনের অস্বাভাবিক শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন, 'এ কে লিখেছে?'

ভবেশ যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল, প্রশ্ন শেষ হবার আগেই বলে উঠল, 'এই ইন্দ্রজিৎ মাস্টারমশাই, বারণ করলুম কত ক'রে কিছু লিখিস না, কিছু লিখিস না, মাস্টারমশাই রাগ করবেন হয়ত—'

বিনু ওর এই বয়সের মধ্যে এতখানি অবাক আর কখনও হয় নি। কোন ওর বয়সী ছেলে যে এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, বেশ ভেবেচিন্তে এমনভাবে কারও সরলতা বা অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কুকাজ করিয়ে নিজেই আগ বাড়িয়ে ধরিয়ে দিতে পারে—কোন রকম প্রতিহিংসার কারণ ছাড়াই—বিশেষ যেখানে সে বন্ধুত্বই করতে চায়, ভালবাসতে চায়—তা ধারণা করার মতো অভিজ্ঞতাও যে ওর নেই! এমন কখনও শোনারও সুযোগ হয় নি, এতদিন বাড়ির বাইরে যায়নি বলে। এমন যে হতে পারে তাও কখনও ভাবেনি। সে কেমন আচ্ছন্ন বিহ্বলভাবে ভবেশের দিকেই তাকিয়ে রইল। কোন প্রতিবাদ করার কথা কি অস্বীকার করার কথা মনেও হল না। পিছন থেকে কে যেন চাপা গলায় বলতে লাগল—'বল না, আমি করিনি, ও মিথ্যে বলছে', কিন্তু তাও তখন ওর মাথায় ঢুকল না।

সুবোধবাবুর গলা দিয়ে যেন এবার হিংস্র স্বর বার হল একটা, 'হুঁঃ! বুড়ো বয়েসে ক্লাস থিব্রতে পড়তে এসেছ—লেখাপড়ার নামে ঢুঁ-ঢুঁ—শুনেছি অনাথ ছেলে, এসব খারাপ কথায় তো বেশ পোক্ত হয়ে গিয়েছ। কিছুই তো শিখতে বাকি নেই দেখছি।...এখানে আর কেন বাওয়া, মিছিমিছি মায়ের ভিক্ষে-দুঃখু করা পয়সা নষ্ট করা—বাজারে গিয়ে বিড়ি পাকাও গে—নেশাভাঙ করার পয়সা মিলবে—তোফা থাকবে।...রাসকেল। দাঁড়াও, দাঁড়াও বলছি। বেঞ্চির ওপর কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকো। এর পরের ঘণ্টাও অমনি থাকবে।...বেত মারাই উচিত ছিল—ফার্স্ট অফেন্স বলে ছেড়ে দিলুম। ফের যদি কোনদিন এসব অসভ্যতা করতে দেখি, বেত মেরে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে দোব, গাধার টুপি পরিয়ে ক্লাসে ঘোরাব।'

ভবেশ খুব মিষ্টি গলায় অভ্যস্ত শান্তভাবে বলল, 'কত করে বললুম, মুছে ফেল, মুছে ফেল। এসব লিখেই বা কি লাভ হল তোর।'

দূরে কোথাও কি কেউ হাসল ? চাপা একটা কৌতুকের হাসি ? খুবই চাপা—কিন্তু অনেকের হাসি বলেই চাপা থাকল না একেবারে—তার খিক-খিক শব্দটা শোনা গেল ।

কিন্তু বিনুর আচ্ছন্নতার মধ্যে সেটা মনে হল দূরাগত কোন শব্দ । ওর পিছন বা পাশের ছেলেরাই হাসছে তা বুঝতেও পারল না । সেইভাবে একটা ঘোরের মধ্যেই শুনল, সুবোধবাবুর গলার একটা টিটকিরি সুর 'আসলে যে ডানা গজিয়ে গেছে এই বয়সেই । লেখাপড়া হবে না ঘোড়ার ডিম হবে । এর পর পকেট কাটতে শিখবে ।'

অপমান তো নিশ্চয়ই—শব্দটা শোনাই ছিল এতকাল, এইবার বুঝল—এতগুলি সহপাঠীর সামনে, শুধু তাই বা কেন, অন্য ক্লাসের কত ছেলে সামনের বারান্দা দিয়ে যাতায়াত করছে, তারাও দেখে একটু মুচকি হেসে চলে যাবে নিশ্চয়ই ; এত কঠিন কথাও ওর এই ন'-দশ বছর বয়সের মধ্যে কখনও কেউ বলেনি ওকে, সম্পূর্ণ অকারণে যে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হল—এর মধ্যে কি খারাপ অর্থ আছে তা বহুদিন পর্যন্ত জানেনি, তখন তো জানার কথাই ওঠে না ; তবু কেন তার জীবনের ঐরকম হীন পরিণতি সামান্য এই একটা তুচ্ছ ঘটনা দিয়ে হিসেব ক'রে নিলেন মাস্টারমশাই ; ওকে কোন উত্তর দেবার অবসর দিলেন না, অন্য কোন ছেলেকে ডেকেও আসল ঘটনা যাচাই করে নিতে পারতেন, সে-কথাটা কেন তাঁর মনেও পড়ল না, কী এমন অসভ্যতার অন্য লক্ষণ দেখেছিলেন ওর মধ্যে—এসব ওর ধারণা করাও সম্ভব নয়, ওর মাথার মধ্যে কিছুই তখন ঢুকছে না, কিন্তু এই জ্বালা, এই অবিচারের জন্যে বিদ্রোহী মনোভাব—সব ছাড়িয়ে যে অনুভূতি ওর তখন প্রবল হয়ে উঠেছিল—যা ওর সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন আপ্লুত করে ছিল বলে সেদিন এই শাস্তিতেও ওর চোখে জল আসে নি—সে হল বিস্ময় । বিপুল, সীমাহীন একটা বিস্ময় ।

কেন, কেন ওরা এরকম ব্যবহার করল বিনুর সঙ্গে । বিনু তো ওদের কোন ক্ষতি করে নি কখনও । কারও সঙ্গে কোন অসদ্ব্যবহারও তো করে নি । আর করবার তো সময়ও পায় নি, এই তো তিন চার মাস সবে সে এখানে আসছে । তবে কেন এত আক্রোশ ওদের । আর ঐ ভবেশ, ওর ঐ শান্ত মুখের মধুর কথার আড়ালে এত বিষ ! এত শত্রুতা করার কথা ও ভাবল কি ক'রে—আর কেন, কেন ! বিশেষ ক'রে ওকেই বা এমনভাবে কষ্ট দিয়ে কি লাভ হল ওর । ও নিশ্চয় জানত—জানে—কেন এইভাবে দুটো নাম লেখাটা অন্যায় । ওর ভেতরের কদর্থও জানে—তাই বা এইটুকু বয়সে জানল কি ক'রে ।

অথচ, আশ্চর্য ! ওর সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিল বিনু, ওর সঙ্গে একটা পারস্পরিক নির্ভরতা, অন্তরঙ্গতা গড়ে তুলতে চেয়েছিল । মনে হয়েছিল, দুজনের অবস্থাই যখন অনেকটা একরকম—বিনুর অসুবিধা, সংকোচ, সকলের সঙ্গে খোলাখুলি মেশবার মানসিক বাধা—এগুলো ভবেশ বুঝবে ।...

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বিনুর খুব মনে পড়ে । এই ঘটনার মাস তিনেক পরে হঠাৎ ভবেশ স্কুলে আসা বন্ধ করল । লক্ষ্য করলেও এ সম্বন্ধে কোন কৌতূহল প্রকাশ করে নি । সেদিনের পর থেকে ওকে সাপের মতোই বোধ হ'ত । মা অনেকদিন গল্প করেছেন—সাপের গা নাকি খুব ঠাণ্ডা, নিঃশব্দে চলাফেরা করে, বিনা কারণে কামড়ায় । 'সাপের লেখা—বাঘের দেখা' কথাটা প্রায়ই বলতেন । ভাগ্যে লেখা থাকলে সাপ তাকে কামড়ায়—বাঘ

মানুষ বা অন্য প্রাণী দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। কথাটা পরবর্তী জীবনে মিলিয়েও পেয়েছিল। পাড়ার খাবারের দোকানের তিনটে ছোকরা কর্মচারী উনুনের পাশে রাত্রে শুত, একই কাঁথা পেতে, পাশাপাশি। একদিন রাত্রে ভোম্বলের গা দিয়ে উঠে এসে মাঝে লালুকে কামড়ে লছমনের গা বেয়ে নেমে গেল। এরাও ঠাণ্ডামতো কি গায়ে উঠেছে দেখে হাঁকপাঁক ক'রে উঠেছিল— অন্ধকারেই অবশ্য—কিন্তু তাদের কিছু বলল না। রোজা এসে বললে গোখরো সাপ, অনেক কিছু করল—বাঁচানো গেল না। আঠারো বছরের জোয়ান ছেলেটা নীল হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

ভবেশের অনুপস্থিতির কারণটা অবশ্য শুনল কমলাদিদিমার মুখেই। তিনিই একদিন বললেন, 'আহা, ভগবান যাকে মারেন বুঝি এমনি ক'রেই মারেন। লেখাপড়া বেশীদূর না শিখুক, মন্তরগুলো পাঁজি দেখে পড়ার মতো বিদ্যে হলে যজমানী করে মাকে খাওয়াতে পারত। একটা ছেলে— মাগীর বরাত দ্যাখো দিকি!'

মহামায়া উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি হয়েছে মা? কার কি হল!'

'আবার কি। ঐ ভবাটার কথা বলছি। ভগবান দিলেন, দিলেন গরিব ভিখিরীর ঘরে একেবারে রাজরোগ। যক্ষ্মা—আজকাল যাকে থাইসিস বলে।'

বললে একদিন দুর্গাদাসও। ইদানীং বেছে বেছে দুর্গাদাসের পাশেই বসত, বিনু সম্ভব হলে। সেই-ই একদিন বললে, এই, শুনেছিস—ভবেশের থাইসিস হয়েছে—? ডাক্তাররা বলেছে ও আর বাঁচবে না। সমুদ্দুরের ধারে নিয়ে গিয়ে ভাল খাওয়াতে পারলে নাকি কিছু আশা ছিল। ওর তো কোন ওষুধ নেই। খোলা হাওয়া ভাল খাওয়া—এই হলে তবু কিছুদিন বাঁচে। তা যে বাড়িতে থাকে—বিনাপয়সায় ভাল বাড়ি পাবেই বা কোথায়— দিনের বেলাও আলো জ্বালতে হয়, একটু হাওয়া বাতাস ঢোকার রাস্তা নেই কোনদিকে। ওর মধ্যেই পড়ে আছে। কেউ যায়ও না, ছোঁয়াচে রোগ বলে। ও কি আর বাঁচবে? আসলে তোর শাপটাই লাগল। তুই খুব মনে দুঃখ পেয়েছিলি বলেই—'

কদিন পরেই শুনল ভবেশ মারা গেছে। ওদেরই পিছন দিকে থাকত, অন্য রাস্তা দিয়ে যাতায়াত, তবু ক্ষীণ হরিধ্বনি কানে গিছল, অত খেয়াল করে নি। স্কুলে গিয়ে শুনল।

দুঃখিত হওয়া কি উচিত ছিল? একটু করুণা, সহানুভূতি প্রকাশ করা? হয়ত ছিল—কিন্তু সেদিনও তা অনুভব করে নি বিনু, আজও করে না।

এই দুর্গাদাসই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওর এই স্কুল মরুভূমিতে একমাত্র ওয়েসিস। খুব যে হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল তা নয়, দুর্গাদাসের ঠিক তেমন স্বভাবও নয়—বোধহয় নিজের অবস্থার জন্যেই একটু কুণ্ঠিত থাকত সর্বদা, সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে সাহস করত না। কথাই কম বলত, কোন ব্যাপারে মাতামাতি করা—উৎসাহ উচ্ছলতা প্রকাশ করা তার স্বভাবেই ছিল না। স্বল্পভাষী এই ছেলেটি তাকে ভালবাসত কিনা তা আজও বিনু জানে না, তার ওকে ভাল লাগত।

দুর্গাদাসরা তিন ভাই, এই স্কুলেই পড়ত। অন্ধ বাবা আর কঠিন হাঁপানিতে অশক্ত মা। আয়ের মধ্যে এক মামা মাসে পাঁচ টাকা পাঠাতেন। যে বাড়িতে ওরা থাকত, সেখানে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ ছিল। ওরা যে-কোন এক

ভাই—অন্ধ দিয়ে নাকি পুজো হয় না—একটু জল বেলপাতা দিত! ওরা নিত্যপুজার কাজটা করবে এই শর্তেই বাড়িওলা নিচের দুখানা অন্ধকার অব্যবহার্য ঘর দিয়ে রেখেছিলেন। বাকী অংশ ভাড়া ছিল, তাতে ট্যাক্স মেরামতি চলত। কিছু বাঁচলে তাঁরা তো নেবেনই।

শিবের ভোগ লাগে না, অর্ঘ্যর দুটো আলোচাল আর বেলপাতা, তাতেও মাসে পাঁচ ছ আনা খরচ হত। বাকী সাড়ে চার টাকায় দুটো পেট আর পাঁচটা লোকের আচ্ছাদন চালানো সম্ভব নয়। পাড়ার লোকের অবস্থাও তথৈবচ, এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক ও একটি বাঙালী স্কুল মাস্টার মধ্যে মধ্যে দু-এক টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন, পালপার্বণে সিধা, গামছা এগুলোও আসত। কালেভদ্রে ধুতি উড়ুনি কিম্বা সধবার লালপাড় মোটা শাড়িও এক-আধখানা।

দুর্গাদাসরা তিন ভাই—ভাইদের নাম ঠিক মনে নেই—ছত্রে খেত। এই নাটকোটার ছত্রেই নাম লেখানো ছিল। খেতে দিতেন তাঁরা, পাত্র নিয়ে আসতে হত। বাড়ি থেকে আনলে সে পাত্র আবার কোথায় রাখবে? এক পয়সায় বারোখানা পাতা (শাল নয়—পলাশপাতা বোধহয়), এক পয়সা জমা রাখলে দোকানদার চার দিন তিনখানা ক'রে পাতা দিত।

নাটকোটার ছত্রে খাওয়ার ব্যবস্থা নাকি বীরেনবাবুরাই বলে কয়ে করিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা পুঁটের ছত্রেও ক'রে দিতে পারতেন কিন্তু সেখান থেকে খেয়ে এখানে এসে ইস্কুল করা যায় না। তাছাড়া পুঁটের ছত্রে দেরি হত। সেইজন্যেই এখানে নাম লেখানো। বোধহয় ওদের অনুনয় বিনয় আর বীরেনবাবুদের সুপারিশেই—এই তিন ভাইকে সাড়ে দশটার মধ্যে খেতে দিত। তবে সর্বদিন হয়ে উঠত না। সেসব দিনগুলোর টিফিনের সময় ভরসা, এক একদিন ঠিক সময়ে মিলে যেত, এক একদিন তা হত না, আগে পরে হয়ে যেত। বিনাপয়সার খাওয়া—মোটামুটি সময় নির্দিষ্ট থাকলেও প্রত্যহ ঠিক ঘড়ি ধরে খেতে দেবে, পাঁচ দশ মিনিট এদিক ওদিক হবে না, তা আশা করাও অন্যায়। ফলে এক একদিন খাওয়াই হত না বেচারাদের।

প্রতিষ্ঠাতা বাবুদের মধ্যে বীরেনবাবুই বস্তুত কর্তা ছিলেন। পদবীতেও সেক্রেটারী। তাঁর কড়া শাসন, দারোয়ানকে বলা ছিল টিফিনের আগে কাউকে বেরোতে দেবে না। অসুখ বিসুখ বা তেমন কোন জরুরী দরকার থাকলে তাঁর বা হেডমাস্টার মশাইয়ের অনুমতি নিতে হবে (অতি বৃদ্ধ নিরীহ জীব, সেক্রেটারীর মন বুঝে চলতে হত তাঁকে, রিটায়ার করার দশ বছর পরে এই কাজ পেয়েছেন, মাস গেলে বাইশ টাকা য়্যালাউন্স, এ কাজ গেলে আর হবে না)। টিফিনের আগেও যেমন যাওয়া চলবে না, তার পরেও ফেরা চলবে না। দেরি ক'রে ফিরলে দারোয়ান সোজা বীরেনবাবুর কাছে নিয়ে যাবে—শাস্তি হিসেবে সেইটেই যথেষ্ট। বিরাট গোল মুখ, সাহেবদের মতো রঙ ও বাঘের মতো গলা। এক আধ-দিন দুর্গাদাসরা বলে-কয়ে পাঁচ দশ মিনিট আগে বেরিয়ে যেত, বা খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে দেখে তার আগেও পাঁচ মিনিটের জন্যে চলে যেত—কিন্তু পরপর দুদিন কি এক সপ্তাহের মধ্যেও দুদিন এ অনিয়ম বীরেনবাবু বরদাস্ত করতেন না।

অথচ ওদের অবস্থা সবাই জানতেন, তাঁরাই ফ্রী বা বিনামাহিনায় স্কুলে পড়াচ্ছেন, ছত্রের ব্যবস্থাও তাঁদেরই করা, এই খাওয়া না হলে সারাদিন আর খাওয়াই হবে না তাও জানতেন। কোনদিন সিধেটিধে পেলে রাত্রে একটু ভাত বা রুটি বা খিচুড়ি জুটত—তাও ওপরের ভাড়াটেরা কয়লার গুঁড়োগুলো

এদের দান করতেন, ছেলেরা ছুটির দিন গুল শুকিয়ে নিত তাই—নইলে দেড় পয়সায় একপো ছোলার ছাতু কিনে তাই তিন ভাই খেত একটু একটু ; মা বাবা একবেলাই খেতেন।

এসব কথা কিছু দুর্গাদাস বলেছে, কিছু চোখেই দেখেছে বিনু। যেদিন বেচারাদের খাওয়া হত না, মুখ শুকিয়ে যেত ; একেই বেচারারা রোগা, বিবর্ণ চেহারা, তায় অনাহার—বিকেলের দিকে যেন আরও রোগা দেখাত আরও ফ্যাকাসে—সেসব দিনে দুর্গাদাসের দিকে চেয়ে বিনুই যেন একটা দৈহিক যন্ত্রণা বোধ করত। রাগ হত বীরেনবাবুর ওপর—ওঁদের আর কি, বড়লোক জমিদার, নিজেরা হয়ত এর মধ্যে চারবার খেয়ে বসে আছেন—সে খাবার হজম করার জন্যেই ইস্কুলে খাটা—এই তিনটে ছেলে সকাল থেকে কিছুই খায়নি, সারাদিন এই পেটের জ্বালা সহ্য করবে, হয়ত বাড়ি ফিরেও কিছু খেতে পাবে না। একেবারে রাত্রে, তাও যদি ঐ দেড়পয়সার সংস্থান থাকে তবেই, এক ডেলা ছাতু জুটবে।

সব জেনেও মানুষ এমন হৃদয়হীন হয় কি ক'রে, বিনু ভেবে পেত না। যেদিন ওদের মুখের ওপর রূঢ়ভাবে 'না, হবে না' বলে দিতেন, সেদিন যেন, কথা নয়, বিনুর মুখের ওপর সপাং ক'রে এক ঘা বেত পড়ত। এ নাকি স্কুলের ডিসিপ্লিন রাখার জন্যে দরকার, বিনুর দাদা বলত। কিসের এই ডিসিপ্লিন বা নিয়মশৃংখলা তা আজও ওর মাথায় ঢোকে না। সবাইকার তো ওদের অবস্থা নয়, তারা কি অজুহাতে এ ধরনের সুযোগ চাইবে ?

খালি পা, উড়ুনি ভরসা জামার বদলে—ভবেশের মতোই পরিচ্ছদ। সে অবশ্য তখনকার দিনে কাশীতে অনেকেরই ছিল। ধুতি চাদর দানে পেতেন ব্রাহ্মণরা, শুধু ধুতি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না, উড়ুনি তাই সহজপ্রাপ্য ছিল। উড়ুনি অন্য কাজেও লাগত। একদিনের কথা খুব মনে আছে বিনুর। এরা যে দোকানে পাতার পয়সা জমা রাখত, সেদিন কী কারণে যেন সে দোকান খোলে নি, বা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে চলে গেছে। কোন তিনটে হতভাগা ছেলে সিকি পয়সার পাতা নিতে আসবে, সেজন্যে সে তার জরুরী কাজ ফেলে বসে থাকবে এমন আশা করাও যায় না। এদের তখন সময় হাতে নেই আদৌ, গণেশ মহল্লায় বাড়ি গিয়ে থালা বা পয়সা এনে অন্য দোকান থেকে পাতা কিনে আনবে—সে সময় নেই। অগত্যা তিন ভাইকে উড়নি পেতে বসে খেতে হল। পাকা মেঝে, তবু ডালের সংস্পর্শে এসে নিচের ধুলো কি আর কিছুটা বিগলিত হল না ! তারপর রাস্তার কলে যথাসাধ্য কেচে সেই ভিজে চাদর গায়ে দিয়েই ইস্কুলে আসতে হল। সবটা যদি হলুদ রঙ হত তবু কথা ছিল, রঙীন চাদর ভাবা চলত এ একটা হরগৌরী অবস্থা। বেচারারা লজ্জায় মাথা তুলে কারও দিকে তাকাতে পারল না সারাদিন।

তবু একটা কথা বিনু বলতে বাধ্য, সকৃতজ্ঞচিত্তেই সে স্মরণ করে—বিশেষ এখনকার দিনের কলকাতা শহরের ছেলেদের শূন্যগর্ভ চাল ও বৃথা ঔদ্ধত্য যখন দেখে—ওদের এই দুরবস্থার কথা সবাই জানত, ছত্রের দিকের জানলা দিয়ে ওদিকে যেসব ক্লাস, চারতলা বাড়ির অন্তত আট প্রস্থ জানলা, কি আরও বেশী—সবই দেখা যেত কিন্তু তা নিয়ে কেউ কোনদিন সামান্য মাত্র বিদ্রূপ করেনি কি কোন বাঁকা কথাও বলে নি। সাধারণত এ প্রসঙ্গ নিয়েই কেউ আলোচনা করত না, করলেও এমন সহৃদয়তার সঙ্গে করত যে দুর্গাদাসদের কুণ্ঠা বা সংকোচের কোন কারণ থাকত না।

সেই স্কুল জীবনের পর আর কখনও দুর্গাদাসের সঙ্গে ওর দেখা হয় নি। শুনেছিল—অনেক কাণ্ড ক'রে, বিস্তর ঝড়ঝাপটা সয়ে, অনেক কষ্ট ক'রে কী একটা রঙের দোকান না কি করেছিল দেবনাথপুরার মোড়ে। একবার দাঙ্গার সময় ছুরি খেয়ে মারা যায়। যে অভাগা হয় চিরদিনই তাকে দুর্ভাগ্যের বোঝা বইতে হয়—এই বোধহয় নিয়ম।

দুর্গাদাস ছাড়া আরও তিনটি ছেলেকে ওর ক্রমশ সহনীয় বলে বোধ হয়েছিল, প্রণব আর মানস, গোরা আর কালা—দুই ভাই, আপন নয়, মামাতো পিসতুতো—অথবা সেই জন্যেই, বন্ধুর মতো ছিল। মানস বা কালা মামার বাড়িই থাকত। শান্ত ধীর স্বভাবের ছেলে, লেখাপড়ায় মাথা খুব একটা না থাকলেও মন ছিল। আর একটি হল হৃষিকেশ। তার কথা মনে আছে এই জন্যে যে, তার বয়স ওদের সকলের চেয়ে বেশী, কেমন একটু পাকাশিটে ধরনের চেহারা, চোস্ত পাজামা আর আলপাকার লম্বা কালো কোট গায়ে দিয়ে আসত—বোধহয় তার বাবার রেলের জামার রূপান্তর—বরাবর ঐ এক পোশাক, মানে যতদিন দেখেছে। বন্ধুত্ব করার মতো ছেলে নয়, তেমন স্বভাবও নয় হৃষিকেশের—তবে ভদ্র ও শান্ত স্বভাব বলে তাকে পছন্দ করত।

বছর খানেক যাবার পর যার সম্বন্ধে সত্যকার একটা আসক্তি বোধ করেছিল সে হল প্রণব বা গোরা। বাবার একমাত্র ছেলে, মা নেই। বাবা প্রত্যেকদিন হয় স্কুলে দিয়ে যেতেন নয় তো ছুটির সময় নিয়ে যেতেন। তাঁর বোধ হয় ভয় ছিল, ছেলে অসৎ সংসর্গে পড়ে 'বকে' যাবে। এই ছেলের মুখ চেয়েই তিনি আর বিয়ে করেন নি নইলে যখন স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে অনেকের সে বয়সে প্রথম বিয়েই হয় না।

এত আদরের ও উৎকণ্ঠার ছেলে, তবু গোরা, যাকে বলে আদুরে ছেলে, তা হয়ে ওঠেনি। আস্তে আস্তে কথা কইত—সামান্য তোৎলা ধরণ ছিল, তাতে যেন আরও মিষ্টি লাগত কথাগুলো, অন্য ছেলেদের মতো বাজে ফষ্টিনষ্টি করা—টাকা পয়সা কার কত, বীরেনবাবুদের অন্তঃপুরের ঘটনা নিয়ে মুখরোচক আলোচনা, এ সব প্রসঙ্গে একদম যোগ দিত না সে। লেখাপড়ার কথাই বেশী বলত, বড় হয়ে অধ্যাপক হবে সে, অনেক পড়াশুনো করবে, বাবার মুখ উজ্জ্বল করবে। দেশ-বিদেশে ঘুরবে—চীনের পাঁচিল, পিশার হেলানো টাওয়ার দেখবে, ব্যাবিলনের ঝুলনো বাগান, বিসুবিয়াসের মুখের মধ্যে নেমে যাবে, বন্দুক চালাতে শিখে কোন সাহেবকে বন্ধু ক'রে নিয়ে যাবে আফ্রিকার জঙ্গলে—নৌকো ক'রে গিয়ে জলহস্তী আর কুমীর মারবে, বনে সিংহ চিতাবাঘ গরিলা দেখবে—গরিলা ধরে আনার চেষ্টা করবে—এই সব ওর আশা।

ছেলেমানুষী কথা, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা ক'রে ও বয়সের ছেলেদের মন চলে না, চলা উচিত নয়—কিন্তু বিনুর মন বলে এই, এই বন্ধুই সে চেয়েছিল, এই বন্ধুই চায়। এই তার মনের মতো সঙ্গী। একেই সে ভালবাসবে, এ-ও একমাত্র তাকেই ভালবাসবে—দুজনে এ জগতে থেকেও আলাদা, নিজেদের মতো বিশেষ জগৎ তৈরী করে নেবে।

ঠিক যে এভাবে তখন ভাবতে পেরেছিল তা বোধহয় না—এই ধরণের একটা মনোভাব বোধ করেছিল—ঝাপসা ঝাপসা, যা ঠিক গুছিয়ে ভাবার মতো বয়স হয়নি তখনও। এই একান্ত ক'রে পাবার ইচ্ছা, বন্ধুত্ব সম্বন্ধে এই ধরণের চিন্তা স্পষ্ট আকার নিয়েছিল আরও অনেক পরে। কিন্তু প্রবল আকর্ষণটা বোধ করেছিল তখনই। গোরা আর কারও সঙ্গে কথা বললে ওর ভাল লাগত না

(ঈর্ষা কথাটা তখনও ঠিক বোঝে নি), ঐ সব উচ্চাশা বা জীবন-স্বপ্নের কথা সে আর কাউকে বলবে—এ বিনুর ভাল লাগত না। মনে হত ওরা কি বুঝবে এসব কথা? এ কথা ওদের শুনিয়ে লাভ কি? গোরা কথা বললে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যেন শুনত বিনু। মনে হত ওর একটি শব্দও না বাদ পড়ে।

কালোর এত সব উচ্চ আশা বা কল্পনা ছিল না। অনেক ভাই বোন নিয়ে ওদের সংসার। মামা ওকে এনে রেখেছেন, ছেলের সঙ্গী হিসেবে। এতে তার বাবা মা বেঁচে গেছেন। ওর সাফ কথা, কোন মতে বি-এ পাশ ক'রে একটা চাকরি যোগাড় ক'রে নেবে। অনেক দায়িত্ব ওর মাথায়, ওদের মাথায়। ওদের মানে ওর আর ওর দাদার। মানসের দাদার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরও সীমাবদ্ধ। স্কুললিভিং পাশ করলেই উঠে পড়ে লাগবে কোথাও একটা চাকরির জন্যে। বোনেদের বিয়ে দিতে হবে, ভাইদের পড়াশুনা আছে, বাবার যা সামান্য আয় তাতে সংসারই চলে না, মামা এখান থেকে মাঝে মাঝে সাহায্য করেন তাই। কাপড়-জামা, শীতের পোশাক, বিছানামাদুর, অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসার খরচ—সবই মামা পাঠান। বোনেদের বিয়ে হলে নিজেদের বিয়ে করতে হবে, সংসার পাততে হবে। সেকথাও ভাবে এখন থেকে।...এই সব তুচ্ছ ব্যক্তিগত কথা, অতি ক্ষুদ্র জগতের সীমাবদ্ধ কল্পনা ও চিন্তার অভিব্যক্তি। কালোকে করুণার চোখেই দেখত বিনু—গোরার সঙ্গে তুলনা করে। তবু গোরার সঙ্গী—তাছাড়া কালোও ভদ্রস্বভাবের ছেলে বলে তাকে খারাপ লাগত না।

স্কুল—বিশেষ এই স্কুলবাড়ি ওকে যেন চারিদিক থেকে চেপে ধরে ছিল, তবু এখানেই থাকতে থাকতে হয় তো ওরও মন ঐ একান্ত সাধারণ মাপটাই মেনে নিত জীবনের—কিন্তু ভাগ্য ওকে মুক্তি দিলেন।

মার ইচ্ছে ছিল না এখান থেকে ছাড়িয়ে অন্য কোথাও দেওয়া হোক, কারণ এটা খুব কাছে, তাঁর কোলের ছেলে বেশী দূরে যাবে, পথে কত কি বিপদ ঘটতে পারে—এ সম্বন্ধে তাঁর কল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী। তাছাড়া গোরা আর কালা এই পাড়াতেই থাকে, কিছু হলে তারাই তৎক্ষণাৎ খবর দেবে। কিন্তু এখন তাঁর ইচ্ছাই একমাত্র নয়। রাজেন এখন বড় হয়েছে, দেহ বা বয়সের দিক থেকে যত না, মানসিক গঠনের দিক থেকে বেশ যেন অনেকটা বড় হয়ে গেছে এই তিন বছরেই। সংসার দেখতে, বাজার হাট করতে সে-ই একমাত্র। তাতেই একটা কর্তৃত্বের সহজ ভঙ্গী এসে গেছে তার। লেখাপড়াতেও খুব মন বসেছে। স্কুল লাইব্রেরী থেকে মোটা মোটা বই এনে নিবিষ্ট চিত্তে পড়ে। মাকেও জঙ্গমবাড়ির এক লাইব্রেরীর মেম্বার ক'রে দিয়েছে—সেখান থেকে বই এনে দেয়, তার মধ্যেও ভাল বই কিছু থাকলে দ্রুত পড়ে নেয়।

রাজেন বললে, 'এই স্কুলে কিছু হবে না, যা দেখছি। ছাড়িয়ে নিয়ে আমাদের স্কুলে দোব।'

মা ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'তা তুই তো চলে যাচ্ছিস, তবে আর ওকে ওখানে দিয়ে লাভ কি?'

অসহিষ্ণু রাজেন বলে, 'আমি যাচ্ছি এই স্কুলে ক্লাস এইটের বেশী নেই বলে। আমি থাকছি না বলে কি ইস্কুলটা উঠে যাচ্ছে, না মাস্টার মশাইরা চলে যাচ্ছেন! তাঁরা আমাকে স্নেহ করেন, আমার ভাই বলে তাঁরাই নজর রাখবেন।...সেদিন সেক্রেটারী চিন্তামণিবাবু নিজে, আমি ফার্স্ট হয়েছি বলে ডেকে পাঠিয়ে কাছে বসিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে কত আদর করলেন, মিষ্টি

খাওয়ালেন। প্রাইজে কি বই নেব জিজ্ঞাসা করলেন। তিনিই বললেন, তোমার ভাইকে এখানে ভর্তি ক'রে দাও, আমি নিজে নজর রাখব। ওখানে থাকলে পড়াশুনো কিছু হবে না।'

'অতদূর যাবে, ছেলেমানুষ—তুই তো উল্টো দিকে যাবি—একা পারবে যেতে?'

'ওর চেয়ে অনেক ছেলেমানুষরাও যাচ্ছে মা। তাছাড়া ওর বন্ধুরা মানস আর প্রণব ওরাও তো যাচ্ছে। তিন বন্ধুতে একসঙ্গে যাবে—সেই তো ভাল।'

'ও, ওরা যাচ্ছে।' মা তবু কিছুটা আশ্বস্ত হন। বাধাও দিতে পারেন না—তেমন কোন কারণ খুঁজে পান না বলে।

মিশরি পোখরা থেকে পাঁড়ে হাউলি প্রায় দু মাইল পথ। কিন্তু এইটুকু হাঁটা নিয়ে তখন কেউ মাথা ঘামাত না কাশীতে। বড়লোকের ছেলেরাও স্বচ্ছন্দে হেঁটে যেত। এর থেকে বেশী পথও হাঁটত। চৌখাম্বার মিত্তির বাড়ি বা বোসেদের বাড়ির ছেলেরাও অন্য সহপাঠীদের সঙ্গে দল বেঁধে নতুন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যেত নাগোয়ায়—অন্তত পাঁচ মাইল পথ। যাওয়া আসা মিলিয়ে দশ। এরা ধনী সন্তান—গাড়িও ছিল নিজস্ব—কিন্তু সহপাঠী বন্ধুরা হেঁটে যাবে, তারা যাবে গাড়িতে, একথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। তখন সাইকেলের চল হয়নি এত, ষাট টাকার কমে একটা ভাল সাইকেল হত না। ষাট টাকা অনেক পরিবারের পাঁচ ছ' মাসের আয়। এক্কা ছিল, শেয়ারে ভাড়া খাটত, গোধুলিয়া কি রামাপুরা চৌমোহানী থেকে পাঁড়েহাউলি—পাঁড়েহাউলি কেন, সোনারপুরা পর্যন্ত সওয়ারী-পিছু তিন পয়সা ভাড়া—কিন্তু সেও তো বিলাস!

হেঁটে যেতে বিনুর ভাল লাগত খুব। এর মধ্যে ওর মুক্তির আনন্দ ছিল একটা। ওদের দক্ষিণ-খোলা বারান্দার সামনে অবারিত অনেকখানি মাঠ, তার ওপারে চওড়া রাস্তা, তবু তেতলা থেকে নামার হুকুম ছিল না বলেই বন্দী বন্দী মনে হত। ভোরে নরোত্তম গোয়ালার কাছে দুধ আনতে যাওয়া আর স্কুলে যাওয়া—তা সেই বা কতটুকু—বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে পেত না। মার সঙ্গে গঙ্গাস্নান কি বিশ্বনাথ দর্শনে যাওয়াতে ঠিক মুক্তির স্বাদ ছিল না।

এই নরোত্তম গোয়ালা এক অদ্ভুত জীব। সন্ধ্যে থেকে গাঁজা খেয়ে ভোম হয়ে থাকত। সকালে যখন দুধ দুইত কি গরুর পরিচর্যা করত তখন দুই চোখ জবা ফুলের মতো লাল দেখাত। মেজাজও থাকত সপ্তমে চড়ে—কিন্তু দুধে জল দিত না আর ভাল ভাল ভাওয়ালপুরী কি মুলতানী গাই রাখত বলে দূরদূরান্তর থেকে লোক আসত দুধ নিতে। দুধ যোগান দিতে যেত না নরোত্তম—অন্য যারা যেত তাদের বাকী দুধ পাইকিরি বেচে দিত। খাঁটি গরুর দুধ, দামও একটু বেশী নিত—টাকায় আট সের অর্থাৎ দু আনা ক'রে সের। বিনুরা এক সের ক'রে দুধ নিত, অত ছেলেমানুষ বলেই হোক আর চুপ করে ভয়ে ভয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকত বলেই হোক নরোত্তম ওকে একটু স্নেহের চোখে দেখত। বীরা আর লছমী—লছমীর মেয়ে বীরা—দুটি পাটকিলে রঙের গাই ছিল, ক্ষীরের মতো ঘন দুধ হত, বিনু ঘটি নিয়ে গেলে এদেরই একটা দুয়ে ওকে দিত, অবশ্য খুব দেরি হয়ে না গেলে। গাই খেঁড়ো হয়ে এলে বিনুর ঘটি নিয়ে সরাসরি তাতেই দুয়ে দিত। সে ঘটিটায় একসের দুধই ধরত, মাপজোকের কোন প্রয়োজন ছিল না।

এই নরোত্তমের কাছে দুধ আনতে যাওয়া উপলক্ষেই ওর জীবনে এক

স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একদিন—আশু মুখুজ্জে বলতে সমস্ত বাঙ্গালী সমাজে তখন যে তেজঃস্বরূপ পুরুষ-ব্যাঘ্রকে বোঝাত। তিনি কাশীতে দুর্গাপূজা করবেন বলে মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী মশাইয়ের একটা বাড়িতে উঠেছিলেন লক্ষ্মীকুণ্ডে—কদিনের জন্যে। পরে কামেচ্ছায় রাজা মতিচাঁদের বাগান-বাড়িতে চলে যান, সেইখানেই পুজো হয় (এঁর বাগানের ল্যাংড়াই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হত সেকালে)।

বিনু শুনেছিল প্রথম নাকি পণ্ডিত ব্রাহ্মণরা আশুবাবুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে চাননি, উনি বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন বলে, পরে এক গিনি করে দক্ষিণা দিয়ে অধ্যাপক-বিদায়ের ব্যবস্থা করতে অনেকের চাপে সে বিরূপতা দূর হয়ে গিছল।

আশু মুখুজ্জের নাম তখন বাঙালীর মুখে মুখে। তাঁর নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, শিক্ষানুরাগ বিশেষ মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অসামান্য উদ্যম, মাতৃভক্তি—তাঁকে জীবিতকালেই কিম্বদন্তীর পুরুষ ক'রে তুলেছিল। সেসব কথা ঠিক না বুঝলেও—অনেক শুনেছে বিনু, তাতে একটা উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে মনে। ছবিও দেখেছে খবরের কাগজের পাতায় দিনের পর দিন। এই মানুষ এসে ওদের পাড়ায় উঠবেন, উঠেছেন—এ সংবাদে ঐ ছোট্ট পাড়ার ক্ষুদ্র বাঙালী সমাজে রীতিমতো উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, তার কিছুটা বিনুও অনুভব করবে—এ স্বাভাবিক।

তাই সেদিন দুধ নিতে গিয়ে আশুবাবুকে হঠাৎ তাঁর চাকরের সঙ্গে সেখানে আসতে দেখে অবাক হয়েই গিয়েছিল। প্রায় হাঁটুর-কাছে-ওঠা খাটো কাপড় (বা ঐভাবে পরা), খালি গা, হাতে একটা লাঠি। সঙ্গের লোকটির হাতে বেশ মাঝারি আকারের বালতি, বোধহয় সের চারেক দুধের বরাত করেছেন—কি আরও বেশি। নরোত্তম বেছে বেছে তেমনি গরুই দুইবে, যাতে এক গাইয়ের দুধই সবটা হয়। তাই একটু দেরি হচ্ছে। বিনুকেও খানিকটা দাঁড়াতে হবে, নয়ত 'ঘাঁটা' দুধ নিতে হবে—নরোত্তমের বড় বৌ (দুই বিয়ে নরোত্তমের) শুনিয়েই দিয়েছে আগে।

বিনুর সেদিকে খেয়ালও ছিল না, সে অবাক হয়ে এই ব্যাঘ্র-পুরুষকে দেখছে এক দৃষ্টে। আশুবাবু স্তুতিতে অভ্যস্ত, তবু স্তুতি ভালও বাসতেন—তা যেখান থেকেই আসুক। বিশেষ এইটুকু ছেলের সভয় সসম্ভ্রম দৃষ্টির শ্রদ্ধার্ঘ্য যে নির্ভেজাল তা বুঝতে তাঁর ভুল হয় নি। তিনি সস্নেহ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'অমন ভাবে আমার দিকে চেয়ে কি দেখছ খোকা, আমাকে চেনো?'

বিনু ঘাড় নেড়ে জানাল সে চেনে।

'কে বলো দিকি?

'শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।'

'বাঃ! তা কি ক'রে চিনলে?'

'আপনি এসেছেন শুনেছি, আপনার ছবি দেখেছি।'

'বা রে, বেশ খোকা। তোমার নাম কি? কোন বাড়ি থাকো? কোন ইস্কুলে পড়ো?' ইত্যাদি প্রশ্ন করলেন খুশী হয়েই।

বিনুর মনে হয় ওর জীবনে ঐটেই প্রথম স্মরণীয় দিন। এবাড়িতে দুর্গাপূজা বিশেষ আশুবাবু যে সমারোহ সহকারে করবেন সম্ভব নয় বলে কাশিমবাজারের পুণ্যশ্লোক মহারাজার আগ্রহ সত্ত্বেও এ বাড়ি ছেড়ে মতিচাঁদের

বাগান-বাড়িতে চলে যেতে হল। যেদিন চলে গেলেন আশুবাবুরা—সকালবেলা, বোধহয় সাড়ে নটা দশটা নাগাদ—মতিচাঁদেরই পাঠানো বগি-গাড়ির পিছন দিকের আসনের সবটা জুড়ে, সেদিন বিনু যেন একটা দৈহিক কষ্ট অনুভব করেছিল।

॥ ১৪ ॥

দীর্ঘ পথ হাঁটা যে এত আনন্দময় হয় এই প্রথম জানল বিনু।

মিশির পোখরার মোড়ের বটগাছতলা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ে রামাপুরার গির্জে ঘরটাকে ডাইনে রেখে 'ঘাসিয়াড়ি পট্টির' মাঠ পেরিয়ে একটা সরু গলি দিয়ে বড় রাস্তায় পড়া। তারপর সে কত কি দোকানপাট—ছোট ছোট রসনাতৃপ্তিকর নানারকম খাবারের দোকান, ফুটপাথের ওপরই লম্বা বেতের মোড়ার ওপর বসানো বিরাট থালায় চলমান বিপণিই বেশীর ভাগ—এক্কা ও টাঙ্গাওয়ালাদের 'সোনারপুরা চৌমোহানী' 'নাগোয়া' 'অসি' 'সংকটমোচন' চিৎকার, কে কত কম ভাড়ায় যেতে রাজী তারই প্রতিযোগিতা—তার মধ্যে দিয়ে অগস্ত্যকুণ্ডু, জঙ্গম বাড়ি, নাটকোটার মঠ, দেবনাথপুরার মোড়, মদনপুরা—তারপরই পাঁড়ে হাউলি, বাঁদিকে 'য়্যাংলো বেঙ্গলী' বা চিন্তামণির ইস্কুল, ডাইনে 'বেঙ্গলীটোলা'। কতটুকুই বা পথ, মনে হত এ পথ এরই মধ্যে শেষ হয়ে যায় কেন, কেন আরও বহুদূর-বিসর্পিত হয় না ; কেন ইস্কুলটা তাদের ঐ কোন সুদূর শিবালা বা লংকায় হল না ? পথচলার আনন্দটা আর একটু বেশী ভোগ করা যেত।

সেণ্ট্রাল কাশী ইনস্টিটিউশানের চারতলা বারান্দাহীন বাড়ি থেকে এসে এ ইস্কুল বাড়িটাও কিছু মুক্তির স্বাদ দিয়েছিল বৈকি ! একটা উঁচু পোতার ওপর বাংলো ধরনের একতলা বাড়ি, সামনে বেশ বিস্তৃত একটা মাঠ—দুপাশে, পিছনেও খানিকটা ক'রে জমি—তাতে ছেলেরা মধ্যে মধ্যে একটু বাগানও করে, তাতে প্রাইজ আছে। অবশ্য চারিদিকে বাগানঘেরা সে অবস্থা আর নেই, ক্লাসঘর বাড়াবার জন্যে পাশে পাশে মাটি দিয়ে পেটা ছাদের (ধোবার পাটন) কিছু কিছু শ্রীহীন ঘর করতে হয়েছে, তাতে অনেকটাই জমি চলে গেছে, তবু টিফিনের সময় মনের সুখে ঘুরে বেড়াবার পক্ষে অনেকখানি মাঠ তখনও অবশিষ্ট ছিল। পাশে বাগানের জমিতে ওর দাদা একটা 'আনার' বা ডালিম গাছ পুঁতেছিলেন—সে গাছটা বহুদিন পরেও দেখে এসেছিল বিনু।

কিন্তু তবু স্কুল জীবনের আনন্দ এখানেও পেল না সে। তার কারণ—যত দূর ভেবে দেখেছে সে—ওরই মনের বিচিত্র গঠন।

ওখানে যে বাকী ছেলেদের চেয়ে অনেক বড়, বেমানান লাগত, এখানে তেমন মনে হওয়ার কোন কারণ ছিল না। রাধানাথ, পণ্ডা ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। এমনি বড় তো বটেই, ফেলকরা ছেলে বলে তারাই এদের মধ্যে বরং বেমানান। রাধানাথ তো বেশ মোটাসোটা, ওর চেয়ে ঢের বেশী স্বাস্থ্যবান। পণ্ডার তখনই গোঁফের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—ক্লাস সিক্সেই। নরেশ বলে একজন ছিল, সে অত মোটা বা ঢ্যাঙা না হলেও তার মুখ দেখেই বোঝা যেত ঢের বেশী বয়স তার—আর, কিছুদিনের মধ্যেই টের পেয়েছিল বিনু—জীবনের কোন রহস্য, দেহের কোন ধর্মই তার জানতে বাকী নেই। এদের পড়াশুনো হবে না সে বিষয়ে তারাও নিশ্চিত—শুধু মা-বাবার ব্যাকুল দুরাশার মাশুল যোগাতেই তারা ইস্কুলে আসত। এই নরেশকে বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ পরে কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত অর্ধোন্মাদ

অবস্থায় দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রাক্তন সহপাঠী বা পরিচিতদের কাছ থেকে নেশার পয়সা ভিক্ষা করতে দেখেছে।

এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা অন্তরঙ্গতা হওয়া সম্ভব নয়। সোজাসুজি হয়ত অতটা বুঝতে পারত না—যদি না এরা প্রথম চোটেই তাকে দিয়ে (অনভিজ্ঞ ও সরল বুঝে) নিজেদের প্রথম কৈশোরের সদ্যজাগ্রত তীব্র যৌন ক্ষুধা মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করত। তাতেই ভয় পেয়ে একটা অপরিচিত বিতৃষ্ণা বোধ ক'রে—ওদের সঙ্গ বিষের মতো পরিহার ক'রে চলত বিনু। এদের মধ্যে নরেশই ছিল সবচেয়ে 'ক্ষুধার্ত', সবচেয়ে বেপরোয়া। সে ঐ বয়সেই, এমন কি ওপরের ক্লাসের সুশ্রী চেহারার ছেলেদেরও ধরে ধরে বকাত। তার মধ্যে সরোজাক্ষ ছেলেটির জন্যে আজও দুঃখ হয় বিনুর—কী সুন্দর দেখতে ছিল, যেন কিশোর কন্দর্প। তেমনি মিষ্টি স্বভাব। বড় বংশের ছেলে, লেখাপড়াতেও মন ছিল। ঐ নরেশ তাকে দিয়ে তৃষ্ণা মেটাবার পর পুরোপুরি অধঃপতনের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

শুধু সরোজাক্ষ নয়—এ ক্লাসে দুটি খুব ধনী সন্তান—কাশীর বিখ্যাত বাঙালী কায়স্থ পরিবারের ছেলে পড়ত—তার মধ্যে একজন বাবুল, খুব সুন্দর দেখতে ছিল, পণ্ডা নরেশের দল তারও জীবন নষ্ট ক'রে দিয়েছিল, অল্পবয়সেই 'ডালকামণ্ডী'র খারাপ পাড়ায় যেতে শুরু করেছিল। পরে বিয়েও করে নি আর—কে জানে, হয়ত করতে সাহস করে নি।

এদের সঙ্গে বন্ধুত্বের কোন প্রশ্নই ওঠে না। বাকী যারা, মোটা অজিত, ফরসা সুধামাধব—এরা ছিল অতিমাত্রায় গোলা আর আত্মকেন্দ্রিক—বন্ধুত্ব জিনিসটাই বুঝত না, অর্থাৎ এসব বাজে ভাবাবেগের ধার ধারত না। এমনি গোলা সাধারণ ছেলেই বেশির ভাগ, যারা বড় হয়ে চাকরি বাকরি করবে, বিয়ে করবে ছেলেমেয়ে হবে, তাদের শিক্ষা বিয়ে-থা—এর বেশি কোন জগতের ধার ধারবে না কোনদিন। অলক ফার্স্ট বয়, খুবই ভদ্র, শান্ত,—নিরহংকারীও বটে—তবু কেমন যেন অতিমাত্রায় আত্মস্থ, সুদূর, রিজার্ভড্ যাকে বলে, যারা দেখে বেশী, নিজেরা ধরা দেয় না। নিজের—শ্রেষ্ঠত্ব যদি বা না বলা যায়—বুদ্ধি ও লেখাপড়ার জ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন। তার ভক্ত শ্রেণীতে থাকা যায়, বন্ধু হওয়া যায় না।

বিনু যাদের সঙ্গে মিশত, যারা ওকে দূরে পরিহার করত না, অথবা নিজেদের বিশেষ খোলসের মধ্যে আত্মগোপন করতে চাইত না—তাদের মধ্যে দুটি ছেলে—কাশীনাথ ও নাগেন্দ্রনাথকে ওর ভালো লাগত। সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, কাশীনাথ কায়স্থ—ঘোষ ; নাগেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে—ব্রাহ্মণ। এদের উচ্চাশা বলতে কিছু নেই ; ইস্কুলে এসেছে আসাই নিয়ম বলে ; কাশী বলত, 'কোন মতে ইস্কুলের পাশটা দিয়ে নিতে পাবলে হয়। বাব্বা, বইখাতা আর নয়। বাবা বলেছে একটা পাস দে নিদেন, তাহলেই একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে পারব।' নাগেন অতখানিও মাথা ঘামাত না। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে চেহারার ছেলে, উড়ুনি গায়ে খড়ম পায়ে ইস্কুলে আসত—নিজের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন, মাথার টিকি উদ্ধত হয়ে থাকত, তা নিয়ে সহপাঠীরা অজস্র ঠাট্টা-তামাশা করা সত্ত্বেও তা ছোট হয়নি কোনদিন।

এদের মধ্যে ওর আদর্শ সঙ্গী—অবশ্য আদর্শ যে কেন তা কি ও জানত ? শুধু নিজের টানটাই অনুভব করত—গোরা।

সেও আদুরে ছেলে—বিনুর মার ভাষায় 'বিধবা' বাপের একমাত্র ছেলে, যার জন্যে যৌবনেই সন্ন্যাসী সেজেছেন ওর বাবা—তবু নষ্ট হয়নি। দুর্দান্ত নয়, উড়নচণ্ডে নয়, জেদীও নয়। আস্তে কথা বলে, ঠাণ্ডা স্বভাবের, ঠাট্টা করলে বোঝে, রাগ করে না—এবং সবচেয়ে যেটা ভাল লাগে বিনুর, স্বপ্ন দেখতে জানে। খুব বড় হবে সে, বাপের মুখ উজ্জ্বল করবে, বাবাকে সুখী করবে। ডাক্তার কিম্বা অধ্যাপক হবে—ডাক্তারী করলে শহরে বসে মোটা ফী হাঁকবে না কিম্বা মোটা মাইনের চাকরিও খুঁজবে না। গ্রামে গিয়ে বসবে, সাধ্যমত গরিবদের চিকিৎসা করবে। চাষীরা ফী দিতে পারবে না, ঘরের দুধ ঘি কলা মুলো লাউ দিয়ে যাবে, তাতেই চলে যাবে ওদের। মোটা ভাত কাপড় ছাড়া কিছু দরকার নেই। নিজের কিছু জমি থাকবে যাতে ভাতটা বাঁধা থাকে।

আবার কখনও বলে অধ্যাপক হবে সে। পি সি রায়ের মতো সব টাকা লোককে দান করবে, গরিব ছেলেদের শিক্ষার জন্যে খরচ করবে। মোটা জামা পরবে, মোটা কাপড়। নিরামিষ খাবে, ছেলে-মেয়েদেরও সেইভাবে তৈরী করবে। তার হাত দিয়ে যদি দশটা ভাল ছাত্রও বেরোয় তাহলেই জন্ম সার্থক ভাববে।

এই গোরাকেই সে একান্ত ক'রে পেতে চায়। দুজনে দুজনের একমাত্র বন্ধু হবে। আর কাউকে চাইবে না, স্বতন্ত্র একটা জগৎ গড়ে তুলবে তারা নিজেদের দিয়ে, সেখানে আর কারও প্রয়োজন থাকবে না। এখনও না, পরেও না। বিয়েও করবে না। বেশ তো, গোরা যদি বড় হয় হোক, সে গোরার কাজে সাহায্য করবে, সেবক হয়ে থাকবে, সারা জীবন উৎসর্গ করবে বন্ধুর সুখের-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে।

কিন্তু এই একান্তভাবে পাওয়া হয়ে ওঠে না। তার কারণ গোরা ভাবপ্রবণ, রোমাণ্টিক নয়। আজ সেটা বোঝে বিনু। সে আদর্শবাদী—জীবন সম্বন্ধে উচ্চ আশা আর উচ্চ ধারণা। বন্ধুত্ব যে প্রেমের পর্যায়ে উঠতে পারে সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। সে বিনুকে ভালবাসে—যেমন সহপাঠীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পছন্দসই ছেলেকে ভালবাসে অধিকাংশ কিশোর বয়সী ছাত্র। অথবা বিনু যে তার দিকে আকৃষ্ট, সে সম্বন্ধে সে অবশ্যই সচেতন, সে জন্যেও সে একটু বেশী সঙ্গ দেয় ওকে। ভক্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা ঠিক নয়—ভক্ত সম্বন্ধে দুর্বলতা বলাই উচিত।

শুধু এইটুকুতে মন ওঠে না বিনুর। যতটা অন্তরঙ্গতা চায় সে—তা পায় না। সাহচর্যই বা কতটুকু পেতে পারে। ওর বাড়িতে কোন বন্ধুকে নিয়ে আসবে, সে সাহস নেই ; মা এ বিষয়ে অত্যন্ত কড়া। ও যাবে গোরাদের বাড়ি সে স্বাধীনতা নেই। গোরার বাবাও অবশ্য বাজে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আড্ডা দেওয়া একদম পছন্দ করেন না, তবে বিনুকে স্নেহের চোখে দেখেন—গোরাকে সে ভালবাসে বলে। ফলে অন্তরঙ্গতা আরও গাঢ়বন্ধ হওয়ার সুযোগই মেলে না।

গোরাকে কাছেই বা পায় কতটুকু ? বাড়ির কাছে বাড়ি—সূর্যকুণ্ড আর লক্ষ্মীকুণ্ড—যাবার সময় ডেকে নিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই যায়। তার মধ্যেও কোন দিন দুজনের কারও দেরি হয়ে গেলে অন্যকে একা যেতে হয়। ফেরার সময়ও। সুধা থাকে আরও কাছে, মধ্যে মধ্যে সে এসে জোটে ওদের দলে, তাতে বিরক্ত হয় বিনু কিন্তু উপায় কি ?

এই সময়টুকু যা খুব কাছে পায় গোরাকে। স্কুলে গেলেই যেন বন্ধুর

ভিড়ে হারিয়ে যায় গোরা। বাজে ছেলেদের বাজে গল্প, আরও বাজে রসিকতার চেষ্টা। অবশ্য গোরা ভদ্র এবং শান্ত প্রকৃতির হলেও একটু গম্ভীর প্রকৃতির, এদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার একটা সহজাত বর্ম তার ছিল। অমন নীরব শান্ত কাঠিন্য এক অলক ছাড়া আর কারও দেখে নি বিনু।

এই অলককে নিয়েই বিনুর যত অশান্তি। গোরা আদর্শবাদী বলেই অলকের প্রতি তার একটা সম্ভ্রম মেশানো আকর্ষণ। ক্লাসে ঢুকেই সে প্রাণপণে চেষ্টা করত অলকের পাশে বসতে। দুজনের স্বভাবে কিছুটা মিলও ছিল বলে অলক একমাত্র ওর সঙ্গে যা একটু গল্প করত, সহজভাবে মিশত। যদিও পড়াশুনোয় গোরা যে তার সমকক্ষ নয় সে সম্বন্ধে তার সচেতনতার বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না।

বিনু লেখাপড়ায় অলকের সমান হয়ে উঠতে পারলে অথবা ছাড়িয়ে গেলে যে এ সমস্যার সমাধান হয়—অলক সম্বন্ধে সম্ভ্রমের কারণটা ওর মধ্যে খুঁজে পেলে ওর সান্নিধ্যই বেশী কামনা করত গোরা, কারণ অলকের মধ্যে স্নেহ-প্রীতির উত্তাপ ছিল না, বরং একটু নাতি-প্রচ্ছন্ন অহংকারই ছিল, সে জায়গায় যে প্রীতি ও পুজোর আসন সাজিয়ে বসে আছে তার দিকে আকৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক—সে কথাটা সেদিন মাথায় যায় নি বিনুর। নিকটে আসতে পারছে না বলেই যে সে আরও দূরে চলে যাচ্ছে এ কথাটাও বুঝতে পারে না। বিনু লেখাপড়ায় একেবারে অক্ষমের দলে নয়, স্মরণ-শক্তি ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা দুটোই ছিল তার—মাষ্টার মশাইরা বুঝিয়ে দিলে পড়া বুঝতে আর তা মনে রাখতে পারত—কিন্তু গোরার সম্বন্ধে তীব্র আকর্ষণ, ও সেই কারণেই অলক সম্বন্ধে প্রবল ঈর্ষা, এইতেই যাকে দিন-রাত্রির অধিকাংশ সময় আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, সে পড়ায় মন দেবে কখন ?

ফলে পরীক্ষাগুলোয় যখন দেখা যেত অলক তো বটেই, গোরা এমন কি সুধা অজিত এদের থেকেও সে কম নম্বর পেয়েছে তখন অলকের চোখে অনুকম্পা ও তাচ্ছিল্যের যে প্রায়-অলক্ষ্য দৃষ্টি ফুটে উঠত সেটা কাঁটার মতোই বিঁধত বিনুকে। তার চেয়েও বেশী বিঁধত একটা জায়গায়—হয়ত সেও বিনুর অনুমান, নিজের গরজেই অনুমানটাকে সত্য ভাববার চেষ্টা করত—গোরা যেন একটু লজ্জিত বোধ করত বিনুর থেকে বেশী নম্বর পাওয়ার জন্যে।

একবার, বোধহয় হাফ ইয়ার্লির ফল বেরোতে বাড়ি ফেরার পথে খুব আস্তে প্রশ্ন করল গোরা, 'ক্লাসে তো তুই চটপট উত্তর দিস মাষ্টার মশাইরা কিছু জিগ্যেস করলে, খাতায় লেখার সময় অমন যা তা লিখিস কেন ? শ্যামবাবু বলছিলেন অর্ধেক কোশ্চেন খানিকটা করে লিখে ছেড়ে দিয়েছিস, জানা উত্তর ভুল লিখেছিস —কেন রে ? অশ্বিনীবাবু তোর খাতা নিয়ে অলককে দেখাচ্ছিলেন, কবিতা মুখস্থ যেটা লিখতে হবে, ক্যাসাবিয়াঙ্কা, সে তো তোর মুখস্থ, অথচ কোশ্চেনের সংখ্যাটা লিখে সাদা পাতা ছেড়ে গেছিস। মেমরি তোর সকলের চেয়ে ভাল, শুধু অবহেলা ক'রে লিখিস নি, এই কথাই বলছিলেন উনি। মন-টন খারাপ ছিল ?'

এর উত্তর কি বিনু সেদিন নিজেই জানত ! আজ হলে স্পষ্ট উত্তর দিত, 'তোমার জন্যে—তোমাদের জন্যে, তুমি আর অলকই দায়ী এর জন্যে।' কিন্তু সেদিন বলতে পারে নি। কি বলবে তাই ভেবে পায় নি।

আসলে নিজের মনের এই চেহারাটা চোখে পড়ার বয়স ছিল না সেদিন,

বোঝারও না। এটা যে ঈর্ষা, নিজের হীনমন্যতাবোধ—তা বোঝার বয়সও সেটা নয়।

উত্তর দিতে পারে নি, তবে সেদিন মনে হয়েছিল পাথরে মাথা কুটে মরে সে। কোন কথাই বলা হয়ে ওঠে নি নিজের দু চোখ জ্বালা করে যে জল বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল সেইটে গোপন করতে নিঃশব্দে মাথা নিচু ক'রে এগিয়ে গিছল।

গোরাও—ঠিক এতটা বোঝে নি, তবে বিনু আহত হয়েছে সেটা বুঝে আর কোন কথা বলে নি, একটু দ্রুত গিয়ে ওকে ধরারও চেষ্টা করে নি।

বরং বিনু ভুল বুঝল ওকে, সহানুভূতিটাকে বিদ্রূপ মনে করল ভেবে একটু অভিমানই বোধ করেছিল।

এত ছেলে—বন্ধু না হলেও সহপাঠী তো বটেই—তার মধ্যে থেকেও বিনু একা, নিঃসঙ্গ।

এ অবস্থাটা ও কিন্তু ঐ বয়সেই বুঝত। সে জন্যে একটা লজ্জাও যেমন অনুভব করত, তেমনি একটা অকারণ অবোধ জ্বালাও।

আজ মনে হয় খুব অকারণ কি ?

মা কারও সঙ্গে মিশতে দিতেন না। ওর কোন বন্ধু বাড়িতে এলে তাকে শুনিয়েই ওকে নানা কথা বলতেন ! মার সেই ধীর শান্ত গাম্ভীর্য, মহিমময়ী ভঙ্গী এখানে এসে অপরিসীম পরিশ্রমে ও দৈন্যে কষ্টে যেন কোথায় চলে গেছে, সে জায়গায় অনেক কর্কশ হয়ে উঠেছে তাঁর ভাষা। আচরণ হয়ে উঠেছে রূঢ়, কঠিন। ফলে মা যে সব মন্তব্য করতেন তা ওর বন্ধুদের কানে যেতে পারে ভেবেই ওর লজ্জায় সীমা থাকত না।

অথচ বিনুর বন্ধুরা—বিশেষ গোরা আর সত্যনারায়ণ ওকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে টানাটানি করে ; গোরার বাবা ভূতেশবাবু বিশেষ ক'রে—ওকে খুব স্নেহের চোখে দেখেন, এটা-ওটা খাওয়াতে চান কিন্তু এর পাল্টা কোন প্রতিদান দিতে পারবে না জেনেই সে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। সহজে কারও বাড়ি যেতে চায় না, মানে বাড়ির মধ্যে, ডাকার দরকার হলে বাইরে থেকেই ডাকে।

এরা ওর আচরণের ভুল অর্থ বোঝে। অহংকার, দেমাক, ঠেকার—এই শব্দ ব্যবহার করে ওকে শুনিয়েই।

আরও অনেক কথা বলে, ঠাট্টা করে—তাতেও অপমানে ওর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করে অথচ এর যে কি প্রতিকার করা যেতে পারে তা ভেবে পায় না।

মা যদি ওকে খেলাধুলোও করতে দিতেন—ইস্কুলের মাঠে তো মাস্টার মশাইয়ের সামনেই খেলার ব্যবস্থা—তাহলে বন্ধুদের সঙ্গে মেশা কিছুটা সহজ হত। কিন্তু মা ওকে ছাড়েন না, বলেন, 'হ্যাঁ, ঐ ভ্যাবা-গঙ্গারাম ছেলে, দিন-রাত যেন এক ভাবের ঘোরে থাকে। এখনও নিজেকেই নিজে গল্প শোনায় একটু আবডাল হলেই—খেলবে না ছাই, বড় বড় দামড়া দামড়া ছেলে সব মাঠে আসে।...আর তাছাড়া, এতক্ষণ না খেয়ে টাঙ্গিয়ে থাকতে পারবে না তো, ফিরে এসে খেয়ে আবার এতটা পথ হেঁটে যাওয়া—ফিরতে সন্ধ্যে উতরে যাবেই। কোন বকাটে ছেলের পাল্লায় পড়বে, বিড়ি বার্ডসাই খেতে শিখবে হয়ত—পকেটমার তৈরী ক'রে দেবে।...না না, ও এমনি থাক। তাছাড়া ও খেলাধুলোতে

তত রতও নয়, গল্পের বই পড়তেই ভালবাসে, তাই পড়েও। বাড়িতে ফেরামাত্তর তো কেউ ওকে ইস্কুলের পড়া পড়তে বলে না, অন্য বই পড়াতেই ওর অনেক শান্তি।'

কিন্তু এত বিচার রাজেনের বেলা করেন না মা। সে যত না বয়সে বড় হয়েছে তত বড় হয়েছে সংসারের দায়িত্ব নিয়ে। বাজার-হাট এটা-ওটা—যা যখন দরকার হয় রাজেনই করে। সেই হিসেবেই কখন যে ঐ চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে বাড়ির কর্তার স্থানটি অধিকার করেছে—কেউ বোধহয় বুঝতেও পারে নি। মাও না, তিনি যে কবে এ সত্যটা মেনে নিয়েছেন তাও তিনি জানেন না।

রাজেন খেলাধুলোও করে, তারপরও অধিকাংশ দিন বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে বসে আড্ডা দেয়, সে সব দিনে সন্ধ্যার বেশ খানিকটা পরেই বাড়ি ফেরে। প্রথম প্রথম এই দেরি করে ফেরা নিয়ে একটু শাসন করতে গিছলেন মা, কিন্তু প্রতি পরীক্ষাতেই ছেলে প্রথম হয়ে পাস করছে দেখে আর কিছু বলেন না। এমন কি এক-একদিন দল-বল নিয়ে বাড়িতেও আসে, মা তাদের যত্ন করে বসতে দেন, বিনুকে দিয়েই মিষ্টি আনিয়ে খেতে দেন। তারা নাকি ভাল সব ছেলে —বিনুর বন্ধুদের সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ তাঁর, তাঁর বিশ্বাস ওরা সবাই উনপাজুরে বরাখুরের দলে পড়ে।

দিদি পারুল বাড়িতে থাকে। তার সঙ্গে একটু মন খুলে কথা বলতে পারলেও এই নিঃসঙ্গ ভাবটা এত বোধ হ'ত না। কিন্তু সে একেবারেই কথা বলে না। গল্পের বইও পড়ে না, সংসারের কাজেই তার বেশী আসক্তি।

সহজে মিশতে পারে না বলেই বন্ধুদের ঠাট্টা-তামাশা, বিশেষ ধরনের সাংকেতিক কথাবার্তার অর্থও বুঝতে পারে না। ফলে তারা আরও তামাশা করে ওকে নিয়ে, গবেট ভাবে, করুণার চোখে দেখে। মুখ রক্ষার জন্যে যেন অনেক বুঝেছে, ইচ্ছে করেই সেটা প্রকাশ করছে না এই ভাব দেখিয়ে, হাসিহাসি মুখে চুপ ক'রে থাকে। আজ মনে হয় সে তথ্যটা সেদিন ওদের বুঝতে বাকী থাকত না, তারা আরও বোকা ভাবত।

এই যে কোথাও খাপ খাওয়াতে পারে না—সে সম্বন্ধে যত সচেতন হয় ততই খাপ খাওয়ার সম্ভাবনাটা আরও সুদূর হয়ে পড়ে। নিজেকে এদের দলে প্রক্ষিপ্ত, হংস মধ্যে বক যথা (এসব কথা নিজেই শিখেছে, বই পড়ে পড়ে) মনে হয়। আরও কষ্ট হয়, মধ্যে মধ্যে বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করে এই ভেবে যে গোরা এবং অলকও ওকে অকওয়ার্ড, নির্বোধ অঘা ছেলে ভাবছে। গোরা না হোক—কথায় ও ব্যবহারে অলকের সে ভাবটা দিন দিন স্পষ্টই হয়ে ওঠে।

আরও একটা অদ্ভুত মনোভাব ও নিজেই লক্ষ্য করত—সেদিন তার কারণ খুঁজে পেত না, আজ একটু বোঝে—গোরা ছাড়া ও অন্য বন্ধুদের সাহচর্য সম্বন্ধে তত আগ্রহী ছিল না, যতটা ছিল মাষ্টার মশাইদের সম্বন্ধে। অন্য ছেলেরা এঁদের এড়িয়ে যেতে চাইত—আর চাওয়াই স্বাভাবিক—এঁরা বকতেন, শাসন করতেন, তখনকার দিনে চড়টা-চাপড়টা, কানমলা—এমন কি তেমন গুরুতর অপরাধ করলে বেত মারাটাও নিষিদ্ধ হয় নি, বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া, বা চেয়ার হয়ে দাঁড়াতে বলা তো নিতান্ত সাধারণ শাস্তির মধ্যেই গণ্য ছিল।

এমন কি এর ওপরেও কখনও কখনও দুই কান ধরতে হত। চেয়ার হয়ে দাঁড়ানোটাই ওর মধ্যে সবচেয়ে কষ্টকর মনে হত বিনুর। এ ছাড়াও এক-একদিন ওদের ড্রয়িংমাস্টার (ম্যানুয়াল ট্রেনিং-এর শিক্ষকও)—অল্প-বয়সী, শ্যামবর্ণ, দু দিকে ভাগ করা ঝাঁকড়া চুল, বড় বড় চোখ—অনেকটা কবি নজরুলের মতো দেখতে ছিলেন—তাঁর একটা উৎকট শাস্তি ছিল—দেহের কোন একটা অংশের খানিকটা মাংস খাবলে ধরে (বিনুর ক্ষেত্রে চোটটা পেটেই পড়ত বেশী) প্যাঁচাতে থাকতেন। অসহ্য যন্ত্রণা তো বটেই, চার-পাঁচ দিন জায়গাটায় কালসিটে পড়ে থাকত। তবু তখনকার দিনের অভিভাবকরা তা নিয়ে ঝগড়া করতে আসার কথা ভাবতে পারতেন না, বরং এসে বলে যেতেন, 'বেশ ভাল ক'রে শাসন করবেন মাস্টার মশাই। ডাণ্ডা ছাড়া ওদের কিছু হবে না। দণ্ডেন গো-গর্দভৌ—ওরা গাধারও অধম, খচ্চর।'

যাঁরা কষ্টকর শাসন করতেন না, তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন বৃদ্ধ, বয়স্ক। অন্য কাজ থেকে অবসর নিয়ে কাশীবাস করতে এসেছেন, কেউ কেউ অবশ্য এখানকার লোকও ছিলেন, সামান্য দশ-পনেরো টাকা হাত-খর্চার বিনিময়ে দেশের কাজ করার গৌরব বোধ করতেন। পশ্চিমে বাঙালী ছেলেদের বাংলা শেখাবার কাজ তখন মহৎ কর্ম বলেই গণ্য হত। এর মধ্যে শ্যামবাবু, অশ্বিনীবাবু, তারেশবাবু ছিলেন—অন্তত বয়সে—অতিবৃদ্ধের দলে। কেউ কেউ দশ বছর, কেউ বা পনেরো বছর পেন্সন ভোগ করছেন, একজনের পেন্সন ছিল না, কলকাতার বাড়ির টাকা-ত্রিশেক ভাড়া পেতেন।

এঁরা তিরস্কারই করতেন বেশী, শ্যামবাবুর অস্ত্র ছিল বাক্যবাণ, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। তারেশবাবু রাশভারী লোক, দীর্ঘ দেহ, শীতকালে প্রায় পা-পর্যন্ত ঢাকা গরম অলেস্টার কোট পরে থাকতেন—তাঁকে দেখেই সকলে ভয় পেত, শাসন করার প্রয়োজন হত না। এঁদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত মিষ্ট স্বভাবের মানুষ ছিলেন অশ্বিনীবাবু, মোটাসোটা, পুরু চশমার মধ্যে দিয়ে কটমট করে চাইবার চেষ্টা করতেন, তত ফল হত না। তবে ভাল মানুষ বলে ছেলেরাও অল্পে রেহাই দিত। ওদের সহপাঠী অজিত ছিল এঁরই নাতি, দৌহিত্র। বৃদ্ধ হলেও এঁদের প্রতি বিনুর একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল, ছেলেদের চেয়ে এঁদের সঙ্গ-সাহচর্যই সে কামনা করত। এমন কি দ্বিজদাসবাবু খুব রাগী ছিলেন—হাতের কাছে যা পেতেন তাই দিয়েই দিতেন ঘা কতক বসিয়ে, তা কে জানে ছাতা আর কে জানে খাতায় লাইন টানার রুল। তবু বিনু ওঁর কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করত, পিছু পিছু ঘুরত। এটা যে আকর্ষণ তা বুঝতেন না তাঁরা, কল্পনাও করতে পারতেন না, পাবার কথা তো নয়—কখনও-কখনও হয়ত দু-একটা কথা কইতেন (ও পড়ার কথাই কিছু জানতে চায়—এই ভেবে)—কখনও বা এমনিই চলতে চলতে সস্নেহে কাঁধে হাত রেখে 'কী রে ?' বলে ক্লাসে বা তাঁদের বসবার ফালিপানা ঘরটাতে চলে যেতেন।

অল্পবয়সী যাঁরা—যেমন তারাপদবাবু কি ঐ ড্রয়িং মাস্টার মশাই—এদের সম্বন্ধে বিনুর কোন আগ্রহ ছিল না, সবিস্ময় মুগ্ধতার সঙ্গে দেখত নবাগত কমলেশবাবুকে—সুশ্রী, সুদর্শন চেহারা, মিষ্টি মেয়েলি ধরনের কণ্ঠস্বর—অথচ মুখে, বিশেষ ওষ্ঠের ভঙ্গীতে পুরুষোচিত দৃঢ়তার ছাপ, সেই সঙ্গে পড়াবার অসাধারণ দক্ষতা। এ ওঁর সহজাত, তখনও এল-টি পাস করেন নি, বোধহয় বি-এ পাসও করেন নি—অথচ ওঁর ক্লাসেই প্রথম জানল বিনু স্কুলের

লেখাপড়াটাও গল্পের বই পড়ার মতোই আকর্ষক হতে পারে। বিশেষ ভূগোল এবং জ্যামিতির মতো বিষয় এমন মনোহারী ক'রে পড়ানো যায়—তা পরেও, কারও পড়ানোর মধ্যেই দেখে নি সে।

কিন্তু ওঁর সমস্ত কথাবার্তা চালচলন কি ব্যবহারে সকলের সঙ্গে এমন একটা দূরত্ব বা ব্যবধান বজায় রেখে চলতেন যে ঘনিষ্ঠতার প্রয়াস তো কল্পনাতীত—কাছে যেতেই কারও সাহস হত না।

দ্বিজদাসবাবুকে নিয়ে একটা ঘটনা আজও বিনুর স্পষ্ট মনে আছে।

উনি মাস কতক ওদের ইতিহাস পড়িয়েছিলেন। তখন প্রতি বিষয়ের সাপ্তাহিক পরীক্ষার নিয়ম ছিল, তবে সব সপ্তাহে হয়ে উঠত না। উনি সাধারণত শুক্রবারে পরীক্ষা নিতেন, ক্লাসে এসে পুরনো পড়া থেকে প্রশ্ন বলতেন, ক্লাসে বসে তখনই তা লিখতে হত। সেদিন এসেই বললেন, 'বুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান লেখো সব।'

আসলে এটা বিশ্রামের ফাঁক খোঁজা—নইলে মুখে মুখে প্রশ্ন করলে অনেক বেশী জানা যায় কে কতটা পড়েছে। মাস্টার মশাইদেরও অবশ্য যুক্তি ছিল একটা—এর পরে তো লিখেই পরীক্ষা দিতে হবে, সে জন্যেও তৈরী থাকা দরকার।

ওরা তো যে যার খাতা খুলে লিখতে শুরু করল। পাশে, সামনের বেঞ্চের প্রায় সকলেই কোলে ইতিহাসের বই খুলে রেখে ছাঁকা টুকতে লাগল। ই. মার্সডেনের বই (অনুবাদ ?)—বড় বড় হরফে ছাপা, টুকতে কোন অসুবিধেই নেই।

বিনু কোন দিনই এসবের ধার ধারে না। ইস্কুল থেকে ফিরে খাতা বই যেমন গাদা করা হাতে করে নিয়ে আসত, তেমনিই ফেলে রাখত ওর বইয়ের তাকে, পরের দিন আবার স্কুলে যাবার সময় হলে তাদের খোঁজ পড়ত, রুটিন অনুযায়ী দরকারী বই খুঁজে গুছিয়ে নিত। বাড়িতে পড়ত গল্পের বই, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্য লহরী কিংবা আরব্য উপন্যাস বা অন্য কোন উপন্যাস—লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করা। স্কুল লাইব্রেরী থেকেও নিত কিছু কিছু বাঁধানো মাসিকপত্র—মুকুল বা অন্য কিছু।

তবে ক্লাসের পড়া—ঈর্ষার চিন্তায় না থাকলে মন দিয়ে শুনত। ওদের স্কুলে তখন ব্যবস্থাও ছিল সেই রকম পড়াবার। চিন্তামণিবাবু সমস্ত শিক্ষককেই বার বার সতর্ক ক'রে দিতেন 'আমার গরীব ছাত্র সব, বাড়িতে প্রাইভেট টিউটার রাখতে পারবে না। সেই বুঝে আপনারা পড়াবেন। আপনারা ইচ্ছে করলে বই দেখে পড়াতে পারেন কিন্তু ছেলেদের না বই কেনার দরকার হয়।' বইয়ের তালিকায় সেই সূত্রই মানা হত, সাহিত্যের বই ছাড়া কিছু নাম দেওয়া হত না।

বলা বাহুল্য—মাষ্টার মশাইরা নিজেদের সুবিধার জন্যে আর অমনোযোগী ছাত্রদের অসুবিধা বুঝে গোপনে সব বিষয়েই এক-একখানা বইয়ের নাম করে দিতেন। একমাত্র কমলেশবাবুই ছিলেন এর ব্যতিক্রম, তিনিই—অন্তত তখন—চিন্তামণিবাবুর উপদেশ ও আদর্শ মতো চলতেন।

বিনু যা লিখত, যে কোন পরীক্ষাতেই হোক—নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি মতো, নিজের ভাষায় লিখত। ওর বই-ই ছিল কম, মানের বই পর্যন্ত ছিল না কিছু, তখন এত হেল্পবুক-এরও রেওয়াজ হয় নি। বাড়িতে পড়াবার লোক ছিল

না। দাদার কাছে পড়তে পারত, ওরও কখনও সে ইচ্ছা হয় নি, রাজেনও চেষ্টা করে নি। সে নিজে কারও সাহায্য নেয় নি, ভাইও নেবে না ধরে নিয়েছিল।

সেদিনও সেইভাবেই লিখছিল বিনু। বেশী দূর এগোয়ও নি, হঠাৎ ওপাশ থেকে কে বলে উঠল—বোধহয় রাধানাথ—'ওরা সব টুকছে স্যার, ওপাশের দুটো বেঞ্চিতে।'

দ্বিজদাসবাবু তাঁর স্বভাব মতো উঠে তেড়ে এলেন পাখার বাঁট বাগিয়ে ধরে। দৈহিক স্বাস্থ্য, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও শ্রীর জন্য বিনুর দিকেই প্রথম নজর পড়বে এটা বিনু জানত। সে বিপদ বুঝে নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি টুকি নি মাষ্টার মশাই, আমার নিজের ভাষায় লিখেছি—দেখুন!'

এটাকে আত্মরক্ষার একটা ভাল ফিকির—ওদের কাছে একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করল বাকী সবাই। তারাও ঐ এক সুর ধরল, 'আমি নিজের ভাষায় লিখেছি, আপনি পড়ে দেখুন।'

ওরা বোধহয় ভেবেছিল আপাতত ওতেই অব্যাহতি পাবে—সত্যিই সত্যিই কি মাষ্টার মশাই খাতা মিলিয়ে দেখবেন? কিন্তু দ্বিজদাসবাবু সেকালের লোক, তিনি সত্যিই 'আচ্ছা দেখি' বলে খাতাগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে নিজের টেবিলে ফেললেন। বিনুর খাতা ছিল নিচের দিকে। প্রথম যে কটা খাতা চোখে পড়ল তার সবই, ওদের ভাষায় 'টুকলি-ফাই করা,' হুবহু বই থেকে নকল করে দেওয়া। ফলে দু-তিনখানা দেখেই দ্বিজদাসবাবু একটা হুংকার দিয়ে উঠে আবার পাখার বাঁট উদ্যত করে তেড়ে এলেন।

এদিক দিয়ে এলে সে পাখা যে বিনুর পিঠেই প্রথম পড়ত তা নিঃসন্দেহ, বিনু সেই ভয়েই কতকটা মরীয়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'সবাইকে একভাবে বিচার করবেন না মাষ্টার মশাই, আমি আগে বলেছি আমারটা আগে দেখে ঠিক করুন সত্যি বলেছি কিনা। যদি মিথ্যে হয় আমাকে যত খুশি মারবেন, যে সাজা দিতে হয় দেবেন।'

হয়ত এটাও বিশ্বাস করতেন না দ্বিজদাসবাবু কিন্তু কি জানি কেন—সম্ভবত বিনুর মুখে একটা অস্বাভাবিক দৃঢ়তা—সত্যের ছাপ লক্ষ্য ক'রে থাকবেন—উনি ফিরে গিয়ে ওর খাতাটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়ে দেখলেন, তারপর খানিকটা চুপ ক'রে থেকে, বোধহয় প্রচণ্ড ক্রোধ দমন ক'রে নিয়ে বললেন, 'না, আমার অন্যায় হয়েছে। আই য়্যাপলজাইজ। ব্যাপারটা কি জানিস—অনেকগুলো দুষ্টু গাইয়ের সঙ্গে কপলে গাইও বন্ধ হয়—এ তো প্রবাদই আছে।'

তারপর আবারও হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'ইউ রাসকেল্স্, স্ট্যাণ্ড আপ, আই সে, স্ট্যাণ্ড আপ। কান ধরে বেঞ্চির ওপর দাঁড়াও সব। এই বয়সে চুরি শুধু নয়—চুরি ঢাকতে আবার মিথ্যে কথা বলা! দু ঘণ্টা দাঁড়াবে এমনি। ইউ মণিটার অলক—পরের ঘণ্টায় মাষ্টার মশাই এলে তাঁকে জানাবে আমি দু ঘণ্টা দাঁড়াতে বলে গেছি।'

সেদিনের খাতা যখন পরের দিন এসে ফেরৎ দিলেন তখন বিনু দেখল দ্বিজদাসবাবু ওকে কুড়ির মধ্যে সাড়ে উনিশ নম্বর দিয়েছেন।

ওর সবচেয়ে আনন্দ সে কথাটা উনি ক্লাসের মধ্যে ঘোষণাও করলেন। সকলের সঙ্গে নিশ্চয় অলকও শুনল।

সেদিন এঁদের সম্বন্ধে ওর মনোভাব কি আকর্ষণের কারণ বুঝতে পারত না—ভাবেও নি অতটা।

পরে ভেবে দেখেছিল, বুঝেও ছিল কিছুটা। ওর বিশ্বাস এটা ওর স্নেহের, আদরের ক্ষুধা।

ওর বাবা মারা গেছেন ওর জ্ঞান হবার আগে। মার মুখে শুনেছে ওর প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালবাসার কথা। ব্যস্ত মানুষ এক একদিন গভীর রাতে বাড়ি আসতেন। তবু—যখন যত রাত্রেই হোক, এসে কাপড় জামা ছাড়বারও আগে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন, শেজ-এর আলো জ্বলত সারা রাত ওদের ঘরে, তার গেলাসটা ধরে ধরে ওর ঘুমন্ত মুখটা দেখতেন, শীতের সময় গায়ের কাঁথা বা লেপ সরে গেছে দেখলে ভাল ক'রে গুছিয়ে চাপা দিয়ে দিতেন। ঘাম হচ্ছে দেখলে খানিকটা বাতাস করতেন হাত পাখা দিয়ে।

এই বাবাকে সে জ্ঞান হয়ে দেখল না, জানল না—তাঁর এতটা আদর অনুভব করতে পারল না—এ নিয়ে ওর ক্ষোভ ও ক্ষুধার অন্ত ছিল না মনে। হয়ত সেই অতৃপ্ত ঈর্ষাই ওকে অনিবার টানত বয়স্ক লোকের দিকে।

ওর দাদার সম্বন্ধেও, সেই কারণেই, প্রথম কৈশোরে একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। পিছনে পিছনে ঘুরত, কোন ফাই-ফরমাশ খেটে দিতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করত। একদিন একটা বড় রকম আঘাতেই সে মোহটা কেটে গিছল। মোহ ছাড়া কি বলা যায় তা আজও ও জানে না। তখন এত কিছুই জানত না, হয়ত সেই কারণেই আঘাতটা অত বেজেছিল।

দাদা কলেজ থেকে খেলাধুলো করে যেমন সন্ধ্যা পেরিয়ে বাড়ি ফেরে তেমনিই ফিরেছে সেদিনও, হঠাৎ বিনুর মনে হল সে অনেকক্ষণ দাদাকে দেখে নি। তার সান্নিধ্য পাবার জন্যেই—ঘরে বারান্দায় সে যেখানে যাচ্ছে—বিনুও তার পিছু পিছু সঙ্গে যাচ্ছে, হয়ত একটু বেশী কাছ ঘেঁষেই—দাদা হঠাৎ বলে বসল, 'কি রে তুই অমন কুকুরের মতো পেছনে পেছনে ঘুরছিস কেন?'

হয়ত অত কিছু ভেবে সে বলে নি, নিতান্তই ঠাট্টা, কথার-কথা যাকে বলে—কিন্তু বিনুর মনে প্রবল আঘাত লেগেছিল। এই এতদিন পরেও কথাটা মনে পড়লে সে ক্ষতটা যেন টনটনিয়ে ওঠে।

॥ ১৫ ॥

অনেকে বলেন কৈশোর কালই নাকি মানুষের সবচেয়ে সুখের কাল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অন্য কথাই বলেছেন, তাঁর মতে এই সময়টা বড় দুঃখের কাল, কারণ এই একটা বয়স যখন মানুষ না পারে ছোটদের দলে মিশতে আর না পায় বড়দের দলে পাত্তা। কথাটা ঠিকই। ছেলেদের গোঁফ দাড়ি গজিয়ে মুখের মসৃণতা ও বাল্যকালের ঔজ্জ্বল্য চলে যায়, দুটি-একটি ক'রে ব্রণ দেখা দিতে থাকে, অথচ ঠিক তরুণের দলে প্রতিষ্ঠা নিতে পারে না, বালক যুবক সর্বত্রই সব দলেই বেমানান, প্রক্ষিপ্ত বোধ করে নিজেকে।

সে যাই হোক, এই কালটা যে মিষ্টি স্বপ্ন দেখার প্রারম্ভকাল তাতে সন্দেহ নেই, পৃথিবীর সব কিছু সে অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারবে, অসীম শক্তি তার, অপরিসীম সম্ভাবনা—এই প্রত্যয় দেখা দেয়। তরুণ বয়সীরা নিজেদের অন্তরঙ্গ দলে প্রবেশাধিকার না দিক, কিশোর বয়সীদের জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদনে

সুযোগ দিতে দ্বিধা করে না, নিজেরা ওদের সাহায্যে সেটা আস্বাদ করার সুবিধা পায়। ছেলে-মেয়েরা অনেক কিছু জানে, অনেক কিছু ভাবে, ভবিষ্যতে কুসুমাস্তৃত সৌভাগ্যদীপ্ত জীবনের কল্পনা করে, কিন্তু তখনই কোন দায়িত্ব নিতে হয় না। কঠোর বাস্তব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দূরে থাকে।

কিন্তু বিনুর এমনই পরিবেশ ও ভাগ্য যে এই বয়স থেকেই দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের অংশ নিতে হল। জীবন সম্বন্ধে যে সচেতনতা জাগল তা আদৌ সুখের নয়। ঐ বয়সেই অন্ধকারের চেহারাটা দেখতে পেল।

হঠাৎ ওর দিদি মারা গেল। দিদির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল অর্থ-কষ্ট। এটা হয়ত প্রথম থেকেই ছিল, বিনু অত বুঝত না, এবার একটু একটু ক'রে সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল।

ওর দিদি চিরদিনই চাপা স্বভাবের, মার মতোই মিতবাক। বরং, আজ মনে হয় একটু যেন বিষণ্ণই।

ছোট ভাই সম্বন্ধে স্নেহে উচ্ছ্বসিত হতে তাকে কেউ দেখে নি। কোন কারণেই দিদির কারও সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস, কোন বিষয়েই তার উৎসাহ বা আতিশয্য প্রকাশ পেত না। সে জন্যে বিনুর খুবই দুঃখ পাবার কথা—অতটা যে পায় নি তার কারণ মনের অস্বাভাবিক গঠন। সে মন বয়স্ক প্রবীণ লোকের স্নেহ পাবার জন্যেই লালায়িত। স্ত্রী-পুরুষ দুই ক্ষেত্রেই। এখানে এসে ওর সবচেয়ে মন-কেমন করত বামুনমার জন্যে, সবচেয়ে আনন্দ পায় ও দৈবাৎ কমলা দিদিমা বেড়াতে এলে।

তবু দিদি সম্বন্ধে সে একেবারে উদাসীন ছিল না। কিছু কিছু সুবিধা পেত তো বটেই। দিদি আছে—এটা ওটা কাজ, যেমন—জামার বোতাম ছিঁড়ে গেলে, কি কাপড় ছিঁড়লে অথবা গেঞ্জি ময়লা হলে—সে নিজে থেকেই—লক্ষ্য ক'রে, সেলাই ক'রে বা সাবান দিয়ে কেচে দিত। বই-খাতা গুছিয়ে রাখা, বিছানাপত্র সাফ করা, লেখার পেন্সিল কেটে দেওয়া—এসব কখন নিঃশব্দে করত কেউ টেরই পেত না। মার রান্নার কাজেও সাহায্য করত নিজে থেকেই—কোন্‌টা কখন হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়া বা কোন কাজটা ক'রে দেওয়া দরকার—নিজেই দেখে বুঝে। তার সঙ্গে মাকে কখনও বকাবকি করতে হয় নি, ডেকে ডেকে করাতে হয় নি কোন কাজ।

রাজেনেরও, টুকিটাকি ব্যক্তিগত কাজগুলো নিজেই করত, তবে সে ফরমাশও করত অনেক। পারলে, সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হলে নীরবেই করত, না হলে মৃদু স্পষ্ট কণ্ঠে জানিয়ে দিত, 'এখন আমার সময় হবে না।' তারপর দাদা যতই বকাবকি কি অনুযোগ করুক—সে কাজও করত না, জবাবও দিত না। আস্ফালনগুলো যেন কোন জড়বস্তু, পাথরের দেওয়ালে ঘা খেয়ে ফিরে আসত।...

দিদির নাকি পনেরো বছর বয়সে জলে ফাঁড়া ছিল। মা সেটা জানতেন, কোন্ জ্যোতিষী নাকি বলে গিছলেন।

সেই জন্যেই মা তাকে কখনও গঙ্গায় চান করতে দেন নি। সঙ্গে নিয়ে যেতেন না। গঙ্গার ঘাট দিয়ে যে সব মন্দিরে যাওয়া যেত, যেমন কেদারনাথ, চৌষট্টি-যোগিনী কি সংকটা—বিনুকেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেন। কোন দিন দিদিকে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হলে অর্থাৎ বিনু না থাকলে—গলি-পথে যেতেন, অনেক বেশী হাঁটতে হলেও। কখনও নৌকোয় উঠতে দেন নি ঐ কারণেই—

যদি নৌকোডুবি হয় কি মাথা টলে পড়ে যায় !…

কিন্তু এত ক'রেও দৈবকে লঙ্ঘন করতে পারলেন না মা ।

ওদের কলঘর থেকে বাস করার ঘরে আসতে হত দশ ফুট বারান্দা পেরিয়ে । বারান্দাটা ছিল আরও চওড়া, বাথরুমের তিন ফুট ঐ থেকেই বার করা । বিলিতি মাটির মেঝে নিত্য দু' বেলা মোছার ফলে তেল-চকচকে হয়ে উঠেছিল । সেদিন দিদিই একটু আগে স্নান ক'রে ছোট বালতির জল এনেছে, এটা বাইরে ঝাঁঝরির কাছে বসানো থাকত—ছোটখাটো হাত ধোবার প্রয়োজনে । ভর্তি বালতি থেকে দু-এক ফোঁটা জল পড়তে পড়তে আসবে, এ তো স্বাভাবিক ।

সে বালতি রেখে দিদি আবার কলে গিয়েছিল ওদের ঘরের কলসী ভরতে, ভরে ফেরার পথেই বিপত্তি ঘটল । আগেকার সেই এক ফোঁটা জলে পা পিছলে পড়ে গেল । পড়ল চিৎ হয়ে । ফলে শিরদাঁড়ার হাড় ভাঙ্গল ।

আঘাতটা যে এত গুরুতর প্রথমটা অবশ্যই কেউ অত বোঝে নি ।

হৈ-চৈ ক'রে বহুলোক ছুটে এল, কমলা দিদিমার স্বামী এলেন কতকগুলো হাড়ভাঙ্গার ডালপালা নিয়ে । কেউ বা বললেন মালিশ করো, কেউ সেঁক দেবার পরামর্শ দিলেন, তাতে আরও বিপত্তি, যন্ত্রণা বেড়েই গেল আরও ।

আসল যেটা দেখা গেল দিদির আর একেবারেই ওঠবার শক্তি নেই । কোলে ক'রে এনে শোয়াতে হল । যে দিদি কখনও জোরে কথা বলে না, সে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল ।

কাজের কাজ কিছুই করা হ'ত না, যদি না চেঁচামেচিতে একটা দুর্ঘটনা আঁচ করে দোতলার ভাড়াটে ভদ্রলোক—ওরা বলত জ্যাঠামশাই—এসে পড়তেন ।

তিনি প্রবীণ লোক, চিরদিন বড় সরকারী চাকরি ক'রে এসেছেন, কোন আকস্মিক বিপদ দেখা দিলে যে শুধু হা-হুতাশ না ক'রে মাথা ঠাণ্ডা রেখে তার প্রতিকার ভাবতে হয় —এ তিনি জানেন । তিনিই বেরিয়ে সোজা সিভিল সার্জন ডেকে নিয়ে এলেন একেবারে ।

ডাক্তার—বিশেষ সার্জন আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন বৈ কি !

মানুষটি ভদ্র-লোকও । তিনি সৎ পরামর্শই দিলেন ।

বললেন, 'এ-সব হাড় সেট করা, প্লাস্টার করা—এখানে সম্ভব নয় । দু'-তিনজন লোক লাগবে—অনেক ঝামেলা—খরচাও অনেক । সে কি পেরে উঠবেন ? তার চেয়ে হাসপাতালে নিয়ে যান, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি কোন অসুবিধা হবে না । সরকারী হাসপাতালে না যাওয়াই ভাল । মারোয়াড়ী হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেন, এই কাছেই, গোধুলিয়ার মোড়ে । কিম্বা সেবাশ্রম । সেবাশ্রমই ভাল, যত্ন হবে, চিকিৎসারও ত্রুটি হবে না । ওখানে চিঠিও লাগে না, তবে আপনি তো একা—কে নিত্য শোওয়া-রুগীর এত ঝঞ্ঝাট বইবে ? আমি লিখে দিলে গুরুত্বটা বুঝবেন—ইনডোর পেশেণ্ট ক'রে রাখবেন ওঁরা ।'

'হাসপাতাল ! হাসপাতালে থাকবে !'

মহামায়া প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন ।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'সে আপনাদের ইচ্ছা আর সামর্থ্য, বুঝে দেখুন । প্লাস্টার হয়ে গেলে আবার ফিরিয়ে আনা যায়—কিন্তু আপনি হয়ত ঠিক কথাটা বুঝছেন না, নেচার্‌স্ কল-টলগুলো সব বিছানাতেই করাতে হবে, খাওয়ানো চান করানো সব । তেমন লোক কেউ আছেন ?'

উত্তর দিলেন জ্যাঠামশাই-ই। তিনি এদের অবস্থা কিছুটা জানতেন, কিছুটা আঁচ করেছিলেন। তিনি বললেন, 'না, তেমন কেউ নেই। বৌমা একা, মাহারিন পর্যন্ত নেই। এই মেয়েটিই যা আছে সাহায্য করার—তা সে পড়ে থাকলে তো আরও চমৎকার। প্রাত্যহিক কাজ চালানোই শক্ত হবে।'

তারপর—এতদিনের মধ্যে যদিচ মহামায়ার সঙ্গে সোজাসুজি কখনও কথা হয় নি—তাঁকেই সম্বোধন ক'রে বললেন, 'বিপদের দিনে বৃথা সংকোচ করতে নেই বৌমা, তাই সত্যি কথাই বলতে হচ্ছে, কিছু মনে ক'রো না, তোমার সম্বল তো ঐ মাসে পঞ্চাশ টাকা মণি-অর্ডার, আমি ইসাদী হিসেবে সই করি বলেই জানতে পেরেছি—তা থেকে বারো টাকা বাড়ি ভাড়া দিয়ে, ছেলেমেয়েদের ইস্কুল কলেজের মাইনে, চারটে প্রাণীর খোরাক জুগিয়ে ক'টাকাই বা বাঁচে। এসব পেশেণ্ট বাড়ি রাখতে হলে একটা দাই চাই—সে নিদেন রোজ আট-দশ আনা নেবে, তাছাড়া খাওয়াতে হবে, ডাক্তার আসবেন মাঝে মাঝে দেখতে, তাঁর ফী আছে। গাড়ী ক'রে রুগী নিয়ে যেতে হবে তারও ঝঞ্চাট কম না—ওপর নিচে করানোই তো মুশকিল—কে করবে বলো। এই তো ডাক্তার ব্যানার্জি এসেছেন, ওঁর আট টাকা ফী, পারবে দিতে?'

এতক্ষণ মার মুখের দিকেই এক দৃষ্টে চেয়ে ছিল বিনু, দেখল অপমানে তাঁর সুগৌর মুখ কেমন ক'রে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, দু' চোখে জল ভরাই ছিল, এবার এই আঘাতে তা ঝর ঝর ক'রে ঝরে পড়ল। তবু এই নিষ্ঠুর নির্ঘাৎ সত্য অস্বীকারও করতে পারলেন না। ঘাড় নেড়ে খুব মৃদু অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'মাসের শেষ, বোধহয় কুড়িয়ে বাড়িয়ে তিনটে টাকা হবে। বাকী কি—'

আর কথা শেষ করতে পারলেন না। বোধহয় মেঝেতে আছড়ে পড়ে ডাক ছেড়ে খানিকটা কাঁদতে পারলে কিছুটা সুস্থ হতেন।

জ্যাঠামশাই কোমল কণ্ঠে বললেন, 'সে আমি জানি মা, তুমি প্রায় আমার মেয়ের বয়সী—বৌমা বলি কেন আর, মাই বলছি—আমি সে টাকা ওঁকে দিয়েই দিয়েছি। ফী টাঙ্গা ভাড়া সব। তার জন্যে তুমি লজ্জাও পেও না, ব্যস্তও হয়ো না। তোমার ছেলেমেয়েরা আমার আত্মীয়ের মতোই হয়ে গেছে—সগোত্রও তো বটে—এটুকুতে আমার কোন অসুবিধেও হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করছি। ওপর থেকে নিচে নামানোর জন্যেই অনেক কাণ্ড করতে হবে, তার ওপর অতদূর নিয়ে যাওয়া, এক্কা কি টাঙ্গায় তো সম্ভবও নয়। ডুলিতে বসতে পারবে না, পালকি চাই। পালকি আজকাল সহজে পাওয়াও যায় না—দেখি চেষ্টা করে—'

'কিন্তু সেও তো অনেক খরচা পড়বে—আমার হাতে তো ঐ শুনলেনই—'

'শুনেছি মা। যা করবার আমিই করছি। তুমি অনর্থক লজ্জা কি মনোকষ্ট পেও না। ফেরৎ দিতে পারো কখনও, দিও, তোমার আত্মসম্মানে আঘাত দিতে চাই না। তবে না দিলেই আমি বেশী খুশী হবো।'

জ্যাঠামশাইয়ের কথাগুলো এমনই মর্মান্তিকভাবে সত্য, এমনই বাস্তব যে আর কিছু করার বা বলার রইল না।

তিনিই করলেন সব। খরচও যে কম হ'ল না—তাও বুঝতে পারলেন মহামায়া।

পালকি যোগাড় করা, লোকজন ডেকে আনা, তাঁর ক্যাম্পচেয়ারটা স্ট্রেচারের মতো করে তাতেই শুইয়ে নামাতে হল—অবশ্য তারা সবাই ভদ্রলোকের ছেলে,

কেউই মজুরী নেয় নি—তবে তাদের জলখাবার খাওয়ার ইত্যাদি সবই করলেন তিনি।

তার খরচও যে খুব সামান্য হয়নি, তাও রাজেনের মুখে শুনলেন মহামায়া। মহাপ্রাণ শব্দটা এতদিন শোনাই ছিল, এবার চোখে দেখলেন। বিপত্নীক মানুষ। ছেলে চাকরি করে আম্বালায়, বৌ নিয়ে সেখানেই থাকে। বুড়ো মা কাশীবাস করবেন বলে এখানে এই বাড়ি নিয়ে থাকা। আসলে ভাইপো ভাইঝিদের পড়ার সুবিধের জন্যই এই ব্যবস্থা অন্তত মহামায়ার তাই বিশ্বাস। ছিয়ানব্বুই বছরের মা, ঊনিশটি সন্তানের জননী, গায়ের চামড়া পার্চমেণ্ট কাগজের মতো পাতলা আর খড়খড়ে হয়ে গিছল, এ পর্যন্ত ষোলটি সন্তানের মৃত্যুশোক সহ্য করেছেন তিনি, আর কিছু করতে পারেন না, ঠাকুর ঝি রেখে এই সংসার চালান ভদ্রলোক—যিনি অনায়াসেই ছেলেবৌয়ের কাছে গিয়ে থাকতে পারেন।

পারুলকে নিয়ে যাওয়া হল সেবাশ্রমেই।

একটু দূরে হল সেবাশ্রম অবশ্য লক্ষ্মীকুণ্ডর মধ্যে দিয়ে গেলে আধমাইলেরও কম—তবু মহামায়ার পক্ষে অনেকটা।

কিন্তু উপায়ই বা কি। সবাই বললেন, ওখানেই সব চেয়ে সুব্যবস্থা। এরা বলে 'কৌড়িয়া হাসপাতাল' কে এক চারু মিত্র প্রায় এক একটি কড়ি ভিক্ষে নিয়ে নিয়ে এই হাসপাতাল করেছেন। সাধুরা নিঃস্বার্থভাবে সেবা করেন বলেই ব্যবস্থাও ভাল, সাধারণের সহযোগিতাও পাওয়া যায়।

শুধু নিয়ে যাওয়া নয়—সারা দিন হাসপাতালে দাঁড়িয়ে থেকে প্লাস্টার করানো, 'বেড' এর ব্যবস্থা করা, যে সব জমাদাররা প্রাকৃতিক কার্যগুলো করাবে তাদের ডেকে গোপনে অগ্রিম চার আনা করে বকশিস ও ভবিষ্যতে আরও সন্তুষ্ট করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া—সবই করলেন ভদ্রলোক। তার মধ্যেই পারুলকে কিছু খাইয়ে যখন বাড়ি ফিরলেন তখন সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নেই। তিনি তখনও অস্নাত অভুক্ত—তবে রাজেনকে জোর করে একটু পুরী কিনে খাওয়াতে ভুল হয় নি তাঁর।

কৃতজ্ঞতার কারণ পর্বত প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, ঋণের অবধি থাকছে না।

কিন্তু এর কোন প্রতিদান, সামান্যতম ঋণ শোধেরও, যে সামর্থ্য নেই মহামায়ার—সে সম্বন্ধে তাঁর চেয়ে সচেতন আর কে আছে।

আয় বলতে তো ঐ পঞ্চাশটি টাকা মাসে। যুদ্ধের সময় জিনিসপত্রের যা দাম ছিল যুদ্ধ শেষ হতে তার চেয়েও বেড়ে গেছে। কোন মতেই আয়-ব্যয়ের দু-প্রান্ত মেলাতে পারেন না মহামায়া।

মাছ মাংস তো আসেই না, ডাল তাও কদাচিৎ। একটা কিছু ভাতে—ডাল হোক, আলু হোক বড়ি বেগুন হোক—আর একটা নিরামিষ তরকারি, তারই খানিকটা রাত্রের জন্যে ঢালা থাকে, এই তো বরাদ্দ। শীতকালে বেগুন পোড়া অনেকের বাড়িই ভোজ্যের উপক্রমণিকা—ওদের কাছে তা প্রধান উপকরণ। বেগুন পোড়া হলে তাই-ই দু'বেলা চালান। রাত্রেরটা হয়ত এক একদিন একটু নুন মিষ্টি দিয়ে হিং আদা ফোড়নে ছোঁক দেওয়া থাকে। 'দু' বেলা পোড়া খেতে নেই'—এ অনুশাসন অনেক দিনই মানা ছেড়ে দিতে হয়েছে।

মহামায়ার রাত্রের খাওয়া বন্ধ হয়েছে বহুকাল। এখানে আসার কয়েক

মাস পর থেকেই। দুধ বাঁচলে কোন দিন এক ঢোঁক জোটে, তা নইলে সিকিখানা মুঠি-গুড় ভরসা।

বাজার হয় সপ্তাহে একদিন, রবিবারে রবিবারে। অন্য দিন রাজেনের সময় হয় না। কোন কারণে একেবারে ঘর খালি হলে সবজিওলা ডেকে এক আধ পয়সার শাক কি ভিণ্ডি কি নেনুয়া কিনে নেন মা। কিম্বা বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে আধসেরটাক আলু কিনে আনা হয়।

তা নইলে ঐ ছ' আনা সাত আনার বাজারই সাত দিনের সম্বল। নেহাৎ কাশী বলেই চলছে। শীতকালে ছ' আনার বাজার রাজেন বয়ে আনতে পারে না—খাচিয়াওয়ালী দিয়ে আনাতে হয়। ওদিকে যদি বা সাশ্রয় হয়, দশাশ্বমেধ থেকে সূর্যকুণ্ডু এক আনার কম কোন খাঁচিয়াওয়ালীই আসে না।

নিহাৎ কাশী বলেই চলছে, তবে আর যেন কিছুতে চালানো যাচ্ছে না। পুজোয় নতুন জামা-কাপড়ের কথা তো কেউ তোলেই না, এ বছর অতি কষ্টে বিজয়া দশমীর দিন বিনুর জন্যে একটা আট হাতি ধুতি কেনা হয়েছিল। মণি-অর্ডার ঐদিনই পোঁছেছিল, (বামুনদির করা টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডার)—তাই সাত টাকা দাম। মার মুখে হতাশার চিহ্ন আর কপাল চাপড়ানো দেখে সেই কোরা কাপড় পরার আনন্দটাও উপভোগ করতে পারে নি বিনু। ওর কোরা কাপড় পরতে অত ভাল লাগে না—তা সত্ত্বেও।

কিন্তু পুজোয় না হোক, কাপড় জামা তো কিনতেই হবে। লজ্জা নিবারণের জন্যে অন্তত।

অথচ এই অবিশ্বাস্য দামে কোথা থেকে টাকা এনে সে লজ্জা নিবারণ করবেন মহামায়া ভেবেই পান না।

জিনিসপত্রের দাম এইভাবে বেড়ে যাচ্ছে, আরব্য উপন্যাসের সেই বোতলের দৈত্যের মতো—আয় এক পয়সাও বাড়ছে না, নিশ্চল হয়ে সেই অঙ্কেই থেমে আছে। সামান্য কিছু বাড়াবার জন্যেও অনুরোধ জানাবার সাধ্য এদের নেই—সেটা এই বয়সেও বিনু বুঝতে পারে। একই ঘরে বাস করা—কোথায় কী চিঠিপত্র লেখা হচ্ছে তা সবাই জানে। কাকুতি মিনতি করে, বাজার দরের হিসেব নিয়ে বহুবারই চিঠি লিখেছেন মহামায়া, তার উত্তর পর্যন্ত আসে নি।

এ টাকাও যদি নিয়মিত আসত!

আগে আসত পয়লা-দোসরা, তার মানে ওখান থেকে পাঠানো হত আগের মাসের শেষের দিকে। তারপর হ'ল চৌঠো-পাঁচই ক্রমশ এসে দাঁড়াল দশ, বারো তারিখে। তা থেকে কুড়ি-বাইশ—এখন একেবারে শেষ মাসে শেষ তারিখে এসে পোঁছয়—কোনো বার পরের মাসের পয়লাও।

মহামায়ার আশঙ্কা এইভাবে একটা মাসের টাকার হিসেব গোঁজামিলে চলে যাবে, এই পয়লা দোসরাটা সেই মাসের টাকা মনে ক'রে নিশ্চিন্ত থাকবেন তাঁরা।

সে যাই হোক, এতে চলে না কোন মতেই, সেটাই বড় কথা।

কলকাতায় থাকতেও যেমন চার পাঁচ মাস অন্তর লোহার সিন্দুক খুলে বামুনদিকে পাঠাতে হ'ত পোদ্দারের দোকানে, একটু সোনা বিক্রী ক'রে এনে 'বাকী-পড়া'র তাল সামলাতে—এখনও তেমনি তাঁকেই চিঠি লিখতে হয়।

বামুনদির জিম্মাতেই সব রেখে আসা হয়েছে। তিনি এই ধরনের জরুরী

চিঠি পেলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করেন। পঞ্চাশ ষাটে কাজ চালানোর সম্ভাবনা বুঝলে দু-চারখানা বাসন বিক্রী ক'রে কাজ চালিয়ে দেন, এমন এর মধ্যে দু-তিন বার করেছেন। ভারী ভারী খাগড়াই বাসন সব, গিয়ে-গিয়েও কয়েকখানা আছে এখনও। আর দাম যতই কমে যাক খাগড়াই কাঁসার এখনও ভাল দর পাওয়া যায়।

প্রয়োজন বেশী হলে প্রায়-অবলুপ্ত সোনায় হাত পড়ে আবার।

আঠারো টাকা সোনার ভরি—স্যাকরার কাছে গেলে চোদ্দ টাকার বেশী পাওয়া যায় না। যে গড়েছে সেও দেয় না। বিবিধ বিচিত্র হিসেব আছে ওদের—খাদ, পানমরা, ময়লা বাদ, গালাই বাদ—আরও কত কি!

অথচ উপায়ও নেই। একশো সওয়াশোও দরকার পড়ে মধ্যে মধ্যে। শীত-বস্ত্র আছে, বিছানাপত্র ধুলধুলে হয়ে গেলে পাল্টাতেই হয়। এমনি রোজকার ব্যবহারের কাপড় জামাও এ যুদ্ধের বাজারে ঐ পঞ্চাশ টাকা থেকে বাঁচিয়ে করা যায় না।

আর এও একমাত্র নয়। য়্যাডমিশন পরীক্ষার সময় রাজেনেরই লেগেছে আশি টাকার মতো। এ টাকা অন্যত্র কোথাও থেকে পাওয়ার আশা নেই। সুতরাং বামুনদিকেই সেই 'চরম পত্র' দিতে হয়। এক এক সময় খুচরো দেনাই জমে ত্রিশ-চল্লিশে পেঁ ৗছে যায়। তখনও কলকাতায় চিঠি লেখা ছাড়া উপায় থাকে না।

এই খুচরো দেনাকে বড় ভয় মায়ের। এতদিন এত কষ্টে, অভাব সহ্য ক'রেও কোন মতে মাথা উঁচু ক'রে থেকেছেন। আজ যদি দুটো পাঁচটা টাকার জন্যে কারও কাছ থেকে উঁচু নিচু কথা শুনতে হয়—তার চেয়ে অপমানের আর কি আছে!

অবশ্য বেশির ভাগ যাদের কাছে 'বাকী' পড়ে তারা উদগ্রীব ধার দিতে। যেমন মুদি মাতাপ্রসাদ। এরা নগদ মাল কেনে, সর্বদাই ভয় থাকে কোথাও এক পয়সা দর কম পেলেও সেখানে চলে যেতে পারে—তাই সে বাঁধতে চায়।

তেমনি গোয়ালা নরোত্তমও একজন। সে নেশা ভাঙ করে কিন্তু মানী লোকের মর্যাদা বোঝে। যেদিন টাকা নিতে আসে সর্বক্ষণ মায়ের সামনে হাত জোড় ক'রে থাকে। বলে, 'হাপনার কাছে রুপেয়া সো তো হামার বাকস মে আছে।'

কিন্তু মহামায়া জানেন, এসব বিশ্বাস বড়ই ঠুনকো, এর ওপর চাপ দিতে নেই।

এমনিই ঠুনকো নিচের তলায় বৃদ্ধা-সমাজের সহৃদয়তা।

রাঙা দিদিমা গোসাঁই দিদিমা—এঁরা অল্প স্বল্প দু-চার টাকা তেজারতীতে খাটান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটি বাটি বাঁধা রেখে দেন, কিম্বা কানের ফুল বা নাকছাবি। মহামায়াকে দেন শুধু হাতে, সুদও বেশি নেন না টাকা পিছু মাসিক দু' পয়সা হিসেবে ধরা হয়। যাঁরা বেশী টাকা খাটান—যেমন প্রয়াগবাবু স্ত্রী—তাঁরা শতকরা মাসিক এক টাকার বেশি নেন না।

এঁদের কাছে অবশ্য যাওয়ার প্রয়োজন হয় নি কখনও। সে সাধ্যও ছিল না; বাঁধা দেবার মতো—মোটা টাকার জন্যে যে সব জিনিস দিতে হয়, তা এখানে কোথায়? তবে খুচরো টাকা দু-চারটে মাঝে মাঝে নিতে হয়েছে। ইস্কুলের মাইনে কি ওষুধের দাম—এ তো আর মণি অর্ডারের মর্জির মুখ চেয়ে

অপেক্ষা করবে না।

তবে এই ধরনের জরুরী দরকার না পড়লে নগদ টাকা ধার করেন না—এটাও ঠিক। একেবারে হাত খালি হলে রান্না বন্ধ হয়ে যায়, এর মধ্যে এমনও হয়েছে, টাকা এসেছে পরের মাসেরও পর পাঁচ তারিখ পার করে—তিন দিন পরপর ছেলেমেয়েরা সকালে চিঁড়ে আর রাতে ছাতু খেয়ে কাটিয়েছে। কারণ—মুদীর দোকানের ধার তো বটেই, কয়লা ঘুঁটেও বাড়ন্ত হয়ে পড়েছে। দুধটা মাসকাবারী বলে সেটা বন্ধ হয় না—মহামায়ার সেই এক এক ঢোঁক দুধই অবলম্বন। তবু তিনি ধার করেন নি কখনও।

বরং—সাহায্য এসেছে এক আধবার এরকম ক্ষেত্রে—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পথে। কমলা দিদিমা গরিব মানুষ, তাঁরই মেগে-পেতে দিন চলে—তবু কীভাবে যেন এদের এই অর্ধাহারের খবর পেয়ে না কি রাজেনকে অসময়ে ছাতু কিনতে দেখে এক দিন বুকে ক'রে বয়ে এনে ভাত-ডাল পেঁাছে দিয়ে গেছেন। অন্য উপকরণ সামান্যই, একটুখানি আলু-চচ্চড়ি। তবু সেই তো তখন অমৃত।

আর একবার, কোথায় কোন যজ্ঞিবাড়িতে রাঁধতে গিছলেন, তারা ফেরার সময় অনেক খাবার দিয়েছিল—উনিও বোধহয় ইচ্ছে ক'রেই তাতে প্রতিবাদ জানান নি—সন্ধ্যেবেলা (ব্রত উদযাপনের খাওয়া, দুপুরের যজ্ঞি) বাইশ-চব্বিশখানা বড় বড় লুচি, ডাল, কুমড়োর ডালনা—আর খানিক বোঁদে পেঁাছে দিয়ে গেলেন, বললেন, 'তুই না খাস, ছেলেমেয়েদের খাওয়াস। শুদ্ধাচারে করা, আমি আর একটি বামুনের মেয়ে, আমরাই রেঁধেছি। নিরামিষ যজ্ঞি, তুইও খেতে পারিস অক্লেশে।'

তারপর একটু থেমে অপ্রতিভের হাসি হেসে বলেছিলেন, 'মিষ্টিগুলো বাপু আমি আমার বুড়োর জন্যে রেখে দিয়েছি। বড্ড ভালবাসে। জোটে না তো সহজে। মিষ্টি বলতে দুটো সন্দেশ, চারটে রসগোল্লা,—তা দু তিন দিন ধরে খেতে পারবে। জলখাবার তো অন্য কিছু দিতে পারি না, চালভাজা গুঁড়ো ক'রে একটু গুড় আর জল দিয়ে মেখে দিই তাই খায়। এতে শরীর থাকে? তুই বল!'

হাসপাতালে দেওয়া হল, বামুনদিকে টেলিগ্রাম করে টেলিগ্রামেই কিছু টাকা আনিয়ে নিলেন মহামায়া, সেবাশ্রমের ডাক্তাররাও যথাসাধ্য করলেন কিন্তু পারুলকে বাঁচানো গেল না। হাড় ভেঙেছে প্লাস্টার করেছেন সার্জন, যথেষ্ট যত্নের সঙ্গেই করেছেন, তাতে কোন ত্রুটি ঘটে নি—কিন্তু না শান্তিবাবু আর না ওখানকার ডাক্তার—কেউই বুঝতে পারেন নি যে ঐ সময়েই কিডনীতে একটা সাংঘাতিক চোট লেগেছিল। সেটা যখন বোঝা গেল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে—আর কোন প্রতিকারই হল না। শেষের তিন দিন সম্পূর্ণ বেহুঁশ হয়ে থেকে তার মধ্যেই এক সময় নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে গেল।

চিরদিন যে মেয়েটা চুপ ক'রে থেকেছে সব কিছু সহ্য করেছে মুখ বুঁজে,—শেষ সময়ও তেমনিভাবে অসহ্য যন্ত্রণা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য ক'রে নিঃশব্দেই বিদায় নেবে, সেই তো স্বাভাবিক।

॥ ১৬ ॥

দিদির আচরণে স্নেহের কোন উচ্ছ্বাস বা বহিঃপ্রকাশ না থাক, সে যে বিনুর এই ছোট্ট জীবনের অনেকখানি জুড়ে ছিল, সেটা বোঝা গেল তার মৃত্যুর পর। দিদির অভাব যে এমন ক'রে বাজবে, তার জন্যেই যে বিনুকে গোপনে কাঁদতে হবে তা কে ভেবেছিল।

নিজের দুঃখ তো ছিলই—মার দুঃখের চিন্তাটা যেন আরও প্রবল হয়ে উঠল।

মহামায়া যেন পাথর হয়ে গেলেন একেবারে।

এ ঘটনার পর অনেকেই এলেন সান্ত্বনা দিতে, সহানুভূতি জানাতে।

এই ব্যারাক বাড়িটাতে বৃন্ধার দল ছাড়াও কয়েকটি পরিবার ছিল, এখন যাকে ফ্ল্যাট বলে তেমনি এক একতলায়। তাঁরা সকলেই এসে একে একে দেখা ক'রে গেলেন। সকলেরই চিন্তা, একটু কেঁদে হালকা হতে না পারলে মানুষটা পাগল হয়ে যাবে যে!

দু-একজন সে কথা বলেও ফেললেন, 'কাঁদছ না কেন মেয়ে, কান্না পাচ্ছে না। এত বড় মেয়েটা গেল!'

একজন বেশীও বললেন। বাড়িওলা কেষ্টর বৌ সত্যভামা কটুভাষিণী বলে বিখ্যাত, আর সে জন্যে লজ্জা নয়, বেশ একটু গর্বই ছিল তার। সে তো একদিন বলেই ফেলল, 'ধন্যি তোমার মায়ের পেরাণ দিদি!...মেয়েটা ছায়ার মতো সঙ্গে থাকত, সে চলে গেল তবু তোমার একটু কান্না পাচ্ছে না?'

অবশ্য মহামায়াকে এর জবাব দিতে হল না। দিলেন ওদের দোতলায় জ্যাঠামশাইয়ের বিরেনব্বুই বছরের মা। বললেন, 'ওলো, তোরা শোকের কতটুকু বুঝিস! বিশ্বনাথের কাছে পেরারথনা করি, বুঝতেও না হয় কোন দিন—তবে তাই বলে অমন হঁস্যিদীঘ্যি বিচের না ক'রে কথা বলিস নি। লোকে বলে অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।...উনিশটা বিইয়েছি আমি তার মধ্যে ষোলটা চিতেয় দিয়েছি, তাও গেছে সব বড় বড় হয়ে—এদান্তে আমার চোখেও আর জল আসে না।...এ মেয়েছেলেটা মুখে কখনও প্রকাশ করে নি—কিন্তু ওর আচার ব্যাভারে তো বুঝি, লাখোপতির বৌ ছিল—সে আজ বাসন মাজছে ঘর পুঁচছে! কীই বা বয়স ওর, এই বয়েসেই যার কপাল পুড়েছে রাজরানী ভিখিরী হয়ে পথে বসেছে, তার কি আর চোখের জল আছে কোথাও। সব যে শুকিয়ে গেছে!'

সত্যিই মহামায়ার সমস্ত অন্তরটা যেন পাথর হয়ে গেছে। মন আর বুদ্ধি নিয়ে যে সত্তা—সে যেন কিছুই আর অনুভব করে না।

সত্য যেখানে নীরব সেখানে অনুমানের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি!

অভাব তো আছেই—কিন্তু দুঃখ ঠিক অভাব-অনটন-দারিদ্র্যের জন্যে নয়, দুঃখ যে এ অভাব ওর থাকার কথা নয়, অন্তত এতটা নয়। অথচ যাদের জন্য এই দুঃখ বরণ করলেন, নিজের সন্তানদের পরিচয় বলতে কিছু রাখলেন না—তারা সে বিপুল আত্মত্যাগের কথা একটুও মনে রাখল না। ভিখিরীর মতোই ব্যবহার করে ওঁদের সঙ্গে—তাঁর সঙ্গে, ওদের নিকট-আত্মীয় এই ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে।

এর জন্যই বামুনদির গঞ্জনা শুনতে হয় আজও।

ছেলেদের উপনয়নের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, সে কথা ইদানীং প্রায় প্রত্যেক চিঠিতে মনে করিয়ে দেন তিনি। লেখেন, সবই যখম ধারকর্জ ক'রে হচ্ছে, গয়না বেচেই সংসার চালাতে হচ্ছে, তখন পৈতেটাই বা ফেলে রাখছ কেন তাও তো বুঝি না। অরক্ষণা মতেও তো বয়েস পেরিয়ে যাচ্ছে খোকার, ওখেনে গঙ্গার ঘাটে তো শুনেছি কত পুরুত-বামুন ঘোরে, যা হোক ক'রে সুতোগাছটা গলায় দিয়ে দাও না!'

এইখানে কিন্তু মহামায়া অটল।

না, তা তিনি করবেন না কিছুতেই।

রাজার ছেলে ওরা, ওদের পৈতে অমন ভিখিরীর মতো যেমন তেমন ক'রে দেবেন না। না হয় পৈতে না-ই বা হবে। এমন তো আজকাল কত ছেলে পৈতে নেয়ই না, কত ছেলের উপনয়ন হবার কদিন পর থেকেই গায়ত্রী বা পৈতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। এই তো পাশের বাড়ির মহেশ্বরবাবু, বয়স হয়েছে, ভট্টাচার্য রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ,—খালি গায়েই ঘোরেন বেশীর ভাগ এমনকি বাজারেও যান খালি গায়ে—গলায় একটা সুতোর খেই পর্যন্ত নেই।

পাপ হবে বয়েসের মধ্যে পৈতে না দিলে? ইজ্জৎ নষ্ট হবে?

ভিখিরির আবার পাপ-পুণ্য কি? বেইজ্জত—যাদের বংশের ইজ্জৎ নষ্ট হবার ভয় তারা যদি সে কথা মনে না রাখে তাঁর অত কি গরজ সে ইজ্জৎ পাহারা দেবার?

সেই কথাই লেখেন বামুনদিকে।

'ওদের সারা জীবন সামনে পড়ে আছে বামুন দিদি, ওদের মানুষ হতে হবে, লেখাপড়া শিখতে হবে। তার খরচ—কাপড়-জামা পোশাক আশাক, পড়ার খরচ—দিন-দিন বাড়ছে বই কমছে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খোরাকীও বাড়ছে, কাপড়জামার মাপও। সব চেয়ে বড় কথা—অসুখ-বিসুখ আছে। আমি যদি হঠাৎ পঙ্গু হয়ে পড়ি—ঠাকুর চাকর ঝি রাখতে হবে। গয়না আর কীই বা আছে? সে খবর তো তুমিই সবচেয়ে বেশী রাখো। এক-মনে ভগবানকে ডাকছি যাতে খোকা মাথাধরা হয়ে ওঠা পর্যন্ত কিছু সম্বল হাতে থাকে, সত্যিই পথে আঁচল পেতে না ভিক্ষে করতে হয়। এখন পৈতে না হলে লোকে নিন্দে করবে সেই ভয়ে ঐ সামান্য পুঁজি থেকে কিছু বার করতে পারব না।

'আর অমুক মুখুজ্জের ছেলে ওরা—গঙ্গার ঘাটে অনাথ ছেলেদের মতো পৈতে

দেবই বা কেন? না হয় কোন দিন না-ই হল। এমন হয়—শুনেছি অনেকে বিয়ের আগে পৈতে দিয়ে নেয়। ওদেরও না হয় তাই হবে, যদি পৈতের জন্যে বিয়ে আটকায়।'

কিন্তু বামুনদিকে যা-ই বোঝান, এদিকে যে সকলকার রসনা নীরব হয়ে নেই, সে তথ্যটা সম্বন্ধে সচেতন হতেই হয়। নানা কথা নানা পথ ধরে কানে এসে পেঁছয়।

সেইটেই প্রচণ্ড আঘাত মহামায়ার, মেয়ে মরারও বেশি।

খবর দেন মহামায়ার পাতানো মা, বিনুদের অক্ষম দরিদ্রতম কিন্তু চিরহিতাকাঙ্ক্ষী কমলা দিদিমা। কিছু কিছু শোনেন গোঁসাই গিন্নির মারফৎও।

গোঁসাই গিন্নীর কৌতূহল বেশী, সংবাদ-সংগ্রহের অনিবার ক্ষুধা। এখনকার ভাষায় যাকে 'জনসংযোগ' বলে সে কাজে তাঁর অসামান্য প্রতিভা। কোন দিন এমনি কারো বাড়ি যেতে না পারলে এ বাড়ির আসল সদর যেটা—সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন, যাকে পান টেনে ঘরে আনার চেষ্টা করেন। নয়তো ঐখানেই দাঁড়িয়ে হাটের খবর যোগাড় করেন। তাই যেখানেই যা উল্লেখযোগ্য ঘটুক, যেখানে যেটুকু রসালো প্রসঙ্গ উঠুক নিন্দুকের নিত্য নব-উদ্ভাসিত 'কিস্‌সা' বা কেচ্ছা—তাঁর কানে পেঁছতে দেরি হয় না।

মহামায়া সম্বন্ধে কুটিল সন্দেহের কারণ আছে বৈকি!

এরা এতকাল আছে এখানে, কই কেউ তো আসে না কখনও। কোন আত্মীয়কুটুম বান্ধবের সঙ্গেই তো যোগাযোগ নেই। কেউ একটা বিয়ে-পৈতের নেমন্তন্নও তো পাঠায় না। কেউ কোথাও নেই, এ কখনও হতে পারে? ওঁর কে এক বামুন দিদি আছে সে ছাড়া আর কেউ একটা চিঠিও দেয় না। মণিঅর্ডার আসে, তার কুপনেও এক লাইন কুশল প্রশ্ন থাকে না।

কৌতূহল এবং সন্দেহ অনেকেরই। আপাতসম্ভ্রান্ত বয়স্ক ভদ্রলোকেরাও এ মনোভাবের উর্ধ্বে নন। এ বাড়ির বিভিন্ন অংশের ভাড়াটেরা তো বটেই—আশপাশের বাড়িতে যেসব বাঙালী ভদ্রলোকেরা থাকেন তাঁরাও—এ বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করা বা মনোমত কাহিনী রচনা করা কর্তব্য বলে মনে করেন। সকলে নয়, তবে বেশির ভাগই। কেউ হয়তো সক্রিয়, কেউ বা দর্শক কি শ্রোতা মাত্র।

এ ব্যাপারে অনেকেই উৎসাহিত বলে, বিশেষ পুরুষরা, পিওনকে আটকে কি চিঠি আসে না আসে মহামায়ার—তার হিসেব নিতে অসুবিধা হয় না। খোলা চিঠি হলে পড়া হয় এবং চিঠির বক্তব্য পরস্পরকে জানানোতেও বিলম্ব ঘটে না।

সত্য যেখানে নীরব সেখানে অনুমানের প্রাসাদ গড়ে তোলা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। সামান্য তথ্যের কাঠখড় বা কঞ্চিতে মাটি ধরানোর কাজ তো চলবেই, সম্পূর্ণ কল্পনার আশ্রয়ও নেন কেউ কেউ।

আর কল্পনার মিথ্যা প্রচার বাস্তব প্রমাণের বাধা না পেলে ক্রমে খরস্রোতা প্রবাহে পরিণত হবে—এও তো জানা কথা। নানা রটনা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

একদিন এও কানে এল, মহামায়াকে নাকি কে কলকাতায় খারাপ পট্টিতে দেখেছে। সেই পরিচয় এড়াতেই নাকি এই বয়সে মাথা নেড়া করেছেন।

যাঁর নামে এত কাহিনী রচিত ও রটিত হয়—তিনি এর একটারও প্রতিবাদ করেন না। কান পেতে শোনেন শুধু চুপ ক'রে। এমন কি একটু তাচ্ছিল্যের হাসিও তাঁর মুখের ভঙ্গীতে ফুটে উঠতে দেখে না কেউ।

বোধহয় তিনি জানেন, বিনা অন্য প্রমাণে প্রতিবাদ করার অর্থই কাদা আরও ঘুলিয়ে তোলা। বিশেষ তাঁর মুখের সামনে যখন বলছে না কেউ—প্রতিবাদ করলেই পুরনো প্রবাদ বাক্য তুলে নিজেদের দিক ভারী করবে—'ঠাকুর ঘরে কে, আমি তো কলা খাই নি।'

তাই নীরবতাই চরম উপেক্ষা—এই সত্য ধরে থাকেন। কেউ তাঁকে যেমন প্রতিবাদ করতেও দেখে নি তেমনি উত্তেজিত হতেও না। শান্ত গম্ভীর, আত্মস্থ। মর্যাদার প্রতিমূর্তি মনে হয়। সে মুখের দিকে চেয়ে তাঁর সামনে এই সব নোংরা কথা তুলবে, এমন সাহসী ও পাড়ায় কেউ ছিল না।

মহামায়া বাড়ির বাইরেও যান কদাচিৎ। পালে পার্বনে বা একাদশীর দিন হয়ত গঙ্গাস্নানে যান, সেই সঙ্গে যেদিন যেমন—বিশ্বনাথ, সংকটা বা কেদার দর্শনে। সংকট-মোচন, পিশাচ-মোচন—এসব কালেভদ্রে। কারণ এসব দূরে দূরে। মহামায়া একায় উঠতে পারেন না, টাঙ্গার ভাড়া অনেক।

আর যান, মধ্যে কিছুদিন গিছলেন রাণী ভবানীর গোপাল বাড়িতে কথকতা শুনতে। কিন্তু সে অল্প কিছুদিনই। যেদিন শুনলেন কথকঠাকুর এক স্ত্রী বর্তমান এবং এখানে থাকা সত্বেও একটি অল্পবয়সী বিধবা শ্রোত্রীকে নিয়ে ঘর বেঁধেছেন, ফলে স্ত্রীকে অপরের বাড়ি রান্নার কাজ করতে হয়েছে—সেদিনই সেখানে যাওয়া ছেড়ে দিলেন।

দশাশ্বমেধে মহিম গায়ক আছেন একজন। রামায়ণ গান করেন ; এক আধ পয়সা পেলার উপর নির্ভর—আজকাল তাও পড়ে না বিশেষ। কোনদিন দশ আনা, কোনদিন বারো আনা, কোনদিন বা আরও কম। পয়সা আধলা মিলিয়ে (বাজনদার দোয়ার নিয়ে মোট পাঁচজন দলে)—সেই মহিমা ঠাকুরের গান শুনতে যান কোন কোন দিন, খুব মন খারাপের কারণ ঘটলে।

মহিম গায়েন বাড়িতেও আসেন। জন্মাষ্টমী বা শিবরাত্রির পারণ উপলক্ষে। কমলা দিদিমার স্বামী রামেশ্বর মুখুজ্জে তো আছেনই—তা নয়, প্রয়োজন বলে নয়, আসলে মহিম ঠাকুরকে দেখে বড় মায়া হয় ; মনে হয় অর্ধেক দিন হয়ত এক মুঠো ভাতও জোটে না। তবু লোকটাকে সামনে বসিয়ে কিছু খাওয়াতে পারলেও শান্তি। বড় নিরীহ আর সৎ লোকটা। এমনিও এটা ওটা—পায়েস বা কোন ভাল খাবার করলে নতুন ভাঁড়ে ক'রে গিয়ে দিয়ে আসেন।

এর মধ্যে নিন্দুকের রসনা ওঁকে আক্রমণ করার সুযোগ পায় না, সাহসও হয় না সম্ভবত।

তবে যে বৃদ্ধার দল বা আশপাশের বাড়ির গৃহিণীরা বাড়ি বয়ে আসেন—তাঁদের এড়ানো যায় কেমন ক'রে। তাঁরা আসেন সহানুভূতির পথ ধরে, কণ্ঠে স্নেহ ও মমতা নিয়ে। তাঁদের কারও কারও স্নেহ ও মমতা আন্তরিক তাতেও

সন্দেহ নেই। তাঁদেরই মধ্যে কেউ কেউ আমিষগন্ধী আলোচনার নির্দোষ রসাস্বাদন ও কৌতূহল চরিতার্থ করতেই অভদ্র লোকের কদর্য মনোভাবের পর্যাপ্ত নিন্দা ক'রে সহসা এক এক সময় কতকগুলি সুচিন্তিত ও তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ক'রে বসেন।

এ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক—বিশেষ মহিলাদের পক্ষে। মহামায়ারও তার জন্য এঁদের খুব দোষী করতে পারেন না। এবং এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকেন বলেই খুব অসুবিধাও বোধ করেন না। তিনি এ প্রসঙ্গই সযত্নে সুকৌশলে এড়িয়ে যান প্রশ্নের ইঙ্গিত—কি বোঝায় বা তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা মাত্র করেন না, অর্থাৎ ফাঁদে পা দিতে চান না।

তাছাড়া, বেশী সময়ও দেন না এদের। কিছু পরেই বলেন, 'এবার কিন্তু আমাকে উঠতে হবে ভাই (কি মা বা দিদি বা মাসীমা—যেক্ষেত্রে যেমন সম্পর্ক পাতানো) বিস্তর কাজ পড়ে। জানেন তো—এক হাতে সব করা। মজুরণীও তো নেই, মাসে এক টাকা দেড় টাকা দিয়ে শুধু বাসন কখানা যে মাজিয়ে না নিতে পারি তা নয়, কিন্তু এঁটো রেখে চলে যায়—ঘরে ঢুকতে গিয়ে তিনচার দিন অবেলায় নাইতে হয়েছে—তাই ও পাপ বিদেয় ক'রে দিয়েছি। আর এই তো কলে জল আসারও সময় হয়ে এল—এবেলা তো মোট দেড় ঘণ্টা জল—কলের সঙ্গে রীতিমতো দৌড়তে হয়, নইলে হাতের কাজ সারবার আগেই জল চলে যায়, বাচ্ছাদের একটু খাবার জল পর্যন্ত থাকে না।'

অকস্মাৎ এদের এই নিস্তরঙ্গ অন্ধকার-প্রায় জীবনে যেন এক অঘটন ঘটে গেল।

অঘটন ছাড়া একে কি বলা যায়! এর জন্যে কোন প্রস্তুতি ছিল না, আশা বা আকাঙ্ক্ষাও করে নি কেউ।

কিছুদিন ধরেই কথাটা কানে আসছিল।

কলকাতা থেকে কে এক শাঁসালো কাপ্তেনবাবু এসেছেন কাশীতে, বিরাট বজরা ভাড়া ক'রে গঙ্গার ওপরই বাস করছেন। বজরা, তাও একটা নয়। বাড়ির মতো বড় বজরায় উনি থাকেন—চাকর বাকর আর মোসাহেবদের জন্যে, দরকারী মাল রাখতে আরও দুখানা সাধারণ মাপের বজরা নেওয়া হয়েছে। সে দুটো সময় বিশেষে দূরে চলে যায় আবার দরকার মতো বড় বজরার গায়ে কাছি বাঁধে।

লোকটার নাকি অঢেল টাকা, ওড়াচ্ছেও দু হাতে।

এক নামকরা 'বাইউলী' এনেছে, সে বজরাতেই বাস করছে বাবুর সঙ্গে। বড় বড় গাইয়ে আসে, সন্ধ্যায় নিত্য মাইফেল চলে। বুঢ়ুয়ামঙ্গলের সময় যেমন বহু বজরায় এই ব্যাপার চলে—এক্ষেত্রে এই অসময়েই তাই চলছে। দামী বিলিতী মদের কার্ফা এসেছে সঙ্গে, যে যত পারো খাও—ঢালা ব্যবস্থা। ফলে কলকাতা থেকে আনা মোসাহেবদের সঙ্গে এখানের মোসাহেব, জুটে গেছে বিস্তর।

তবে টাকা শুধু মদে আর মেয়েমানুষেই উড়ছে না, দান খয়রাতও নাকি করছে ঢের। সেদিন বিশ্বনাথের গলিতে গিয়ে ভিখিরীদের এক সিকি করে

ভিক্ষে দিয়েছে—তাতে এত ভীড় হয়ে গেছল যে শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে বাবুটিকে উদ্ধার করে।

এমনি কত কি, ভাসা ভাসা উড়ো কথা কানে আসছে ক'দিন ধরেই। কোথাও কারও বাড়ি না গিয়েই শুনতে পাচ্ছেন মহামায়া।

ওদের বাড়িতেই—বাগানের উত্তর দিকের ফ্ল্যাটের সরস্বতীর সঙ্গে পশ্চিম দিকের এক ফ্ল্যাটের যশোদার কথা হচ্ছে; প্রয়াগবাবুর স্ত্রী গল্প শোনাচ্ছেন এদের দোতলায় বিষ্ণুপদর স্ত্রীকে, কেষ্টর বৌ তেতলা থেকে গোঁসাই গিন্নীকে সাড়ম্বরে গল্প-বলছে; বেশ চেঁচিয়েই বলতে হচ্ছে, এতদূর থেকে যখন, কাজেই এ রঙদার কথা শোনার কোন অসুবিধে নেই।

কিছুদিন ধরে এই প্রসঙ্গটাই জোর চলছে, অন্য কথা বড় একটা কোথাও শোনা যাচ্ছে না—বিশেষ মেয়েমহলে। মহামায়াও শুনছেন, সত্য মিথ্যা জড়িয়ে কত কি খবর। অবিশ্বাস্যও ঠিক নয়, এমন তো ধরেই কারো কারো মরণদশা। বিচিত্র সত্য, তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে বিচিত্রতর কল্পনা। এক মুখ থেকে যা বেরোয় এই ধরনের 'লচ্ছেদার' খবর অন্যর মুখে পেঁছে তাতে আর একটু রঙ তো ধরবেই।

কানে যায় কিন্তু মহামায়ার মনে যায় কিনা কে জানে। তিনি যেমন প্রাত্যহিক কাজকর্ম করেন তেমনিই ক'রে যান। এ নিয়ে আলোচনাও করেন না কারও সঙ্গে এমন কি জানলা দিয়েও কাউকে কোনদিন এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন না। এই নির্বিকার উপেক্ষাই এক এক সময় বরং আলোচনার বস্তু হয়ে ওঠে। কেউ বলেন, 'ওসব দেখানো, যে এসব কথা আমাদের কানে ঢোকে না।' কেউ বলেন, 'বড় মানষী চাল দেখানো। মানে জানিয়ে দেওয়া আমরাও এককালে বড় লোক ছিলুম, এসব আমাদের কাছে কিছু না।' কেউ বা বলেন, 'কে জানে কত কী তো শুনি—ঐ লাইনের কিনা কে জানে—তাই ওদিকের কথাবাত্তারায় যেতে চায় না।'

কেবল কমলা দিদিমা যেদিন কোন দুর্লভ অবসরে (তাঁর কাছে অবসরটা সত্যিই দুর্লভ, তাঁকেই একরকম গায়ে খেটে অন্নসংস্থান করতে হয়। রামেশ্বর দাদার আর খাটবার সামর্থ্য নেই) এদের খবর নিতে আসেন তখন স্বভাবতই তিনিও এই কাপ্তেনবাবুর কথা তোলেন।

ওঁর কাছেই কেবল মহামায়া মুখ খোলেন। বলেন, 'এমন তো চিরকালই আছে মা, বড়লোকের অপদার্থ ছেলের হাতে হঠাৎ পৈতৃক পয়সা এসে পড়লে এমনি ফুর্তি ক'রে দুহাতে উড়িয়ে দেয়। তারপর পথের ভিখিরি। অধিকন্তু কেউ কেউ কতকগুলো খারাপ রোগ ধরিয়ে বসে। অব্যেস খারাপ হয়ে গেলে, পয়সা থাক বা না থাক, সেসব বজায় দিতে হয় তো, তখন নোংরা বস্তি পাড়ায় যাওয়া ছাড়া উপায় কি বলুন। তারপর শুরু হয় ভিক্ষে। আমি শুনেছি কে এক রাজা ইন্দির চন্দর ছিলেন, তাঁকে পুরনো আমলের খানসামার কাছে হাত পাততে হয়েছে শেষ বয়সে। একজন তাঁর সইসকে দোতলা বাড়ি ক'রে দিয়েছিল—মরার সময়ে সেই সইস আশ্রয় দিয়েছিল তাই—সে খেতেও দিত দুটি দুটি—নইলে ফুটপাথে পড়ে মরতে হত। এতো নিয়মই। মা লক্ষ্মী তো একজনের ঘরে

বেশীদিন থাকেন না, আর তা নইলে অপরের ঘরে যাবেন কখন ? এই অহংকারের ছুতো ধরেই ত্যাগ করেন তিনি। কথাতেই তো আছে, এক পুরুষে কেনারাম পরের পুরুষে রাজারাম তার পরের পুরুষে বেচারাম !'

'না মা' দিদিমা বলেন, 'আমি শুনেছি, একজন বেশ ভাল লোক বলেছে, বড় ঘরের ছেলে তবে অবস্থা এত ভাল ছেল না, নিজেই এই যুদ্ধের বাজারে কি বেচাকেনা ক'রে হঠাৎ পয়সা করেছে।'

'তবে তো আরো ভাল। ঐ যে কী একটা বইতে পড়েছিলুম না ক্ষণেকের আলো ক্ষণেকে মিলাল—দীপ নিভে গেল আঁধারে !'

বলেই মা অন্য প্রসঙ্গ তোলেন। কী রান্না হল—কিম্বা এবার দশমীবৃদ্ধি একাদশী, সম্পূর্ণ দ্বাদশীতে উপবাস হচ্ছে তাই বলে পূর্ণ একাদশীতে ভাত খাওয়া ঠিক হবে ? শাস্ত্রর এসব কি ব্যাপার !

শাস্ত্রর জটিলতা কখনই ভেদ করতে পারেন না—তবে প্রসঙ্গটা অন্য জগতে চলে যায়, মহামায়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

এইসব তুচ্ছ লঘু বিষয়, যাতে নিজেদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধিই নেই তা নিয়ে এত মাতামাতি—বিশেষ অজানা অচেনা পরের ব্যাপার—মহামায়ার ভাল লাগে না।

যার সঙ্গে তাঁর বা তাঁদের জীবনের কোন যোগ কোন সম্পর্ক নেই জেনে নিশ্চিন্ত ও উদাসীন ছিলেন মহামায়া—সেই একান্ত অপরিচিত, দিদিমার ভাষার 'নিষ্পর' মানুষটার জীবনের স্রোত যেন অকস্মাৎ বেঁকে তাঁর জীবনের মধ্যে এসে পড়ল এবং তাঁর ভাগ্যে ও ভবিষ্যতে একটা প্রচণ্ড আবর্তের, তাঁর শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করল।

সেও একটা কি উপবাসের দিন, ছুটিও ছিল ইস্কুল কলেজে। এমন সুযোগ বড় একটা আসে না—মহামায়া সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন বৈকি। তাই সকাল সকাল রান্না ক'রে রেখে বিনুকে নিয়ে মহামায়া বেরিয়ে ছিলেন গঙ্গা-স্নানে। স্নান করে বিশ্বনাথেও যাবেন, এমনি একটা সংকল্প ছিল।

এইসব পালে পার্বনে সকালের দিকে পেষাপেষি ভীড় হয় বলেই একটু দেরিতে—দশটা নাগাদ বেরিয়েছিলেন। আবার তাড়াও আছে—তখন বিশ্বনাথের ভোগ লাগত সাড়ে এগারোটায়, পৌনে বারোটায়—তার আগে পুজার্থীদের সরিয়ে ঘর ধোওয়া-মোছা ক'রা হত। সওয়া এগারোটা পেরিয়ে গেলে একটি ঘণ্টা অন্তত বসে থাকতে হত ধন্না দিয়ে—ভোগ না সরা পর্যন্ত।

গঙ্গা-স্নান ক'রে কালীতলার মোড় থেকে ফুল বেলপাতা কিনে কালীমন্দিরে ঢুকেছিলেন। তখন মার মন্দির অনেকটা উঁচু ছিল সাধারণ মাপের পুরুষের নাক সমান। ইদানীং বিনু দেখেছে অনেকটা যেন নিচু—মন্দিরের মেঝেই নিচু করা হয়েছে অথবা রাস্তাই কালক্রমে উঁচু হয়েছে, তা কে জানে।

মহামায়া মন্দিরে ঢুকে প্রণাম করছেন—বাইরে যেন একটা আলোড়ন উঠল। কিসের এত চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা—কোলাহলও সেই সঙ্গে—তা তিনি বুঝতে পারলেন না। অত মাথাও ঘামাননি প্রথমটায়, কী আর এমন কাণ্ড ঘটবে, হয়ত

দুটো ষাঁড়ে লড়াই করছে—নয়তো কেউ কারও সঙ্গে মারামারি করছে—এই ধরনের কিছু হবে—আর কি। তিনি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তেই জপ ও প্রণাম সেরে বাইরে এলেন তাই।

আসতে আসতেই কানে এল পূজারী ঠাকুর কাকে বলছেন, 'সেই মুখুজ্জেবাবুটি বজরা থেকে উঠে বাজারে আসছেন, তাই সবাই ছ্যাঁকাব্যাঁকা করে ধরেছে আর কি! ভিখিরীর দেশ, ভিক্ষে কেউ দিচ্ছে শুনলে আর রক্ষে নেই। ছ্যাঃ!'

বিনু আগেই বেরিয়ে এসেছিল। দেখল, বাইরে রাস্তায় কে একজন ভদ্রলোককে ঘিরে বহুলোকের ভিড়, ভিক্ষার্থীই বেশী, সাধারণ পথে-বসা ভিখিরী ও তার ওপরের স্তরেরও—ব্রাহ্মণ, ঘাটপাণ্ডা কিছু, তথাকথিত সাধুও। সকলেই প্রার্থী, অসংখ্য হাত প্রসারিত ঐ একটি লোকের দিকে। কেউ কেউ আবার—সম্ভবত কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের রসিদ বইও এগিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

অবশ্য ভদ্রলোককে বাঁচাবার চেষ্টাও যে নেই, তা নয়। দুতিনজন তাঁকে ঘিরে এগোচ্ছে বাবুটির সঙ্গে সঙ্গে। তারা চেষ্টা করছে এদের এই মিলিত আক্রমণ—বিশেষ ঘাড়ে পড়া বা গায়ে হাত দেওয়া থেকে বাঁচাতে, অনেকেরই অতি নোংরা বেশবাস, কারও হাতে পটি জড়ানো—সত্যিকার কুষ্ঠরোগী কি না তাই বা কে জানে—কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। বাবুটি খুচরো পয়সার থলি আগেই এদের একজনের হাতে দিয়ে রেখেছেন তবু সকলেরই লক্ষ্য খোদ মালিক বা আসল দাতার দিকে। কারণ—ঐ মোসাহেব বা আশ্রিত শ্রেণীর লোকটি যে—ইনি দিলে যতটা দিতেন তার থেকে—কম দেবে সে বিষয়ে এরা নিঃসন্দেহ, নিজেদের বহু প্রাক্তন অভিজ্ঞতা থেকে সে জ্ঞান আহরণ করেছে এরা।

বোঝার কোন অসুবিধাই ছিল না যে, এই বাবুটি সেই বজরায় থাকা কাপ্তেনবাবু।

মহামায়াও তা বুঝলেন।

এই দৃশ্য দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ও কৌতূহল নেই তাঁর। এই শ্রেণীর বিলাসী ও অমিতাচারীদের একই রকম চেহারা হয়—এর আর দেখার কি আছে। সামান্য কটা পয়সার জন্যে এই লোকটার কাছে যারা এত দীনতা প্রকাশ করছে তাদের জন্যেই দুঃখ হয়।

তাঁর চিন্তা অন্য। লোকটি এই দিকেই আসছে হয়ত বাঙালীটোলার ভেতরে ঢুকবে কিম্বা কৃত্তিবাসের দোকান থেকে মিষ্টি কিনবে। যাই করুক সহজে এদিকের পথ খালি পাওয়া যাবে না। তিনি কোন পথে বেরোবেন? এ ভীড় ঠেলে যেতে হলে তাঁকে আবার চান করতে হবে। বেশী দেরিও করা চলবে না। ওদিকে দর্শনের দেরি হয়ে যাবে, বাড়ি ফিরে ছেলেদের খেতে দিতে হবে।

মুহূর্তের মধ্যেই কথাটা ভেবে নিলেন! এখনও বাঁদিকটা ফাঁকা আছে, যদি চট ক'রে নেমে কালিয়া গলি দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেন তাহলে এক সময় দেঁড়শি কা পুল বা বিশ্বনাথের গলির মুখে পড়ার অসুবিধা হবে না। চাই কি তার আগেই আঠারো হাত দুর্গার সামনে ডান হাতি কোন গলি দিয়ে বেরিয়ে বড়

রাস্তায় পড়তে পারেন। গলিটা অবশ্য বড় নোংরা, তেমনি ষাঁড় আর কুকুরের ভিড়, মাথার ওপর কি দোতলা বাড়িগুলোর বারান্দায় বানরের উপদ্রবও কম না—তবু কোনমতে নোংরা ন্যাকড়া বা ময়লা এড়িয়ে গেলে সময়মতো মন্দিরে পেঁছিনো যাবে, আবার গঙ্গায় গিয়ে নামতে হলে সে সম্ভাবনা থাকবে না।

ঐ পথ ধরবেন ভেবেই পা বাড়িয়েছেন এমন সময় অঘটনটা ঘটল।

হঠাৎ একটা ভূমিকম্পে পৃথিবী টলে গেলেও এত ব্যস্ত কি বিচলিত হতেন না বিনুর মা।

কী যে ঘটল তাও বোধকরি ঠিক তখন বুঝতে পারলেন না। তখনও বাবুটির দিকে চেয়ে দেখেন নি ভাল করে—তাই তিনি কোন দিকে চেয়ে আছেন বা দেখছেন তাও চোখে পড়েনি। নিজের পালাবার রাস্তায় কথাই ভাবছেন শুধু। একেবারে এ বিষয়ে অবহিত হলেন যখন—মনে হল যেন নিমেষ-পাত মাত্র সময়ে—সেই জনসমুদ্রের ঢেউটা কালীমন্দিরের সামনেই এসে ভেঙ্গে পড়ল।

তাও, তখনও, আকুল হয়ে নিজের বিপদের কথাটাই ভাবছেন—অকস্মাৎ একটা স্পষ্ট উচ্চকণ্ঠের ডাক এসে পেঁছিল, 'বৌদি'।

বিহ্বল মহামায়া এবার চেয়ে দেখতে বাধ্য হলেন।

তবু যেন ঠিক নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

সামনের বাবুটিই তাঁকে ডাকছেন। সুবেশ, গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবী, হাতে অনেকগুলো দামী পাথরের আংটি, গলায় একটা মোটা মালা, বোধহয় কোন ঘাটপাণ্ডা বা আশপাশের মন্দিরের পূজারী পরিয়েছে—মুখে পান জর্দা। চোখে মুখে ভঙ্গীতে বাচনে প্রাচুর্যের তৃপ্তি ও কৃত্রিম বিনয়।

সেই লোকটাই পানের 'পিক' থেকে জামা বাঁচাবার চেষ্টায় মুখটা একটু ওপরের দিকে তুলে পুনশ্চ বললেন, 'আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি কেবু।'

আর বলতে বলতেই এগিয়ে এসে নিচে থেকে ওপরের পৈঠেতে দাঁড়ানো মহামায়ার একেবারে পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করলেন ভদ্রলোক।

মহামায়ার আড়ষ্ট ভেদ ক'রে এবার একটি শব্দ বেরোল, 'তারাপ্রসাদ!'

তারপর যে কি হল—ভিড়, ঠেলাঠেলি, গোলমাল, বিভিন্ন লোকের কণ্ঠস্বর, —সঙ্গে সঙ্গে রাণীমার দিকে কত হাত এগিয়ে এল—তা এতকাল পরে গুছিয়ে মনে করা শক্ত। আর, তখনই তো সে সব পরিষ্কার দেখা কি বোঝা যায় নি।

তবে একটা ব্যাপার সেই অত ছোট বয়সেই বিনু লক্ষ্য করেছিল। আর তা এখনও মনে আছে ওর। মায়ের মুখে বিভিন্ন রংয়ের খেলা, একই সঙ্গে বিভিন্ন বিপরীত-ধর্মী মনোভাবের প্রকাশ।

কপালে সদ্য জমে ওঠা ঘাম, মুখে তৃপ্তি ও কৃতজ্ঞতা, তার সঙ্গে একটু বিজয়-গর্বেরও আভাস, একটা আশ্রয় বা অবলম্বনের আশা ও আশ্বাস, চোখে বহুদিনের নিরুদ্ধ অভিমানের অশ্রু।

এই দিকেই চেয়ে ছিল, অবাক হয়ে দেখছিল বলেই—দুজনে কি কথা হল তাও অত কানে যায় নি। যেটুকু মনে আছে, বোধ হয় ওদের ঠিকানা জিজ্ঞাসা

করছিলেন ভদ্রলোক—মা বলে দিলেন। তিনি পার্ষদদের একজনকে বললেন, তখনই লিখে নিতে। তারপর বললেন, 'আমি কাল না হয় পরশু যাবো। বড় খোকার ক্লাস শুরু হয় কখন? কখন বেরোয় ও?'

মা বললেন, 'কাল ওদের কিসের যেন ছুটি, র‍্যানিবেশান্ত না মালব্যজীর জন্মদিন। কাল বাড়িতেই থাকবে, না হ'লেও বলে দোব থাকতে।'

ভিড় ক্রমেই বাড়ছে, সে চাপ সঙ্গের ঐ তিন চার জন সামলাতে পারছে না দেখে ভদ্রলোক দ্রুত এগিয়ে গেলেন ভেতর দিকে! যেতে যেতেই মুখ ফিরিয়ে বলে গেলেন, 'ভেবেছিলুম দর্শনে যাবো, তা আর হবে না দেখছি। চৌষট্টি যোগিনী হয়ে ঐ ঘাট দিয়েই গঙ্গায় নেমে পড়ব।'

সেই ভিড়—ভিক্ষার্থী ও প্রার্থীর জনতা আরও ঘন হয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই গলির মধ্যে ঢুকল। এ পথ বিনুর চেনা, এদিক দিয়েই কেদারে যেতে হয়, এই দিকেই রাণীভবানীর তিনটে মন্দির, চৌষট্টি-যোগিনীও।

মহামায়ার বেশ একটু সময় লাগল বিস্ময় ও আবেগের এই অভিঘাত সামলে নিতে। অন্তত দু-তিন মিনিট।

বিনুর মনে হল মা যেন বড় বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। পা টেনে চলছেন।

কেন এমন হল ঐ লোকটাকে দেখে কে জানে। ওর একটু রাগই হ'ল—ঐ ভদ্রলোক, কেবু না তারাপ্রসাদ কী যেন নাম—তাঁর ওপর।

বিশ্বনাথের গলির দিকে যেতে যেতে প্রশ্নই ক'রে বসল, 'ও লোকটা কে মা?'

'ছিঃ! অমন ক'রে কারও সম্বন্ধে কথা বলতে নেই। লোকটা নয়, জিগ্যেস করতে হলে বলবে ও ভদ্রলোকটি কে।'

বিনুও যে এটা একেবারে না জানত তা নয়। একটু চুপ ক'রে থেকে অপরাধটা যেন স্বীকার করে নিয়ে বলল, 'তা উনি কে হন তোমার? ওঁকে কি করে চিনলে?'

'উনি তোমার কাকা হন।' সংক্ষেপে উত্তর দিলেন মহামায়া।

কাকা যে বাবার ছোটভাইকে বলা হয়—এ তথ্যটা এতদিন কোন কাকার খবর না পেলেও জানত বিনু। অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'কাকা! আমাদের কাকা? কৈ এত্তদিন শুনি নি তো।'

প্রশ্নের শেষ অংশ এড়িয়ে গিয়ে মা বললেন, 'হ্যাঁ, আপন কাকা তোমাদের।'

॥ ১৭ ॥

বিনুর কাকা সত্যি সত্যিই পরের দিন এসে হাজির হলেন ওদের বাড়ি।

মহামায়া তাঁর কথার ওপর খুব যে একটা ভরসা করেছিলেন তা নয়। তবু ছেলেদের একটু ভাল জামা-কাপড় পরিয়ে, বিছানার চাদর ওয়াড় পাল্টে (বিছানাতেই বসতেও দিতে হবে এলে)—একটু প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। ভোরবেলাই উনুনে আঁচ দিয়ে কখানা রুটি তরকারি ক'রে নিয়ে শেষ আঁচে একটু

গাজরের হালুয়াও ক'রে রেখেছিলেন—জলখাবার হিসেবে। এলে কথা কইতে কইতে দেরি হবে বলেই রুটি-তরকারি করে রাখা, সবাই তাই খাবে।

হয়ত এখানে বা এসবের কিছুই খাবে না, নাক তুলবে। যা সব শোনা যাচ্ছে—মদ মাংস মাছের এলকেল—সে কি আর মিষ্টি জিনিস মুখে তুলবে? তবু তাঁকে তো কিছু একটা সামনে ধরে দিতে হবে।

প্রস্তুত হয়ে ছিলেন, তাই বলে অস্থির হননি। কিন্তু বিনু সকাল থেকেই বলতে গেলে বারান্দায় রেলিং ধরে একদৃষ্টে রাস্তার দিকে চেয়ে ছিল। এ-পথে টাঙ্গা বড় একটা চলে না, এক্কা ডুলি—দৈবাৎ পালকিও এক আধটা আসে। এত হিসেব বিনুর নেই, অত বড় লোক এক্কা কি ডুলিতে আসবে না—এসব তার মাথায় যায় নি, কোন রকম যানবাহনের শব্দ পেলেই, বহু দূর থেকেও সচকিত হয়ে উঠছিল সে। রেলিং-এর খাঁজে মাথা চেপে ধরে সেই বহু দূরে যেখান পর্যন্ত ওর দৃষ্টি চলে—সেইখানে চোখ রেখে ছিল। এলে ঐ একটা দিক থেকেই আসবে। সেই এক ভরসা।

শেষে যখন ওরা সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে তখন এক সময় এগারোটা পার ক'রে দুপুর নাগাদ একটা টাঙ্গার শব্দ পাওয়া গেল, আর বিনু সেই দৃষ্টিসীমার শেষপ্রান্তে গাড়িটা আসতেই চিনতে পারল ওর কালকের সেই কাকা আসছেন।

সে ছুটে এসে মা ও দাদাকে খবর দিল। মহামায়া বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন রাজেন আর বিনু নেমে গেল একতলায়—সদর দরজায়।

তারাপ্রসাদ নম্বর দেখতে দেখতে আসছিলেন, কি ভেবে ঠিক ওদের বাড়ির সামনে পর্যন্ত গাড়ি আনলেন না, দু'খানা বাড়ি আগেই নেমে পড়ে টাঙ্গাওয়ালাকে কি একটা নির্দেশ দিলেন, সে খালি গাড়ি নিয়ে এই দিকেই আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে রাস্তাটা যেখানে অপেক্ষাকৃত চওড়া হয়েছে—একটা কি ছোট্ট পাথরের মূর্তি আছে, এদেশী নববিবাহিত দম্পতি পুজো দিতে আসে—সেইখানেই গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। বোধহয় যাওয়া-আসা ভাড়া হয়েছে, খানিকক্ষণ দাঁড়াতে হবে বলা আছে।

বাড়ি দেখে চিনেই এগোচ্ছিলেন, এদেরও দেখতে পেয়েছিলেন কিন্তু দরজা পর্যন্ত পেঁছিবার আগেই বাধা পেলেন একটা।

দেখা গেল কালকের ঘটনাটা অত দূরে এবং অত অসময়ে ঘটা সত্ত্বেও তার বর্ণনাটা—হয়ত বা অতিরঞ্জিত হয়েই—বহু বিস্তৃত পরিধি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে! এ পাড়ায়ও পেঁচৈছে। মহামায়া টের পান নি, তার কারণ তারপর আর বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ হয় নি তাঁর। তবে অন্য বাকী সকলের জীবনে অনেক দিন পরে এমন একটা মুখরোচক প্রসঙ্গের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁরা সেটা উপভোগও করেছেন। সম্ভবত কাল অপরাহ্ন এবং আজ সকালে কাজকর্ম ফেলেই সকলে এই নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আর সেই জন্যেই, সত্যিই যদি তারাপ্রসাদ আসেন সেই প্রত্যাশায় অনেক উদগ্রীব হয়ে ছিলেন।

সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল—ছোটকাকা যেখানে নামলেন, ওদের বাড়ি থেকে পূর্ব দিকের দুখানা বাড়ি পরে—সেখানে যে দেড় হাত চওড়া একটা সরু গলি

তার মধ্যে থেকে ওদের পাড়ায় যতীনবাবু আর কেষ্টবাবু—ওদের বাড়িওলা—বোধহয় গলিটার মধ্যে ছায়ায় অপেক্ষা করছিলেন, এখন হনহন ক'রে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এসে তারাপ্রসাদের পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালেন।

তারাপ্রসাদ বিস্মিত হলেও তা প্রকাশ করলেন না, শান্ত ভাবেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওঁদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আপনি—আপনি কাকে—মানে কোন বাড়ি খুঁজছেন?' একজন এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন।

'খুঁজছি না তো! কৈ আমি কি কারও কাছে খোঁজ করেছি? আপনারাই বা ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আপনারা কি বাড়িভাড়ার দালালী করেন? আমি ভাড়াও নিতে আসি নি, কিনতেও আসি নি। আমি যে বাড়ি যাবো তার নম্বর জানি, দেখেও নিয়েছি—ঐ তো ওরা দাঁড়িয়েও আছে।

মুখের প্রশান্তি নষ্ট না হলেও কণ্ঠস্বর বেশ কঠিন হয়ে উঠেছিল তারাপ্রসাদের। যতীনবাবুরা একটু থতমত খেয়ে গেলেন। কেষ্টবাবু কোনমতে বললেন, 'অ। ঐ ওরা মানে রাজেনরা?'

'হ্যাঁ' বলে এবার তারাপ্রসাদই ওঁদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন।

যতীনবাবু এতক্ষণে সামলে নিয়েছেন কিছুটা, পাশে পাশেই চলতে চলতে বললেন, 'এরা কে হয় আপনার?'

বিরক্ত হবারই কথা, তারাপ্রসাদও অবশ্যই হয়ে থাকবেন—কিন্তু যে ব্যবসা করে বিত্তশালী হয়েছে তার অভিজ্ঞতা ও মানব-চরিত্রের জ্ঞানই প্রধান সম্বল—তিনি চোখের নিমেষে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। বেশ ধীর ভদ্রভাবেই—বরং যেন একটা স্বয়ং প্রকাশ সত্য এদের বুঝতে দেরি হচ্ছে দেখে বিস্মিত হবার ভঙ্গিতে বললেন, 'আমার বৌদি, ভাইপোরা। রাজেনদের আমি কাকা হই।'

'আপন কাকা?'

'হ্যাঁ। আমার বড় দাদার ছেলে ওরা। আপন বৌদি। আপন ভাইপো।'

তারপরই আরও বিস্মিত হবার সরল ভঙ্গিতে বললেন, 'কেন বলুন তো এত জেরা করছেন? ওরা কি কোন খারাপ কাজ-টাজ করেছে?'

'না না। তা নয়। জেরা করব কেন! মানে কখনও তো আপনাকে এর আগে আসতে দেখিনি, কেউই তো আসেন না। এদের সঙ্গে—'

কথাটা শেষ করতে দিলেন না যতীনবাবুকে, তার আগেই শেষাংশটা মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে তারাপ্রসাদ বললেন, 'যোগাযোগ কম—এই তো? তার কারণ দাদা বহুদিন আগেই আলাদা হয়ে গিছলেন—বেশী যোগাযোগ থাকবে কেন? তা তাই বলে তো সম্পর্কটা উঠে যায় নি, এ যে রক্তের সম্বন্ধ। বিশেষ ছেলেমানুষ ওরা। বিদেশে পড়ে রয়েছে, এখানে যখন এসেছি—দেখা করব না! ঠিকানাটা নিয়ে আসি নি বলেই—নইলে তো প্রথমেই আসার কথা!'

এক চ্যাঙ্গারী মিষ্টি হাতে করে আসতে ভুল হয়নি তারাপ্রসাদের।

না, ভুল কিছুই হয় নি।

ব্যবহার যে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন তা মানতেই হল মহামায়াকে। কথায়বার্তায় আচরণে কোথাও কোন ঔদ্ধত্য কি ঐশ্বর্যের চিহ্ন বহন করে আনে নি। মহামায়া সবচেয়ে কৃতজ্ঞ যে ঐ মোসাহেবদের কাকেও সঙ্গে ক'রে আনে নি।

একা এখানে পেঁছিবার আগেই গাড়ি থেকে নেমে এইটুকু পায়ে হেঁটে এসেছে। এদের এখনকার দীন অবস্থা না লজ্জা পায় এই ভেবেই নিশ্চয়। বিছানা দেখিয়ে দিলেও সেখানে বসল না, পাশে মেঝেতে বসল। বলল, 'এই তো বেশ, ঝকঝক করছে মোছা, পরিষ্কার। বাইরের কাপড়ে আর বিছানায় বসি কেন। এইখানেই শোয় ছেলেরা?'

শুধু মিষ্টি খাবারই আনে নি, মিষ্টি কথাও শুনিয়ে গেল অনেক। অনেক আশা, উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা। রাজেনের পড়াশুনোর সব খবরই শুনল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ভাল ক'রে পাস করেছে, প্রথম হয়ে জলপানি পেয়েছে শুনে বলল, 'ইস, আগে যদি জানতুম। তুমি আবার আই. এসসি পড়তে গেলে কেন? শুধু শুধু সময় নষ্ট। ওদেশে এটার কোন দাম নেই। পাস ক'রে নিতে চাও করো, তবে আর এখানে পড়ার চেষ্টা করো না। কলকাতায় চলে এসো, রেজাল্ট-এর জন্যেও অপেক্ষা করার দরকার নেই। এগজামিন দিয়েই কলকাতায় চলে এসো, আমি তোমাকে জার্মানীতে পাঠিয়ে দোব। আর যদি বিলেত যেতে চাও—তাও হবে, কেম্ব্রিজে আমার এক বন্ধু থাকে, তাঁকে লিখলে সব ব্যবস্থাই হয়ে যাবে। তবে আমার তো মনে হয় সায়ান্সে জার্মানীই ভাল। যাই হোক—পড়তে হয় পাস করতে হয় ওখানেই করো। এখানের এসব মামুলি পড়ায় কেন ফিউচার নেই। বিলেতে গেলে আই-সি. এস হয়ে আসতে পারো, কি ব্যারিস্টার—যা খুশি। এমনিও খামকা বিলেতে ফুর্তি ক'রে এসে দাঁড়ালেই—বিলেত ফেরৎ এই সুবাদে বড় বড় মার্চেণ্ট আপিসে চাকরি পেয়ে যাচ্ছে কত লোক।'…

অকস্মাৎ সামনে প্রখর আলো জ্বলে উঠতে দেখলে যেমন মানুষের চোখে ও মনে ধাঁধাঁ লাগে—রাজেনেরও সেই রকম লাগল অনেকটা। অপ্রত্যাশিত শুধু নয়, অচিন্তিত কল্পনাতীত সৌভাগ্য সত্যিই কি তার সামনে এসে এক কুবেরপুরীর দ্বার খুলে দিল? আশা করতে ভয় করে? না, তাও ঠিক নয়। এমন আশা যে করা যায় তাই তো ভেবে দেখে নি কখনও, ভাবার কথা মনেও হয় নি।

মহামায়াই মৃদুকণ্ঠে বললেন; 'আমার ইচ্ছে ছিল একটা ছেলে ইঞ্জিনীয়ার হয়—'

'বেশ তো!' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে ওঠে তারাপ্রসাদ, 'এ আর এমন কি শক্ত কথা। ভালো স্টুডেণ্ট যে তার তো সব দোরই খোলা। বিশেষ সায়ান্সই পড়ছে যখন—না সে হয়ে যাবে। তবে তাও এদেশে নয়। আমেরিকার ম্যাসাচুয়েসেটস'এ খুব ভাল ব্যবস্থা—আমার বন্ধু নলিনীর অনেক লোকজন আছে ওখানে—যখন বলব তখনই সব বন্দোবস্ত ক'রে দেবে। দ্যাখো এখনই যেতে চাও? তাহলে তুমি একাই চলে এসো—আমি আপাতত একটা মেস ঠিক

ক'রে দেবো, তুমি সেখানেই উঠতে পারবে—তারপর বৌদিরা ধীরে-সুস্থে একটা বাড়ি দেখে চলে যেতে পারবেন। আর যদি—'

মাথা ঘুলিয়ে ওঠারই কথা। কিন্তু রাজেনের তা হয় না। প্রথম দিককার সেই চোখ ঝলসে ওঠার ভাবটাও সে কাটিয়ে উঠেছে। সে ধীর শান্তভাবে বলে 'না, আর এই তো বছরখানেক, এতদিন পড়লুম এটা পাস করে নেওয়াই ভাল। বলা তো যায় না কখন কি হয়। যদি শেষ পর্যন্ত এখানেই বি এস সি পড়তে—মিছিমিছি এই পড়াটা নষ্ট করি কেন !'

'সে দ্যাখো। য়্যাজ ইউ উইল। মোদ্দা পরীক্ষা দিয়েই চলে এসো।'

এই প্রসঙ্গে ও সুযোগে খরচপত্রের ও মাসোহারার অপ্রতুলতার কথা তুলতে গিছলেন মহামায়া। কিন্তু তারাপ্রসাদ সবিনয় মধুর হাস্যে সে প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিল। বলল, 'আপনি তো জানেনই, ও ডিপার্টমেণ্টটা মেজদার। ওঁর সঙ্গে আমার মত কোন দিনই মেলে নি। ওঁর বুদ্ধিতে চলতে গেলে আমাকে আজও তিরিশ টাকা মাইনের মাষ্টারী করতে হত !'

তারপর আরও অনেক ভাল ভাল কথা বলে, ওদের কল্পনার পটে ভবিষ্যতের অনেক উজ্জ্বল আশার ছবি এঁকে দিয়ে দুই ভাইয়ের হাতে দুখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বিদায় নিল এক সময়।

যাবার সময়ও বারবার রাজেনকে বলে গেল, 'যত তাড়াতাড়ি পারো চলে যেও, আমার এ মুড আর হাতে টাকা থাকতে থাকতে। আমি জমি কেনাবেচার ব্যবসা করি, কতকটা গ্যাম্বলিং বলতে পারো। একটা যদি হিসেবে ভুল হয়ে যায় সব ডুববে ! এসব ব্যবসায় আজ রাজা কাল ফকির।'

রাজেনই কথাটা তোলে প্রথম।

বলে, 'মা, ছোটকাকা আসায় আমাদের খুব প্রেস্টিজ বেড়েছে পাড়ায়।'

'কি করে বুঝলি ?' মহামায়া প্রশ্ন করেন।

'আগে যারা পাশ দিয়ে চলে গেলেও কথা কইত না—এখন ডেকে আমাদের শরীরের খবর নেয়। জহরের দোকানে জিনিস কিনতে গেলে ওর ঐ একফালি রকের ওপর পাতা তেলচিটে চটের ওপর একটা চ্যাটাই পেতে দেয়, বলে বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে।'

বলে আর হাসে খুব।

তারপর বলে, 'আর জানো, কেষ্টমামা পর্যন্ত আজ সকালে ডেকে বলেছেন, "তোমরা এত বড় ঘরের ছেলে, অথচ এমন ভাবে থাকো যেন মনে হয় কিচ্ছু নেই। তোমার মা আচ্ছা চাপা মানুষ কিন্তু।" এ যা হল না—এখন যদি তুমি এক বছরও ভাড়া না দাও, কেষ্টমামা সাহস করে তাগাদা করতে পারবেন না।···বড়লোক হওয়ার এই এক সুবিধে, লোকে ধার দিতে পারলে কৃতার্থ হয়ে যায়।'

প্রেস্টিজ—ওর মানে বুঝি মর্যাদা বা ঐরকম—যে বেড়েছে তা মহামায়া বেশ টের পেয়েছেন। পাচ্ছেন প্রতিদিনই। তবে একটু অন্য রকমে যাকে বলে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া তাই পাচ্ছেন।

'ধন অপবাদ' কথাটা কেন বলে তাও এতদিনে বুঝলেন।

হঠাৎ সেই দিন থেকে সাহায্য ও ঋণপ্রার্থী বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে বললেও কিছু বলা হয় না, আগে এক-আধ পয়সার খদ্দের—অর্থাৎ মন্দির কি গঙ্গার ঘাটের ভিখিরী ছাড়া কেউ ওঁর কাছে কিছু আশা করত না। আশা করত না বলেই চাইত না কখনও। এখন রাতারাতি যেন আশাটা পর্বতপ্রমাণ উঁচু হয়ে গেছে!

বাঙ্গালী গার্লস স্কুলের জন্যে চাঁদা, বেদ বিদ্যালয় স্থাপন না করলে সনাতন ধর্ম ছারেখারে গেল তার জন্যে চাঁদা, শ্রীশ্রী১০৮ বাবা ভজনানন্দজীর আশ্রম পাকা করার জন্যে চাঁদার খাতা তো আসছেই—কার মেয়ের বিয়ে, নাতির পৈতে, কোন গরিবের ছেলের বই কিনে দেওয়ার জন্য অনুরোধ উপরোধ, হাতে পায়ে পড়ারও অন্ত নেই। পাড়ার লালমোহন সরকারের ছেলে কয়লার দোকান দেবে—সেও এসে ঋণ চায় ওঁর কাছে।

পাড়া থেকে বহুদূরে অসময়ে, বলতে গেলে অবেলায়—কোথায় কি সামান্য ঘটনা ঘটেছে—তার খবর যে এইভাবে এত বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে তা কে জানত! আর তার ফলে ওঁর অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে উঠবে!

বড় বড় চাঁদার খাতা এড়াতে তো হচ্ছেই তাঁরা কেউ মহামায়ার অবস্থা বোঝেন না, বিশ্বাসও করেন না। কিন্তু যাদের সামান্য প্রার্থনা, সামান্যতম আশা—তাদের কিছু না কিছু তো দিতেই হয়। ফলে সত্যিই যেন নিজেদের ভাতে টান পড়ে, খুচরো দেনা জমে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। রাজেন আর বিনুর কাকার কাছ থেকে পাওয়া—এই প্রথম ও এই শেষও সম্ভবত—কুড়িটা টাকাও চেয়ে নিতে হয়। এছাড়াও বিনুর কাছে হাত পাততে হয় তাঁকে।

বিনুর 'বিত্তশালী' হওয়ার ইতিহাস বড় বিচিত্র।

রাজেন বাজার করে, বাজারের পয়সা থেকে যা ফেরে তার মধ্যে আধলা বা আধ পয়সা থাকলে বিনু চেয়ে নেয়। এইভাবে সাতটা আধলা জমলে রাজেনকেই আবার দিয়ে এক আনা আদায় করে। কালক্রমে আনিও জমে, সাড়ে পনেরো আনা হলে মাকেই দেয়, মা একটা টাকা দেন খুশী হয়েই। ছেলে পয়সা জমাতে শিখেছে, জমানোর আনন্দেই জমায়—কোন বাজে খরচ করে না—মহামায়া তাতেই আরও খুশী।

এইভাবে জমতে জমতে গোটা ত্রিশ পর্যন্ত হয়েছিল। এর আগে খুব বিপদ বা অনাহারের মুখে দু-এক টাকা নিতে হয়েছে, তবে মহামায়া সাধ্যমতো ওর পয়সায় হাত দেন না। এবার কিন্তু সবই নিঃশেষ করে নিতে হল উপায়ান্তর না দেখে।

কলকাতা থেকে মাসিক মনিঅর্ডার আসার দিন ক্রমেই বিলম্বিত হচ্ছে। এখানের সংসার অচল শুধু নয় ছেলেদের ইস্কুলের মাইনে পর্যন্ত বাকী পড়ছে, ঠিক সময় দেওয়া যাচ্ছে না কোন মাসেই। ফাইন তো দিতে হচ্ছেই, লজ্জার অবধি থাকছে না। বিনুর অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। ওদের ক্লাসেই মাইনে নেওয়া হয়, মাসে তিন দিন, ক্লাস টিচার অশ্বিনীবাবু মাইনে নেন। তিনি ভালো মানুষ, বেশী কিছু না বললেও সকলকার শ্রুতিগোচর স্বরেই মৃদু

তাগাদা দেন, 'ইন্দ্র, তোর লাস্ট ডেটও পেরিয়ে গেছে কিন্তু।'

বিনু কি জবাব দেবে? মার অবস্থা তো দেখছেই। মাথা হেঁট করে বসে থাকে, লজ্জায় কান মাথা আগুন হয়ে ওঠে।

কলকাতায় বামুনদিদির কাছে রেখে আসা সোনার পুঁজি ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। ঠকায়ও ওঁকে খুব। তাছাড়া ওঁরও শরীর ভেঙেছে এবার, অর্ধেক দিন নিজের কাজেই বেরোতে পারেন না। এর মধ্যে দু-তিন দিন মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে গেছেন। এর ভেতর নিজের বেগার চাপাতে লজ্জাই করে মহামায়ার।

জীবনের আকাশে দুর্ভাগ্যের মেঘ ঘনিয়েই আসে ক্রমশ, কোথাও কোন আলোর রেখা দেখতে পান না।

কেউ কেউ বলে মানুষের দুঃখের ভরা পূর্ণ হলে—গোসাঁই গিন্নীর ভাষায় 'নেখন পরিপুণ্যি হলে'—নাকি ভগবানের করুণা নামে তাকে শক্তি বা সান্ত্বনা দিতে। কখনও কখনও অপরের হাত দিয়ে সাহায্যও পাঠান তিনি।

মহামায়ার জীবনেও সেই ঘটনা ঘটল এবার।

রাজেনের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার টাকা জমা দেবার শেষ তারিখ এসে গেছে, টাকা আসেনি। কলকাতায় বহু পূর্বেই দুখানা চিঠি দেওয়া হয়ে গেছে, একশো ক'টাকা লাগবে সবসুদ্ধ সে হিসাব দিয়ে—সে বাড়তি টাকা আসার আশা অবশ্য তিনি করেন না, য়্যাডমিশন পরীক্ষার সময় পঁচিশটি টাকা মাত্র বেশী পাঠিয়েছিলেন তাঁরা—এবার বাড়তি তো দূরের কথা, মাসকাবার পেরিয়ে আর এক মাস শেষ হতে চলল সে মাসিক খরচার টাকাও আসেনি।

এরকম যে হবে তা অবশ্য কতকটা তো জানাই, সে জন্যে বামুনদিকে পনেরো কুড়ি দিন আগে চিঠি লেখা হয়েছে, টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার করে দেড়শো টাকা পাঠাতে, তার কোন উত্তর বা টাকা কিছুই আসেনি।

শেষ তারিখের আগের দিন বিকেলে আর কোন মতেই ঘরে স্থির হয়ে বসে থাকতে না পেরে রাজেনকে বসিয়ে (যদি 'তারে' টাকা আসে, যে কোন সময়েই আসতে পারে) বিনুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

সংকটা মার ওপর খুব বিশ্বাস, তাঁকেই একমনে ডাকতে ডাকতে হাঁটছিলেন। কোথায় যাবেন তা জানেন না, শুধু এক জায়গায় নিশ্চল হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয় বলেই পথে বেরিয়েছেন, সেই ভাবেই হাঁটছেন। হয়ত মনের অবচেতনে সংকটার মন্দিরে যাবার কথাটা ছিল, কিন্তু তখনও কিছু স্থির করেন নি। গঙ্গার ধারে গিয়ে আঁজলা করে জল চোখে দিয়ে চোখের জল ফেলার লজ্জা থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে সেই কথাটাই বড় ছিল মনে। লজ্জা—এবং কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে—হাজারো কৈফিয়ৎ।

সংকটাই দয়া করলেন কিনা কে জানে—দশাশ্বমেধের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে যে মেয়েটি উঠে আসছে চোখে পড়ল—সে ওঁদেরই প্রাক্তন ভাড়াটের মেয়ে, সরস্বতী।

সে চোখ ঝলসানো রূপের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। চোখের কোলে কালি, দৃষ্টিতে ক্লান্তি এই বয়সেই প্রসাধনের প্রলেপ ভেদ করে মেচেতার চিহ্ন

ফুটে উঠেছে—তবু চিনতে কোন অসুবিধে নেই। এখনও চেহারার যে জেল্লা বা ঔজ্জ্বল্য আছে তাও ঢের, প্রায়-সন্ধ্যার জনবিরল ঘাটে পুরুষের দল চঞ্চল হয়ে উঠছে।

সরস্বতীকে চিনতে যেমন মহামায়ার কষ্ট হয়নি, সরস্বতীরও ওকে চিনতে না। সে 'ও মাসীমা গো' বলে লাফাতে লাফাতে ব্যবধানের তিনটে সিঁড়ি পার হয়ে এসে একেবারে ওঁকে জড়িয়ে ধরল।

তারপরেই বোধহয় মনে পড়ে গেল কথাটা, বলল, 'তোমাকে জড়িয়ে ধরলুম, ঘেন্না করছে না তো? আমি জানি এ অন্যাইয়ের জন্যে তুমি ঠিক ঘেন্না করবে না, তবে—তা কাপড় তো তুমি গিয়ে কাচবেই নিশ্চয়, নাইতে হবে না তো? কাজ বাড়ালুম হয়তো—।'

এত দুশ্চিন্তা ও দুঃখের মধ্যেও মেয়েটাকে দেখে—আগেকার চেনা লোক—মহামায়ার আনন্দই হল। তিনি সস্নেহ ধমকের সুরে বলে উঠলেন, 'নে নে, তোকে আর মুরুব্বির মতো লেকচার দিতে হবে না। গঙ্গার ওপর—এক্ষুনি গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করব—কাপড়ই বা কাচব কেন?…তারপর, তুই কবে এলি, কোথায় আছিস? কার সঙ্গে এসেছিস?' তারপর গলাটা ঈষৎ নামিয়ে বলেন, 'জ্ঞানবাবু—জ্ঞানবাবু তোকে বিয়ে করেছে? কৈ কপালে তো সিঁদুর দেখছি না।'

একটু ম্লান হেসে সরস্বতীও আস্তে বলে, 'পোড়া কপালে সিঁদুর উঠবে কেন মাসিমা, সিঁদুর পরার কপাল ক'রে আসতে হয়।…একটু আগেই দেখলুম বড় রাস্তায় নেমে, এই ঘাট দিয়ে একটা মড়া নে গেল, বোধহয় মণিকর্ণিকা যাচ্ছে—এয়োস্ত্রীর মড়া, সতীরানী ভাগ্যিমানি—কী সাজিয়ে দিয়েছে কি বলব। এই চওড়া ক'বে সিঁদুর পরিয়েছে, টকটকে ম্যাজেণ্টার* পায়ে, চওড়া লালপেড়ে ধোয়া শাড়ি—মনে হল এমন করে সাজিয়ে কেউ নে যাবে জানলে এখুনি মরতে রাজী আছি।…মাসীমা, আজ মনে হয়, তোমাদের ও বাড়ির সামনে যে সরকারদের বাড়ি ছেল, সেই রাঙাবাবুদের দারোয়ানের সঙ্গে আমার যদি বে হত, সেও আমার সুখের হত। তবু সিঁদুর তো পরতে পেতুম।'

বলতে বলতে ওর চোখের দু'কূল ছাপিয়ে জল ঝরে পড়ল।

মহামায়া ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে কি সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বাধা পেলেন।

সরস্বতীর পিছনে অনেকটা দূরে এক বৃদ্ধ আসছিলেন—বৃদ্ধ হয়ত ঠিক নন, প্রৌঢ় বলাই উচিত, চুল এখনও সব পাকেনি—তাতে সযত্ন টেরি, কাঁচাপাকা গোঁফের দু'প্রান্ত মোম দিয়ে ছুঁচলো করে পাকানো গিলেকরা পাঞ্জাবী, কুঁচনো ফরাসডাঙ্গার ধুতি, সরু লিকলিকে চিনে বেতের ছড়ি, হাতে ফুলের মালা জড়ানো—শৌখিন কাপ্তেন বাবু বলতে যা বোঝায়—অতিকষ্টে সিঁড়ি ভেঙ্গে আসছিলেন এতক্ষণ, এবার কাছে এসে বললেন, 'তোমার কি দেরি হবে এখানে?'

---

* আগেকার দিনে অনেকে আলতাকে এই নামে অভিহিত করত। বোধহয় 'ম্যাজেন্ট.' থেকে তৈরী বলেই।

'হ্যাঁ গো, একটু হবে। অনেক কাল পরে চেনা মানুষের দেখা পেলুম, আমাদের বামুন মাসিমা, ছেলেবেলায় এঁদের বাড়ি ভাড়া ছিলুম আমরা কলকেতায়। কোথায় আছেন, কবে এলেন, কদিন থাকবেন—কোন কথারই ছিরি ছাঁদা হয়নি। তুমি এগিয়ে যাও, খানিক পরে বরং ঝি কি জীবনকে পাঠিয়ে দিও, আমরা এইখেনে একটা কোন ঘাটের পাটায় বসে গল্প করব।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। সরস্বতী এক রকম মহামায়াকে টেনে নিয়ে গেল নিচে জলের ধারে, সকালে স্নান সেরে একেবারে জলের ওপরই যেখানে বৃদ্ধরা বসে পুজো জপ করেন—সেই কাঠের পাটাতনের ওপর। হাত বাড়ালেই জল পাওয়া যায়, সরস্বতীই একটু তুলে নিজের মাথায় মহামায়ার মাথায় ছিটিয়ে দিল, 'গঙ্গা গঙ্গা'।

তারপর এই দুটি অসমবয়সী স্ত্রীলোক বসে নিজেদের জীবনের দুঃখের ইতিহাস পরস্পরকে শোনাতে লাগল, গল্প করতে লাগল বন্ধুর মতোই। বিনুকে কেউই পুরুষ কেন, বড় কিশোর বয়সী ছেলে বলেও গণ্য করল না, ও যে এসব কথা কিছু বুঝতে পারে—সে কথা কারও ধারণাতেই এল না।

ঠিক গয়না কাপড় কি পয়সা টাকাই নয়—জ্ঞানবাবু ওকে ব্রাহ্মমতে বিয়ে করবেন—এই লোভেই কতকটা সরস্বতী বেরিয়ে এসেছিল সেদিন, হয়ত কিছুটা তাঁর চেহারাতেও আকৃষ্ট হয়ে! রূপ তো ছিলই ভদ্রলোকের, পুরুষোচিত চেহারা, তাছাড়াও—একজন অভিজ্ঞ পুরুষের সম্বন্ধেও কুমারী মেয়েদের একটা সহজাত আকর্ষণ থাকে, সে অভিজ্ঞতার আভাস তাদের মনে অন্য এক রূপও রচনা করে পুরুষটার সম্বন্ধে।

সে আকর্ষণও বড় কম নয়।

বিয়ে হয়নি, কলকাতায় ফিরে বিয়ে করবেন বলেছিলেন জ্ঞানবাবু। সেটা যে ঠিক বিশ্বাস করেছিল সরস্বতী তা নয়—তবে তখন আর উপায় কি? ভাগ্যের ছকে জীবনের দান তো পড়েই গেছে!

তবু প্রথমটা মন্দ কাটেনি।

বিহারে কোডারমার কাছে ওর এক বন্ধু 'ফার্ম হাউস' বা খামারবাড়ি করেছিলেন—তাঁরও বিয়েটা হয়েছিল একটু বেআইনী গোছের—অনেকখানি জমি নিয়ে, ছোট বাড়িও করেছিলেন একটা। চাষবাস করবেন, গরু মোষ রেখে মাখন ঘি তুলবেন—এই ইচ্ছা। স্বাভাবিকভাবেই—এ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা বা আসক্তি যাকে বলে তা ছিল না, সুতরাং সেদিকটা পুরোপুরি লোকসান, এই জঙ্গলে ভদ্রলোকের স্ত্রীও থাকতে রাজী হননি। সে বাড়িটা পড়েই ছিল, সেখানেই জ্ঞানবাবু ওকে নিয়ে গিয়ে তোলেন।

অঢেল টাকা সঙ্গে এনেছিলেন, আত্মরক্ষার জন্যে বন্দুকও ছিল সঙ্গে। তখন একটা বন্দুক কারও আছে জানলে চোর-ডাকাত তার ত্রিসীমায় যেতে সাহস করত না। সেটা আছে জানাবার জন্যে মধ্যে মধ্যে রাত্রে ফাঁকা আওয়াজ করতেন—'দেয়াড়ি দেওয়া' যাকে বলে।

ওখানে তিন মাস থেকেই অসহ্য লেগেছিল। পেটে একটা ছেলে আসে—সেটাও নষ্ট করার দরকার ছিল। জ্ঞানবাবু বুঝিয়ে ছিলেন, পেটে ছেলে আছে

জানলে ব্রাহ্মমতে বিয়ে হবে না। ওখান থেকে বেরিয়ে কাশী এলাহাবাদ (সরস্বতীর ভাষায় 'পৈরাগ') আগ্রা দিল্লী হয়ে কাশ্মীর পর্যন্ত গিছলেন। আগ্রাতেই ভ্রূণটা নষ্ট করা হয়, আনাড়ি ডাক্তার। তাতে জীবনসংশয় দেখা দিয়েছিল সরস্বতীর। তাতেই ওখানে মাসখানেক থাকতে হয়। একটু সেরে উঠতেই কাশ্মীর মুসৌরী।

তারপর হাতের টাকা ফুরিয়ে এল, শখ তো মিটেছিল আগেই। জ্ঞানবাবু ঘোড়েল লোক, আবার এই কাশীতে এসেই হাজারখানেক টাকা দিয়ে আর এক 'রসিক' বন্ধুর জিম্মায় রেখে সরে পড়লেন। বলে গেলেন, দাদাদের একটু ভুচুং-ভাচাং দিয়ে আর কিছু নগদ টাকা হাতিয়ে নিয়ে ফিরে আসবেন।

তারপর থেকেই ভাগ্যস্রোতে ভাসছে ও।

বলাবাহুল্য সে রসিক বাবুটিও ছেড়ে দিলেন মাস দুই পরে। তবে তিনি একটু দয়া করেছিলেন—সঙ্গে করে এনে মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের এক বাড়িউলির কাছে পেঁছে দিয়েছিলেন।

কলকাতায় এসে নিষ্ফল জেনেও জ্ঞানবাবুর খোঁজ করেছিল। শুনল তাঁর ভাইয়েরা আর স্ত্রী একরকম নজরবন্দী ক'রে রেখেছে। হাতে একটা পয়সাও দেয় না। উনি পৈতৃক ব্যবসার অংশ একজন মুসলমান মহাজনকে বেচতে যাচ্ছেন খবর পেয়ে বাড়ি আর ব্যবসার অংশ নাবালক ছেলের নামে লিখিয়ে নিয়েছে, স্ত্রী তার অভিভাবক হিসাবে সই-সাবুদ দেখাশুনো করবেন—এই ব্যবস্থা হয়েছে।

তারপর অনেক ঘাটের জল খেয়েছে সরস্বতী। কষ্ট আর অপমানের শেষ থাকে নি। শেষে ভাগ্যক্রমে এই বুড়োর কাছে আশ্রয় পেয়েছে। এরও টাকা ঢের। তবে এবার আর সে বোকামি করেনি, ওর টাকায় নিজের নামে বাগবাজারে একটা বাড়ি কিনে নিয়েছে, তাতে এক ঘর ভদ্রলোক ভাড়াটে আছে, মাসে ষাট টাকা ভাড়া পায়। কাশীতেও জমি কিনেছে, ইচ্ছে আছে এই বেলা এখানেও একটা বাড়ি করিয়ে নেবে বুড়োকে দিয়ে। সেই তক্কেই এসেছে এবার। একটা কন্ট্র্যাকটরও ঠিক হয়েছে, হয়ত খানিকটা হয়েও যাবে।

'খানিকটা' বলার অর্থও বুঝিয়ে দিল। খুব গরম পড়ে গেলে আর থাকতে পারবে না বাবু। বুড়োমানুষ গরম সইতে পারে না। ঠাণ্ডা দেশেও যেতে চায় না। পুরী ওয়ালটেয়ার কিম্বা সমুদ্রের ধারে কোথাও চলে যায় ফী বছরই। ছেলেরা সব বড় হয়ে গেছে, তাদেরও অনেক রোজগার, তারা বাবার একটু-আধটু ফুর্তি নিয়ে মাথা ঘামায় না। স্ত্রীও তাই—এক ছোকরা গুরু জুটেছে—সাধনা ভজন নিয়ে মেতে আছে। বাবুও তাতে উৎসাহ দেয়, নিজের স্বাধীনতা থাকে অনেকখানি। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি খানিকটা।

না, মোটামুটি ভালই আছে সরস্বতী। বুড়োর কোন ঝক্কি-ঝামেলা নেই। একটু সেবা পেলেই খুশী। কাপড় গয়নায় মুড়ে দিয়েছে। কোনদিন কদাচ কখনও গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হয়ত বুড়োর একটু ইয়ে হয়, তা তাতে আপত্তি কি। একজন সরকার আছে ছোকরা, জীবন বলে—বাবু বলেন সেক্রেটারী—দেখতে-শুনতে ভাল, বুদ্ধিমান; খুব একটা চোর-চ্যাঁছড়ও নয়, সেই জন্যেই বুড়ো সঙ্গে রাখে, চুরি না ক'রেও লোকসান নেই তার; বুড়ো যখন-তখন

অনেক টাকা দেয়—সরস্বতী আড়ালে-আবডালে তাকে দিয়েই শখ মেটায়। তবে খুব একটা বাড়াবাড়ি করে না, কারণ অনেকদিন পরে ভাল আশ্রয় পেয়েছে, সেটা খোয়াতে চায় না।

আরও অনেক খবর দিল সে।

চপলার আবার বিয়ে দিয়েছে ওর দাদা। ওদেরই স্বঘর, বেনেদের মধ্যেই। জেনেশুনেই বে করেছে লোকটা। সরস্বতী বলল এক পয়সা তো নেয়নিই, উল্টে দাদাকে নাকি এত্তোটি টাকা দিয়েছে। সেই টাকায় চাকরি ছেড়ে রাধাবাজারে দোকান করেছে দাদা। লোকটা নাকি টাকার কুমীর। জমিদারী, বড় বড় কারবার, অনেক বিলিতি কারবারের অংশীদার, মাছের ভেড়ি, ভাঙা বাড়ি—টাকার সীমে-পরিসীমে নেই। একটা আগের পক্ষের বৌও আছে, সেও বড়লোকের মেয়ে। তবে ছেলেপুল হয় নি, আসলে সে ঘরও করে না। সেই জন্যেই একে বে করেছে! বে করেছে একটা শর্ত্তে। সে শর্ত্তে নাকি কেউ রাজি হয় নি, দিদির আগে। তবে লোকটা পোড়খাওয়া, সরাসরি দিদির সঙ্গে কথা বলে কড়ার ক'রে নিয়ে বে করেছে।

মহামায়া আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'তোমাদের ঘরে বিয়ের আগে মেয়ের সঙ্গে বর কথা কয়ে নিল! এতে তো তোমাদের জাত যাবার কথা বলতে গেলে।'

এর মধ্যে যে বিত্তান্ত আছে মাসিমা। আর যেখেনে এত টাকা সেখেনে কি না হয়। দাদাকে একটি হাজার টাকা গুণে দিয়েছে ঐ জন্যে। তারকেশ্বরে নে গিছল। সেখেনে ভিড়ের মধ্যে এক ফাঁকে একটু দূরে গিয়ে কথা বলেছে, সে আর কে জানতে যাচ্ছে বল।'

'তা শর্তটা কি?' চিরসংযমী মহামায়ারও কৌতূহল হয়।

'তোমার কাছে বাপু সেকথা বলতে লজ্জা হয়।…তবে লজ্জা বা আর কি করলুম, কোন কথাটা বাদ গেল। কেউ তো আর শুনতে আসছেও না, আমার সঙ্গে আর কার দেখাই বা হচ্ছে, বলেই ফেলি।…লোকটার নাকি একটা দোষ আছে। এমনি পুরুষ মানুষের ধম্ম বজায় দিতে পারে না। কোন একটা মেয়েকে ধরে চাবুক মারতে থাকলে তবে খানিক পরে বেটাছেলে হয়। তা বৌ বড়লোকের মেয়ে, সে এ ছোটলোকপনা সইবে কেন? তাই এ ব্যবস্থা। রাঁড় রাখতেই চেয়েছিল। একটি লাখ টাকা কবলে ছিল সে জন্যে—দাদাকে আলাদা দশ হাজার—দাদা-মার আপত্তিও ছেল না। দিদি বেঁকে বসল। সে সেয়ানা মেয়ে, বললে, তা হবে না। দস্তুর মত মন্তর পড়ে, তত্ত্বতাবাশ করে লোককে জানিয়ে বে করো, বোয়ের ময্যেদা দাও, তোমার ও চোরের মার সইতে রাজী আছি। নইলে কটা টাকার জন্যে খানকী পাড়ায় নাম নেকাব, অত লোভ আমার নেই। তা লোকটা তাইতেই রাজী হয়েছে।…সেও কড়ার করে নিয়েছে দিদি, মাসে একটা দিন তার বেশী নয়। লোকটাও ভাল, খুব যত্ন করে দিদিকে, এক লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়েছে বৌভাতের দিনই। যে দিন ধরে ঠেঙ্গায় সেদিনই একখানা ক'রে জড়োয়া গয়না দেয়। দিদিও নাকি খুব সেবাযত্ন করে, করবে নাই বা কেন বল, এ আশা তো ছেল না। দাদার বাড়ি ঝি বিত্তি করে জীবন কাটাছিল এ তো রাজার রানী হল। এখন শুনছি,

প্রথম বোয়ের খুব রোষ। সেও ফিরে আসতে চায়। বর বলে, না, আর না। আমারও আশার অতিরিক্ত পেইছি। শুনেছি দিদি পোয়াতিও হয়েছে, এ আশাও তো ছেল না লোকটার। ভগিনপোত তো আমার আনন্দে পাগল হতে বসেছেল, বলে, তুমি সাক্ষাৎ রাধারানী, আমার বংশের প্রতি করুণা করে আমার ঘরে এয়েছ।'

'তা কি হয়েছে চপলার—ছেলেপুলে ?'

'সে খবর পাই নি মাসিমা। সেই থেকেই তো এর সঙ্গে ভাসছি, দেশে দেশে। কলকাতায় গেলে আমাকে বড় বড় বিলিতি হোটেলে রাখে, সে ঐ দুটো-চারটে দিন। সেখেনে আর কার কাছে কি খবর পাব বল।'

নিজের কথা শেষ হলে মহামায়ার কথাও শোনে।

সবই বলেন তিনি। কিছুই গোপন করেন না।

আসলে কাউকে এতটা দুঃখের কথা না জানাতে পেরেই কষ্ট হচ্ছিল তাঁর সবচেয়ে।

সব বলেন। বর্তমান বিপদ—কালকের আসন্ন সর্বনাশের কথাও।

'কাল তিনটের মধ্যে ফিয়ের টাকা জমা না পড়লে ছেলেটার একটা বছরই নষ্ট হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, মনটা ভেঙে যাবে। কালই বলছে এসব লেখাপড়ার বিলাস আমাদের সাজে না, উচিত ছিল কোন কারখানায় কাজ খোঁজা। দেওর অবিশ্যি বলেছেন পাস দেবার দরকার নেই, কিন্তু দুটো বছর ধরে খাটল—সব জলে যাবে! বল দিকি। তাছাড়া দেওরের তো ঐ ধরনের মতিগতি—তার ভরসায় ভেসে পড়তেও তো ভয় হয়।'

স্থির হয়েই শোনে সরস্বতী, মহামায়ার বলা শেষ হলেও অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে সে। গঙ্গার নিস্তরঙ্গ স্রোতের দিকে চেয়ে বসেছিল এতক্ষণ, সেইভাবেই চেয়ে থাকে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ঘাটের ধারে একটা মন্দিরে আলো জ্বলে উঠেছে এরই মধ্যে। আধা অন্ধকারের মধ্যে এক-আধখানা নৌকো চলেছে যাত্রী নিয়ে, তাদের ছপাৎ ছপাৎ দাঁড় ফেলার শব্দ উঠছে অল্প অল্প। অহল্যাবাই ঘাটে শরৎ কীর্তনীয়া এখনও গান গাইছে—সেই শব্দটাই প্রবল। দু-একজন যাঁরা এসেছেন ঘাটে, মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে কুশাসন পেতে যে যার আহ্নিকে বসে গেছেন।

অনেকক্ষণ পরে কথা কইল সরস্বতী, গাঢ় মৃদুকণ্ঠে বলল, 'একটা কথা বলব মাসিমা, আস্পদ্দা ধরবে না? বিপদে পড়লে তো মানুষকে অনেক মন্দ কাজও করতে হয়, অনেক হেনস্তা অনেক অপমানও সইতে হয়। তেমনিই যদি ধরো তো বলি কথাটা সাহস করে—'

বুকটা কি আশায় দুলে ওঠে মহামায়ার ?

হে মা সংকটা!

'কী রে, এমন কি কথা, বল না।' অনেক চেষ্টা করে গলাটা সহজ করেন মহামায়া।

'ঐ টাকাটা আমার কাছ থেকে নেবে? আমার অনেক টাকা, খাবার কেউ নেই। ছেলেপুলে আমার আর হবে না, সে আমি জানি। জ্ঞানবাবুই সে পথ মেরে দিয়েছে সেবার।···কি হবে আর আমার টাকা। বুড়ো যদি মরে যায় কি ছেড়ে দেয়—আমার জীবন এক রকম করে চলেই যাবে। ঐ বাড়ির ভাড়া থেকেই আমি চালিয়ে নিতে পারব। নাও না টাকাটা, না হয় ধার বলেই নাও—।'

'পেলে তো বেঁচে যাই মা, স্পষ্ট কথাই বলি,' মহামায়া বলেন, 'আমার এখন মান-অপমান ওজন ক'রে অত মাথা ঘামালে চলবে না। টাকাটা কিভাবে আমাকে দেবে? আর আমিই বা কি করে পেঁৗছে দোব?'

'না মাসিমা, শোধ দিও, তবে আমার সংস্পর্শে আর না আসাই ভাল। দেখা হল, তা-ই কথায় কথায় কি জানাজানি হবে—যা শুনলুম তোমাকে কাদায় নামাবার জন্যেই সবাই ব্যস্ত—তোমাকে সুদ্ধ হয়ত আমাদের দলে জড়াতে চাইবে। ছেলেরা বড় হয়েছে, মানুষও হবে—তোমার ছেলে যেকালে—তাদের গায়ে না কোন রকম কাদার দাগ লাগে। যদি ফেরৎ দেবার মত অবস্থা হয় তোমার—তাড়াহুড়ো ক'রো না—তুমি বরং এক কাজ ক'রো—টাকাটা রামকৃষ্ণ মিশনের কোন হাসপাতালে দিয়ে দিও। আমার নামে নয়—তোমার নামে হোক, তোমার ছেলেদের নামে হোক—যে নামে খুশী। আমার নামের সম্পর্কেও এস না আর। তাতেই আমার দেনা শোধ হবে।···বরং ডবল সৎ কাজে লাগাবে, সেটাই আমার বড় লাভ ধর। যদি পাপের ময়লা কিছুটা কমে।'

'তা আমি কালকের মধ্যে পাব কি করে? কখন?' মহামায়ার তখন আর সৌজন্য করার সময় নেই, কথা বাড়ালে চলবে না। ছেলেটা একলা আছে, মনের দুঃখে কি ক'রে বসবে কে জানে। তাছাড়া রাতও হয়ে এল, ওঁদের জন্যেও সে ভাববে।

কিন্তু সরস্বতী কোন উত্তর দেবার আগেই দু-এক ধাপ ওপর থেকে কে ডাকল, 'বৌদি আছেন নাকি এখানে? বৌদি।'

'জীবনবাবু।···এই যে আমি এখেনে জলের ওপর। যাচ্ছি।'

তারপর মহামায়াকে বলল, 'সঙ্গে তো টাকা নেই, দরকারও হয় না! বুড়ো সঙ্গেই থাকে, যখন যা দরকার দেয়। অন্য কোন দিন কোথাও হাটে-বাজারে গেলে এই জীবনই থাকে, টাকা-পয়সা সে রাখে। আমি বাড়ি পেঁৗছেই জীবনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি ওকে ঠিকানাটা বুঝিয়ে দাও।'

উঠে ওপরে আসতে সেই আবছা আলোতেও জীবনকে দেখতে পান মহামায়া। সুশ্রী জোয়ান ছেলে, ভদ্রঘরের ছেলে দেখলেই বোঝা যায়। বেশ বিনত ব্যবহারও। পরিচয় নেই, তৎসত্ত্বেও মহামায়াকে দেখে হেঁট হয়ে নমস্কার করল।

একটু মুখ টিপে হেসে সরস্বতী বলল, 'ইটিই আমাদের জীবনবাবু মাসীমা, বাবুর সেক্রেটারী। আমাদের বুড়ো-বুড়ির জীবন বলতে গেলে। ও-ই গার্জেন আমাদের। বেশ ভাল ঘরের ছেলে, মেদনিপুর জেলায় বাড়ি, বাপের বড় গোলদারী কারবার, জায়গা জমি আছে। সৎমার সঙ্গে ঝগড়া করে এক

কাপড়ে চলে আসে, কলকেতায় মুটেগিরি করলেও পয়সা এই শুনে সেই আশাতেই এসেছেল। একটা পাসও দিয়েছেল নাকি, তা এখেনে ওকে কে চাকরি দেবে বলো, তাবড় তাবড় তিনটে পাসওলা ছেলেই কাজ পাচ্ছে না।···কীভাবে জানি না, আমাদের বাবুর নজরে পড়ে গেছল, সেই থেকে ওনার কাছেই আছে। আসলে মানুষটা সেবা-যত্নেরই কাঙাল, তা আমাদের জীবনবাবুর ও বিদ্যেটা জানা আছে ষোল আনার ওপর আঠারো আনা। বাবু বলেন, গা টিপে দিলে ঘুম পেয়ে যায় এত আরাম লাগে। অবিশ্যি, মিছে কথা বলব না, কথাটা সত্যিই। দিয়েছে, আমাকেও যে না দিয়েছে এক-আধ দিন তা নয়।'

তারপর একটু মুচকে হেসে বলে 'আমার আবির্ভাবের আগে তো শুনিছি বাবু ওকে পাশে করে নে শুত। অবিশ্যি লোকটার বিবেচনা আছে, তা বলব। যে ওকে একটু দেখে-শোনে তাকে দু'হাত খুলে দেয়। এর নামে মাসে মাসে ব্যাংকে টাকা রাখছেন—বেশ মোটা টাকা—এখন হাতে দেবেন না—বলেন, হাত খরচা তো আমি দিচ্ছিই, যখন যা দরকার, ও টাকা নে কি করবে এখন, ও জমুক। আসলে ভয় কিছু বেশী টাকা হাতে পেলে যদি পালিয়ে যায়? উনি—যখন থাকবেন না তখন যাতে ওকে আর কোথাও চাকরি না করতে হয়, কারবার করে খেতে পারে—সে ব্যবস্থা উনি করে যাবেন, সে কথা বার বার বলেন। আমাকে চুপ্‌চুপ্‌ আরও বলেছেন, যদি এর মধ্যে না সটকাশ, আরও তিন-চার বছর অন্তত টিকে থাকে, একটা বাড়ি করে দিয়েও দেবেন।'

জীবন যে লজ্জায় ঘেমে উঠছে তা এক গোলাপী রেউড়ীওলার আলোতে দেখতে কোন অসুবিধে নেই। শেষে আর থাকতে না পেরে বলে, 'বৌদি অনেক রাত হল। দাদা হয়ত ভেবে অস্থির হচ্ছেন। এখন গল্পর ঝুলি বন্ধ করলে হয় না?'

'এই করলুম। মুখে গো দিলুম। কিন্তু জীবনভাই তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। এই মাসিমা—আমাদের অনেক কালের বামুন মাসী—এঁর ঠিকানাটা তুমি ভাল ক'রে জেনে বুঝে নাও। বাড়ি ফিরেই তুমি দেড়শোটা টাকা নে এঁকে পেঁাছে দিয়ে আসবে। একটুও না দেরি হয়। আমি এঁকে কথা দিয়েছি—আধ ঘণ্টার মধ্যে পেঁাছবে। কিসের দরকার কি বিত্তান্ত সে আমি বাবুকে বলব, তুমি শুধু টাকাটা পেঁাছে দিও।'

জীবন আস্তে আস্তে, মাথা চুলকে বলল, 'যদি দেড়শো হলেই কাজ চলে বৌদি—এখন নেবেন? ও টাকা আমার সঙ্গেই আছে। ব্যাংক থেকে তুলেছি, সারা দিন একে-ওকে দিতে হচ্ছে, বাক্স পর্যন্ত পেঁাছয় নি। এখন কি তাহলে—।'

যথেষ্ট সম্ভ্রম এবং সংকোচের সঙ্গেই কথাটা বলে—মহামায়ার মর্যাদা না ক্ষুণ্ণ হয়—সেদিকে লক্ষ্য রেখে।

'আছে? তবে তো—। না, তার দরকার নেই। এতগুলো টাকা নিয়ে মাসিমা বাড়ি ফিরবেন কি ক'রে? গুণ্ডা বদমাইশের তো অভাব নেই এ শহরে। তুমি গেঁজে থেকে বার ক'রে গুণে দেবে, ভাবছ অন্ধকার, দ্যাখো গে কত জোড়া চোখ এদিকে তাকিয়ে আছে। তুমি বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে পেঁাছে দিয়ে এসো!

আমরা আছি এই ঘাটের কাছেই, বড় রাস্তার ওপর—ভগবতী সেনের বাড়ি ভাড়া নিয়ে—আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলে আর আমার জন্যে ভাবনা নেই—ও এখনই তোমার সঙ্গে চলে যাক বরং—'

আর একবার মনে মনে মা সংকটাকে প্রণাম জানালেন মহামায়া।

॥ ১৮ ॥

কথাটা বিনুই তুলেছিল ওদের ক্লাসে। ওপরের ক্লাসে—ক্লাস এইট সেটা, তখনও ও ইস্কুলে ঐ পর্যন্ত ছিল, হাইস্কুল হয় নি—হাতে লেখা মাসিক বেরোত একটা। বেরোত মানে, লেখা ও ছবি আঁকা হলে বাঁধিয়ে লাইব্রেরীতে রাখা হত। প্রতি মাসে ঠিক বেরোত না, সে তো জানা কথাই, তবে বছরে পাঁচ-ছ'খানা বেরোত। ছেলেরা এসে যতটা পারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাইব্রেরীতেই নেড়েচেড়ে উল্টে দেখে যেত। সাধারণ ছেলেদের অত ঔৎসুক্য নেই, যাদের লেখা আছে, তারাই পড়ে মনোযোগের সঙ্গে। লেখাগুলো তারিণীবাবু একটু দেখে দেন, হাতের লেখা ভাল কমলাক্ষর, সে কপি করে।

বিনু গোরাকে বলল, 'আয় আমরা একটা এমনি কাগজ করি।'

প্রথমটা সকলেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল।

'ধ্যুস! আমরা কি কাগজ করব! পাগল নাকি! কে লেখক আছে আমাদের মধ্যে শুনি, কত নম্বর পাস 'এসে' লিখে? এক লাইন লিখতে পারবি?'—এই ধরনের কথাই ওঠে চার দিক থেকে।

কিন্তু বিনু জিদ ধরে। সে বলে, এমন কি একটা শক্ত কাজ। ওদের সব লেখাটেখা তারিণীবাবু দেখে দেন, আমরা নতুন মাষ্টার কমলেশবাবুকে দিয়ে দেখিয়ে নোব। সুরেশদার মুখে শুনেছি উনি খুব পড়াশুনা করেন, রাশি রাশি বই পড়েন। সেই জন্যেই বি-এ ফেল করেছেন এবার—মানে আসল টেকস্ট বুক সব পড়েন নি বলে। খুব ভাল থিয়েটারও করেন। এ সব কাজ উনি তারিণীবাবুর চেয়েও ভাল পারবেন দেখে নিস।

আসলে এটা ওর উপলক্ষ। আসল লক্ষ্য গোরা—গোরাকে অনেকটা সময় কাছে পাওয়া। এ এমন একটা কাজ যাতে জড়িয়ে পড়লে ওর বাবাও বাধা দেবেন না, কেউই কিছু বলতে পারবে না। গোরার হাতের লেখা ভাল, ছাপার কাজ—এক্ষেত্রে পরিষ্কার ছাপার মতোই সাজিয়ে কপি করার ভার নিশ্চয়ই ওর ওপরই পড়বে। আবার যেহেতু এ প্রস্তাবটা—উৎসাহ উদ্যোগ—প্রধানত বিনুরই—সম্পাদনার দায়িত্বও তার ওপরই পড়বে নিশ্চয়। ছাপাখানার সঙ্গে সম্পাদকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—একথা দাদার মুখে অনেকবার শুনেছে।

গোরাই প্রশ্ন করে, 'ছবি আঁকবে কে? ওদের দেখেছিস পাতায় পাতায় ছবি, কী সুন্দরভাবে প্রত্যেক পেজে বর্ডার আঁকে, সব লেখার হেডিং-এ ছবি দেয়, ওদের প্রফুল্লদা আছেন, খুব ভাল আর্টিস্ট—আমাদের এসব কে করবে?'

'ছবি আমি আঁকব।' ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলে বিনু।

'তুই!'

কাছাকাছি যে দু-তিনজন ছিল সবাই হেসে ওঠে। তামাশা করছে ভাবে। কিংবা—এদের ভাষায়, 'ফাট নিচ্ছে।'

'তুই কখনও ছবি এঁকেছিস? কোন দিন তো কিছু আঁকতে দেখলুম না।' কালা বলে ওঠে।

কেবল নাগেন, বিনুর বড় অনুরাগী, সে, বলে 'না না ইন্দুর ড্রয়িং-এর হাত খুব ভাল, মাস্টার মশাই সেদিন বলছিলেন—ঐটেকেই যা গাধা পিটে ঘোড়া করতে পেরেছি।'

'আরে, ড্রয়িং ভাল পারা আর ছবি আঁকায় অনেক তফাৎ। কৈ, কোন দিন কি এঁকেছে একটাও ছবি।'

বিনু মুখ গোঁজ করে বলে,'রঙ তুলি কেনার পয়সা নেই যে—নইলে দেখিয়ে দিতুম। একথা বাড়িতে বলেও কোন লাভ নেই। মা বলবেন, পড়ার বই অর্ধেক কেনা হয় না—রঙ তুলি কিনে দেবে ওঁকে।'

সাধারণত নিজেদের আর্থিক দৈন্য প্রকাশ করতে চায় না ও, কতকটা জেদ বজায় দিতে গিয়েই বলে ফেলল। সবটাই ফাঁকা আওয়াজ বলতে গেলে। সত্যিই ছবি আঁকা বলতে যা বোঝায় তা কোন দিনই আঁকে নি—তবে প্রায়ই ইচ্ছে হয় এটা ঠিক। আর এও মনে হয়, কাজটা এমন কিছু শক্ত নয়। নিষ্ফল জেনেই বাড়িতে কখনও কথাটা ওঠায় নি। যারা খেতে পাচ্ছে না, তাদের কাছে রঙ তুলির বিলাস ধৃষ্টতা।

নরসিং পেছনের বেঞ্চে বসেছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, বেশ তো, তুই পেন্সিল দিয়েই একটা ছবি এঁকে দেখিয়ে দে না। ধর—যা তুই প্রত্যহ দেখছিস এমন একটা জিনিস। এই বাড়ি, সামনের বেঙ্গলীটোলা স্কুল, দশাশ্বমেধ ঘাট—কত কি তো আঁকতে পারিস। এই নে, আমি সাদা কাগজ দিচ্ছি, আর এই পেনসিল। খুব ভাল পেনসিল, আমার মেসোমশাই কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছেন। সরু ক'রে কেটেও দিয়েছে আজ পণ্ডা। আঁক দেখি।'

আর পিছিয়ে আসার কোন উপায় নেই।

দেখতে দেখতে ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে উঠল। একবার মনে হল বলে—কাগজটা দে, বাড়ি থেকে এঁকে এনে দোব কাল, পরক্ষণেই এ প্রস্তাবের কি ফল দাঁড়াবে তাও বুঝল। বলার সঙ্গে সঙ্গে ওরা টিটকিরি দিয়ে উঠবে। অবিশ্বাস বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ হতে থাকবে চারিদিক থেকে। আর সেটা স্বাভাবিকও। ভাববে অপর কাউকে দিয়ে আঁকিয়ে এনে নিজের বলে চালার ফন্দি এটা। হয়ত ওর দাদাই আঁকতে পারে, তাকে দিয়ে আঁকিয়ে এনে নিজে বাহাদুরী নেবে।

একবার অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। সকলের চোখে মুখেই ব্যঙ্গের ছুরি উদ্যত হয়ে আছে।

বেশ শান দেওয়া ধারালো ছুরির মতোই।

ভয় করছে, আবার লোভও হচ্ছে এই সুযোগে নিজের শক্তিটা দেখিয়ে দেবার—যে শক্তি আছে বলে ওর বিশ্বাস।

সে মরীয়া হয়ে কাগজটা টেনে নিয়ে বলল, 'কিন্তু তোমরা চারদিক থেকে ঘিরে থাকলে চলবে না। আমি ওদিককার বেঞ্চিতে গিয়ে আঁকব।'

অসুবিধা ছিল না। সে পিরিয়ড তারাপদবাবুর। তিনি আসেন নি, বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আর কেউ আসার মতো নেই—এটা শেষের আগের পিরিয়ড, যাঁদের ফাঁক থাকে তাঁরা বাড়ি চলে যান। সেই হট্টগোলেরই সুযোগ নিয়েছিল এরা।

ওদিকের একটা বেঞ্চি খালি করে দেওয়া হল! একেবারে জানলার ধারের ডালিম গাছটার দিকে।

বিনুর হাত কাঁপছে, ঘাম গড়িয়ে পড়ে কাগজ ভিজে যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে হতাশও হয়ে পড়ছে, মনে হচ্ছে—ওর দ্বারা হবে না; ছবির মতোও হবে না হয়ত, সকলে যা-তা বলবে। কেনই বা মরতে বড়াই করতে গেল ও। পালাবার উপায় থাকলে ছুটে চলে যেত ও। আর এখানে আসতে হবে না এমন ভরসা যদি থাকত।

সুতরাং কাগজ পেনসিল নিয়ে বসতেই হল।

শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালও একটা।

এঁকেছে অহল্যাবাই-ঘাটের ছবি। গঙ্গাস্নান করতে গেলে বার বারই তাকিয়ে দেখে এই ঘাটের ওপর দিকটা, গঙ্গা থেকে কিংবা পাড়ে উঠে মায়ের জন্য—অপেক্ষা করতে করতে।

সিঁড়িগুলো কোন উঁচুতে উঠে গেছে। ওপরের বাড়িগুলোর মাথায় পাথরের জাফরি বসানো পাঁচিল। উমাচরণ কবিরাজের বাড়ির বারান্দায় ওপরের দিকে যে খানিকটা ক'রে ঢাকা আছে তার গায়ে বড় বড় হরফে লেখা—বোধহয় দু-হাত উঁচু হরফ—সেই শ্লোকটা তো মুখস্থই হয়ে গেছে প্রায়—'উমাচরণ চিত্তেন উমাচরণ শর্ম্মণা, যৎ উমাচরণাৎ প্রাপ্ত তৎ উমাচরণোর্পিতম্।'

দিনে দিনে মনের মধ্যে এই সম্পূর্ণ ছবিটাই আঁকা হয়ে গেছে যেন। সামনের বাঙালীটোলার বাড়িটা দেখে আঁকা যায়—কিন্তু সে হল নিতান্তই ড্রয়িং। তাকে ছবি বলা যে চলবে না কোন মতেই—সে জ্ঞানটুকু এখনই হয়েছে। আবার বাড়িটা এতই সাধারণ যে কোন দিন ভাল করে তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি, সেই কারণেই তার ছবিও মনে গেঁথে যায়নি, স্মৃতি থেকে আঁকা যাবে না।

অহল্যাবাইঘাট কিন্তু ছবি হয়েই মনে গেঁথে গেছে।

অনেকদিন সে মনে মনে এই ছবিটা দেখেছে—ছবির মতো করেই—সম্পূর্ণ। তাই সেইটেই ধরেছিল। সেইটেই আঁকল।

ছবি যে নিজের খুব পছন্দ হয়েছিল, তা নয়। নানান ভুল-ত্রুটি, রেখার অসমতা—এসব তো আছেই। নিজের চোখেই ধরা পড়ছে এর দৈন্য আর অসম্পূর্ণতা।

হয়ত সে এনে সাহস ক'রে এদের হাতে দিতে পারত না—এরা সে অবসরও দিল না। আঁকার শেষে হাত থামিয়ে মাথা তুলতেই ওরা চিলের মতো ছোঁ মেরে কেড়ে নিল কাগজখানা। তারপর নরসিংহের সিটের কাছে 'হাইবেঞ্চে' মেলে ধরতেই সবাই মিলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এমন কি অলক পর্যন্ত।

না, ধিক্কার নয়, বিদ্রূপ নয়।

প্রথম প্রচেষ্টায় আশাতিরিক্ত পুরস্কার পেলো সে।

পরবর্তী জীবনে অনেক প্রশংসা, অনেক পুরস্কার পেয়েছে সে, এত আনন্দ আর কখনও বোধ ক'রে নি।

গোরাই বলে উঠল, 'আরে বাস। শাবাশ! সত্যিই তো ওর আঁকার হাত আছে দেখছি। একেবারে অহিল্যেবাই (গোরা কখনও অহল্যাবাই বলতে পারে না, ওর বাবা বলেন অহিল্যেবাই, সেটাই মাথায় লেগে গেছে) ঘাট—হুবহু। বা রে ছোকরা! আবার দ্যাখ, ঐ শ্লোকটা সুদ্ধ এঁকে দিয়েছে ছবির মধ্যে। বারান্দায় জাল দেওয়া, ভেতরে কাপড় শুকুচ্ছে, অবিকল!

নরসিং বলল, 'না, সুন্দর হয়েছে। না ভাই ইন্দ্র, তোকে বেকুব বানাতেই চেয়েছিলুম, সকলের সামনে তোর বড়াই ভেঙে দিতে—এখন মাপ চাইছি।'

এমন কি চির-উদাসীন অলকও বলল, 'না, সত্যিই, মার্ভেলাস। আর এই কুড়ি মিনিট সময়ের মধ্যে—। বাহাদুরী আছে!'

সেদিনকার মত্যে কথাটা সেইখানেই চাপা পড়ল। একজন মাস্টার মশাই আসেননি বলেই এই ঘণ্টাটা পাওয়া গিয়েছিল। মোট পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়। তারপর রুটিন মতো চলল ক্লাস আপনার নিয়মে। ছুটির পর সকলেরই বাড়ি যাওয়ার তাড়া।

পরের দিন প্রায় ছুটতে ছুটতে বলতে গেলে বেশ একটু আগেই এল বিনু! তার সাহস বেড়ে গেছে, আজ বেশ একটু দাপটের সঙ্গেই গোরাকে বলল, 'তাহলে পত্রিকার কাজটা ঠিক হল তো! এবার শুরু করে দে—'

'বা রে। কী ঠিক হবে তাই শুনি। তুই না হয় ছবি আঁকলি কি বর্ডার দিলি—তাও তো রঙ তুলি চাই, ভাল কাগজ চাই। কিন্তু আসল জিনিস তো লেখা—আসল যা বার করবি। সে সব লিখবে কে?'

'তুই লিখবি, আমি লিখব। যা পারি তাই লিখব। আমাদের কাছে কি আর কেউ দীনেন রায়ের মতো লেখা আশা করবে? আমরাই তো পড়ব।'

তখন বিনু মার জন্যে জঙ্গমবাড়ির বিশ্বনাথ লাইব্রেরী থেকে আনা দীনেন্দ্রকুমার রায়ের বই হরদম পড়ছে। ওর কাছে তিনিই সবচেয়ে বড় লেখক! এর মধ্যে এদের কাছে 'চূড়ান্ত চাতুরী', 'মেয়ে বোম্বেটে'র গল্পও শুনিয়েছে—নিজে কিছু কিছু রঙ চাপিয়ে।

গোরা অত কিছুই পড়েনি। সে বললে, 'যা, তা কখনও হয়। আমরা কি লিখব! কখনও লিখেছি। ওরা ওপরের ক্লাসে পড়ছে ওদের কথা আলাদা।'

'ওঃ! ভারী তো ওপরের ক্লাস। আমরা সিক্স ওরা এইট। এতেই এত পণ্ডিত হয়ে গেল। চেষ্টা কর, চেষ্টা করলে সবাই লিখতে পারবি!'

শেষ পর্যন্ত বিনুর উৎসাহ একটু একটু ক'রে সঞ্চারিত হয় এদের মনে। গোরা লেখার চেষ্টা করতে প্রতিশ্রুতি দিল, নাগেন তো একটা ফণ্টিনণ্টি গোছের লিখেই ফেলল। কেবল কালী বলল, 'কিন্তু উপন্যাস? উপন্যাস ছাড়া তো মাসিক পত্র হয় না। সবাই তো কবিতা লিখছে। উপন্যাস চাই, প্রবন্ধ চাই। প্রবাসী ভারতবর্ষ দেখিস না?'

বিনু বললে, 'আমি লিখব। লিখতে পারি কিনা দেখিস!'

একটু-আধটু ঠাট্টা তামাশা করলেও, আজ আর কেউই ওকে উড়িয়ে দিতে সাহস করল না। কাল ছবি এঁকেই বিনু এদের চোখে অনেকটা উঠে গেছে। ওর এতটা ক্ষমতা আছে কিনা, সে সম্বন্ধে সকলের মনেই যথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও তা খুব বড় গলা করে বলতে সাহস করল না।

'কাগজের কি নাম হবে?' ফটিক প্রশ্ন করল।

বিনয় ভাদুড়ি বলল. 'সোনার ভারত নাম দে, খুব চলবে।'

স্বল্পভাষী রাধানাথ বললে, 'চলবে মানে কি? আমরা কি বিক্রী করতে যাচ্ছি?'

বিনু বললে, 'না, ওতো ভারতবর্ষের নকল হল। নাম রাখ হিমালয়।'

অলক এতক্ষণ চুপ করেছিল। সে এবার প্রশ্ন করল, 'হোয়াই হিমালয়?'

'সামনে আদর্শটা উঁচু রাখা দরকার। কমলেশবাবু বার বার বলেন। তা হিমালয়ের চেয়ে উঁচু আর কি আছে বল!'

অলকের ওপর এক হাত নিতে পেরেছে বিনুর এমনি একটা ধারণা হল এটা বলতে পেয়ে।

ততক্ষণে স্কুল বসার ঘণ্টা পড়ে গেছে। গিয়ে বারান্দায় প্রেয়ারে জড়ো হতে হবে। তার মধ্যেই প্রশ্ন উঠল, 'সম্পাদক কে হবে? সম্পাদক!'

এতদিনের এত আয়োজন ও আশা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে গোরা বলে উঠল, 'কেন অলক। ও ছাড়া আর কে হবে!'

বিনু কেমন যেন থিতিয়ে গেল আশাভঙ্গের এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে। সে শুধু অনেক কষ্টে বলল, 'হোয়াই? আর কে হবে মানে কি? হবার তো অনেকে আছে। তুইই তো হতে পারিস। আমি তো তাই ভেবে রেখেছি। অলক এমন কি মাতব্বর সম্পাদক একেবারে? কখানা কাগজ চালিয়েছে সে? কেউই তো এ-কাজ করেনি কখনও, সেদিক দিয়ে সবাইতো সমান!'

'তা নয়। ও ফার্স্ট বয়, ক্লাসের মনিটার। তাছাড়া এটা তো সত্যি যে অলক আমাদের চেয়ে লেখাপড়ায় অনেক ভাল। আমাদের কাঁচা লেখা একটু-আধটু শুধরে না নিলে তো কমলেশবাবুকে দেওয়া যাবে না। সে কাজটা অন্তত বানান ঠিক করাটা তো পারবে অলক!'

যুক্তি অকাট্য। অগত্যা চুপ ক'রে যেতে হয়।

এতদিনের এত উৎসাহ আগ্রহের বেলুন একটা প্রস্তাবের পিনেই ফুটো হয়ে চুপসে গেছে, আর কোনও প্রতিবাদেরও যেন উৎসাহ নেই।

প্রেয়ারে যেতে যেতে বাবুল শুধু বলে, 'বেশ, তাহলে ইন্দ্রকে সহকারী সম্পাদক করে দে। ওরই তো কাগজ বলতে গেলে।'

অনেকখানি মুষড়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত কিছুটা সামলে নেয় বিনু।

তার কারণ, গোরার সঙ্গে এই উপলক্ষে একটু ঘনিষ্ঠতা বাড়ে সত্যি সত্যিই—সেদিক দিয়ে ওর অনুমান কিছুটা বাস্তবে পরিণত হয়, পরিকল্পনাটা কাজে লাগে।

অলক সম্বন্ধে গোরার যতই উচ্চ ধারণা থাক, অথবা আছে বলেই—একেবারে কাঁচা লেখা তাকে দেখাতে সাহস করে না, দেখায় বিনুকেই। ওর গল্প বলার

ধরনে, এই ছবি আঁকার সাফল্যে কেমন যেন ধারণা হয় গোরার যে বিনু এসব ভাল বোঝে।

লেখা সত্যিই কাঁচা। কিভাবে কি লেখা উচিত তা অবশ্য বিনুই বা কতটুকু জানে, তবু গোরার অবিরাম সাধু ও চলতি ক্রিয়াপদ মিশিয়ে ফেলা, কমা সেমিকোলন তো দূরের কথা দাঁড়ি সুদ্ধ বাদ দিয়ে একটানা লিখে যাওয়া—এসব দেখে বিনু যেন একটু হতাশ হয়েই পড়ে। লিখতে চেষ্টা করেছে গল্পই—সেও, ঠিক কি গল্প, কাদের গল্প বলতে যাচ্ছে, সেটা বলা হচ্ছে কিনা সে সম্বন্ধেও কোন ধারণা নেই।

বিনু যেন একটু অবাকই হয়। বলে, 'এমন হল কেন তোর? তুই তো 'এসে'তে ভাল নম্বর পাস। এবারের হাফ-ইয়ারলিতেও তো বাহাত্তর পেয়েছিলি বাংলায়!'

বলে ফেলেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নেয়, বলে, 'আসলে তুই একটু ভয় পেয়ে গেছিস, না? ঐ যে শ্যামবাবু যাকে বলেন, নার্ভাস হওয়া—তুইও নার্ভাস হয়ে পড়েছিস।'

দেখে দেয় সে যত্ন করেই। তার সীমিত বিদ্যাবুদ্ধিতে যতটুকু যা বোঝে—সংশোধন ও পরিবর্তন করে। পুরস্কারও পায়, গোরা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, 'তুই ভাই সত্যিই এটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিস। এখন এটা তবু মাস্টার মশাইয়ের কাছে দেওয়া যাবে। আগে যা ছিল—ধ্যেস্!'

তাতে বিনুর আসল উদ্দেশ্যটাও সফল হয়, গোরা একটুখানি কাছে আসে। রণজিৎ ওকে আরও একটা কথা চুপি চুপি বলেছে, 'গোরা ওর ঐসব আবোল-তাবোল লেখা নিয়ে অলককে দেখাতে গিছল, অলক বলেছে, "আমার ভাই এখন সময় হবে না, আমাকে একটা লিখতে বলেছে তাতেই হিমশিম খাচ্ছি। আর আমিই বা কি এমন বুঝি!" তাতেই তোকে ধরেছে এবার।'

গোরার এই সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার ভাবটুকু ওরও কাজে আসে বৈ কি। এতকালের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে, গোরার মনে নিজের এই উঁচু আসনটা যেমন ক'রেই হোক বজায় রাখতে হবে।

বিনু সেই কারণেই—মনে হয় যেন অলকের কাছ থেকে গোরাকে কেড়ে নেবার জন্যেই আরও—প্রাণপণে চেষ্টা করে নিজেও ভাল লেখার।

এর আগে যে লেখেনি তা নয়। কিছু কিছু লিখেছে। গদ্য পদ্য দুই-ই।

স্কুলের ছুটির পর ওকে বাড়ি ফিরতে হয়, তখনও দাদা ফেরে না। মা কাজে ব্যস্ত থাকেন সেই সময়টায়। অখণ্ড অবসর ওর। তখন বাদামী কাগজের রাফখাতা থেকে দু'এক পাতা ছিঁড়ে নিয়ে (হাতে সেলাই খাতা, মাঝখান থেকে চার পৃষ্ঠা বার করে নিলে কেউ বুঝতে পারে না) লেখার চেষ্টা করে। কবিতাই বেশী, কবিতা আর নাটক।

বলা বাহুল্য, বড় হয়ে নিজেই মিলিয়ে দেখেছে—সে সব নাটক সদ্য-পড়া ডি এল রায় আর গিরিশ ঘোষের বই থেকে বেমালুম নেওয়া। কিছু কিছু ওর মৌলিকত্ব থাকত, দেশকালপাত্র সামান্য অদলবদল করতো, ভাষাও যতটা

সম্ভব বদলাবার চেষ্টা করত—কিন্তু মূল নাটকীয়তা ওঁদেরই। ওর যেটুকু সেটুকু নিতান্তই ছেলেমানুষী, একেবারেই কাঁচা লেখা। পরে আস্তে আস্তে মৌলিকত্ব বেড়েছে, ছায়াবলম্বনটাও কমেছে। ছেলেমানুষী অসংলগ্নতাও দূর হয়েছে কিছু কিছু। ক্লাস টেন-এ পড়তে পড়তে যে নাটক লিখেছে তাতে ডি এল রায়ের প্রভাব যথেষ্ট থাকলেও তাকে নিজের লেখা বলে স্বীকার করতে সংকোচ নেই।

তবু কবিতা নাটক সম্বন্ধে ঝাপসা ধারণা কিছু ছিল। কিন্তু যে ছোটগল্প লেখারই চেষ্টা করেনি কখনও, তার পক্ষে একেবারে উপন্যাসে হাত দেবার চেষ্টা দুঃসাহস বললেও কিছুই বলা হয় না। দস্তুর মতো পাগলামি। এখন মনে হয় আনাড়ির দুঃসাহস এটা, ধৃষ্টতাও নয়, স্পর্ধাও নয়। শিশু যেমন নির্ভয়ে আগুনে হাত দিতে চায় এও তেমনি।

তবে একটা ভরসা ওর আছে।

দাদা ও মায়ের কল্যাণে মাসিক পত্র অনেক পড়ে সে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়েই দেখে, পড়ে বিজ্ঞাপন সুদ্ধ। প্রধানত আসে, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী। তাতেই দেখেছে—উপন্যাস মাত্রেই ক্রমশ বেরোয়, মানে একটু একটু করে মাঝে মাঝে।

ভারতীতে আবার নতুন রকম। বারোয়ারী উপন্যাস বেরোচ্ছে একটা, বারোজন লেখক মিলে বই শেষ হবে। এক এক জন বিখ্যাত লেখক এক-একমাসে লিখছেন। কেউ নাকি কারও সঙ্গে পরামর্শ করেন না, গল্প কি হবে তাও আগে থাকতে ঠিক হয়নি। গল্প কোথায় যাবে, শেষ অবধি কি দাঁড়াবে—কেউ জানে না। এ যেন লেখা লেখা খেলা একটা। অপরকে জব্দ করার না হলেও হারিয়ে দেবার চেষ্টা। মা উদগ্রীব হয়ে থাকেন পরের সংখ্যার জন্যে।

এমনি অন্য অন্য পত্রিকাতেও অনেক উপন্যাস বেরোয়—অনুরূপা, নিরুপমা, ইন্দিরা দেবী, শরৎ চাটুয্যে, চারু বাড়ুয্যে, সীতা দেবী, শান্তা দেবী—এঁদের। সবই ক্রমশ বেরোয়, একটু একটু ক'রে মাসে মাসে। আর সেই জন্যেই যেন পাঠকরা বাঁধা থাকেন, পাত্রপাত্রীদের কী হল পরের সংখ্যায় সেটা না পড়া পর্যন্ত স্থির থাকতে পারেন না।

সুতরাং কোন মতে একটুখানি লিখে দিতে পারলেই হল, ক্রমশ টেনে দিয়ে। তারপর আবার কবে পরের সংখ্যা বেরোবে, কোনদিন বেরোবে কিনা তারও তো ঠিক নেই। শেষ কেন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদই হয়ত আর লেখার দরকার হবে না। (পরিচ্ছেদ কথাটা লিখতে হবে মনে করে—প্রথম পরিচ্ছেদ লেখাই নিয়ম। যদিও পরিচ্ছেদ কেন তা বিনু জানে না। দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, দাদা সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিল, 'পরিচ্ছেদ হল 'চ্যাপটার'।' তারপর আর নিজের মূর্খতা প্রকাশ করতে সাহস হয় নি।)

তবু—প্রথমটা তো যা-হোক কিছু লিখতে হবে।

হে ভগবান, কি লিখবে সে? কি করে বড় উপন্যাস ভাবতে হয় তাইতো জানে না।

ভাবতে ভাবতে ভগবানই বুঝি উপায় করে দিলেন।

ওর দাদা তখন খুব ইংরেজী উপন্যাস পড়ছে। যেটা ভাল লাগে—যেমন অলিভার টুইস্ট, লে মিজারেবল, কাউন্ট অফ মণ্টেক্রীস্টো, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স—সেইসব বইয়ের গল্প রাত্রে শুয়ে শুয়ে মাকে আর ভাইকে শোনায়। সংক্ষেপেই বলে গল্প। তবে আসল কথাগুলো কিছুই বাদ দেয় না।

এ অভ্যেসটা বিনুর জীবনে মহা উপকারে লেগেছিল। ক্লাস এইট থেকেই সে যে ইংরেজী বই পড়তে শুরু করেছিল, স্কুলজীবনের মধ্যেই ভাল ভাল কন্টিনেন্টাল নভেল পড়ে শেষ করেছে, রাশি রাশি—তার মূলে এই গল্প বলাই। যে গল্প ভাল লেগেছে, তার পুরোটা পড়ার জন্যে আগ্রহ বা ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। গল্পগুলো জানা বলে পড়ে বুঝতেও তত অসুবিধে হয়নি, হাতড়ে হাতড়ে অর্থবোধের পথ খুঁজে পেয়েছে।

এইভাবে দাদা কদিন আগে একটা ভাল গল্প শুনিয়েছে। কে এক রেনল্ডস্ বলে লেখক ছিলেন বিলেতে, বেশির ভাগই অশ্লীল বই লিখেছেন (অশ্লীল কাকে বলে তা তখন বুঝত না বিনু, তবে বুঝতে বেশী সময় লাগে নি)—তাঁরই একটা বই—কী যেন নাম, পোপ জোয়ান না কি, তারই গল্প। তাতে মাটির নিচের এক বন্ধ ঘরে—একটা ঘরও না, বোধহয় কয়েকটা বড় ঘরেরই কথা আছে—অস্ত্র আর বর্মর বিশাল ভাণ্ডার। বর্ম মানে আমাদের দেশের মতো বুক আর হাত ঢাকা নয়, আগাগোড়াই ঢাকা; এমন কি মুখের ওপরও একটা চাপা দেবার ব্যবস্থা ছিল—দেখলে মনে হত লোহার মানুষ একটা। একটি মেয়ে এই অস্ত্রাগারে ঢুকেছিল—অস্ত্র বলতে তখন তলোয়ার আর বর্শা, এই তো—হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে দেখল একটা সেই বর্মের মানুষ চলছে। মানে বাকী সবগুলো ফাঁকা কিন্তু একটার মধ্যে বা কয়েকটার মধ্যে মানুষ ছিল, বর্ম পরে প্রস্তুত।

তারপর সেই শূন্য ঘরে কে যেন গম্ভীর কণ্ঠে কথা বলে উঠল, কে কথা বলছে দেখাও যায় না। সে এক ভয়াবহ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। মূল গল্পটা কি শোনেনি, সে পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে—কিন্তু এই গা-ছমছমে পরিস্থিতিটা মনে আছে এখনও।

এইটেই প্রথম পরিচ্ছেদ হিসেবে চালিয়ে দিল সে। তবে ওর নায়িকা নয়, নায়ক—ফরাসীদেশের নয়, পনেরো-ষোল বছরের স্কুলের ছাত্র। বাঙ্গালীর ছেলে। অস্ত্রাগারটাও বাংলাদেশের মধ্যেই কোথাও। যদিও কলকাতার এক বিশেষ অঞ্চলের এক বিশেষ গলির একখানা তিনদিক চাপা বাড়ি ছাড়া বাংলাদেশ সম্বন্ধে তখনও কোন অভিজ্ঞতাই নেই। তবে পাড়াগাঁয়ের এত বর্ণনা পড়েছে বিভিন্ন বইতে, পড়ছেও প্রত্যহই—একটা কাল্পনিক গ্রামের ছবি আঁকতে আর অসুবিধে কি?

সেদিনের সেই চিত্রাঙ্কন পর্বের পর ওর সম্বন্ধে ঔৎসুক্য সকলেরই—লেখাটা এনে গোরার হাতে প্রথম দিলেও সবাই ঝুঁকে পড়ল। পণ্ডা বলল, 'এ তো বেশ আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছ বাবা, কে লিখে দিয়েছে বলো দিকিনি!'

সত্য বললে, 'কে আবার। দাদাই তো রয়েছে। ওর দাদা বাংলায় খুব

ভাল, শ্নেছি ম্যাডমিশনে বাংলা পেপারে একশোর মধ্যে উননব্বই পেয়েছিল। সেই লিখে দিয়েছে।'

কান মাথা গরম হয়ে উঠল বিনুর—এই অন্যায় ও মিথ্যা অভিযোগে। তবে সে জানে, প্রমাণহীন প্রতিবাদে আরও লাঞ্ছিত হতে হবে। মিছিমিছি নিজের শক্তিক্ষয় শুধু। সে অন্য পথ ধরল, বলল, 'বেশ তো, বাংলায় ভাল ছেলের তো অভাব নেই। তোর পাশের বাড়িতেই তো রামময়দা থাকেন। বাংলা 'এসে' কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়ে প্রাইজ পেয়েছেন। তুইও ওঁকে দিয়ে একটা লিখিয়ে আন না। আর কিছু না হোক কাগজখানা তো ভাল দাঁড়ায় তাতে। ওরা যেসব লেখা দিচ্ছে তার সবই যে ওদের লেখা তারই বা এমন কি প্রমাণ আছে?'

ওর এই উত্তাপহীন সহজ অথচ গম্ভীর বলার ধরনে সকলে কেমন যেন একটু দমে গেল। আর বেশী কিছু খোঁচা দিতে সাহস করল না।

কমলেশবাবুর কাছে সব লেখাই দেওয়া হচ্ছিল। তিনি প্রথমটায় এ দায়িত্ব নিতে রাজী হননি। বলেছিলেন 'আমাকে কেন দিচ্ছ, বাংলার মাস্টারমশাই রয়েছেন তোমাদের—তারাপদবাবু, তাঁকেই দাও না।'

বিনুই সাহস করে বলেছিল, 'না, আপনিই একটু দেখে দিন দয়া করে। বলা উচিত নয়—সাহিত্য-টাহিত্য তারাপদবাবু বিশেষ পড়েননি। বঙ্কিমবাবু ছাড়া আর কোন লেখকের নাম জানেন না, রবি ঠাকুরকেই তুচ্ছ-নাচ্ছ করেন।'

কমলেশবাবু ভুরু কুঁচকে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, 'তুমি জানো? নাটক নভেল খুব পড়ো বুঝি? আচ্ছা, এখনকার দু'চারজন বড় বড় লেখকের নাম বলো দিকি—'

শুধু লেখকই নন: কোন কোন লেখকের কি কি বই, কোনোটা সে পড়েছে, কোনোটার নাম শুনেছে—তাও যখন বলতে শুরু করল, তখন বললেন, 'ও, তোমার দাদাকে প্রায়ই দেখি বটে চটপটির লাইব্রেরী থেকে বই বদলাতে—আমি ভুলেই গিছলুম কথাটা। তার মানে তোমাদের বাড়িতে চর্চা আছে। আর তুমিও যা পাও তাই পড়ো।'

তারপর ওর লেখাটায় একটু চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এ তোমার নিজের—অরিজিনাল লেখা? মানে সবটা নিজে ভেবে লিখেছ?'

একবার লোভ হয়েছিল বৈকি, কৃতিত্বটা নেবার। কিন্তু একটু চুপ ক'রে থেকে সত্যি কথাই বলল। দাদা গল্পটা বলেছেন, কোন বই, কতটুকু শুনেছে তাও বলল। সেটাই মাথার মধ্যে ছিল, শুধু স্থান আর পাত্র বদল করেছে।

'ভেরি গুড। তুমি সত্যি কথা বলেছ, এতে আরও খুশী হয়েছি। তবু বলব, তোমার ক্রেডিট আছে। ভাষায় অনেক গোলমাল আছে, কনস্ট্রাকশন ঠিক হয়নি—এসব অবশ্য এই বয়সের লেখায় তো থাকবেই। কিন্তু রূপান্তর যেটা করেছ তাতে বেশ বাহাদুরী আছে।...হ্যাঁ, এদিকে তোমার ন্যাক আছে শুনেছি। অশ্বিনীবাবুর ক্লাসে মাইনে নেবার দিন বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলো।'

ভরসা পেয়ে বিনু বলে, 'তাও, বেশির ভাগ রহস্যলহরী বইগুলোরই গল্প, তবে আমি কিছু কিছু তার মধ্যে বানিয়ে নিই বলার সময়—বলতে বলতেই।'

'তাতে দোষ নেই। একেবারেই কেউ লেখক হয় না। সে আশা করাই

আহাম্মুকি। তা শুনলুম, অলক বলছিল তুমি একটা আর্টিকল মানে প্রবন্ধও লিখবে এই কথা দিয়েছ ?'

ঘাড় হেঁট করে বিনু বলে, 'ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছিলুম। কি জানি পারব কি না! কিভাবে লিখতে হয়, তাও তো জানি না।'

'যা হোক একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করো। সেটা সম্বন্ধে কি ভেবেছ, ভাল মন্দ—সেইগুলোই লেখো। তোমার কাছে কেউ এমার্সন বা স্মাইলস-এর 'এসে' আশা করবে না এমন কি য়্যাডমিশন পরীক্ষার খাতার 'এসে'ও না। তবে একটা কথা, এটা তুমি নিজে যা ভেবেছ সেই ভাবেই লেখার চেষ্টা করো—তাতে যেমনই দাঁড়ায় দাঁড়াবে।'

এ আরও যেন বোঝা চাপল ওর মাথায়।

কমলেশবাবুর স্নেহ আর আস্থার যোগ্য হতেই হবে তাকে।

কিন্তু কিভাবে কি ভাববে, আর সেটা কিভাবে গুছিয়ে প্রকাশ করবে—কিছুতেই যেন মাথায় আসে না।

ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে দেখার চেষ্টা করে. ভাবার মতো কিছু মাথায় আসে কিনা। বারান্দায় দাঁড়ালেই চোখে পড়ে অন্নপূর্ণার হাতীশালার দিকে। হাতীটাকে বটগাছের বা অন্য কোন গাছের বড় ডাল এনে মাহুত খেতে দেয় কিম্বা খাচিয়া ভর্তি দুর্বা ঘাস। হাতীটা শুঁড় বাড়িয়ে মাহুতকে আদর করে। হাতী নিয়েই লিখবে নাকি ? না, না, সে একেবারেই মার্কামারা ইস্কুলের 'এসে' হয়ে যাবে। ওদের ক্লাসেই এই প্রথম ইংরিজী 'এসে' লিখতে দিচ্ছেন অশ্বিনীবাবু, ডগ, কাউ—এইসব। মনে হবে এর বেশী ওরা জানে না। মাসিক পত্রিকা যখন বলা হচ্ছে—তখন সেইভাবেই লিখতে হবে।

'কাশীর গৌরব' নিয়ে একটা লিখলে কি হয় ?

পরক্ষণেই মনে পড়ে—ক্লাস এইটের যে পত্রিকা তার গত সংখ্যাতেই তারাপদবাবু স্বয়ং লিখেছেন—'বারাণসীর প্রাচীনত্ব'। এখন আবার কাশী নিয়ে লিখলে মনে হবে ও'রই নকল করেছে। গঙ্গার ঘাটগুলোর শোভা নিয়ে অবশ্য লেখা যায়—কিন্তু কোন ঘাট কবে হয়েছে, কোনটা কোন রাজা কোন বছর করে দিয়েছেন—সবই তো প্রায় রাজা মহারাজাদের করা—রাণামহল, রাজাঘাট, দারভাঙ্গা ঘাট, সিন্ধিয়াঘাট, অহল্যাবাঈ ঘাট—সবই তো – কিছুই তো জানে না ও। প্রবন্ধ লিখতে গেলে এগুলো বোধহয় জানা দরকার।

আচ্ছা, নরোত্তম গোয়ালাকে নিয়ে লিখলে কেমন হয় ?

লেখার মতো মানুষটা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। গাঁজায় ভোম হয়ে থাকে—রাগলে জ্ঞান থাকে না, দুটো বৌকে সমানে এলোপাতাড়ি ঠেঙ্গায় কিন্তু কারবারে ষোল আনা সাচ্চা। দুধে জল দেয় না, কোন খদ্দের যেতে দেরি হলে বলে দেয়, 'যা আছে কিন্তু ঘাঁটা দুধ, সবরকম মিশানো কালকের বাসি দুধও আছে। নেবে কিনা ভেবে দ্যাখো।'

প্রথমটা খুবই উৎসাহ বোধ করে, আবার মনে হয়—লেখার মতো ঠিকই। কিন্তু এও তো সেই গল্পই হয়ে যাবে। গল্প বা জীবনী যা বলো। একে

প্রবন্ধ বলা যাবে কি ?

আকাশ পাতাল ভাবছে, হঠাৎ ওকে বাঁচিয়ে দিলেন কমলা দিদিমা।

এমন সময় তিনি আসেন না কখনও। নানা ধরনের ব্যস্ততা থাকে তাঁর। তখন সন্ধ্যে হয় হয়—মা ঘরদোর মুছে কাপড় কেচে এসে সন্ধ্যে দিচ্ছেন—সেই সময় সেটা। মা বলতেন, 'ব্রাহ্মমুহূর্ত।' শুধু ভোর বেলাই নয়, এই ঠিক গোধূলি বেলাকেও ব্রাহ্মমুহূর্ত ধরে। ব্রহ্ম বা ভগবানকে ডাকবার সময় এটা। অথচ সে সময় খেতে চাইলে বলেন, 'ওমা, এ-সময় খাবি কি। ভরা রাক্ষসী বেলা।' হ্যাঁ এ নিয়েও একটা ছোটখাটো প্রবন্ধ লেখা যায়। ওদের ঠিক উলটো দিকে, বাগানের উত্তর ভাগের ফ্ল্যাটে থাকে মার এক চারুবালা বৌমা, সে আবার বলে 'ঝুঁঝকি বেলা'।

কমলা দিদিমা যখন এলেন তার একটু আগেই একতলার বুড়িদের মহলে কোণের দিক থেকে একটা কান্নার শব্দ শোনা গেল। প্রথমটা বেশ মড়া কান্নার মতোই চেঁচিয়ে উঠল কে, তারপর আর অতটা নয়, তা হলেও বেশ চলল, অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলে যেমন একটু সুর ক'রে কাঁদে মেয়েরা—তেমনিই।

মা ছুটে গিয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন খানিকক্ষণ। কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়ানো সম্ভব নয়—সে সময়টা—কলের জল চলে যাবার তাড়া আছে। বাসন মাজা, ঘর মোছা সারা হয়েছে—তবু কাজও ঢের বাকী। কাপড় কাচা, খাবার জল তোলা, পরের দিন সকালের জন্যে রান্নার জল ভরে রেখে আসা তেতলার রান্নাঘরে—ওঁর ভাষায় অসুম্বর কাজ।

দাঁড়াতে পারেন নি কিন্তু চিন্তাটা থেকেই গিছল। যেদিক থেকে কান্নাটা আসছে—সেখানে রাঙ্গাদিদিমা আর গোসাঁই গিন্নির ঘর পাশাপাশি। এ দুজনের সঙ্গেই মার ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক, একমাত্র এঁদের ঘরেই মা কদাচিৎ হলেও মধ্যে মধ্যে যান, ওঁরাও আসেন। গোসাঁই গিন্নির বাতের জন্যে সিঁড়ি ভাঙ্গতে কষ্ট হয়—মধ্যে মধ্যে বিনুদের জানালার নিচে বাগানে এসে দাঁড়িয়ে হেঁকে হেঁকে কথা বলেন। মহামায়ার পক্ষে কান্নাটা উদ্বেগজনক। যারই শোকের কারণ ঘটুক, সন্ধ্যে দেওয়া হলে একবার যাওয়া উচিত। গেলে ফিরে এসে এ কাপড় ছাড়তে হবে। কেন না রাস্তায় বেরিয়ে পাশের দোর দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি ভেঙ্গে বাগানে উঠলে তবে ওঁদের ঘর। রাস্তায় দুবেলা ঝাড়ু পড়ে—ওদিকের বড় 'সরকারী' চলনে আবর্জনার শেষ নেই। অন্ধকারে কত কি মাড়াবেন হয়ত—মাসে একদিন চামারনী ঝাড়ু দেয়। একমাস ধরে এতগুলো ভাড়াটের আনাগোনা এবং রাস্তার ধারের টিকেওলাদের ছেলেগুলোর খেলার ফলে যত রকমের সম্ভব নোংরা জিনিস জমে। সেসব মাড়িয়ে এসে ঘরে ঢোকা বা রান্না খাওয়ার জল ছোঁওয়া সম্ভব নয়।

কি করবেন ভাবতে ভাবতেই কমলা দিদিমা এসে পড়লেন। উনি যখনই আসেন ঝড়ের বেগে, সত্যিই দুনিয়াসুদ্ধ লোকের বেগার ঠেলে। পরিধিটা শিবালা থেকে ত্রিপুরা ভৈরবী, এদিকে কামেছা পর্যন্ত (দুনিয়া ছাড়া কি বলবে ?), তবে সামান্য সামান্য যা প্রণামী, উপহার কি সিধে পাওয়া যায়—তাতেই সংসার চালাতে হয় তাঁকে। নিজেই বলেন, 'আমার মা সত্যি সত্যিই যোগে-

যাগে সংসার চালানো। বেরতো-পাব্বনে, কার সাবিত্তির বেরতো, কার একাদশীর বেরতো, এই খুঁজে বেড়ানো। এমনি হলে আলতা সিঁদুর সিধে, সিধে তাও আমাকে বলেই দেয় ইচ্ছে করে, অবস্থা জানে বলে, উজ্জাপনে ধরো ওর সঙ্গে শাড়ি গামছা, কদাচ কখনও—দেবে ভবিষ্যতে সোনার কুঁচিও মেলে। আর আছে যজ্ঞির রান্না ঠেলা, আগের দিন থেকে গিয়ে গতর পাত করলে তবে কিছু খাবার আর বাড়তি ময়দা, আনাজপাতি—প্রাণে ধরে ঘি দেয় না পেরায় কেউই—বড় জোর তার সঙ্গে একটা ভারী সিধে দেবে, দুটো একটা টাকা পেন্নামী হিসেবে। যোগযাগ ছাড়া কি!'

এছাড়াও আছে, মহামায়া জানেন। সন্ধ্যেবেলা কোন ডাক্তারের একশো বছরের ঠাকুমাকে তেল মালিশ ক'রে দিয়ে আসেন। কার জ্বর হয়েছে রান্নার লোক নেই ছেলেরা খেতে পাচ্ছে না—তাদের বাড়ি সকালে একটু ডালভাত, সাবু বার্লি, বিকালে কখানা রুটি গড়ে দিয়ে এলেন হয়ত—সে ভাল হয়ে একখানা গুণচটের মতো মোটা শাড়ি দিলে। সেটা বেচলে—ঘরোয়া খদ্দের বারো-তেরো আনার বেশি দিতে চায় না। মানে খাটুনির তুলনায় মজুরি খুবই কম। তবু, উপায়ই বা কি। এর চেয়ে সোজাসুজি কারো বাড়ি রাঁধুনির কাজ করলে দুবেলা খাওয়া আর অন্তত পাঁচটা টাকা মাইনে জুটত। তবে তাতে ইজ্জৎ থাকে না। উঁচু নিচু কথা শুনতে হয় মনিবের! এ বয়সে সেটা পারবেন না।

কমলা দিদিমা এসে বললেন, 'জানি মেয়ে আবার ভাববে, তাই ছুটতে ছুটতে খবরটা দিতে এলুম। আমি ভেতরের পথ দিয়ে আসব। তোমাকে খবর দিতে গেলে রাস্তায় পড়ে সদর দে ঢুকতে হবে—ফিরে এসে নাইতে হবে হয়ত।'

'হ্যাঁ মা, খুবই ভাবছিলুম। মনে হল যেন গোঁসাই মার ওদিক থেকেই আসছে। কার কি হল—'

'ওরে মা, কারুর কিচ্ছু হয়নি। তোর রাঙ্গা মাসীর ননদ ঐ তারাবুড়ি, ওর বুঝি কি পুঁজিপাটা ওর ভাশুরপোর কাছে রাখা ছিল, সে তার সুদ হিসেবে মাসে তিনটে ক'রে টাকা পাঠাত। সব জুড়িয়ে ওদের আঠারো টাকা আসে তো—তার মধ্যে থেকে তিনটে টাকা খেলে এমন কিছু ক্ষেতি হবে না যে বিশ্বনাথের গলিতে আঁচল পেতে বসে ভিক্ষে করতে হবে। তা আজ বিকেলের ডাকে চিঠি এসেছে সে ভাশুরপো সন্ন্যেস রোগে হঠাৎ মারা গেছে। তাই বুড়ির কান্না—ছেলের মতো কেন, ছেলের বাড়া ছিল, সেই ভাশুরপো চলে গেল। গেছে অবিশ্যি সে ষাট বছরে, উনি এখনও বসে কুঁড়েপাতর গিলছেন—তা শোক তার জন্যে নয়—ভাবনা হল ঐ টাকাটা যদি না আসে! বৌ যদি উড়িয়ে দেয়! সে বেওয়াটা কোথায় দাঁড়াবে সে চিন্তে নেই, নিজের বুঝি চারশো খানিক টাকা ছিল, সেইজন্যে পাগল হয়ে গেল একেবারে। ভাজ যত বোঝায় যে 'আমি যতক্ষণ আছি, তোমার এত ভাবনা কি, আমার একমুঠো জুটলে তোমারও জুটবে। তোমায় কি না দিয়ে খাবো? তাছাড়া এখনও তোমার গলায় সাত ভরির হার আছে, তোরঙ্গে দুশো-আড়াইশো টাকা। ঐ ভেঙ্গেই চালাও না, বিরিশি বছর বয়স হল, আর কতকালই বা বাঁচবে!' তত বুড়ির তিন টাকার

শোক উথলে উঠছে। বলে, 'কতকাল বাঁচব তার কি কিছু ঠিক আছে, তুই যদি অদ্দিন না বাঁচিস? গলায় হার আছে তেমনি ব্যামোও তো হতে পারে কঠিন কিছু! তাছাড়া ছেরাদ্দ। তার খরচা তো রেখে যেতে হবে!' বোঝো কথা। উনি একশো বছর বাঁচবেন তদ্দিন পঞ্জস্ত ভাশুরপোকে বেঁচে থাকতে হবে ঐ তিনটি ক'রে টাকা দেবার জন্যে!'

কমলা দিদিমা যেমন ঝড়ের মতো এসেছিলেন তেমনিই চলে গেলেন। কথা শেষ করেই। মহামায়াও মুখের ও হাতের একটা বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে গিয়ে জপে বসলেন। বিনু ভাবতে লাগল তারাবুড়ির কথা। তারাবুড়ি কেন, গঙ্গার ঘাটে, বাজারে এমনি কত বুড়িই তো দেখে। কারও আসে মাসে তিন টাকা কারও চার-পাঁচ। বিনা ভাড়া কি মাসিক চার আনা আট আনা ভাড়ায় বাঙালীটোলার বাড়ির নিচের তলায় অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে অব্যবহার্য ঘরে ভাড়া থাকে, কোনমতে জীবনধারণ করে। এত সস্তার আম বা অন্য ফল, তাও ভরসা করে খেতে পারে না। কেউ কোথাও নেই—অসুখ-বিসুখ হলে দেখার কেউ নেই। কারও হয়ত দূর-সম্পর্কের কেউ দয়া ক'রে ঐ তিন বা চার টাকা পাঠায়। কারও বা জামাই আছে, সে পাঁচ কি ছ'টাকা দেয়। মরতেই এসেছে এখানে, মৃত্যুরই প্রতীক্ষা। তবু মরার কথা কেউ ভাবতেও পারে না। বাঁচার জন্যে কি ব্যাকুলতা।

দেশে বা অন্য কোথাও ওদের বংশের কোন লোক কি নিকট আত্মীয় কেউ মরছে বা মরেছে কি অসুস্থ—তাদের জন্যে তত চিন্তা নেই, শোক নেই (শোক থাকলেও এই মৃত্যুতে নিজের অসুবিধার কথা ভেবেই যা শোক)—চিন্তা নিজেদের এই নিভে যাওয়া, অভাবের দারিদ্র্যের নিত্য নানা রোগভোগের এই জীবন কেমন করে বাঁচিয়ে রাখবে তার জন্যেই। ওরা যে মরেই আছে, সে-কথা মনে হয় না ওদের একবারও।

এ কী জীবন! এ কি বেঁচে থাকা?

হঠাৎ মনে পড়ে—শ্যামবাবু ওদের ক্লাসে একদিন গল্প করেছিলেন মিশরের মমিদের কথা। কেউ মারা গেলে, অবশ্য যাদের খরচ করার সঙ্গতি থাকত, মৃতদেহের ভেতরের নাড়ি-ভুঁড়ি পেট অন্ত্র এইসব অংশ—যা পচতে পারে—সেগুলো বার করে নিয়ে শুধু হাড় আর ওপরের চামড়া অবিকৃত রেখে নতুন পাতলা কাপড়ে ফের মুড়ে খোলাই রেখে দিত, একটা বাক্সে করে। বিশেষ-ভাবে মুখটা থাকত অবিকৃত, মানুষ বলে চেনার কোন অসুবিধা হত না। ওদের বিশ্বাস ছিল আবার একদিন জেগে বেঁচে উঠবে ওরা—সেই নবজন্মের অপেক্ষায় থাকত। এখনও আছে।

শ্যামবাবু আরও বলেছিলেন। একেবারে প্রথম যুগে নাকি ক্রিশ্চানদের মধ্যে বিশেষ রাজা কি জমিদারদের মধ্যে মাটিতে পুঁতে সমাধি দেওয়ার রীতি ছিল না। ভাল পোশাক পরিয়ে খোলা খাটে বা কফিনের মতো কাঠের খোলা বাক্সে শুইয়ে, ভাল সাটিন কি রেশম পশমের চাদর ঢাকা দিয়ে মুখ খুলে রেখে বুকে একটা বাইবেল দিয়ে—সেই পরিবারের যে সমাধি গৃহ থাকত—সাধারণত মাটির নিচেই এই সমাধি ভবন তৈরি হত, বিশাল দুই বা তিন কামরার—সেখানে ওপর

নিচে থাক থাক রেলের বাংক-এর মতো করা থাকত, দুই কি তিন থাক, যাতে অনেক মৃতদেহ রাখা যায়—সেইখানেই রেখে আসা হত। কী যেন সেই সাজানো খাটকে বলত—ক্যাটাফাল্‌ক্‌ না ক্যাটাকম্ব এমনি কি একটা নাম।

নাকি ক্যাটাকম্ব বোধহয় অন্য জিনিস, রোমের প্রথম ক্রিশ্চানরা সম্রাট বা রোমান রাজপুরুষদের ভয়ে মাটির নিচে সুড়ঙ্গ ক'রে বাস করত। তার গলি পথগুলো ছিল গোলক ধাঁধার মতো, যাতে কেউ সন্ধান পেলেও হঠাৎ না ধরতে পারে। এর মধ্যেই সমাধিও হত। সেও নাকি লম্বা বাক্স করে রেখে দেওয়া হত—পরে সুদিন এলে ভালভাবে সমাধি দেওয়া হবে বলে।

এই ধরনের মড়া বা মমির সঙ্গেই বুঝি এদের তুলনা হয়। মরেই গেছে, কবে সেকথা এরা জানেও না, বোঝেও না।

কথাটা মাথায় আসার পরই কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেল বিনু।

হ্যারিকেনের আলোয় উপুড় হয়ে পড়ে লেখা। মা প্রশ্ন করলেন, 'কি লিখছিস রে?'

বিনু সগর্বে উত্তর দিল, 'ম্যাগাজিনের লেখা।'

দাদা ফিরল রাত নটায়, তার মধ্যেই ওর লেখা হয়ে গিছল।

কমলেশবাবু কিন্তু দমিয়ে দিলেন পরের দিন।

লেখাটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'আইডিয়াটা মন্দ নয়। তবে পয়েণ্টগুলো গুলিয়ে ফেলেছ। উপমার সঙ্গে মেলাতে পারোনি। খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলে, না? কথাটা মাথায় আসামাত্র লিখতে বসেছ। চিন্তাটা পরিষ্কার ক'রে প্রকাশ করাটাই তো লেখার আসল উদ্দেশ্য। সেভাবে লিখতে গেলে আগে ভাল করে ভেবে যুক্তিগুলো মনের মধ্যে গুছিয়ে নিতে হয়। বড্ড গোলমাল করে ফেলেছ। হাউ এভার, আমি যতটা পারি ঠিক করে দিচ্ছি।'

॥ ১৯ ॥

'হিমালয়' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা আর কোন কালে বেরোবে না—এই আশংকা (বা আশ্বাস) ছিল বিনুর। কিন্তু প্রথম সংখ্যাও বেঁধে বেরনো চোখে দেখতে পেল না সে।

কিছুটা তৈরি হয়েছিল, শেষ হয়নি বলেই বাঁধানো যায়নি।

বার্ষিক পরীক্ষার সময় আসন্ন, পড়ার চাপ পড়ল সকলকার ওপরই। গোরার বাবা ছেলেকে অন্যদিকে যতই আদর দিন, পড়াশুনোর ব্যাপারে ছিলেন খুব কড়া আর সদা সচেতন।

তার মানে ওদের ছাপাখানাই বিকল হল। গোরারই পরিষ্কার করে সব লেখাগুলো 'কপি' করার কথা। অলকেরও হাতের লেখা ভাল তবে সে আগেই 'না' বলে দিয়েছে। তাছাড়াও অসুবিধা ছিল। সবাই দু আনা ক'রে চাঁদা দিয়ে রং, তুলি চিনে-কালির ব্যবস্থা করবে কথা হয়েছিল—কার্যকালে বিশেষ কেউই যে চাঁদা দিল না। কমলেশবাবু বলেছিলেন আলাদা খোলা কাগজে লিখে ছবি

বর্ডার যা দেবার শেষ ক'রে দিলে তিনি হেড মাস্টারমশাইকে বলে বাঁধিয়ে দেওয়াবেন। লেখা রেখার কাজই শেষ হ'ল না—বাঁধানো হবে কি? বিনুর প্রবন্ধটাও কমলেশবাবুর হাতে কি দাঁড়ালো তাও দেখতে পেল না সে। গোরার কাছেই রয়ে গেল।

তখনকার মতো কথা রইল বার্ষিক পরীক্ষার পর প্রায় দুমাস গরমের ছুটি পড়বে, পড়াশুনোর বালাইও থাকবে না—তখন এটা শেষ করা যাবে। ক্লাশ সিক্স-এর পত্রিকা না হয় ক্লাস সেভেন থেকে বেরোবে। কিন্তু গরমের ছুটি পড়তে আর কারও পাত্তা পাওয়া গেল না। পরীক্ষা শেষ হতেই গোরার বাবা ওকে নিয়ে দেশের বাড়ি চলে গেলেন—গোবরডাঙ্গা না কোথায়। তাঁদের ফেরার ওরদিনই বিনুকে চলে আসতে হল কাশী ছেড়ে।

হঠাৎ ওদের জীবনে একটা মস্ত বড় ওলট পালট হয়ে গেল।

অবশ্য কলকাতায় ফেরার কথা যে একেবারে ওঠেনি আগে তা নয়। দাদার এই পরীক্ষা শেষ হলেই তো চলে যাবার কথা—তারাপ্রসাদ যা বলে গিছলেন। তবে আগে স্থির ছিল সে একাই কলকাতা যাবে তখনকার মতো, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

মহামায়া সে কথাটার ওপর খুব যে একটা জোর দিয়েছিলেন তা নয়—তবু কোথায় একটা স্বপ্ন ছিল বৈকি, তাঁর ছেলে বিলেত-ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার হয়ে আসবে। কিন্তু সে স্বপ্ন একেবারেই মরীচিকার মতো শূন্য মরুতে মিলিয়ে গেল। এই পরীক্ষার আগেই বামুনদির চিঠিতে খবর এল, তারাপ্রসাদ দেউলে খাতায় নাম লিখিয়েছে। জমি কেনা বেচাতেই মধ্যে এই দুটো বছর টাকার মুখ দেখেছিল—বড়মানষি কাপ্তেনী যা করার ক'রে নিয়েছে—তাইতেই আবার সর্বস্বান্ত হল। চড়া সুদে টাকা ধার করে কলকাতার দক্ষিণে কোথাও অনেকখানি জমি কিনেছিল, তখনও জমির দর চড়ার মুখে বলে সুদের হার শুনে পেছয়নি কিন্তু সম্ভবত ওরই কপালে হঠাৎ দর পড়তে লাগল। আবার উঠবে এই ভেবে আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে গিয়ে আরও ক্ষতি হল। মহাজন বেগতিক দেখে নালিশ করল। শেষ রক্ষা করতে না পেরেই এ্যাটর্নীর পরামর্শে দেউলে হয়ে নিশ্চিন্ত হল। এখন কি টুকটাক কাজ করে অর্ডার সাপ্লাইয়ের, তাতে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার চালানোই নাকি দায় হয়ে উঠেছে।

তবে—মুখে দাপট এখনও খুব। বামুনদির সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল, তাঁকে বলেছে, 'খোকাকে বলো, আমি যা বলেছি তা হবে, হয়ত দু-এক বছর পিছিয়ে গেল, তবে এয়সা দিন নেহি রহেগা। এ শর্মাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আবার উঠব, তখন ওর ব্যবস্থাই করব আগে। অত ভাল ছেলেটা —কেরিয়ারটা না নষ্ট হয়।'

আবার উঠেছিল ঠিকই, তবে পড়েছে তার চেয়ে বেশী। তাই রাজেনের কেরিয়ার আর ভাল করা হয়ে ওঠেনি কোনদিনই। লোকটির একটু জুয়াড়ি মনোভাব ছিল, হঠাৎ অনেক টাকা লাভ হয়—আবার লোকসান হলে সর্বস্ব ডোবে এমন কারবার ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি কখনও।

জার্মানী আমেরিকার স্বপ্ন দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেলেও কাশীতে আর পড়তে

রাজী হল না রাজেন। এবারেও প্রথম হয়েছে এই খবর পাওয়া মাত্র জিদ ধরল কলকাতায় গিয়ে সে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বে।

মার মুখ শুকিয়ে গেল। অনেক কারণেই। আপাত বড় কারণ যেটা সেটাই বললেন, 'ওমা, এত খরচ আমি কোথা থেকে টানব? এখানেই চালাতে পারছি না। কলকাতায় গেলে যত ছোট বাড়িই হোক তিরিশ টাকার কম কি ভাড়া হবে।'

'কলকাতায় না হয়—আশপাশ শহরতলীতে কোথাও থাকব, যেখান থেকে কলকাতায় যাওয়া আসা করা চলবে। সেসব জায়গায় বারো পনেরো টাকায় একটা বাড়ি পেয়ে যাবো নিশ্চয়ই। তাছাড়া ওখানে শুনেছি অনেক টিউশানী পাওয়া যায়—আমার পড়ার খরচ চালাবার মতো আমি রোজগার করে নিতে পারব। তাছাড়া বিনুটারও এখানে পড়াশুনো কিছু হচ্ছে না, একটা ভাল ইস্কুলে পড়ানো দরকার।'

'ওখানে গেলে এ জলপানির টাকা পাবি?'

'না। তা কখনও দেয়। কিন্তু এই জলপানির পনেরোটা টাকার জন্যে আখেরটা নষ্ট করব? প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরোলে ভাল চাকরির ভাবনা থাকে না শুনছি, আমাদের প্রোফেসাররাও তাই বলেন।'

তবু মা ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু যেন রাজেনের ভাগ্যেই, বামুনদির একটা চিঠি এল। তিনি লিখছেন, 'আমার শরীর একেবারেই ভাল যাইতেছে না, ক্রমশ বরং যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আমি আর কোনমতেই বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া রান্নার কাজ করিয়া আসিতে পারিতেছি না। ক্রমাগত মাথা ঘোরে, রাস্তায় টাউরি খাইয়া পড়িয়া যাই। এখনও মরা ঘোড়াকে চাবুক মারিয়া চালাইতেছি, ঘোড়া হয়ত একদিন একেবারেই জবাব দিবে, পথেই কোনদিন মরিয়া পড়িয়া থাকিব। তোমরা আসিয়া তোমাদের জিনিসপত্র বুঝিয়া লইয়া আমাকে অব্যাহতি দাও। তোমরা যদি আমাকে টানিতে না পারো, তাহা হইলে এ বন্ধন হইতে মুক্তি পাইলে কোথাও রাতদিনের কাজ লইতে পারি। একজায়গায় বসিয়া কাজ হয়ত আরও কিছুদিন চালাইতে পারিব। আর যদি মাসে চার-পাঁচ টাকাও পেনসন হিসাবে দাও—বাবা বিশ্বনাথের চরণতলে গিয়া আশ্রয় লই।'

অগত্যা মন স্থির করতে হল। কাশী আসার সময় মনে হয়েছিল, কোন অকূলে বুঝি ভাসলেন; এখন বুঝলেন মহামায়া—এইবার সত্যিসত্যিই অকূলের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন, কি খাবেন তার কিছুই স্থির নেই, সমস্ত ভবিষ্যৎটাই অনিশ্চিত, অন্ধকার।

এসেছিলেন চারজন, একজনকে এখানে রেখে যেতে হল। এদের দুজনকে রেখে—মানুষ হয়েছে দেখে কি যেতে পারবেন? এক এক সময় হতাশায় মন ভেঙ্গে পড়ে, কোথাও যেন কোন আলো দেখতে পান না। আবার সুদিন আসবে কোন দিন—অবিশ্বাস্য মনে হয়। মেয়ের পাশে ঐ মণিকর্ণিকায় শুতে পারলে অন্তত অহরহ এই দুশ্চিন্তা ও নৈরাশ্য থেকে মুক্তি পেতেন। তাও তো হল না।

একেবারে রওনা হবার আগের দিন সরস্বতীর সঙ্গে আর একবার দেখা হয়ে গেল।

মা শেষবারের মতো—অন্তত এ যাত্রার—দর্শনে বেরিয়েছিলেন। তখন বেলা বারোটা হবে, রান্নার কাজ সেরেই তিনি বেরোন বরাবর, ঝাঁ ঝাঁ করছে শেষ বৈশাখের রোদ—পথে বিশেষ কেউ হাঁটে না এ সময়, দোকানীরাও অনেকে সামনের মালপত্রের ওপর চট চাপা দিয়ে ঝিমুচ্ছে। এসময় দূর থেকেও কাউকে আসতে দেখলে চেনার অসুবিধে নেই।

মহামায়া বিশ্বনাথের গলি থেকে বেরোচ্ছেন সরস্বতী ঢুকছে। ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছে। যেন, ওঁর দিকে চোখ থাকলেও তাতে দৃষ্টি ছিল না, প্রথমটা সে চিনতেই পারেনি।

ওকে দেখামাত্র মনে হল মহামায়ার—এই তিন-চার মাসে মেয়েটা যেন অনেকখানি শুকিয়ে গেছে। মুখ শুকনো, চোখে যেটুকু উজ্জ্বলতা সেদিন দেখেছিলেন, সেটুকুও আর নেই।

'কি রে, অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?' মহামায়া উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'শরীর খারাপ? নাকি—'

সরস্বতী হাসল একটু ক্লিষ্ট হাসি। বলল, 'ঐ নাকিটাই ঠিক বামুনমাসী, যা বুঝেছ তাই। তবে এমনি ছেড়ে যায়নি। ওর হঠাৎ মাথায় শির ছিঁড়ে নাক মুখ দিয়ে রক্ত—একটা দিক পড়ে গেল একেবারে। আমরা বড় বড় ডাক্তার ডেকেছিলুম তক্ষুনি, চিকিচ্ছের কোন কসুর হয়নি—হয়ত সেইজন্যেই প্রাণটা এ যাত্রার মতো রক্ষে পেয়েছে—আপাতক। অমর ডাক্তার এসেছেল, বললে, 'এ রোগে মানুষ বড় একটা বাঁচে না। খুব—পুণ্যের জোর তাই—প্রাণ আছে, জ্ঞানও হয়েছে একটু—কিন্তু ডানদিক এখনও অসাড়—কথাও কইছে দুটো একটা, জড়িয়ে জড়িয়ে। তা এ অবস্থায় বাড়িতে তো খবর দিতে হয়। জীবন তার করেছিল, ছেলে জামাই এসে ফাস্টোকেলাস রিজাব করে নিয়ে গেল। জীবনও সঙ্গে গেছে। আমি এখানে একা পড়েছি। অবিশ্যি ঝিটাও আছে।'

'তাহলে এখন? কি করবি? কলকাতায় ফিরে যাবি?

'কলকেতায় ফিরে আর কি করব মাসিমা। আবার নতুনবাবু খুঁজব? না, সে ইচ্ছে আমার নেই আর। এ মানুষটা অনেক করেছে আমার জন্যে। তাছাড়া বাকী দিন কাটাবার মতো সংস্থান তো করেই দিয়েছে পেরায়। আর কেন মিছিমিছি। এত আদর-যত্নের পর কার কাছে গিয়ে পড়ব তাই বা কে জানে। গয়না আর টাকা যা হাতে আছে, এখন কিছুদিন চালাতে পারব, বাড়ি ভাড়ার টাকা তো আছেই। কোথাও একখানা ঘর ভাড়া করে থাকলে রাজার হালে কেটে যাবে।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'কথা বিশেষ বলতে পারছিল না ঐ জড়িয়ে জড়িয়ে যা আর ইশোরা—তাতেই বাকস দেখিয়ে বলেছেন, 'এই বেলা কিছু বার করে নাও। যদি ভাল হইতো আসব আবার, নয়তো ওখেনে ডেকে পাঠাবো। নইলে চেন্টা করব জীবনকে দিয়ে কিছু পাঠাতে।' ওর কথা মতো জীবনই বাকস থেকে দু হাজার টাকা আর সাতখানা গিনি বার ক'রে দিয়েছে। আরও ছেল, আমি বারণ করলুম। ছেলেরা কি মনে করবে। ভাববে, যা ছেল সব চুরি ক'রে নিইছি। এ ভাল হল, ছেলে বাক্স খুলে অত নোটের গোছা দেখে একটু

অবাক হয়েই তাকাল আমার মুখের দিকে। আগে কথা কয়নি, তারপর যাবার আগে দুটো-চারটে কথা তবু বললে। জীবনও বলে গেছে, 'এইখেনেই থাকো। যে লোকটা এত করছে তাকে এ দুঃসময়ে ত্যাগ করব না, আমার কাছে কাছে থাকা দরকার। দু-এক মাস দেখি যদি ভাল হয়ে ওঠে তো ভাল, নইলে ফিরে এসে আমার নামে যে টাকা জমেছে তাই দিয়ে পৈরাগ কি এদিককার শহরে গিয়ে একটা ছোটখাটো দোকান দোব, তাতেই আমাদের বেশ চলে যাবে।'

তারপর একটু মুচকি হেসে বলে, 'আবার লোভ দেখিয়েছে, রেজেস্টারি করে বে করবে। পোড়ার দশা। না, অত আশা আর নেই, বের সাধ মিটে গেছে। তবে মনে হয় আসবে। একসঙ্গে সোয়ামী স্ত্রীর মতো বাস করে, সেই আমার ঢের। যে কদিন যায়। বলে না—ভাঙ্গা ঘরে জোচ্ছনার আলো, যদ্দিন যায় তদ্দিন ভাল। বাবু যে আর ভাল হয়ে উঠে আসতে পারবেন তা মনে হয় না। আসার মতো হলেও ছেলেরা ছাড়বে না।'

মহামায়ার খবরও সব শুনল সরস্বতী।

ওরা এখানকার বাস উঠিয়ে কলকাতায় চলে যাচ্ছে শুনে দুঃখ নয়, আনন্দই প্রকাশ করল, 'খোকা ঠিকই বলেছে বামুন মাসী, এখেনে লোক মরতে আসে, এখেনে উন্নতি করার পথ কি আছে বলো। কলকেতাই হল আসল জায়গা। চলে যাও, চলে যাও। এখেনেও তো এসেছেলে ভাগ্যের ওপর নিরভর করে—তাই করেই চলে যাও। তুমি ধম্মপথে আছ, ভগবান তোমার মন্দ করবে না।'

পরের দিন আর এক কাণ্ড করে বসল সরস্বতী।

কোন ট্রেনে যাবেন মহামায়ারা তা জেনে নিয়েছিল। গাড়ি ছাড়বার যখন আর দুটি মিনিট মাত্র বাকী, কাছে এসে জানালা দিয়ে মহামায়ার কোলের ওপর একখানা মুখ আঁটা খাম ফেলে দিল। কেমন এক রকম গাঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমার টাকা বলে ঘেন্না করো না বামুন মাসিমা, বড্ড শখ ছিল, ছেলেপুলে হবে তাদের ভাল করে লেখাপড়া শেখাব। তা তো হল না। এই টাকায় ওকে কলেজে ভর্তি করে দাও গে। যদি কিছু বাঁচে ওর বই কেনাতেই খরচ করো।'

মহামায়া দেখলেন ওর দুই চোখে জল টলটল করছে। তিনি ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'কেন এসব করতে গেলি মা। তোর নিজেরই তো এই আতান্তর।'

'আতান্তর আর কী। যেদিন বাড়ি ছেড়ে বেইরে এইছি, সেই দিনই তো দুঃখুর সমুদ্দুরে ঝাঁপ দিইছি।…আমার জন্যে ভেবো না, বেঁচে আছি, থাকবও বেঁচে। আমাদের প্রাণ সহজে যাবে না। এর বেশী আর বরাতের কাছে আমাদের কি পাওনা থাকতে পারে বলো!'

তারপর কাছে এসে—তখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে—চুপি চুপি বলে, 'আমার টাকা তোমাকে দান করে অবমান করবো না। আগেও যা বলিছি, যখন হাতে আসবে—তখন ঐভাবেই শোধ করো।'

ট্রেন প্লাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তখন। মহামায়া চোখ মুছে খামখানা খুলে দেখলেন—একশো টাকার দুখানা নোট।

॥ ২০ ॥

প্রথমটা অত ঠিক বুঝতে পারেনি বিনু।

ঠিক বোধহয় বিশ্বাসও হয় নি। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল।

আর কোন দিন এখানে ফেরা হবে না, আর কোন দিন গোরাকে দেখতে পাবে না—এটা বুঝতে বিশ্বাস করতে চায় নি বলেই বাস্তবের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ছিল।

ট্রেন যখন বেনারস ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন ছেড়ে, এমন কি রাজঘাট ছেড়ে গঙ্গার পুলে উঠল তখনই হঠাৎ বুঝল তারা সত্যিই কাশী ছেড়ে চলে যাচ্ছে, চিরকালের মতো না হলেও দীর্ঘকালের তো নিশ্চয়ই; তারপর যদিও আর কখনও আসে, গোরার সঙ্গে কি আর কখনও দেখা হবে; এই ঘনিষ্ঠতা, এই বন্ধুত্ব কি ফিরে পাবে?

ওদের কাশী ছাড়বার আগের দিনই গোরারা ফিরে এসেছিল দেশ থেকে। সেদিনের গোছগাছের ব্যস্ততার মধ্যেও—মাকে সাহায্য করার প্রধান লোকই তো বিনু—কোনমতে মাকে বলে বুঝিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরবে বলে ওদের বাড়ি চলে গিছল।

তখনও সেই ঘোরটা চলছে বলে ঠিক চোখে জল আসে নি তার, তবে তার মুখ দেখে দুঃখের গভীরতা না বোঝবার কথা নয়। কিন্তু গোরার বন্ধুপ্রীতি অত গভীরে যাওয়ার মতো গাঢ় নয়, সে খুব সহজভাবেই নিল কথাটা।

'ও, তোরা চললি। দাদা কলকাতায় পড়বেন।···বাবা, স্কলারশিপ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, খুব শখ তো। তা ভালই তো, বড় ইস্কুলে পড়বি, ভালভাবে পাস করবি। দেখবি ওখানে উন্নতির কত স্কোপ। ভাল চাকরি পেয়ে যাবি। কলকাতাই তো আসল জায়গা। এবার দেশ থেকে ফেরার পথে দু দিনের জন্যে কলকাতায় পিসীমার বাড়ি ছিলুম। উঃ, কী জায়গা। ওখান থেকে আসতে ইচ্ছে করে না। বাবার যে কি ঝোঁক কাশীতেই থাকবেন। এখানেও তো চাকরী নয়, ঠিকাদারী করেন, কলকাতার কি করতে পারতেন না। উনি কাশী ছেড়ে কোথাও নড়বেন না।···যা, তোর বরাত ভাল। এর পর কলকাতার বাবু হয়ে যাবি, বড় চাকরি করবি গরীব বন্ধুকে মনে রাখিস!'

হেসে, পিঠ চাপড়ে, এক রকম ঠেলেই দিল বাইরের দিকে। ওর দাদার মুখে শুনেছিল বিনু এইভাবে কথাবার্তায় ছেদ টেনে বিদায় ক'রে দেওয়াকে ইংরেজরা নাকি ডিসমিস করা বলে। সেইটেই মনে হল ওর।··

তখনও ঠিক কোন তীব্র বেদনা জাগে নি, এই ছেড়ে 'যাওয়া সম্বন্ধে তমনও সচেতন হয় নি এতটা—তাই খুব আঘাত পায় নি। তবু বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

এত সহজে নিল গোরা ওর চলে যাওয়াটাকে। এত হাল্কাভাবে। যেন দুদিনের জন্যে পাড়ায় এসেছিল, চলে যাচ্ছে!···না, না, ও হয়ত ভেবেছে ঠাট্টা করছে বিনু। কিম্বা কলকাতা থেকে সদ্য এসেছে, এখনও সেই বড় শহরের

চোখ ধাঁধানো দীপ্তিটা চোখে আছে। হয়ত ওরও আশা শিগগিরই কলকাতায় চলে যাবে। নইলে বিনু এত ভালবাসে গোরাকে, গোরা কি একটুও না বেসে পারে।

কিন্তু এখন টেনে গঙ্গা পেরিয়ে কাশীতে পিছনে রেখে মোগলসরাইতে গিয়ে দাঁড়াতে হঠাৎ মনে হল বিনুর, বুকের মধ্যেটা কী একটা যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠল। সত্যিকারের দৈহিক যন্ত্রণাই যেন বোধ করল একটা—অস্ফুট একটা শব্দও বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

'কি হল রে। চোখে কয়লা পড়ল বুঝি ?...বলছি সেই থেকে অমন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকিস নি !'

গাঢ় কণ্ঠেই মহামায়া বলে ওঠেন।

তাঁরও মন, ভাল নেই। সেদিন যে অকূলে ভেসেছিলেন কলকাতা ছেড়ে আসার দিন, তখন তবু একটা আশ্বাস ছিল বাবা বিশ্বনাথের আশ্রয়ে যাচ্ছেন। আজ যেখানে যাচ্ছেন সেখানে কোন আশ্বাস কি আশ্রয়ই নেই। এখন মনে হচ্ছে এখানে বেশ ছিলেন, অনেকের সঙ্গে জানাশুনো, আত্মীয়তার মতো হয়ে গিছল, সহানুভূতি পেতেন অন্তত একটু।

আগে থেকে মন খারাপ তো ছিলই শেষ মুহূর্তে সরস্বতীটা এসে পড়ে আরও খারাপ ক'রে দিয়ে গেল। কীই বা বয়স মেয়েটার, সামান্য একটা লোভে পড়ে সারা জীবনটা নষ্ট করল। এখনই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশার সুর ওর কথাবার্তায়, যেন এবার মৃত্যুর প্রতীক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই। এখনও হয়তো দীর্ঘকাল বাঁচবে—সুখ-আহ্লাদ সব চলে গেল, আশা বলতে আর কিছু রইল না।

সরস্বতীর কথা ভাবতে ভাবতে আরও দুটো মেয়ের কথাও মনে হচ্ছে—রাধা আর সরমা। সরমার তবু একটা ছেলে হয়েছে, তার মুখ দেখে সব সহ্য হবে, রাধারই যে আর কিছু রইল না জীবনে।

এইটুকু-টুকু মেয়ে ভগবানের কাছে কী পাপ করে আসে যে এমনভাবে সারা জীবন দগ্ধাতে হয়।...

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে নিজের কথাও।

কী পাপ তিনিই বা করে এসেছিলেন। আবার মনে হয় দশটা বছর তো তবু তিনি সুখের মুখ দেখেছিলেন। সে স্মৃতিও তো অনেকখানি।...

মায়েরও কষ্ট হচ্ছে, তাঁরও গলা চাপা কান্নাতেই এমন ভার ভার লাগছে—বিনুর তখন তা লক্ষ্য করার কথা নয়। তবে কৈফিয়ৎ খুঁজে পেয়ে বেঁচে গেল। কারণ সে আর কোনমতেই চোখের জল চাপতে পারছিল না।

কলকাতা এসে প্রথম দিন বামুনদির ঘরেই উঠতে হল—এত দিনের পাতা সংসারের বিপুল মোটঘাট সুদ্ধ। ছোট ঘর তাঁর। মহামায়ার জিনিসপত্রেই ঠাসা, সেখানে এই বাক্স-বিছানা তোরঙ্গ ধরা সম্ভব নয় তা তিনিও জানতেন, তার একটা ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন। বাড়িওলাদের বলে-কয়ে, এক রকম গিন্নির পায়ে-

হাতে ধরেই—তাঁদের বাইরের ঘরটা খুলিয়ে নিয়েছিলেন। ঘরটা তাঁর ঘরের লাগোয়া। মাঝে একটা দোরও আছে, সেটা এদিক দিয়ে তালা দিয়ে রাখতেন ওঁরা, এটা খুলতে আসা-যাওয়ার কোন বাধা রইল না। তবে গিন্নি বার বার বলে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাই বলে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থেকো না বাছা। ভদ্দর লোকের বাড়ি, আমার শ্বশুরের নামে গলির নাম, পাড়াসুদ্ধ একডাকে চেনে—আমাদের বাড়ি বোটক-খানা না থাকলে ইজ্জৎ থাকবে না। দুটো দিন বলেছ, যেন মনে থাকে। আমার না মেয়ের কাছে পাঁচটা কথা শুনতে হয়।

ভদ্রমহিলা বিধবা, একটি মেয়েই ভরসা। সেই মেয়ে-জামাই নাতি-নাতনী নিয়েই সংসার। গিন্নি একটু দয়া করলেও, মেয়ে নাতি-নাতনীরা বেজার মুখ করেই রইল, এমন কি এদের সঙ্গে চোখোচোখি হতেও একটা কথা কইল না। তাদের বৈঠকখানার জন্যে অত আপত্তি নয়—কল পায়খানায় আরও তিনটে ভাগীদার বাড়ল, সেইটেই এ বিরক্তির কারণ।

এভাবে এদেরও থাকা পোষাবে না—ওঁদেরও আপত্তি, বামুনদির ভাষায় মায়েও মেরেছে ঘরেও ভাত নেই—সে সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। একটা বিকল্প ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছিলেন। কলকাতায় ত্রিশ-চল্লিশ টাকার কম কোন বাড়ি নেই, তাও ঐ ভাড়ায় যে বাড়ি, তাতে মহামায়ারা থাকতে পারবেন না। সেটা জেনেও, ওদের বোঝাবার জন্যে তবু মহামায়াকে সঙ্গে করে দুটো বাড়ি দেখিয়ে আনলেন। একটার দোর খুলতেই কলতলা, সেই জল মাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠলে ওপরে দেড়খানা ঘর, তেতলায় একটা টিনের রান্নাঘর, পাইখানা সিঁড়ির নিচে, মাথা নিচু করে না উঠলে মাথায় লাগবে—এই কল থেকে জল তুলে তিনতলায় নিয়ে যেতে হবে রান্নার জন্যে, চান করতে কি কাপড় কাচতে নামলে বাইরের কোন লোক আসতে পারবে না। ভাড়া পঁয়ত্রিশ টাকা।

আর একটি বাড়ির একতলায় দুটো অন্ধকার ঘর, জানলা-দরজা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা—কল পাইখানা বাড়িওলার সঙ্গে, ছাদ ব্যবহার করতে পারবে না এই শর্ত, ভাড়া ত্রিশ টাকা।

এভাবে থাকা সম্ভব নয় এদের—বামুনদিও তা জানতেন শুধু এদের সন্দেহভঞ্জন করতেই নিয়ে যাওয়া। বেশী খোঁজাখুঁজি করার সাধ্যও নেই বামুনদির, একে তাঁকে দু বাড়ি রান্না করে দিয়ে আসতে হয়, সময় কম, তার ওপর শরীর তাঁর সত্যিই ভেঙ্গে পড়েছে। ক বছর আগে যা দেখে গেছেন এঁরা, সে চেহারারও কিছুই আর নেই।

তিনি স্পষ্টই বললেন রাজেনকে, তোমাকেই বাড়ি খুঁজতে হবে বাবা। তুমি বলছ কালই তোমাকে কলেজে ভর্তি হতে হবে, তাহলে তুমি কাছাকাছি একটা মেস দেখে নাও। তারপর উঠে-পড়ে বাড়ি দেখো। যদ্দিন না পাও, মনের মতো কম ভাড়ায় কলকাতায় বাড়ি পাওয়া একটা তপিস্যের ব্যাপার—তা তার জন্যেও এদের একটা ব্যবস্থা করে রেখেছি। এই হাওড়ার কাছেই, সাঁতরাগাছি ইস্টিশান থেকে একটু ভেতরে, দক্ষিণে যেতে হয়—হাঁটা পথে কুড়ি মিনিটের মতো লাগে—পাড়াগাঁ জায়গা অবিশ্যি। কিন্তু উপায় কি বল। এরা এই আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছে তাই আমার বাপের ভাগ্যি। এরাও

এখেনে থাকতে দেবে না, তোমাদেরও ওঠ ছুঁড়ি তোর বে, হুট করে এসে পড়লে। যেখানকার কথা বলছি সেখেনে আমার এক বোন আছে, তাদেরই পাশের বাড়ি, একখানা নতুন ঘর হয়েছে, বেশ ভাল ঘর, দক্ষিণ খোলা, একটু রোয়াকও আছে, মাসে আট টাকা ভাড়া চেয়েছে। দশ টাকাই বলেছে। আমার বোন স্বপ্ন অনেক বলে ঐ দু টাকা কমিয়েছে। জলের ব্যবস্থা পুকুরে সারতে হবে—তবে এদের নিজেদের নতুন কাটানো পুকুরও আছে একটা, বেড়া দিয়ে ঘেরা, ইত্তিক লোক এসে নোংরা করবে সে জো নেই। তার জলে চান, রান্না সব চলবে। খাবার জল আনতে হবে অন্যত্তর থেকে, আশ-পাশে বড় পুকুর আছে ঢের, চৌধুরীদের পুকুর, মল্লিকদের পুকুর—লোক দিয়ে আনাও বা বিনু নিয়ে আসুক, সে তোমাদের খুশি।'

মহামায়া যেন শিউরে উঠলেন, 'পুকুরের জল খেতে হবে?'

'তাছাড়া উপায় কি বলো। সাত পাড়ার লোক ঐ জলই খাচ্ছে। খুব ঘেন্না করে ফুটিয়ে নিও। আর পারো, গ্যাঁটের জোর থাকে—ইস্টিশানের কাছে টিউকল না কি হয়েছে—অনেকখানি মাটির নিচে থেকে জল ওঠে, তাও আনাতে পারো। তবে পয়সা দিয়েও, সে কি জল দেবে তার ঠিক কি! পয়সাও নেবে আবার হয়ত মল্লিক পুকুরের কি কাঁটা পুকুরের জল দিয়ে যাবে। সে জলও কাঁচপানা, তুমি ধরতে পারবে না।'

চিরদিন কলকাতায় থেকে অভ্যস্ত মহামায়া বুকের মধ্যে যেন একটা হিম হিম ভাব বোধ করেন। অথচ অন্য কি পথ আছে এ থেকে মুক্তি পাবার তাও বুঝতে পারেন না।

সত্যিই আর উপায় ছিল না। দুটো দিন মাত্র তো সময়, এর মধ্যে কে এমন বাড়ি খুঁজে দেবে এখানে যা এঁদের পছন্দসই আবার সাধ্যের মধ্যে হবে। সেই বামুনের গরুর মতো—যে খাবে কম দুধ দেবে বেশী, নাদবে অনেক—বাড়ি এত তাড়াতাড়ি কোথায় পাওয়া যাবে!

তাও দুটো দিনই বা কোথায়? একটা দিন তো পেঁছে স্নান পুজো সেরে ব্যাপারটা বুঝতেই কেটে গেল, বিকেলে যা ঐ দুটো বাড়ি দেখে এসেছেন কোনমতে। আর তো মোটে চব্বিশ ঘণ্টা হাতে আছে। চোখ না ফেলতে ফেলতে কেটে যাবে।

সুতরাং বামুনদির বোনের পাড়ার সেই ঘরই মেনে নিতে হল। তখনও রাজেনের ব্যবস্থা বাকী; বামুনদি এই পাড়ার যে বাড়ি কাজ করেন—তাঁরা খুব ভালবাসেন ওঁকে, ঠিক ঝি চাকরের চোখে দেখেন না—তাঁদের বাড়ির একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সারা সকাল ঘুরে একটা মেস ঠিক ক'রে এল সে। সস্তার মেসও ছিল, হুজুরীমল লেনের মাটকোঠার মেস, সার্পেনটাইন লেনে, বৌবাজারে, বেনেটোলা লেনে, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে, কিন্তু রাজেনের সে পছন্দ হল না। ঢুকলেই যেখানে মনে হয় দম বন্ধ হয়ে আসছে সেখানে দিনের পর দিন থাকবে কেমন করে? বিশেষ পড়ার প্রশ্ন আছে। এক এক ঘরে চারজন ছজন পর্যন্ত লোক—বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন বৃত্তির—তার মধ্যে পড়া!

শেষ পর্যন্ত শিয়ালদার কাছে হ্যারিসন রোডের ওপর একটা মেস ঠিক ক'রে

পাঁচটা টাকা আগাম দিয়ে এল, কথা রইল দিন তিনেক পরে এসে দখল নেবে। দোতলার রাস্তার দিকে ঘর—নিতান্তই সরু এক ফালি, একটা একজনের মতো বিছানা পাতলেও তোশকটা দু দিকে দুমড়ে থাকবে, এ ছাড়া হয়ত কষ্টে-সৃষ্টে একটা বাক্স রাখা যেতে পারে। দরজার সামনে একটা লোহার চেয়ার আর একটা আমকাঠের টুল মতো আছে—টেবিলের অপভ্রংশ।

ঘর বলতে এই, তবে একানে, নিজস্ব ঘর। সেইটেই বড় গুণ। এই বস্তুটি—যত মেস ঘুরল কোথাও নেই, খুব কম হলেও, এক দরজা ঘর, কোন জানলা নেই, সেখানেও দুজন লোকের সীট। যা হৈ-হল্লা দেখল ঐসব সস্তার মেসে, পড়াশুনো অসম্ভব, এমনি থাকলেও রাজেন পাগল হয়ে যাবে। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মেসে যে দৃশ্য দেখল, মেঝেতে প্রায় গায়ে গায়ে বিছানা পেতে একটা ঘরে ছজন লোক থাকে। ওরা যখন গেছে, এক মাস্টার মশাই নিজের বিছানাতে বসে ছাত্র পড়াচ্ছেন, দেওয়ালের দিকে এক ছোকরা বসে ধাঁই ধপাধপ তবলা পিটছে। একটি নিতান্তই প্রায় ঐ ছাত্রের বয়সী ছেলে শুয়ে শুয়ে ক্রমাগত বিড়ি খেয়ে যাচ্ছে। একটু বাদে, রাজেনরা কতটুকুই বা দাঁড়িয়েছিল—তার মধ্যেই, সেই মাস্টার মশাইটি নিজে পকেট থেকে বিড়ি বার ক'রে ঐ ছেলেটির বিড়ি থেকে ধরিয়ে নিলেন নির্বিকার চিত্তে।·· এসব দেখে অনভ্যস্ত রাজেনের গা গুলিয়ে এসেছিল। তবে ওখানে সস্তায় হত। শ্রীগোপালে যা আন্দাজ পাওয়া গেল টাকা এগারোয় এক মাস খাওয়া থাকা চলত, হুজুরীমল লেনে আট টাকায়। এখানের ম্যানেজার বললেন, না মশাই, চোদ্দ টাকার কম নয়, পনেরোও হতে পারে। সেই বুঝে আসুন।

এখানের ব্যবস্থা ঠিক করে কলেজে ভর্তি হতেই সে দিনটা কেটে গেল। পরের দিন সকালবেলাই বামুনদির চেষ্টায় দুটি ভাতে-ভাত খেয়ে ওরা বেলা দশটা নাগাদ রওনা দিল সেই অজ্ঞাত অপরিচিত অ-দৃষ্ট কোন এক পল্লীগ্রামের অনভ্যস্ত জীবনযাত্রার দিকে। নিতান্ত বামুনদি বাড়িওলাদের শুনিয়ে শুনিয়েই তাড়া-হুড়ো করছিলেন বলেই তাই—আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও কোন কটু কথা শুনতে হয় নি; কিন্তু যাত্রার আগে যখন মহামায়া গিন্নির সঙ্গে দেখা ক'রে একটু ধন্যবাদ জানাতে গেলেন তিনি তখন একটা থালায় ক'রে জিরে নিয়ে বাছছিলেন, তা থেকে মুখ না তুলেই বিরস কণ্ঠে বললেন, 'যাই হোক, একটু জায়গা পেয়েছ এই ভাল। আমাদের বড় অসুবিধে বাপু, সত্যি কথাই। বোটক-খানা জোড়া হয়ে থাকলে কি চলে। আউঁতি যাউঁতি আছে, এ একটা কত বড় নামকরা লোকের বাড়ি, আমার শ্বশুরের নামেই রাস্তা—লোকে ভাববে এমনই দৈন্যদশা হয়েছে যে বোটকখানা ঘরটাও ভাড়া দিয়েছে। এই তাই, ভেতরের ঘরখানা, পড়েই ছিল, যত রাজ্যের ডেয়োঢাকনায় ভর্তি, আর্সোলার বাসা হয়ে। বামুন মেয়ে এসে কেঁদে পড়ল—তা বলি মরুক গে, তবু তো একটা লোক থাকবে, বামুনের মেয়েছেলে আচ্ছয় পাচ্ছে। নইলে ভাড়া আর কি বলো, নাম মাত্তর। তাতেই আমার জামাই দুবেলা কথা শোনায়, বলে, আপনার তো সব দুঃখু ঘুচে গেছে ঐ সাত টাকায়, আর ভাবনা কি।···তা রওনা হয়ে যাও বাছা, পাড়াগাঁ জায়গা, সাপখোপের বাসা হয়ে আছে হয়ত সে ঘর—দিনে

দিনে যাওয়াই ভাল। দুর্গা, দুর্গা।'

স্টেশনে নামাই তো এক সমস্যা। ট্রেন দাঁড়ায় এক মিনিট, লাইসেন্সওলা কুলি তো দূরের কথা, এমনি কোন দিশী মুটে পর্যন্ত চোখে পড়ল না। বেগতিক দেখে, গাড়িতে কতক আনাজওলা ফিরছিল খালি ঝাঁকা নিয়ে—কেউ বাউড়িয়া কেউ উলুবেড়ে যাবে—তারা হামরাই হয়ে এসে কোনমতে দু-তিনটে দোর জানলা দিয়ে নামিয়ে দিলে। তাও শেষ বিছানার বড় বোঝাটা ছুঁড়ে দিতে হল চলন্ত গাড়ি থেকেই।

মাল দেখে অবশ্য কোথা থেকে দুজন মেয়েছেলে ছুটে এল—ছেঁড়া ময়লা কাপড়, রুক্ষ চুল, দীর্ঘকাল উপবাসের চেহারা—এরা এত মাল বয়ে প্রায় তিনপো রাস্তা নিয়ে যেতে পারবে না বুঝে বামুনদি বাইরে চলে গেলেন। ভাগ্যক্রমে একটা ভাঙ্গাচোরা নড়বড়ে ঘোড়ার গাড়ি ছিল, যাকে ছ্যাকড়া গাড়ি বলে কলকাতায়, তারও ধ্বংসাবশেষ দাঁড়িয়েছিল একটি মাত্র কংকালসার ঘোড়া। কিন্তু গাড়োয়ান মালের চেহারা দেখে পরিষ্কার বলে দিল আমার গাড়ি মানে ঘোড়া মা ঠাকরোন চারটে লোক আর এত মাল টানতে পারবে না, রাস্তা তো সটান নয়—যদি মাল যায় বড় জোর একজনকে নিতে পারি।

তখন আবারও খানিক ছুটোছুটি করে একখানা বিবর্ণ রংচটা পালকিও যোগাড় হল। ঠিক হল তাতেই মহামায়া যাবেন, সঙ্গে বিনু, বামুনদি যাবেন গাড়িতে মালের সঙ্গে ; রাজেনকে হেঁটেই যেতে হবে। তাকে মোটামুটি পথের হদিস বলে দেওয়া হল। এই একটিই রাস্তা—এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। এই পথ ধরেই কিছু দূর গেলে সরস্বতীর পুল পড়বে, তা পেরিয়ে বাজার আর ছোট কালীবাড়ি একটা। সেইখানেই দেখবে তিন রাস্তা এক হয়েছে—তার বাঁদিকের পথটা ধরলেই হবে। তারপর খানিক এগিয়ে আবারও বাঁহাতি গেলে দেখবে ঘোড়ার গাড়িটা যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেইটেই বাড়ি। এ আর রাজেন চিনে নিতে পারবে না ? আর বামুনদি তো থাকবেনই।

রাজেন ভরসা ক'রে রাজী হল, মহামায়া ভয়ে সিঁটিয়ে রইলেন ছেলের জন্যে। ছেলে কখনও একা নতুন জায়গায় যায় নি এর আগে, যা ঝোপঝাড় ঘুপচি মতো দেখা যাচ্ছে, ওর মধ্যে যদি পথ হারিয়ে ফেলে ? যদিও সতেরো বছর বয়স হয়েছে—মহামায়ার কাছে আজও সে শিশুই থেকে গেছে।

পালকি চড়া বিনুর কাছে একেবারে নতুন নয়। এর আগে ছেলেবেলায় কলকাতায় এক-আধবার চড়েছে, তবে সে ভাল মজবুত পালকি। এ যা অবস্থা, মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়বে। সে আড়ষ্ট হয়ে রইল ভয়ে সর্বক্ষণ।

পালকির দরজা খোলাই ছিল, তা দিয়ে দু দিকের যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাও খুব আশ্বস্ত হবার মতো নয়।

ঘন জঙ্গল, বড় বড় গাছ—ফলের গাছই বেশী অবশ্য, তার নিচেটা কালকাসন্দা আস-সেওড়া আর ভেঁটকোলে সমস্তটা আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। গাছে আর বাঁশ-ঝাড়ে জড়াজড়ি হয়ে এমন অন্ধকার সৃষ্টি করেছে সেই বেলা একটাতেই, মনে

হচ্ছে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পুকুর চোখেই পড়ে না, ছোট ছোট ডোবার মতো, তার বেশির ভাগই টোপা পানা আর পাটায় ঢাকা। এইখানে থাকতে হবে তাদের?

ঘোড়ার গাড়ির বিস্মৃত-প্রায় শব্দে (এখানে পাড়ার মধ্যে গাড়ি আসে কদাচিৎ, ন-মাসে ছ-মাসে, খুব বড়লোক কলকাতার বাবু ছাড়া এ বিলাস করার শক্তি কার?) দু-চারজন ভেতরের কোটর ছেড়ে বাগান পেরিয়ে পথের ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল, তারপরই দূরে পালকি বেয়ারাদের হুম হাম শব্দে আরও বিস্মিত হয়ে প্রাণপণে পথের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে, ফিরে যেতে পারে নি।

এ কৌতূহলী দর্শকদের বেশিরভাগই মেয়েছেলে. তার সঙ্গে কিছু দিগম্বর শিশুর দল। যেমন রোগা শীর্ণ ক্লিষ্ট চেহারা, মেয়েদের তেমনি দীন বেশবাস। ছেলে-মেয়েগুলোর হাত-পা কাঠি কাঠি, পেটগুলো ডাগর। তারা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল—নিঃসন্দেহেই কলকাতার মানুষকে।

কেউ কেউ ওদের সম্বোধন করতে সাহস না ক'রে বেয়ারাদেরই প্রশ্ন করল, 'এ পালকি কার বাড়ি যাবে গা?…আসছে কোথা থেকে?'

বেয়ারারা দু-এক জনকে উত্তর দিল, 'আসছে ইস্টিশান থেকে, যাবে দক্ষিণ পাড়ায়।'

'ও মা।' একজন তার মধ্যে উচ্চ স্বগতোক্তি করল, 'কৈ দক্ষিণ পাড়ায় তো কারও বাড়ি বেথা আছে বলে শুনি নি।'

তাদেরই মধ্যে কে একজন উত্তর দিল, 'বেথা কিগো! একটু আগে দেখলে না ঘোড়ার গাড়িতে বেস্তর মাল গেল, কারা বসবাস করতে আসছে।'

এখেনে বসবাস! কলকেতার লোক! দ্যুস।…

বাড়িটায় পেঁছে প্রথমটা খুব খারাপ লাগে নি। নতুন ঘর, আর একেবারে ছোটও নয়। সামনে দক্ষিণ দিকে একটু বারান্দাও আছে, তারই এক প্রান্তে গোলপাতার চালার রান্নাঘর। তাতে অবশ্য বাঁশের আগড়, দরজা নেই। অর্থাৎ বাসন কি রাঁধা জিনিস এখানে রেখে নিশ্চিন্ত থাকা যাবে না, ফি হাত ঘর থেকে নিয়ে যেতে হবে আবার বয়ে এনে ঘরে তুলতে হবে।

খারাপ লাগে নি তার কারণ সদ্য রাজমিস্ত্রী বিদায় নিয়েছে বলে সামনের উঠোনটুকুতে এখনও গাছপালা আগাছা হয় নি। হলে কি দাঁড়াবে তা অবশ্য বাড়িওলাদের উঠোনের দিকে চাইলেই বোঝা যায়। লংকা থেকে ঢ্যাঁড়স গাছ কিছুরই অভাব নেই, তার মধ্যেই দু-একটা টগর আর সন্ধ্যামণিও কোনমতে মাথাগুঁজে থেকে গেছে। অপরাজিতার লতা উঠেছে পাঁচিলে, তরুকলা আর ধুঁধুল গাছ ছাদে। ফলে জানলাগুলো প্রায় আচ্ছাদিত। শশার জন্যে একটু মাচা এক ধারে, রান্নাঘরের একটা ঘোঁচ মতো কোণে। রান্নাঘরের দাওয়ার প্রান্তে, যেখানে কাঠ বা পাতা-লতার জ্বালে রান্নার উনুন (এখানে, পরে দেখেছিল বিনু, ভাতটা অন্তত সবাই এই পাতার জ্বালেই রাঁধে), তার ঠিক নিচে দুটো ঝুনো নারকোল মাটিতে আধ পোঁতা ক'রে রেখে চারা বার করার ব্যবস্থা হয়েছে, যাতে হাত ধোবার আর চাল ধোবার জল অবিরাম পড়তে পড়তে অঙ্কুরিত হয়। একটা ছাঁচি-কুমড়োর গাছ উঠেছে রান্নাঘরের চালে—দেখে বামুনদি টিপ্পনি কাটলেন,

'আহাম্মুক নম্বর দুই, চালে তুলে দেয় পুঁই—দুটো চাল-কুমড়োর জন্যে চালের পাতা যে পচছে সে হুঁশ নেই।' এ ছাড়াও একটা বিলিতী কুমড়োর চারা বিভিন্ন গাছের মধ্যে থেকে এঁকে-বেঁকে একটু ফাঁকায় এসে যেন ডগা উঁচু ক'রে আশ্রয় খুঁজছে।

এমনি এখানটাও হবে হয়ত, কে জানে। ভাড়াটের দিক বলে এটুকু হয়ত তাদের জন্যেই ছেড়ে দেওয়া হবে, তবে ভাড়াটেরা কাজে না লাগালে কি আর ওঁরা চুপ করে থাকবেন?

এইটুকুই যা মুক্তি, সেই জন্যেই প্রথমটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন, তবে সে অল্প কিছু কালই। তারপরই চারিদিকে ভাল করে তাকিয়ে বুকের মধ্যেটা যেন একটা অসহায় ভাব বোধ করে। সমস্ত পুব দিকটা জুড়ে বিরাট এক বাঁশ ঝাড়—সে বাড়িওলার অংশেরও পুব দিকে, কিন্তু তার ছায়া এ ঘরও আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে; পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটা ডোবার মতো পুকুর আছে বটে, তার পাশে বিরাটতর একটা তেঁতুল গাছ পশ্চিমের রোদ এবং আলো আড়াল করে রেখেছে। গাছটা পুকুর এবং এঁদের জানলার মাঝামাঝি। পুবে কোন জানলা নেই, তবে উঠোনেও যেটুকু আলো আসতে পারত, তাও আসে না।

দক্ষিণ দিকেই রাস্তা, কাঁচা রাস্তাই, তবে হয়ত এককালে কিছু খোয়া পড়েছিল, তাই বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় গাড়ি আসে এ পর্যন্ত। তার ওদিকে যাঁদের বাড়ি তাঁদের অবস্থা—ভাঙ্গা জানলা আর নোনাধরা দেওয়ালেই প্রকাশ পাচ্ছে, এদিকে তাঁদের বড় বড় আম গাছ সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করে আছে। বাড়িওলার স্ত্রী মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, 'আর বলো না দিদি, চল্লিশ বছরের গাছ কি আরও বেশি, টোকো দিশি আম, ফল বিশেষ হয় না আর, যে বছর ফলে বড়জোর একশো, তাই কি মায়া। বলি এগুলো কেটে নতুন কলমের চারা বসাও, তা নবো একেবারে যেন শিউরে ওঠে; বাপ রে, ও কথা আর বলো না মেজদি, লোকে কথায় বলে বাড়ির গাছা আর পেটের বাছা—দুই-ই সমান। বুড়ো হয়েছে বলে কেটে ফেলব!...পোড়ার দশা বুদ্ধির!'

বামুনদি সন্ধ্যে পর্যন্ত থেকে মোটামুটি জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর যে বোন এই পাড়ায় থাকেন, তিনি এসে উনুন পেতে দিয়ে গেলেন। ভরসা দিলেন তাঁর ছোট ছেলে পরের দিন সকালে বিনুকে সঙ্গে নিয়ে কয়লার দোকান, মুদির দোকান, বাজার সব চিনিয়ে দেবে, কালকের মতো বাজারহাট করেও দেবে। ঘুঁটের দরকার নেই, তাঁর বাড়িতেই অঢেল। নারকোল পাতারও অভাব নেই। 'ক্যালাচিনি' তেল বাজারেই পাওয়া যায়, এদের বোতল না থাকে তিনি একটা দেবেন। দুধ যদি লাগে সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে, পাড়ায় অনেকে বেচে, কারও কাছে যোগান ধরিয়ে দিতে পারবেন। দাম বেশী, চার সেরের বেশী দেবে না টাকায়, তাও সেরে আধসের জল—তবে উপায় কি?

আরও বলে গেলেন সেদিনের মতো ছোট খোকার দুটি ভাত আর মহামায়ার একটু দুধ সন্ধ্যের পর এসে নিজেই দিয়ে যাবেন।...

এদিকটা অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অপরাহ্ন ঘোর হবার আগেই যখন উঠোনের ওপর মশার ঝাঁক চক্রাকারে ঘুরতে লাগল,

ছায়াঘন গাছগুলোর তলায় মনে হল কত কি শরীরী বা অশরীরী প্রাণী এসে জমছে এক এক ক'রে—তখন বিনুর চোখের জল আর বাধা মানল না। ঘরের পাতা বিছানাতে উপুড় হয়ে পড়ে রইল, যাতে ওদিকে তাকাতে না হয়।

আরও একটু পরে, অন্ধকার পাকাপাকি নামতে মহামায়ারও বুকের মধ্যেটা আতঙ্কে গুর গুর করতে লাগল। নাম না জানা বিভীষিকার আতঙ্ক, অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কা। রাত্রে রাস্তায় আলো জ্বলে না, এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। আশপাশের বাড়িতে হয়ত আলো জ্বলছে—গাছপালার দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ ক'রে তার আভাস মাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। এমন যে হয়, এমন অন্ধকারে যে মানুষ বাস করতে পারে—তা তো কখনও ভাবেনও নি।

পরে দেখেছিলেন মহামায়া, এখানে অনাবশ্যক আলো কেউ জ্বালে না। ছেলেরা যেখানে পড়াশুনো করে—খুব বিশেষ কেউ করে না—সেখানে একটা হ্যারিকেন জ্বালা হয় ঐ সময়টুকুর জন্যে, বাকী একটি মাত্র ল্যাম্পো বা ডিবে ভরসা, প্রয়োজন মতো রান্নাঘর ও শোবার ঘরে যাতায়াত করে।

ভাল করে অন্ধকার হবার আগেই শুরু হয়ে গেল শিয়ালের ডাক। শিয়ালের ডাক ছেলেবেলায় কলকাতাতেও শুনেছেন এক-আধটা—কিন্তু এ তো মনে হচ্ছে শয়ে শয়ে শিয়াল ডাকছে—ঘরের পাশেই।

বামুনদির বোন খাবার দিতে এসে জানিয়ে গেলেন, 'ও পোড়ার জানোয়ারের কথা আর বলো না দিদি। এ তো তবু এতকাল বসবাস ছিল না। দু-চার দিন থাকো, দেখবে এই উঠোনের মধ্যে কিল কিল করছে। আমাদের রান্নাঘরের পাশে নর্দমার ধারে ফ্যানের লোভে সেই সন্ধ্যের আগে থাকতে অমন কুড়ি-পঁচিশটা এসে জড়ো হয়।'

তবু বিস্ময় ও ভয়ের এই শেষ নয়।

পরের দিন ভোরে উঠে মহামায়া দেখলেন আর একটি প্রয়োজনীয় তথ্য গতকাল সংগ্রহ করা হয় নি।

বড় প্রাকৃতিক কাজটা সারার কোন পাকা ব্যবস্থা এখানে নেই। এ যে না-থাকতেও পারে, তা বোধহয় ঘর ঠিক করার আগে বামুনদিও ভাবেন নি। পিছনে উত্তর দিকে গভীর এক পগার আছে, জল নিকাশী ব্যবস্থা হিসেবেই বোধহয়, তারই ধারে দুটো ইট পাতা, সেগুলোও বাঁধানো নয়, পিছলে গেলেও যেতে পারে, আলগা ইট।

'এখানে খাটা পাইখানা করার খুব অসুবিধে। অনেকে ক'রে ফাঁপরে পড়েছে।' বাড়িওলা বোঝালেন, 'খাটবার জমাদার পাওয়া যায় না। এ কোন ঝামেলা নেই, ময়লা সোজা পগারে গড়িয়ে পড়ে। বিস্তর মাছ আছে তারা খেয়ে যায়, তোফা ব্যবস্থা। পয়সা খরচ করে অসুবিধে ভোগ করার কি দরকার আছে বলুন।'

মহামায়ার একবার মনে হল এখনই লোক ডেকে মাল তোলাবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কঠোর সত্যটা সামনে এসে দাঁড়াল—তারপর? কোথায় যাবেন এখান থেকে? সত্যিই তো গিয়ে রাস্তায় বসা যায় না।

বাড়িওলার স্ত্রী ওঁর মুখ দেখে অবস্থা অনুমান করে নিয়ে গলা নামিয়ে

বললেন, 'বেশ তো দিদি, ওদিকে কোথাও গিয়ে পাঁদাড়ে কাজ সেরে আসুন না, দেদার জায়গা পড়ে আছে, কেউ দেখতেও পাবে না।'

মুশকিল হল সবচেয়ে বিনুকে নিয়েই। সে ওদিকে যাবে না কিছুতেই। একটু আগেই দেখেছে পগারের জল থেকে কুমিরের ছবির মতো একটা কিম্ভূত-কিমাকার জীব—কদর্য একটা জন্তু উঠে আসছে। সে তো বিনুকে দেখলেই খেয়ে ফেলবে।

বামুনদির বোনপো এসেছিল ওকে বাজার দোকান চেনাতে, সে তো হেসেই খুন, বলে, 'ও তো গো-হাড়গেল, যাকে কলকাতার বাবুরা গোসাপ বলে। ও আবার কি করবে, একটা তাড়া দিলেই আবার জলে চলে যাবে। ওরা এই পোকামাকড় সাপ-ব্যাঙ খেয়ে থাকে, ওরা কি মানুষ খেতে পারে।'

তারপর একটু থেমে বলে, 'অমনি কদাকার দেখতে, কিন্তু ওদের দাম আছে, চামড়া খুব দরে বিকোয়।'

রাজেন পরের শনিবার এসে বিনুকে এখানকার স্কুলে ভর্তি করার কথা তুলেছিল। অতবড় ছেলেকে বসিয়ে রাখা ঠিক নয় বলে, কিন্তু মহামায়া বেঁকে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এখানে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না। ভয়ে সিঁটিয়ে সিঁটিয়ে বিনুটা আধখানা হয়ে গেল, কিছু খেতেই চায় না, পাছে পগার ধারে যেতে হয়। তুই উঠে-পড়ে একটা বাড়ি দ্যাখ। এর চেয়ে কলকাতায় খোলার ঘরে থাকাও ভাল। এখানে বেশী দিন থাকলে পাগল হয়ে যাবো।'

বিনুর এই কদিনেই মনে হচ্ছে ওর জীবন শেষ হয়ে গেল। ইস্কুলে যাবারও যে খুব ইচ্ছে আছে তা নয়, গোরা নেই যেখানে সেখানে গিয়ে ও কার সঙ্গে মিশবে, কথা কইবে। নতুন কোন ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা অসম্ভব। বন্ধু একজনই থাকে জীবনে।

এখানে বাস করার দুঃখ তো আছেই, পড়া নেই ইস্কুল নেই, এমন লাইব্রেরী নেই যেখান থেকে বই আনিয়ে পড়া যায়—এই চারদিকের অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে, একেবারে এতদিনের অভিজ্ঞতার বাইরে এই বিচিত্র একধরনের মানুষের সঙ্গে বসবাস, যারা কলা বাখলা নারকোল বেলদো, গাছপালা আর প্রতিবেশীদের দারিদ্র্য ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ জানে না—এ ওর পরিচিত জানা জীবনের সমাধি ছাড়া কি!...মৃত্যু-যন্ত্রণা কি এর চেয়ে কষ্টকর? মনে তো হয় না। এর চেয়ে সোজাসুজি সে দিদির মতো মারা গেল না কেন?

ঘরে জানলার ধারে বসে (একটি মাত্র জানলা) স্বভাবতই কাশীর কথা মনে পড়ে। গোরার কথাই বেশী। এক এক সময় মনে হয় বুকটা দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে কে, এখনই ফেটে যাবে হয়ত। মানুষের জন্যে মানুষের এত কষ্ট হতে পারে, হয়—আগে তো কারো কাছে শোনেও নি।

একদিন মনে হল গোরাকে একটা চিঠি লিখবে। কিন্তু তার নানা অসুবিধা। পোস্টকার্ড কিনে আনা, মা হাজারো প্রশ্ন করবেন—কাকে লিখবি, কেন—হয়ত দেখতে চাইবেন কি লিখলি। তাছাড়াও মনে হল, কিইবা লিখবে সে। তাকে ছেড়ে এসে ওর যে এই মর্মান্তিক দুঃখ তা কি বোঝাতে পারবে? তেমনভাবে

তো কখনও কিছু লেখে নি, এধরনের চিঠি কোন বইতেও তো পায়নি। ঠিক ভাষা কি মনে আসবে? আর, সে প্রাণপণে লিখলেও গোরার কাছে এ চিঠির কি মূল্য। বিদায় নেবার সময় তার অতি সহজ ভঙ্গি, সাধারণ কথাগুলো মনে পড়লে ইনিয়ে বিনিয়ে তাকে ভালবাসার কথা লিখতে নিজেরই লজ্জা হয়।

তাই চিঠি লেখা আর হয়ে ওঠে না।

যেটা হয়—ওর জীবনের প্রথম কবিতা লেখা। একেবারে দ্বিতীয় ভাগ শেষ করার সময় একটা কি কবিতা লিখেছিল, সে ধর্তব্য নয়। এইটেই প্রথম কবিতা। পয়ার ছন্দে ষোল না আঠারো লাইনের, দার্শনিক সুর মিশনো বিরহের কবিতা। তার প্রথম দুটো লাইন আজও মনে আছে ওর, "মানব-জীবন পটে প্রথম যে রেখা সমস্ত জীবন ধরি সে-ই দেয় দেখা বারবার!"

কিন্তু এ কবিতাও শান্তি আনে না মনে। বরং মধ্যে মধ্যে নির্জনে যখনই কাগজটা বার ক'রে একবার পড়ে দেখতে যায়, গরম কি একটা জিনিসে যেন দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসে।

কলকাতায় মায়ের আলমারীতে যে বইগুলো আছে, তার দু'চারখানাও যদি মা নিয়ে আসতেন!

॥ ২১ ॥

যেখানে একদিনও থাকা যাবে না ভেবেছিলেন মহামায়া, সেখানেই ছ' মাস কেটে গেল দেখতে দেখতে।

এখানে থাকতে হয়েছে বাধ্য হয়েই, কারণ বাড়ি খোঁজার লোকের অভাব। কলকাতার মধ্যে গলি ঘুঁজিতে যে বাড়ি সস্তা ভাড়ায় খালি পাওয়া যায় সেখানে মহামায়া থাকতে পারবেন না। হয় অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে আলো-বাতাসহীন, নয়তো ভাঙ্গাচোরা, দরজা জানলা খোলে না বা বন্ধ হয় না, কলঘর বলতে কিছু নেই, নোনা ধরা দেওয়ালে চুন হয়নি, বাইরেও প্লাস্টার হয়নি দীর্ঘকাল। এছাড়া সস্তায় বাড়ি মানে ত্রিশ টাকার মধ্যে খালি পড়ে থাকবেই বা কেন?

একটু দূরে দূরে খুঁজতে যাবে রাজেনের সে সময় হয় না। সায়ান্সে অনার্স নিয়ে পড়া, খাটুনি বেশী, তার ওপর বাধ্য হয়ে একটা টিউশানী ধরতে হয়েছে। নইলে কিছুতেই খরচ কুলানো যায় না। কলেজের মাইনে, মেসের খরচ, ট্রাম-বাস ভাড়া, এদের এখানের সংসার খরচা—পঞ্চাশ টাকা আয়ে চলে না। এটা পেয়ে বেঁচে গেছে বলতে গেলে। নিচের ক্লাসের ছাত্র, বেশী পরিশ্রম হয় না, কিন্তু রোজ যাওয়া আসা পড়ানোতে অন্তত দেড় ঘণ্টা পোনে দু'ঘণ্টা লেগে যায়। নিজের পড়াশুনোরই সময় পায় না—সকালে যা ঘণ্টা দুই। সব রবিবার মার খবর নিতেই যেতে পারে না, পড়ার চাপে। এর মধ্যে বাড়ি খুঁজতে যায় কখন, গোরু খোঁজা করে খুঁজতে গেলে যথেষ্ট সময় লাগে।

তবু পথের ধারে ইউরিনালে সাঁটা হাতে লেখা বিজ্ঞাপনগুলো লক্ষ্য করে, কাছাকাছি ঠিকানা দেখলে ওরই মধ্যে মরিবাঁচি করে যায়ও। তবে সেও সেই বৌবাজার, নেবুতলা, চাঁপাতলা, পটলডাঙ্গা—এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেখানে

যায় সেই একই ইতিহাস, সেসব বাড়িতে থাকা যায় না। ওরা অন্তত পারবে না।…

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের বামুনমাই এ পর্বকে ত্বরান্বিত করতে বাধ্য করলেন।

ওঁর শরীর বহুদিন ধরেই ভাঙছিল, এবার সাফ জবাব দিল। দু'বাড়ি যাওয়া আগেই বন্ধ করেছিলেন, একটা বাড়ি ছিল। সেও ব্রাহ্মণ বাড়ি, তারা খেতে দিত কাপড়ও দিত—দু'টাকা মাইনে দিত হাত খরচ বলে। সেখানে থাকার কথাও বলেছিল, বামুনদি পারেন নি। এদের মাল আগলাবার জন্যে রাত্রে নিজের ঘরে এসে শুতে হত।

একদিন ভোরে উঠে কাজে যেতে যেতে পথে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। রাস্তার লোক তুলে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে দেয়। জ্ঞান হতে ঠিকানা বলেন, রাজেনের মেসের নম্বর জানা ছিল না, তাই নিজের বাড়ির ঠিকানাই দিয়েছিলেন। পুলিশ এসে বাড়িওলাদের খবর দেয়, তারা দায়িত্ব এড়াতে খোঁজ করে করে ওঁর মনিব-বাড়িতে সে খবর পেঁছে দেন। তাঁরাই ছুটে গিয়ে নিয়ে এসে নিজেদের বাড়িতে তোলেন। তাদের একটি ছেলে প্রেসিডেন্সীতেই ফোর্থ ইয়ারে পড়ত, সে গিয়ে রাজেনকে খবরটা দিল।

রাজেন এসে ওঁকে মায়ের কাছেই নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু বামুনমা রাজী হলেন না। বললেন, 'তোদের ক্ষুদকুঁড়ো হোক যা-ই হোক, ওই তোদের যথাসর্বস্ব, ওখানে পাশের বৈঠকখানা ঘরে কেউ থাকে না, নিচের তলাটাই তো খালি পড়ে থাকে, আমার ঘর বাদে। বৈঠকখানায় একটা শুধু খিল ভরসা, সে তো খুন্তি দিয়েই খোলা যায়। যে কেউ এক মিনিটে ঘরে ঢুকে পড়তে পারে, তারপর ভেতর থেকে দোর বন্ধ করে সারা রাত ধরে তালা ভাঙলেও কেউ টের পাবে না। না, তুই আমাকে ওখানেই পেঁছে দে, যা হোক, পারি দুটো ভাত ফুটিয়ে নোব নাহয় চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো। এখন খরচাও দিতে হবে না, হাতে দশ বারো টাকা এখনও আছে। শুধু তুই উঠে-পড়ে লেগে বাড়ি খোঁজ, এসব সরিয়ে নিয়ে আমায় অব্যাহতি দে। তারপর তোরা পুষতে পারিস রাখিস —না হলে বোনের কাছে গিয়েই উঠব। ওরা গরিব, তবু শেষ বয়সে দুটো ভাত দিতে কাতর হবে না। মরার কালে মুখে একটু জলও দেবে। এমনি তো আমার বোন অতিথি ভিখিরী এলেই মুষ্টিভিক্ষে দেয় না, বসিয়ে পাতপেড়ে দুমুঠো ভাতই খাইয়ে দেয়—যা হোক বাগানের আনাজ কোনাজ কুড়িয়ে যা উপকরণ হয় তাই দিয়েই। আমাকে ফেলবে না।'…

এরপর পাঁচজনকে বলে, নিজে দুদিন কলেজ কামাই ক'রে ছুটোছুটি করা ছাড়া উপায় রইল না।

শেষে কলেজেরই এক দারোয়ান সন্ধান দিল, বালিগঞ্জ স্টেশনের পুব দিকে একটু দক্ষিণ পানে উজিয়ে গেলে একটা পাড়া মতো আছে, ভদ্দর লোকের পাড়া, ক'ঘর বামুন আর ঘোষ আছে, বেশ ভাল অবস্থা তাদের, সেখানে একটা বাড়ি খালি পেতে পারে।

আরও খবর পাওয়া গেল তার কাছেই। হিন্দুস্থানী দারোয়ানটি জাতে

আহীর, ও পাড়ায় তার ফুফেরা ভাইয়ের খাটাল আছে, সেখানে ও যায় প্রায়ই। নিজে দেখেছে সে বাড়ি। ছোট বাড়ি, তিনটে ছোট ঘর, টানা দালান একটা, মাটির রান্না ঘর। তবে তোলা উনুন থাকলে দালানেও রসুই করতে পারো। ভেতরে কল নেই, কুয়া আছে একটা, সামনেই রাস্তার কল, খাবার জল সেখান থেকে নিতে হবে। সামনে পিছনে একটু জমি, দুটো গাছপালাও আছে, এক ঝাড় কলা, একটা আমগাছ আর বোধহয় কাঠচাঁপা করবী এমনি দু-একটা ফুলের গাছ, তবে জঙ্গল নয়। বাড়িটার পোতা উঁচু, আলোবাতাস পাবে। আশপাশে সব ভদ্রলোকের বাস। বাড়িওলা বলেছেন দুবার মাসের ভাড়া হাতে পেলে কল আনিয়ে দেবেন।

আসল প্রশ্নটারও উত্তর মিলল, ভাড়া চল্লিশ টাকা।

ভাড়া শুনে মুখ শুকিয়ে যায় রাজেনের কিন্তু তখন আর উপায় কি? বাড়িওলার কাছে গিয়ে হাতে পায়ে ধরার মতো অনুরোধ করেও ছত্রিশ টাকা থেকে নামানো গেল না।

সেদিনই টিউশানীর মাইনে পেয়েছিল ত্রিশ টাকা, (এ টিউশানী কলেজের এক অধ্যাপক ওর অবস্থা দেখে ও শুনে দয়া ক'রে ক'রে দিয়েছিলেন তাই, বড় লোক ডাক্তারের বাড়ি—নইলে ক্লাস সিক্স-এর ছেলের পড়াবার জন্যে এ মাইনে তখন স্বপ্নেরও অতীত)—সেটাই অগ্রিম হিসেবে বাড়িওলাকে দিয়ে রসিদ নিয়ে চলে এল। কথা রইল আর ছ'টাকা দিয়ে চাবি নিয়ে যাবে।

এবার ওখানকার, বামুনদির ঘরের সংসার তুলে আনার পালা। সেও রীতি-মতো ব্যয়সাপেক্ষ। মাকে আনা মানে—ভাড়া চুকনো, দুধটুধ যা মাসকাবারী দেওয়া হয় তার দেনা শোধ, মুদির দোকানে কিছু পাওনা আছে কিনা কে জানে, গাড়ি ভাড়া, মুটে ভাড়া, ট্রেন ভাড়া—হাওড়া থেকে বালিগঞ্জ আসা, তাও রীতি-মতো প্রত্যন্ত প্রদেশ, এ-খানের সংসার পাতার প্রাথমিক খরচা—সত্তর পঁচাত্তরের কম নয়। বামুনমার ওখানকার মাল নিয়ে আসা, সেও আরও কোন না ত্রিশ।

কমপক্ষে একশটি টাকা। হাতে এক পয়সাও নেই। এখানের মেসের টাকাও শোধ হয়নি। টিউশানীর টাকা থেকেই শোধ করে, এটা আর কলেজের মাইনে—তা সে তো সব বাড়িওলার পাদপদ্মেই দিয়ে আসতে হল।

অগত্যা আবারও দ্রুত ক্ষীয়মাণ সেই মহামায়ার গোপন পুঁজিতে হাত পড়ে।

মহামায়া নিজে নন, বামুনমাই কাঠের সিন্দুক খুলে পাথরের বাসন সরিয়ে তলা থেকে ক্যাশবাক্স বার করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন।

'আর তো বলতে গেলে কিছুই রইল না। কি করে চালাবি রে তোরা! বিনুটা এখনও একটা পাস পর্যন্ত করল না।'

কলকাতা বা কাশীর মতো নয়, তবু এখানে এসে মহামায়ার মনে হল যেন আবার জীবন ফিরে পেলেন, অন্ধকূপে বন্ধ ছিলেন—বিনু মহাভারতের ভক্ত পাঠক, তার ভাষায় জরাসন্ধের কারাগার—সেখান থেকে মুক্তি পেলেন। সূর্যের মুখ দেখা যায়; গাছপালার স্নিগ্ধতা আছে, ছায়াঘন বনের বিভীষিকা নেই; রাস্তা সরু হলেও পাকা—গাড়ি ঘোড়াও যায় মধ্যে মধ্যে। দুটো-পাঁচটা মানুষের

মুখ দেখা যায় ঘরে বসেই।

সবচেয়ে রাজেন মেস ছেড়ে কাছে এল, বামুনদিকেও কাছে আনতে পারলেন—এইতেই শান্তি বেশী। তিনজনে তিন জায়গায়—দিন রাত এই দুজনের জন্যে চিন্তা—এতে যেন মহামায়ার শরীরও ভেঙ্গে যাচ্ছিল। কেবল পারুলকেই রেখে আসতে হল মণিকর্ণিকায়—ওঁদের পুরনো সংসারের গঠনের মধ্যে এই একটাই বড় শূন্যতা রয়ে গেল। প্রথম যেদিন বামুনদিকে নিয়ে এল রাজেন, সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়েই তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। এই শান্ত সহ্যশীলা মেয়েটি বামুনমার বড় প্রিয় ছিল। মহামায়া চিৎকার করে কাঁদলেন না তবে তাঁরও চোখের জলে বুকের কাপড়-জামা ভেসে গেল।

এইবার বড় প্রশ্ন বিনুকে স্কুলে দেওয়া।

বিনু যখন প্রথম এখানে আসে, তখন ওর আদৌ ইচ্ছা ছিল না কোন স্কুলে ভর্তি হয়। স্কুল-জীবন ওর শেষ হয়ে গেছে—গোরার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে—এইটেই ছিল মনের ভাব সেদিন। জীবনেই আর তার কোন ইচ্ছা, আশা, আনন্দ রইল না, সারা জীবনটাই অর্থহীন হয়ে গেল এই কথাই মনে হত বারবার। বা এইরকম ভাববার চেষ্টা করত। এখন ভাবে অল্প বয়সে অনেক উপন্যাস পড়ারই ফল এটা—এইরকম ভাবতে শেখা, এই ধরনের একটা কৃত্রিম ভাবাবেগ সৃষ্টি করা মনের মধ্যে।

কিন্তু এখন, এই দীর্ঘকাল ধরে বসে থেকে, মার ফাইফরমাশ খাটায় কতকটা দিদির স্থলাভিষিক্ত হয়ে—তার অরুচি ধরে গেছে। ঐ অজ পাড়াগাঁয়েও যার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হত, সেই প্রশ্ন করত 'কোন ক্লাসে পড়ো' নয় তো 'কোন ইস্কুলে পড়ো'—তারপরই বিস্ময় প্রকাশ, 'ওমা, এত বড় ছেলেকে ইস্কুলে দাওনি। ঘরে বসিয়ে রেখেছ। এতে বাপু ছেলেপিলে নষ্ট হয়ে যায়। যেখানে হোক একটা ইস্কুল-পাঠশালায় ঢুকিয়ে দিলে পারতে। তারপর অন্যত্তর যেতে—সেখেনে আবার সেখেনকার স্কুলে ভর্তি হত!'

অবিরাম ঐসব মন্তব্যে রাগ হত, লজ্জাও হত। শেষের দিকে দোকান বাজারে যেত অনেক দেরি করে—যখন সব ফাঁকা হয়ে যায়, ভদ্রলোকের ভীড় বেশী থাকে না।

তাই এবার যখন স্কুলে ভর্তি করার কথা উঠল, বিনু রীতিমতো একটা উত্তেজনা বোধ করল, একটা ঔৎসুক্যও। না, বন্ধুত্ব আর কারও সঙ্গে হবে না এটা ঠিক, বন্ধুত্ব মানুষের একবারই হয় জীবনে। একজনের সঙ্গে—সে বন্ধু তার হারিয়ে গেল বোধহয় চিরদিনের মতোই—তা হোক, তবু বিনা মাইনে সংসারের চাকরি থেকে তো অব্যাহতি পাবে খানিকটা। ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারবে তো।

এই নৈষ্কর্ম্যই ওকে বিষম পীড়িত করছিল আসলে। ওখানে দিন আর কাটতে চাইত না। তার চেয়েও ভয়াবহ ছিল রাত। সন্ধ্যা থেকেই চারিদিক অন্ধকার, ঘন কালো ছায়ার মধ্যে যেন অশরীরী কাদের আনাগোনা। বাড়ির পিছনে পগারধারে মনে হত রাজ্যের চোর ডাকাত ঘাপটি মেরে আছে। আর শিয়াল

ডাকা। সত্যি সত্যিই এক-একদিন শিয়ালরা দল বেঁধে ওদের উঠোনে ঢুকে পড়ত। প্রথম বোঝেনি, বলেছিল, 'দ্যাখো দ্যাখো মা কী সুন্দর জন্তুগুলো। এদের কি বলে?' মাও চেনেন নি, বাড়িওলার বৌ হেসেই খুন, 'ওমা, তুমিও দিদি শেয়াল চেনো না।' তারপর থেকে আতংকে আর ঘরের বার হত না রাতে।

কাজে থাকতে পারলেও তবু হত। কাজ বলতে সংসারের কাজ, সে আর কতটুকুই বা! দুটো লোকের সংসার, একবেলা রান্না। মা সকালেই ওর মতো চার-পাঁচখানা রুটি করে রাখতেন, রবিবার হলে ঐ সঙ্গেই দুখানা পরোটা। রাজেন এসে খাবে। রাজেন সকালে থাকত না, রবিবার কাপড়জামায় সাবান দেওয়া আছে, পড়া আছে। রাত্রেও থাকত না, সকালের পড়া নষ্ট হবে বলে।

কাজ বলতে কিছু নেই, সামান্য যা বাজার-দোকান করা এক-আধবার। বইও নেই যে পড়ে। খুব ইচ্ছে করত যেটা—ছবি আঁকতে। এদিকে একটা ঝোঁক ছিলই,—শেলেটে ছবি আঁকতো আগে, শক্তি আছে কিনা সে কথা তেমন কখনও ভাবেনি। কাশীতে ওদের হাতে লেখা পত্রিকার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস এসেছে। আত্মসচেতনতাও।

কিন্তু আঁকার সরঞ্জাম কৈ? তার এ উদ্ভট শখের খরচা কে যোগাবে? মাকে একবার বলতে গিছল, তিনি ধমক দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, তা আর নয়, বলে পেটে খেতে ভাত জোটে না, মাথায় ফুলেল তেল। লেখাপড়া কর না, তা করলে তো পারিস। দাদা তো বই খাতা এনে দিয়েছে। অংক কষ না বসে বসে, সেটা তো পারিস। তা নয়, উনি এখন ছবি আঁকবেন। ভারী আমার রবি বর্মা এলেন রে!'

সেদিন বিনুর চোখে জল এসে গিছল। মা একবার দেখতেও চাইলেন না, সত্যি ওর কোন ক্ষমতা আছে কিনা।

তবু ও গোপনে অংক কষার খাতায় ছবি আঁকতো। কাগজ পেন্সিলে যতটা হয়। খাতার মধ্যে দুটো পাতার দুদিকে আঁকা হলে পাতা দুটো আস্তে আস্তে ছিঁড়ে নিয়ে গুটিয়ে ফেলে দিত। জানালা দিয়ে যা দেখা যায়—গাছপালা, বাঁশঝাড়, পুকুর, গোরু-বাছুর, এমনকি মানুষ পর্যন্ত। এঁকে দূরে ধরে দেখত সেগুলো আসলের মতো হয়েছে কিনা। মানুষ হত না—গাছপালা হত। তবে তাতে মন ভরত না। সরু কলম, তুলি আর চীনে কালি—কতই বা দাম। রং না হয় নাই জুটল। একরঙা ছবিই যদি ঠিকমতো আঁকতে পারত।

স্কুলে যাবার কথায় তার আরও উৎসাহ এই জন্যেই। ড্রয়িং ক্লাস একটা নিশ্চয়ই আছে, সেখানে অন্তত সে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারবে। তাছাড়া দেখেছে ওপরের ক্লাসে দাদাকে জিওগ্রাফীর খাতায় ম্যাপ এঁকে তাতে রং দিতে। ছ'আনা দিয়ে সেজন্য কলার বক্সও কেনা হয়েছিল। এখানেও জিওগ্রাফী পড়ানো হবে নিশ্চয়, তখন দেখবে ও, মা কেমন না বলতে পারেন!

তবু একটু ভয়ে ভয়েই গিছল প্রথম দিন। এখানকার মাস্টারমশাইরা না জানি কেমন হবেন। এখানে আবার মাষ্টারমশাই বলে ডাকা চলে না নাকি, স্যার বলতে হয়। খুব কড়া হবেন কি? কলকাতার হালচাল আলাদা—অন্তত এখন যা দেখছে। সে একটু 'অন্য রকম'; ঠিক খাপ খাওয়াতে পারে না, সাধারণ ছাত্রের

সঙ্গে মিশতে পারে না—সহপাঠীরাই বা কি ভাবে নেবে কে জানে। হয়ত পড়াও ওখানের মতো নয়, শুনেছে সে এখানে মানের বই কিনে বাড়িতে পড়া মুখস্থ করতে হয়। ও আবার—ঐভাবে মুখস্থ করতে একেবারেই পারে না। হয়ত পদে-পদেই বকুনি খেতে হবে।

কিন্তু ইস্কুলে গিয়ে ওর প্রথম ভয়টা কেটে গেল হেডমাস্টার নিশীথবাবুকে দেখে। ভারী অমায়িক লোক। মুখে খুব বড় ঝোড়া গোঁফ আর গলার আওয়াজ ভারী হলেও আসলে ভাল মানুষ। বেশ মিষ্টি ক'রেই কথা বললেন। দাদার ইঙ্গিতে বিনু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে মাথায় হাত রেখে সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন, 'কল্যাণ হোক' বলে। তারপর দু-একটা প্রশ্ন করলেন লেখাপড়া সম্বন্ধে। নিতান্তই সহজ প্রশ্ন। একটু ইংরিজী লিখতে বললেন।

ওঁর ব্যবহারে বিনুর ভয় ভেঙ্গে গিছল, সে প্রশ্নগুলোর যথাসাধ্য উত্তর দিল, ওর বিশ্বাস ঠিক ঠিকই হয়েছে—তবে ইংরেজী লেখার অভ্যেস নেই, সেটা ভাল হল না। যথেষ্ট ভুল রইল, সে সম্বন্ধে ও নিজেই সচেতন। লেখাপড়ার চর্চাই নেই বলতে গেলে এতকাল, তাছাড়া ওখানে ওদের ক্লাসে ইংরেজী প্রবন্ধ লেখার প্রশ্নই ছিল না। ভয় পেয়েও গিয়েছিল একটু, লেখার আগেই ঘেমে উঠেছিল।

কিন্তু নিশীথবাবু ভাল করে না দেখেই বললেন, 'বাঃ ভালই হয়েছে।'

আজ বোঝে বিনু যে এ পরীক্ষাটা নিতান্তই নিয়মরক্ষা। ওখান থেকে আসার সময় ট্রানসফার সার্টিফিকেট আনা হয়নি তাড়াতাড়িতে, এই প্রথম স্কুলে ভর্তি হয়েছে বলে নেওয়া হয়েছিল।

নিশীথবাবু ওকে একেবারেই থার্ড ক্লাসে ভর্তি ক'রে নিলেন। বললেন, 'বয়স বেশী হয়ে গেছে, একটা বছরও তো বলতে গেলে নষ্ট হল। থার্ড ক্লাসেই ভর্তি হোক, ছেলে তো বোকা নয় বলেই মনে হচ্ছে, একটু খেটে ম্যানেজ করে নেবে'খন।'

তারপর থার্ড ক্লাসের মনিটারকে ডেকে বললেন, 'একে নিয়ে যাও সঙ্গে করে, তোমাদের ক্লাসে ভর্তি হল। কাশীতে পড়ত, তোমাদের থেকে অ্যাডভান্সড। ফার্স্ট বেঞ্চে বসতে দেবে।'···

কী দেখেছিলেন ওর মধ্যে নিশীথবাবু কে জানে, আজও সে কথা মনে হলে কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে যায় বিনুর। শুধু এই একবারই নয়, চিরজীবনই সে নিশীথবাবুর কাছে স্নেহ ও সাহায্য পেয়েছে।······

মনিটার যেটি এল—বেঁটে রোগা একটি ছেলে, চোখে পুরু চশমা, দেহের অনুপাতে মাথায় চুলের বোঝা অনেক বড়, ঢেউ খেলানো বাহারী চুল—একবার তাচ্ছিল্যভরে ওর দিকে তাকিয়ে চুলটা অকারণেই একটু ঠিক করার চেষ্টা ক'রে বেরিয়ে গেল। নিশীথবাবু বললেন, 'যাও ওর সঙ্গে, ক্লাসে বসো গে। বই নেই, তাতে কি হয়েছে—পড়া শুনতে তো বাধা নেই। কেমন পড়ানো হয় এখানে দ্যাখো, বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করো টিফিনের সময়। খাতা তো আছে, মাস্টার-মশাইরা কিছু লিখিয়ে দেন তাও লিখে নিও।'

মনিটার ছেলেটির নাম মদন। সেই নাকি ফার্স্ট বয়, সে কথাও নিশীথবাবু বলে দিলেন। সে একবার মাত্র আড়ে দেখে নিল বিনু আসছে কিনা, কোন কথা

বলল না। তার পিছু পিছু গিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় উঠে পাশ দিয়ে গিয়ে একটা বারান্দা পার হয়ে পিছনের দিকে একটা ঘরে পেঁছিল, সেইটেই নাকি থার্ড ক্লাস, ওদের ওখানের ক্লাস এইট।

ক্লাসে গুটি পঞ্চাশেক ছেলে, হঠাৎ মদনের পিছনে একটা নতুন ছেলেকে ঢুকতে দেখে সবাই একটু অবাক হয়ে তাকাল, যে মাস্টারমশাই পড়াচ্ছিলেন তিনিও। তার মধ্যেই মদন মনিটারোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, 'এ ছেলেটি আমাদের ক্লাসে আজ ভর্তি হয়েছে স্যার, হেড স্যার বলে দিয়েছেন ওকে ফার্স্ট বেঞ্চে বসাতে।...তোমাদের একজন পাশের বেঞ্চিতে চলে যাও, ওখানে তো একজন আজ কম আছে দেখছি—ঠিক হয়ে যাবে।'

পাঁচজন বসে একটা বেঞ্চিতে, চোখ বুলিয়ে নিল বিনু, কাশীর মত তিনজন ক'রে নয়, বড় বেঞ্চি—তার শেষ প্রান্তে যে বসেছিল সে-ই অগত্যা অন্ধকার মুখ ক'রে পাশের বেঞ্চে চলে গেল। ওকে বলল মদন, 'এসো, এর মধ্যে যেখানে হোক বসে পড়ো।'

চারটি ছেলে রইল—মদন তার মধ্যে একজন, তার প্রথম হওয়ার গৌরবে বেঞ্চির প্রথম স্থান তার প্রাপ্য—বাকী তিনজনের মধ্যে একটি কাল মত ছেলে, অলোক নাম, তার পাশে যে ঢ্যাঙ্গা, ফর্সা বড় বড় চোখ বরং একটু বেশীই বড় মনে হয়—শান্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসেছিল, বয়স এদের তুলনায় একটু বেশীই হবে, কারণ এখনই বেশ ঘন গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে—হঠাৎ সে বিনুর মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসল। অল্প মিষ্টি হাসি।

বিনুর মনে হল সে ওকে কী এক অমোঘ আকর্ষণে টানল—ঐ চাহনি আর হাসিতে—সে কতকটা আবিষ্টের মতো গিয়ে তার পাশেই বসল, এদিকের একটি ছেলেকে সরিয়ে দিয়ে।...

সেটা অংকের ক্লাস, প্রসন্নবাবু মাস্টারমশাই ঈষৎ এক রকমের কৌতুকভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে একটা ছদ্ম গাম্ভীর্যে প্রশ্ন করলেন, 'কি হে ছোকরা? কোথাকার ফেরৎ? কাশী থেকে এসেছ? কেন, তারা তাড়িয়ে দিলে! কোন ইস্কুলে পড়তে? য়্যাংলো বেঙ্গলী? জানি, চিন্তাহরণবাবু হেডমাস্টার। তা কি করেছিলে? তাড়ালেন কেন? তিনি তো ভাল লোক। অ, তিনি তাড়ান নি। তাহলে কালভৈরব তাড়া করলেন বল নাদনা নিয়ে। তাই আমাদের জ্বালাতে এলে!'

তারপর সাধারণভাবে ছাত্রদের দিকে চেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ গো, তোমরা জান না, কালভৈরব হলেন বিশ্বনাথের কোতোয়াল, মানে কোটাল, এখন যাকে পুলিশ কমিশনার বলে—বিশ্বনাথই কাশীর অধিপতি, রাজা, উনি, তার হয়ে শাসন করেন। কালভৈরব যার ওপর রাগ করবেন তাঁর আর কাশীতে থাকার উপায় নেই।...তা বেশ, এয়েছ, থাকো। ওখানে তো বোধহয় কিছুই শেখায় নি আঁকটাঁক—একটু মন দিয়ে পড় এবার, বোঝার চেষ্টা করো।'

বিনু আর থাকতে পারল না, বোধহয় প্রসন্নবাবুর বলার ভঙ্গীতে ভয়ও ভেঙ্গে-ছিল, বলে উঠল 'না, মাস্টারমশাই, সেখানে কমলেশবাবু আমাদের অংক দেখতেন। খুব ভাল পড়ান।'

'ও তাই নাকি!' তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুর গলায় কিন্তু চোখে প্রসন্নতা, বললেন, 'বা, বুলিও তো বেশ জান দেখছি। আসতে না আসতেই কপচাতে শুরু করলে যে!'

তারপর বিনুর মুখে ভয়ের আভাস দেখে অভয়ের সুরে বললেন, 'না, ভাল ভাল। শিক্ষকের প্রশংসা করছ সাহস করে ভরসা করে—তাঁর নিন্দের প্রতিবাদ করেছ এ তো সদ্‌গুণ। বসো বসো।...'

এইবার পাশের সেই শান্ত ছেলেটি আর একটু হেসে প্রশ্ন করল, 'তোমার নাম কি ভাই?'

বিনু বিনা কারণেই কেমন যেন লজ্জিতভাবে উত্তর দিল 'ইন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়।'

'ভালই হয়েছে। এখানে এ নামে কেউ নেই। আমার নামে কিন্তু এই ইস্কুলে অনেক আছে। সেকেন্ড ক্লাসে দুজন।'

'কী তোমার নাম?'

'ললিত। ললিত লাহিড়ী। আমরাও ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র শ্রেণীর।'

॥ ২২ ॥

বামুন মা মরণাপন্ন হয়েছিলেন সেটা সত্যিই। কিন্তু এখন দেখা গেল তাঁর ব্যাধি ততটা দৈহিক নয় যতটা মানসিক। এখানে এসে নতুন পরিবেশে, এদের যত্নে আর পূর্ণ বিশ্রামে একটু একটু ক'রে সেরেই উঠলেন। তাছাড়া এদের সঙ্গটাও অনেকখানি কাজ করল। এই তিনটে ছেলেমেয়েকে জন্মাতে দেখেছেন, বলতে গেলে গু-মুত পরিষ্কার করে মানুষ করেছেন। নিজের ছেলেমেয়ে হয় নি, বাল্য-বিধবা, এদের নেড়েচেড়ে এদের সঙ্গে বকে-ঝকে সংসার করার তৃষ্ণা কিছুটা মিটিয়ে ছিলেন, এরাই ছেলে-মেয়ে হয়ে গিছল। আজও সে ভাবটা যায় নি, এখনও একটু ফাঁকা পেলে বসে পারুলের জন্যে কাঁদেন।

বামুন দি অবশ্য বলেন, তা নয়। শরীর সারবে না কেন বল, দিব্যি বাড়া ভাতে আছি! এ তো সেই ন'বছর বয়সের পর আর অদেষ্টে জোটে নি।...ঐ বয়সেই দুবেলা ভাত খাওয়া ঘুচল, তাতে কিন্তু হাঁড়ি ঠেলা বন্ধ হয় নি। শ্বশুর-বাড়ি হাঁড়ি-হেঁশেল ঐ বয়েসেই আমার ঘাড়ে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল শাশুড়ী। কী সমাচার, না কাজেকম্মে না রাখলে খারাপ দিকে মন যাবে, চরিত্তির রাখতে পারব না। শাশুড়ী আমার সামনে বসে রাত্তির বেলা এক কাঁসি ভাত খেত আর গলায় কান্না কান্না সুর এনে বলত, "আ রে। এই বয়েসে খাওয়া-পরা ঘোচালি মা, এত বড় রাতটা—এই জোয়ান বয়েস—কাটে কি করে। কথাতেই আছে রাত উপোসী হাতী পড়ে। ঐ মুড়িই চাট্টি বেশী করে খাস—একটা নারকেল নাড়ুও বরং নিস!" মুড়কী-মুখী কম! ন'বছর বয়েস নাকি জোয়ান বয়েস। তখন থেকেই একাদশী করাত। আমিও ছিলুম তেমনি, ইদিক-ওদিক দেখে যা পেতুম মুখে পুরতুম। ঠাকুরের বাতাসা, ডাল, বেগুন ভাজা—যা সুবিধে হত। নিদেন এক খাবলা গুড়ই সই। তবে গুড় খাওয়ার বড় ঝঞ্ঝাট, মুখের চটচটানি যেতে

চায় না। সহজে যা পাওয়া যেত—তাই খেয়েছি—তবে মাছ মাংস খাই নি কখনও, মানে এমনিই খাই নি। পিরবিত্তিও হয় নি। জ্ঞান হবার পর আর খাই নি তো। সোয়াদই মনে পড়ে না—তার লোভ হবে কেন?

ভাল হয়ে ওঠেন—কিন্তু যত সুস্থ হন তত যেন সংকোচ বোধ করেন। অত দাপট ছিল এককালে—এখন যেন বেশ একটু নিনু হয়ে থাকেন। এদের অর্থাভাব যে কতখানি তা তো তিনি চোখেই দেখছেন। বড় খোকার লোকালয়ে বেরোবার পোশাক বলতে একখানি ধুতি আর একটি পাঞ্জাবিতে এসে ঠেকেছে। সাবান দিয়ে কেচে কেচে চালাতে হয়। রবিবার খুব ভোরে উঠে সাবান দেয়—যতক্ষণ না শুকোয় কোথাও যেতে পারে না, বর্ষার দিন উনুনের ওপর উঁচু করে ধরে ধরে শুকোয়। বিছানার চাদর নেই, মহামায়ার আগেকার ফরাসডাঙ্গা শান্তিপুরের শাড়ি মাঝে কেটে লম্বালম্বিভাবে জোড়া দিয়ে পাতা হয়। এখানে আসার পরই খুন্তি দিয়ে খিল খুলে চোর গোছা-ভর্তি বাসন আর কাপড়-জামা যা বাইরে ছিল নিয়ে গেছে—তাতেই আরও এত টান। খাগড়াই বাসন সব, এ দুর্দিনে বেচে দিলেও কাজ হত।

এত টানাটানি অভাবের মধ্যে আবার একটা পেট বাড়ল, এইটেই ভাবেন বামুন-দি। শুধু পেটই বা কেন, খাওয়া-পরা ওষুধ—সবই তো চাই। পরনের থান ছিঁড়লে তাও কিনে দিতে হবে এদেরই। এর ভেতরেই দিতে হত—পুজোর সময় বোনপো এসে একখানা দিয়ে গেছে তাই রক্ষা। পুজো উপলক্ষেই পুরোন মনিব বাড়ি গিছলেন একদিন—তারাও চারটে টাকা আর একখানা কাপড় দিয়েছেন। তবে তাতে আর কতটুকু হয়—বামুনদির নিজেরই ভাষায় 'সমুদ্দুরে পাদ্য অর্ঘ্য।'

একদিন অনেক ইতস্তত করে মহামায়ার কাছে তুলেও ছিলেন কথাটা, 'পাড়ার জগন্নাথ ঘোষের বাড়ি কাজ আছে, রাঁধুনী চায় ওরা। এখন তো একটু যাহোক সেরে উঠেছি—কাজটা ধরি না?'

মহামায়া দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন, 'না না, ছিঃ! লোকে কি মনে করবে। তুমি আমাদের আত্মীয়, এই কথাই সবাই জানে।...আর অত ভাবছই বা কেন, আমাদের যদি এক বেলা একমুঠো জোটে, তোমারও জুটবে। আমরা যদি উপোস করি—তুমিও না হয় করবে। দেখি না, ডুবেছি না ডুবতে আছি। পাতাল কহাত জল।'

আর কিছু বলেন নি বামুনদি সাহস করে, এ প্রসঙ্গই তোলেন নি। তবে ভেবে ভেবে আর একটা উপার্জনের পথ বার করে নিয়েছিলেন। এককালে ক্রুশ বোনার হাত খুব ভাল ছিল ওঁর, এখন সেটাই একটু কাজে লেগে গেল। পাশের বাড়িতে যাঁরা ভাড়া ছিলেন তাঁরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। এলেন যাঁদের বাড়ি তাঁরাই। আগেকার ভদ্রলোকরা সকলেই ছাপোষা, সামান্য উপার্জনের জন্যে উদয়-অস্ত খাটতে হত—আলাপ-পরিচয় বিশেষ করবার সুযোগ পেতেন না—বাড়িওলারা, বাড়িউলী বলাই উচিত, এখানে আসার দু-একদিন পরেই যেচে সেধে আলাপ করতে এলেন।

প্রভাবতী মহামায়া এই আকস্মিক উৎপাতে মোটেই খুশী হন নি। তাঁকে দিনরাত খাটতে হয়, তাছাড়া বাড়ি-ঘরের চেহারা—তাঁর ভাবার শ্রীর—ভাল না, আতিথ্য করার অবস্থা বা দৈহিক শক্তি কোনটাই তাঁর নেই। কেউ এলে তাই বিরক্ত হতেন, একটু বিরক্তও। কিন্তু এই মহিলা দুজন—মা আর মেয়ের পরিচয় পেয়ে ও কথাবার্তা শুনে সে ভাবটা আর রইল না। এরা—বাড়িখানা থাকা সত্ত্বেও প্রায় তাঁর মতই দুঃখী। মা যিনি, তাঁর স্বামী বড় সরকারী চাকরি করতেন—দিল্লি-সিমলে—অর্থাৎ বড় দরের চাকরিই—একটি মাত্র মেয়ে তাঁদের, সুখে-স্বচ্ছন্দেই দিন কাটত—বেয়ারা আর্দালি ঝি রেখে। মেয়ের বিয়েও দিয়েছিলেন ভাল পাত্রের সঙ্গে, ঐ আপিসেরই একটি সুদর্শন ছেলে, যা কাজ করে তাতে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, দেখেই দিয়েছিলেন।

অকস্মাৎ এঁদের ওপর বিধাতার বিরূপতা নেমে এল।

ভদ্রমহিলার স্বামী, উনি চৌধুরী মশাই বলেই উল্লেখ করলেন, পেন্সন নেবার এক মাসের মধ্যেই হঠাৎ একদিন হার্টফেল ক'রে মারা গেলেন। তখনও পেন্সন হয় নি, তার আগের ছুটি চলছিল। এক পয়সাও তাই পেলেন না, তখন সরকারী চাকরিতে অন্য কোন পথও ছিল না, বেঁচে থেকে পেন্সন ভোগ করতে পারো কর, নইলে ঐ পর্যন্তই।

তবু জামাই ছিল, তারও বিশেষ কেউ ছিল না, নিজের ছেলের মতো থাকত সে ওঁর কাছে। ছ মাস যেতে না যেতে তাকে কাল ব্যাধিতে ধরল, যক্ষ্মা রোগ। তখন এ রোগের কোন চিকিৎসা ছিল না। তবু যতটা পারলেন, ওঁদের যতটা সাধ্য বা সাধ্যের অতীত, করলেন ওঁরা। বড় ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা, ভাল খাওয়া, কসৌলীতে পাঠানো—কোনটারই ত্রুটি হয় নি। শেষ পর্যন্ত যমুনার ধারে একটা নির্জন বাড়ি ভাড়া ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন—মুক্ত নির্মল হাওয়া পাবে বলে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সেও মারা গেল এদেরও প্রায় মেরে রেখে গেল। ধনে-প্রাণে মারা যাকে বলে।

ভদ্রমহিলার স্বামী চৌধুরীমশাই একটু রাজকীয়ভাবে থাকতে ভালবাসতেন, ফলে আয়ের বেশী ব্যয় ছিল চিরকাল—নগদ টাকা প্রায় কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। তখন জীবনবীমারও এত চল ছিল না। এক যা কয়েকটা গহনা ছিল, মহিলার, সেগুলো এবং মেয়েরও প্রায় সব গহনা এই চিকিৎসায় চলে গেছে। একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে এখানে ফিরে এসেছেন দুজনে।

দুজন বলাও ভুল। দুটি নাতনী, ওঁরা দুজন—মোট চারটি প্রাণী। তার ওপর যাকে বলে প্রমীলার সংসার। আশু কেউ কিছু উপার্জন করবে সে সম্ভাবনাও নেই। যেটুকু ওঁদের আয়ত্তের মধ্যে সেটুকু করেছেন, ওপরে নিজেরা থেকে নিচেটা ভাড়ার ব্যবস্থা করেছেন, হয়ত কুড়ি টাকার মতো ভাড়া পাবেন। তবে তাতে যে চলবে না এও জানেন। সেই চলারই আর একটা ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছেন ইতিমধ্যেই। ওঁর এক পরিচিত মহিলা, ওঁদের আগেকার পাড়ার এক মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী এই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন আগেই, এতেই ছেলেদের পড়াচ্ছেন তিনি। তিনিই এই সন্ধান দিয়েছেন। আজকাল এক ক্যারম খেলা উঠেছে, একটা চারকোণা কাঠের টেবিল বোর্ড—তার চার কোণে 'চারটে গর্ত'।

তাতেই কতকগুলো কাঠের চাক্‌তি ফেলতে হয়—অবশ্য তার নিয়মকানুনও যথেষ্ট—সেই গর্তের তলায় ক্রুশে বোনা জালের থলি আছে, এঁরা বলেন পকেট, সেই পকেট ক্যারমওলারা মেয়েদের বুনতে দেয়। তারা সুতো দিয়ে যায়—আবার বোনা শেষ হলে বুঝে নিয়ে যায়, বোনার জন্যে চার আনা ছ আনা পকেট প্রতি মজুরী দেয়। নানান সুতোয় শৌখিন প্যাটার্ন তুলে বুনতে হয়—সেই বুঝে মজুরীও, কোনটা চার আনা হিসেবে কোনটা পাঁচ আনা। খুব বেশী খাটুনি হলে ছ আনা। সাধারণ সাদামাটা কাজ হলে দু আনা তিন আনা। তা হয়, আয় খুব খারাপ হয় না। জোরে হাত চালালে এক এক দিনে—সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকেও তিন চারটে পর্যন্ত হয়ে যায়। বেশী পয়সার দরকার থাকলে তুমি রাত জেগে কাজ করতে পারো—মজুরী বেশী পাবে।

ওঁর কাছ থেকে এই কাজটাই বুঝে নিয়েছেন বিনুর বামুন মা। বহুদিনের অনভ্যাস, তাও আগে যা করেছেন—খুঞ্চেপোশ এক আধখানা, কিম্বা পেটিকোটের লেস—সামান্য কাজ, অনেকদিন ধরে একটু একটু ক'রে করেছেন। এখন ভুলেই গেছেন প্রায়, আঙুল চলে না। তবু ধৈর্যসহকারে তাই করছেন। তবু তো বড় খোকার এক জোড়া জুতো হয়।

মহামায়াও জানেন, দেখছেন কিন্তু আর কিছু বলেন নি। এতে আয় যেমন সামান্য তেমনি মেহনতও। এতেই যদি ওঁর আত্মসম্মান কিছুটা বাঁচে—বাধা দিয়ে লাভ নেই।

বামুন মা এখানে এসে নবজন্ম যতটা পেলেন—তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে বিনু পেল অনেক বেশী।

বাড়িতে ওর গল্প করার কেউ ছিল না এতদিন, কাশী গিয়ে পর্যন্ত; মানে ওর বকুনি শোনার এবং নানান ধরনের গল্প বলার। এই বস্তুটির সঙ্গে ওর বাল্যজীবনের যা কিছু মধুময় স্মৃতি জড়িয়ে আছে। গল্প জানতেনও বামুনমা অনেক। কতক বা লোক-মুখে শোনা, কিছু বা বইতে পড়া, পৌরাণিক গল্পই বেশী। উনি কখনও একই গল্প একভাবে বলতেন না, রং চড়ানো বা রং বদলানোতে ওঁর একটা সহজাত দক্ষতা ছিল। কিছু হয়ত রঙচড়ানোই শুনেছেন উনি বাল্যকালে, কথকদের কাছে, তার ওপরও হয়ত নিজে রং চড়িয়ে নিতেন—বলার সময়ে যা যেমন মনে আসত।

রাজেন এসব শুনত না বিশেষ, কেননা তার বাইরে খেলাধুলো ছিল, বন্ধুবান্ধবও। পারুল আর বিনুই ছিল ওঁর দুই মুগ্ধ শ্রোতা। একই গল্প বারবার শুনেও পুরনো হত না—তার কারণ বলার ভঙ্গী ও ঘটনার তথ্য-বিন্যাসে প্রতিবারই কিছু নূতনত্ব থাকত। পৌরাণিক ছাড়াও—যাত্রার মারফৎ প্রধানত, কতক বা মহামায়ার আলমারীভরা নাটকের বই পড়ে—অনেক ঐতিহাসিক গল্পও জানতেন তিনি। তাও নিজের মনের রসে জারিয়ে নিজের বিশেষ ভঙ্গিতে বলার দরুন খুব ভাল লাগত ওদের।

বরং বিনুর এইগুলোই বেশী ভাল লাগত। এর মধ্যে তার কল্পনার দিগন্ত বিস্তৃততর হবার সুযোগ মিলত, ঐসব বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীর পৃষ্ঠপটে তার এক

বিশেষ বা বিশিষ্টতম চরিত্র হিসেবে নিজেকে ভাববার চেষ্টা করত সে। এর ভেতর পৃথ্বীরাজ বা ছত্রপতি শিবাজীই ছিল তার সর্বাধিক প্রিয়। এদের যেসব অসম্ভব অসম্ভব কৃতিত্বের বিবরণ বামুনদি বা ঐতিহাসিকদের জানা নেই—তাঁরা কেউ বলেন নি কি লিপিবদ্ধ করেন নি—সেসব ঘটনা ওর মনের মধ্যে নিত্য ঘটত। নিত্য নব নব ইতিহাসের সৃষ্টি হত ওর মনে।

আরও আশ্চর্য এই, এসব সে নিজেও ইতিমধ্যে পড়েছে অনেক। বামুনদি যা পড়েছেন তার চার গুণ বই পড়া হয়ে গেছে ওর—তবু বামুন মার মুখেও শুনতে ইচ্ছে করত। বোধহয় সেটা তাঁর কথকতার গুণ।

তাই এখানে এসে দিনকতক পরে, বামুন মা একটু সুস্থ হয়ে ওঠার পরই একদিন—কী একটা ছুটির দিন সেটা—বিকেলবেলা তাঁকে চেপে ধরল, 'অনেকদিন গল্প শুনি নি তোমার বামুন মা, আজ একটা ভাল দেখে গল্প বলো দিকি !'

বামুন মা অবাক।

'যাঃ ! বুড়ো ছেলে, ইস্কুলে পড়ছে—এখন কচি খোকার মতো গল্প শুনবে !'

'ওমা, ইস্কুলে বুঝি গল্প বলে কেউ ! মাস্টারমশাইরা যা পড়ান সেসব তো শক্ত পড়া। ভূগোল অংক সংস্কৃত—রাজ্যের বাজে পড়া। সাহিত্যের বই যা পড়ানো হয় তাও পড়াবার সময় ওঁরা দেখেন কি কোশ্চেন পড়তে পারে—আর তার কি উত্তর লিখব আমরা। সে ভাল লাগে না, তুমি গল্প বলো।'

'কেন, ইদিকে তো বই পড়ার বিরাম নেই, এত তো বই পড়িস গাদা গাদা, তাতে গল্প নেই ?'

'তাতে কি আর তোমার মুখে গল্প শোনার মজা পাওয়া যায়। এ আলাদা ব্যাপার।···বলো না, বাবারে বাবা, একটা গল্প বলবে তার আবার এত খোশামোদ।'

খুশী হন বামুনদি। মনে ক'রে ক'রে স্মৃতির প্রত্যন্ত কোণ হাতড়ে পুরনো গল্পের ঝুলি খুলে বসেন।

বহু পুরাতন বহুশ্রুত কাহিনী সেসব। বামুনদিরও কথকতার সে ধার ক্ষয়ে গেছে। তবু বিনুর ভাল লাগে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় বলেই কি ? সেদিনের সে আনন্দর স্মৃতিই আজকের এই গল্পের দোষত্রুটি ঢেকে দেয় ?

এর মধ্যে একদিন কালবৈশাখীর শিল কুড়োতে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগে বামুনদির জ্বর হল। উনি বললেন, 'না না, জ্বর নয়। একটু জ্বর-ভাব।'

কিন্তু মহামায়া গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন গা পুড়ে যাচ্ছে। জোর ক'রে শুইয়ে রাখলেন। ডাক্তার ডাকবার কথাও বলেছিলেন রাজেনকে—বামুন মা খুব রাগারাগি চেঁচামেচি করাতে ততদূর যাওয়া গেল না। বামুন মার ভাষায় 'এ কি আবার একটা জ্বর নাকি ! এ কি আমার সান্নিপাতিক ধরেছে, না পালাজ্বর ম্যালেরিয়া ! ডাক্তার ডাকছে ! আর অত আদিখ্যেতায় কাজ নেই।'

ডাক্তার ডাকা গেল না, তবে পাশের বাড়ির চৌধুরী গিন্নী হোমিওপ্যাথী ওষুধ রাখেন দুচারটে, তিনিই কি দুটো পুরিয়া দিয়ে গেলেন, বললেন; 'বুড়ো মানুষের অমন একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে, জ্বরও হয়। ভয়ের কিছু নেই।

শুকনো-শাকনা খাইয়ে রাখুন, তাতেই ভাল হয়ে যাবে।'

ভাল হলেন কিন্তু চার পাঁচদিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হল। তরকারি ঢাকনা দিয়ে সাবু খেয়ে পড়ে রইলেন। দেখবার কেউ নেই বললে সত্যের অপলাপ হবে, ঠিক সব সময় কাছে বসে থাকার লোকের অভাব—এইটুকু সত্য। মহামায়ার এই সংসারের অসুমর কাজ—ঘর-মোছা বাসন মাজা পর্যন্ত, রাজেনের কলেজ, টিউশ্যানী—সময় বলতে সকালে ঘণ্টা দুই। নটায় বাড়ি থেকে বেরোয়। বালিগঞ্জে নটা সাতাশের গাড়ি না ধরলে কলেজ হয় না, ফেরে রাত দশটায়। সকালের দুঘণ্টা সময়ও পড়ার পক্ষে যথেষ্ট নয় কিন্তু তবু ওর মধ্যেই বাজার মুদীর দোকানে মালমশলা কেনা কয়লা আনা ইত্যাদি তাকেই করতে হয়। নিত্যকার কাঁচা বাজার যা বিনুই করে অবশ্য! তবে মাছের পাট নেই, নিরামিষ বাজার একদিন করলে দুদিন—কোন কোন ক্ষেত্রে তিনদিনও চলে যায়। তার সঙ্গে উঠোন কুড়িয়ে গয়লা নটে কি শেপুণ্যে শাক তোলা হয়। এত কাজের মধ্যে মাথায় বাতাস করা কি গায়ে হাত বুলিয়ে দেবার লোক কোথায় পাওয়া যাবে?

বিনুও করেনি অবশ্য কোনদিনই, কিন্তু এবার কে জানে কেন বামুন মার জন্যে খুব মন-কেমন করতে লাগল—তাঁর অসহায় ও সংকুচিত ভাবের জন্যেই আরও। বুড়ো মানুষ, তাদের জন্যে অনেক করেছেন, কলকাতায় শেষের দিকে মা এক পয়সা পারিশ্রমিক বলে দিতে পারেন নি, বামুনদিও তা আশা করেন নি—তিনি এ পরিবারের অঙ্গীভূত হয়ে গিছলেন মনে প্রাণে। এরা চলে যাবার পরই তাঁর এবং এদের মনে হয়েছিল তিনি খেটে-খাওয়া লোক, নিজের জীবিকার জন্যে রান্নার কাজ করেন।

বিনুই এসে সময়মতো মাঝে-মধ্যে কাছে বসতে লাগল। অপটু হাতে মাথা টিপে দেওয়া, কোমর টিপে দেওয়া, সে-ই করতে লাগল। সন্ধ্যের সময়টাই অবসর মিলত বেশী। মহামায়া সেই সময়টায় সংসারের কাজ সেরে সারাদিনের ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েন একেবারে। রাজেন না এলে খাবার দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। এই সময় এক একদিন বিনুও গিয়ে মার পাশে শুয়ে পড়ে একটা গল্পের বই নিয়ে। এখন বামুন মার কাছেই বসে বা শুয়ে—গল্প শোনা নয়, নিজেই বকবক করতে লাগল, তারই গল্প শোনাত সে, পড়া বইয়ের গল্প। ইস্কুলের মাস্টার মশাইয়ের গল্প, জানা মশাই কি করে গুড় ওজন করেন—এইসব গল্প।

এর মধ্যে একদিন, জ্বরটা সবে ছেড়েছে সকালে, অবসন্নভাবে বিছানায় পড়ে আছেন, বিনু এসে মাথায় হাত দিয়ে বললে, 'মাথা টিপে দোব বামুন মা?' বামুন মা বললেন, 'না, তুই এমনিই বসে থাক কাছে একটু, তাহলেই হবে।' তার একটু পরে—বসে নয়, পাশে গুটিসুটি মেরে শুয়েই পড়েছে বিনু তখন, বামুন মা প্রায় চুপি চুপি বললেন, 'হ্যাঁরে পাগলা, অন্যদিন গল্প শোনার জন্যে ছিঁড়ে খাস—আজ যে কিছু বলছিস না?'

'তোমার যে শরীর খারাপ। মা বলে দিয়েছে সবে আজ জ্বর ছেড়েছে তোমার—আমি না বেশী বকিয়ে জ্বর বাড়িয়ে দিই।...তা তুমি কি বলবে একটা গল্প, বলো না।'

'না না, রোজকার মতো সে সব গল্প বলতে পারব না আজ। এমনি ছোট-খাটো একটা গল্প শুনবি? সত্যিকারের গল্প, রাজা উজীর নয়। আমাদের মতো মানুষদের—আমার জানা মানুষ। শুনবি? ভাল লাগবে? তুই তো চুপচুপ লুকিয়ে গল্প লিখিস দেখি, সেই জন্যেই বলছি—শুনবি?

'দুস্! আমি গল্প লিখি কে তোমাকে বললে?'

'তোরা বুড়োদের বড্ড বোকা ভাবিস, না? বুড়োদেরও তোদের বয়েস ছিল এককালে, সে বয়েস পেরিয়ে এসেই আজ বুড়ো হয়েছে—তা ভুলে যাস নি।··· তোর আঁকের খাতায় তিন তিনটে গল্প লেখা আছে, আমি পড়েছি। তার মধ্যে সেই খোঁড়া সেনাপতি যে ঘোড়া থেকে নামলে আর যুদ্ধ করতে পারত না বলে ঘোড়াটা মরে যেতে যুদ্ধটা জিততে জিততেও হেরে গেল—সে গল্পটা খুব ভাল লেগেছে আমার।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে বিনু। এ একটা অভাবনীয় খবর তার কাছে। ওঁরা জানেন সে গল্প লেখে, তার মানে মাও জানেন নিশ্চয়। তবু বারণ করেন নি, বকেন নি। ছবি আঁকে—তার জন্যে বকেন, অবশ্য তার কারণটাও বোঝে, রঙে কাগজে অনেক পয়সা খরচ হয় সত্যিকারের ছবি আঁকতে গেলে। গল্প লেখায় সেই জন্যেই আপত্তি নেই তত।···ইস্, দাদা যদি জেনে থাকে! কী লজ্জার কথা। খুব হাসাহাসি করেছে নিশ্চয়। দাদা এই বয়সেই কত মোটা মোটা ভারী ভারী ইংরিজি বই পড়েছে, তার কাছে এইসব ছাইভস্ম লেখা—ঠাট্টার জিনিস তো বটেই।···কে জানে গত বছরের পুরনো পাঁজির মধ্যে যে কবিতা আর নাটকের খাতাটা আছে, সেটা এঁদের চোখে পড়েছে কিনা।

ইচ্ছা দুর্নিবার, তবু ভরসা করে প্রশ্নটা করতে পারল না। একটা লেখার প্রশংসা করেছেন বামুন মা, হয়ত মারও ভাল লেগেছে—সেটাই মনের মধ্যে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে চায়। এর মধ্যে যদি কোন বিরূপ মন্তব্য ক'রে বসেন—কি ব্যঙ্গবিদ্রূপ কিছু হয়েছে কানে আসে—সে খুব খারাপ লাগবে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বামুনদির হাতের খাঁজে মুখ দিয়ে বলে, 'তুমি যে কী গল্প বলবে বললে, আবার চুপ ক'রে গেলে কেন?'

'শুনবি?' যেন সাগ্রহে বলেন বামুন মা, 'তুই লিখিস টিখিস, হয়ত একদিন এসব বুঝবি, হয়ত একটা বইও লিখতে পারবি। তাই বলছি। আমি মরে গেলে আর বলবার কেউ থাকবে না!···তোর দাদা এসব শুনতেও চায় না, তার সময়ই বা কোথায়? আমার পারুল থাকলে সে শুনত, চাপা বুঝদার মেয়ে, বুঝতও। তুইই শোন। তবে মাকে এখন যেন বলিস নি এ গল্পের কথা—এসব তোর বয়সের ছেলেকে বলা উচিত নয়, সত্যি কথাই—শুনলে রাগ করবে। কাউকেই বলিস নি এখন, শুধু মনে ক'রে রাখিস।'

তারপর, একটু চুপ ক'রে থেকে বলেন, 'সত্যিকারের লোক, তবে আসল নাম বলছি না। অনেকে বেঁচে আছে। আর কী দরকারই বা, তোর তো দরকার গল্পটা শুধু।'

॥ ২৩ ॥

গল্প বলার মতো ক'রেই এক নতুন ধরনের রূপকথা শোনান বিনুর বামুন মা।

না, 'এক যে ছিল রাজকন্যা' নয়। এক বিধবা ভদ্রমহিলার কথা।

'এই কলকাতারই কথা। আহিরীটোলা অঞ্চলই ধরো।' বলেছিলেন বামুন মা। বিনুর অবশ্য, কলকাতাতেই জন্ম হলেও, আহিরীটোলা সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, সেটা কোনদিকে জানে না। কোম্পানীর বাগান, নিমতলার স্নানের ঘাট, নতুন বাজার, ছাতুবাবুর বাজার—এটা বিশেষ মনে আছে বাড়ির খুব কাছে বলে, আর চড়ক বসত এখানে ; কাঁটা ঝাঁপের সময় যেতে দিতেন না মা বড্ড ভীড় হয় বলে, অন্য সময় যেত সে ঝি গিরিবালা কি এই বামুন মার সঙ্গে, তবে ওদের ছাদ থেকেও দেখা যেত চড়ক কাঠটা ঘুরছে—তাতে লোক বাঁধা—এর মধ্যেই ওর কলকাতার অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ।

তবে তাতে গল্পটা বোঝার অসুবিধা কি? আহিরীটোলা হোক আর দর্জিহাটা, দয়েহাটাই হোক—একটা পাড়া ওদের বাড়ির দিকটাতেই—এইটুকুই যথেষ্ট।

ঐখানে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন বাঁড়ুয্যেমশাই বলে, খুব ধর্মপ্রাণ লোক। গুরু বংশের সন্তান, তবে দীক্ষা দেওয়া উনি বন্ধ করেছিলেন, কারণ গুরুর ওপর নাকি দীক্ষা দেবার পর শিষ্যর জপতপ ইষ্টকে পাওয়ার সব দায়িত্ব অর্শায়, সে শক্তি যখন ওঁর নেই, উনি দু টাকা চার টাকা বার্ষিক প্রণামীর লোভে পাপে ডুববেন কেন? অদৃষ্টের ফের এমন, ঐ লোক আর কোথাও চাকরি পান নি, অথবা ওঁর ধর্মভীরুতার কথা লোকে জানত বলে, এক জমিদারী সেরেস্তায় কাজ পেয়েছিলেন, বাধ্য হয়েই নিতে হয়েছিল। এ চাকরিতে উপরি রোজগার করবেই কর্মচারীরা—মালিকরা এটা ধরে নিতেন, তাই মাইনে দিতেন মাসে পাঁচ টাকা ছ টাকা। নায়েবদেরই একেবারে মরবার কালে দশবারো টাকা মাইনে হত—তাতেই তাঁরা দোল দুর্গোৎসব করতেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই চুরি করতেন না, ঘুষও নিতেন না, উপরির সোজা পথ যেসব—রসিদ না দিয়ে খাজনার টাকা আদায় করা—প্রজারা পরে বিপন্ন হবে, খাজনা না দেওয়ার জন্যে হয়ত জমিই চলে যাবে, টাকা অর্ধেক জমা করা, 'পুণ্যে'র টাকার এক খাবলা ট্যাঁকে পোরা—সে সবও উনি পারতেন না বলে খুব কষ্টেই দিন কাটত। পৈতৃক বহু ভাগের এক ভাগ—এক চিলতে একটু বাড়ি ছিল, আর ছিল ঠাকুমা মার আমলের কিছু পেতল কাঁসার বাসন, স্ত্রীর দু একখানা বিয়ের সময়ের গহনা—সেই সম্বল ক'রেই দিন কাটত।

কিন্তু তাও টিকতে পারলেন না। তিনি উপরিটা না নিলে অন্য কর্মচারীদের অসুবিধে, তারা আদাজল খেয়ে লাগল ওঁর পিছনে, ফলে—পাছে কোনদিন 'না করা চুরির দায়ে' জেল খাটতে হয় এই ভয়ে সে চাকরিও ছেড়ে দিয়ে বাড়ি এসে বসলেন। এবং স্ত্রীর তাড়নায় যজমানির কাজ ধরলেন। তাও তাঁর সঙ্গে যজমানের মতের মিল হত না প্রায়ই—বেশী যজমানও পান নি বা রাখতে পারেন নি। এই অবস্থাতেই একদিন নিউমোনিয়া রোগে মারা

গেলেন।

বাঁড়ুয্যেমশাইয়ের আগে একটি ছেলে হয়েছিল, দশ বছরের হয়ে সে মারা যায়—তার অনেকদিন পরে একটি মেয়ে হল—স্বপ্নে দেখেছিলেন মা দুর্গা আসছেন তাঁর ঘরে, তাই ভবানী নাম রেখেছিলেন। যখন মারা গেলেন তখন ভবানীর বয়স নয়—তার মা কালীতারার বয়স প্রায় চল্লিশ।

ব্রাহ্মণের ঘরে তখন এ বয়সে মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার কথা। না দিতে পারলেও ব্যস্ত হয়ে উঠতে হত, বাপ-মার ঘুম থাকত না দিনে-রাতে। বাঁড়ুয্যে-মশাই ছিলেন নির্বিকার। বলতেন, 'আমার সামর্থ্য নেই এক পয়সারও, পাত্র খুঁজে কি করব? পণ নেওয়ার বংশ নয় আমাদের যে মেয়ে বেচে কিছু টাকা ঘরে তুলব। যে বেটি এসেছে সে-ই নিজের ব্যবস্থা ক'রে নেবে।'

'এখনও তো বাড়িটা আছে, বেচলে কোন না দু' হাজার টাকা—নিদেন দেড় হাজার টাকাও পাওয়া যাবে। তাতেই মেয়ের বে দাও, তারপর আমাদের অদৃষ্টে যা আছে হবে।' কালীতারা বলতেন।

বাঁড়ুয্যে উত্তর দিতেন, 'আমাদের বামুনের ঘরে মেয়ের বের খরচা বে'র রাতেই শেষ হয় না। তত্ত্বতাবাশ আছে, পুনর্বিয়ে—নানান খরচা, সেসব না পারলে, মেয়ের ক্ষোয়ারের শেষ থাকবে না, সে জ্বালা সইতে পারবে?'

তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেইভাবে নিশ্চিন্ত মনেই চলে গেলেন কালীতারার ওপর সব দায় চাপিয়ে।

কিন্তু কালীতারাও তখনই মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে পারলেন না। একবেলা খাওয়ারই সম্বল নেই যেখানে, সেখানে বাড়ি বেচেও মেয়ের বিয়ের কথা ভাবা চলে না। বাড়ি সামান্যই, বহুকালের পুরনো বাড়ি—পার্টিশ্যন হতে হতে ওঁদের ভাগে যেটুকু পড়েছে—তার খদ্দের জোটা মুশকিল। জুটলেও হয়ত হাজার বারোশো বলবে তারা। তাতে কি ভদ্রঘরে ভদ্রভাবে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে? বিশেষ বামুন-কায়েত-বেনের ঘরের বিয়ের খরচ কলকাতা শহরে ভয়াবহ হয়ে উঠছে।

তা ছাড়া—এখন সম্বল বলতে এই বাড়িটুকুই যা আছে। দুখানা ঘর। এইটুকু গেলে তিনি একা দাঁড়াবেন কোথায়? মেয়েছেলে, একটি বিয়ের যুগ্যি মেয়ে নিয়ে? সত্যিই কিছু ভিক্ষে ক'রে খেতে পারবেন না। ভিখিরির মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে মুখ দেখাবে কি ক'রে? সে বিয়ে দেওয়া না দেওয়া সমান। হয়ত এক কাপড়ে বার ক'রে দেবে তারা।

মেয়ে খুব সুন্দরী বলে এক ঘটকী যেচে সম্বন্ধ এনেছিল।

ছেলে চাটুয্যে, গোয়াবাগানে এক খোলার বাড়িতে থাকে। তবে সেটুকু অবশ্য নিজেরই—ভাড়া করা নয়। তেমনি লোকও অনেক, মা বাপ ভাই বোন। ছেলে ছাপাখানায় চাকরি করে, মাসে দশ টাকা মাইনে, দু' পয়সা রোজ জলপানি। চায় কুড়ি ভরি সোনা, হাজার টাকা নগদ। একটু জেরা করতেই বেরিয়ে এল আসল কথাটা—ঐ টাকা আর সোনা দিয়েই বোনের বিয়ে হবে, ছেলের পাওনার মধ্যে এই মেয়েটাই!

এর পর আর ও স্বপ্ন দেখতে—স্বপ্ন দেখা ছাড়া কি?—সাহস হয় নি।

জীবনধারণের নিত্যকার সমস্যাটাই যেখানে প্রবল, সেখানে বিয়ের চিন্তাও দস্তুর মতো বিলাস একটা। দুটো প্রাণীর খাওয়াপরা তখনকার দিনেও দশ টাকার কমে হত না। তাও একবেলা খাওয়া ধরে হিসেব ক'রেই। কালীতারা ভদ্রভাবে যেটুকু উপার্জন করা যায় সেই পথ ধরলেন—টেকোয় পৈতে কাটা, খুঞেপোশ বোনা—এই ধরনের কাজ, যাতে বিশেষ মূলধন লাগে না। তবে তিনি পরিশ্রম করতে রাজী থাকলেও এসব জিনিসের এত খদ্দের কোথায় ? খুব বেশী হলেও মাসে চার পাঁচ টাকার ওপর তুলতে পারতেন না আয়ের অংকটা।

সুতরাং, 'তলাগুছি' হিসেবে পেতল কাঁসার বাসনগুলো একে একে নতুন-বাজারে গিয়ে উঠতে থাকে। সোনা—যা সামান্য ক্ষুদ-কুঁড়ো আছে তাতে হাত দিতে সাহস হয় না, তাহলে মেয়ের বিয়ের আশায় একেবারেই জলাঞ্জলি পড়বে। কিন্তু বাসনও কিছু অফুরন্ত নয়, আর কিনতে যে দাম, বেচতে গেলে তার সিকির বেশি মেলে না। আস্ত আস্ত রুপোর মতো খাগড়াই কাঁসার বাসন ভাঙ্গা বাসনের দরে নেয় বাসনওলারা।

অগত্যা শেষ পর্যন্ত সোনাতেও হাত পড়ে।

এবং—এদিকে মেয়ের বয়স নয় থেকে এগারো, এগারো থেকে চোদ্দও পেরিয়ে যায় এক সময়। বাড়নশা গড়ন, উপবাসেও তার যৌবন-কান্তি ক্লিষ্ট হয় না, দেহের পূর্ণতা নষ্ট হয় না। কলকাতা বলেই তাই, পাড়াগাঁ হলে বামুনের ঘরে অতবড় আইবুড়ো মেয়ে—সমাজে রীতিমতো ঘোঁট হত। হয়ত জাতেই ঠেলত।

এর ওপরও আছে। দেখা গেল খাওয়া পরার সমস্যা ছাড়াও কিছু কিছু জরুরী ও আবশ্যিক খরচা এসে পড়ে, যার অংকও সামান্য নয়।

বাড়ির কল এবং পাইখানার পাইপ ট্যাংক ইত্যাদির অবস্থা মেরামতের অভাবে একেবারে অচল হয়ে উঠেছে। দেওয়ালে চুন বালি নেই, তা না থাক, জানলা দরজাও এবার জবাব দিচ্ছে। শেষে একেবারে চোখে অন্ধকার দেখলেন যখন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে নোটিশ এল—যেহেতু সাত আট বছরের ট্যাক্স দেন নি ওঁরা, সেই হেতু চোদ্দ দিনের মধ্যে জরিমানা সুদ্ধ সব টাকা না পেলে ওঁরা বাড়ি নিলাম ক'রে নিতে বাধ্য হবেন।

ঘরে বসে কাঁদলেন খানিকটা কালীতারা, অদৃষ্টকে গালমন্দ করলেন। তারপর নিকট পাড়াপ্রতিবেশী ও জ্ঞাতিদের কাছে গেলেন পরামর্শের জন্যে। জ্ঞাতিরা বললেন, 'এ বাড়ি বেচে কোন বস্তিতে চলে যাও। খোলার ঘর ওই টাকায় একটা কিনেও নিতে পারো। ভাড়া নিলেও মাসে এক টাকা দেড় টাকার বেশি ভাড়া হবে না, সে অনেক শান্তি।'

দু একজন খুব সহানুভূতিসম্পন্ন গরজ ক'রে দালালও আনলেন—কালীতারার সন্দেহ তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি ক'রেই আনা হয়েছে—তারা বলে গেল বাড়ির যা অবস্থা, মাথার ওপর মিউনিসিপ্যালিটির খাঁড়া ঝুলছে, হাজার বারোশোর ওপর কেউ উঠবে না। তাতে জ্ঞাতিরা উদারভাবে জানালেন, 'না না, এ টাকায় বেচবে কি ? দাঁড়াবে কোথায় ? তেমন হয় আমরাই দু

একশো বেশী দিয়ে আটকাবো।'

পর যারা—নিতান্তই প্রতিবেশী মাত্র—তাঁরা কিছু কিছু কার্যকর পরামর্শ দিলেন। বললেন, 'এখনও যা আছে সব বেচে বাড়ি সারাও, ট্যাক্স মিটিয়ে দাও। একখানা ঘরে থেকে আর একটা ভাড়া দাও, যা সাত-আট টাকা পাবে তাই লাভ। সেই যখন যা দু এক কুচি সোনা আছে তাই বেচে বেচেই খেতে হচ্ছে, সর্বস্বান্ত হতেই হবে একদিন—এমন দগ্ধে দগ্ধে মরে লাভ কি? বরং এতে কিছু আয়ের পথ হবে। তেমন বুড়োবুড়ি দেখে দিলে তারা চাই কি অভিভাবকের কাজ করবে।'

আর একজন, পাড়ার এক গোয়ালা পরামর্শ দিলে, 'তার চেয়ে বামুন-মাঠান মহেশ মুখুজ্জের কাছে যান। মানুষটা গরিব থেকে বড়লোক হলেও গরিবদের ভোলে নি, বংশটা হাজার হোক বড় তো—খুব নাকি দান ধ্যান করে। এমনি ওর কাছে ধার করলেও লাভ আছে, পয়মন্ত লোক, ওর কাছে যারা টাকা ধার করে তাদের দেনা শিগগিরি শোধ হয়। ফলনা দত্ত (নাম করলে হাঁড়ি ফাটে বলে দত্তমশাইকে ফলনা দত্ত বলা হয়) কি আড্যিদের মতো হাত ভারী নয়। তাদের কাছে গয়না কি বাড়ি জমি বাঁধা রাখলে আর ফেরত নিতে পারে না কেউ। যদি তেমন হয় মাঠান—বাড়ি বাঁধা রেখে দু-আড়াইশোর মতো টাকা নিয়ে মেরামতি আর যা যা দেনা আছে শোধ ক'রে দিন, ভাড়া দিয়ে সেই টাকাটাই বরং মাসে মাসে কিস্তি হিসেবে শোধ দেবেন। ভাল লোক, হয়ত সুদও মকুব করতে পারে।'

ভাগ হতে হতে এইটুকু একচিলতে ফালিপানা অংশ পেয়েছিলেন বাঁড়ুয্যে-মশাই, একটা উঠোন পর্যন্ত নেই। দোর দিয়ে ঢুকতেই কলতলা, কলে থাকলে কেউ ভেতরে ঢুকতে পায় না—এক খাঁজে একটু পাইখানা—তারপরই কলতলা দিয়ে সিঁড়ি উঠে দুটো ঘর। একটা ঘরের মধ্যে দিয়ে আর একটায় যেতে হয়। এর একখানা ভাড়া দিতে গেলে সামনের ঘর থেকে দুহাত বার করে নিয়ে পাঁচিল টেনে কি বেড়া দিয়ে ভেতরের ঘরে যাবার চলন দিতে হবে, দরজাও নেড়ে বসাতে হবে। সামনের ঘর কি দাঁড়াবে তাহলে। রান্না তো ঐ পাইখানার গায়ে দুহাত জায়গায়—তা ভাড়াটেই বা কোথায় রাঁধবে তাঁরাই বা কোথায় যাবেন।

তবে অত ভাবনারও আর সময় নেই। সত্যি সত্যিই পথে কাপড় পেতে ভিক্ষে করার চেয়ে—এ তবু ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণ, এঁর কাছে দাঁড়ানো ভাল।

অনেক ভেবে অনেক কেঁদে একদিন শেষ পর্যন্ত ঘোমটা দিয়ে মহেশ মুখুজ্জের কাছে গিয়েই দাঁড়ালেন।

এই মহেশ মুখুজ্জের ধনী হওয়ার মূলে একটু ইতিহাস আছে; বড় বিচিত্র ইতিহাস। বামুন মা সেটাও বলে নেন আসল গল্প থামিয়ে। আঙুল ফুলে কলাগাছ যাকে বলে, তেমনি ভাবেই লোকটা বড়লোক হয়েছে, মাত্র দুতিন বছরের মধ্যেই। ভাগ্য যাকে বড় করবেন—তাকে এমনিভাবেই বুঝি হাত ধরে টেনে নিয়ে যান সৌভাগ্য ও সম্পদের দিকে।

বংশ অবশ্য ভাল, এ পাড়ার পুরনো বাসিন্দা। সাবর্ণ চৌধুরীদের পাট্টা

ওদের, সবাই—মানে বনেদী অধিবাসীরা সবাই চেনে।

মহেশের বাবা সরকারী চাকরি করতেন, ভাল চাকরি। তাঁর ইচ্ছা ছিল মহেশ আইন পড়ে উকিল হোক। কিন্তু নিজে হঠাৎ একদিন চাকরি ছেড়ে সংসার ছেড়ে মাথা কামিয়ে কণ্ঠি গলায় বৃন্দাবন চলে গেলেন। চিঠি লিখলেন, 'সংসারের চোখে আমাকে মৃত জানিও। তোমরা কী করিবে তাহা ভাবি না। এ জগতে কেহই কিছু করিতে পারে না, তিনি যেমন করাইবেন তাহাই হইবে।'

কথাটা সাংঘাতিকভাবে সত্যি, কারণ মহেশের বাবা ঘোর শাক্ত ছিলেন, শাক্তরই বংশ ওঁদের—চিরদিন ভেখধারী বৈষ্ণবদের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করেছেন।...মহেশের মা আর মহেশ বৃন্দাবন গেলেন কিন্তু কোন হদিসই পাওয়া গেল না। তাঁর গুরুদেব আদেশ দিয়েছেন ভিক্ষান্নজীবী হয়ে নির্জন স্থানে গিয়ে তপস্যা করতে। ঠিকানা কেউ জানে না।...এর পর মহেশের মা আর বেশীদিন বাঁচেন নি। এটাকে তিনি স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা আর ওঁর ব্যক্তিগত অপমান বলেই মনে করেছিলেন। বৈষ্ণব সাধনা কান্তাভাবের সাধনা—তার জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করার প্রয়োজন কি ছিল। তিনিও কি সন্ন্যাস নিতে পারতেন না।

সে যাই হোক, মহেশের আর ওকালতি হল না। কোন মতে বি-এ পাস ক'রে উপার্জনের পথ দেখতে হল। ধরাধরির কেউ ছিল না, ভাইদের লেখাপড়া বাকী, তাড়াতাড়ি একটা মাস্টারীতে ঢুকে পড়লেন মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে।

লক্ষ্মী যার ঘরে আসবেন বলে কৃতসংকল্প—আসার জন্যে ব্যস্ত বলাই ঠিক—তাকে অনেক গুণ দেন, কিছু কিছু সুলক্ষণও। সুশ্রী চেহারা, মিষ্ট ব্যবহার, সদা-প্রসন্ন উজ্জ্বল মুখ। স্থির বুদ্ধি। বিখ্যাত ঠিকাদার অভয় চাটুয্যেও সামান্য অবস্থা থেকে ধনী হয়েছেন, এখন সরকারী ঠিকে একচেটে—তিনিও মানুষ চেনেন। ছেলে স্কুলে কি একটা কুকর্ম ক'রে ফেলেছিল, সেটা সামলাতে অভয়বাবু নিজে এসেছিলেন। ঐখানেই মহেশকে দেখলেন, আলাপ করলেন, পরিচয় জানলেন।

তাঁর সব কাজই তাড়ঘড়ি, মনস্থির করতে সময় লাগত না, স্থির করা কাজ শুরু করতে তো নয়ই। তিনি পরের দিনই মহেশের মার কাছে এসে প্রস্তাব করলেন, তাঁর মেয়েকে উনি দয়া ক'রে ওঁর পুত্রবধূ করুন। লোকে বলে সুন্দর—নিজে সে কথা বললে বিশ্বাস্য হবে না, ওঁর বিশ্বাস সে পরম সুন্দরী, সে দেহ উনি সোনায় মুড়ে দেবেন, নগদও যদি কিছু চান ঘর-খরচার মতো—তাও দেবেন।

মহেশের মা বললেন, 'আপনার মতো লোক যদি আমাদের মাথার ওপর দাঁড়ান, সে তো ভাগ্যের কথা চাটুয্যেমশাই, কিন্তু ছেলে যে কিছুতে বে করতে চায় না, বলে তিরিশ টাকা মাইনের মাস্টারী চাকরি—আজ আছে কাল নেই—এখনও ভাইরা মানুষ হয় নি, বিয়ে করে খাওয়াবো কি, তোমাদেরই বা চলবে কিসে!'

চাটুয্যেমশাই হেসে বললেন, 'সে তো আমার ভাবনা বেয়ান ঠাকরুন। একটা মেয়ে আমার, আদরের জিনিস। তাকে জেনেশুনে কি জলে দিতে চাইছি?

তা নয়—ভবিষ্যৎ সব ভেবেছি। ভগবান আপনার মহেশকে ত্রিশ টাকার মাস্টারী করার জন্যে পাঠান নি। ওকে আমি আমার ব্যবসায় টেনে আনব। না, না, আমার তাঁবে নয়—সে মনে হবে কর্মচারী, ঘরজামাইয়ের অবস্থা—ওকে আলাদা ব্যবসা ক'রে দোব। ওর যদি সন্দেহ থাকে, আমার সঙ্গে লেখাপড়া করুক, মাসে একশো টাকার মতো আয় হলে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে—আমি আগেই সে ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। আপনি একবার একটা ছুতো ক'রে মেয়েটাকে দেখে আসুন, আমার গাড়ি পাঠালে আপনার অপমান, পাল্কীই পাঠাবো, যাওয়া আসার ভাড়া দিয়ে—তারপর মহেশকে বলবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে, ওর সঙ্গেই কথাবার্তা কইব। বুদ্ধিমান ছেলে আপনার—কোন ভয় নেই, কিছু বোকামি করবে না।'

মহেশ বোকামি করেন নি। তিনি মাস্টারী ছেড়ে ঠিকেদারীতে ঢুকে পড়লেন। অভয়বাবু ভাবী জামাইকে মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্মগুলো ছেড়ে দিলেন, রাস্তাঘাট মেরামত করা—নিজস্ব বাজারের মেরামতি, তৈরী করা, এইসবগুলো—শুধু তাই নয়, সরকারী পি-ডবল্যু-ডির কাজও কিছু কিছু দিতে লাগলেন। বিশেষ দূরের কাজ, যা তাঁর পক্ষে আর দেখা সম্ভব হচ্ছিল না। হুগলী হাওড়ার কাজও ওকে সাবকনট্র্যাকটর হিসেবে দিতে লাগলেন।

এতে টাকা লাগে, মূলধন। সরকারী কাজে কিছু আগাম পাওয়া গেলেও, পুরো বিল মিটিয়ে পেতে দীর্ঘকাল সময় লাগে। মিউনিসিপ্যালিটিও তাই। ততদিনে অন্য কাজ ফেলে রাখা যায় না, নতুন কাজ শুরু ক'রে দিতে হয়। অভয়বাবু বিশ হাজার টাকা 'আসন্ন' জামাতার নামে ব্যাংকে আমানত ক'রে দিলেন, দরকার হলে আরও দশ হাজার টাকার মতো ওভার ড্রাফ্‌ট্‌ যাতে পেতে পারে তারও আগাম জামিন দিয়ে রাখলেন।

তবে অভয়বাবুও বোকা নন। তিনি দস্তুর মতো য়্যাটর্নীকে দিয়ে মুসাবিদা করিয়ে একটা এগ্রিমেণ্ট সই করিয়ে রেজেস্ট্রী করিয়ে নিলেন।

শর্ত রইল মহেশ যদি এক বছরের মধ্যে অন্তত বারো হাজার টাকার কাজ পান ও করতে পারেন—শতকরা দশ টাকা লাভ ধরছেন অভয়বাবু, তেমন খেলোয়াড় ছেলে হলে ঢের বেশী করতে পারবে—তাহলে তিনি অভয়বাবুর মেয়ে কমলাকে বিবাহ করতে বাধ্য থাকবেন।

শুধু তাই নয়, আরও শর্ত রইল, কমলার জীবদ্দশায় তিনি অন্য কোন বিবাহ করতে পারবেন না ; আর যদি ঈশ্বর না করুন কমলার 'কাল' হয় এবং মহেশ আবার বিবাহ করেন, মহেশের পৈতৃক বাড়ির অংশ, ভবিষ্যতে কমলার জীবদ্দশায় অন্য যেসব সম্পত্তি উনি খরিদ করবেন, এর মধ্যে অন্য কোন স্থায়ী ব্যবসায় যদি পত্তন করেন সে ব্যবসার মালিকানা ও নগদ দুই লক্ষ টাকা (অন্যথায় যতটা পর্যন্ত নগদ টাকা তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থেকে আদায় হয়) অভয়বাবুর দৌহিত্র বা দৌহিত্রীদের অর্শাবে।

য়্যাটর্নী একটু ইতস্তত করছিলেন, গোপনে বলেছিলেন, 'এ দলিল কি হাইকোর্টে গেলে টিঁকবে ? ও যদি আবার বিবাহ করে আর সেখানে সন্তান হয়, তাহলে তাদের একেবারে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ক'রে পথের ভিখিরী

করা—এ কি কোর্ট মানবে ?'

অভয়বাবু উড়িয়ে দিয়েছিলেন কথাটা, 'বড় একটা মামলা হবে, এই তো ? হোক না, তারা যদি মামলা চালাতে পারে চালাবে। আমরা এই দলিলের বলে একটা ইনজাংশন্ তো দিতে পারব, মানে মহেশের টাকায় সে মামলা চালাতে পারবে না। আর সে তো বহুদূরে ভবিষ্যতের কথা, জামাই যদি দু লাখ টাকার ওপর টাকা রেখে যেতে পারে—নিক না তারা। মেয়ে আমার মরবেই বা কেন ? যদি বুড়ো বয়সে মরেও জামাইয়ের আগে, মহেশই যে তখনই বিয়ে করতে ছুটবে, তারও কোন মানে নেই। এ একটা বাঁধন রাখা হল—এই পর্যন্ত।'

মহেশও চক্ষু বুজে সই করেছিলেন। কারণ, তার আগেই তিনি কমলাকে দেখে নিয়েছেন। সুন্দরী মেয়ে, টাকার সঙ্গে এমন মেয়ে পাবেন এ কেউ আশাও করে না। এ-স্ত্রী পেলে আর অন্য বিয়ে করতে ইচ্ছেই বা হবে কেন ? বিশেষ উন্নতির নেশায় তিনি মশগুল, কঠোর পরিশ্রম ছাড়া অর্থ উপার্জন হয় না, আর সে পরিশ্রমের শক্তি ও ইচ্ছা দুইই তাঁর যথেষ্ট। সুতরাং এর মধ্যে একটু 'জুলুম' লক্ষ্য করলেও খুব আপত্তিকর কিছু দেখেন নি !

যদি এ বৌ অল্প বয়সে মরে, এবং আর একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় ? সব টাকা সম্পত্তি শ্বশুরকে ধরে দিয়ে দলিল নাকচ করিয়ে নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করতে পারবেন—এ বুকের পাটা তিনি রাখেন। এখনই তো কত লোকে ওঁকে ওয়ার্কিং পার্টনার করে ব্যবসায় নামতে চাইছে। মহাজনরা টাকা দেবার জন্যে উৎসুক।

ঠিকাদারীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনেক নতুন নতুন ব্যবসা ধরলেনও। গুড়ের ব্যবসা, চামড়ার ব্যবসা, চাল ডাল বাঁধি করা—আর যাতে হাত দিচ্ছেন তাতেই সোনা ফলছে। এ যেন সত্যিই নেশায় পেয়েছে তাঁকে। সে নেশা বেড়েও যাচ্ছে।

তবে সত্যিই, ঐ গয়লা যা বলেছে। নেশাটা টাকা রোজগারের, জমাবার নয়। সঞ্চয় করবেন তো বটেই, তবে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে নয়, এই ছিল মহেশ মুখুজ্জের মত। সে বঞ্চনা বলতে খাওয়া পরার প্রশ্নই শুধু নয়, দান ধ্যান করা, লোকের উপকার করা, পাড়ার ছেলেদের কর্মে সাহায্য করা—এগুলোও তাঁর বিলাসের মধ্যে ছিল, মানসিক বিলাস। মেজাজটা চিরদিনই একটু জমিদারী ধরনের ছিল। সেটা মাস্টারী করার সময়ও দেখা গেছে। লোকে বলত জমিদারের রক্ত আছে দেহে। টাকা ছুঁড়ে মারতেন। কাজ আদায়ের জন্যে আগাম বকশিস দিতেন, পরে আবার দেবেন প্রতিশ্রুতি দিতেন। সে কথার খেলাপও করতেন না কখনও। আর যা দেবার দ্রুত, কাজ করলেই দিয়ে দিতেন সঙ্গে সঙ্গেই। ব্যবসায় এত অল্পসময়ে এত উন্নতিরও এইটেই আসল রহস্য।

রাখাল গোয়ালাই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল কালীতারাকে। কি বলতে হবে, তাকেই ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কোন পরিচয় দেবার আগেই, ওঁর সম্ভ্রান্ত ভাবভঙ্গী দেখে—যদিচ কালীতারা হাতজোড় ক'রেই দাঁড়িয়েছিলেন—মহেশ মুখুজ্জে উঠে দাঁড়ালেন একেবারে।

উনি তখন নিজের আপিস ঘরে বসে হিসেব দেখছেন, বাইরে মিস্ত্রী ও

পাওনাদারের দল বসে—'পেমেণ্ট' নেবে বলে। মহেশ সপ্তাহে সপ্তাহে যার যা পাওনা কড়াক্রান্তি মিটিয়ে দিতেন। তার ফলে মাল পেতেন অনেক কম দামে, মজুরিও অপর ঠিকেদারদের চেয়ে কম দিলে চলতো, বরং কাজ পেতেন অনেক বেশী। এরা ছাড়া, ঘরেও দু-একজন লোক ছিল, নানা আর্জি নিয়ে এসেছে তারা, কেউ এসেছে ঘুষের পয়সা নগদ নগদ মিটিয়ে নিতে। কেউ বা আপাতত শুধুই মোসাহেবী করতে এসেছে। এছাড়া সরকার ছিলেন, 'ওভারসীয়ার' ছিলেন। হিসেবের কাজে এদের দরকার।

এত লোকের মধ্যে আসতে মাথা কাটা যায় বৈকি!

আর সেই মর্যাদাময় সঙ্কোচের ভাবটা দেখেই মানুষ চিনতে দেরি হয়নি মহেশের। ইনি যে সাধারণ প্রার্থী বা ভিক্ষার্থী নন, একাজে অভ্যস্ত তো ননই—সে কথা কেউ বলে দেবার প্রয়োজন ছিল না।

উনি উঠে দাঁড়িয়ে রাখালের দিকেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।

'কী ব্যাপার রাখাল? এঁকে, মানে ভেতর-বাড়িতে নিয়ে গেলেই তো পারতে—'

'না বাবুমশাই, উনি আপনার কাছেই এসেছেন।'

রাখাল সংক্ষেপে বলল কথাগুলো, মানে কালীতারার বিপদের বিবরণ। পরিচয়ও দিল।

মহেশবাবু আরও ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন; 'আচ্ছা, আচ্ছা, সেসব কথা পরে হবে। আপনি বসুন মা, রাখাল, ঐ চেয়ারখানা এদিকে এগিয়ে দাও তো—' তারপর সরকারের দিকে চেয়ে বললেন, 'বিষ্টুপদ তোমরা একটু বরং বাইরে বসো, আমি এঁর কথাটা শুনে নিই।'

বললেন বিষ্ণুপদকে কিন্তু চোখটা বাকী সকলের দিকেও ঘুরে এল একবার। সকলেই বিরক্তভাবে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন! এ আবার এক কি উড়ো আপদ এল সক্কালবেলা—এই মনোভাব তাদের। আর এসেছে সাহায্য চাইতে—তার এত খাতিরই বা কিসের।

মহেশবাবু কালীতারার দিকে চেয়ে এবার বললেন, 'আমি বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের কথা অনেক শুনেছি। ঘোষেদের এস্টেটে কাজ করতেন তো। দেবতুল্য ঋষিতুল্য লোক ছিলেন সবাই বলে। উপরি রোজগারের চারদোর খোলা বলে লোকে জমিদারী সেরেস্তায় কাজ নেন। উনি উপরি নিতে হবে বলে চাকরি ছেড়েছিলেন।...উনি যে তাই বলে এমনি অবস্থায় আপনাদের ফেলে—ইস্! তা আপনি নিজে কেন এলেন মা, আমাকে ডেকে পাঠালেই তো হত—।'

একটুখানি ভরসা পেয়ে কালীতারা এবার বাড়ি বাঁধা দিয়ে টাকা নেবার কথা পাড়তেই মহেশ বলে উঠলেন, 'না না, ওসব কোন কথাই নয়। ঐ তো যা শুনলাম এক চিলতে বাড়ি, ওর কীই বা ভাড়া দেবেন, আর তার ভাড়াই বা কত হবে যে তা থেকে সংসার চালিয়ে দেনা শোধ করবেন? যা কিস্তি দেবেন তার দুনো সুদই পাওনা হবে, শেষে ঐ কটা টাকার জন্যে সুদে আসলে বাড়িই চলে যাবে। ওসবে দরকার নেই, আমার মিস্ত্রী প্লাম্বার তো বসেই থাকে কতদিন, তাদের টাকাও কিছু কিছু দিয়ে যেতে হয়, নইলে তারা খাবে কি?

অপর জায়গায় কাজ ধরলে আমার কাজের সময় পাবো না। মেরামত কল-পাইখানার যা কাজ দেখে বুঝে ফাঁকমতো ক'রে দিয়ে আসবেখন। আর ঐ ট্যাক্সের নোটিশখানা রাখালকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। খানিকটা তো ছাড় হবেই, যেটুকু দিতে হবে আমি দিয়ে দোব।'

কালীতারা তবু বলতে যান, 'তা মেরামতের জিনিসপত্তর—'

'মা, আপনাকে মা বলেছি, যদি সন্তান বলে মনে করেন ওসব কথা আর তুলবেন না। আর যদি দয়া হয়—এরপর যা কিছু জরুরী দরকার পড়বে, নিঃসংকোচে আমাকে জানাবেন।'...

মহেশ বলেছিলেন মিস্ত্রীরা ফাঁকমতো সেরে দিয়ে যাবে—কিন্তু এল পরের দিনই। মিস্ত্রী, মজুর, 'পিলাম্বরের' দল হৈ-হৈ ক'রে এসে পড়ল। চুন সুরকি বালিও এল। পাড়ার লোক—বিশেষ জ্ঞাতিদের—কৌতূহল আর দুশ্চিন্তার সীমা রইল না। কার কাছে বাড়ি বাঁধা দিলেন কালীতারা—মাথাব্যথা সেইজনোই বেশী। দেনা তো শোধ করতে পারবেই না, জানা কথা। যেই ধার দিক সে-ই দখল করবে একদিন। কে লোকটা, কে কত সুবিধে ক'রে নিল কে জানে।...মাঝখান থেকে বেশী লোভ করতে গিয়ে তাঁদের হাত ফসকে গেল বোধহয়।

মেয়েরা যথাসাধ্য চেঁচিয়ে দুবেলা শোনাতে লাগলেন, 'এই জন্যেই বলে দেইজী শত্তুর! একটা পরলোককে এনে এখানে ঢোকাবার জন্যে বুঝি এত নাকে-কান্না! কেন, আমাদের কাছে হাত পাতলে কি মাথা কাটা যেত নাকি! মন তো নয়, অমিত্তির প্যাঁচ। ভগবান এমনি এমনি সব্বনাশ করেন না কারও, কথাতেই তো আছে—মনের গুণে ধন!' ইত্যাদি—

বাড়ি মেরামত তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গেল। কতটুকুই বা কাজ। পাঁচ ছজন লোক লেগেছিল, ফলে চার পাঁচ দিনেই কাজ সেরে ফেলল। সম্ভবত মহেশবাবুর নির্দেশ দেওয়া ছিল, তারাই এ ঘরের মাল ও-ঘরে সরালো, আবার কাজ শেষ হলে ধুয়ে মুছে যেখানকার যা ঠিক ক'রে বসানো করতে লাগল। আগেকার পলেস্তারা খসিয়ে বালি চুন ধরিয়ে কলি ফিরিয়ে বাড়ি প্রায় নতুন করে দিল। কালীতারা তাঁর বিয়ের পরও এ-বাড়ির এ ছিরি দেখেন নি।

কাজ 'ফিনিশ', মিস্ত্রিরা গিয়ে জানাতে সরকারকে সঙ্গে নিয়ে মহেশ এলেন নিজে দেখতে। ফুরনে মজুরি তাদের—মাপটা ওঁদের দেখা দরকার।

বাইরের পুরুষ এলে, ভবানীর ওপর নির্দেশ দেওয়াই ছিল, গুটিসুটি মেরে এক কোণে তাদের চোখের বাইরে কোথাও লুকিয়ে পড়বে। চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে—বাড়নশা গড়নের জন্যে ষোল আঠারো মনে হয়। জ্ঞাতিরা সেইটেই রটনা করেন সুযোগ পেলেই, আরও এক আধ বছর চাপিয়ে দেন কেউ কেউ।—তার ওপর রূপসী, কালীতারার ভাষায় 'আগুনের খাপরা', স্পষ্টই বলেন, 'হতভাগী কোনদিন নিজেও পুড়বে, আমাদেরও পোড়াবে।'

সে সম্বন্ধে ভবানীও যথেষ্ট সচেতন, যতদূর সম্ভব আত্মগোপন ক'রেই থাকল। কিন্তু এক্ষেত্রে ঘরের কোণে থাকা চলবে না, কারণ ওঁরা ঘরে ঢুকে মাপ

নেবেন কাজ কেমন হয়েছে দেখবেন। কোথায় যাবে সে? শেষ অবধি কোনমতে গিয়ে কয়ক বিঘৎ রান্নাঘরেই আশ্রয় নিয়েছিল। সেদিকে ওঁরা অবশ্য যাননি, রান্নাঘরে বাইরের লোক অন্যজাতের লোক ঢুকলে হাঁড়িকুঁড়ি নষ্ট হত সেকালে, বাইরে থেকেই মাপটা মোটামুটি বুঝে নিয়েছিলেন। তবে অদৃষ্টে বিপদ থাকলে কেউ রোধ করতে পারে না। মহেশবাবুরা বাইরে চলে গেলেন দরজা ভেজিয়ে। কালীতারাও কলতলায় নেমেছেন দরজা দেবেন বলে—মহেশবাবুর মনে পড়েছে তাঁর ছড়িটা ঘরে ঢোকবার দরজার কোণে ঠেসিয়ে রেখেছিলেন, আনতে মনে নেই। সরকারকে পাঠানো অভদ্রতা হবে ভেবে নিজেই গলাখাঁকারি দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন আবার। শব্দ ক'রেই এসেছেন, তবে শব্দটা করতে করতেই দরজা খুলে ফেলেছেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই— এঁরা চলে গেছেন ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে ভবানী— ফালিপানা রকটার ওপর।

রান্নাঘরটা নিতান্তই ছোট, জানলা নেই, ঘুলঘুলি আছে তাতে জাল দেওয়া বেড়ালের ভয়ে। গরমের দিনে ঐটুকু জায়গায় দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকা—বিশেষ এই মেঘলা গুমোট দিনে—এক ধরনের শাস্তি। অন্ধকূপ হত্যার অবস্থা। অতিরিক্ত ঘামে এই আধ ঘণ্টা সময়েই ভবানীর মুখ গলা— যেটুকু অনাবৃত—মনে হচ্ছে যেন চুপসে গেছে। মনে হচ্ছে কে বালতি ক'রে জল ফেলেছে গায়ে—সেই কারণেই গায়েও যেটুকু কাপড় ভাল ক'রে জড়ানো যেত, সেটুকুও প্রয়োজন নেই জেনে ঈষৎ অসম্বৃত—সেই অবস্থাতেই মহেশের চোখে পড়ে গেল।

উনি অবশ্য তখনই পালিয়ে আসার মতো ক'রে বেরিয়ে এলেন—কিন্তু অনিষ্ট যা হবার তখন হয়েই গেছে। কালীতারা মেয়েকে খানিকটা বকলেন— অকারণেই। আর অকারণ বলেই ভবানীও চড়া চড়া জবাব দিল। মহেশবাবুকে সে অনেকক্ষণ ধরেই দেখেছে, দরজার কাঠের ফাঁকে চোখ লাগিয়ে। ভদ্রতা সহবৎ-জ্ঞান, অপরিসীম মিষ্টি হাসি আর মিষ্টি কথা, মিষ্টি ব্যবহার। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস নাকি, রাখাল যা বলেছে, কিন্তু অত দেখায় না, চেহারাও সুন্দর, অল্পবয়সী বলেই মনে হয়।...এই প্রথম দেখার-মতো একটা পুরুষকে কাছ থেকে দেখল অনেকক্ষণ ধরে, সে ছবিটা এখনও মন আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে—এই সময় বিনা অপরাধে মার এই তিরস্কার বড় বেশী তিক্ত মনে হয়েছিল। জীবনে প্রথম স্বপ্ন দেখার মাধুর্য উপভোগ রূঢ় আঘাতে নষ্ট হয়ে গেল। অত সে নিশ্চয়ই বোঝে নি—সেই কারণেই কালীতারাও বোঝেন নি ওর অত ঝাঁঝের অর্থ।...

এর কদিন পরে মহেশ এলেন, মিউনিসিপ্যালিটির রসিদটা দিয়ে যেতে।

যথেষ্ট সাড়া শব্দ দিয়ে মাথা হেঁট ক'রেই এসেছেন, গাড়ি অনেক দূরে গলির মোড়ে রেখে—আচরণে কোন ত্রুটি হয়নি। রসিদটি পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে প্রণাম করলেন। কালীতারা রসিদটা তুলে দেখলেন তার খাঁজে দুখানা দশ টাকার নোট!

অতিকষ্টে মনের উচ্ছলতা দমন ক'রে উচ্চারণ করলেন, 'এসব কী বাবা?'

'কিছু না। ছেলের প্রণামী। ছেলেকে যদি কিছু দিতে চান আশীর্বাদী হিসেবে—ভাল দেখে সময়মতো একটা খুঞেপোশ বুনে দেবেন, তাহলেই খুব খুশী হব।'

মহেশ আর দাঁড়ালেন না।

কালীতারাও খুব একটা আপত্তি করতে পারলেন না। ভিক্ষুকের পর্যায়ে পেঁছিবার আগে ভগবান ধাপে ধাপে সইয়ে নেন, অপমান বোধটাকে কমিয়ে আনেন সেই সঙ্গে।

প্রয়োজন, খুবই প্রয়োজন। আজই চরম অবস্থায় পেঁছেছেন। ঘরে একদানা চাল নেই, কয়লা নেই, রান্নার কি আলো জ্বালার তেল নেই। শুধু একটু নুন পড়ে আছে। আগের দিন বেলা তিনটেয় মায়েঝিয়ে সত্যিসত্যিই নুনভাত খেয়েছিলেন, আজ এখনও পেটে কিছু পড়ে নি। বিক্রী করার মতো বাঁধা দেবার মতো আর একটুখানি সোনাই পড়ে আছে, এটুকু চলে গেলে—মেয়েটাকে গঙ্গায় ডুবিয়ে মারতে হবে। এ বিক্রী করা মানে সমস্ত ভবিষ্যৎ বাঁধা রাখা। তবু তাও করত হত, আজই করতে হত—কারণ চকচকে বাড়ি বা কলের নতুন পাইপ কামড়ে খাওয়া যায় না—যা প্রতিবেশীদের প্রচণ্ড চিত্তদাহের কারণ হয়েছে।

এই একান্ত দুঃখের সময়ে যেন অন্তর্যামীর মতোই প্রয়োজন বুঝে সকালবেলাই এটা দিয়ে গেলেন মহেশ।

তাঁর আচরণেও কোন ত্রুটি কি অশোভনতা ছিল না। শুধু উৎসুক চোখ দুটো বারবারই যে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল একবগ্গা ঘোড়ার মতো, শালীনতার শাসন অগ্রাহ্য ক'রে, ভবানীর চোখ এড়ায়নি সেটা।

ভেতরের ঘরের বন্ধ দরজার ফাঁক থেকে লক্ষ্য করেছে, আর কে জাবে কেন, ভাল লেগেছে। তবে এ ভাল লাগার যে কোন বিশেষ অর্থ আছে তা বোঝে নি। ভাল লেগেছে তাই কি বুঝেছে? সে সচেতনতা—সে সময় ও পরিবেশ, সামাজিক আবহাওয়ায় সম্ভব ছিল না। দেহের সঙ্গে মনকেও আষ্টে-পৃষ্টে নিয়মের ও শাসনের বাঁধনে বাঁধবার চেষ্টা হয়ত বৃথা—তবু তার কিছুটা প্রভাব পড়বে বৈকি।

॥ ২৪ ॥

এক দিনে এত বড় বিশাল কাহিনী বলা সম্ভব নয়।

বিনুরও তো সব তথ্য ও বর্ণনায় গূঢ় অর্থ বা ব্যঞ্জনা বোঝার বয়স সেটা নয়।

তিন-চার দিন ধরে বলেছেন বামুন মা, চুপি চুপি মহামায়ার কান বাঁচিয়ে। বিনু কতক বুঝেছে, কতক ঝাপসা ঝাপসা—কতক বয়স বাড়ার সঙ্গে একটু একটু ক'রে অভিজ্ঞতার আলোয় স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে সবটা। তবে যা শুনেছে না বুঝলেও, মনে ছিল সব কথাই। পরবর্তী কালে তৈরী-মনের রসে তার শুষ্কতা ও আপাত-অর্থহীনতা দূর হয়ে পরিপূর্ণ নিটোল কাহিনীতে পরিণত

হয়েছে। শোনা কথাগুলো ইটের গাঁথুনির মতো স্থায়ী হয়েছিল—পরে কল্পনা ও অভিজ্ঞতার পলেস্তারা পড়ে ইমারৎ সম্পূর্ণ হয়েছে।

এর পর এমনিই আসেন মহেশ মুখুজ্জে মধ্যে মধ্যে, কুড়ি-পঁচিশ দিন অন্তর অন্তর। কখনও বলেন, এই এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম একটু খবর নিয়ে গেলুম, কোন দিন বা বলেন, আর কোন টেক্সের নোটিশ-টোটিস আসে নি তো—তাই খবর নিয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু যখনই আসেন, প্রণামী বলে পনেরো-বিশ টাকা রেখে যান। কালীতারা আপত্তি করেন, তবে খুব জোর দিতে পারেন না। যদি ভিক্ষেই করতে হয়—সে অবস্থার তো বড় বেশী দেরিও নেই, এক পা বাকী আছে রাস্তায় দাঁড়াতে—এ সসম্মান ভিক্ষাই ভাল। এ শহরে একালে কে এমন আছে যে প্রণামী বলে ভিক্ষে দেবে?

যে যথার্থ দিতে চায় তাকে এড়ানোও শক্ত। একবার যখন কিস্তিটা পনেরো দিনে এসে দাঁড়াল তখন কালীতারা কিছুতেই নিতে চাইলেন না। বললেন, 'প্রয়োজনের বেশী নেব কেন বাবা, তাহলে লোভ বেড়ে যাবে। তুমি যথেষ্ট করছ, আর না। এ টাকা তুমি বরং অন্য কোন দুঃখীকে দাও, তাতে আমি বেশী আনন্দ পাব।'

এর পরের দিনই পিওন এসে কড়া নেড়ে একখানা খামের চিঠি দিয়ে গেল। প্রথম তো বিশ্বাসই হয় না—শেষে ঠিকানা আর নাম ঠিক দেখে নিতেই হল চিঠি। ওঁকে কে চিঠি দেবে? কে দিতে পারে? স্মরণ কালের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল ট্যাকসের চিঠি ছাড়া আর কিছু আসে নি। ঘরে গিয়ে খাম খুলে দেখলেন, একটা সাদা কাগজে মোড়া দুখানা দশ টাকার নোট। কোন চিঠি নেই, প্রেরকের নাম-ঠিকানাও নেই।

রাগ হয়েছিল কালীতারার, ভেবেছিলেন ঠিক এমনিভাবেই মহেশকে খামে ক'রে ফেরৎ পাঠাবেন টাকাটা, ভবানীই বারণ করল, বলল, 'এবার দৈবাৎ এসে গেছে। আমরা পাঠাব, তিনি যদি না পান? তিনি জেনে থাকবেন যে আমরা নিয়েছি—এবার এলে ভাল ক'রে বলে দিও বরং।'

অবশ্য তারপর—কালীতারা হাত জোড় ক'রে বুঝিয়ে বলতে মহেশও একটু সতর্ক হয়েছিলেন, মাসে একবারের বেশি আসতেন না, ঘন ঘন টাকা পাঠাবারও চেষ্টা করেন নি আর।

এও বলেছিলেন, 'অন্য লোককে দিয়েও পাঠাতে পারি মা, কিন্তু সে আপনার অসম্মান হবে। সোজাসুজি সাহায্য করছি বলে বুঝে নেবে। মুখে মুখে কথাটা ছড়াবে অনেক দূরে। অন্য অর্থ হবে হয়ত। কি দরকার!'

এর মধ্যে একদিন দৈবাৎ ভবানীর সঙ্গে সামনা-সামনি চোখোচোখি দেখা হয়ে গেল মহেশের। কালীতারা কি একটা যোগে স্নান করতে গিছলেন গঙ্গায়, কয়লাওলার কয়লা দিয়ে যাবার কথা, কড়া নাড়ার শব্দ শুনে সেই কথা ভেবেই দরজা খুলে দিয়েছে ভবানী, আরও নিশ্চিন্ত ছিল এই ভেবে যে এত সকালে কোন দিন মহেশ আসেন না। সকালে বিস্তর লোক জমে বাড়িতে, তাদের সঙ্গে কাজের কথা সেরে বেরোতে দেরি হয়ে যায়।

মহেশ অবশ্য ওকে দেখে আর বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেন নি। মা কোথায় প্রশ্ন মাত্র করে, তিনি স্নানে গেছেন শুনেই কপাট ভেজিয়ে দিয়ে চলে গিছলেন। ভবানীও উত্তর দিতে দিতেই ছুটে ঘরে চলে গিছল, পরে দরজা বন্ধ করার জন্যে নেমে দেখেছিল, ভাঁজ করা নোট দুটো ফেলে যেতে ভুল হয় নি।

চকিতে, এক লহমার দেখা, তাতেই অনিষ্ট যা হবার হয়ে গিছল। ভবানী অবশ্য বহু বারই দেখেছে আড়াল থেকে কিন্তু মহেশ সেই প্রথম দিনটির পর আর দেখতে পান নি। সেদিনের সেই ছবিই যথেষ্ট ছিল, আজকের সকালে সদ্য-স্নাত অনবগুণ্ঠিত মুখ—কবি না হয়েও মহেশের মনে পড়েছিল শিশির ধৌত পদ্মের উপমা—ওঁর মনে আগুন ধরিয়ে দিল।

সেই এক লহমার দেখাতে কিন্তু আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করতে অসুবিধা হয় নি মহেশের। সেটা ভবানীর পরনের শাড়ি। অতি সস্তা দামের শাড়ি একটা, তাও জরাজীর্ণ। একেবারে শতচ্ছিন্ন যাকে বলে তা হয়ত নয়—কিন্তু একটা সেলাই যখন সামনেই চোখে পড়ল তখন অন্যত্রও নিশ্চয় আরও একাধিক আছে। এসব দৈন্য মেয়েরা চোখের আড়ালে রাখারই চেষ্টা করে।

এই একটা চিত্রই মহেশের ভদ্রতাবোধ, আভিজাত্য ও হিসাব বুদ্ধি—সব ঘুলিয়ে দিল। এ মেয়ের এই বেশ—ঈশ্বরের অবিচার বলে বোধ হল তাঁর। দিন কয়েক পরে—অনেক ইতস্তত ক'রেও—আর স্থির থাকতে পারলেন না, আবেগে বিবেচনা-বুদ্ধি গেল ভেসে—তিনি কালীতারার জন্যে রেলির বাড়ির একটা থান ধুতি আর ভবানীর জন্যে একটা রঙীন শাড়ি—সাধারণ, দামী কিছু নয়—সেটুকু হিসেব তখনও ছিল—নিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

এবার কালীতারারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি বলতে গেলে জ্ঞান হারিয়ে বসলেন।

তার কারণও ছিল।

কিছুদিন ধরেই জ্ঞাতি ও প্রতিবেশী মহল সক্রিয় ও সরব হয়ে উঠেছিল এঁদের আলোচনায়। মহেশবাবু ওদের বাড়ি সারিয়ে দিয়েছেন—রাখাল অবশ্য সকলকে বলে বেড়িয়েছে বাড়ি বাঁধা রেখেই টাকাটা দিয়েছেন তিনি—কিন্তু জ্ঞাতিরা এ রটনায় ভোলার পাত্র নয়।

তা ছাড়াও উনি যে মধ্যে মধ্যে আসেন এখানে, তাও কারো জানতে বাকি নেই। যতই মহেশ গলির মোড়ে গাড়ি রেখে হেঁটে আসুন—কারও কোনদিন চোখে পড়বে না তা কি হয়। এই আসার সঙ্গে ওদের গ্রাসাচ্ছাদন কিসে চলছে—তার একটা মানসিক যোগফলে পেঁছিতেও দেরি হয় নি। এর ফলে যে অনুমান স্বাভাবিক তাই তাঁরা করেছেন—কালীতারা মেয়েকে ভাড়া খাটাচ্ছেন। শুধু সে স্থান ও সময়টা সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন তথ্য খুঁজে পাচ্ছেন না বলেই রীতিমতো সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করতে পারছেন না।

এদিকে ভবানীর রূপের দীপ্তি চাপা থাকছে না কোন মতেই। আগুনের মতো রূপ—তা নিন্দুকেও স্বীকার করবে। সে আগুনে পুড়ে মরতে বা পোড়াতে—শুধু পাড়ার বখা ছোকরারা নয়, অনেকেই উৎসুক। বাড়ির সামনে যখন তখন শিস দেওয়া, রসালো গানের কলি ভাঁজা—এমনকি কড়ানাড়া ঢিল

ফেলাও শুরু হয়েছে। একদিন তো দুজন পাঁচিল টপকে উঠোনেও নেমেছিল, এরা দুজনে প্রাণপণ চেঁচিয়ে উঠতে খিল খুলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। দূর থেকে কে বেশ চেঁচিয়েই বললে, 'তোদের কাজ নয়, তোদের কাজ নয়। যাস কেন ধাষ্টামো করতে? কত টাকা ছড়াতে পারবি তোরা? ফলনা মুখুজ্জের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবি?'

অনেকদিন ধরেই এসব লক্ষ্য করছেন কালীতারা। যারা ভালবাসে—যেমন রাখাল গোয়ালা, আগেকার ঝি গিরিবালা—এরা রটনাটা কি কি হচ্ছে, তা যতদূর সম্ভব রেখে ঢেকেই জানিয়ে যায়, কিন্তু নীরব থাকাটা উচিত নয়, সেটুকুও বুঝিয়ে দেয়।

অথচ কী যে করা যায় তাও ভেবে পান না। যারা ঐ ছোঁক-ছোঁক ক'রে বেড়াচ্ছে, বখা বেকার ছেলের দল তাদের সঙ্গেও বিয়ের কথা পাড়তে গেলেই বাপ-মা আড়াই হাজার তিন হাজার হিসেব দেয়। এবাড়ি বিক্রি করলেও অত উঠবে না। সুপাত্রর দর আরও বেশী। এখন কালীতারা সতীনের ওপর—দোজবরে এমনকি তেজবরেতেও দিতে রাজী কিন্তু সেও পাওয়া যায় না। বিনা দায়িত্বে মজা লুটতে চায় সবাই, দায় বহন করতে কেউ রাজী হয় না।

এর মধ্যে ঘটকও লাগিয়ে ছিলেন কালীতারা।

দোজবরে তেজবরে চেয়েই। সুন্দরী মেয়ে তাঁর, বুড়ো বররা তো অনেক সময় মেয়ের বাড়ির ঘরখরচা দিয়েও নিয়ে যায়। তিনি তেমন পাত্র পাবেন না, এমন দেবী-প্রতিমার মতো মেয়ে তাঁর?

কিন্তু একের পর এক ঘটকী আসে, চার আনা ছ আনা আগাম খরচা বলে নিয়ে যায়—কেউ আর দ্বিতীয়বার মুখ দেখায় না। শেষে একজন ডাকসাইটে ঘটকী একদিন এসে পরিষ্কার বলে গেল, 'এ আশা ছাড় বামুনমা, এপাড়া না ছাড়লে তোমার মেয়ের বে হবে না···বিচ্ছিরি সব ভাংচি পড়ছে, সে কথা শুনলে তোমার গলায় দাঁড় দিতে ইচ্ছে করবে।···মাঝখান থেকে আমাদের পুরনো ঘর নষ্ট হতে বসেছে, বলে জেনে শুনে আমাদের এই সব্বনাশটা করতে বসেছিলি!'

শোনেন আর পাথর হয়ে যান কালীতারা। সত্যিই এক-একদিন গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে। অথবা কী করবেন—কোথাও কোন পথ দেখতে পান না।

ঠিক সেই সময়টাকেই—মানসিক বিফলতা যখন চরম বিন্দুতে পেঁাছেছে—মহেশ শাড়ি নিয়ে এসেছিলেন।

কালীতারা একেবারেই জ্বলে উঠলেন—নিমেষে যেন এক প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল মহেশের সামনে। বললেন, 'এসব কি পেয়েছেন কি? এমনিই এপাড়ায় আর মুখ দেখাতে পারছি না, মেয়ের বিয়ের কথা উঠলেই কুচ্ছিৎ কুচ্ছিৎ ভাংচি পড়ছে—তার ওপর আরও কি চান। নরকে নেমে যাই সেইটেই কি আপনার মনের ইচ্ছে? ওরা যা বলে—আপনারও কি মতলব সেই রকম? সেই জন্যে এত উপকার করার ঝোঁক আপনার? কি ভেবেছেন কি আপনি? গরিব, ভিখিরী, সবই ঠিক—তবু ব্রাহ্মণের মেয়ে, গুরুবংশের বৌ। মেয়েকে ভাড়া

খাটাবার আগে নিজে হাতে গলা টিপে মেরে ফেলব—তারপর গিয়ে গঙ্গায় ডুববো। কিছু না পারি এই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে মা বেটি পুড়ে মরব। না, আপনি দয়া ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে যান এসব, অন্য ভাবেও দেবার চেষ্টা করবেন না।···ধাপে ধাপে এগোতে চান, না?···আজ কাপড়খানা সয়ে গেলেই কাল গয়না নিয়ে আসবেন। কী আস্পদ্দা আপনার! য়্যাঁ। ···আর কোনদিন কিছু দেবার চেষ্টা করবেন না, দোহাই আপনার। উপোস ক'রে মরতে দিন আমাদের, সে ঢের শান্তি।'

পাগলের মতোই বলে যাচ্ছিলেন কালীতারা। গলাটা যে ক্রমেই চড়ছে সে হুঁশও ছিল না। জানলায় জানলায় উৎসুক মুখ—উনি লক্ষ্য না করলেও ভবানী করেছিল কিন্তু মাকে থামাতে গেলে বেরিয়ে আসতে হয় ভেতরের ঘর থেকে—সে আরও অপরাধ হ্য়ত।

না দেখলেও অবস্থাটা অনুমান করতে অসুবিধা হয় নি মহেশবাবুরও। তিনি ব্যাকুলভাবে কি বলতে গেলেন, কালীতারা আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'না, আমি হয়ত আরও কি বলে বসব, এতবড় মানুষটা আপনি, অপমান করা হবে। আপনি আমাদের আর উপকার করার চেষ্টা করবেন না, আমাদের উপকার করা সম্ভব নয়।···আমি সতীনের ওপরও মেয়ে দিতে রাজী আছি—পারবেন বিয়ে করতে? দেখুন, সেই যথার্থ উপকার করা হবে। ওবাড়ি নিয়ে যেতে না চান—নিয়ে যাবেন না, কুলীনের মেয়ে বাপের বাড়ি থাকায় দোষ নেই। পারবেন?···না, পারবেন না আমি জানি। আপনি আসুন, আর কোনদিন কোন ছুতোয় এখানে আসবেন না।'

এরপর মাথা হেঁট ক'রে চলে আসতেই হয়েছিল মহেশবাবুকে। এই কটা মুহূর্তের মধ্যেই ঘেমে নেয়ে উঠেছিলেন। এপাড়ায় অনেকেই ওঁকে চেনে—তারা মজা দেখছে। একথা রটতে রটতে অভয় চাটুজ্যের কানে পেঁছিলে কি হবে—সেইটেই আসল চিন্তা।

গাড়ি থেকে এই সরু গলিটার মোড় এটা যে এতখানি পথ—এর আগে কোনদিন বোঝেন নি মহেশ।···

হয়ত একটু সান্ত্বনা পেতে পারতেন—যদি জানতেন উনি চলে আসার পর ভবানী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কেঁদে ফেলেছিল।

'কী করলে মা, যে লোকটা ভিক্ষে চাইবার মতো ক'রে ভিক্ষে পেঁছে দিয়ে গেল চিরকাল—তাকে কুকুর বেড়ালের মতো ক'রে তাড়িয়ে দিলে। যদি মরাটাই সোজা পথ হয় বাঁচবার, সেইটেই তো করতে পারতে। মিছিমিছি এতখানি উপকারের বদলে অকারণ এই অপমানটা করলে! চারদিকে শত্রুর দল, তাদের সামনে হেয় করলে। আর তাতেই কি আমাদের বদনাম ঘুচবে?'

মহেশদের কুলগুরুর বংশ লোপ হয়ে গিছল। শেষ যে পুরুষ ছিলেন, মহেশের বাবার গুরুভাই, তাঁর ছেলেপুলে ছিল না। তাঁর স্ত্রী আর বৌদি এই দুটি বিধবাই এ বংশের ঐতিহ্য আর গৃহদেবতা নিয়ে পড়ে ছিলেন। যারা দীক্ষা নিতে চাইত বৌদি বা বড়মাই দিতেন, তবে সে খুব পীড়াপীড়ি না

করলে নয়, বাকী সকলকে বলে দিতেন 'তোমাদের যেখানে মন চায় সেখানেই গুরু করো, তাতে কিছু দোষ হবে না, আমি অনুমতি দিচ্ছি!'

কেউ কেউ দত্তক নেবার কথা বলেছিলেন, বৌদি রাজী হন নি। বলেছেন, 'ঘর-বাড়ি, কিছু অন্য সম্পত্তিও আছে, অনেকেই সেই লোভে আসবে, কিন্তু এ বংশের ধারা বজায় রাখতে পারবে না। সে পাপ আমাদেরই অর্শাবে। না, আমরা যে হোক এক জন গেলে, অন্য কোন মঠে কি ঠাকুরবাড়িতে এই ঠাকুর আর সম্পত্তি সব বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে আর একজন। ভাগ্নেরা তো আছে, তারা সব চাকরি-বাকরি করে, হোটেলে খায়—গায়ত্রীটাই ভুলে গেছে—তাদের এনে আর এখানে বসাতে চাই না। আমার শ্বশুর বড় নিষ্ঠাবান ছিলেন, আমি থাকতে অনাচার ঢোকাব না।'

মহেশবাবু বড়মার কাছে দীক্ষা নেন নি, দীক্ষা নেবার কথা মনেও আসে নি তাঁর। কিন্তু কুলগুরু হিসেবে, বাবার গুরুবাড়ি বলে গুরুপূর্ণিমায় বার্ষিক প্রণামী পাঠানো বন্ধ করেন নি। উপরন্তু পুজোর সময় দুই জাকে দুটি থান ও কিছু প্রণামী পাঠাতেন, পুজোর পর সুবিধামতো এসে প্রণামও ক'রে যেতেন। এঁরাও পাল-পার্বণে নিয়মিত নিমন্ত্রন করতেন, মহেশ সময় পেলে আসতেনও, আর গেলে গৃহদেবতার প্রণামী দিতে ভুল হ'ত না।

সেদিনের সে ঘটনায় স্বাভাবিক কারণেই প্রথমটা খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন মহেশ। তিনি কোন অশোভন আচরণ করেছেন বলে তাঁর মনে পড়ে না, অথচ সমস্তটার জন্যই তিনি দায়ী হয়ে পড়লেন, লাঞ্ছনা ও অপমানের শেষ রইল না। যাকগে, উপোস ক'রে মরতে চায় কি গায়ে কোরোসিন তেল ঢেলে—তো মরুক। ওঁর চিন্তা এই নাটকের খবরটা না কোন রকমে শ্বশুরের কানে পেঁছিয়। এ ব্যবসা আর কেড়ে নিতে পারবেন না তিনি। দুর্ভাবনা সে জন্যে নয়—মহেশের উচ্চাশা তো এইটুকুতে থেমে নেই, তিনি চান আরও বহু দূর এগিয়ে যেতে, আর তা যেতে হলে কিঞ্চিৎ মূলধন প্রয়োজন। ভায়েরা এখনও উপার্জনক্ষম হয় নি। বরং তাদের জন্যে যথেষ্ট খরচ করতে হচ্ছে। একজন ডাক্তারী পড়ছে আর একজন ইঞ্জিনীয়ারিং—তারা পাস ক'রে কবে রোজগার শুরু করবে—করতে পারবে কিনা সবই অনিশ্চিত। না, অভয় চাটুয্যেকে বিরূপ করতে তিনি পারবেন না।

তা যেমন পারবেন না, তেমনি ভবানীকে অনিশ্চিত ভাগ্যের স্রোতে ভাসিয়ে দিতেও পারবেন না। সেটা কদিন পরে, প্রাথমিক উত্তাপটা কমে যেতে পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। ওরা উপোস ক'রে তিলেতিলে শুকিয়ে মরবে কিম্বা সত্যিই আত্মহত্যার চেষ্টা দেখবে—আর তিনি নির্বিকারভাবে বসে থাকবেন সেই খবরের প্রতীক্ষায়—সে সম্ভব নয়। অথচ, আর কাউকে দিয়ে টাকাটা পাঠাবেন—রাখাল বা ঐ রকম কোন সামান্য লোককে দিয়ে কি মণি অর্ডার করবেন—সে সাহসও আর নেই।

অনেক চিন্তা ক'রে একদিন উনি নিজের গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ভাড়াটে গাড়ি ক'রে বরানগরের দিকে রওনা হলেন। কোচম্যান সহিস উত্তম সংবাদবাহক। এটা তিনি এত দিনে বুঝেছেন, তাই আজকাল অনেক সময়ই নিজের গাড়ি না

নিয়ে ভাড়া গাড়িতে যান। গেলেনও অনেক হিসেব ক'রে, দুপুর পেরিয়ে—যখন ওঁদের প্রসাদ পাওয়া শেষ হয়ে যাবে, খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে পারবেন না। বাইরের লোকের ভিড়ও ফাঁকা হয়ে যাবে।

সব কথাই এঁদের খুলে বললেন উনি, নিজের অস্পষ্ট মনোভাব ছাড়া, সেটা ঠিক গোপন করার পর্যায়ে পড়ে না, কারণ তা কোন আকার ধারণ করে নি। তাছাড়া সবই বললেন, কালীতারার প্রথম সাহায্য প্রার্থনা করতে আসা থেকে শুরু ক'রে শেষ দিনের এই অনভিপ্রেত ঘটনা পর্যন্ত।

বড়মা বহুদর্শী মানুষ, অনেক রকম লোক দেখেছেন, এখনও নিত্য দেখছেন। স্থিরভাবে সব শোনার পর বললেন, 'তা তুমি এখন কি চাও বাবা? তোমার তো এখন আর বিয়ে করার উপায় নেই, সেও রক্ষিতা থাকতে রাজী হবে না—তাহলে এখন কি করতে বলো, কি করা উচিত বলে মনে হয়?'

মহেশ বললেন, 'না না, আপনার কাছে মিথ্যে বলব না, হয়ত একটা মোহ দেখা দিয়েছে মনে—তবে তার বেশী নয়। এটা কেটে যেতেও হয়ত খুব সময় লাগবে না। মেয়েটা কোন ভাল পাত্রে পড়ুক, বিয়ে-থা ক'রে এই অভাব আর লাঞ্ছনার হাত থেকে অব্যাহতি পাক—এই আমি চাই। অথচ কি যে করব তাও তো বুঝতে পারছি না। ওরা আমার কাছ থেকে আর কোন সাহায্য নেবে না, জোর ক'রে কিছু করতে গেলেও ওদের অনিষ্টই করব হয়ত। আমি আপনার কাছেই পরামর্শ চাইছি।...আপনি আপনার নাম ক'রে যদি কিছু সাহায্য করেন? বা এখান থেকে বিয়ের চেষ্টা করেন? আমি যদি কিছু দিন ওদের সংস্পর্শে না থাকি তাহলে তো আর এ সব বদনাম দিতে পারবে না কেউ!'

'বদনাম কি দিচ্ছে সত্যি সত্যিই নিজেদের বংশের কি পাড়ার একটা সৎ ব্রাহ্মণের ইজ্জৎ বাঁচাতে? মেয়েটার যাতে বিয়ে না হয়, শেষ পর্যন্ত ওদের হাতে ধর্ম লজ্জা সব বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়—তাই চাইছে। বিয়ের সম্বন্ধ করতে গেলে ওখান থেকে সরিয়ে আনতে হবে। দেখি কি করতে পারি। তুমি কিছু টাকা দিয়ে যাও, তারপর দেখছি আমি।'

বড়মা পরের দিনই দুই জায়ে মিলে একটা গাড়ি ভাড়া ক'রে খুঁজে খুঁজে গিয়ে উপস্থিত হলেন কালীতারাদের বাড়ি।

প্রথমটা দুটি ধোপদুরস্ত কাপড় পরা বিধবাকে এইভাবে অভিযান ক'রে আসতে দেখে একটু সন্দিগ্ধ—শুধু সন্দিগ্ধ কেন ভীতই হয়ে উঠেছিলেন কালীতারা। সেটা বুঝেই বড়মা কোন ভনিতা করলেন না, সোজাসুজি সত্যি কথাতেই এলেন। মহেশ সব কথাই তাঁদের কাছে খুলে বলেছেন। তাঁর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে কোন উপকার করা সম্ভব নয়, করতে যাওয়া বরং এঁদের পক্ষে বিপজ্জনক—তা মহেশ ভালভাবেই বুঝেছেন। এখন ভবানীর বিয়ে কিভাবে দেওয়া যায় যাতে কালীতারা দায়মুক্ত হতে পারেন—সেই পরামর্শের জন্যেই তাঁদের কাছে এসেছেন। তাঁরা মহেশের গুরুবংশের বৌ, বড়মার স্বামীই মহেশের বাবার গুরু ছিলেন, সে হিসেবে মহেশ তাঁর ছেলের মতো। এখন বংশে পুরুষ বলতে কেউ নেই। খুব ধরাধরি করলে বড়মাই দীক্ষা দেন। ঘরে বিগ্রহ আছে,

নিত্য সেবা হয়। একজন পুরোহিত এসে পূজো ক'রে যান। অন্নভোগ হয় ঠাকুরের। শ্বশুরের আমলের পূজার্চনা, পাল-পার্বণ ওঁরা এখনও বজায় রেখেছেন। এ পুরোহিতটি ভাল, তেমন বুঝলে দেবতা আর দেবোত্তর সম্পত্তি তাকেই দিয়ে যাবেন ওঁরা।

এত কথার পরও কালীতারার সংশয় ঘোচে নি। এদের এসব কথার উদ্দেশ্য খোঁজারই চেষ্টা করছেন মনে মনে। এখন প্রশ্ন করলেন, 'তা আমায় কি করতে বলেন ?'

বড়মা বললেন, 'যা শুনছি এখানে বসে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন না। আপনি অন্য ভাল ভদ্রপাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে যান। এ বাড়ি ভাড়া দিন। একানে-বাড়ি টাকা পনেরো—হেসে-খেলে ভাড়া উঠবে। নতুন পাড়ায় গিয়ে নতুন ক'রে ঘটকী লাগান, ভাল পাত্রই খুঁজুন, যা খরচা হয় মহেশ সব দেবে। আপনি তার জন্যে কুণ্ঠিত হবেন না, ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধার ব্রাহ্মণের ধর্ম, পুণ্যের কাজ। তেমন বোঝেন, সব কাজ সুছেরেংখলায় মিটে যায়—এই বাড়িটা তাকে লিখে দেবেন। ভাল জামাই হয় সেও দেনা শোধ ক'রে এ বাড়ি উধরে নিতে পারবে।'

'কিন্তু কোথায় কে বাড়ি খুঁজবে, কে দেখা-শুনো করবে সেখানে, নতুন পাড়ায় যাব—আরও বেশী বিপদে পড়ব না তো ? এ তবু এতকালের জানাশুনো—'

'বাড়ি আমরা খুঁজে দিতে পারব। ঠিকানা দোব—আপনি বরং একদিন মেয়েকে চাবি দিয়ে রেখে কোন বিশ্বাসী মেয়েছেলে—কি আপনাদের কে পুরনো গয়লা আছে চেনাশুনো—একজনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে নিজে দেখে আসুন, পাড়া বাড়ি বাড়িওলা সব। একটা সন্ধান এখনই লিখে দিয়ে যাচ্ছি—আমাদের ওখানে গিয়েও থাকতে পারতেন, ঘর তো পড়েই আছে দুখানা, তবে সে নিত্যি বিস্তর লোকের আনাগোনা, সোমত্ত মেয়ে নিয়ে না থাকাই ভাল—আমাদের পূজুরী বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর করে, ভাল বামুন ওরা, তার নিজের বাড়িতেই একটা বড় ঘর খালি আছে। আমি বললে এখনই ভাড়া দেবে, কে কোত্থেকে বদ লোক আসবে, এই ভয়ে দেয় না। তারাই দেখা-শুনোও করতে পারবে। আমরা কাছেই থাকি, আমরাও খোঁজ-খবর করব। নামকরা গুরু বংশ আমাদের, এক ডাকে এখনও হাজার লোক জড়ো হবে, কেউ কোন ট্যাঁ-ফোঁ করতে সাহস করবে না। ব্রাহ্মণ-প্রধান পাড়া, একটা পাত্র পাওয়াও খুব শক্ত হবে না। আমি লোক পাঠাতে পারি, তবে সে আপনার সন্দেহ হবে। আপনিই কাউকে নিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া ক'রে চলে যাবেন বরং—'

বড়মা একটা কাগজে ওঁদের পুরোহিতের ঠিকানা লিখে পঁচিশটা টাকা জোর ক'রে হাতে গুঁজে দিয়ে চলে গেলেন। কালীতারাও আর বাধা দিতে পারলেন না। সত্যি সত্যিই দুদিন চিঁড়ে খেয়ে কেটেছে, কাল তাও জুটত না।

যে অপমান তিনি সেদিন করেছেন তার পরও সেকথা ভুলে গিয়ে লোকটা তাঁদেরই কল্যাণ চিন্তা করছে—এ দেবতা ছাড়া কি ?

মেয়েটাকে চোখে লেগেওছে।

এই পাত্রর হাতে যদি ওকে তুলে দিতে পারতেন!

ঘর পাড়া দেখলেন, পছন্দও হল। মানুষগুলিকেও মোটামুটি মন্দ লাগল না। ভাড়া কত প্রশ্ন করতে বড়মা বললেন 'সে মহেশ ওর সঙ্গে কথা বলেছে—যা করবার সে-ই করবে। আপনি মাথা ঘামাবেন না।'

সব ঠিক হল একরকম—তবু কি আসতে মন চায়! যতই হোক নিজের বাড়ি। এই বাড়িতেই এতকাল কাটল। চারিদিকে জ্ঞাতি-আত্মীয় পরিচিত লোক সব। তাছাড়া—এভাবে চলে গেলে আরও কত কি দুর্নাম উঠবে তার ঠিক কি।

আবার মনে হয়—এখানে থেকেই বা কি করবেন। এপাড়া, আত্মীয়রা—যেন তাঁদের সর্বনাশ করতেই বদ্ধপরিকর। এখানে বেশী দিন থাকলে হয় আত্মহত্যা নয় মেয়েটাকে নরককুণ্ডে ঠেলে দেওয়া—এছাড়া কোন পথ থাকবে না।

অগত্যাই দিন স্থির করতে হয়। বড়মা পাকা লোক, তিনি সৎ পরামর্শ দেন', দুটো একটা জিনিস আগে পাচার করো, তারপর তোমরা দুজনে চলে এসো; কোথায় যাচ্ছ কি বিত্তান্ত কাউকে বলবার দরকার নেই। আমার এক উকীল শিষ্য আছে, বাগবাজারে থাকে, খুব দুঁদে লোক, বাকী মাল আনা, বাড়ি ভাড়া দেওয়া কি বিক্রী করা সে সব করবে। তোমার কোন জিনিস ক্ষতি হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

'কী আর আছে দিদি, ক্ষতি হবার মতো। সবই তো বেচে খেয়েছি। থাকার মধ্যে একটা ভাঙ্গা তক্তপোশ, আর ছেঁড়া বিছানা। দু-একখানা পাথরের বাসন—বিক্রী হয় না তাই পড়ে আছে। এই তো, আর কি। পুরনো তোরঙ্গ কটা—সে গেলেই বা কি থাকলেই বা কি।'

তবু বলতে বলতেই চোখে জল এসে যায় কালীতারার।

নতুন পাড়ায় নতুন অনভ্যস্ত পরিবেশে এসেই হয়ত— এতকালের জীবনযাত্রার মূলসুদ্ধ উপড়ে চলে আসার জন্যেই—অথবা দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা অর্ধাশনে, অনশনে আত্মীয়দের কদর্য শত্রুতার শরীর আগে থেকেই ভেতরে ভেতরে ভেঙ্গে আসছিল, এখন এইভাবে একেবারে পরভৃৎ হয়ে পড়ার অসম্মানে কালীতারার শরীর দ্রুত ভেঙ্গে আসতে লাগল।

আর সেটা কালীতারা নিজে যতটা না বুঝেছিলেন বড়মা বুঝেছিলেন অনেক বেশী। ভেতরে ভেতরে ঘুণধরা দেহ, যেদিন ভেঙ্গে পড়বে একেবারেই গুঁড়ো হয়ে যাবে। পশ্চিমের দিকে এক-একটা বিরাট শালগাছে জ্যান্ত অবস্থাতেই উই ধরে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না, শেষ পর্যন্ত দু-চারটে নতুন পাতা লেগে থাকে—যেদিন ভেঙ্গে পড়ে সেদিন দেখা যায় গুঁড়ো মাটি কতকগুলো, কিছুই ছিল না ভেতরে।

তিনি ব্যস্ত হয়ে চারিদিকে ঘটক লাগান, সম্বন্ধও আসে কিন্তু পছন্দ হলেই পরিচয়ের প্রশ্ন ওঠে। বাপের দিকে কে আছে, মামার বাড়ি কোথায়—এ

তো প্রথম কথা। বিশেষ পাত্রপক্ষ এতবড় সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে, বিনা, ভালরকম খোঁজ-খবরে নেবেন তাও সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণের আত্মীয়তার সূত্র কলমীর দলের মতো—বহু দূর বিস্তৃত অথচ ঘনসম্বন্ধ—পরিচয় পেলে আত্মীয়দের খোঁজ পেতে আর কতক্ষণ লাগে।

সেই কারণেই মেয়ে দেখে বিস্তর উৎসাহ দেখিয়ে যান যাঁরা, কত তাড়াতাড়ি এঁরা বিয়ে দিতে পারবেন জানতে চান, তাঁরাও আর কোন খবর দেন না, একেবারে নীরব হয়ে যান। অথবা ঘটক কি ঘটকী এসে মুখ বেজার ক'রে বলে, 'মেয়ের নামে বেস্তর বদনাম বড়দিদিমা, এর সম্বন্ধ করা ঝাবে না।'

একথা যেমন রেখে ঢেকেই এরা বলুন কালীতারার বুঝতে বাকী থাকে না অবস্থাটা। তিনি এইবার একেবারেই শয্যা গ্রহণ করেন। জ্বরজাড়ি কি অন্য কোন ভারী অসুখও নয়—শুধুই দুর্বলতা আর আহারে অরুচি। কিছু খান না বা খেতে চান না, অথচ উঠলেই মাথা ঘোরে—জপে আহ্নিকে বসতেও কষ্ট হয়। এইবার তিনি নিজেও বোঝেন যে আর বেশী দিন নয়, মুক্তি দ্রুত এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে।

বড়মা বিপদ বুঝে মহেশকেই খবর দেন শেষ পর্যন্ত।

খবর যে দিয়েছেন সেটা কালীতারাকেও জানিয়ে দেন। নিঃশব্দেই শোনেন কালীতারা, কোন প্রতিবাদ করেন না।

মহেশ এসে বিছানার পাশে মেঝেতেই বসে পড়লেন, আস্তে আস্তে বললেন, 'মা, আমাকে ডেকেছিলেন?'

কালীতারা সেদিন সকাল থেকেই নিঃশব্দ কাঁদছেন, ওঁকে দেখে সে জলের ধারা বেড়েই গেল। অনেকক্ষণ অবধি কোন কথা বলতে পারলেন না, শেষে কোনমতে উচ্চারণ করলেন, 'বাবা, আমার মেয়েটা—?'

অবস্থা দেখে মহেশ আর বৃথা সংকোচ রাখলেন না। ওঁর মেয়েকে তিনি সাদরে সাগ্রহে নিতে রাজী আছেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে ক'রে। কিন্তু তাঁর শ্বশুরের সঙ্গে যা বন্দোবস্ত—প্রকাশ্যে এখন অন্য বিয়ে করা চলবে না। পুরোহিত ডেকে শাস্ত্রমতেই বিয়ে করবেন তিনি, তবে যেটুকু ঐ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান, নারায়ণ আর অগ্নি স্বাক্ষী রেখে, কুশণ্ডিকাও করবেন—তার বেশি কিছু নয়। কাউকে এখন জানানো চলবে না। বিবাহের অন্য যেসব লোকাচার স্ত্রীআচার সে সবও বাদ দিতে হবে। উনি স্ত্রী বলেই গ্রহণ করবেন, সেইভাবেই রাখবেন, কালে আত্মীয় স্বজনের কাছে স্বীকৃতি দিতেও পারবেন। তবে এখন একটা বিরাট ব্যবসায় হাত দিতে যাচ্ছেন, তাতে শ্বশুরের কাছ থেকে অনেক টাকা নিতে হবে—এখন তাঁকে বিরূপ করা চলবে না। পরে এ কাজ সফল হলে, হবে তা তিনি জোর ক'রেই বলতে পারেন—শ্বশুরের টাকা মিটিয়ে দেবার পর তিনি এটা প্রকাশ করবেন অবশ্যই। আর ইতিমধ্যে এই স্ত্রীর নামে তিনি কিছু কিছু বিষয় আশয় করতে থাকবেন—তাতে কারও কোন হাত থাকবে না। চাই কি এর নামে কিছু কিছু ছোটখাটো ব্যবসাও করবেন যাতে তার ওপর ওঁর প্রথম পক্ষর কোন দাবী না থাকে। তবে আপাতত শ্বশুরের কাছে কথাটা গোপন রাখতেই হবে।

কালীতারার কান্নার বেগ আরও বাড়ল। এই জন্যেই কি তিনি এতকাল এত যুদ্ধ ক'রে এলেন! তবু একটু পরে বললেন, 'তাই যা হয় করো বাবা, আমি আর ভাবতে পারছি না। আমার দিন একেবারেই ফুরিয়ে এসেছে, ওর সিঁথেয় সিঁদুরটা দেখব বলেই কোনমতে যেন প্রাণটা ধরে রেখেছি।' তারপর এক রকম অশ্রুবিকৃত হাসি হেসে বললেন, 'ও আবাগীও তোমার পায়ের কাছেই থাকতে চায়—বোধহয় ঝি হয়ে থাকতেও ওর আপত্তি নেই।'…

তাই হল। কালীতারা যে শয্যা নিয়েছেন সেই শেষ শয্যা, তা বুঝতে কারও বাকী ছিল না। দু-তিন দিনের মধ্যেই একটা লগ্ন ছিল গভীর রাত্রে, সেই লগ্নেই বিবাহ হয়ে গেল। স্ত্রী আচার হল না, উলু পড়ল না—নিতান্তই মন্ত্র পড়ার হোম করার অনুষ্ঠান যেটুকু, সেইটুকুই হল। কুশাণ্ডিকাও শেষ রাত্রেই সেরে নিয়ে ভোরবেলা মহেশ তাঁর নববধূকে নিয়ে চলে গেলেন। কালীতারা উঠে সম্প্রদানও করতে পারলেন না, পুরোহিতই আভ্যুদয়িক ও সম্প্রদান করলেন—তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে।

বাড়ি মহেশ আগেই ভাড়া ক'রে রেখেছিলেন। একটু গলির মধ্যেই নিয়েছিলেন, নিয়মিত যাওয়া আসার দৃশ্যটা না চট ক'রে কারও চোখে পড়ে। গত দুদিনের মধ্যেই বাড়ি পরিষ্কার করিয়ে—আসবাবপত্র, বিছানা, ঝি-চাকর রাঁধুনী—সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ রেখেছিলেন। ভবানী সাজানো সংসারে নতুন বৌ নয়—যেন গৃহিণী হয়ে এসেই উঠল।

সেই নতুন জীবন, নতুন সংসারের শুরু। মহেশের স্ত্রী ক্ষণপ্রভা নাকি এটা অনুমান করেছিলেন, মহেশকে প্রশ্ন করতে মহেশও তাঁর কাছে গোপন করেন নি। তার প্রয়োজনও ছিল না। ক্ষণপ্রভা স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। একটি ছেলে হওয়ার পর থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন নানান অসুখে, প্রায়ই শয্যাগত থাকেন, মেয়েরা বলে 'শুকনো সূতিকা', কেউ কেউ বলে থাইসিসের পূর্বাভাস। এইভাবে চিররুগ্ন হয়ে স্বামীর গলায় পাথরের মতো ঝুলে থাকছেন, এতে লজ্জার অবধি ছিল না তাঁর। রীতিমতো যেন অপরাধী বোধ করতেন নিজেকে। এটা জানতেন বলেই মহেশ একমাত্র তাঁর কাছেই সত্য কথা বলেছিলেন।

ক্ষণপ্রভা রাগ কি অভিমান তো করেনই নি বরং বার বার বলেছিলেন, 'তাকে এখানেই নিয়ে এসো। আমি বাবাকে বলে ক'য়ে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করব। তুমি এই দিনরাত ভূতের মতো খাটছ, একটু সেবাযত্নও করতে পারি না। সে যদি সে ভারটা নেয় তাহলেও আমার শান্তি। চাই কি আমারও একটা গল্প করার লোক হয়।'

মহেশের এতটা সাহস হয় নি। অভয় চাটুয্যেকে মেয়ের থেকে মহেশ বেশী চিনতেন। বলেছিলেন, 'এখন না, মস্ত একটা কাজে হাত দেবার ইচ্ছা। উনি এখন বিগড়োলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। কিছুদিন যাক, এদিকটা একটু গুছিয়ে নিই, তারপর যা হয় হবে।'

সম্পূর্ণ স্ত্রীর মর্যাদাতেই রেখেছিলেন মহেশ ভবানীকে, শাশুড়ির মৃত্যুশয্যায়

তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন খুব শিগগিরই এই মর্যাদা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিতও করবেন তিনি। বন্ধুবান্ধবদের কাছ স্ত্রীই বলতেন, সামনে বলতেন আমার ছোট বৌ, আড়ালে বলতেন দু নম্বর। ভবানীকে রাজার হালেই রেখেছিলেন, এত সুখ এত স্বাচ্ছন্দ্য ওর সমস্ত রকম অভিজ্ঞতা-কল্পনার অতীত। বামনী রেঁধে দেয়, পরনের কাপড়টা পর্যন্ত ঝি কাচে। কোথাও যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেই দুটো গাড়ির—ব্রুহাম আর ল্যাণ্ডোলেট যে কোন একটা এসে দাঁড়ায়, সহিস সেলাম ক'রে দরজা খুলে দেয় গাড়ির। মহেশ আজকাল কারও সঙ্গে ব্যবসা সম্পর্কিত কোন গোপন পরামর্শ করতে হলে এবাড়িতেই আনেন। তারাও 'বৌদি' বলে সসম্ভ্রমে নমস্কার করে।

অভয়ের মতো পাকা ও দুঁদে লোক কি এখবর পান নি? একই শহরে, দুপক্ষেরই পরিচিত বহু লোক কাছাকাছি বাস করে। অভয়ের বাড়ি থেকে মহেশের নতুন বাসা দেড় মাইলেরও কম। বিশেষ গাড়ি যাতায়াত করে, সহিস কোচম্যান সবাই জানে যখন, সে সংবাদ ছড়াতে বেশী দেরি হবার কথা নয়, এরাই ভাল গোয়েন্দাও। রাত্রে এখানেই থাকেন আজকাল বেশির ভাগ দিন, তাই ভাল কোন খাবার হলে ক্ষণপ্রভা কোচম্যানকে কি দারোয়ানকে দিয়ে তা পাঠিয়ে দেন। তারা সে গল্প কারও কাছে করবে না তাও সম্ভব নয়। তবে মহেশ তাঁর অনুচর সকলেরই প্রিয়, জেনেশুনে অনিষ্ট করবে না।

খবর পেয়েছিলেন বৈকি। কিন্তু আরও অনেক আগে থেকে পেয়েছিলেন বলেই উদ্বিগ্ন হবার কারণ বোঝেন নি, অর্থাৎ অন্যরকম ধারণা হয়েছিল। কালীতারা নিজেদের বাড়িতে থাকার কালেই রটেছিল তিনি মহেশের কাছে মেয়েকে ভাড়া খাটাচ্ছেন। সেই মেয়েকেই কোথায় সরিয়ে নিয়ে গিছলেন মহেশ, এখানে নানারকম কথা উঠছিল বলে। মেয়েটার মা মরে যেতে তাকে এনে পুরোপুরি বাড়িভাড়া ক'রে রেখেছেন। অর্থাৎ ধরে নিয়েছিলেন ভবানী মহেশের রক্ষিতা।

অভয় এ ব্যবস্থায় কোন দোষ দেখেন নি। তখন ধনী হওয়ার প্রধান একটা লক্ষণ (বা কর্তব্য) ছিল রক্ষিতা রাখা। ঘরে ঘরে প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা তখন চালু ছিল না, সুতরাং উপায়ই বা কি? ছেলে একাজ করলে বাপ খুশী হতেন, নিশ্চিন্তও হতেন। অভয়ও নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। আর তাঁর মুখ থেকেই সংবাদটা ছড়ানোয় মহেশের ভাইরাও মেনে নিয়েছিল এবং যুগধর্ম অনুযায়ী এতে দোষও দেখে নি।

ভবানীর সন্তান হতে শুরু হল যখন, তখনও মহেশ যা কিছু কৃত্য সমস্ত ক'রে গেলেন, এমন কি অন্নপ্রাশনে নান্দীমুখ পর্যন্ত কিছু বাদ গেল না। কিন্তু এবার এদের ভবিষ্যতের কথাটা ভাবতে হয়, ভবানীও সে কথাটা যে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে না তা নয়—অবসর পায় না। এর মধ্যে মহেশ বিরাট এক ব্যবসায় লেগে গেছেন, দিনরাত সেই চিন্তা ও কাজেই কাটে। গুজরমল মারোয়াড়ি বিলিতি কাপড় আমদানী করত—জাহাজ জাহাজ। স্বদেশী আন্দোলন প্রবল হতে বিলিতী জিনিস পোড়ানো শুরু হল যখন তখন বিস্তর ক্ষতি হয়ে গেল। আরও হতে পারত—মহেশেরই পরামর্শে বড়বাজারে আর

জোড়াবাগানে কয়েকটা পুরনো বাড়ি ভাড়া করে গুদোমজাত করতে বেঁচে গেল অনেকটা।

এর আগে একটা ঠিকার ব্যাপারে মহেশের সঙ্গে গুজরমলের আলাপ হয়েছিল। ক্রমে সেটা বন্ধুত্বে পরিণত হয়। মহেশ শুধু তখনকার মতো বাঁচালেন না, টাকাটা আটকে পড়েছিল, কাপড় পচে গেলে সবটাই লোকসান হত—তারও একটা ব্যবস্থা করিয়ে দিলেন। স্বদেশীওলাদের কথা না শুনে গুজরমল দশেরার দিন রেলী ব্রাদার্সকে বিলিতী কাপড়ের অর্ডার দিয়েছিল—এই জন্যে তারা গুজরমলের খুব অনিষ্ট করার চেষ্টা করছে, ডাকাতী করা কি ওকে খুন করাও আশ্চর্য নয়—সরকারী মহলে এক বন্ধু সাহেবকে দশ হাজার টাকা ঘুস দিয়ে, লাট সাহেবের সেক্রেটারীর স্ত্রীকে হ্যামিলটনের দোকান থেকে জড়োয়া নেকলেস উপহার দিয়ে সব মালটা সরকারকে দিয়ে কিনিয়ে দিলেন মহেশ। মহেশ নিজে পেলেন মাত্র পাঁচ হাজার টাকা।

এরপর মহেশেরই পরামর্শে একটা আধমরা কাপড়ের কল কেনে গুজরমল। গুজরমলের চালাবার সাধ্য ছিল না, সে মহেশকে ধরল বিনা পুঁজির অংশীদার হয়ে কারবার চালু করতে। মহেশ রাজী হলেন, লেখাপড়াও একটা হল। যা লাভ হবে তা থেকে গুজরমলের বারো আনা, ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে মহেশের চার আনা। পার্টনারশিপ ব্যবসায়ে যে শর্ত থাকে, এখানেও তা ছিল, মহেশের মৃত্যু ঘটলে এ অংশীদারত্ব এইখানে শেষ হয়ে যাবে। গুজরমলই কলের ক্রেতা হিসেবে পুরো মালিক থাকবেন।

কিছুদিন কল চালিয়েই মহেশ বুঝলেন এসব কাপড় বাজারে চালানো যাবে না। গুণচটের মতো কাপড় হয়, পাড়ের রঙ থাকে না—নানান দোষ। মহেশের মাথায় চট ক'রে বুদ্ধি খেলে গেল, তিনি চিঠি-চাপাঠি করে জার্মানী থেকে মিলের পুরনো কলকব্জা পাঠিয়ে সেই মতো নতুন আনাবার ব্যবস্থা করলেন। সে অনেক টাকার খেলা। গুজরমলের হাতে আর তখন টাকা নেই, একটা বড় দাঁও মারতে গিয়ে শেয়ার মার্কেটে বিষম ঘা খেয়েছে। স্থির হল এ টাকা মহেশই ঢালবেন ব্যবসায়, তার জন্যে দশ আনা ছ'আনা লাভের অংশ ঠিক হল। মহেশ পুরোপুরি অংশীদার হলেন। যে কোন অংশীদারেরই আগে মৃত্যু হলে আর একজন মৃতের ভাগের যা মূল্য তা বুঝিয়ে দেবেন অথবা কারবার বেচে—এই হিসেবেই ভাগ হবে।

এইসব শর্তের একটা দলিল বা 'ডীড'ও লেখা হয়েছিল, যথারীতি স্ট্যাম্প কাগজে—শুধু গড়িমসি করে সেটা রেজেষ্ট্রী করা হয় নি। গড়িমসি বলাও হয়ত ভুল, আসলে সময়াভাব। দুজনেই অত্যন্ত ব্যস্ত, একটা সময় ক'রে দুজনে একসঙ্গে রেজেষ্ট্রী আপিস যাবেন সেই সময়টাই মেলে নি। তাছাড়া তখন এমনই গাঢ় বন্ধুত্ব দুজনে, অবিশ্বাসের কোন প্রশ্নই ওঠে নি। অন্তত মহেশের দিক থেকে। অথচ এই টাকাটা—যা উনি ঢেলেছিলেন তার পুরোটা অনেক চেষ্টা ক'রেও মহেশ যোগাড় করতে পারেন নি, শ্বশুরের কাছ থেকে হাজার কুড়ি টাকা ধার করতে হয়েছিল।

এরকম সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে এই ভেবেই তাঁকে চটাতে চান নি মহেশ।

আসলে ঠিকাদারীর কোন নিশ্চয়তা নেই, প্রতিটি কাজের জন্যেই ধরপাকড় আর ঘুষ—দেখে দেখে মহেশের একাজে অরুচি ধরে গিছল। অন্য একটা স্থায়ী বড় ব্যবসার কথা ভাবছিলেন অনেকদিন থেকেই। গুজরমালের এই কাপড়ের কল তাঁর সৌভাগ্যলক্ষ্মীর নির্দেশ আর আশীর্বাদ বলে ধরে নিয়েছিলেন।

মহেশের এটা মরার বয়স নয়, স্বাস্থ্যও খারাপ ছিল না কোনদিন। এর মধ্যে কখনও কোন ক্লান্তিও বোধ করেন নি। কেউ এ সম্ভাবনার কথা একবারও ভাবে নি তাই। মহেশ নিজেও না। ভাবলে দলিলটা অন্তত রেজেস্ট্রী করিয়ে নিতেন।

দিল্লীতে তখন বিস্তর কাজ। নতুন রাজধানী বিস্তার লাভ করছে, ঘর-বাড়ি রাস্তাঘাট বড় বড় অফিস বিল্ডিং সবই দরকার, অনেক অনেক। বড় বড় ঠিকা দেওয়া হচ্ছে সরকার থেকে, কোটি কোটি টাকার। সাহেব কোম্পানী বা মার্টিনের মতো বড় বড় আধা-দেশী কোম্পানীই পাচ্ছে সে সব কাজ। কিন্তু বৃহৎ কাজে রবাহূতদের জন্যও কিছু ব্যবস্থা থাকে, ছোটখাটো টুকরো টাকরা, এদিক ওদিকে ছিটকে পড়ছে প্রত্যাশী কুকুরদের সামনে উচ্ছিষ্ট মাংস বা হাড়ের টুকরোর মতো। সেগুলো একটু তদ্বির করলেই পাওয়া যায়। তাছাড়া বড় ঠিকাদাররাও অপরকে ঠিকা দিচ্ছেন ভাগাভাগি ক'রে। যাই পাওয়া যাক, লাখ লাখ টাকার খেলা।

এমনি একটা কনট্র্যাক্টের প্রাথমিক কথাবার্তা হবার পর ব্যবস্থা পাকা করতেই দিল্লীতে গিছলেন মহেশ। সেটা বৈশাখের শেষ, দুঃসহ ভয়াবহ গরম। এখনকার বৃক্ষবহুল ছায়াচ্ছন্ন দিল্লী দেখে সে সময়কার সে মরুভূমি কল্পনাও করতে পারবেন না কেউ। তখন গ্রীষ্মকালে চারিদিক থেকে আগুন বৃষ্টি হত, সমস্ত দেহ জ্বলত শুধু। এক ফোঁটা ঘাম হত না। জ্বালা শুধু, সব পুড়ে যাচ্ছে এই মনে হত।

মহেশ এ সময় কখনও আসেন নি, তবে তাই বলে গরমের জন্যে কি রৌদ্রের ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকবেন, ঈশ্বর সে ধাতুতে তাঁকে গড়েন নি। সেখানে পেঁছে সারাদিন টাঙ্গা ক'রে ঘুরেছেন, বেলা পাঁচটায় হোটেলে এসে জামাকাপড় খুলে বাথরুমে ঢুকেছেন স্নান করতে। সরকার নিষেধ করেছিল, উনি জবাব দিয়েছিলেন, 'ঘামের ওপর চান করলে সর্দি গর্মি হয়, এ ঘাম কোথায় ?' কিন্তু যেমন ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢেলেছেন, সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন। সরকার অতটা বোঝে নি প্রথমটায়, অনেকক্ষণ সাড়া শব্দ না পেয়ে প্রথম ডেকেছে, দরজায় দুমদুম করে লাথি মেরেছে, তারপর দরজা ভেঙ্গে দেখেছে ঐ ব্যাপার।

হোটেলের ম্যানেজার তখনই ডাক্তার ডেকেছেন, হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিন্তু তাঁর চিকিৎসার আর কোন অবসর ছিল না। হাসপাতালে যাবার আগেই মারা গেছেন। কিছু লিখে রেখে বা কাউকে কিছু বলে যেতে পর্যন্ত পারলেন না। বোধ হয় বুঝতেই পারলেন না তিনি মারা যাচ্ছেন।

সরকার বাড়িতে খবর দিতে ভাইয়েরা ছেলেকে নিয়ে গেছেন, দিল্লীতেই

দাহ ইত্যাদি হয়েছে। ভবানীরা কোন খবরই পায় নি।

বিপদ বা দুর্ভাগ্য একা আসে না। ক্ষণপ্রভা বেঁচে থাকলে কি হত বলা যায় না। তিনি হয়ত এসে জোর ক'রে ভবানীকে ভবানীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতেন, বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে রাগারাগি ক'রে নিজেই ছেলের অভিভাবক হিসেবে সম্পত্তির অংশ দিতেন। অবশ্য সম্পত্তি বলতে তখন পৈতৃক বাড়িই—যা কিছু উপার্জন করেছেন মহেশ সবই নতুন নতুন কারবারে ঢেলেছেন, তাঁর বিশ্বাস এবং মতও ছিল—জমিদার হয়ে বসতে গিয়েই বাঙালীরা লক্ষ্মীমাকে মারোয়াড়িদের বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে।

তবে ভবানীর জন্যে একটা কিছু করা দরকার এটা মহেশের মাথায় ছিল। দিল্লী যাবার আগেই সিমলে কাঁসারিপাড়ায় একটা ছোট বাড়ি দেখে ভবানীর নামে পাঁচশো টাকা বায়না ক'রে গিছলেন। মোট ষোল হাজার টাকা দাম ঠিক হয়েছিল। দোতলা বাড়ি—একটু গলির মধ্যে, তা হোক, ওপর নিচে মোট ছখানা ঘর, এদের যেমন দরকার। কথা ছিল ফিরে এসে য়্যাটর্ণীকে দিয়ে দলিলপত্র দেখিয়ে বাড়িটা কিনে দেবেন।

সেও হল না, সবচেয়ে ভাগ্যের বড় মার, ক্ষণপ্রভাও রইলেন না। এক আশ্চর্য খেল দেখালেন তিনি। দশপিণ্ডর দিন—ঘাট করতে যাবার সব ব্যবস্থা হচ্ছে যখন, তখন দেখা গেল ক্ষণপ্রভা কখন নিঃশব্দে মারা গেছেন। কাউকে ডাকেন নি, কোন যন্ত্রণা প্রকাশ করেন নি, বোধহয় টেরও পান নি—ঘুমের মধ্যেই কখন মহাঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন।

তখন মহেশের প্রথম পক্ষর ছেলে কনকের বয়স মাত্র দশ। ক্ষণপ্রভার স্বভাব ছিল মধুর, দেওরদের মায়ের মতোই আগলে রাখতেন, যখন যা দরকার ওদের মুখ দেখেই বুঝতে পারতেন—সময় অসময়ে হাতে না থাকলে বাবার কাছ থেকে টাকা এনে ওদের দিতেন। যদিও বড় দেওর তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু বড়ই হবে।

বৌদির প্রতি ভক্তি আর কৃতজ্ঞতায়—তাঁর ছেলে—সদ্য বাবা-মা মরা ভাইপোটার ওপরই সমস্ত সহানুভূতিটা গিয়ে পড়ল।

টাকা হাতে কিছুই ছিল না। বড় মোহন ডাক্তার—প্রথম একটা চাকরিতেই ঢুকেছিলেন, সরকারী চাকরি, ঠিক এই সময়ই বিদেশে বদলীর নোটিশ আসতে ছেড়ে দিয়ে প্র্যাকটিশ শুরু করলেন, হয়ত বা বৌদির আশীর্বাদেই—দেখতে দেখতে বেশ জমেও গেল। এও একটা বৌদির প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার কারণ। এই চাকরি নেওয়াতে ক্ষণপ্রভার ঘোরতর আপত্তি ছিল, তিনি নিজের গয়না বেচে ডিসপেনসারী সাজিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। পরেরটি ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী চাকরি পেয়েছিলেন, দুজনে উঠে পড়ে লাগলেন কনকের প্রাপ্য উদ্ধার করতে।

ঠিকাদারী ব্যবসাতে মহেশের আড়াই লাখ তিন লাখ টাকার মতো লগ্নী ছিল। সে হিসেবও সব পাওয়া গেল না। কাগজপত্রের ব্যাপারে মহেশ ছিলেন খুব অগোছালো। আশ্চর্য স্মৃতি-শক্তি ছিল, সবটাই নিজের মাথায়

রাখতেন। বলতেন, 'অত হিসেব রাখতে গিয়ে আমার যা সময় নষ্ট, সে সময়ে আমি ঢের রোজগার ক'রে নিতে পারব। এদিকের লোকসান ওদিকে পুষিয়ে যাবে।' সরকারকেও সব সময় সব কথা বলতেন না। কোথায় কাকে কি দিলেন—চুনসুরকি বিলিতিমাটি রঙ বার্ণিশওলাদের—এমনি এক এক সময় থোক টাকা দিয়ে চলে আসতেন, রসিদ নিতেন না অনেক সময়ই। সদা-ব্যস্ত, ওটুকু দাঁড়াতেও তর সইত না। অথচ মালগুলো মিস্ত্রীরাই নিয়ে আসত ওঁর হুকুম-নামা 'চিট' দিয়ে সই ক'রে। এখন কেউ কেউ সুযোগ বুঝে সে সব জমা অস্বীকার করলেন, দেনার হিসেবটা পাকা, সেটাই সামনে দাখিল করলেন। তেমনি কার কাছ থেকে কি আদায় হল সেটাও সরকারকে সব সময় বলতেন না খেয়াল ক'রে। ফলে অতি কষ্টে ষাট পঁয়ষট্টি হাজার টাকা মাত্র আদায় হল। হয়ত সরকারও এই সুযোগে 'পরকালের' কাজ কিছু গুছিয়ে নিলে। আবার কোথায় কবে চাকরি পাবে, পেলেও এমন মনের মতো চাকরি—তার তো ঠিক নেই। বেহিসেবে এত পয়সা কেউ দেবে না। এই আকস্মিক সমূহ বিপদকালে সে যদি আখেরের কাজ গুছোয় খুব দোষ দেওয়াও যায় না তাকে।

যা সামান্য পাওয়া গেল নাবালক ছেলের নামেই জমা হ'ল। একটা ইনসিওরেন্স ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকার—ক্ষণপ্রভাই তার নমিনী ছিলেন—সে প্রাক-ভবানী যুগের—সে তো কনক পাবেই। কিন্তু আসল পাওনা যেটা—কাপড়কলের অংশ সেটা গুজরমল স্রেফ উড়িয়ে দিল। সে বার করল আগের দলিল—ওআর্কিং পার্টনারের।

পরবর্তী সক্রিয় অংশীদার হওয়ার দলিল লেখা হয়েছিল, সইসাবুদও বাকী ছিল না কিন্তু রেজেষ্ট্রী হয় নি। সেই অবস্থাতেই আপিসের দেরাজে পড়েছিল সেটা, মহেশের মৃত্যু সংবাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসেবে গুজরমল ঐ দলিলটি হস্তগত করল, নিজের বাড়িতেও রাখতে সাহস করল না, দেশে পাঠিয়ে দিল। অথচ এ দলিলের কথা সবাই জানত। দুজন সাক্ষীও সই করেছে সে কথাও এরা জানে। মহেশের য়্যাটর্ণীর এক বাবু স্বীকার পেলেন যে তিনি সই করেছেন, তাঁকে দিয়ে একটা এফিডেবিটও করিয়ে নেওয়া হল কিন্তু অপর ইসাদী গুজরমলের এক বন্ধু। সে আকাশ থেকে পড়ল, সই? কিসের? কি ব্যাপার? না, এমন কোন দলিলের কথা সে জানে না, সইও করে নি।

যিনি এই মামলা চালাতে পারতেন—অভয় চাটুয্যে—গুজরমলকে টিট করার উপযুক্ত লোক—তিনি একমাত্র মেয়ে ও মনের মতো জামাইয়ের মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়েছেন একেবারে, কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন—তাঁর আর এসব ঝামেলা করার সাধ্য নেই, সাফ জানিয়ে দিলেন। কিছু কিছু কূটবুদ্ধি দেওয়া ছাড়া বেশী কোন সাহায্য করে উঠতে পারলেন না।

মোহন একাই হাল ধরলেন। গুজরমলের নামে দু-তিন দফা মামলা রুজু করা হল। জার্মানী থেকে মেশিনের পার্টস আনানোর টাকা মহেশ সব দিয়েছিলেন, অভয়ের কাছে দেওয়া রসিদে কেন টাকা নিচ্ছেন তার উল্লেখ প্রসঙ্গে কোম্পানীর নাম ও মোট কত টাকা উনি দিচ্ছেন তার পূর্ণ বিবরণ ছিল। সোজা উনিই পেমেণ্ট করেছেন, ব্যাঙ্কের মারফৎ—ব্যাঙ্ক থেকে সে কাগজপত্র

উদ্ধার করার জন্য মোহন ছুটাছুটি করতে লাগলেন। পুরনো খাতাতেও এ টাকা মহেশের নামে জমা ছিল সে খাতাও গুজরমল গায়েব করেছিল, সেটাই বরং গুজরমলের বিরুদ্ধে গেল। সব খাতা আছে, যে বছর এসব মাল এসেছে সেই বছরের খাতাই নেই কেন ?

এ সবই শুনছে ভবানী। তার কিছুই করার নেই, কিছু পাওয়ারও না। সে এবার একেবারেই অসহায়। যথার্থ অভাগী। মার মৃত্যুতেও এমন অসহায় বোধ হয় নি, কারণ তখন মহেশ ছিলেন, স্নেহ দিয়ে সহানুভূতি দিয়ে সমবেদনাবোধে—সর্বোপরি জীবনের তখনও পর্যন্ত অনাস্বাদিত মাধুর্য, অকল্পনীয় আনন্দ স্বাদ—প্রেম দিয়ে সব শূন্যতা পূর্ণ ক'রে ছিলেন, বরং মনের পাত্র ছাপিয়ে গিছল। আজ মনে হচ্ছে আশ্রয় বলতে অবলম্বন বলতে কেউ নেই, কিছু নেই। পায়ের নিচের মাটি সরে গেছে, মাথার ওপরও কেউ নেই—ত্রিশূন্যে ঝুলছে সে কতকগুলো অবোধ শিশু সন্তান নিয়ে।

ভবানী দেওরদের কাছে যায় নি। গিছলেন মহেশের দু-তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যাঁরা জানতেন জীবনের এই শেষ কটি বৎসর ভবানীই মহেশের যথার্থ চিত্তবিশ্রাম ছিল। চিন্তা ও কর্মক্লান্ত দিনগুলির শেষে সেবা ও একান্ত-তদগত-প্রাণ সাহচর্য দিয়ে, দৈহিক বিশ্রামও যথার্থ করে তুলত—যা এর আগে কখনও কোথাও পাননি মহেশ।

এঁরা সবই জানতেন। এবাড়িতে যাওয়া আসা ছিল। তার আগের ঘটনাও জানতেন আদ্যন্ত। এ বিয়ের আকস্মিক কারণ ও তার বিবরণও জানা ছিল। তাঁরাই মোহন আর সেজভাই নরেশের কাছে গেলেন। তাঁদের অনুরোধ—ওরাও মহেশেরই ছেলেমেয়ে, ভবানী মহেশের স্ত্রী—ওদের দিকটাও একটু বিবেচনা করুক এরা।

ইঞ্জিনীয়ার বললেন 'ও ব্যাপার আমরা কিছুই জানি না। দাদা আমাদের কোনদিনই কিছু বলেননি, আমরা ওটাকে বিয়ে বলে মানতে রাজী নই।'

একজন বন্ধু এদের একটু দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও বটে, বললেন, 'কিন্তু শাস্ত্র মতে বিয়ে হয়েছিল কুশাণ্ডিকাও, সে পুরোহিত এখনও আছেন। ওরা অনায়াসেই দাবী করতে পারে।'

মোহনও এবার একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন, নরেশ একেবারেই উড়িয়ে দিলেন। তিনি বড় বৌদির একটু বেশী আশ্রিত ছিলেন চিরদিনই। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সময় বন্ধুদের কাছে বড়মানুষী দেখাতে গোপনে অনেকবার অনেক টাকা নিয়েছেন—ভবানী সম্বন্ধে তাই তার জাতক্রোধ, পারলে তাকে আর তার ছেলেমেয়েদের সকলকে খুন ক'রে জলে ভাসিয়ে দিতেন। তিনি রূঢ় কণ্ঠে বললেন, 'দাবী থাকে তো মামলা করুক। আদালত যদি বলে দিতে, অবশ্যই দোব। নাবালকের সম্পত্তি আমরা তো তার গোমস্তা মাত্র। তবে আপনাদের তো জানার কথা, দাদা তাঁর স্ত্রীর নামে যথাসর্বস্ব লিখে দিয়ে গেছেন মায় এই কাপড়ের কল মামলায় যদি কিছু পাওয়া যায়, সেও কনকের—যতই মামলা করুক—টাকা একটাও আদায় করতে পারবে না। বরং যদি মামলা-মকদ্দমায় না যায়—দাদার কুকর্ম ভেবে কিছু কিছু খোরপোশের মতো দিতে

পারি—যত দিন না ছেলেরা সাবালক হয়ে ওঠে।'

বন্ধুরা অপমানিত বোধ ক'রে চলে এলেন। তাঁরা বললেন, 'মামলা করো, আমরা আছি সাক্ষী দোব।'

ভবানী ম্লান মুখে কপাল চাপড়ায়। কান্নাও তাঁর ফুরিয়ে গেছে বোধ হয়, কম দিন তো কাঁদছে না। সেই বাপ মারা যাবার পর থেকেই তো শুরু হয়েছে। সে বলল, 'কি দিয়ে মামলা করব বলুন। দিল্লি থেকে ফিরে এসে সংসার খরচের টাকা দেবার কথা এ মাসের। যেদিন এই খবর এল—বাড়িতে, কুড়িয়ে বাড়িয়ে পঞ্চাশটা টাকাও ছিল কিনা সন্দেহ। এখনও তো দেনাতেই চলছে, আগেকার হিসেবে চলছে তাই কেউ উচ্চবাচ্য করেনি এ পর্যন্ত। বাড়িওলা অনেক দুঃখু জানিয়ে তিন-চারবার গলা খাঁকারি দিয়ে জানিয়ে গেছেন, এ মাসেই তাঁর টেক্‌স দেবার কথা। সম্বলের মধ্যে কখানা গয়না তাও ঝুড়ি ভর্তি কিছু নয়, ওঁর যখন যা খেয়াল হয়েছে নিজেই দিয়েছেন—আমি তো কখনও চাইনি। এ বেচে মামলা চালাব না এদের ভাতের চিন্তা করব?'

কেবল ছোট ভাই মহেশের—সে নাকি বলেছিল দাদাদের, 'যখন বিষয়ের ভাগ এক পয়সা পাবে না জানোই, তখন স্বীকৃতিটা দিতে দোষ কি? বিয়ে হয়েছিল, ভাল ব্রাহ্মণের মেয়ে, পালটি ঘর—এতো আমরা সবাই জানি। ছেলেগুলোর কথা ভাব একবার, তাদের জীবনটা কি দাঁড়াবে? বৌদি নিজে বলেছিলেন,—ওদের খবর দিয়েছ তো? একসঙ্গে ঘাট করা তো উচিত—সে কথাটা মনে ক'রে দ্যাখো।'

নরেশ কঠিন কণ্ঠে বলল, 'বৌদির সর্ব ভূতে দয়া ছিল, তিনি দেবী, আমরা দেবতা নই। ও বিয়ের কথা আমরা জানিও না, জানতে চাইও না। আর তুমি যা জান না, তা নিয়ে মাথা ঘামাও কেন? এতটা বয়স হল, বিয়ে থা করেছ—না শিখলে কোন পেশা, না নিলে একটা চাকরি। দাদার ব্যবসাটাও তো বুঝে নিতে পারতে। এধারে তো শুনছি ব্যবসার নাম ক'রে হলটে হলটে বেড়াও রাতদিন, রাত দশটার আগে বাড়ি ফেরো না! মুরদ থাকে তো ঐ বৌদির হয়ে মামলা চালাও না!'

সে বেচারার তখন নিজেরই টিকে ধরাতে জামিন লাগে এমন অবস্থা—সে চুপ ক'রে গেল। হয়ত অনেক সদিচ্ছা আর উচ্চাশা ছিল কিন্তু চিরদিনের 'খরচে' সে, রোজগার যে করে না তা নয়, তবে যা আয় হয় দুহাতে উড়িয়ে দেয়। একবার কিছু টাকা করেছিল—আবু হোসেনের মতো দুদিনের নবাবীতে উড়িয়ে দিয়ে এখন পথের ভিখিরী।

গুজরমল এসেছিল একদিন চুপি চুপি ভবানীর সঙ্গে দেখা করতে।

বলেছিল, 'আপনি আমার হয়ে সাক্ষী দেবেন বলুন, আমি আপনার বায়না করা ঐ কাঁসারিপাড়ার বাড়ি এখনই কিনিয়ে দিচ্ছি। আমি নগদ টাকা আপনার হাতে এনে দোব, সে টাকা কোথা থেকে এসেছে কেউ জানবে না, আপনি বাড়িওলাকে দেবেন, আপনার জমানো টাকা হিসেবে। আপনি মামলা করুন, বড় উকিল লাগিয়ে দিচ্ছি, মামলা চুক্তি ক'রে দু-তিন হাজার যা চায় তাও দিয়ে

দেব, আমাকে সাক্ষী মানবেন, আমি আপনার হয়ে সাক্ষী দেব।'

তাতে গুজরমলের লোকসান হত না, কেন না তখন 'মিল'এর এমন অবস্থা—ছ আনা অংশেই দেড়-দু লাখ টাকা পাওনা হবে কনকের।

ভবানী কিন্তু দৃঢ়স্বরে ঘাড় নাড়লে, 'না, সে আমি পারব না।'

যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হল গুজরমল।

সে তার নিজের মানসিক গঠন অনুযায়ী ভেবে নিয়ে বলল, 'আপনি কি আরও কিছু বেশি চান? বেশ, কত চান বলুন, ও-বাড়ি ছাড়াও আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিচ্ছি।'

ভবানী বিরক্ত হয়ে উঠল, 'আপনি অত টাকার লোভ দেখাচ্ছেন কেন? এক লাখ টাকা দিলেও আমি ঐটুকু ছেলের সর্বনাশ করতে পারব না।'

আরও অবাক হয়ে যায় গুজরমল 'ও তো আপনার সতীনপো, ওর জন্যে আপনি নিজের ছেলেদের সর্বনাশ করবেন?'

ভবানী বলে, 'তাঁর বড় ছেলে, তিনি খুব ভালবাসতেন, একই সঙ্গে অমন বাবা-মা গেল বেচারার, এই বয়েসে। তার প্রাপ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করলে তিনি স্বর্গে থেকেও দুঃখ পাবেন। তাছাড়া ওর মা, যাকে আপনি সতীন বলছেন, তিনি সর্বপ্রথম বলেছিলেন, ও-বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলতে, তিনি বোনের মতো কাছে রাখবেন, এ-বিয়ে সকলকে মানতে বাধ্য করবেন। না, এ আমি পারব না, মাপ করবেন।'

॥ ২৫ ॥

অভিভূত হয়ে শোনে বিনু। কোন কোন কথা তখনই বোঝে না হয়ত কিন্তু বেশির ভাগই বোঝে, এ-ধরনের ব্যাপারে ওর মনটা বাল্যকাল থেকেই—অকাল-পরিপক্ব।

শোনে, জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে অনেক বেশি তথ্য জেনে নেয়, যা বামুনমা আগে বলতে ভুলে গিছলেন। বামুনমা এমনিই সব গুছিয়ে বলতে পারেন না, আগের কথা পরে, পরের কথা আগে বলেন, সেগুলোও ঠিক ক'রে নিতে হয় ওকে। নামেরও গোলমাল হয়ে যায়। কোন কোন অংশে যে ফাঁক থেকে যায় গল্পের—নিজের কল্পনা দিয়ে সেটা পূর্ণ করে নেয়।

অভিভূত হয় এইজন্যে যে, বামুনমা যতই গল্পের ছলে বলুন, আর একজনদের গল্প করে বলে চালাতে চান—এটা যে ওদেরই পূর্ব ইতিহাস, ওদের বংশের কথা—সেটা খানিকটা শোনার পরই বুঝে নিয়েছিল। মনমোহন মুখুজ্জেই মহেশ, ভবানী মহামায়া। ওর কাকা রাধাপ্রসাদ ডাক্তার, অনাদিপ্রসাদ ইঞ্জিনীয়ার—এ-তথ্যটা কাশীতে ছোটকাকা যাওয়ার সময় মার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা থেকেই জেনেছিল। বামুনমাও, গল্পের মধ্যে মোহন আর রাধাপ্রসাদ অনেকবার গুলিয়ে ফেলেছিলেন, সত্যটা বুঝেই সেটা ধরিয়ে দেয় নি বিনু।

এত বড় বংশ তাদের, তাদের বাবা এমন মহান, এমন অক্লান্তকর্মী, ভদ্র

দিলখোলা মানুষ ছিলেন।

অভিভূত হয় এই ভেবেই আরও, সেই সত্যটাই—অবিশ্বাস্য, অপ্রকাশিত এই তথ্যের বেদনা ও আনন্দ তাকে যেন নেশায় ডুবিয়ে রাখে।

তাদের মতো অভাগা কে! ভাল করে জ্ঞান হবার আগেই, বিনুর তো তখন বোঝার বয়স হয়নি—এমন বাবা, এমন মা—ক্ষণপ্রভাও তাদের মা, দেবীর মত মা হারাল। আর এমন সব লোক তাদের আত্মীয়—সত্যকার আত্মীয়, রক্তের সম্বন্ধে—তা সত্ত্বেও পরিচয় দিতে পারছে না—হয়ত পারবেও না কোনদিন। ভাবতে গেলেই কান্না আসে, মার সঙ্গে চোখোচোখি হবার সম্ভাবনা এড়িয়ে চলে। চোখে চোখ পড়লেই হয়ত কেঁদে ফেলবে সে।...

কদিন সে যেন এই ইতিহাসের মধ্যেই বাস করে। এই কাহিনীর অনুবর্তন করে—প্রতিটি তথ্যের; প্রতিটি ঘটনার। একটা ঘোরের মধ্যে কাটে তার দিনরাত, তার ভাবনা। মহামায়া বুঝতে পারেন না ব্যাপারটা। হঠাৎ কী হল ওর? কোথাও থেকে কি বড় রকম কোন আঘাত পেয়েছে? ইস্কুলে কি কিছু ক'রে ফেলেছে লজ্জা পাবার মতো?—দাদার কাছে বকুনি খাবে বলে এমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে? কেবলই নির্জনতা খোঁজে কেন? এক জায়গায় বসে হয় বাইরের কলাগাছ বা আমগাছের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, নয়তো একখানা বই খুলে বসে থাকে কিন্তু চোখটা সেখানে থাকলেও দৃষ্টি বা মনটা নেই, তা একটু দেখলেই বোঝা যায়।

শেষের একদিন বিনু নিজেই থাকতে পারে না আর। মার কাছে শুয়ে রাত্রে বলে, 'মা—ঐ যে আর পি. মুখার্জি ডাক্তার খুব নাম হয়েছে আজকাল, উনি—আমার মেজ কাকা হন?'

চমকে ওঠেন মহামায়া। কথা কইতে দেরি হয়—কী উত্তর দেবেন তখনই ভেবে পান না। শেষে পাল্টা প্রশ্ন করেন: 'কে বলেছে রে তোকে!'

'বামুনদি?'

লজ্জায় বালিশের খাঁজে মুখ গোঁজে বিনু।

বামুনদি বলতে বারণ করেছিলেন বার বার, লজ্জা সেই জন্যেই। যদি আবার বকেন বামুন মাকে?

লজ্জিত হন মহামায়াও।

একটু ভয়ও পান। কতটা কি বলেছেন বামুনদি এইটুকু ছেলেকে, তার ঠিক কি?

আস্তে আস্তে বলেন: 'আর কি বলেছে রে?'

সে কথার জবাব দেয় না বিনু। একটু পরে শুধু বলে, 'বেশ করেছ মা। খুব ভাল করেছ—ওই মারোয়াড়ীটার হয়ে সাক্ষী দিতে রাজী হওনি। স্বর্গ থেকে বাবা মনে দুঃখ পেতেন। কীই বা হত ক'টা টাকায়? আমরা মানুষ হয়ে ঢের বেশী টাকা তোমাকে রোজগার ক'রে দেব!'

মহামায়ার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেন, 'বাঁচালি তুই আমায়। আমি নিশ্চিন্ত হলুম। কেবলই মনে হ'ত ভুল করলুম কিনা, তোদের বঞ্চিত করলুম

কিনা। বিশেষ এই যে কষ্ট করছে খোকা—কেবলই ঐ কথাটা মনের মধ্যে খচ-খচ করে।…তাই কর, তোরা বড় হয়ে বাপের নাম উজ্জ্বল কর—দরকার নেই ক'টা টাকার জন্যে ছোট-লোক-বৃত্তি করে। টাকাও চাই না আমি, তোরা মানুষ হ, বড় হ,—তাতেই আমার শান্তি, তাঁর ঋণ শোধ হবে তাতে।'

তবু অনেকদিন পর্যন্ত আসল কথাটা পাড়তে পারে না বিনু। ওর খুব ইচ্ছা করে এই কাকাদের একদিন দেখে। নাই বা পরিচয় দিল, দূর থেকে একটা ছুতো ক'রে দেখে আসে যদি? দোষ কি?

মনে হয় কাউকে কিছু না বলে একদিন ইস্কুল থেকে বেরিয়ে একাই গিয়ে দেখে আসে। অন্তত একজনকে, ডাক্তারকাকাকে।

কিন্তু সাহসও হয় না ঠিক।

পথ চেনে না যে। কোথা দিয়ে কোন্ ট্রামে যেতে হয়, কোথায় নামতে হয় কিছুই জানে না।

মাকে বলবে? মা হয়ত রাগ করবেন, বকবেন। যেতে দেবেন না খুব সম্ভব।

হয়ত বামুনমাকে সুদ্ধ বকবেন, এইসব ওর মাথায় ঢুকিয়েছেন বলে।

শেষ পর্যন্ত থাকতেও পারে না, ভয় আর সঙ্কোচ জয়ই করে। কোনমতে সাহস সঞ্চয় ক'রে বলেই ফেলে মাকে, 'আচ্ছা মা, একদিন গিয়ে কাকাদের সঙ্গে দেখা করলে কি হয়? না হয়, তেমন যদি বোঝো, পরিচয় না-ই দিলুম। কোন ছুতোয় একদিন এমনিই দেখে আসব? মেজকাকা তো ডাক্তার, বৈঠকখানায় বসে রুগী দেখেন শুনেছি। তাঁকে তো বাইরে থেকেই দেখা যেতে পারে।…এক সেজকাকা, তা তাঁরও বাড়ি তো ঐ কাছেই—কোন ছুতোয় দেখে নোব ঠিক।'

কিন্তু সব ভয় উড়িয়ে দেন মহামায়া।

বলেন, 'না না, তা কেন। এমনিই দেখা করতে পারিস। সে কিছু বলবে না। তোরা কত বড় হয়েছিস, কি পড়ছিস না পড়ছিস তাঁরা সব খবর রাখেন।'

তারপর একটু কি ভেবে বলেন, 'দেখি বড় খোকাকে বলে একবার। তোর এত ইচ্ছে। সে আবার কী বলে, তার সময় হবে তবে তো—'

রাজেন প্রথমটায় রাজি-হয় নি। একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছিল কথাটা, 'সে আবার কি! নিজে থেকে সেধে গিয়ে—। ধ্যেৎ!'

কিন্তু তখন মনে হয় মহামায়ারই যেন ঔৎসুক্য ও কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠেছে। তিনিই বললেন, 'তা একবার যা না। কখনও তো যাস নি। বিনু পাগলা, কিন্তু এক একটা কথা ঠিক বলে। যাওয়া-আসায় সম্পর্কটা সহজ হয়ে আসে অনেক ক্ষেত্রে।'

শেষ পর্যন্ত একটা উপলক্ষও এসে যায়। সামনে পুজো, তার মানে বিজয়া।

উত্তম সুযোগ।

মহামায়া রাজেনকে বলেন, 'এই তো ভাল একটা উপলক্ষ। এতদিন এখানে থাকতিস না, সে একটা কথা ছিল। এখন বলতে গেলে এই প্রথম বছরেই—। বিজয়াতে গিয়ে প্রণাম ক'রে আয় না ওদের।'

তবু রাজেন খানিক ইতস্তত করে। বলে, 'সে আবার কি বলবো তাঁরা

কি ভাববেন কে জানে। তাছাড়া আমাকে তো চেনেনও না। নিজের কাকার কাছে গিয়ে পরিচয় দেওয়া—সে বড় বিশ্রী। লজ্জা করে। হয়ত একঘর লোক থাকবে—বাইরের লোক—'

ইদানীং মহামায়ার আগের সে অবিচলিত স্থৈর্য ও নির্বিকার ভাব যেন চলে গেছে। এখন একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

তিনি বলে ওঠেন, 'দ্যাখ, তোর যা চেহারা—তোদের গুষ্টি কেটে বসানো। তুই গিয়ে দাঁড়ালে আর পরিচয় দিতে হবে না। যদি হয়—ফিরে চলে আসিস।'

অগত্যা রাজেনকে রাজী হতে হয়।

তবে বিজয়ার দিন সে কিছুতেই যাবে না, আগেই সাফ্ বলে দিয়েছিল।

পরের দিনও গেল না রাজেন, তার পরের দিন রবিবার—একটু বেলাবেলি বেরিয়ে সাড়ে তিনটে নাগাদ গিয়ে হাজির হ'ল রাধাপ্রসাদের গোয়াবাগানের বাড়িতে।

রাধাপ্রসাদ এখন অন্য বাড়িতে একটা ডিস্‌পেন্সারী করেছেন, সেইখানেই রোগী দেখেন। বাইরের বড় ঘরটা বৈঠকখানা হিসেবেই ব্যবহার হয়। ওরা গিয়ে কড়া নাড়তেই চাকর বেরিয়ে এল, 'কাকে চাই ?'

রাজেন নিজের নাম বলল, মুখোপাধ্যায় পদবীটাকে একটু বেশী জোর দিয়ে। তারপর বলল, 'বলগে যাও তারা প্রণাম করতে এসেছে।'

ভেতর থেকে ফিরে এসে সেই লোকটিই বাইরের ঘরের দোর খুলে দিল। বলল, 'বসুন আপনারা, ডাক্তারবাবু নামবেন এখুনি।'

রাধাপ্রসাদ অবশ্য একটু পরেই নামলেন। হাতে খবরের কাগজ।

ভাব-লেশহীন গম্ভীর মুখ। নীরবেই প্রণাম নিলেন। কোলাকুলি করার কোন চেষ্টাও করলেন না। শুধু একটি শব্দ—'বসো', বলে নিজেই একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসে কাগজটা মুখের সামনে মেলে ধরে পড়তে লাগলেন।

তারপর আবার কি ভেবে কাগজখানা নামিয়ে রেখে আপন মনেই বসে শূন্যে একটা আঙুল ঘুরিয়ে যেন কিছু লেখার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বিনুর মনে হল নিজের নামটাই সই ক'রে যাচ্ছেন অনবরত।

একটু পরে আর একটি ছোকরা চাকর দুটো বড় থালায় চারটে ক'রে ছোট আকারের মিষ্টি—দুটো রসগোল্লা ও দুটো সন্দেশ, দু পয়সা দামের—এনে সামনে রেখে চলে গেল। আর একজন এল দু গ্লাস জল নিয়ে।

নীরবেই খেল ওরা। অপমানে বিনুর কানমাথা গরম হয়ে উঠেছে তখন, কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা দেখা দিয়েছে।

রাজেন কেমন অবিচলিত স্থিরভাবে বসে খেয়ে যাচ্ছে! দেখে বেশ একটু অবাকই হয়ে গেল বিনু। এর মধ্যেই এক-চমক মনে হল, দাদা বোধহয় বাবার স্বভাব পেয়েছে। কিছুতেই বিচলিত হয় না। অন্তত যা শুনেছে সে সকলের মুখ থেকে, সম্প্রতি বামুনমার গল্প থেকেও!

মিষ্টি খাওয়া শেষ হলে রাজেন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে আসি আমরা।'

'এসো' বলে রাধাপ্রসাদও উঠে দাঁড়ালেন।

বিনু তখনও পর্যন্ত আশা করছিল ওদের একবার ভেতরে যেতে বলবেন কি

সঙ্গে নিয়ে যাবেন কাকীমার সঙ্গে দেখা করতে। অন্তত ওদের ভাইবোনদেরও ডাকবেন।

সেদিক দিয়েই গেলেন না রাধাপ্রসাদ, ওরা থাকতেই বরং ভেতরবাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

রাজেন এবার মরীয়া হয়েই বলে ফেলল, 'সেজকাকার বাড়িটা এই কাছেই না? ভীম ঘোষ লেন —না কি?'

রাধাপ্রসাদ ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'সেখানে যাবার দরকার নেই—সে পছন্দ করে না।'

বিজয়া সম্ভাষণাদি পছন্দ করে না—না ওদের—অনাবশ্যক বোধেই তা আর বললেন না…

লজ্জায় অপমানে বিনুর চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে গিছল, সে পথ চলছিল কতকটা অন্ধের মতো।

দাদার কি অবস্থা ও লক্ষ্য করে নি, করার মতো শক্তিও ছিল না। শুধু এইটুকু বোধ ছিল—সে সোজাসুজিই হাঁটছে—বেশ সহজভাবে। ঘাড় হেঁট ক'রে, কতকটা আন্দাজে আন্দাজে, তার পা লক্ষ্য ক'রেই যেতে লাগল বিনু।

একটুখানি যেতেই—হঠাৎ প্রায়-অপরিচিত অথচ যেন ঠিক একেবারে পুরো অজানাও নয়,—এমন একটা গলার ডাক কানে এসে পেঁছিল। 'আরে, রাজেন, না?…এই যে ইন্দ্রজিৎও আছ দেখছি। এদিকে কোথায় গিছলে? মেজদার বাড়ি? বিজয়ার প্রণাম করতে বুঝি? হায় হায়—আর লোক পেলে না!'

এতক্ষণে একটা সহজ আন্তরিক ধরনের কথা কানে গেল। এতক্ষণ যে বুকচাপা ভাবটা বোধ করছিল সেটা কেটে গেল নিমেষে। উৎসুক সাগ্রহে চেয়ে দেখল, তারাপ্রসাদ বা কেবু।

আসলে তারাপ্রসাদ ওদের ন' কাকাই, এখন ছোটয় দাঁড়িয়েছেন। শক্তিপ্রসাদ বলে ওঁর পরে একটি ভাই হয়েছিল, সে ফার্স্টক্লাসে পড়তে পড়তে ট্রামচাপা পড়ে মারা যায়।

এ তথ্যটা সম্প্রতি মার মুখে শুনেছে ও।

এবার তাড়াতাড়ি কোনমতে এদের আড়ালে চোখটা মুছে নিয়ে ভাল ক'রে চাইল বিনু।

উজ্জ্বল প্রশান্ত মুখ। নির্মল হাসি। আন্তরিকতা শুধু কণ্ঠস্বরে নয়—দৃষ্টিতেও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

কে বলবে যে এই লোকটা লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান দিয়ে দেউলে খাতায় নাম লিখিয়েছে।

তারাপ্রসাদ সস্নেহে এক হাত রাজেন আর এক হাত বিনুর কাঁধে দিয়ে বললেন, 'তারপর? কেমন আছ সব? তা হঠাৎ যে মেজদাকে প্রণাম করতে গেলে! এ বুদ্ধি কে দিলে তোমাদের? খেজুর গাছে গা ঘষতে যাওয়া! বৌদি বলেছেন বুঝি?'

রাজেনের মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তারাপ্রসাদকে দেখে, এতক্ষণ বিরূপতাটা

কঠোর চেষ্টায় চেপে রেখেছিল—এখন যেন একটা মুক্তির স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। বলল, 'এই যে, ইনি! ইনি কাকাদের দেখবার জন্যে মরে যাচ্ছিলেন একেবারে! এঁর জেদেই আসতে হ'ল আরও। নইলে একাই বোধহয় চলে আসত!'

'তা হয়।' তারাপ্রসাদ সস্নেহে বিনুর কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বললেন, 'আপনার লোককে দেখতে ইচ্ছে হয় বৈকি। আপনার তো বটেই, খুব আপনার। রক্তের সম্পর্কে আপন। এমন আপন লোককে জীবনে একবারও দেখলাম না—এ একটা ক্ষোভ মনে জাগা স্বাভাবিক।'......

তারপর দুজনকেই প্রবলভাবে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'তা বেশ হয়েছে। চলো, এখন আমার ওখানে চলো।...বেশীদূর নয়। এই কাছেই হরি ঘোষ স্ট্রীটে। হরি ঘোষের গোয়াল কথাটা শুনেছ তো? সেই হরি ঘোষের নামেই রাস্তা।'

রাজেন বললে, 'তা আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?'

'আমিও ঐ কম্মই করতে যাচ্ছিলুম, মেজদা আর মেজবৌদিকে পেন্নাম করতে। কাছাকাছি আছি, যেতে তো হয় একবার, কী বলো। যাওয়া উচিত। কালই যাওয়া উচিত ছিল—তা, আর ভাল লাগল না। সে যাক গে, তোমরা এখন আমার ওখানে চলো।'

'তা ওখানে যাবেন না? মেজ—আপনার মেজদার কাছে?'

বিনুই প্রশ্ন করে। মেজকাকা বলতে গিছল আগে কিন্তু ইচ্ছা হল না সম্পর্কটা উচ্চারণ করতে, সামলে নিল নিজেকে।

তারাপ্রসাদ বুঝলেন। একটু হেসে ওর কাঁধে আবারও একটা চাপ দিয়ে বললেন, 'ছিঃ বাবা তিনি যে ব্যবহারই ক'রে থাকুন তবু তিনি গুরুজন। ওভাবে কি বলে।'

বিনু ওঁর স্নেহেই বোধহয় একটু জোর পেয়েছে। বলল, 'না কি জানি, ঐ সম্পর্কটা আমরা উচ্চারণ করলে যদি তিনি অসন্তুষ্ট হন, ধৃষ্টতা ভাবেন।'

'বাঃ; এই যে বেশ কথা বলতেও জানো দেখছি। এইরকমই চাই, কথায় পৃষ্ঠে ঠিক কথা বলা—ঠিক জবাবটি দেওয়া—অবিশ্যি অসভ্যতা কি বাচালতা নয় —আসল স্মার্টনেস। হাউ-এভার, সে হবে খন! দশমী থেকে ত্রয়োদশীতে পৌঁচেছে, চতুর্দশী হলেও কোন ক্ষতি হবে না। আমি না গেলেই বোধহয় মেজদা খুশী হবেন বেশী। তাঁর ভয়—যদিও এখনও পর্যন্ত চাইনি কোনদিন —আমি তাঁর কাছে সাহায্য চাইব।...সে হবেই এখন, সন্ধ্যেবেলা কি রাত্তিরেও সারা চলতে পারে। যখন হোক একবার 'প্রেজেণ্ট স্যার' ক'রে গেলেই হ'ল। সম্পর্ক তুলে দিয়েছি একেবারে—এমন কথা না বলতে পারেন।'

তিনি ওদের প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে গেলেন।

হরি ঘোষ স্ট্রীটটাই একটু বড় গোছের গলি, তা থেকে একটা আরও সরু গলি বেরিয়েছে, তার মধ্যে একটা বাড়ির একতলা নিয়ে আছেন ওঁরা।

খান তিনেক ঘর। পুরনো সেকালের বাড়ি, কিছুদিন আগেই চুনকাম হয়েছে সেটা দেওয়ালের ওপর দিকে চাইলে বোঝা যায়, নিচেটা নোনা ধরে বালির পলেস্তারা বেরিয়ে আছে, কোথাও বা ইট পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ঘরে

ঢুকতেই যেটা চোখে পড়ে—ওপরতলার পাইখানার মোটা নলটা এঘরের দেওয়াল বেয়ে নেমে এসেছে। তবে সবটা নয় এই রক্ষা, মধ্যপথেই আবার দেওয়ালের মধ্যে ঢুকে গেছে।

এই ঘরে বাস। আসবাবপত্রও বিশেষ নেই বললেই চলে। মেঝেয় বিছানা, তার চাদর ওয়াড় জরাজীর্ণ গোছের—একটারও অবস্থা ভাল এমন চোখে পড়ল না। ঘরে সাবান দিয়ে কাচা হয় খুব সম্ভব, ছাদে যাবার অধিকার না থাকায় ঘরেই শুকনো—লালচে ছোপ পড়ে গেছে। দড়ির আলনায় কাপড় জামা ঝোলানো, তারাপ্রসাদের একটা পাঞ্জাবী দেওয়ালের হুকে ঝুলছে।

বিছানারই একদিক থেকে কতকগুলো বালিশ সরিয়ে ওদের বসতে বললেন কমলা কাকীমা।

শ্যামবর্ণের ওপর ভারী সুন্দর শ্রী একটি, হাসিখুশী স্নেহময় মানুষ। এত ভাগ্যবিপর্যয়—এখন তো সম্পূর্ণ নিরাভরণা, শাঁখা ছাড়া কিছুই নেই, স্বামীর অনাচার অবহেলা, মদ বেশ্যাসক্তি কিছুই তো বাকী ছিল না—কিন্তু মুখে তার জন্য ক্ষোভ দুঃখ বা অভিমানের চিহ্ন নেই, মুখের প্রসন্নতা নষ্ট হয় নি এতটুকুও।

আরও যেটা বিনু লক্ষ্য করল—অল্পক্ষণই ছিল ওরা, তার মধ্যেই চোখে পড়েছে তার—স্বামীর দিকে কাকীমার সদাসতর্ক দৃষ্টি, তাঁর সুখসুবিধা, আনন্দ কিসে হয়—সে সম্বন্ধে সদাসচেতন। এর পরেও ওরা এসেছে ছোটকাকার বাড়ি, এ বাড়ি ছেড়ে শেষে বাড়ি বদলাতে বদলাতে দমদম পর্যন্ত পিছু হটতে হয়েছে তারাপ্রসাদকে—কাকীমার মুখে হাসি ছাড়া কিছু দেখে নি।

ওরা অবশ্য খুব অল্পক্ষণে ছাড়া পেল না।

কাকা তখনই হাতীবাগান বাজার থেকে মাছ নিয়ে এলেন, কাকীমাকে হুকুম করলেন, 'মাছের তরকারী আর পরোটা ক'রে দাও, পেট ভরে খেয়ে যাবে ওরা।'

রাজেন একটু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কাকার এক ধমকে চুপ ক'রে যেতে হল।

ছেলেমেয়েগুলি ভারী শান্ত আর ভদ্র। এমনভাবে কথা কইতে লাগল যাতে মনে হয় এ পরিচয় অল্প এই ক মিনিটের নয়—আজন্ম তারা একই বাড়িতে মানুষ। তারাও বলতে লাগল সবাই মিলে, 'খেয়ে যান না, কী হয়েছে!'

তারাপ্রসাদ ওদের ঠিকানা জেনে নিলেন, বললেন, 'শিগগির একদিন যাবো। আমিও ঐসব মামলা মকদ্দমা নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম, তোরা যে কাশী থেকে কবে এলি কোথায় ছিলি—এসব কোন খবরই নিতে পারি নি। মেজদা জানেন অবশ্য, ওঁকে একদিন জিজ্ঞাসাও করেছিলুম, বললেন, 'কী জানি সে খাতায় লেখা আছে। অন্য একদিন এসো, খুঁজে দেখব।' সঙ্গে সঙ্গে উপদেশও দিলেন, 'ওদের কোন যথার্থ উপকার যখন করতে পারবে না—মিছিমিছি যোগাযোগ রেখেই বা লাভ কি' ?'

তারাপ্রসাদ এলেন সত্যিসত্যিই ছ-সাত দিন পরেই।

এখানের ঠিকানা খুঁজে বার করা খুব সহজ কাজ নয়—একটা ঘোড়ার গাড়ি

নিয়েছিলেন বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে, খুঁজে খুঁজে জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে এসে পেঁছতে অনেক দেরি হয়েছে। আট আনা ভাড়া একটাকাতে রফা করতে হ'ল।

নিয়মমতো একটু মিষ্টি আনতেও ভুল হয়নি, তেমনি ভক্তিভরে প্রণামও করলেন মহামায়াকে।

মহামায়া একটু ফল কেটে দিলেন, আর শরবৎ। আর কিছুই ছিল না ঘরে দেবার মতো, কে-ই বা আনতে যায়। খাবারের দোকান সব অনেক দূরে। বামুনদি বুদ্ধি ক'রে মুড়ি মেখে দিলেন তেল দিয়ে, উঠোন খুঁজে একটা কাঁচা লংকাও সংগ্রহ করলেন—অনুপান হিসেবে।

কেবু এতেই বেশী খুশী। তবে এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, 'আপনারা বুঝি এখনও চা ধরেন নি? ধরে দেখুন, গরিবের এমন বন্ধু আর নেই। একাধারে খাদ্য আর পানীয়—দুইই। খুব খিদে পেয়েছে, এক কাপ চা খান—আর খিদে থাকবে না।'

হাসলেন মহামায়া। বললেন, 'অত বক্তৃতা কেন, খেতে ইচ্ছে করছে? বিনু গেছে আনতে। আমাদের এই পাশের বাড়ির এঁরা সিমলের থাকতেন এককালে—খুব চা-খোর। কেউ বললেই ক'রে দেন, সেই উপলক্ষে নিজেদেরও একটু বাড়তি খাওয়া হয়ে যায়। তবে খুব ভাল চা হবে না হয়ত, ওদের অবস্থা এখন খুব পড়ে গেছে।'

'আর ভাল চা। আমরাও ওসব শৌখিনতা ভুলে গেছি অনেককাল। ছটা প্রাণীর ভাত যোগানোই মুশকিল হয়ে উঠেছে, ভাল চা কিনব কোথা থেকে? এক পয়সানে প্যাকেট আসে এক একদিন মুদির দোকান থেকে।'

'তা', মহামায়া খুব সঙ্কোচের সঙ্গে প্রশ্ন করেন, 'অন্য আর কোন ব্যাবসা ট্যাবসা সুবিধে হচ্ছে না?'

'না, বদনাম একটা রটে গেছে তো, কেউ পয়সা বার করতে চায় না। ঐ টুকটাক করছি, উঞ্ছবৃত্তি যাকে বলে। তবে কি জানেন—বাঁধা কোন আয় তো, নেই, হঠাৎ হয়ত শ' তিনেক কি শ' চারেক টাকা হাতে এল, তারপর আবার দুমাস একটা পয়সার মুখ দেখা গেল না। বাড়ি ভাড়াই ষাট টাকা, তারপর খাওয়া-পরা, বিছানা, মাদুর, ধোপা-নাপিত—কী নেই! আর জানেন তো, আমি চিরদিনই একটু খরচে—হাতে টাকা এলেই হাত চুলকোয় খরচ করার জন্যে।'

মহামায়া একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'ছেলেমেয়েগুলোর কি করছ? সেদিকটা নজর রেখো। নিজেরা উপোস করো আর যাই করো—ওটায় অবহেলা ক'রো না।'

'সেইখানেই তো অসুবিধা হয়ে পড়েছে একটু। ছোটগুলোকে দিয়েছি ঐ কাছেই—নিউ ইণ্ডিয়ানে। বড় ছেলেটারই কিছু হচ্ছে না। সেজদা অবিশ্যি বলেছিলেন—ভেরি কাইণ্ডলি—ওঁর কাছে রাখতে, পড়াশুনোর সব ভার তিনি রাজী আছেন। মনে করছি এবার তা-ই দোব, আর তো কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না।'

'সে তো ভালো কথাই ভাই। এতদিন দাও নি কেন?' মহামায়া বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, 'পড়াশুনোর একবার ঘ্যাচড়া পড়ে গেলে আর এগোতে চায় না।'

'কি জানেন—সেজদা, সেজদা কেন ছোড়দা বলাই উচিত—আমাকে মানুষ বলে মনে করেন না। তা বললেও ঠিক বলা হয় না, আমাকে অমানুষ বলে মনে করেন। কথাটা হয়ত মিথ্যে নয়, তবু—ছেলেটা থাকবে—উঠতে বসতে ঐ কথাটাই তাকে শোনাবেন, তুলনা দিয়ে বলবেন, 'যেন বাপের মতো হয়ো না'। সেটা ভাবতে বড় খারাপ লাগে। ছেলেটার আরও খারাপ লাগবে, লাগতে বাধ্য।…কিন্তু করবই বা কি! ছেলেটার ইহকাল পরকাল নষ্ট হতে বসেছে। যদি লেখা-পড়াটাও হয়, সেই ভাল। না হয় বাপকে ঘেন্নাই করতে শিখবে।'

তারাপ্রসাদের মুখ থেকে অনেক খবরও পাওয়া গেল। যা এতদিন অন্য ভায়েরা কেউ বলেন নি।

মামলায় এদের জিৎ হয়েছে, কনক দু'লাখ টাকা পেয়েছে গুজরমলের কাছ থেকে। লাইফ ইনসিওরেন্সের পঞ্চাশ হাজার টাকাও পাওয়া গেছে। কনক নাকি কী সব ব্যবসা-ট্যাবসার কথা ভাবছে। কি ভাবছে তা এঁরা জানেন না। কারও সঙ্গে পরামর্শ করে না। কিছু বন্ধুবান্ধব জুটেছে, তাদের সঙ্গেই যত কিছু পরামর্শ।

রাধাপ্রসাদ নাকি শেষ অবধি রাজেনদের কথা বলতে গিছলেন, বলেছিলেন, ছোটখাটো একটা বাড়ি শহরতলীর দিকে পাঁচ-ছ' হাজারের মধ্যে কিনে দিতে। কনক রাজী হয় নি। শুধু এদের খরচের যে টাকাটা তখনও পর্যন্ত রাধাপ্রসাদ দিচ্ছিলেন, সেটা তারপর থেকে এই কয়েক মাস কনকই দিচ্ছে। এখন সত্তর টাকা ক'রে দেয়—তাও দুবারে—সেটাও একশো করার কথা তারাপ্রসাদ বলতে গিছল, সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছে—'ভেবে দেখি' সে ভেবে দেখা যে আজও হয়ে ওঠে নি, তা বলাই বাহুল্য।

সব খবর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রাজেনের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'আমি অমানুষ হই আর যাই হই, ভগবানে বিশ্বাস করি, আমি বলছি তোমাদের উন্নতি হবেই। মানুষ হয়ে একদিন দাঁড়াবে তোমরা। ওর চেয়ে অনেক ভাল বাড়ি করবে। ও অছেন্দার দান না দিয়েছে ভালই করেছে।'

তারাপ্রসাদ আসবার দিনও বামুন-মা বেশ ভাল ছিলেন। মুড়ি মেখে দেন তিনিই, নিজে থেকে। লোকটার মন বুঝে পাশের বাড়িতে বিনুকে পাঠিয়ে চা আনবার ব্যবস্থাও তিনিই করেন।

কেবু আসাতে আনন্দও যেমন হয়েছিল এদের সব খবর পেয়ে, তেমনি একটা সুতীব্র আঘাতও পেয়েছিলেন। কনক কিছুই দিল না, সত্যি সত্যিই কোন দিন কিছু দেবে না—এ উনি ভাবতেই পারেন নি। এত দিন সমস্ত বাস্তব ও প্রত্যক্ষ সত্যের আওতা থেকে বাঁচিয়ে মনের গভীর গহনে একটি আশা লালন করছিলেন—কতকটা হয়ত নিজের অগোচরেই—একদিন এরা সবটা না হোক কিছু প্রাপ্য পাবেই। সেই আশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।…

'এদের বাপের ধনে এরা একেবারে বঞ্চিত হল! শুনলুম তো তিন লাখ টাকার ওপর পেয়েছে। প্রাণে ধরে কিছুই দিতে পারল না। তিন লাখ টাকার সুদ কত! এক মাসের সুদ দিলেও তো এদের একটা এইসব জায়গায়

কি নারকোলডাঙ্গা বেলেঘাটার দিকে কোথাও মাথা গোঁজার মতো জায়গা হয়ে যেত। অথচ মনমোহন মুখুজ্জের প্রাণ ছিল এই ছেলেমেয়ে তিনটে—তা কি ওর কাকারা জানে না, কারুর মুখে শোনে নি? যত রাতই হোক ফিরতে—বিনুকে গায়ে মাথায় হাত না বুলিয়ে শুতে যেতেন না। পেরায়ই বলতেন এদের আমি একটু বড় হলেই বিলেতে পাঠিয়ে দেবো, ঐখানেই পড়াশুনো করবে।'

এই ধরনের কথা শুরু হলে আর থামে না। আপন মনেই গজগজ ক'রে যান।

মহামায়া মৃদু তিরস্কার করেন মধ্যে মধ্যে, 'ওসব কথা থাক না বামুনদি, বলে তো কোন লাভ হবে না, মিছিমিছি শুনলে এদের আরও মন খারাপ লাগবে। কাটাঘায়ে নুনের ছিটে!'

বারবার এই ধরনের অনুযোগে বামুনদি শেষ পর্যন্ত চুপ ক'রে যান বটে, কিন্তু—পরে মনে হ'ত মহামায়ার—এমনভাবে চুপ না করলেই ভাল হ'ত।

কেন না, দু-তিন দিন পরে গজগজ করা বন্ধ হতে কেমন যেন গুম খেয়ে গেলেন। কারও সঙ্গে কথা বলেন না, খেতেও চান না। বাড়া ভাত পড়ে থাকে, উনি রোদে বসে থাকেন—হাঁটু মুড়ে উবু হয়ে বসার মতো—ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

এমনি আট-দশ দিন কাটার পর জ্বর এল।

অনেক দিন আর জ্বর-টর আসে নি, মহামায়া একটু উদ্বিগ্ন বোধ করলেন। তবে পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলাকে জানাতে তিনি আশ্বাস দিলেন, 'ও কিছু নয়, এই তো নতুন হিমের সময়—দ্যাখো গে যাও ঘর ঘর জ্বর হচ্ছে। একটু আদা দিয়ে চা ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছি বেশ গরম গরম খাইয়ে দাও, আর জলটল না ঘাঁটে বেশী, সেদিকে নজর রেখো।'

দিন তিনেক পর জ্বরটা একটু কমল কিন্তু বামুনদি উল্টো কথা বললেন, 'ওরে বড়খোকা, তুই একবার গিয়ে আমার বোনের বাড়ি খবর দিয়ে আয় বাবা একটু। যা বাবা, যেমন ক'রে হোক সময় ক'রে, কলেজ কামাই হয় হোক!—আমার আর দেরি নেই, ছুটি এসে গেছে—মিছিমিছি, তোরা ছেলেমানুষ আতান্তরে পড়বি কেন!'

মহামায়া বলেন, 'ও কি কথা গা। তুমি যে ছেলেমানুষ হয়ে গেলে একেবারে। সামান্য জ্বর, এই তো কমেও গেল—তার মধ্যে একেবারে আতান্তরে পড়বার মতো কি হল?'

কেমন এক রকমের ক্ষীণ অথচ দৃঢ়স্বরে বামুনদি বলেন, 'যা বলছি ঠিকই বলছি। এখানে মলে এদেরই সব করত হবে, খরচ অন্তর তো বটেই, একগাদা টাকা লাগবে—তাছাড়া কে-ই বা এ ছিষ্টি করবে, করতে তো ঐ এক বড়খোকা।... না, না, তুই কাল সকালেই চলে যা, বাবা, এসে যেন ওরা আমাকে নিয়ে যায়। বোনের কাছে আমি একটা বিছে হার রেখে দিয়েছি অনেককাল থেকে, হাজার দুঃখেও হাত দিই নি। কথাই আছে মরার পর ছাদ্দশান্তি যা লাগবে ঐ থেকেই করবে। বোনপোই মুখে আগুন দেবে খন। এখানে বড়খোকা দিলে ওকে

একটা পিণ্ডি দিতে হবে। কোথা থেকে করবে তাই শুনি !'

অগত্যা ভোরে উঠেই রাজেনকে যেতে হল।

বোনপো আপিসের ফেরৎ যখন এল, তখন একেবারেই ঝিমিয়ে পড়েছেন বামুনদি।

বোনপোর ডাকে যেন অনেক চেষ্টায় চোখ মেলে বললেন, 'ঐ যে কি ট্যাকসিগাড়ী না কি হয়েছে আজকাল, এখুনি একটা ডেকে আন, আমাকে নিয়ে চল। তোর হাতের জল আর আগুন খাবো—কত দিন থেকে টেঁকে আছি। তুইও তো বাক্যিদত্ত। আর দেরি করিস নি। তুই একা পারবি নি, বড়খোকাও চলুক—দশটা না সাড়ে দশটায় গাড়ি আছে বলিস তোরা, তাতেই ফিরে আসবে'খন ?'

বাধা দেবারই কথা, কিন্তু মহামায়া বাধা দিতে পারলেন না। কথাগুলো জড়িয়ে আসছে, হাত পা ঠাণ্ডা। কিছুই খান নি দুদিন। পাশের বাড়ির গিন্নিও চিন্তিত মুখে ঘাড় নাড়লেন, 'তিন দিনের জ্বরে এমন হয়ে পড়া, আশ্চর্য। এমন কখনও দেখি নি। এ বাপু পাঠিয়েই দাও।'

ট্যাক্সী ডেকে সবাই মিলে উঠিয়ে দিলেন ধরাধরি করে। গাড়িতে উঠে ইশারা করে মহামায়াকে ডেকে বললেন, 'আমার জপের থলির মধ্যে পনেরোটা টাকা আছে—বোনপোর হাতে বারোটা দাও, আর তিনটে বড়খোকার হাতে। এখন হয়ত দু-একদিন আসা-যাওয়া করতে হবে, কোথায় এত পয়সা পাবে ও বেচারী।'

মহামায়ার রুদ্ধ চোখের জলে দু-পাশের রগে শিরাগুলো টনটন করছে তখন, মনে হচ্ছে ফেটে বেরিয়ে আসবে—জল বা রক্ত। তিনি প্রাণপণে নিজেকে সংযত ক'রে জপের থলি থেকে টাকা নিয়ে দুজনকে ভাগ ক'রে দিয়ে জপের থলিটা বামুনদির গলায় গলিয়ে দিলেন। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিলে মাটিতেই আছড়ে পড়লেন। একমাত্র সত্যকারের হিতাকাঙ্ক্ষী'ও সহায় যে ছিল—সেও আজ ত্যাগ ক'রে চলে গেল। আর কি কখনও আসবে, আসতে পারবে ?

বামুনদি বুঝেছিলেন নিজের অবস্থা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারেন নি।

রাজেনকে আসা যাওয়া আর করতে হ'ল না। যখন ওখানে পৌঁছল পাড়ার প্রবীণার দল এসে দেখে চমকে উঠলেন, 'ওমা, এ কী রুগী আনলে ! এতো আর দেরি নেই, শ্বাস উঠেছে যে !'

ডাক্তার একজন তখনই ডাকা হ'ল। তিনি এসে দেখে বললেন, 'ইঞ্জেকশ্যন একটা দিচ্ছি তবে বিশেষ ফল হবে বলে মনে হচ্ছে না, বরং দেখুন যদি একটা অক্সিজেন যোগাড় করতে পারেন।'

রাজেনের আর রাত্রে ফেরা হল না।

পরের দিন ভোরেও না।

সকাল আটটা নাগাদ বামুনদি মারা গেলেন।

॥ ২৬ ॥

এই সমস্ত সময়টা—মাঘ থেকে কার্তিক পর্যন্ত অন্য সব ভাবনা ও কাজের মধ্যে, বিভিন্ন বিচিত্র ও প্রবল আবেগের মধ্যে, বিপুল আশা ও বিপুলতর আশাভঙ্গের মধ্যে আর একটি বড় রকমের আবেগঘন নাটকের অবতারণা চলছিল বিনুর জীবনে।

নতুন এক বন্ধন—স্বেচ্ছাকৃত, স্বেচ্ছাবৃত।

এ বন্ধনে বুঝি যেমন বেদনা, তেমনি মাধুর্য।

বিনুর সবচেয়ে বড় আশা ও সাধ, সেই ছোট থেকেই—নিজের মন ভাল ক'রে বোঝবার বা এটা যে একটা সাধ তা জানবার, সে বিষয়ে সচেতনতা আসার অনেক আগে থেকেই—কোন একটি বন্ধুকে, একান্ত আপন ক'রে অন্তরঙ্গ ক'রে পাওয়া। একে বাসনা কি কামনা এই ধরনের কোন বহুল ব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগ করে ঠিক প্রকাশ করা যায় না—আধুনিক ভাষায় এ ওর বুঝি জীবন-স্বপ্ন, জীবন-ভাবনা।

এ আকুতি যেন ওর স্বভাবের মধ্যে, সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে। এ ওর দৈহিক গঠনে, জীবন-ধারায়—এ ওর রক্তস্রোতে মিশে আছে। এক সাংঘাতিক বীজাণুর মতোই তার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, সংগঠনে জড়িয়ে আছে। এ চিন্তা ওর বাকী সমস্ত চিন্তার নিত্যসাথী, মনের অবচেতনে সদা বিদ্যমান। একে ভাবনা বলাই উচিত।

আবেগ বা কামনা যখন প্রবল হয় তখন মানুষ পাত্রাপাত্র দেখে না। সেই জন্যেই দেখা যায় সমাজে বা সংসারে রমণীরত্ন নরপশু বা নরপিশাচকে ভালবাসছে তার জন্যে প্রাণ দিচ্ছে। এই ধরনের প্রেমাস্পদ বা কাম্য পাত্রের জন্য তারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বেচ্ছায় নষ্ট করে, কোন দিকে তাকায় না, কারও কথা ভাবে না। নিজের কথা তো নয়ই।

এ পুরুষের বেলাও সমান সত্য। কত বিদ্বান বুদ্ধিমান—অনেক ক্ষেত্রে রূপবানও, আদর্শবাদী তরুণ ছেলেরা যাদের সামনে উজ্জ্বলতম জীবনপথ প্রসারিত, তারাই বেছে নেয়—কুরূপা, স্বার্থপর (বা অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থসর্বস্ব) অতি চপলমতি, মূর্তিমতী অশান্তি—এই শ্রেণীর মেয়েদের। বোধহয় এই ধরনের ভাল ছেলেরাই আরও বেশী এমনি নিজেদের আবেগের ফাঁদে ধরা পড়ে। নিজেদের স্বয়ংবৃত বন্ধনে বদ্ধ হয়, জীবন নষ্ট করে—উচ্চাশা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিপুল সম্ভাবনা—সব কিছু জলাঞ্জলি দেয়।

এরা কেউ রূপও দেখে না। এদের চোখে নিজেদের উদগ্র আবেগ এক আবরণ টেনে দেয়। বিনু তো কত দেখল; বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারে কাছে—ভেতরেও, বহুদিন যাতায়াত করতে হয়েছে তাকে। পথে-ঘাটে বাসে-ট্রামে, বাসস্টপ-এ, অনেক এমন সর্বনাশের নিভৃত অন্তরঙ্গ ছবি চোখে পড়েছে—আবেগ-উন্মত্ত ছেলেমেয়েদের। সুশ্রী সুন্দরী মেয়েরা উচ্ছৃংখল অপদার্থ কদর্য চেহারার

ছেলেদের জন্যে মা-বাপকে নিষ্ঠুরতম আঘাত দেয়; কান্তিমান সুপুরুষ উজ্জ্বল তরুণরা বাজে মেয়েদের পায়ে নিজের জীবন ও ভবিষ্যৎ সঁপে দিয়ে নিঃশেষিত হয়।

রূপ-গুণ কিছুই পায় না এদের অনেকেই। ভাবেও না সে সব কথা। নিজেদের দৈহিক কামনার উগ্রতা এদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, অন্ধকার ক'রে দেয়। এ পর্দা যখন সরে তখন সর্বনাশের বিশেষ কিছু আর বাকী থাকে না।

এ সকলের পরিণতি হয়ত নয়—তবু অনেকের, এ তো নিজেই দেখেছে।

দেখছে খুব অল্পবয়স থেকেই।

তবু এ নিতান্তই জৈবিক কামনা, যৌন ক্ষুধা ভেবেই উপেক্ষা করেছে—সে এর অনেক ঊর্ধ্বে ভেবেই নিশ্চিত হয়েছে।

এই দুই ধরনের আবেগের মধ্যে কোথায় একটা মৌলিক মিল আছে তা ভেবে দেখে নি।

ভেবেছে এটা নরনারীর বিশেষ মিলনের, বিশেষ কামনার প্রশ্ন। জন্মের মতো জীবন সঙ্গিনী বা সঙ্গী বেছে নেওয়ার প্রশ্ন। নিজের তীব্র বেদনার আঘাতও তাকে এ বিষয়ে সজাগ করতে পারে নি, বরং কোন কোন পরিচিত ক্ষেত্রে এইসব কামনার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে যখন সিন্ধুবাদ নাবিকের সেই বৃদ্ধের মতো দুই সাঁড়াশি-কঠিন পা দিয়ে গলা আটকে পাথরের মতো বোঝা হয়ে উঠতে দেখেছে—যা না যায় ফেলা, না যায় বওয়া—তখন এক ধরনের কৌতুক রসই অনুভব করেছে।

অবশ্য তখন বিনু অত জানত না। সেই কিশোর বয়সে। এত ভাবে নি, এত দেখেও নি।

তার কল্পনা ও স্বপ্নের সীমা বন্ধু পর্যন্ত। সে স্বপ্নেরও যে সেই একই গতি, তা ও নিজে তখনও বোঝে নি। তখন কেন, অনেক দিন পর্যন্ত বোঝে নি। হয়ত বুঝতে চায় নি বলেই। ওর গরজ এটা—কোন এক বন্ধুর প্রতি প্রীতি-প্রেম চিন্তা-ভাবনা নিঃশেষে উজাড় ক'রে দেওয়া; না দিয়ে থাকতে পারবে না সে। যেখানে দিচ্ছে, যাকে দিচ্ছে—সে কেমন, এই সর্বস্ব ত্যাগ—স্বার্থ, ভবিষ্যৎ নিজের উচ্চাশা পর্যন্তও হয় তো বা—এর উপযুক্ত কিনা, এই ত্যাগের বিশালতা, বিপুলতা মহত্ত্বর মূল্য বা মর্ম বুঝবে কিনা, তা ভাবে নি, ভাবার কথাও ভাবে নি। সে বিষয়ে কোন সচেতনতাই নেই। ওর যে কাউকে বা কোথাও দেওয়া দরকার, না দিয়ে যে ওর স্বস্তি নেই, মুক্তি নেই। না দিতে পারলে জীবনটাই বুঝি অর্থহীন হয়ে যাবে।

আধারের বা পাত্রের যোগ্যতা ভাবতে গেলে তো ওর চলবে না। গোরা ওর কল্পনার কাছাকাছিও পেঁছিতে পারে নি, সে মানসিক গঠনই ছিল না তার। কিন্তু তাতে কি!

এই প্রবৃত্তি. এই প্রবলতা বা প্রবণতা যে ওর সহজাত। তা না হ'লে গোরার ব্যাপারেই শিক্ষা হ'ত, নিজেকে সংযত করত। কিন্তু তা হয় নি। গোরার কাছ থেকে—কাছ থেকে বললে হয়ত অবিচার করা হয়—গোরাকে উপলক্ষ ক'রে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, ওর বয়স ও অজ্ঞতার তুলনায় প্রচণ্ড—তবু চৈতন্য হয়

নি। এ আবেগ ও ঈপ্সা ওর প্রাণের পাত্র পূর্ণ করে উপচে পড়ছে—কোথাও বা কাউকে না দিয়ে থাকতে পারবে না। এ ওর এক রকম ব্যাধি, এর বীজাণুও বুঝি অমর।

এবারে স্কুলে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিহ্নিত করেছে মনে মনে—অথবা চিহ্নিত হয়ে গেছে দেখা মাত্র—সেই বন্ধু।

ললিত।

ললিত লাহিড়ী।

উজ্জ্বল গৌর বর্ণ—লম্বা ধরনের চেহারা, শান্ত আয়ত দুটি চোখ, তাতে গভীর স্থির দৃষ্টি।

অন্তত বিনুর তাই মনে হয়েছিল।

নিয়তিই যেন অমোঘ আকর্ষণে ওকে টানল সেদিন—সেই প্রথম দিন—ললিতের দিকে, ললিতের পাশে গিয়েই বসল। ওর সঙ্গেই প্রথম পরিচয় হ'ল এ স্কুলে।

সেই দিনই—সেই ক্ষণেই ওর মন বলে উঠল, এই—একেই সে চেয়েছিল, চাইছিল। এ-ই ওর সেই চিরদিনের বন্ধু।

মনে হল, ভাবতে ভাল লাগল—জন্মাবধি এরই প্রতীক্ষা করছে সে।

ললিতরা এই পাড়াতেই থাকে—মানে স্কুলের পাড়ায়।

বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছাকাছি ওদের বাড়ি। বিনুদের বাড়ি থেকে লাইন পেরিয়ে পাড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে পথে পড়ে ওদের বাড়ি। মাঝারি ধরনের পুরনো বাড়ি তবে একেবারে জরাজীর্ণ নয়। তখনও এ অঞ্চলে এত ধনী ব্যক্তিদের সমাগম হয় নি, হ'লে বেমানান মনে হত। তখন খুব হতশ্রী লাগত না।

ললিতের বাবা কি একটা বড় বিলিতি ফার্মে চাকরি করেন। ললিত তাঁর প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় সন্তান। ওর মা দুটি ছেলে হবার পর অতি অল্প বয়সেই সুতিকা হয়ে মারা যান। তখন ওর বাবা নিতাইবাবুরই মাত্র তেত্রিশ বছর বয়স।

সুতরাং নিতাইবাবু আবার বিয়ে করবেন সেটা স্বাভাবিক। যথানিয়মেই বিয়ে করেছেন এবং এ পক্ষেও তিনটি মেয়ে ও দুটি ছেলেও হয়ে গেছে।

ললিতের কথাবার্তায়, আর পরে পাড়ার অন্য ছেলেদের মুখে যা শুনেছে—ললিত বিনুর মতোই দুর্ভাগা, স্নেহের কাঙ্গাল। ওর এক বছর বয়সে মা মারা গেছেন, মাকে মনেই পড়ে না। তাঁর একখানা ছবিও ঘরে নেই। বিয়ের পর বুঝি ললিতের মামার বাড়ি জোড়ে একখানা ছবি তোলা হয়েছিল সেটা চিকে খেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, মামার বাড়িতে সে ছবির যে কপি ছিল সেও নেই, সে নাকি আগেই ছাদ থেকে বৃষ্টির জল পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

ললিতের মামার বাড়িতে দিদিমা ছিলেন, ওর মার মৃত্যুর পর মাত্র চার-পাঁচ বছর বেঁচেছিলেন অবশ্য, তবু এই ক'বছরও তারা আদরে লালিত হতে পারত—কিন্তু হয় নি। দিদিমা ঐ বয়সেই অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর পক্ষে আর

ছোট ছেলে মানুষ করা সম্ভব ছিল না। মামারা পৃথক, দিদিমা বড় মামার কাছেই থাকতেন—তবে সেও ভাগে, বাকী দু ছেলে মাসে দশ টাকা ক'রে দাদার হাতে দিত, মার খোরাকী বাবদ।

এ অবস্থায় ভাগ্নেরা কোন্ মামীর কাছে মানুষ হবে? সে প্রশ্নই কেউ তুলতে দেয় নি, উত্থাপন মাত্রেই এড়িয়ে গেছে।

অবশ্য নিতাইবাবুও ছেলেদের মামার বাড়ি পাঠানোয় খুব আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর শালারা থাকে দর্জিপাড়া অঞ্চলে, ওখানকার ছেলেদের খুব সুনাম ছিল না। শালার ছেলেরাও যেভাবে মানুষ হচ্ছে সেটা ছেলেদের বাবার পক্ষে খুব আশাপ্রদ নয়। সেই জন্যে তিনিও এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন নি, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী না আসা পর্যন্ত ক' মাস এক বিধবা মাসতুতো দিদিকে এনে রেখেছিলেন, তাকে এখনও সেজন্যে মাসে পাঁচ টাকা ক'রে পাঠাতে হয়।

ললিতের দিদিমা একবার নিতান্ত কর্তব্য-বোধে ক্ষীণ কণ্ঠে প্রস্তাব তুলেছিলেন—'তা ওদের নয় কিছু দিনের জন্যে এখেনেই পাঠিয়ে দাও না! কে দেখছে ওখেনে, ছেলে দুটোর ক্ষোয়ার হচ্ছে হয়ত—'

অনাবশ্যক বোধেই নিতাইবাবু সে কথায় কোন উত্তর দেন নি। তিনি চিরদিনই স্বল্পবাক মানুষ, কাজেই তাঁর এ নিরুত্তরতা কেউ অস্বাভাবিক ভাবে নি, শাশুড়িও অপমানিত বোধ করেন নি। বরং বড় বৌমার কটুভাষণ ও তাচ্ছিল্যের ভাত থেকে ছেলে দুটো বেঁচে গেল ভেবে জামাইয়ের সুবুদ্ধির প্রশংসাই করেছিলেন মনে মনে।...

ললিতের সৎমা বড় লোকের মেয়ে। মানে নিতাইবাবুর অবস্থায় তুলনায়। এটা অবিশ্বাস্য বোধ হলেও অসম্ভব ঘটনা নয়। অবিশ্বাস্য এই জন্যে যে অবস্থাপন্ন লোকরা কেউ সহজে দোজবরেতে মেয়ে দিতে চান না। এ ক্ষেত্রে দিয়েছিলেন তার কারণ অবস্থা ভাল হলেও ভদ্রলোকের ছটি মেয়ে—আর সে মেয়েদেরও কোন বিচারেই রূপসী বলা চলে না। একেবারে কুরূপা নয় এই পর্যন্ত।

আর ঠিক সেই সময়েই নিতাইবাবুর বেশ একটু—সহকর্মীদের চোখ-টাটানো গোছের—পদোন্নতি হয়েছিল। মেয়ের কাকা ঐ আপিসেই কাজ করেন, কাজেই সংবাদ জানতে অসুবিধা হয় নি। বস্তুতঃ তিনিই এ সম্বন্ধ এনেছিলেন।

ললিতের বিমাতা পদ্মলতা মানুষ খারাপ ছিলেন না। সন্তানদের প্রতি যা অবশ্য করণীয় সব কিছুই ক'রে যেতেন—কিন্তু কর্তব্যের উপরে উঠতে পারেন নি তার কারণ এ বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তাঁরও সন্তান হতে আরম্ভ হয়েছে। স্নেহ মমতা উদ্বেগ প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি নিজের সন্তানদের ওপরই বর্ষিত হতে বাধ্য। হয়ত সেখানেই নিঃশেষ হয়ে যেত, তা হয় নি, এই ঢের তবে ঠিক ততটাই সমানভাবে সৎ ছেলেদের ওপরও আসবে তা আশা করাই অন্যায়।

ললিত আর তার দাদা অজিত এই পার্থক্যটা লক্ষ্য করবে সেও স্বাভাবিক। এবং এতটা আশা করা নিজেদেরই মূর্খতা, বাস্তব বুদ্ধির অভাব—তাতে ঐ বয়সে তারা বুঝতে চাইবে না, বা পারবে না, সেও প্রকৃতির নিয়ম। অবহেলা বা অযত্ন ঠিক নয়—হয়ত ঔদাসীন্যই—তবু তাতেই ক্ষুণ্ণ হত ওরা। রাত্রে

খেতে দেবার সময় নিজের ছেলেরা সবাই এসে না বসলে অপেক্ষা করতেন, ডাকাডাকি করতেন, খোঁজ নিতেন তারা আসছে না কেন—কিন্তু এদের বেলায় একবার মাত্র ডেকে—যাকে বলে 'ধম্ম ডাক'—ভাত তরকারী থালায় বেড়ে ঢাকা চাপা দিয়ে রাখতেন। বেশী দেরি হলে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে নিজেও খেয়ে চলে যেতেন। ওরা পরে এলে সেই সারি সারি এঁটো থালা ও উচ্ছিষ্টের রাশির মধ্যে একা বসে খেয়ে যেতে হ'ত।

নিতাইবাবু অনেক আগে খেয়ে নিয়ে পাড়ার ক্লাবে তাস খেলতে যেতেন—তাঁর এসব জানার কথা নয়। আর এ এমন কিছু অভিযোগ করার মতো অসদ্ব্যবহারও নয় যে বিশেষভাবে তাঁর কাছে গিয়ে জানাতে হবে।

এই ধরনের নিতান্তই ছোটখাটো ঔদাসীন্য ও বিস্মৃতি—কোন একটা তরকারি একদিন কাউকে দিতে ভুলে যাওয়া, কুটুম্ববাড়ি থেকে মিষ্টি এলে সবাইকে দিয়ে ওদের একজনকে দেবার কথা মনে না পড়া—হয়ত সকালে ওদের কারও জন্যেই কোন একটা খাদ্য তুলে রেখে পরের দিন পচে গেলে রাস্তায় ফেলে দিতেন, আগের রাত্রে সে কথা মনে না পড়া,—এসব কোন অবিচার বা দুর্ব্যবহার নয়, এর জন্যে নালিশ চলে না—একথা সেইটুকু বয়সেই বুঝত ওরা।

তবু এ স্নেহ-বুভুক্ষা যে ঠিক বিনুর তৃষ্ণার পথ ধরে চলত না—সেটা তখনই বোঝে নি সে।

অনেক, অনেক পরে বুঝেছে। প্রাণপণে সেদিকে চোখ বুজে থাকার চেষ্টা সত্ত্বেও একদিন সত্যকে স্বীকার করতে হয়েছে।

প্রথম পরিচয়ের পর ক'দিন যেতে না যেতেই বিনু ললিতের সঙ্গে একটু নিভৃত আলাপের জন্যে অস্থির অধীর হয়ে উঠল।

একটু ঘনিষ্ঠ সাহচর্য, দু-একটা অন্তরঙ্গ কথাবার্তা—যাতে অনায়াসে ভাবা যায় অপরের সঙ্গে ললিতের যে প্রীতির সম্পর্ক তার থেকে বিনুর সঙ্গে অনেক বেশী। এইটুকু শুধু।

বাড়ি খুব দূরে নয়, যেতে আসতে আধ ঘণ্টা আর আধ ঘণ্টা গল্প করা এমন কিছু অশোভন হবে না।

তার বাড়িতেও বাধা বিস্তর। বন্ধুদের ডেকে বাড়িতে আনা চলবে না। মা পছন্দ করেন না, তাছাড়া সে সুবিধাও নেই। তিনটে ঘর গায়ে গায়ে লাগা, ভেতর দিয়ে দিয়ে দরজা। মধ্যের যে ঘরটা বাইরের ঘর বা বাইরের লোক বসার ঘর হতে পারত, সেটায় আগে বামুনমা থাকতেন, তাঁর বিছানাটা গোটানো থাকত দেওয়ালের দিকে—এখন একেবারেই খালি পড়ে আছে। সেখানে একটা চেয়ার চৌকী এমন কি একটা টুলও নেই যে কাউকে বসতে দেবে। একটা ময়লা ছেঁড়া মাদুর আছে এক কোণে, সেটাও বামুনমারই—তিনি দুপুরে সন্ধ্যায় একটু গড়াতেন। তা পেতে কাউকে বসানো যায় না, ওর বন্ধুদের তো নয়ই। সে মাদুরখানা ছাড়া আর কিছুই নেই।

দরকার ছিল না বলেই সে ব্যবস্থা হয় নি।

রাজেনের বন্ধু বলতে সহপাঠীরা, তারা কলকাতার ছেলে, ট্রেনে ক'রে কেউ

এখানে গল্প করতে আসবে না। একবার মাত্র একজন এসেছিল, শৈলেশ বলে একটি ছেলে সে নাকি বরাবর সব পরীক্ষায় প্রথম হয়—তাকে রাজেন মাঝের ঘর দিয়ে এনে নিজের ঘরে অদ্বিতীয় বিছানাটাতেই বসিয়ে ছিল। সেদিন পূর্ণিমা, মা বেলায় নিজের খাবার করছিলেন, দুখানা পরোটা ভেজে দুটো রসগোল্লা আনিয়ে জলখাবার খেতে দিয়েছিলেন।

তবে সে রাজেনের বন্ধু, ভাল ছাত্র, তার সম্মান আলাদা। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে—বর্ধমানের দিকে কোথায় বাড়ি, এখানে হিন্দু হোস্টেলে থাকে। আত্মীয়-স্বজন কলকাতায় বিশেষ নেই বলেই এতদূরের পথ এসেছে। আর কার এত গরজ হবে?

বিনুর বন্ধুদের মা ভাল চোখে দেখেন না, কে কেমন বিচার না ক'রেই। তার এই স্থানীয় সহপাঠীদের ভেতরে এনে কোথাও বসানো যাবে না। মার ঘরে মার সঙ্গেই শোয় সে, সে বিছানায় বাইরের কাপড়জামা পরা, রাস্তায় মাঠে খেলে বেড়ানো ছেলেকে এনে বসানো তো যাবেই না। তাছাড়া ওদের বিছানাপত্রেও দৈন্যের ছাপ স্পষ্ট। সে দারিদ্র্যের চেহারা বন্ধুদের দেখাতে রাজীও নয় বিনু।

বিনুর সঙ্গীদের ওপর মহামায়ার এ বিদ্বেষ বা বিরক্তির মূলে বিনু সম্বন্ধে মহামায়ার বিশেষ উদ্বেগ। কাশীর সহপাঠীদেরও উনি সন্দেহের চোখে দেখতেন। ওঁর বিশ্বাস পাড়ায় যত 'বখাটে উনপাজুরে বরাখুরে' ছেলেরা ওঁর এই সরল, অনভিজ্ঞ আধপাগলা ছেলেটাকে বিগড়ে দেবার জন্যে উৎসুক ও ব্যগ্র। কোন বন্ধুকে যদি ডেকে বাইরের ফালি বারান্দাটায় কি সিঁড়িতে বসিয়েও গল্প করে—মা যে ধরনের বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন করবেন—কণ্ঠের তিক্ততা গোপন করার কোন চেষ্টা না ক'রেই—ভাবতেই ঘেমে ওঠে বিনু। সে রকম কোন ঘটনা ঘটলে সে অন্তত আর ঐ স্কুলে যেতে পারবে না।

সুতরাং বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে গেলে তাকেই যেতে হয়।

এমন কদাচ স্কুল থেকে ফেরার পথে বা কোন দিন হঠাৎ ছুটি হয়ে গেলে—সহপাঠী দু'একজন টেনে নিয়ে গেছেও—বিশেষ যাদের এই স্কুলের পাড়াতেই বাড়ি। বিনুর নিজের ভাল লাগে না। দেরি হলে মা ভাবতে শুরু করবেন, অথচ চিন্তার কোন কারণ ঘটে নি মানে বিপদ আপদ ঘটে নি—আড্ডা দিতে গিয়ে দেরি হয়েছে—জানলে চটে উঠবেন, বকুনি দেবেন।

অবশ্য হঠাৎ-পাওয়া ছুটিতে সে বিপদ নেই, তবু বিনুর ভাল লাগে না কারও বাড়ি যেতে। প্রাণপণে এড়িয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করে।

তার কারণও যথেষ্ট।

এরা বাড়ি নিয়ে গেলে এদের বাবা মা ভাইবোনরা কেমন সস্নেহ ভাবে কথা-বার্তা বলেন, কত কি খেতে দেন। এইসব বন্ধুরা যদি পাল্টা ওর বাড়ি কোন দিন আসতে চায়—এমনি দল বেঁধে!

এই ধরনের ঘনিষ্ঠতা হলে বলতেই পারে। বলা স্বাভাবিক। কিন্তু সে কোথায় বসতে দেবে?...তাদের এমন বাড়তি পয়সাও নেই যে বাজার থেকে খাবার এনে খেতে দেবে, অথবা করবার মতোও এত লোক নেই যে, বাড়িতে খাবার করিয়ে খাওয়াবে!

তার ওপর সবচেয়ে যেটা ভয়ের কথা—মায়ের বিরস মুখ, বিরক্ত ভঙ্গী এবং কঠিন কথাবার্তা। তারা অপমানিত বোধ করবে—ওর বন্ধুরা। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে, হয়ত ওর মুখের ওপরই কত কি বলবে। ওর মার সম্বন্ধে এমন সব কথা বলবে যা ওর সহ্য করা সম্ভব নয়, অথচ তার প্রতিবাদও করতে পারবে না।

এই ভয়েই শিটিয়ে থাকে সে। সহজে কোথাও কারও বাড়ি যেতে চায় না।

প্রসাদ বলে একটি ছেলে পড়ে ওদের সঙ্গে—খুবই ধনী ও বিখ্যাত লোকের ছেলে, বড় বংশের সন্তান—এক ডাকে সবাই চিনবে ওদের পরিবারের নাম। কিন্তু ছেলেটি দুনিয়ার খবর যত রাখে, রাজনীতি যতটা তার আয়ত্তে, বড়মানুষীও এই বয়সেই বেয়ারা বা আর্দালীকে যে ভাবে শাসন করতে শিখেছে—ফড়ফড় ক'রে ইংরেজী কথা বলে ওদের তাক লাগিয়ে—লেখা-পড়ায় সে পরিমাণ মন বা সামর্থ্য নেই। আর চাকরবাকরদের কাছ থেকে এখনই বিড়ি সিগারেট খেতে শিখেছে, খারাপ কথাও। সেগুলো যে খারাপ কথা তা বিনু জানত না, অন্য সহপাঠীদের লজ্জা-ও ভয়-মেশানো কৌতুকের হাসি দেখে বুঝত এগুলো প্রকাশ্যে—শিক্ষক কি অভিভাবকদের কাছে বলবার মতো কথা নয়।

একদিন এক শিক্ষকের আকস্মিক মৃত্যুতে স্কুল বসবার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটি হয়ে গেল। এই সুযোগেই সেদিন ওদের এক বিরাট দলকে নিজের বাড়িতে টেনে নিয়ে গিছল। বিনু প্রথমটা যেতে চায় নি, শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছিল—কতকটা কৌতূহল সামলাতে না পেরেই। এত ধনী, এত বিখ্যাত লোক প্রসাদের বাবা, বিলেত ফেরত বললেও কিছু বলা হয় না, বিলেতেই মানুষ বলতে গেলে, জীবনের অর্ধেকেরও বেশী দিন বিলেতে কেটেছে, অর্থাৎ পাক্কা সাহেব। তাঁদের বাড়িঘর জীবনযাত্রা না জানি কেমন—এ কৌতূহল ও জানার আগ্রহ ছিলই মনে মনে। সেই কারণেই ওর স্বাভাবিক অনীহা—সতর্কতাও বলা চলে—লঙ্ঘন ক'রেই গিয়েছিল দলের সঙ্গে।

ওদের বাড়িতে গিয়ে সব দেখেও ঠিক আশাভঙ্গ হয় নি।

বিরাট বাড়ি, চওড়া সাদা পাথরের সিঁড়ি, পাথরেরই রেলিং—সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে সামনেই বড় হল-ঘরের মতো ড্রয়িং রুম বা বৈঠকখানা। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা, সোফা কাউচ, সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো বড় বড় আয়না, অয়েল-পেটিং ছবি। পরে শুনেছে ওগুলো কয়েকখানা বিশ্ববিখ্যাত ছবির নকল, অনেক খরচ ক'রে পাকা শিল্পীদের দিয়ে করানো। বড় বড় ঝাড় বাতিদান—অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী থেকে নাকি কেনা। লাল ভেলভেটের পর্দা দরজায় দরজায়।

এছাড়া ঘরের এক কোণে একটা পিয়ানো—পিয়ানো এই প্রথম দেখল বিনু—উল্টো কোণে বড় গোছের একটা গ্রামোফোন আর তিন বাক্স রেকর্ড।

প্রসাদ গিয়েই রাজ্যের শৌখিন খেলনা বার ক'রে আনল কোথা থেকে, ক্যারম বোর্ড, লুডো, তাস। দলে দলে ভাগ করে বসে গেল সব। বিনুই এর মধ্যে সবচেয়ে আনাড়ি, বেমানান। সে এসব খেলা জানে না, কোন কোনটা কখনও দেখে নি পর্যন্ত, তাস চেনে, তবে গাদা পেটাপেটি ছাড়া কখনও কিছু খেলে নি। কার সঙ্গেই খেলবে, কে-ই বা শেখাবে!

কিন্তু প্রসাদও নাছোড়বান্দা। 'আরে আমি তোকে মানুষ করে দিচ্ছি' বলে জোর ক'রে নিজের সঙ্গেই বসালো। 'টোয়েন্টি নাইন' খেলার তখন নাকি খুব 'চল', সেটা মোটামুটি শিখিয়ে দিল ওকে—মানে নিয়মকানুনগুলো। কিন্তু খেলার গভীরে ঢুকতে পারল না বিনু। সে ইচ্ছাও খুব ছিল না, এর যে এত হিসেব আছে, প্রথমে হাতে পাওয়া চারখানা মাত্র তাস দেখে রঙ ঠিক করতে হবে, যে রঙ তোমাকে খেলা জিততে সাহায্য করবে ; কোন রঙের কখানা তাস পড়ল আর কখানা 'বাজারে' আছে এবং সেগুলো কার হাতে কোন্‌টা থাকা সম্ভব খেলার গতি দেখে ঠিক করা—এত হিসেব করতে পারে না বিনু। খেলা খেলাই, তাতে যদি অত অংক কষতে হয় তা হলে সে খেলায় আনন্দ কি !

ফলে, যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে না বলে প্রসাদের কাছে বকুনি খেতে লাগল অনবরত।

এইসব খেলা আর হৈহল্লার মধ্যে ভেতরের কোন ঘর থেকে প্রসাদের বাবা ডাকলেন ওকে, 'খোকা' বলে। প্রসাদ গিয়ে ওঁকে কি বলল কে জানে, একটু পরেই মুসলমান বাবুর্চি ও বেয়ারা এসে কয়েক ডিশ খাবার দিয়ে গেল—কেক স্যাণ্ডউইচ বিস্কুট সিঙ্গাড়া আর চা।

বোধহয় এই খাবারের কথাই ওর বাবা আনতে বা বলতে চেয়েছিলেন। বন্ধুরা এসেছে, তাদের কিছু খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছে কিনা। এত বড় লোক, পাকা সাহেব—তাঁরও কত সহৃদয়তা, কত বিবেচনা।...মুগ্ধ হয়ে গেল বিনু। সেই সঙ্গে নিজের বাবার অভাবটা মনে পড়ে—সে যে কতখানি অভাব নিত্যই তো বুঝছে, পদে পদে, মনের একটা গভীর ক্ষত যেন নতুন ব্যাথায় টনটন করে উঠল।

কিন্তু এদিকে একটা মস্ত বিপদ ওর সামনে। খাবার যারা দিচ্ছে, তারা মুসলমান যে। বিনুরা নাকি ব্রাহ্মণ, ওদের খাওয়া-ছোঁওয়ার ব্যাপারে অনেক বিধিনিষেধ আছে, সেগুলো মেনে চলা দরকার। ছোটবেলা থেকেই কথাগুলো মা আর বামুনমার মুখে শুনে এসেছে। কারও বাড়িতেই বড় একটা খেতে দিতেন না মা, এখনও দিতে চান না। বাড়িতে এলে বারবার প্রশ্ন করেন কায়স্থ বা বদ্যি কোন বন্ধুর বাড়ির তৈরি করা খাবার খায় কিনা, সে, সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দেয়, যেন না খায় কখনও। ব্রাহ্মণ বাড়ি ছাড়া নিমন্ত্রণ যেতে দেন না, সঙ্গে করে কদাচ কখনও কারও বাড়ি গেলে আগে থাকতে সতর্ক ক'রে দেন, কার বাড়িতে জল খাবার খাওয়া চলবে, কার বাড়িতে চলবে না।

ক্রমাগত এই নিয়মের বাধা আর নিষেধের কথা শুনতে শুনতে ওদের মনেও একটা সংস্কার গড়ে উঠেছিল।

ঘেন্না? না ঘেন্না নয়—ওদের যেখানে সেখানে খেতে নেই, বর্ণশ্রেষ্ঠর মর্যাদা বজায় রাখার জন্যেই রসনায় সংযম দরকার—এই বিশ্বাসটাই বদ্ধমূল হয়ে গেয়েছিল সহজভাবেই।

কাজেই এখানের খাবার আর পরিবেশনকারীদের দেখে মুখ শুকিয়ে উঠবে বৈকি !

ওর সামনে ডিশ নিয়ে আসতেই ক্ষীণ কণ্ঠে আপত্তি জানিয়ে এড়িয়ে যাবার

চেষ্টা করল। কারণ? মিথ্যে কথা বলা খুব একটা অভ্যাস নেই বলে একটু উল্টোপাল্টা হয়ে গেল কৈফিয়ৎগুলো। একবার বলল, ক্ষিদে নেই, আর একবার বলল, পেটটা খারাপ করেছে।

কিন্তু অত সহজে অব্যাহতি দেবার পাত্র প্রসাদ নয়। সে প্রথমটা খুব চোটপাট করল—সাধারণত যেমন করে ছেলেরা, 'নে নে, ন্যাকামো করিস না। পেট খারাপ করেছে না কচু। আসলে এটা তোমার নোকোতা। এসব মেয়েলি ন্যাকামি কার কাছে শিখলি! দেখছিস তো সবাই খাচ্ছে। তোর এত লজ্জা কিসের তাই শুনি! তুই পুরুষমানুষ—না কি! বন্ধুর বাড়ি বন্ধু এলে সে খাওয়াবে না!' ইত্যাদি—

তার পরই কিন্তু—দেখা গেল লেখা-পড়ায় যেটুকু খামতি ওর সেটা বুদ্ধির অভাবে নয়—ইচ্ছার অভাবে—একরকমের অবজ্ঞা আর অনুকম্পা মেশানো চোখে ওর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'ঠিক করে বল দিকি খাবি না কেন, মুসলমানের ছোঁয়া বলে?…তোরা এখনও এসব মানিস! কবেকার লোক রে তোরা। ছোঃ! দেখছিস সবাই খাচ্ছে, ওদের মধ্যে বামুন নেই? ওরা হিন্দু নয়? আমি নিজেও তো বামুন।'

'না না—যা!—তার জন্যে নয়', আরও বেশী বিব্রত হয়ে পড়ে বিনু, 'সে কি, সে কিছু নয়। এমনিই, বাইরে খাই না কখনও, অব্যেস তো নেই—'

'দ্যাখ, মিছিমিছি এক ঝুড়ি মিছে কথা বলিস না। তোকে পরশুই দেখেছি গণেশের কাছ থেকে ডালমুট কিনে খাচ্ছিস!' তারপর বিনুর গলার আওয়াজ ভেঙ্গিয়ে বলে, 'সে জন্যে কিছু নয় তো খা—যা হয় কিছু মুখে দে, তবে বুঝি!'

কথাটা নির্ঘাৎ সত্য। মা একটা ক'রে পয়সা দেন এখনও, টিফিন বাবদ। এক পয়সায় চানাচুর ডালমুট কি বেগুনি ফুলুরি ছাড়া—কিছু খাওয়া যায় না। ইস্কুলের ধারে কাছে কোন তেলেভাজার দোকান নেই—কোন দোকানই নেই, সবই বসবাসের বাড়ি চারিদিকে—কাজেই ঐ গণেশের ডালমুট ছাড়া আর কিছু কেনা যায় না। অবশ্য তাও যে সব দিন খায় তা নয়—খুব খিদে না পেলে খায় না। পরশুই সেইরকম অসহ্য খিদে পেয়েছিল।

ওর চোখের ওপর তখনও প্রসাদের দৃষ্টি স্থির। সে যেন ওর মনের এই কথাগুলো বইয়ের পাতার মতোই পড়ে গেল, বলল, 'দ্যাখ, বাজারের খাবার তো কত কি কিনে খাস, কে কি দিয়ে কী তৈরী করে জানিস? কত নোংরাভাবে তৈরী করে। আর কেক কি কখনও খাস নি? সে তো মুরগীর ডিম দিয়ে হয়, মুসলমানরাই করে। …যাক গে বিস্কুট তো আছে, তাই খা…তবে এসব কুসংস্কার ছেড়ে দে, বুঝলি! এখনকার দিনে এসব চলে না। লোকে শুনলে গায়ে থুথু দেবে।'

আরও অনেক কথা বলল প্রসাদ। অন্য ছেলেরাও অনেকে প্রসাদের কথা সব শুনতে পেয়েছিল, তারাও হাসাহাসি করতে লাগল। টিটকিরী দিল বিস্তর। 'ছুঁচিবাই বিধবা' এমনি অনেক ধিক্কার শুনতে হল।

অগত্যা—লজ্জায় অপমানে তখন কান মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছে—এটা যে জাত

বা ধর্মের ব্যাপার নয়, এমনি বলছিল—সেইটে প্রমাণ করার জন্যেই কখানা সিঙ্গাড়া আর বিস্কুট তুলে নিল ডিস থেকে এবং প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাণপণে চিবোতে লাগল।

সিঙ্গাড়াগুলো ভাল নয়, কী একরকম বাজে ঘিয়ে ভাজা, তার ওপর ঠাণ্ডা, বোধহয় পাড়ার বাজে দোকান থেকে কিনে এনেছে বেয়ারা, কিছু পয়সা মারার কৌশল এটা—অথবা অনিচ্ছার জন্যেই—খেয়ে তার গা-কেমন করতে লাগল। কোনমতে মনের জোরে নিজেকে সামলে রাখল সে।

এখানে আসাই উচিত হয়নি। মা যদি কখনও জানতে পারেন, কত দুঃখ পাবেন। সত্যিই, তারা যখন আর পাঁচটা সাধারণ লোকের মতো নয়, তখন মেশবার সময়ও একটু দেখেশুনে বন্ধু বেছে মেশাই উচিত। এই কথাই মনে মনে বলতে লাগল বারবার।

তবু এইতেই রেহাই পেল না বিনু। আরও কিছু বাকি ছিল।

প্রসাদ কাজটা যে কোন আক্রোশবশতঃ করেছে তা নয়। ওর মাথায় এমনিতেই নানা রকম দুষ্টবুদ্ধি খেলে সর্বদা। বিনুর এই খাওয়া-ছোঁওয়ার বাছবিচার দেখে ওকে বা ওদের পুরাতনপন্থী বুঝেই সে দুষ্টবুদ্ধি চাড়া দিয়ে উঠল।

বিকেলের দিকে ঘড়িতে সময়টা দেখে বিনু চঞ্চল হয়ে উঠল। ভাল লাগছিল না তার আদৌ, আশা করছিল এ-আড্ডাও এক সময় বিনা কর্মের ক্লান্তিতে আপনিই ভেঙ্গে আসবে। কিন্তু বোধহয় সকলেই অপেক্ষা করছিল একজন কেউ আগে কথাটা তুলুক। বিনুই সে-কাজটা করল।

চারটেয় ছুটি হয় ওদের, বাড়ি পেঁছিতে সাধারণত সাড়ে চারটে বাজে, কোনদিন বেরোবার মুখে গল্পগুজবে পৌনে পাঁচটা বেজে যায়, তার বেশী নয়। আজও সেই সময়ই ফেরা উচিত। না হলেই নানান জবাবদিহিতে পড়তে হবে। এও এক ধরনের মিথ্যাচরণ। তবু এ ততটা দোষের নয়, বানিয়ে বানিয়ে অনেক মিথ্যা কথা বলাটা যতখানি। এই বলেই মনকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল সে, সেই জন্যেই অপেক্ষা করছিল অন্য দিনের ছুটির সময়টায়। তার চেয়ে বেশি দেরি কিছুতেই করা চলবে না।

বিনু একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'প্রসাদ, আমি আজ এখন চলি ভাই, আর দেরি করতে পারব না।'

'সে কিরে। এই তো সবে পৌনে চারটে। এখুনি উঠবি কি। চারটে বাজুক অন্তত, ছুটির সময়টা হোক। এখন থেকে হেঁটে গেলেও পাঁচটার মধ্যে খুব পেঁছিতে পারবি। আর যদি বাসে যাস—এখান থেকে বালিগঞ্জ স্টেশন এক আনা ভাড়া—সাড়ে চারটেয় বেরোলেও চলবে।...এই তো সবে জমল, এরই মধ্যে যাবি কি!'

'এই সবে জমা'র একটা বিশেষ অর্থ আছে।

প্রসাদের বাবা গাড়ি বার করিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেলেন। ওর দাদা এখানে থাকেন না, ইন্দোরে না কোথায় চাকরি করেন। মা বহুদিন মারা গেছেন সুতরাং অভিভাবক বলতে বাড়িতে কেউই নেই সে সময়টায়। ফলে প্রসাদ আর তার মতো দু-তিনজন বন্ধু মুখের লাগাম খুলে দিয়েছে, খারাপ কথার

ফোয়ারা ছুটছে।

বিনু এর বেশির ভাগ কথারই মানে বোঝে না। তবে এগুলো যে খারাপ কথা, তা অন্য বন্ধুদের ওপর প্রতিক্রিয়ায় বোঝে। ওর খারাপ লাগছে আরও একটা কারণে—সে ললিত। ললিত অত হাসছে কেন। ও যেরকম ভাবে হাসছে, মনে হচ্ছে এই কথাগুলো বেশ উপভোগ করছে। ললিত এ-ধরনের কথায় আমোদ পাচ্ছে—এতে যেন একটা বিশেষ ব্যথা অনুভব করছে বিনু। তবু তো একটা সান্ত্বনা—সে নিজে এই ইতর রসিকতায় অংশগ্রহণ করছে না।

অবশ্য সোজাসুজি এতে যোগ দেয় নি আরও অনেকেই। এসব কথা নিজেরা বলছে না শুধু যে তাই নয়, এ-পর্বের শুরু থেকেই উশখুশ করছে—উঠে যাবার জন্যে। শুধু প্রসাদের ক্যাটকেটে কথার জন্যেই সাহস করছে না।

ওরা উপভোগ করছে না, তার কারণ এইসব রসিকতার পূর্ণ রস উপভোগ করার মতো বয়স তাদের অনেকেরই তখনো হয় নি। শুধু নিষিদ্ধ আচরণের গোপন আনন্দ ছাড়া অন্য কোন রস পাওয়া ওদের সম্ভব নয়।

বিনু কিন্তু এবার মনস্থির করে ফেলেছে। সে বই-খাতা গুছিয়ে নিয়েই উঠে পড়েছিল, সে সিঁড়ির দিকে যেতে যেতেই বললে, 'না ভাই, মাকে বলা আছে, ছুটির পর আর একটুও দেরি করব না। সাড়ে চারটেয় ফিরে মাকে—মাকে নিয়ে পাঁচটার মধ্যে এক জায়গায় যেতে হবে।'

'হঠাৎ আবার মিছে কথার ঝাঁপি খুললি!' প্রসাদ বলে ওঠে।

বিনুও তখন অপ্রস্তুত নয়, সে আগেই এ-অবস্থাটা ভেবে রেখেছিল, সেও শান্ত অথচ বেশ একটু শানিত কণ্ঠে বলল, 'তুই এত মিছে কথা বলিস প্রসাদ।'

'তার মানে।'

প্রসাদ ঠিক বুঝতে পারে না আক্রমণটা কোথা দিয়ে কিভাবে আসছে।

বিনু বলল, 'নিজে দিনরাত মিছে কথা বলিস বলেই দুনিয়ার সব লোককে কেবল মিথ্যে কথা বলতে দেখিস।'

বলতে বলতেই সে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

প্রসাদও এর শোধ তুলবে বৈকি। সেও মোক্ষম ঘা দিল।

হঠাৎ ওকে ছেড়ে মদনদের দিকে চেয়ে বলল, 'হ্যাঁরে এই মদনা, তাহলে আমাদের নেকস্ট মীটটা কোথায়? মানে এমনি কোন অকেশ্যান হলে? এবার আমাদের ইন্দ্রর বাড়িই যাওয়া দরকার। কী বলিস? বেচারা একটেরে পড়ে থাকে, ওর বাড়ি তো যাওয়াই হয় না আমাদের।'

বুকের মধ্যেটা ধড়াস করে উঠল বিনুর।

সে যে আজ এখানে এসে কি ভুল—ভুলও নয়, অন্যায় করেছে, তা ক্রমশই বেশি ক'রে বুঝছে। হয়ত সে বোঝার শেষ হয় নি এখনও। প্রসাদকে বকে-যাওয়া বড়লোকের ছেলে বলেই জানত, কিন্তু সে যে এত পাজী, তা জানা ছিল না। জানলে কখনই সে ফাঁদে পা দিত না।

ওদিক থেকে আরও দু-তিনজন—অত কিছু তলিয়ে না বুঝেই ধুয়াটা ধরে নিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল।'

বিনুর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে ততক্ষণে, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে।

তার ঐ অল্প সময়ের মধ্যে এটুকু বুঝে নিয়েছে যে, ভবিষ্যতে অনেক বেশী লজ্জা থেকে বাঁচতে হলে—এখন একটু লজ্জা স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নেওয়া ভাল।

সে সিঁড়ির মুখেই একটু থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'না ভাই, আমি গরিব মানুষ, আমার বাড়িতে পাঁচ-ছ'জনের বসবারই জায়গা নেই, কিছু খাওয়াতেও পারব না। বাড়িতে ঠাকুর-চাকর কোন লোকও নেই, এসব করবার। একটা ঠিকে-ঝি আছে শুধু বাসন মাজার, মাকেই বাকী সব কাজ করে নিতে হয়। আমার ওখানে যাবার চেষ্টা করো না।'

একটা ঠিকে ঝি পর্যন্ত নেই বর্তমানে, সেটা আর লজ্জায় বলতে পারল না।

আবারও সেই শান্ত কঠিন দৃষ্টি স্থির হয় ওর মুখে, সেই সঙ্গে ঠোঁটের একটা—নিষ্ঠুর যদিবা বলা না যায়—নির্মম ভঙ্গী।

'বসবার জায়গা নেই মানে কি? শুনেছি তো তোদের বাড়ির সামনে একটু খোলা বাগান-মতো আছে—সেখানেই বসব আমরা, ঘাসের ওপর মাটিতে, তাতে কিছু আটকাবে না। আর খাওয়া? সেও না হয় নিজেরা চাঁদা তুলে কিনে নিয়ে যাবো। একটু জল তো দিতে পারবি? না, তাও নেই।'

হয়ত কোনদিনই যাবে না, অতদূরে কে যাবে। তবু বলা যায় না, প্রসাদের যেন একটা রোখ চেপে গেছে। শুধু বিনুকে জব্দ করার জন্যেই দলবল নিয়ে হাজির হতে পারে।

লজ্জায় অপমানে—এখানে আসার নিবুদ্ধিতার জন্যে ক্ষোভে ও আত্মগ্লানিতে ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল, তবু এ পর্বের এখানেই শেষ করা উচিত—এই ভেবেই সে অতিকষ্টে গলার আওয়াজটাকে শান্ত আর স্বাভাবিক করার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'না ভাই, আমার মা দাদা এসব পছন্দ করেন না।'

বলতে বলতেই দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

পিছনে টিটকিরি রোল উঠেছে। সে তো উঠবেই। তার সব কথা শোনা গেল না, তবু দু-একটা শব্দ কানে এল বৈকি। 'কঞ্জুষ' 'কিপ্পুস', অগাধ জলের মাছ'—এবং শেষ কথাটা প্রসাদেরই—'খাতি পারি, নিতি পারি, দিতি পারি না!'…

দোলু বলে ওর এক সহপাঠী লেখাপড়ার তত ভাল নয়—প্রসন্নবাবুর ভাষায় 'মাঠো'—সে বেরিয়ে এসেছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—একটু দ্রুত এগিয়ে এসে ওর একটা হাত ধরে ফেলল। সে বোধহয় ওর অবস্থাটা বুঝেছিল—চোখের জল পড়েনি বলেই আরও, চোখের সামনে সব একাকার ঝাপসা হয়ে গেছে, অন্ধর মতো ঠোক্কর খেতে খেতে পথ চলছে—তাই খুব আস্তে, আলতোভাবে হাত ধরে রেখেই পাশে পাশে চলতে লাগল, ও যে পথ দেখাবার মতো ক'রে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা না জানাবার চেষ্টা করতে করতে। সেই ভাবেই যেতে যেতে বলল, 'কেন ওসব কথা বলতে গেলি! ওরা তোর ওখানে যাবে ভেবেছিস? কস্মিনকালেও না। মিছিমিছি ঘাড় পেতে কতকগুলো টিটকিরি শোনার দরকার কি?'

আশ্চর্য ! এই দোলুকে এত দিনের মধ্যে কখনই কোন রকম আমল দেয় নি বিনু। খুব একটা সচেতনভাবে না হ'লেও বোধহয় একটু অবজ্ঞার চোখেই দেখেছে। পেছনের বেঞে বসে, হ্যা-হ্যা ক'রে হাসে, অকারণে চেঁচিয়ে কথা বলে। ঈষৎ একটু নাকি সুর ওর গলায়, আর বখনও হোমটাস্ক তৈরী ক'রে আনে না—এ কোন পরিচয়টাই ওর কাছে বন্ধুত্ব করার যোগ্য বলে বোধ হয় নি। আজ ওর হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেল। চোখের জলও আর সামলাতে পারল না ! এতক্ষণ পরে এই সত্যকার সহানুভূতির স্পর্শে তা ঝরঝর ক'রে ঝড়ে পড়ল।

সে তাড়াতাড়ি হাতের উল্টো পিঠে চোখ মোছার চেষ্টা করতে করতে গাঢ় স্বরে বলল, 'তুমি জানো না ভাই, ঐ প্রসাদটা সব পারে। শুধু আমাকে জব্দ করার জন্যেই হয়ত সকলকে গাড়ি ভাড়া দিয়ে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। আমার বাড়িতে একটা বসতে দেবার মাদুর পর্যন্ত নেই, মা সব কাজ নিজের হাতে করেন—'

বলতে বলতে আরও এক ঝলক জল উপ্‌চে পড়ে ওর চোখ থেকে।

দোলু তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে গলায় একটা বিকৃত সুর বার করে বলে, 'এ*- ! তা আর নয় ! তাহলেই তুই প্রসাদকে চিনেছিস। হাড় কিপ্পন ! ও কাউকে কোন দিন এক পয়সা খাইয়েছে দেখেছিস কখনও ? সেদিন সেই যে একটি অন্ধ ভদ্রলোক সাহায্য নিতে এসেছিলেন—মনে আছে ? মেয়ের বিয়ের জন্যে ? হেড স্যার মনিটারদের বলেছিলেন ক্লাস থেকে যে যা দেয়—যতটুকু হোক চেয়ে জড়ো ক'রে ভদ্রলোককে দিতে। সব্বাই দিলে এক পয়সা দু' পয়সা—ফণী অরবিন্দ লক্ষ্মীছাড় ছেলে সব—তারাও দিলে—প্রসাদের কাছ থেকে এক পয়সাও বেরোল ? তুই নিশ্চিন্ত থাক, কেউ যাবেও না, প্রসাদও নিয়ে যাবে না কাউকে !'

॥ ২৭ ॥

ইতস্তত করেছিল বৈকি। অনেক দ্বিধা, অনেক আশঙ্কা।

কে কি মনে করবে, ওর গুরুজনরাই বা কি বলবেন—তার মাকেই বা কি কৈফিয়ৎ দেবে—ভাবনার অন্ত ছিল না।

কিন্তু যত ইতস্তত করে, যত নিবৃত্ত হবার কারণের সম্মুখীন হয় ততই আকর্ষণ আর আবেগ প্রবল হয়ে ওঠে।

এমন একতরফা আর অকারণ আবেগ আর কারও বোধহয় কিনা, এতাবৎ হয়েছে কিনা—সে জানত না। আজও জানে না। হয়ত তার দৈহিক ও মানসিক গঠনের অস্বাভাবিকতা, বা—এখন অনেকে বলেন, জন্মলগ্নে গ্রহ সংস্থানের ফল এসব মানসিকতা—যে কারণেই হোক, যখন যে আবেগ মনের মধ্যে দেখা দেয় তা যেন দেখতে দেখতে প্রবল আর অসম্বরণীয় হয়ে ওঠে।

বিশেষ এই ব্যাপারটায়। এ যে কী ওর এক অবর্ণনীয় মনোভাব, প্রায় আজন্ম তৃষ্ণা—এর কথা তো কাউকে বোঝাতেও পারবে না সে। ছেলেবেলায় কলকাতায় যখন ছিল, কাশীতে এসেও যে এক বছর স্কুলে ভর্তি হয় নি—

তখনও, বোধহয় প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ থেকেই, মনে মনে এমনি একটা অস্পষ্ট ঝাপ্সা স্বপ্ন দেখেছে, একটা অজানা পিপাসা বোধ করেছে।

অস্পষ্ট আর অজানা তার কারণ—চোখের সামনে তেমন কোন স্পষ্ট ছবি নেই, অভিজ্ঞতা তো নেই-ই। একটু বড় হবার পর যে সব গল্প উপন্যাস পড়েছে, তাতে নরনারীর আকর্ষণের কথাই অধিকাংশ। তা যে ভাল লাগে নি তা নয়—কিন্তু সেগুলো ঐ অল্প বয়সেই উদ্দাম আবেগ এনে ওর মনের চোখ রুদ্ধ করতে পারে নি।

একটা অভ্যাস ওর বরাবরই ছিল, সেই প্রথম বাল্য থেকেই—যে-গল্প বা গল্পের কোন অংশ ভাল লাগত—বোঝবার চেষ্টা করত, পরবর্তী বয়সে নিজেকে প্রশ্ন করত—কেন ভাল লাগল। সে অভ্যাস বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত করেছে। নিজের রচনা সম্বন্ধে আত্মজিজ্ঞাসায়। কেবল দুটো গল্প ওকে অন্যভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তখনও সে কাশীতে—কী একটা কাগজে মনে নেই, বোধহয় যমুনা কি গল্প-লহরীতে কিম্বা জাহ্নবী মানে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত কাগজ—দুই বন্ধুর গল্প পড়েছিল একটা। এক বন্ধু অপরের সঙ্গে তুচ্ছ কারণে বিশ্বাসঘাতকতা করল, তা সত্ত্বেও সেই অপর বন্ধু এর বিপদে নিজের সুনাম, পারিবারিক জীবন—সমগ্র ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে রক্ষা করল।

আর একটা গল্প—বোধহয় টলস্টয়ের হবে—সেটা পড়েছে এখানে ফিরে এসে।

রাশিয়ায় প্রচণ্ড তুষারঝটিকা ও কল্পনাতীত ভয়াবহ শৈত্যের মধ্যে দুটি লোক এক বিরাট, প্রায় সীমাহীন প্রান্তরে আটকে পড়েছিল। এক গ্রাম্য চাষী গৃহস্থ আর তার দাসপ্রজা।

ওদেশে তখন চাষী প্রজারা জমির মালিকের সম্পত্তি বলে গণ্য হত। প্রায় ক্রীতদাসের মতোই জীবন যাপন করত এরা, প্রভু বা জমি বদল করা চলত না। মালিকের বিনা অনুমতিতে বিয়ে পর্যন্ত করার হুকুম ছিল না। সুতরাং এই সব সার্ফ বা দাসপ্রজাদের মালিক সম্বন্ধে স্নেহ বা শ্রদ্ধা থাকার কথা নয়। কিন্তু এই ক্রীতদাসটি যখন বুঝল আরও কিছু বেশী শীতবস্ত্র না পেলে প্রভুর জীবন রক্ষা হবে না, যথেষ্ট তাপ রক্ষা করা যাবে না—তখন নিজের জামাটিও খুলে মনিবের জামার উপর চাপা দিল, তারপর—নিশ্চিত মৃত্যু জেনেই, নিজের দেহ দিয়ে ঢেকে রাখল তাকে। ফলে প্রভু বাঁচল কিন্তু ভৃত্যটি বরফে কাঠ হয়ে জমে গেল।

এই দুটো গল্প পড়েই একটা অভূতপূর্ব উত্তেজনা আর আবেগ বোধ করেছিল বিনু—সেটা আজও স্পষ্ট মনে আছে।

গোরাকে যখন ভালবেসেছিল বা ভালবাসতে চেয়েছিল, তখনও বালক বয়স পার হয় নি একেবারে। ললিতকে দেখল কৈশোরে পেঁৗছে। এ আবেগ অনেক বেশী প্রবল, অনেক বেশী উদ্দাম। এতে যেমন অধীরতা, তেমনি বেদনা। আবার সেই বেদনা বা যন্ত্রণার মধ্যে কোথায় একটা আনন্দও যেন। যন্ত্রণা পেয়েই আনন্দ।

সুতরাং এ আবেগ যে তাকে অস্থির ক'রে তুলবে—এ স্বাভাবিক।

আর স্বভাবের সেই অমোঘ নিয়মেই তার বিবেচনা হিসাব দ্বিধা সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল।...

একদিন—কী একটা ছুটির দিন সেটা—একখানা জরুরী বই চেয়ে আনার অজুহাতে মাকে বলেই সে ললিতের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হল।

বাড়ি সেদিন আর খুঁজে বার করতে হয় নি। এর আগেও একদিন বাজার যাবার পথে খোঁজ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে এসে দেখে গেছে বাড়িটা। তবে সেদিন ডাকতে পারে নি, সাহস হয় নি বললে বেশী বলা হয়—সংকোচে বেধেছিল। তখনও মনের দ্বন্দ্ব আশংকা ও বিচারবুদ্ধি আবেগের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে নি।

আজ ডাকবে। দেখা করবে বলেই তো এসেছে।

ডাকলও। গলা কি কেঁপে গেল? সহজ সুর বেরোল না? কে জানে। তার তো মনে হল সে যথাসাধ্য সহজভাবেই ডেকেছে।

প্রথমটা ললিত বুঝতে পারে নি।

এ-গলা তার তেমন পরিচিত বলে বোধ হয় নি। এতটা পরিচিত হয়ও না। পাশাপাশি বসে যার সঙ্গে কথা বলা যায়, সে হঠাৎ একদিন চেঁচিয়ে ডাকলে গলা চিনতে দেরি হয়।

তাছাড়া, বিনুর মতো এমন অন্তর্নিবিষ্ট বা অন্তর্নিমগ্ন ছেলে, অন্তত দেখলে তাই মনে হয়। (কথাটা কদিন আগে শিখেছে হেডমাণ্টার মশাইয়ের কাছে—ইংরাজীতে নাকি একে ইনট্রোভার্ট বলে) নিজে থেকে কোথাও আসবে কেন বন্ধুর বাড়ি—একেবারেই যেন ভাবা যায় না। ললিতও তাই ভাবতে পারে নি। জানলা দিয়ে দেখে তাই একটু অবাকই হয়ে গিছল, তারপর অবশ্য আর দেরি হয় নি—ব্যস্তভাবে খালি গায়ে কোঁচার খুঁটটা জড়াতে জড়াতে বেরিয়ে এল।

'কী ব্যাপার! তুমি! হঠাৎ!'

কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। বিস্ময়ের সুরও অকৃত্রিম। কিন্তু বিনুর মনে হল কোথায় যেন একটা অস্বস্তির ভাব দেখা যাচ্ছে—তার মধ্যেই।

কারণটা পরে জেনেছিল। অথবা আরও কিছুদিন যাতায়াত করতে করতে বুঝেছিল!

সেদিন ললিতের বাড়ি গিয়ে একটু অসুবিধাতেই ফেলেছিল বিনু তাকে।

ললিতদের বাড়িও ছোট, সে তুলনায় লোক বেশী।

এমনিতেই তারা ক' ভাইবোন মিলে সংখ্যায় কম নয়। ওদের দু ভাইকে যিনি মানুষ করতে এসেছিলেন, সে বিধবা আত্মীয়াটিকে আর তাড়াতে পারেন নি নিতাইবাবু। তাড়াবার খুব গরজও ছিল না, বরং ধরে রাখারই প্রয়োজন ছিল। অবিরাম ছেলে মানুষ করার পর্ব ওঁর বাড়িতে তো চলছেই। রান্নার কাজ ধাত্রীর কাজ—এবং আসল গৃহিনীর কাজও তিনিই করেন।

এছাড়া, ওঁরা স্বামীস্ত্রী, এই ভদ্রমহিলা ও এতগুলি ছেলেমেয়ের ওপর দুটি ভাগ্নে এসে জুটেছে। তারা সুদূর মফস্বলের এক গ্রামে থাকে, সেখানে স্কুল একটা আছে সেমিরে গোছের—কলেজের কোন ব্যবস্থা নেই। এই দু ভাই

ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলেজে পড়তে এসেছে এখানে, এই শহরেই মামার বাড়ি থাকতে হোস্টেলে থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সে সামর্থ্যও তাদের নেই। ভগ্নীপতি শুধু মধ্যে মধ্যে এক আধমণ চাল আর বাগানের ফসল কিছু কিছু দিয়ে যান।

রাত্রে শোবার জায়গারই অপ্রতুল, পড়বার কোন পৃথক স্থান তো নেই বললেই চলে। যে যার বিছানায় বসেই পড়াশুনো করে। ছোটরা চেঁচিয়ে পড়ে, মারামারি করে—ফলে বড়দের পড়ার ক্ষতি হয়। এরই কোন প্রতিকার করা যায় না—সে ক্ষেত্রে ছেলেদের বন্ধু এনে বসানোর বা গল্পগুজব করার জায়গা মিলবে কোথা থেকে?

সদরের পরেই একটি চলনমতো জায়গায় একটা লোহার বেঞ্চি পাতা আছে. আর দু তিনখানা ভাঙাচোরা বাঁকা লোহারই চেয়ার—সেখানেই নিতাইবাবুর বৈঠকখানার কাজ চলে। সেখানে ছোট ছেলেরা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বসে গল্প করবে তা চিন্তারও অতীত। একমাত্র ললিতের দাদা—যেহেতু বাড়ির বড় ছেলে —এক আধ দিন সেখানে তার সহপাঠীদের এনে বসায়। আর কারও অতটা সাহস নেই।

ঘরে না হোক কোথাও একটা বসাতে পারল না—এর জন্য ললিত একটু অপ্রতিভ বোধ করছিল বৈকি! সেদিনই বাবার দুই বন্ধু এসেছেন কী একটা কাজে, চলনের সেই অদ্বিতীয় বেঞ্চিটিও জোড়া। আর ছুটির দিন, বাবা বাড়ি আছেন, সকালবেলা পড়াশুনোর সময় বন্ধুর সঙ্গে বসে গল্প করলে পরে বাবার কাছে—হয়ত ঠিক বকুনি খেতে হবে না—অনেক জবাবদিহি করতে হবে।

ওর এই ঈষৎ বিব্রতভাব অতিমাত্রায় স্পর্শসচেতন বিনুর দৃষ্টি এড়ায় নি।

লজ্জা আর দুঃখের সীমা রইল না তার। নিজেকে দিয়েই বোঝা উচিত ছিল তার এই অসুবিধার ব্যাপারটা।

সত্যিই, ললিতই যদি ওর বাড়ি যায় আজ, সে কি বসতে দিতে পারবে? এমনকি নিশ্চিন্ত হয়ে এইভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করাও তো চলত না।

ললিত অবশ্য নিজেই কৈফিয়ৎ দিল, 'তুমি এই প্রথম এলে ভাই আমার বাড়ি —অথচ আজই এমন অবস্থা একটু বসতে দেবারও জায়গা নেই।'

'না না, আমি এখুনি চলে যাচ্ছি।' বিনু এর মধ্যেই ঘেমে নেয়ে উঠেছে, কতকটা তোৎলার মতো থেমে থেমে বলল, 'আচ্ছা—তোমার কাছে মানে ডাড্‌লি-স্ট্যাম্পের জিওগ্রাফী আছে—?'

শেষের দিকে যেন কোনরকমে হঠাৎই বলে ফেলে।

'ডাডলি স্ট্যাম্পের জিওগ্রাফী?' অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে ললিত, 'সে আবার কি?…আমাদের কি পড়ানো হবে এবার? না তাই বা কী ক'রে হবে। কে জানে—আমি তো নামও শুনি নি।…সে তোমার কি কাজে লাগবে?'

'না না, এমনি, একটু শখ হয়েছিল। বইটার খুব নাম শুনেছি। মনে হল তোমার দাদা কলেজে পড়েন, হয়ত ওঁর পাঠ্য আছে—'

হঠাৎই আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বইটার নাম ক'রে ফেলেছে। নামটা

বেরিয়ে গেছে মুখ দিয়ে। হয়ত একটু পাণ্ডিত্য দেখাবার ইচ্ছাও ছিল। বলে ফেলে এখন বিষম অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে—এ বই এখানে খোঁজ করার অর্থহীনতা নিজের কাছেই ধরা পড়েছে। ফলে আরও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কথাগুলো।

ললিত অবাক।

'সে কি! দাদা তো আমাদের ইস্কুলেই পড়ে। এই তো সবে ফার্স্ট ক্লাস। তুমি তো চেনো আমরা দাদাকে—রোজই দেখছ!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তাও তো বটে!···আচ্ছা আমি আজ আসি ভাই, কিছু মনে ক'রো না।···বইটার নাম শুনেছি এত, একবার খুব দেখার ইচছে ছিল।' বলতে বলতেই একরকম ছুটে পালিয়ে আসে সে।

সে সারাটা দিনই যেন কেমন এক ধরনের লজ্জা আর অপ্রস্তুত ভাবের মধ্যে দিয়ে কাটল।

সে লজ্জা নিজের কাছে, নিজের মনে।

ক্ষণেক্ষণেই নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা মনে পড়ে আর যেন একটা যন্ত্রণা অনুভব করে। আত্মধিক্কারে এমন একটা শারীরিক কষ্ট বোধ করে লোকে তা সে জানত না।

ছি ছি ছি! কী ভাবল ললিত ওর সম্বন্ধে। কী ক্যাবলাই না জানি মনে করল। এক নম্বরের বুদ্ধু ভাবল নিশ্চয়, কিম্বা একটা পাগল!···এই কথা যদি ললিত অন্যদের কাছে গল্প করে! ইস! কী করল সে, কী করল। এ কি ভূতে ধরেছিল তাকে। একটা যা হোক দরকার কি কৈফিয়ৎ যদি আগেই ভেবে নিয়ে যেত সে। মাকে তো বলে গিছল একটা কম্পোজিশনের বই চাইতে যাচ্ছে। তা-ই কেন বলল না।

কথাটা মনে পড়লেই ঘেমে ওঠে; আপনা থেকেই লাল হয়ে ওঠে মুখ। ভাগ্যে মার অত লক্ষ্য করার মতো সময় নেই। নইলে এখনই এক ঝুড়ি প্রশ্নের জবাব দিতে প্রাণ বেরিয়ে যেত। এখনও যে মিছে কথায় তত ওস্তাদ হয় নি, সেইজন্যে আরও, এই ধরনের ওজরগুলো সহজে মাথায় আসে না।

এইসব এলোমেলো চিন্তায় কাটে সারাদিন। নিজের কাছেই নিজে কৈফিয়ৎ দেয়—এক একবার এক এক রকম। আর এর মধ্যে মাঝে মাঝেই ললিতের মুখ-খানা মনে পড়ে যেন শিউরে ওঠে লজ্জায় অপমানে। পরের দিন কি ক'রে মুখ দেখাবে ললিতের কাছে—ভাবতে গেলেই মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে।

যদি এই যাওয়া আর পালিয়ে আসা নিয়ে ফলাও ক'রে গল্প করে বন্ধুদের কাছে। ও যাবার আগে কিম্বা যাবার পরে ওর সামনেই?

না, তাহলে আর ও ইস্কুলে যাবে না সে। কখনই যাবে না। তা মা দাদা যা-ই বলুন।

খুব ভয়ে ভয়েই গেল পরের দিন। বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করছিল স্কুলে ঢোকবার সময়। কিছুতেই আর কারও দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। কেবলই ভয় হয় এই বুঝি ওরা এখনই সবাই একসঙ্গে হেসে উঠবে। হাসিতে ঠাট্টায় ফেটে পড়বে। এই যে সব চুপ ক'রে বসে আছে—শুধু বেশী ক'রে মজা করবে বলে।

ফলে পড়ায় মন দিতে পারে না। বাড়িতে স্কুলের বই পড়ার অভ্যেস নেই, যেটুকু যা পড়ে এই ক্লাসে বসেই। মন দিয়ে মাস্টারমশাইদের কথা শোনে, তাতেই অনেকটা তৈরী হয়ে যায়। আজ অমনোযোগের জন্যে দু-তিনবার বকুনি খেল। প্রসন্নবাবুর মুখ আলগা, তিনি এক ঘর ছেলের মধ্যেই প্রশ্ন ক'রে বসলেন, 'কী রে, মুখ-চোখের অমন অবস্থা কেন? এই বয়সেই প্রেমেটেমে পড়লি নাকি ;···পাশের বাড়ির নাকে-পোঁটা-ঝরা বুঁচির সঙ্গে?'

কিন্তু ক্রমে যখন একটির পর একটি পিরিয়ড কেটে গেল, এমনকি একটা টিফিনও পেরিয়ে এল—কোন অঘটন ঘটল না, তখন আস্তে আস্তে একটু স্বস্তি বোধ করতে লাগল।

ললিত তাহলে কাউকে বলে নি কিছু। সে ওকে অপদস্থ করতে চায় না।

ললিত ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ললিত কি ভদ্র।

এতক্ষণের সমস্ত আশংকা ললিতের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রীতিতে পূর্ণ হয়ে এক নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলল ললিতের মানসমূর্তি ওর মনের চোখে। বার বার লোভ হতে লাগল ওকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তুমিই আমার সেই বন্ধু আমি, যাকে এতদিন মনে মনে খুঁজছি।'

॥ ২৮ ॥

তবু একসময় ওকে স্বীকার করতেই হয় যে, ললিতের সঙ্গে ওর কল্পনার বন্ধুর অনেক তফাৎ।

ললিত ওর এসব স্বপ্ন বা আবেগের ধার ধারে না। এসব বোঝেও না সে। তার এত পড়াশুনোও নেই যে এমন একটা জিনিস ভাবতে বা ধারণা করতে পারবে। সে একেবারে সম্প্রতি বা দু একখানা উপন্যাস পড়েছে। বাবাকে লুকিয়ে পড়তে হয় তাকে, বাবা সেকেলে মনোভাবের মানুষ, ছাত্রাবস্থায় নাটক নভেল পড়ার কথা ভাবতেও পারেন না। আর লুকিয়ে বসে পড়বার মতো এত নিভৃত জায়গাও নেই তার বাড়ি। পাড়ার লাইব্রেরী থেকে বই আসে, ওদের মার জন্যে। তাঁর সময় কম—একখানা বই শেষ করতে দশবারো দিন, বড় বই হলে আরও বেশী—কুড়ি, পঁচিশ দিনও লেগে যায়। তাঁর অবসরের সঙ্গে ওর অবসর না মিললে পড়া যায় না। সুতরাং অনেক সময় বই খানিকটা-পড়াই থেকে যায়, শেষ হয় না। অন্য কোথাও থেকে কোন বই আসে না। তেমন বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনও নেই ওদের—যাদের কাছে অনেক বই আছে, দু-চারখানা চেয়ে আনা যাবে, এত গরজও ওর মায়ের নেই। বাড়িতে পাঁজি আর এদের পড়ার বই ছাড়া অন্য কিছু নেই।

সেই জন্যেই সে এই 'ইনট্রোভার্ট' বন্ধুটির তল পায় না। তার মনের মাপে এর মন মাপা যে সম্ভব নয় তাও বোঝে না। বিনু কি চায়, কেন ওর সঙ্গেই কথা কইতে এলে অমন আটকে আটকে যায় বলাটা, এলোমেলো আচমকা কথা বলে, বক্তব্যটা ঘুলিয়ে যায়—তা বুঝতে পারে না। অথচ বোকা বলেও তো মনে হয় না। যখন সাধারণ ভাবে, অন্যদের মধ্যে কথা বলে—বিদ্রূপের

ফুলঝুরি ঝরে ওর কথাবার্তায়। ওকে কেউ ঘাঁটাতে গেলে সে-ই জব্দ হয়ে যায়।

বিনুর যে পড়াশুনোও খুব, সেটা নিজেদের বিশেষ পড়া না থাকলেও বোঝে—ললিত শুধু নয়, মদন অসিত সবাই। মাস্টারমশাইরাও আরও সেজন্যে তাঁরা ওর সঙ্গে বেশ একটু সমীহ ক'রেই কথা বলেন। বাংলার স্যার বিভূতিবাবু তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়েই আলোচনা জুড়ে দেন—এটা পড়েছ? ওটা, অমুক কবিতাটা? আচ্ছা, মনে আছে এই কবিতাটা? এই লাইন কটা কোথা থেকে বলছি বলো তো? এই ধরনের সমানে সমানে আলোচনা করার মতোই কথা বলেন।

একদিন, ঠিক পরীক্ষা নয়, একসারসাইজের মতো, ক্লাসে একটা প্রবন্ধ দিলেন লিখতে। বললেন, কুড়ি মিনিটের মধ্যে লিখতে হবে, বাকী সময়টা তিনি ওখানেই দেখে পড়ে নম্বর দেবেন।—তখন তখনই। বিনুর অবশ্য প্রবন্ধ যা 'এসে' পুরো হল না, শেষ মুহূর্তে এক রকম খাতা টেনে নিতে হ'ল ওর কাছ থেকে—তবু দেখা গেল সে-ই সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে।

মদন ক্লাসের ফার্স্ট বয়—সে আগেই বিভূতিবাবুর পিছন থেকে ঝুঁকে দেখে নিয়েছিল লেখাটা। সে ঈর্ষা আর ক্ষোভ চাপতে পারল না, বলল, 'ও লেখায় কি আছে স্যার, কেবলই তো একটার পর একটা কোটেশ্যান তুলেছে, প্রোজও যা লিখেছে ঐ সব কবিতার লাইনগুলোই প্যারাফ্রেজ করে দিয়েছে বা মানের বইয়ের মতো অর্থ লিখে দিয়েছে যেন। এ তো সবাই লিখতে পারে।'

বিভূতিবাবু ভুরু কুঁচকে যখন বললেন, 'তুই পারিস? তোর লেখায় তো কোন উদ্ধৃতিই নেই। বাংলা এসে বা প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হয় কেন? ছাত্রদের বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কতটা জ্ঞান দেখার জন্যেই জান? তা আর কে এত চট করে এই ক'মিনিটের মধ্যে এতগুলো উদ্ধৃতি দিয়েছে? এত কবিতা মনে পড়েছে এই তো কৃতিত্ব। আর কে এত কোটেশ্যান দিতে পারত শুনি! এতগুলো কবিতা কেউ পড়েছে তোদের মধ্যে? শুধু শুধু হিংসে করিস কেন। ফাস্ট ডিজার্ভ দেন ডিজায়ার।...তোরাও পড় না, পড়—অমনি ঠিক জায়গায় লাগসই ক'রে কোট কর—তোদেরও ফুল মার্কস দোব।'

আর একবারের একটা ঘটনা ওর আজও মনে জ্বল জ্বল করছে। সেকেন্ড ক্লাসের য়্যানুয়াল পরীক্ষা সেটা, প্রশ্নপত্রে ইংরেজীতে লেখা ছিল—গিভ দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া কনটেনড্ ইন—এর অর্থটা ঠিক বুঝতে না পেরে বিনু সাবস্ট্যান্স-এর জায়গায় য়্যামপ্লিফিকেশন লিখেছিল। লিখেছিলোও বড় উত্তরের খাতায় আড়াই পৃষ্ঠা। একটা ছোটখাটো প্রবন্ধের মতো ক'রে। হেমচন্দ্রের কবিতা—'কিবা ছিল রোমরাজ্য এখন কোথায়' ঐ বিখ্যাত লাইনটি যে স্ট্যাঞ্জায় আছে সেই স্ট্যাঞ্জা পুরোটাই তোলা ছিল প্রশ্নপত্রে।

বিভূতিবাবু ওকে পনেরোর মধ্যে বারো দিয়েছিলেন। তার ফলে ও মোট তিন নম্বর বেশী পেয়ে বাংলায় প্রথম হল।

মদন বাকী সব বিষয়েই প্রথম হয়েছিল, তবু এটুকুও তার সহ্য হল না। খাতা যখন ফেরৎ দেওয়া হয়েছে তখন বিনুর খাতা এক রকম জোর করেই টেনে নিয়ে দেখে নিল উলটে—আগেই শুনেছিল সকলের মুখে বিনু ভুল করেছে

আসল কি চাওয়া হয়েছে শুনে নিজেই দুঃখ করেছে সে—তার পরই গিয়ে নালিশ জানাল, স্যার, ও তো সাবট্যান্স-এর জায়গায় য়্যামপ্লিফিকেশ্যন লিখেছে—ও কি ক'রে বারো পায় ?'

বিভূতিবাবুর চেহারা ছিল সুন্দর কিন্তু রেগে গেলে ঠোঁট দুটো একটা বিশ্রী ভঙ্গীতে বেঁকে যেত। উনি এখনও সেই রকমভাবে বাঁকিয়ে বললেন, 'তুমি একটি অতি নোংরা ছেলে।...ওহে বাপু, আমি অনেক বছর ইউনিভার্সিটিতে একজামিনারী করছি—আমাকে তুমি আইনের প্যাঁচে ফেলে জব্দ করতে পারবে না। আমাদের নিয়মে বলাই আছে, কেউ যদি এই ধরনের ভুল করে তাহলে ঐ প্রশ্নর মোট নম্বর থেকে শতকরা কুড়ি নম্বর কেটে নিয়ে বাকীটাকে ফুল মার্কস ধরতে হবে। তারপর সেই নম্বরের মধ্যে ঠিক উত্তর লিখলে যেমনভাবে যোগ্যতা বিচার করা হত তেমনিই করতে হবে। মানে ঠিক যা চাওয়া হয়েছিল তাই লিখেছে কি লিখতে চেষ্টা করেছে এইটেই ধরে নিতে হবে। এ কোশ্চেনে ফুল মার্কস ছিল পনেরো—তা থেকে টোয়েণ্টি পার্সেণ্ট কেটে নিলে কত দাঁড়ায়—বারো, কেমন তো ? আমি সেই বারোর মধ্যেই ওকে বারো দিয়েছি। এটা যদি য়্যামপ্লিফিকেশ্যন বা ভাব-সম্প্রসারণ করতেই বলা হয়ে থাকত—ও যা লিখেছে, তার চেয়ে এই ক্লাসের বা এই বয়সের ছেলে কেউ ভাল লিখতে পারত বলে মনে করি না। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে প্রোজ কোটেশ্যন দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়—এসব তো তোমরা কেউ কখনও পড়োনি, পড়লেও মনে করে রাখতে না বা ঠিক জায়গায় লাগাতে পারতে না।...বুঝেছ, জবাব পেয়েছ এবার ? যাও, এখন নিজের জায়গায় গিয়ে বসো—আর এমনভাবে না বুঝে সুঝে হিংসে দেখাতে গিয়ে নোংরা মনের পরিচয় দিও না।'

ওর ওপর চূড়ান্ত আস্থার পরিচয় দিয়েছিলেন হেডমাষ্টার মশাই। ওদের স্কুল লাইব্রেরীতে অনেক দিন হল কোন লাইব্রেরিয়ান নেই। বইয়ের সংখ্যা এত নয় যে পুরো মাইনে দিয়ে একজন লাইব্রেরিয়ান রাখা চলে। আগে নিচের ক্লাসের একজন শিক্ষক বিরাজবাবু অবসর সময়ে এই কাজ করতেন। ফলে কাজ কিছুই হত না প্রায়। না ছেলেদের কোন বই পড়তে দেওয়া হ'ত, না ভাল মতো একটা ক্যাটালগ করা হ'ত, আর না নতুন বই ক্যাটালগে জমা হত। বইগুলো গুছিয়ে আলমারিতে তোলা পর্যন্ত হ'ত না।

বই আগে যা কিছু কিছু ছাত্র বা অন্য মাস্টারমশাইদের দেওয়া হয়েছে—তাও যে সবাই ফেরৎ দিয়েছে কিনা কেউ জানে না। যাও বা ফেরৎ এসেছে তাও ঠিক ঠিক খাতায় জমা করা হয় নি। বিরাজবাবু এই কাজ করতেন, তিনি কোন এক সুদূর ভবিষ্যতে সময় পেলে খাতা খুঁজে বই ফেরৎ-জমা করে গুছিয়ে তুলবেন—এই ভরসায় ফেলে রেখেছিলেন। বিস্তর বই পোকায় কেটেছে, অনেক বৃষ্টির জলে ভিজে তাল পাকিয়ে গেছে।

এ নিয়ে প্রসন্নবাবু ওঁকে একটু বকাবকি করতে গিছলেন বিরাজবাবু সোজা বলে দিয়েছেন, 'দৈনিক পাঁচ পিরীয়ড পড়িয়ে আর এত কাজ পারা যায় না। আপনারা অন্য কাউকে এ ভার দিন।'

সেই গোলমালটার সময়ই একদিন বিনু গিয়েছিল অনুযোগ জানাতে—'স্কুলে বই থাকতে আমরা কোন বই পড়তে পাবো না স্যার ?'

হেডমাস্টার মশাই তখন বসে প্রসন্নবাবুর সঙ্গে এই কথাই আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন খানিকটা, তারপর বললেন, 'তুমি ভার নিতে পারবে ? তুমি তোমার কোন বন্ধুকে নিয়ে ?'

বিনু তো অবাক। কথাটা তার বুঝতেই বেশ কিছুটা সময় গেল। তারপর সে বলল, 'কিন্তু এসব তো আমি কিছু বুঝি না—তাছাড়া সময়—'

হেডমাস্টার মশাই অসহিষ্ণু ভাবে বললেন, 'কেউই আপনা আপনি বোঝে না, সবাইকেই সব কাজ সব লেখাপড়া—চেষ্টা ক'রে শিখতে হয়। যা আর একটা মানুষ করতে পারছে তা তুমি পারবে না কেন ? সে আমরা প্রথমটা বুঝিয়ে দেব একটু। আর সময় ? দুটো টিফিনে তো বেশ খানিকটা সময় পাওয়া যায়,—আধঘণ্টা। আর যদি ছুটির পর আধঘণ্টা ক'রে দাও, তাহলেই হয়ে যাবে। এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। বইগুলো নম্বর দেখে দেখে আলমারিতে তোলা—মানে, তিনশ চুয়াল্লিশ নম্বর বই তিনশ তেতাল্লিশ আর পঁয়তাল্লিশের মধ্যে থাকবে—এ তো সবাই পারে। এ ছাড়া ইসু বুক দেখে কে কে কি বই ফেরৎ দেয় নি—তার একটা লিস্ট করা, ক্যাটালগ খাতা দেখে কত বই নষ্ট হয়েছে সে বার করা—এইগুলো হলেই আমি আমাদের যোগেনবাবুকে দিয়ে নতুন ক্যাটালগ তৈরী করিয়ে দেব, দুচারখানা নতুন বইও কিনতে পারি। তারপর—যতক্ষণ না অন্য পারমানেণ্ট লোক পাই, তোমরা টিফিনের সময় বই ইসু করা আর ফেরৎ নেওয়া—এটা চালাতে পারবে না ? কটা ছেলেই বা স্কুল লাইব্রেরী থেকে বই নেয়—ঐ সময়ের মধ্যেই হয়ে যাবে।'

খুবই ঝুঁকির কাজ। সময়ও যাবে অনেকটা। তাছাড়া ফিরতে দেরি হলে মা যদি বকেন ?

হেডমাস্টার মশাই যেন ওর চোখ দেখে মনের কথাটা পড়ে নিলেন, বললেন, 'যেতে আধঘণ্টা দেরি হওয়ার জন্যে, তোমরা যদি কাজ করতে রাজী থাকো আমি তোমাদের গার্ডিয়ানকে চিঠি লিখে দেবো। আর রোজ করার দরকারও নেই, সপ্তাহে দুদিনই যথেষ্ট।'

বিনু রাজী হয়ে গেল।

রাজী হল তার কারণ ঐ সামান্য সময়ের মধ্যেই একটা আকারহীন আশা ওর মনে দেখা দিয়েছে।

এই তো সুযোগ। স্কুলের কাজ, হেডমাস্টার মশাই গার্জেনদের বলে দেবেন—কারও কোন অসুবিধাই থাকবে না। এই সুযোগে ললিতকে অনেকটা সময় কাছে পাবে। পাশাপাশি একসঙ্গে কাজ করার সুযোগে দুজনে দুজনের মনের অনেকটা কাছে আসতে পারবে।

এতে যে ললিতের কোন অসুবিধা বা অনিচ্ছা থাকতে পারে—তা ওর মাথাতেই যায় নি। সে হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এল শুধু যে এত বড় একটা দায়িত্ব বহনের, বয়স্ক অভিজ্ঞ লোকের কাজ করার উপযুক্ত মনে

করেছেন ওকে, এই গর্বে মাথা উঁচু ক'রে তাই নয়—আনন্দে একরকম উড়ে এল বলতে গেলে। আশার আনন্দ তার মনই নয় দেহটাকেও যেন লঘু করে দিয়েছে। আনন্দ আর আশা। এক অভাবনীয় সুযোগ এসে যাওয়ার আনন্দ আর অকল্পনীয় এক সম্ভাবনার আশা।

কিন্তু ললিতের কাছে কথাটা পাড়তে সে একেবারে ওর সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনায় জল ঢেলে দিল। এতক্ষণের আশার দীপটি দিল এক ফুঁয়ে নিভিয়ে।

'ধ্যুস। তুমিও যেমন। কে ঐ ভূতের বেগার খাটতে যাবে! পুরনো বই, অর্ধেক গেছে পচে, ধুলোর পাহাড় জমেছে তার ওপর, দেবেন কিম্বা শিউশরণ এসে যে ওটুকুও করে দেবে তা আশা করো না—বলতে গেলেই বলবে, আমাদের এদিকে ঢের কাজ, আমরা পারব না। এসব বুঝেই হেড স্যার তোমাকে ভজিয়েছেন—আমাদের দিয়ে ঐ জঞ্জাল সাফ করাতে চান।...না ভাই, আমার এত গরজ নেই। এ বেগার কেউ ঘাড় পেতে নিত না তুমি ছাড়া। তুমি একটি বেহদ্দ বোকা যাকে বলে তাই। কাল বরং স্কুলে এসে বলে দিও তোমার মা দাদা রাজী হচ্ছেন না।'

এটা যে কতখানি আঘাত তা কেউই হয়ত বুঝবে না, বিনু নিজেও তখন বোঝেনি।

আঘাত বুঝেছিল ঠিকই, খুব জোরেই ঘা খেয়েছিল একটা, তবু তার গুরুত্ব—বোধহয় একেবারেই এমনটা ভাবা ছিল না বলেই—পুরোপুরি বুঝতে—উপলব্ধি করতে দেরি হয়েছে।

সেদিনের বাকী ক্লাস দুটোর কোন পড়াই মাথায় গেল না। ছুটির পরও, অপরাহ্ন সন্ধ্যা কোথা দিয়ে কি ভাবে কেটে গেল টেরও পেল না। মাথায় খুব জোরে আঘাত লাগলে যেমন জ্ঞান বা অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে যায় মানুষের—তেমনিই আচ্ছন্ন ভাবে রইল সমস্ত সময়টা। সব কিছুই বিস্বাদ লাগছে, বিবর্ণ হয়ে গেছে চোখের সামনে।

রাত্রে ঘুমও এল না। আরও কষ্টকর—শুয়ে শুয়ে যত ভাবে ঘটনাটা—এই প্রত্যাখ্যানের নানা দিক চোখে পড়ে—ততই একটা অব্যক্ত এমন কি ওর কাছেও কতকটা অকারণ বেদনায় মাঝে মাঝে চোখে জল এসে পড়ে। মা যদি টের পান, এ চোখের জলের কোন কারণও দেখাতে পারবে না—এই ভেবে প্রাণপণে চেষ্টা করে সামলাবার—কিন্তু পারে না, বরং তাতে যেন আরও বেশী বুকে মোচড় লাগে।

এতটা দুঃখ শুধু ওর প্রস্তাব এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দিয়েছে—ওকে বিদ্রূপ করেছে বোকা বলেছে বলেই?

না, তা নয়। ওর কল্পনায় ললিতের যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল বা গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিল—সেটা চূর্ণ হয়ে গেল বলেই কি তবে এই কষ্ট? না, তাও না।

এই সুযোগ উপলক্ষ ক'রে ওর আশা আর আকাঙ্ক্ষা যে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল—ওর কল্পনা আর স্বপ্ন—সে আঘাতও কম নয়। তখনও পৃথিবী

চেনার বয়স হয় নি, সেভাবে বহুলোকের মধ্যে মানুষও হয় নি, তাই এমনও মনে হতে লাগল মধ্যে মধ্যে যে সে তার একটা ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হল!

অথচ এতটা আশা করারও কোন কারণ ছিল না।

আজ বহু মানুষ দেখায় ও চেনায়, জীবনক্ষেত্রে বহু ঘাতপ্রতিঘাতে বুঝতে পারে যে, ললিত নিচে নামেনি, সাধারণ মাপকাঠিতে বরং সে ভাল ছেলের দলেই—বিনু নিজের গরজেই মনের আকাশে ওকে এখন উঁচুতে তুলেছিল যেখানে কারও পক্ষেই ওঠা সম্ভব কিনা সন্দেহ। আর, এ কেউ চেষ্টা ক'রে হতে পারে না, এধরনের মানসিক গঠন মানুষ নিয়ে জন্মায়।

ভুল ভেঙ্গেছে বারবারই, আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসেছে স্বপ্ন, স্বপ্নর মতোই বাস্তবের আলোকাঘাতে তন্দ্রার দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ সাধারণ মাপের ব্যবহার করে, তা দেখে যদি কেউ ব্যথা পায়, সে তার নিজের দোষ, তার প্রাপ্য। তবু স্বপ্ন না দেখে সে যে থাকতে পারে না, তাকে যে স্বপ্ন দেখতেই হবে।

অবশ্য আগের চেয়ে অনেকটা কাছে এসেছে বৈকি।

আসা যাওয়ার সংখ্যা বেড়েছে, তারও বাড়িতে বন্ধুকে বসাবার জায়গা নেই, তবু তো ললিতের শান্ত ভাবভঙ্গী সুশ্রী আকৃতি দেখে মা ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব যাকে বলে অনুমোদন করেছেন। তাই তবু বাইরের বারান্দায় ওঠার সিঁড়িতে বসে দুজনে কথা বলা যায়। ললিতের সেটুকু সুবিধেও নেই। ওদের চলনের লোহার বেঞ্চি প্রায়ই জোড়া থাকে—অন্তত বিনু যখন যাবার অবসর পায়—ছুটির দিন ছাড়া হয়ে ওঠে না, সকালে বা বিকেলে, ললিতের বাবা কি দাদার বন্ধুরা আসেন, আড্ডা দেন। সুতরাং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা কয়ে চলে আসতে হয়। তখনও বা দুজনেই ললিতের বাড়ির সামনে পায়চারি করে কিম্বা একটু দূরে গলির মোড় পর্যন্ত যায়।

এক আধ দিন অন্যত্রও পায় অবশ্য। মাকে বলে বাড়িতে তেমন কোন জরুরী কাজ না থাকলে ললিতের সঙ্গে বিকেলে—নতুন যে বড় সরকারী পুকুর কাটা হয়েছে, 'লেক' বলে চালায়, সেখানেও যায়। এদিকটা কাটা শেষ হয়ে গেছে, পশ্চিমের দিকে আর একটু নতুন জায়গা কাটা চলছে এখনও, সেইখানে গিয়ে বসে ওরা। তবে সে কতক্ষণই বা। ললিতের বেশীক্ষণ থাকতে আপত্তি ছিল না, বিনুরই তাড়া থাকত। তবু এক একদিন সুযোগ মতো, বিশেষ যেদিন কোন কারণে সকাল ক'রে স্কুলের ছুটি হয়ে যেত, যে ছুটির কথা বাড়িতে কেউ জানে না—সেইসব দিনগুলোয় এখানেই আসত ওরা। বিনুই টেনে আনত বেশির ভাগ নিভৃতে গল্প করবে বলে।

এইসব দিনে তিন চার ঘণ্টাও কাটাত এখানে। গভীর ক'রে কাটা হচ্ছে, খুবই গভীর। মধ্যে মধ্যে সেই খাড়া মাটির গায়ে দু একটা গুহার মতো গর্ত ক'রে রেখেছিল কাটুনিরা, কেন রেখেছিল কে জানে, সেইখানে কোন মতে নেমে গিয়ে বসত ওরা কোন কোন দিন—বিশেষ দীর্ঘ অবসরের দিনগুলোয়।

কিন্তু সেও তো একটানা আশাভঙ্গেরই ইতিহাস।

সেখানেও তো বিনুর কল্পনা ও চিন্তা দিয়ে গড়া ধ্যান-মূর্তি বার বার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, ম্লান হয়ে গেছে বারবার।

এইসব কর্মহীন দীর্ঘ অবসরে, এমনি অন্তরঙ্গ জনের কাছে কিশোর বা তরুণ বয়সী বন্ধুর দল স্বভাবতই নিজেদের ভবিষ্যতের কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা—দুরাশাই হয়ত বেশির ভাগ—সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের জানায়। জানাবার সময় সে স্বপ্নজাল বিস্তারলাভ করে। বলতে বলতে এগিয়ে যায়, যে কল্পনা তখনও পর্যন্ত মাথায় আসে নি, তাও মনে এসে যায়, ফলে যোগ হয় সেগুলোও।

বিনু বলে কম, কারণ তার বলার অসুবিধা আছে।

তার যা স্বপ্ন সে সবটাই গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের নয়, কিছু ব্যক্তিগত এবং অন্যের ধারণাতীত অনন্য স্বপ্নের কথাও আছে তার মধ্যে, সে কথা কাউকে বলা যায় না। এটুকু এতদিনে তার মাথায় গেছে যে এসব কথা কেউ বুঝবে না, তাকেই পাগল ভাববে। তবু সেও কিছু বলে। কখনও বলে সে ছবি আঁকবে, রাফায়েল, মিখায়েলেঞ্জেলো টিসিয়ান হবে কিম্বা অবনী ঠাকুর নন্দলাল বোস—এসব নাম, বিশেষ বিদেশী নামগুলো তার কোন সহপাঠীই জানে না এক মদন আর প্রসাদ ছাড়া, ভাবে সে বানিয়ে বানিয়ে কতকগুলো নাম আউড়ে যাচ্ছে তাদের বোকা বানানোর জন্যে—হবে, কখনও বলে সে নাটক লিখবে; শেকস্‌পীয়ার ইবসেন না হতে পারুক—গিরিশ ঘোষ ডি এল রায়কে অবশ্যই ছাড়িয়ে যাবে। কখনও বা কারুর কাছে বলে সে গল্প উপন্যাসই লিখবে, তাতে প্রতিষ্ঠা বেশী, অনেক লোক নাম জানবে। সে যখন কলম ধরবে তখন বঙ্কিম শরতের নাম ম্লান হয়ে যাবে। আর সেই তো সাধনা, গুরুকে ছাপিয়ে গেলেই গুরুর সম্মান বাড়ে। তার নাম করবে লোকে টলস্টয়, ভিক্তর হুগো, ডিকেনস-এর সঙ্গে। আবার অপনমনে ভাববার মতো ক'রে বলে এক এক সময়—'খবরের কাগজের সম্পাদক হওয়াও মন্দ নয়। সেও ভাবছি।'

এইসব—জীবনের বহিরঙ্গ আশার কথা বলে, কিন্তু মন ভরে না। অথচ তার যে গোপন কথা—ভালবাসার আর ভালবাসা পাবার—সে-কথা এদের কারও কাছে বলা যায় না।

ললিত অত-শতর ধার ধারে না। এসব নামের অধিকাংশই সে শোনে নি—নয়তো এক-আধবার হয়ত কারও মুখে কথাপ্রসঙ্গে উচ্চারিত মাত্র হতে শুনেছে। সে নামের কোন মূল্য বা মহিমা জানে না, জানার চেষ্টাও করে নি। যা জানে না, যার সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, আশা বা কল্পনা তার কাছে পেঁছিবে কেন?

সে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে সায়ান্স নেবে অবশ্যই। অংকে খুব স্ট্রং সে, বাবা বলেন, আই, এস-সি পাশ করলেই মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করিয়ে দেবেন, ডাক্তারী পড়াবেন। কিন্তু বাবার যা আয়, আর যা সংসারের অবস্থা—দাদাকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ানোই হয়ত অসম্ভব হয়ে পড়বে। কাজেই ওসব কিছু হবে-টবে না। ওদের মা তাঁর নিজের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, বাবাকে দিয়ে জোর ক'রে একটা মোটা টাকার ইন্সিওর করিয়ে—আট

কি দশ হাজার, কত তা ললিত জানে না—সেটা নিজের নামে নমিনি করিয়ে নিয়েছেন, এটা জানে সে। তার প্রিমিয়াম টেনে আর কত খরচ চালাবেন বাবা ?

না, সে উঠে-পড়ে লেগে চাকরির চেষ্টা দেখবে, কলেজে পড়তে পড়তেই। শুনেছে আশুতোষ কলেজে আই. এস-সি-র ছাত্রদের মধ্যে থেকে একটা পরীক্ষা দিইয়ে বেছে নিয়ে কিছু ছাত্রদের টেলিগ্রাফ বিভাগে নেওয়া হয়, আই. এস-সি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিগ্রাফ শেখাও চলতে থাকে। পাশ করলেই চাকরি বাঁধা। ভাল মাইনে, একেবারে ষাট টাকা থেকে শুরু।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর থেকেই বাবাকে জপাবে সে। এটা যদি হয়, ডাক্তারী পড়ার ছ' বছরের ফাঁদে পা দেবে না। অত দিন যদি বাবা না বাঁচেন কিম্বা এতগুলো ছেলেমেয়ের লেখাপড়া চালিয়ে ডাক্তারীর খরচা টানতে না পারেন ? এ-কূল ও-কূল দু কূল যাবে না কি ? কি দরকার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে গিয়ে। ডাক্তারী পাশ করলেই যে পসার হবে তারই বা কি মানে ? কত ডাক্তার তো মুখ শুকিয়ে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই সব কথাই তার বেশির ভাগ।

সংসারের শখও খুব বেশি। নতুন মার সঙ্গে এক সংসারে থাকবে না সে। এ-বাড়ির প্রায় অস্তিত্বহীন একটুকরো অংশে তার লোভ নেই। সে বরং চেষ্টা করবে কিছু টাকা জমিয়ে নিজে একটু ছোট জমি কিনে বাড়ি করতে। দাদাও ততদিনে রোজগার করতে শুরু করবে নিশ্চয়। যদি দাদা তার সঙ্গে থাকতে চায়—দুজনের চেষ্টায় বাড়ি করতে কোন অসুবিধাই হবে না। দু ভাই একত্রে সংসার পাতবে। দাদার পাত্রী সে দেখে পছন্দ করবে। ভাল মেয়ে আনতে হবে, যাতে পরে না সংসার ভেঙ্গে যায়।

নিজের কথাও বলে ললিত। তার বিপদের কথা।

সে নিজে দেখেশুনে এভাবে হিসেব কি বিচার-বিবেচনা ক'রে বিয়ে করতে পারবে কিনা সন্দেহ। মেয়েরা তার মধ্যে যে কি দেখে কে জানে। এখন থেকেই কত মেয়ে যে তার পেছনে লেগেছে। বিশেষ একটি বিবাহিতা মেয়ে—ওর চেয়ে বয়সে এক-আধ বছরের বড়ই হবে হয়ত কিম্বা একবয়সী—সে বিয়ের পরও ওর জন্যে পাগল। থেকে থেকেই নানা ছুতোয় বাপের বাড়ি আসে—শুধু ওকে দেখবে বলে।

শুধুই কি দেখা ! সে যাক গে। এ-ধরনের প্রেম যত খুশি করা যায়—বিয়ে করতে হয় সাবধানে, দেখেশুনে। বাজে মেয়ে আনা উচিত নয়। ঘর-সংসার করবে, দাদা-বৌদির সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারবে এমনি মেয়েই ললিতের কাম্য।

এসব শুনতে শুনতে এক-একদিন একটা তীব্র হতাশা বোধ করে বিনু।

ললিত, তার ললিত কেন এত সাধারণ হবে !

এত ছোট আশা, এত ছোট মাপের ভবিষ্যৎ চিন্তা কেন হবে তার ! ঐসব বাজে ছেলেদের মতো এই বয়সেই মেয়েছেলে প্রেম বিয়ে—এসব কথা কেন ভাববে !

তবু হাল ছাড়ে না বিনু। সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেই প্রস্তাব করে—তারা তাদের

ক্লাস থেকে একটা হাতে-লেখা মাসিক বার করবে।

এটা উপলক্ষ—লক্ষ্য ছিল ললিতকে এই দিকে টানা। ছবি আঁকা, লেখার নেশা ধরানো। কবিতা লেখা, গল্প লেখার নেশা ধরে গেলে সাহিত্যের বই পড়ার দিকেও ঝোঁক আসবে।

প্রথমটা সবাই উড়িয়ে দিল। এসব ব্যাপারের মধ্যে নেই তারা। মাসিক পত্র, তা আবার হাতে লেখা। কে পড়বেই বা। ঐতো একটা কপি হবে, এক-একজন ক'রে পড়তে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখবে, কাগজের বারোটা বেজে যাবে।

তাছাড়া এত ছিষ্টি করবেই বা কে! ঐ ফার্স্ট ক্লাসের মণীদার ঘাড়ে এমনি ভূত চেপেছিল। গত বছর এই সেকেন্ড ক্লাসে উঠেই—'ঋদ্ধি' না কি এক ঘোড়ার ডিম নাম, নামে তো মাসিক, এক-একটা সংখ্যা বার করতে চার-পাঁচ মাস কেটে যায়। সোজা ব্যাপার নাকি? লেখা যোগাড় করা, সাজানো, ছবি আঁকা—সবচেয়ে শক্ত কাজ কপি করানো। হাতের লেখা মুক্তোর মতো হওয়া চাই, এমন হয়ত ক্লাসে একজনেরই আছে—তার নিজের কাজ সেরে তবে তো বেগার দেবে!

তাছাড়া, তাব যদি এ-কাজ ভাল না লাগে—এদিকে টেস্ট বা ঝোঁক না থাকে—সে আরও গড়িমসি করবে। না না, ওসব পাগলামি ছেড়ে দে দিকি, এর পেছনে যে সময়টা নষ্ট করব, সে-সময়টা ক্যারম পিটলে কি গজালি মারলে কাজ দেবে।

বন্ধুরা—না, এদের বন্ধু বলবে না বিনু—সহপাঠীরা সৎ-পরামর্শ দেয়।

বিনুরও জেদ চেপে যায়। সে করবেই। একটা কথা সম্প্রতি শিখেছে—'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' ছবির দোকানে কবে আঁটা লেখাটা থেকে। লোকে নাকি এগুলো নিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রাখে। সে অনেককেই বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল। মদন প্রসাদ অসিত, এদের বিশেষ করে। কেউই ঘাড় পাড়ল না। শেষে সুনীল বলে একটি ছেলে রাজী হল ওকে সাহায্য করতে।

সুনীলের বয়স একটু বেশী। ছেলেবেলায় বহু দিন রোগে ভুগে তিন-চার বছর নষ্ট হয়েছে তার। বোধহয় সেই জন্যেই সে বড় একটা কারও সঙ্গে সহজে মিশতে পারে না—আড্ডা ইয়ার্কি দিতে সংকোচ বোধ হয়। অল্প কথা বলে। পড়াশুনোয় শক্তি কম—সেও বোধহয় অস্বাস্থ্যের জন্যেই, তাছাড়া গরিবের ছেলে, অপুষ্টিও একটা কারণ হতে পারে—তবে পড়ায় মন আছে। সেই জন্যে মাষ্টার মশাইরা সবাই তাকে ভালবাসেন।

এই সুনীলই লাইব্রেরীর ব্যাপারে বিনুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। একমাত্র সে-ই। তাও স্বেচ্ছায়, নিজে থেকেই এসে বলেছিল, 'যদি আমাকে দিয়ে কাজ চলে, আমি রাজী আছি।'

আর বস্তুত সে-ই বলতে গেলে বেশী কাজ করেছে। কাজটা ঠিক কি কি করতে হবে তা বিনুর মুখ থেকেই শুনেছিল কিন্তু বুঝে নিয়েছিল বিনুর অনেক আগে। নিঃশব্দে খাটত বলে কাজও দ্রুত করতে পারত সে।

এবার বিনুই গিয়ে কথাটা পাড়ল তার কাছে।

সুনীল একটু হাসল। ভারি মিষ্টি হাসে সে, ওর গলাও খুব মিষ্টি।

গান-বাজনা কিছু শেখার সুযোগ হয় নি, কিন্তু গানে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে। অপরের মুখে একবার শুনেই তুলে নিতে পারে, আর পরে সে যখন গায় মনে হয় যার কাছ থেকে সুরটা তুলেছে তার চেয়ে অনেক ভাল গাইছে।

সুনীল বলল, 'তুমি যখন ওদের বলছ, তখনই আমি মনে মনে ঠিক করেছি, আমিই এগিয়ে যাবো তোমাকে সাহায্য করতে। ওরা যে কেউ রাজী হবে না সে আমি জানতুম। আর তুমিও তো তেমনি, গেল এক বছর ওদের সঙ্গে মিশলে, এখনও লোক চিনলে না?'

লোক হয়ত চিনেছে বিনু কিন্তু চিনলে যে তার চলবে না। তবে সে কথাটা সুনীলকে বলা যায় না। সে হয়ত ঠিক বুঝবে না, হয়ত ভুল বুঝবে। সে একটু অন্য ধরনের ছেলে। সে যে সব বই পড়ে তা নাটক নভেল নয়, বেশির ভাগই হয় ধর্মগ্রন্থ, নয় প্রবন্ধের বই। কথা কয় সকলের সঙ্গেই, মিষ্টি ভদ্র ব্যবহার, কিন্তু কারও সঙ্গেই গলাগলি নেই। কারও কাছেই নিজের মন খোলে না।

ওর কথা বিনু ভেবে দেখেছে বৈকি। ভাল লাগে, বিশেষ লাইব্রেরীর ঘটনার পর থেকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। শ্রদ্ধা ও প্রীতি দুই-ই আছে সুনীলের প্রতি। তবে ওকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে ভাবা যায় না। যাবে না কোন দিনই। ওর মধ্যে কোথায় একটা দূরত্ব আছে, কিম্বা অন্য মানসস্তরের লোক সে—সেজন্যে চরিত্রগত একটা তফাৎ সত্ত্বেও মনে মনে ললিতকেই তার সেই একমাত্র বন্ধু, আপনজন বলে ভাবতে ভাল লাগে, তার ভালবাসার ভাগ পাবে অন্যে—সে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু সুনীল সম্বন্ধে সে ঈর্ষা বোধ করে না কোনদিন।

সুনীল এল সামান্য সহকারী হিসেবে নয়, অনেক দিক থেকেই কাজটা সহজ ও চালু ক'রে দিল সে!

প্রথমেই সে মাষ্টার মশাইদের জানাল কথাটা। তাঁদের কাছে লেখা চাইল। তাঁদের পরামর্শ ও সাহায্য চাইল। এর আশ্চর্য সুফল ফলল।

মাস্টারমশাইরা বিশেষ বিভূতিবাবু আর হেডপণ্ডিতমশাই খুব উৎসাহ দিলেন, নিজেরাও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বিভূতিবাবু হেডমাস্টার মশাইকে বলে ব্যবস্থা করলেন, এরা কাগজ ভাঁজ ক'রে আলাদা আলাদা সীট লিখবে, মানে লেখাগুলো কপি করবে, শেষ হলে ওঁরা দপ্তরীকে দিয়ে বাঁধিয়ে দেবেন, সে খরচ ইস্কুলই দেবে। হেডপণ্ডিতমশাই কথা দিলেন তিনি ছেলেদের সব লেখা পড়ে মেজে-ঘষে দেবেন।

এতটা এগিয়ে যেতে দু-একজন বন্ধু লেখা দিতে চাইল। দিলও দু-তিনজন। কবিতাই বেশীর ভাগ। তারা কেউই লিখতে জানে না লেখেওনি এর আগে। তেমন বই পড়াও নেই পাঠ্যপুস্তক ছাড়া—ছন্দ সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, বক্তব্যও স্পষ্ট নয়। কিন্তু হেড পণ্ডিতমশাই ধৈর্য ধরে সবগুলোই মেজে-ঘষে একরকম চলনসই ক'রে দিলেন।

অগত্যা বিনুকেই পাতা ভরাবার দায়িত্ব নিতে হল। নামে বেনামে লিখবে সে। কাশীর সেই অকালমৃত উপন্যাস ওখানের অপ্রকাশিত মাসিকপত্রের প্রথম

সংখ্যায় যেটা শুরু করেছিল সেটার কথা ভোলে নি। ওর আজও বিশ্বাস সেটা লিখলে ভাল গল্প হত। তাই সেই স্মৃতিটাই ঝালিয়ে আবারও নতুন ক'রে সেই প্রথম পরিচ্ছেদ লিখল। সেই সঙ্গে কোনান-ডইলের একটা গল্পও অনুবাদ ক'রে ফেলল। সেটা দেখে দিলেন বিভূতিবাবু। গল্পটা তাঁর পড়া, প্রিয় গল্পও। ভুল ত্রুটি কিছু ছিল তিনি সেগুলো শুধরে দিলেন।

কিন্তু আসলে যার জন্যে এত আয়োজন, সে কৈ ?

ললিতকে কিছুতেই যেন তাতানো যায় না। আগেই হার মেনে বসে আছে সে। কথা পাড়লেই বলে, 'আমার দ্বারা ওসব হবে-টবে না। আমাকে বাদ দাও। কবিতা লেখা মিল দিয়ে—কিম্বা বানিয়ে বানিয়ে গল্প লেখা—আমার মাথায় ও আসে না।'

অনেক ভেবেচিন্তে বিনু অন্য পথ ধরল।

ললিতের হাতের লেখা ভাল, সেই দিক দিয়েই তাকে চেপে ধরল, 'তুমি তাহলে এগুলো বেশ ভাল ক'রে সাজিয়ে—যেমন ছাপার বইতে থাকে প্যারা দিয়ে দিয়ে—ভাল ক'রে কপি ক'রে দাও। এটা তো পারবে।'

সে নিজে প্রতি পৃষ্ঠার চারিদিকে মাপ মতো লাতাপাতা আঁকা বর্ডার দিয়ে ছেড়ে দেয়, তার মধ্যে লেখার জায়গাটায় পেনসিলে হাল্কা রুল টেনে দিয়ে—যাতে লেখার পর ইরেজার দিয়ে ঘষে দিলেই পেন্সিলের দাগ উঠে যেতে পারে, অথচ লিপিকারের লাইন বেঁকে যাবার ভয় থাকে।

ফলে দুজনের খানিকটা সময় একসঙ্গে কাটাবার সুযোগ মেলে। ঠিক হয় ছুটির দিনে দুপুরবেলা খানিকটা ক'রে সময় এই কাজটা ক'রে দেবে ললিত। জায়গাও পাওয়া যায় একটা, ললিতই ঠিক করে, ওদের বাড়ির কাছে সুরেনবাবুর বাড়ির বাইরের দিকে একটা ছোট ঘর পাওয়া যায়।

মা আপত্তি করেছিলেন, 'ঘরে একটা লোক নেই, নিদেন ছুটির দিনে একটু বাড়ি থাকবে তা নয়, আড্ডার ছুতো খুঁজে খুঁজে বার করা!' কিন্তু রাজেনের প্রতিবাদে চুপ ক'রে যেতে হয়। রাজেনের উপার্জনেই সংসার চলছে আজকাল বলতে গেলে, দুটো টিউশানী করছে সে পড়া চালিয়েও। কনক ব্যবসায়ে নেমেছে, মাসে সত্তর টাকা আদায় করতে তিন দিন হাঁটতে হয়। তা-ও দু কিস্তি ধরেছে আজকাল। এলে সব মাসে পুরো টাকা আদায়ও হয় না।

রাজেন বলে, 'দুপুরে তো আমি থাকি ছুটির দিনে, ও একটু যাক না। না খেলা, না ধুলো—ঐভাবে বিধবা মেয়ের মতো ওকে ঘরে বসিয়ে রেখে রেখে ওর শরীরটা ভেঙ্গে যেতে বসেছে। একটু বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিশতে না দিলে জন্তু হয়ে যাবে যে।'

'তুমি দুপুরে বাড়ি থাকো ছুটির দিনে ঠিকই, কিন্তু তোমাকে দিয়ে ঘরের কাজ কিছু হয় না'—এ-কথাটা মা লজ্জায় বলতে পারেন না আর।

সেটা বিনু বোঝে, কিন্তু বুঝতে গেলে তার চলে না।

এই দু' ঘণ্টা তিন ঘণ্টা পাশাপাশি কাছাকাছি থাকা, এইটেই তো পরম লাভ ওর কাছে।

তবে এ সঙ্গলাভটুকুও নিরঙ্কুশ হয় না। সুরেনবাবুর বাড়ি ছেলেমেয়ে

অনেকগুলি—ভাইপো-ভাগ্নে জড়িয়ে—তারা একটু ফুর্তিবাজ গোছের। ঘরের মধ্যে ভীড় করে এসে আড্ডা জোড়ে—ঠাট্টা-ইয়ার্কি চালায়, অভিভাবকরাও তাতে বাধা দেন না। তারা ওদের কাজের সময় প্রায়ই এসে বসে—হৈ-চৈ করে, ইয়ার্কি করে, গান গায়। বিনুর রাগ ধরে কিন্তু কিছু বলতে পারে না। তাদের বাড়ি বেরিয়ে যাও বলা চলে না। ললিতেরও তাদের ঐ বাজে চ্যাংড়ামিতে ঝোঁক বেশি, সে আনন্দ পায়।

এ এক যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি—অথচ উপায়ও কিছু খুঁজে পায় না।

তবু কাজ এগোয়। বিনু লেখাগুলো ধরে ধরে পড়ে যায়, কোথায় কমা, কোথায় দাঁড়ি সঙ্গে সঙ্গে বলে যায়—ললিত লেখে। বিনুর মাথায় যায় প্রতিটি লেখার শিরোনামা বা হেডিং-এ কারুকার্য করতে হবে, ছাপা পত্রিকায় নাকি এমন থাকে, একেই নাকি 'হেড-পীস' বলে। তার জন্যে বড় তুলিও যোগাড় হয় চাঁদা ক'রে। বিনুই আঁকতে বসে। হঠাৎ ললিত বলে, 'দেখি আমি একটা আঁকতে পারি কিনা।'

দু-একবার ইরেজার—ওর ভাষায় রবাট দিয়ে মোছার পর শেষ পর্যন্ত সত্যিই একটা ফুলের ডাল এঁকে ফেলল ললিত। যত্ন ক'রে তাতে রঙ করল বিনু। ফুলটা জীবন্ত হয়ে উঠল যেন।

এতদিনে এত অনুরোধ-উপরোধে যা হয় নি, এই সাফল্যে তা হল। নেশা লাগল ললিতের। সে এবার থেকে সব হেড-পীসই আঁকবে। অতি কষ্টে তাকে নিবৃত্ত করে বিনু। এতগুলো হেড-পীস আঁকতে গেলে—আনাড়ির হাতে, অনেক সময় লাগবে, কপি করা হয়ে উঠবে না। সে অন্য দিকে নেশা ধরাতে চায়, বলে, 'সবই পারো তুমি ইচ্ছে করলে, একটা কিছু লেখার চেষ্টা করো না, দেখবে এমন কিছু শক্ত নয়। সত্যি এত খেটে লিখছ, তোমার একটা নাম থাকবে না।'

অনেক বলতে বলতে একটা কবিতা লেখে ললিত। ছন্দ মেলে না, মিলে গরমিল—বিনুই যত্ন করে সেগুলোয় তাপ্পি লাগায়, নিজে দু-একটা লাইন যোগ করে, কবিতা তারও বিশেষ আসে না, তবু একরকম দাঁড়ায়।

কাগজে লেখা শেষ হলে বিভূতিবাবু দপ্তরীকে বলে ভাল ক'রে চামড়া দিয়ে বাঁধিয়ে দেন। কাগজের নাম দিয়েছিল সেই পুরনো নাম—হিমালয়। প্রথমেই দিল হেড পণ্ডিতমশাইকে দেখতে। তিনি একটা লীজার পিরিয়ডে উল্টে দেখে কিছু কিছু পড়ে ছুটির সময় এসে ফেরৎ দিলেন। সুনীল বিনুকে খুব বাহবা দিলেন তাদের উদ্যম আর অধ্যাবসায়ের জন্যে। বিনুর উপন্যাসের তারিফ করলেন, বললেন, 'পরে কি হবে তার জন্যে আমিই ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, চটপট লিখে ফেল।' তারপর আর দু-একটা লেখার কথা উল্লেখ ক'রে শেষে হঠাৎ ললিতের দিকে ফিরে বললেন, তুইও তো একটা পদ্য লিখে ফেলেছিস দেখছি। মন্দ হয় নি। সত্যিই যদি এটা প্রথম চেষ্টা হয়, তাহলে তো খুবই ভাল বলতে হবে। আশার কথা।'

প্রথম লেখার প্রশংসা—ললিতের সুগৌর মুখ জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠল, কপালে ঘাম দেখা দিল। অনেক কিছু হয়ত বলতে ইচ্ছে করছিল।

কিন্তু 'ও তো ইন্দ্রই, মানে ওই তো জোর করল, কখনও লিখি নি—বাজে হয়ে গেছে' এই ধরণের দু-একটা কথা ছাড়া কিছুই বলতে পারল না।

তবে বিনু বুঝল তার কাজ হয়েছে। প্রশংসার নেশার মতো উগ্র নেশা খুব কমই আছে। এর পর ললিতকে এদিকে আনা খুব কঠিন হবে না।

॥ ২৯ ॥

ম্যাট্রিক পাশ করার পর বিনু ভর্তি হল প্রেসিডেন্সী কলেজে, ললিত ঢুকল বঙ্গবাসীতে।

ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করলেও এমন কিছু ভাল রেজাল্ট করে নি যাতে প্রেসিডেন্সীতে নিতে পারে। বিনু স্থান পেল দাদার জোরে। এ কলেজে নাকি বংশগত অধিকার বিবেচনা করার রীতি চলে আসছে অনেকদিন থেকেই। যার বাবা বা দাদা বা ঠাকুর্দা পড়েছেন, সে এখানে পড়বে এটা ন্যায্য দাবি বলেই মনে করেন এঁরা। অবশ্য পড়া বলতে কিছুদিন পড়া বা ফেল করা ছাত্রদের কথা ওঠে না, এখান থেকে যাঁরা সগৌরবে বি-এ পাশ করেছেন তাঁদের দাবিই ন্যায্য বলে ধরা হয়।

ললিতের বঙ্গবাসীতে যাওয়ার অন্য কারণ। ললিতের বাবা ঐ কলেজে পড়েছেন, তিনি চান তাঁর ছেলেও পড়ুক। বিশেষ করে নাকি সায়ান্স বিভাগে খুব ভাল ভাল অধ্যাপক আছেন এখানে, গিরিশ বোসের প্রচেষ্টায় এঁদের আনা সম্ভব হয়েছে—সায়ান্স পড়তে হলে এখানেই ভাল। কেমিস্ট্রীতে লাডলি মিত্র আছেন—তাঁর মতো অধ্যাপক আর কোন কলেজে পাওয়া যাবে? এই হল বাবার যুক্তি।

আশুতোষ কলেজের কথা তুলেছিল ললিত। বাবার পছন্দ হয় নি। তিনি বলেছেন, 'আমি বেঁচে থাকতে তুই এখন থেকেই টেলিগ্রাফের বাবু হবার কথা ভাবছিস কেন? ষাট টাকা মাইনের চাকরি কি আর কোথাও নেই? ম্যাট্রিকটা যেকালে পাশ করেছিস সে একটু জুটেই যাবে। যদি ডাক্তারী না পড়তে পারিস তখন সে-চেষ্টা দেখিস। বারেন্দ্র বামুনের গুষ্টি কোথায় নেই। বদ্যি আর বারেন্দ্র, এদের এই গুণটা আছে। একজন কোন আপিসে ভাল পোজিশনে থাকলে সে চেষ্টা করে নিজের জাতের লোক ঢোকাতে।'

ছাড়াছাড়িটা ওদের ভাল লাগে নি। বিশেষ বিনুর। পারলে বঙ্গবাসীতেই ভর্তি হত। কিন্তু দাদা সে প্রস্তাব কানেই তুলল না। 'দূর দূর, প্রোফেসার থাকলে কি হবে। গুচ্ছের ছেলে, ওর মধ্যে কি পড়া হবে! জেলেপাড়ার কলেজ। প্রেসিডেন্সীতে পড়ার প্রেস্টিজই আলাদা। যত বড় বড় চাকরিতে বসে আছে বাঙালী, খোঁজ ক'রে দেখ—হয় প্রেসিডেন্সী, নয় সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র। এখানে ঢুকতে পেলে কেউ অন্য কলেজ চায়?'

কিন্তু বিনুর যে অন্য কথা। ভগবান তাকে সব দিক দিয়েই স্বতন্ত্র ক'রে পাঠিয়েছেন। তার মনের এই বিচিত্র গঠনের কথা সে কাকে বোঝাবে? বোঝাতে গেলে বুঝবে তো না-ই, উল্টে ওকে পাগল ভাববে।

বিনুর একেবারেই ভাল লাগে না এখানে।

এত বড় কলেজ, এত নামী কলেজ—ওর কাছে জেলখানা বলে মনে হয়। মনে হয় সম্পূর্ণ কোন বিদেশে এসে পড়েছে, জার্মান কি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানদের মতোই পরদেশী এইসব ওর সহপাঠীরা।

অধিকাংশই বড়লোকের ছেলে পড়ে এখানে। কেউ বালিগঞ্জ, কেউ ভবানীপুর থেকে আসে। আরও দূর—আলিপুর থেকে আসে কেউ কেউ। এদের অনেকেরই কোন-না-কোন আত্মীয় বিলেতে গেছে বা বিলেতে থাকে। সেই সুবাদে এরাও যেন সাহেব হয়ে গেছে—বরং তাদের চেয়ে বেশি সাহেব। প্রাণপণে সেই সাহেবীয়ানা প্রচারের চেষ্টা করে—কথায়বার্তায় আচারে-আচরণে, গল্পে।

যারা সাহেব হবার জন্যে ব্যগ্র নয়, তাদের আছে বড়মানুষীর দম্ভ। আর সেটা বড় বেশী প্রকট, বড় বেশী উগ্র। তাদের সে চাল-এর কথা আদ্ধেক বুঝতেই পারে না বিনু।

সে গরিবের মতোই মানুষ হয়েছে, গরিবের ছেলেই বলতে গেলে। মার মুখে বাবার বড়মানুষীর কথা কিছু শুনেছে, তবে তার সঙ্গে এর কিছু মেলে না। তিনি ছিলেন অন্য যুগের মানুষ, দান ধ্যান, খাওয়ানো ও খাওয়া—এই সবই বুঝতেন। উপার্জনের মধ্যে কৃতিত্বর প্রশ্নটাই তাঁর কাছে বড় ছিল। বিলাস বলতে গাড়ি-ঘোড়া যা, সেও তাঁর প্রয়োজনে লাগত।

আর, বাবার সঙ্গই বা মা কতটুকু—কদিন পেয়েছেন? শোনা কথাই তো বেশির ভাগ। সে স্মৃতিও এতদিনে বিবর্ণ হয়ে এসেছে।

এরা সে যুগেরও না, সে ধাতেরও না। এরা নিজেদের বিশেষ গণ্ডীর বাইরে বাকী সহপাঠীদের মানুষ বলে মনে করে না, তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে। খুব ভাল ছাত্র যারা, পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় স্থান পেয়ে এখানে এসেছে, তারা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। এইসব বড়লোকরা (অবশ্য সত্যিসত্যিই কে ঠিক কতটা বড়লোক—সে বিষয়ে সেদিনও সন্দেহ ছিল বিনুর, এখন তো মনে হলে হাসি পায়। অনেকেই যে বানিয়ে বানিয়ে বিস্তর কথা বলে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিজের অবস্থা প্রমাণ করতে—আজ তা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট) প্রথমটা তাদের দলে টানবার চেষ্টা করে। কেউ কেউ তাদের মিথ্যা দীপ্তিতে আকৃষ্ট হয়—যাদের মধ্যে ঐ আলেয়াজীবনের জন্য লুব্ধতা আছে—এদের পোশাক-আশাকে বিলাসের উপকরণ সম্বন্ধে আষাঢ়ে গল্প শুনে চোখ ও চিন্তা শক্তি দুই-ই ঝলসে যায়; যারা হয় না তাদের অবিরাম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে—তারা যে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্বের উপযুক্ত নয়—সেটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

ফলে, বিনুর মনে হয় সে হঠাৎ যেন একটা প্রাণোজ্জ্বল ও প্রাণোচ্ছল লোকালয় থেকে মরুভূমিতে এসে পড়েছে। লেখাপড়া এখানে হয়, কিন্তু সে ব্যবস্থাও পরিবেশ অনুযায়ী। ভাল ছেলেরা আপনিই পড়ে। বড়লোকের ছেলেদের দু-তিনজন টিউটার থাকেন—অধ্যাপকরা এ তথ্য ধরে নিয়েই পড়ান। ওরই মধ্যে যারা সত্যিসত্যিই শিক্ষায় আগ্রহী তারা নিজেরাই এগিয়ে যায়, অধ্যাপকরা তাদের হয়ত অবহেলা করেন না, ওঁদের সান্নিধ্যে ও স্নেহে তারা

অনেক কিছু পায়।

বিনুর মতো ছেলের কোন আশাই নেই। স্কুল আর কলেজ জীবনে যে এত তফাৎ হতে পারে তা সে ভাবে নি কোন দিন। তার সৌভাগ্য বা—এখন বুঝছে দুর্ভাগ্যক্রমে—মাষ্টার মশাইদের কাছ থেকে স্নেহ ও প্রশ্রয় পেয়েছে প্রচুর। সেই জন্যেই এখানটাকে এমন মরুভূমি বোধহয়। মনে হয় এ কোন্ জায়গায় এসে পড়েছে সে।

মাঝে মাঝে ভাবে ললিত যদি থাকত, কি সুনীলটাও অন্তত!

সুনীলের জন্য দুঃখই হয়। ভালভাবেই পাশ করল বেচারী কিন্তু কলেজে ভর্তি হতে পারল না। তার বাবার আর পড়াবার সামর্থ্য নেই। এ জগৎ থেকে বিদায় নিতে হল তাকে একেবারেই. চাকরির চেষ্টা দেখতে হবে এখন থেকে। পাবে কি, ম্যাট্রিক পাশ ছেলে কী চাকরি কোথায় পাবে, কে দেবে?

আর ললিত।

হয়ত দেখাটা পেত এখানে, সে-ই একটু সান্ত্বনা থাকত। হয়ত এখানে এই কলেজের মধ্যে তার সাহচর্যটুকু পেলেও এতটা শূন্য এতটা বিবর্ণ মনে হত না—বহু ছেলেরই ঈপ্সিত এই কলেজ-ছাত্র-জীবন।

হয়ত ললিতও, এই কলেজে এত অপরিচিত ও ভিন্ন জগতের ছেলেদের মধ্যে বিনুর সঙ্গও সাময়িক আশ্রয় বলে মনে করত। এখানে অন্তত ক'ঘণ্টা কাছাকাছি থেকে দুজনে দুজনের মধ্যে ওদের পরিচিত জগতের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারত।

নইলে ললিত তো ওর থেকে বহুদূরে সরে গেছে।

কাছে এসেছিল কি আদৌ? সেও তো একটা ধারণার কথা মাত্র।

বিনুর বিশ্বাস করতে ভাল লাগত যে সে কাছে এসেছে।

এত কাণ্ড ক'রে যে মাসিকপত্রের আয়োজন—সাহিত্য শিল্পের রসে ওকে উদ্বোধিত করা—সেও তো ব্যর্থ হয়ে গেল। প্রথম সংখ্যার পর দ্বিতীয় সংখ্যার কাজ খানিকটা ক'রেই ছেড়ে দিল সে। সুরেনবাবুদের বাড়ি কাছাকাছি-বয়সের অনেকগুলি ছেলের অড্ডা। আড্ডাটা ওর মতে বেশ রসালো, সেই ঝোঁকে মিশে গেল। সেখান থেকে তারা ক'জন মিলে মাসিক বার করবে—ললিতকে মুরুব্বি ধরে। সেও হল না, খানিকটা ক'রেই তারা হাল ছেড়ে দিল, তাদের স্বভাবেই একাগ্রতা বা অধ্যবসায় নেই সুনীল বা বিনুর মতো একজন থাকলেও তবু হ'ত—কে এত কাণ্ড করবে। ওটাও হল না, এটাও গেল।

তবে মণীষীরা বলেন, সৎপ্রচেষ্টার কিছু সুফল ফলেই। এক্ষেত্রেও বিনুর কিছু সুফল লাভ হয়েছিল।

হয়ত ওর জীবনে এ অনেকখানিই।

স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রদের এই মাসিকপত্রের কথা শুধু ওদের ক্লাসের ছেলেদের মুখে মুখেই নয়, ফার্স্ট ক্লাস ও থার্ড ক্লাসের ছেলেদের মারফৎ ছড়িয়ে থাকবে। তার ফলে বিভিন্ন পাড়া থেকে কিছু কিছু ছেলেদের দল এসে ওকে ধরতে লাগল, 'তুমি' বা 'আপনি'—যেখানে যেমন—আমাদের একটু সাহায্য করো।

এতে গৌরবও আছে, লজ্জাও আছে। লজ্জার কারণটা অন্য। ওরা বাড়ি বদল করেছে। কিন্তু এখানেও সেই এক প্রশ্ন, ওর বন্ধুদের বা ওর সঙ্গে যারা দেখা করতে আসে—তাদের বসবার কোন জায়গা নেই। দাদার বন্ধুরা সেই আগের মতোই দাদার শোবার ঘরে এসে বসেন, সৌভাগ্যবশত সেটা রাস্তার দিকেও বটে—ও কোথায় এনে বসায়? মার সেই একই কথা—'হ্যাঁ, ইস্কুলের ছেলে—এখন থেকে ইয়ার বন্ধু এনে আড্ডা দেওয়া। তা আর নয়। ঢের হয়েছে, মন দিয়ে লেখাপড়া করুক। তার নামে তো সম্পর্ক নেই। কখনও তো দেখলুম না একটা ইস্কুলের বই নিয়ে বসতে!'

এর ওপর আর কথা চলবে না।

তবে যারা এসেছে নিজেদের গরজে, এত সামান্য কারণে তারা পিছিয়ে যাবে না। কসবা, হালতু, ঢাকুরিয়া—এর পাড়ায় পাড়ায় হাতে লেখা কাগজ—তখন এই ঢেউটা খুব চলছে, ছেলেদের অন্য এত রকম পথে নিজেদের 'কৃতিত্ব' দেখাবার উপায় বেরোয় নি, সাহিত্যের ওপরও অনুরাগ ছিল। কতকগুলো কাগজের নাম আজও ওর মনে আছে—শেফালি, ধারা, শান্তি, বিজয়, পরাগ—এমনি ধরনের নাম। অনেক, অজস্র। পাড়ায় পাড়ায়, তাও পাড়া প্রতি একটা নয়—দলাদলি তো আছেই, একটা কাগজ করতে করতে সামান্য কোন ব্যাপার নিয়ে মতবিরোধ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনজন দল থেকে বেরিয়ে এসে আর একটার পত্তন করল।

না, এরা আসত বিনু খুব একটা বড় লেখক বলে—বা নিপুণ শিল্পী বলে নয়। এরা আসত অন্য কারণে।

এদের উৎসাহ যত, সামর্থ্য তত নয়। আর সে উৎসাহর স্থায়িত্বও বড় অল্প। এদের ঐ রকম কর্মীরই অভাব, যে ভূতের মতো খাটতে পারে। শুধু তাই নয়, অজস্র লেখা যোগান দিতে পারে—এ লোকের অভাবই সবচেয়ে বেশী। লেখা ভাল কি মন্দ, অচল কি চলনসই—সে বিচার পরের কথা, পাতা ভরানো যে দরকার।

বিনুর সেই খ্যাতিটাই ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশ। ও একই সঙ্গে লিখতে পারে, আঁকতে পারে, সব রকমই লিখতে পারে। হাতে লেখা মাসিকে পাকা হাতের লেখা কেউ আশা করে না। বড় লেখকদের স্বারস্থ হয়ে দু-চার লাইন লেখা চাওয়া—অন্যথায় আশীর্বানী—এসব কথা এইসব-নিহাৎই-ভীরু ছেলেরা ভাবতেই পারত না। বিনুর ঐ গুণটা ছিল, দ্রুত লিখতে পারত, কাঁচা লেখাই, তবু এলোপাথাড়ি যা হোক একটা কিছু খাড়া ক'রে, দিত, পাতা ভরাবার পক্ষে যথেষ্ট।

তবে তখন এইসব কাঁচা লেখার সমষ্টিও দু'-চারজন পড়ত। এখন এ চেষ্টা খুব সীমাবদ্ধ—বছরে একখানা বেরোয় কোথাও কোথাও থেকে, খুব খরচা ক'রে, খুব মেহনৎ করে—নয়নাভিরাম একটা পত্রিকা বেরোয়—দেখাবার জন্যেই করা, লোকেও দেখে, রূপসজ্জারই বাহবা দেয়।

তখন যে পড়ত তার প্রমাণ কয়েক বারই পেয়েছে বিনু। একবার তো তার

জীবনের গতিই নির্দিষ্ট হয়ে গিছল এই হাতে লেখা মাসিকের একটি লেখা থেকে, যাকে কেরিয়ার বলে—জীবনের উন্নতির পথ জীবিকার পথ উন্মুক্ত হয়ে গিছল।

তবে সে অনেক পরে। এমনি অনেকে পড়েছে, বাহবা দিয়েছে। একটা ঘটনা খুব মনে আছে তার। পাড়ার লাইব্রেরীতে রাখা একটা মাসিকে ওর একটি লেখা—মুসলমান শাহী-আমলের ঐতিহাসিক গল্প পড়ে মুখুজ্জে পাড়া থেকে একজন দাদা-শ্রেণীর একটি ছেলে ছুটে এসেছিলেন, ওর ফার্সী শব্দের ভুল ধরিয়ে দিতে। ভুল ধরানোর উৎসাহেও এত পরিশ্রম কেউ করে না—সে জন্যে খুবই কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ বোধ করল বিনু, তবে ভুল সেটা নয়। অবশ্য এটার একটা চলিত অর্থ আছে, লোকে সেটাই বেশী জানে—এবং এ নিয়ে কিছু ধিক্কার পাওনা হতে পারে তা ও তখনই ভেবেছিল। তার জন্যে প্রস্তুতও ছিল। বরং বলা যায় এটা এমনি একটা বিতর্কের সৃষ্টি করবে ভেবেই শব্দটা ব্যবহার করেছিল।

মার বইয়ের আলমারীতে যখন তখন হাত দেবার অধিকার ছিল না। সেই জন্যে সে পৃষ্ঠা সংখ্যাটা মনে ক'রে রেখেছিল। চণ্ডীদা যখন এসে ওকে ডেকে বললেন, কণ্ঠে একটু ব্যাঙ্গের সুরই ছিল, 'বাপু হেলে ধরতে পারো না কেউটে ধরতে যাও—এখনও লিখতেই শিখলে না, এসব ঐতিহাসিক গল্প লিখতে চেষ্টা করো কেন, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!' এই ধরনের। বিনুও খুব ভারিক্কি চালে বলল, 'পারেন তো ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীতে পার্সিয়ান ডিকসনারীটা দেখে নেবেন। তবে অত দূরে যাবার দরকার নেই, রাজসিংহ বইটাই বরং দেখে নেবেন, তাতে বঙ্কিমবাবুও এই অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি যদি ভুল ক'রে এতকাল পার পেয়ে থাকেন—আমিও করলুম না হয়। বসুমতীর বঙ্কিম গ্রন্থাবলী নিশ্চয় হাতের কাছে আছে—' এই বলে পৃষ্ঠা সংখ্যাটা একটা চিরকুট কাগজে লিখে দিয়ে বলে দিল, 'এই পাতার মাঝামাঝি আছে শব্দটা, দেখে নেবেন।'

চণ্ডীদা পরে অবশ্য স্বীকার করেছিলেন—বাড়ি আসেন নি আর—পথে দেখা হতে পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে বলেছিলেন, 'না, তোমার কেরামতি আছে। ঠিকই ব্যবহার করেছ। আর মেমরীও তো খুব। পৃষ্ঠা সংখ্যা শুধু নয়—কোথায় তাও। লেখাটাও কিন্তু আফটার অল মন্দ হয় নি।'

লেখা আর পড়া—এর মধ্যেই একটা জগৎ ক'রে নিয়েছিল সে।

নিতে পেরেছিল, এইটেই তার সৌভাগ্য।

নইলে বোধহয় পাগল হয়ে যেত। মনের মধ্যে এমন নিঃসঙ্গতা! যারা কথা বলে, তারা কত কি কথা বলে, কত গল্প হয়; বিশেষ করে পাড়ার বৃদ্ধদের সঙ্গেও আজকাল আলাপ হয়—তাঁরা ডেকে গল্প করেন; সংসারের সব রকম কাজ তার ওপর এসে পড়েছে, দাদার সারাদিনই খাটুনি, কলেজের ফেরৎ টিউশনী সেরে ফিরতে দেরি হয়—সকালটাই তার নিজের পড়া খবরের কাগজ পড়ার অবসর, তার জন্যে মায়াও হয়—আর ন'টা পর্যন্ত তো সময়, এটুকু থাক বেচারার। আজকাল মার শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে বেশির ভাগ দিনই রান্নাতেও সাহায্য

করতে হয় বিনুকে ; ফলে সকাল থেকে নিরন্ধ্র নিরবসরের ব্যবস্থা—কিন্তু তার মধ্যেও একটা শূন্যতা বোধ পীড়া দেয় ওকে। কিন্তু সেই মানুষটি কোথায়, যে ওর মনের কথা আর মনের ব্যথা বুঝবে, ঠিক পরামর্শ দেবে, পরামর্শ না দিতে পারুক ওর বোঝা ভাগ ক'রে নেবে, ভালবাসা আর সহানুভূতির প্রলেপ দেবে ?

নতুন বাড়িতে এসে—ভাড়া বাড়িই—বড় পাড়ার মধ্যে বলে—পরিচিতদের পরিধি বিস্তৃত হয়েছিল। স্কুলের বন্ধু ছাড়াও পাড়ার বন্ধু ঢের। এক বয়সী ছেলে, দু' বছর এক বছরের ছোট বা বড়—সহজেই আলাপ হয়ে যায়। সহপাঠীদের বন্ধু এই হিসেবেই দু' চার দিনের মধ্যে এই নবপরিচিতরাও বন্ধু শ্রেণীতে পরিণত হয়।

তবে এসব ক্ষেত্রেও ঐ একই অসাম্য। তার আর ওদের মধ্যে কোথায় একটা বিপুল ব্যবধান থেকে যায়। কেউই সে ব্যবধান পার হবার চেষ্টা করে না, ব্যবধান আছে কিনা, এবং সেটা কোথায়—কেউ বোঝেও না। তাদের এত গরজই বা কেন থাকবে। আলোচনার গতি ও প্রকৃতি সেই একই। এই ধরনের আলোচনায় সে রস পায় না। আসলে কিছু বোঝেও না। এদের আলোচনায় যে সব ভাষা—শব্দ বলাই উচিত—ব্যবহৃত হয় তার অর্ধেক কথাই বুঝতে পারে না। যেটুকু বোঝে ঝাপসা ঝাপসা।

ফার্স্ট ক্লাসে উঠতেই এটা আরও বাড়ল। অথচ তখন কতই বা বয়স। ষোল-সতেরো—এই তো। ওর নিজের সতেরো বছর তবে দেহের গড়নের জন্যে অনেক বেশী মনে করত এরা। এটা স্বাভাবিক। বিনুও কোন কোন ছেলেকে দেখে ভাবত চোদ্দ কি পনেরো বছরের—পরে শুনেছে তারাও ওর এক-বয়সী। কেবল সুনীলই ওদের মধ্যে একটু বেশী বড়, তার আঠারো হয়ে গেছে। সে মিথ্যে বলে না, বয়স জিজ্ঞাসা করলে ঠিক ঠিক বলে দেয়। বাকী সকলেরই লক্ষ্য করেছে বিনু—বয়স কমানোর দিকে ঝোঁক।

এই বয়সেই এইসব আলোচনা, বড় অবাক লাগত বিনুর।

ষোল সতেরোতে আগে অবশ্য বিয়ে-থা হ'ত, কিন্তু সে যুগ আর নেই। তখন উপার্জনের কথা কেউ ভাবত না, বাপ-মা অল্প বয়সে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে মানুষ-পুতুল খেলার শখ মেটাতেন। নইলে এটাই কৈশোর, যৌবন-সীমান্ত। আঠারোর কম যৌবন ধরা উচিত নয়। এর মধ্যেই এসব আলোচনা আসে কেন !

আজ বোঝে যে তখন এদের মনের সীমা অতি সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল। এক খেলাধুলোর প্রসঙ্গ ছিল, তাও ফুটবল শুধু। এদেশের ক্রিকেটের তখন শৈশব দশা। বাংলা ছবি তত চালু হয় নি, ইংরেজী ছবি আসে ভাল ভাল, তাতে এরা রস পায় না। ও জগৎ ও জীবন সম্বন্ধেই ধারণা নেই। তবে পরবর্তীকালে বাংলা ছবি যখন চালু হয়েছে তখনও দেখেছে—কানটা খোলা থাকেই—আলোচনাটা প্রধানত অভিনেত্রী বা স্ত্রী 'স্টারদের কেন্দ্র ক'রেই আবর্তিত। সুতরাং আলোচনাটা যদি বেশির ভাগই আদিরস ঘেঁষা হয় তো খুব দোষ দেওয়া যায় না।

ওর মা একটা উপমা প্রায়ই দিতেন, অনেকেই দিত, আজও দেয়, অবশ্য প্রবাদ বা এই শ্রেণীর প্রচলিত বাক্য আর প্রচলিত নেই এখন—'কাকে নতুন ময়লা খেতে শিখেছে, বাড়াবাড়ি তো করবেই।' ওদের সামনেও এই প্রথম এত বড় একটা দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে, সত্যকারের পুরুষের জীবনে উপনীত হচ্ছে। তাছাড়াও তখন এইসব ছাত্র বা ছাত্রবয়সী ছেলেদের পৃথিবী নেহাৎই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আসল কলকাতায় অনেক উত্তেজনা, এসব শহরতলীর জীবন অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ। রাজনীতির উত্তেজনাও তখন প্রবল আকার ধারণ করে নি। বস্তুত ওরা ম্যাট্রিক পাস করার পর স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিবেগ বেড়েছে। উনিশ শো তিরিশে এসে—ইংরেজদের পক্ষে ভয়ংকর চেহারা নিয়েছে। তখন মেয়েদের সঙ্গে খোলাখুলি মেশবার সুযোগ ছিল না, গোপনীয়তায় রস এবং আকাংক্ষা বেশী। বৈষ্ণব কবিতায় এই কারণেই শাশুড়ি ও ননদ—জটিলা-কুটিলার প্রবল বাধা সৃষ্টি করতে হয়েছে।

কিন্তু এসব তো এখন ভাবছে সে। তখন এমন ক'রে ভাবতেও পারত না।

তবে চেষ্টা যে একেবারে করে নি—সহজ হবার, স্বাভাবিক হবার, ওদের সঙ্গে মিশে যাবার—তা নয়। এইসব বন্ধুদের কাছে অপদস্থ হবার ভয়ে আন্দাজে আন্দাজে আলোচনা চালাবার চেষ্টা করেছে, বাহাদুরী দেখাতে গেছে—সেও ওদের চেয়ে কম নয়, বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু আনাড়িপনা আর অনভিজ্ঞতা ধরা পড়তে কতক্ষণ লাগে? ফলে ঠাট্টা বিদ্রূপ লাঞ্ছনার অন্ত থাকে নি।

ওর এ কটা নির্বুদ্ধিতার জন্য আজও নিজের অবাক লাগে।

এত আনাড়ি তো এ বয়সে কেউ থাকে না। অবশ্য বয়সটা পুরো ষোল, সতেরোয় সবে পা দিয়েছে, তবে তখন ওকে দেখায় অনেক বড়। আর চেহারাটাও নাকি ভাল—বন্ধুদের মুখে, পরে অন্য মেয়েদের মুখে শুনেছে—কিন্তু সেদিনও ওর বিশ্বাস হত না, পরেও হয় নি। নিজের চেহারাটা আয়নায় কখনই ভাল লাগে না ওর, পুরুষ মানুষ সুন্দর বলতে যা বোঝায় তার ধারেকাছেও ও যায় না—এটা আন্তরিক বিশ্বাস। বরং বয়সকালে ওর দাদার চেহারা অনেক ভাল ছিল। মা বলতেন, 'ও ওর গুষ্টির মতো হয়েছে অনেকটা। তবে তা হ'লেও, তাঁর মতো সুন্দর হয় নি।'

তখন ও সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। বামুন-মার এক বোনপোর বিয়েতে ওকে জোর ক'রে বরযাত্রী নিয়ে গিছল। মা অনেক আপত্তি তুলেছিলেন কিন্তু নিহাৎ বামুন মার বোন এমন আড় হয়ে পড়লেন যে একেবারে কাটিয়ে দিতে পারলেন না। তিনি চেয়েছিলেন দু' ভাইকেই নিয়ে যেতে। দাদার উপায় ছিল না, আর মা একাই বা থাকবেন কি ক'রে! সুতরাং বিনুকেই ছেড়েছিলেন। আসলে বামুন মার বোনের অত আগ্রহ কেন তা বিনু পরে বুঝেছিল, ভাল ঘরে বিয়ে হচ্ছে, বৌ নাকি খুব সুন্দরী। তাঁর ছেলে রাজগঞ্জের কলে কাজ করে, লেখাপড়া শেখে নি, চোয়াড়ে চেহারা, বিড়ি খেয়ে খেয়ে এই বয়সেই দাঁত কালো করেছে। তার বন্ধুরাও সব তেমনি, চোদ্দ আনা, এক টাকা রোজের মিস্ত্রীর দল। নিহাৎ মেয়ের বাপের বছর দুই আগে আপিস উঠে গিয়ে চাকরি গেছে—সেটা সেই পৃথিবীব্যাপী মন্দা বাজারের কাল—একেবারে নিঃস্ব বলেই এ ছেলেকে দিচ্ছে।

তাই দু-একজন একটু ভদ্রগোছের বরযাত্রী যায় তাঁর ইচ্ছে।

বিনুর এই একা স্বাধীনভাবে বাড়ির বাইরে যাওয়া—খুব ভাল লেগেছিল। বিয়েও এমনভাবে সারাক্ষণ দেখে নি এর আগে, রাত্রের কুশণ্ডিকা পর্যন্ত রাত জেগে দেখেছে। কি খেয়েছে, তারা কি খাইয়েছে বাড়ি এসে বলতে পারে নি কিন্তু বিয়ের বিবরণ মনে আছে।

মেয়ের বাপের বাড়ি হাওড়া জেলাতেই—তবে সাঁতরাগাছি থেকে অনেকটা দূরে। গোরুর গাড়ি ক'রে স্টেশনে আসার কথা। বরযাত্রীরা তাই আসবে। কেবল বরকনের পালকির ব্যবস্থা হয়েছিল—কিন্তু বোধহয় সুন্দরী বৌ, তায় একটু লেখাপড়াও জানে, বাসর ঘরে গানও গেয়েছে, বর নার্ভাস হয়ে পড়ে শেষ মুহূর্তে গাঁটছড়া বাঁধা চাদরটা বৌয়ের কোলে ফেলে দিয়ে একরকম জোর ক'রেই বিনুকে সেই পালকিতে তুলে দিল, বললে, 'বাবা, ও আমার পোষাবে না, আমি বেশ হেঁটে যাবো।'

পালকিতে আসতে আসতেই আলাপ জমে উঠেছিল। মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী, ভারি মিষ্টি কথাবার্তাও, গলার আওয়াজ একটু আধো-আধো। তাতে আরও ভাল লাগে। পালকী থেকে নেমে স্টেশন। ট্রেনে আসতে হবে সাঁতরাগাছি। বৌটি এবার সোজাসুজি বিনুর পাঞ্জাবী চেপে ধরে বললে, 'ঠাকুরপো, তুমি আমার কাছেই বসো ভাই। একা যেতে—ভাইটাকে ছেড়ে এসেছি, আমার বিশ্রী লাগছে।' বরও তাই চায়—বিনু আর কনেবৌ একধারে কোণ ঘেঁষে বসল। ফলে পরিচয় গাঢ়তর হবে এ তো স্বাভাবিকই। বিনুর খুবই ভাল লাগল, ওদের তিন কুলে কেউ নেই—একটা বৌদি পেয়ে মনে হ'ল যেন এক মহা সৌভাগ্য নববধূর মূর্তি ধরে এসেছে। কোন আত্মীয়কে উপযুক্ত সম্বোধনে ডাকবার নেই, এ অভাববোধ এক এক সময় একটা দৈহিক যন্ত্রণার মতো মনে হয়।

বিয়ের পরের দিন। তারপরের দিন বৌভাত পর্যন্ত ওখানে কাটাতে হল। ওদের সেই পুরনো বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এসেছে—তাঁদের ওখানেই বিনুর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানের সব কিছু চেনা জানা—অসুবিধা হবে না এই আশায়। অসুবিধা প্রচণ্ড, যে কখনও কারও সঙ্গে থাকে নি একা এভাবে—রাজ্যের লজ্জা ও সংকোচ তাকে চেপে ধরবেই। তবু এরকম ক'রে কাটালো। আরও মনে হল ঐ বৌটির কি কষ্ট, একেবারে পরের মধ্যে এসে পড়ে। আর এই তো বাড়িঘরের ছিরি। বেচারী।

ইদানীং মার শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল, তাছাড়া তেমন কোন আত্মীয় কুটুম্ব না থাকায় কখনও কাউকে নিমন্ত্রণ করার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। আত্মীয়তা বলতে পাশের বাড়ির কি সামনের বাড়ির—লৌকিকতা করা পর্যন্তই কর্তব্য। কখনও সখনও ভাল খাবার কিছু বাড়িতে হলে পাঠিয়ে দিতেন—যাদের সঙ্গে বেশী আত্মীয়তা হয়ে যেত তাদের।

কিন্তু বামুনমার বোন এমনভাবে পুরনো আত্মীয়তা ঝালিয়ে তুললেন, তাছাড়া ঐ 'বনবাসে' থাকতে—মার ভাষা এটা—অনেক করেওছেন ওঁরা, এটা

ঠিক। সুতরাং বর বৌকে নিমন্ত্রণ করতে হল একদিন। বর বৌ আর বরের ছোটভাই। ছোট ভাইই বৌদিকে নিয়ে এল, বড় ভাই আসবে পরে, তার 'ওভারটাইম', ছটায় ছুটি, তারপর বেরিয়ে এখানে আসতে সাড়ে সাতটা হয়ে যাবে। তবু সে পরিষ্কার কাপড় জামা নিয়ে গেছে—ছুটির পর ঐখানেই পোশাক পালটে নেবে।

বৌকে পৌঁছে দিয়ে ছোটজন বেরিয়ে পড়ল। এই ছেলেটিই বিনুকে ওখানকার পথঘাট চিনিয়েছিল। সেও এখন চাকরি করছে, বড়বাজারে এক মারোয়াড়ির গদিতে। এ পাড়াতে তার অপিসের কে বাবু আছেন, এই ফুরসুতে সে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসবে।

মা রান্নায় ব্যস্ত। দুটো হ্যারিকেন মাত্র বাড়িতে, টেবিল ল্যাম্প দাদার ঘরে। সেটা তখনও জ্বালা হয় নি। একটা মার কাছে রান্নাঘরে, আর একটা চলনে। বিনু আর নতুন বৌ বিনুদের ঘরে বসে গল্প করছিল। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার, তবে বাইরের আলোর একটা রেশ একেবারে মুছে যায় নি। একথা সেকথার মধ্যে বৌ হঠাৎ বলে উঠল, 'এই যে সব সন্ন্যাসী সেজে ভিক্ষে করতে আসে, এক একটা কি পাজী না—কি বলব।'

'কেন, তুমি জানলে কি ক'রে?' বিনু প্রশ্ন করে।

'সে কথা বলো কেন। একদিন দুপুরবেলা অমনি পাড়ায় এসেছে, জটা টটা আছে—হলদে কাপড় পরা, বলে তো পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী, হাতটাত দেখে টোটকা ওষুধ দেয়—আসে না? তোমাদের পাড়ায় দ্যাখো নি? সেদিন কেউ নেই, আমি রকে বসে আছি, একেবারে উঠোনে ঢুকে এসেছে। আগে তো আবোল তাবোল কত কি বললে, আমি রাজরাণী হবো, আমার বহুত পয়সা রুপেয়া হবে, সাত বেটা হবে—তার পরই বলে কি, আরে খোকী, তোমার বুকে যে দুটো ফোড়া উঠেছে, আরে বাপরে, দেখি দেখি—বলে একেবারে রকের ধারে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি খুব রাগ ক'রে উঠতে ঘর থেকে মা শুনতে পেয়েছে—একবারে একটা বঁটি নিয়ে বেরিয়ে এসেছে—তখন বেটা পালাতে পথ পায় না!'

বিনু প্রশ্ন করল, 'সত্যিই তোমার ফোড়া হয়েছিল নাকি?'

আবছা আলোতেই দেখা গেল, বৌ যেন কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে, তারপর একটু বিরস গলাতেই বলল, 'দূর, ফোড়া হবে কেন। ওই ওদের ভুজুং। বদ মতলব।'

বৌদির বক্তব্যের গূঢ়ার্থ না বুঝলেও সে যে কিছু বোকামি ক'রে ফেলেছে এটা বুঝেছিল। সে-ই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল তাড়াতাড়ি।

হঠাৎ বৌদি একটা বালিশে মাথা দিয়ে এলিয়ে শুয়ে পড়ল। বিনু উদ্বিগ্ন হয়ে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করল, 'কি হল বৌদি, শরীর খারাপ লাগছে?'

'বুকের মধ্যেটা বড্ড ধড়ফড় করছে ভাই, দ্যাখো হাত দিয়ে—' বলে বিনুর ডান হাতখানা নিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরল।

বিনু তেমন কিছু বুঝল না। ঘাম জমেছে খুব, হাতটা পিছলে যায়। তবু একটু রাখার পর মনে হল সত্যিই বুকের মধ্যেটা ধড়াস ধড়াস করছে। সে হাত

টেনে নিয়ে বলল, 'কি রকম বুঝছ, খুব খারাপ লাগছে ? মাকে বলব ? তেমন যদি হয়—'

বৌদি যেন অকারণেই রেগে উঠল 'হ্যাঁ, তা আর বলবে না ! মাকেই তো বলবে ! কিচ্ছু হয়নি আমার। ঝকমারি হয়েছিল তোমাকে বলা !'

বলতে বলতে উঠে গিয়ে পাশের ঘরে মা যেখানে খাবার গুছিয়ে ঢাকা দিচ্ছেন, সেই ঘরের চৌকাঠে বসে মার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।...

কি হল সেদিন—কিছুই বোঝে নি। এর বেশ কিছুদিন পরেও যখন একবার এই বৌদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বৌদি কি একটা কথা প্রসঙ্গে বলেছিল, 'তোমার কাছে আবার লজ্জা করবে কেন ? বয়েস যাই হোক, তুমি তো কাঁচ ছেলেই থেকে গিয়েছ !' তখনও সে কথার মধ্যে যে পূর্ব অভিজ্ঞতারই ইঙ্গিত ছিল, তাও বোঝে নি।

বুঝেছে অনেক পরে।

অথচ বোঝা উচিত ছিল। এর মধ্যে বাংলা ইংরিজী নভেল পড়েছে রাশি রাশি, নিজেও নানা ধরনের গল্প লিখেছে, প্রেমের গল্পও লিখেছে, বন্ধুরা নিরন্তর এই রসঘেঁষা গল্প করছে—তবু কেন এসব ইঙ্গিত সেদিন বোঝে নি। পড়া ও শোনার অভিজ্ঞতা নিজের মনের রসে জারিয়ে নিতে পারে নি বলে, না নিজের চিন্তা কল্পনা কামনায় এই ধরনের জিনিস উত্তেজনা আনতে শুরু করে নি বলে ?

কে জানে কি ! সে কি সত্যিই এত নির্বোধ ছিল।

এ প্রশ্ন সেদিনও অহরহ করেছে। কেন কোথাও খাপ খাওয়াতে পারে না ও ? কেন সর্বত্র বেমানান ঠেকে। আর যার ফলেই সে এত নিঃসঙ্গ, এত একা। নিজেকে নিয়ে নিজের মনের গভীরে ডুবে থাকা ছাড়া কোনও মুক্তির পথ, সাধারণ স্বাভাবিক ভাবে বাঁচার পথ পায় না। এ বোধ হয় ওকে ছেলেবেলায় ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখে বন্ধুদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে মানুষ করার ফল। অহরহ তাই মনের কথা ও মনের ব্যথার ডালি সাজিয়ে যাকে উপহার দেওয়া যায়, যার ওপর জীবনের সমস্ত ভার আশা-আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়—এই বন্ধুই খুঁজে বেড়ায় তার মন।

অথচ ঠিক কুণো স্বভাবের, কারও সঙ্গে মিশতে যে পারে না, তাও তো নয়।

যারা পরস্যাপি পর, যাদের সঙ্গে সব দিক দিয়েই বিপুল ব্যবধান, যাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না—তাদের সঙ্গে তো বেশ মিশতে পারে, অনেকক্ষণ ধরে গল্প চালাতে পারে—এমন কি সাহস ক'রে কোথাও কোথাও বেশ ধৃষ্টতাও প্রকাশ ক'রে ফেলে কিছু কিছু—বলা উচিত হচ্ছে না বুঝেও—কিন্তু তাতেও তাঁরা বিরক্ত হন না, ধমক দেন না। সে বয়সের তুলনায় অনেক বেশী জেনেছে, সেই জন্যেই একটু 'জ্যাঠামি' করবে বৈকি, এই ভেবেই বরং প্রসন্ন মনে ক্ষমা করেন।

স্কুলের শিক্ষকরা তো অনেকে তার বন্ধুর মতোই হয়ে গেছেন। বিশেষ প্রসন্নবাবু। তিনি এমন সব প্রসঙ্গ আলোচনা করেন—যা শিক্ষক ও ছাত্রর

মধ্যে আদৌ করা উচিত কিনা সন্দেহ।

এ পাড়ায় এসেও ওর কটি বৃদ্ধ বন্ধু জুটেছে। সকলেই চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন অর্থাৎ ষাটের ওপর পেঁচেছেন। এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার কারণ বইয়ের প্রতি প্রীতি। লাইব্রেরিয়ান মাধববাবু এঁদেরই একজন। ঋষিতুল্য চেহারা, তেমনি মিষ্টস্বভাবের মানুষ, বয়সও তখন সাতষট্টি আটষট্টি—স্কুলের ছাত্র ইংরিজী বই পড়ে—এ পরিচয় পাওয়া মাত্র তিনি যেচে সেধে আলাপ করলেন এবং দুচার দিনের মধ্যেই বন্ধুতে পরিণত হলেন।

এ এক অদ্ভুত সদানন্দ ভোলানাথ মানুষ। সংসার বৃহৎ কিন্তু সংসারের বিশেষ ধার ধারেন না। বই-পাগল মানুষ। তিনি সময় পেলেই আর হাতের কাছে পেলেই বিনুকে ধরে ইংরেজ ফরাসী আর রাশ্যান লেখকদের বই ও সাহিত্যিক-শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা জুড়ে দেন, এবং সে সময় একেবারে সমবয়স্কর মতোই কথা বলেন, সমানে সমানে—ওকে ছেলেমানুষ বলে অবহেলা করেন না, কি ধমক দিয়ে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করেন না। ভুলেই যান যে, দুজনের বয়সের অন্তত পঞ্চাশ বছরের তফাৎ।

বরং একটু যেন—অবিশ্বাস্য হলেও—মনে হয় শ্রদ্ধার চোখেই দেখেন। লাইব্রেরী থেকে তো বেছে বেছে বই দেনই—এগুলো বিনুদের মেম্বার হিসেবে প্রাপ্য নয়; যে একখানা ক'রে বই পাওনা, মার জন্যে বাংলা বই নিতে হয়—মাধববাবু এগুলো নিজের দায়িত্বে দিতে লাগলেন। এতদিন দাদাই একমাত্র সরবরাহকারক ছিলেন, রামমোহন লাইব্রেরী থেকে বন্ধুদের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে আনেন। মাধববাবুর কল্যাণে বিনুর বইয়ের অভাব রইল না। কিছু কিছু বই বাড়িতেও ছিল তাঁর, প্রাণধরে ছেলেদেরও তাতে হাত দিতে দেন না—তাও যোগাতে লাগলেন।

আর একজন জগন্নাথবাবু—এক বাঙালী য়্যাটর্ণীর বাড়ির সামান্য চাকরি করেন, যা কিছু হাতে পয়সা উদ্বৃত্ত হয় বই কেনেন—ইংরেজী বা ইংরেজী ভাষায় অনূদিত বই। তিনিই ওকে হল কেন-এর বই পড়িয়েছেন। হল কেন আর হেনরী উড এর সব বই তাঁর কাছে ছিল। তাঁর আরও আস্থা ওর ওপর। তিনি ওকে প্রবন্ধর সব বই পড়াবার চেষ্টা করেছেন। কোন কোন দাঁত-ভাঙ্গা অংশের মানে বুঝিয়ে দিয়ে, লেখকের কি বক্তব্য তার একটা আঁচ দিয়ে কোথায় কোন লেখকের অসাধারণত্ব তা বলে ওর মনে আগ্রহ জন্মাবার চেষ্টা করেছেন।

আর একজন পাগল ছিলেন সত্যবাবু। তিনিও কেরানী, হয়ত একটু মাঝারি দরের কেরানী। কিন্তু সাহিত্য শিল্পকলা নাট্যকলা—বিশেষ অভিনয়-নৈপুণ্য সম্বন্ধে তাঁর প্রবল উৎসাহ আর অনুরাগ ছিল। তাঁর স্মৃতিকথা বা অভিজ্ঞতা বলার লোক পান না, একমাত্র বিনুই মন দিয়ে শোনে বলে হাতের কাছে পেলেই ধরে কিছুটা গল্প করেন।

বিনু শোনে তার কারণ তাঁর বলার মধ্যে দিয়ে আর একটা অজানা বিরাট জগৎ ওর চোখের সামনে উন্মোচিত হয়। আগের যুগের বাংলা থিয়েটার সৃষ্টির রোমাঞ্চকর ইতিহাস, তার বিপুল গৌরব—গিরিশ ঘোষ, অর্ধেন্দু মুস্তাফী, অমৃত মিত্র, মহেন্দ্র বোস, অমর দত্ত। অভিনেত্রীদের মধ্যে সুকুমারী দত্ত,

গঙ্গামণি, বিনোদিনী, তিনকড়ি—এদের অভিনয় যেন ওঁর বলার গুণে জীবন্ত হয়ে ওঠে ওর কাছে। শুধুই তো বর্ণনা নয় ভদ্রলোক ঐ পাড়ায় ঘোরাঘুরি ক'রে বিস্তর মজার গল্পও সংগ্রহ করেছেন—সত্য ঘটনা কিন্তু তা বানানো গল্পের চেয়েও অদ্ভুত। এখনও জীবিত আছেন দানীবাবু তারা কুসুম—সত্যবাবু বলেন কুশী, নেপা বোস—এদেরও বহু বিচিত্র সব কাহিনী। লজ্জার গৌরবের সাধনার।

এই প্রসঙ্গে কত কি বিদেশী বিখ্যাত নামের সঙ্গেও পরিচয় ঘটে। গ্যারিক, হার্বার্ট ট্রী, এলেন টেরি আরও কত কি। গ্যারিক নাকি গিরিশবাবুর ম্যাকবেথ অভিনয় দেখে গেছেন। এলেন টেরির নব্বুই বছর বয়সে জাতির দিক থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল, তায় দশ পাউণ্ড ক'রে টিকিট, তাই কেনার জন্যে দূরদূরান্তর থেকে লোক এসে তুষারপাতের মধ্যে পথে রাত কাটিয়েছে। তিনি চেয়ারে বসে পোর্শিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ঐ বয়সেও।

কিন্তু শুধুই থিয়েটার যাত্রা নয়—সত্যবাবুর উৎসাহ সব দিকেই। কবে নাটোরে সাহিত্য সম্মেলন করতে গিয়ে রবি ঠাকুরের কি দুর্দশা হয়েছিল, সাহিত্য পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে কার তুমুল ঝগড়া হয়—এসব গল্পের পুঁজিও কম নয়। ক্ষমতা কম, রিটায়ার করে অর্থসামর্থ্য খুব কমে গেছে, এখনও তিনটি আইবুড়ো মেয়ে বাড়িতে—কিন্তু উৎসাহ কমে নি, জীবনের সৌন্দর্যের দিক, রসসৃষ্টির দিক জানবার ও জানাবার। পূর্বস্মৃতি রোমন্থন ক'রেই সে আনন্দ কিছুটা উপভোগ করেন।

এই বৃদ্ধদের সাহচর্য আর বই—এই দুটিই আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়। বইয়ের মধ্যেই শান্তি, প্রকৃত বন্ধুত্ব।

একটা ঘটনা ওর আজও মনে আছে।

স্কুল পাঠ্য বই বাড়িতে পড়ার অভ্যেস কখনও ছিল না। কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে মনে হল এবার কিছু পড়া দরকার। এমন অনেক বই আছে যা ছোঁওয়া পর্যন্ত হয় নি, চেহারাই দেখে নি। যখন আর দিন কুড়ি পঁচিশ আছে—তখন থেকে সত্যিই মন দিয়ে পড়তে লাগল। দাদা ওর প্রয়োজন বুঝে নিজের ঘর ছেড়ে দিলেন। রাত্রি ছাড়া নিভৃতি মেলে না। রাত্রেই অনেকক্ষণ পর্যন্ত পড়তে লাগল তাই।

যেদিন পরীক্ষা শুরু হবে তার আগের দিন আরও বেশী রাত পর্যন্ত পড়ার সংকল্প ছিল। কেরোসিনের একটা টেবল ল্যাম্প ভরসা। চিমনিটা ভাল ক'রে মোছা দরকার। আলমারির মাথার ওপর ছেঁড়া কাপড়ের পুটলি থাকে তার মধ্যে থেকে পরিষ্কার 'ন্যাকড়া' বার করতে গিয়ে দেখল কাপড়ের ভেতর একখানা বই! রগরগে বহু আলোচিত বহু প্রশংসিত ইংরেজী উপন্যাস। এক সপ্তাহে না এক মাসে নাকি এই বই এক লক্ষ বিক্রী হয়েছে। খবরের কাগজে নিজেই দেখেছে খবরটা।

সুতরাং বইয়ের খ্যাতি তো জানাই। কৌতূহল বা আগ্রহ অদম্য। দাদাও ছোট ভাইয়ের প্রকৃতি জানতেন, তাই ভাইয়ের দৃষ্টিতে না পড়ে এই জন্যেই

অমন উদ্ভট জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন।

না, না। এ বই এ চারটে দিন পড়া চলবে না। কিছুতেই না।

তবে একবার পাতা ওলটাতে দোষ কি ? প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়।

গোপনেই নিয়ে গেল। যথারীতি খাওয়ার পর ঘরে দোর দিয়ে শিয়রে আলো রেখে বইয়ের স্তূপ নিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়েই পড়ত, একটা বদভ্যাস। কিন্তু প্রথমে ঐ বইটা পাতা উল্টে একটু দেখবে সে পাতা ওলটানো শেষ হল রাত চারটেয়—অর্থাৎ বইও শেষ হল তখন। একেবারেই খেয়াল নেই, পরীক্ষা বা পাঠ্যপুস্তকের কথা।

বইটার নাম 'ইফ উইনটার কাম্স', শেলীর একটা কবিতার লাইন থেকে নাম নেওয়া। হাচিনসন বোধহয় লেখক। আশ্চর্য, এরপর অনেক বই লিখেছিলেন ভদ্রলোক, কোনটাই আর জমে নি।

অবশ্য এতে একটা উপকার হয়েছিল।

সে বছরই ম্যাট্রিক পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়েছিল। নতুন ভাইস চ্যান্সেলার নিজে বিখ্যাত পণ্ডিত, সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তাঁরই নির্দেশে ইংরেজীর প্রশ্নপত্র সবচেয়ে কঠিন করা হয়েছিল। ইংরেজীটা ছেলে-মেয়েরা একেবারেই শিখছে না, অথচ সেটাই শেখা দরকার—উচ্চশিক্ষা পেতে হলে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে। তিনি সত্যকার উপকার করতেই চেয়েছিলেন।

আর সেইজন্যেই সে বছর সবচেয়ে বেশী পরীক্ষার্থী ফেল করেছিল। চারটে বিষয়ে লেটার পেয়েও ফেল করেছে কেউ কেউ। ওর সহপাঠীদের মধ্যে যাদের সহজে সগৌরবে পাশ করার কথা, তারাও অনেকে ফেল করেছিল। পরের বছর তারা সবাই ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করল। বিনুর সারারাত জেগে ইংরেজী বই পড়ার ফলে—মাথায় গজগজ করছে তখন ফ্রেজ ইডিয়ম—বাছাই করা শব্দ—সে ডংকা মেরে বেরিয়ে গেল।...

এই পরীক্ষার সময়ও আর একটি বাজে কাজও সমান তালে চলছিল—সে সময়ও অব্যাহতি দেয় নি। মা রেগে সারা হতেন, 'ও আবার লেখক, আর্শোলা আবার পাখী। তাতেই এত ভক্ত ওর, না জানি তাহলে তারা কি গণ্ডমুখ্খু।' বিশেষ ক'রে পরীক্ষা ঘনিয়ে আসছে—এ সময় এইসব ছেলেখেলায় বিষম আপত্তি তাঁর। আবার শুধু লেখাই নয়, যাদের কাগজ তারা ভিক্ষে-দুঃখু করে রঙ তুলিও দিয়ে যায়—আনাড়ি হাতে ছবিও আঁকতে বসে। এটা ওরই সাধ—শিক্ষার সুযোগ হল না বলে আপসোসের সীমা নেই ওর।

আর একটা শখ ইদানীং হয়েছিল নাটক লেখার। এটা বোধহয় সত্যবাবুরই সাহচর্যের ফল। ওঁর প্রেরণাতেই বহু নাটক পড়েওছে এর মধ্যে, অভিনয়ও দেখেছে কিছু কিছু। দাদা কোথা থেকে পাস যোগাড় ক'রে কয়েকটা ভাল বই দেখিয়েছেন। এ শখ সেইজন্যেই। নিজেই জানে এখন লিখতে গেলে ঐসব নাটক পড়া ও দেখার অভিজ্ঞতা তালগোল পাকিয়ে অম্ল উদ্গার হবে তবু এই ইচ্ছাটাও চাপতে পারে না, অদম্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু লেখার খাতা বা কাগজ কৈ।

প্রসন্নবাবু যাকে বলেন চোতা কাগজ, তা আছে। দাদার পরিত্যক্ত খাতা অনেক পড়ে থাকে, কোনটার হয়ত মাত্র অর্ধেকটা ব্যবহার হয়েছে, কোনটার তিন ভাগ—এসব কলেজের এক্সারসাইজে লাগে—আঁকজোক কষা, দুর্বোধ্য ডায়াগ্রাম আঁকা। এক একটা থেকে ত্রিশ চল্লিশ পাতা পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতেই গল্প লেখে আজকাল কিন্তু এইসব টুকরো কাগজে টানা নাটক লিখতে মন সরে না। দূর, সে বড় বিশ্রী।

অবশ্য কেন যে মন সরে না, কেন যে বিশ্রী—এ প্রশ্ন করলে সেও উত্তর দিতে পারত না। কেবলই মনে হত ওতে নাটকের অপমান।

এরও সমাধান করে দিল বদ্যিপড়ার একটি ছেলে। ছেলেটি ওর খুব অনুরাগী। লেখা চাইতে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অনেকক্ষণ গল্প ক'রে যেত। ওরই সমবয়সী কিম্বা হয়ত এক বছরের ছোটই হবে। তার কাছেই একদিন শখের কথাটা প্রকাশ করে ফেলেছিল। সে দিন দুই পরে এসে একখানা আনকোরা নতুন বাঁধানো খাতা দিয়ে গেল। কেবল প্রথম পৃষ্ঠায় নাম লিখে ফেলেছিল কে, যার খাতা সে ই নিশ্চয়। সেইটেই একটু নিপুণ হাতে কাটা।

নাটকের যেদিন পত্তন করল গভীর রাত পর্যন্ত জেগে—সেদিন থেকে ঠিক এক মাস পরেই পরীক্ষা।

॥ ৩১ ॥

কলেজে পড়ার স্বপ্ন প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রই দেখে। বিনুও দেখেছিল।

কলেজে পড়ার সুখ অনেক। সকলেই আত্মীয়দের মধ্যে, পাড়া ঘরে, রাস্তায় রেস্তোরাঁয়, ট্র্যামে বাসে ট্রেনে কলেজের ছাত্র দেখে। একখানা খাতা হাতে কলেজে পড়তে যায়, বড় বড় চালের কথা বলে, নামের পদবীর আদ্য অক্ষর ধরে প্রফেসারদের উল্লেখ করে, সাড়ে দশটা চারটে—স্কুলের মতো বন্ধ থাকতে হয় না, কবে কখন কতটুকু ক্লাস করে তার হিসেব পাওয়া যায় না—এ যদি স্বপ্ন দেখার মতো না হয়, তাহলে আর কিসের স্বপ্ন দেখবে।

ওর দাদার অবশ্য এত স্বাধীনতা ছিল না, কাশীতেও কিছু কিছু বই নিয়েই কলেজে যেত, এখানে তো আরও বেশী। বি-এস-সি পড়া অনার্স নিয়ে, খাটুনিও ছিল যথেষ্ট। ফার্স্ট ইয়ারে সেকেন্ড ইয়ারে খাটুনি নেই চমক আছে।

কিন্তু এতদিনের ঈপ্সিত বহু প্রতীক্ষিত এই আনন্দ বিধাতা বিনুর ভাগ্যে লেখেন নি। তার জীবনটাই যেন একটানা আশাভঙ্গের ইতিহাস।

আরও বিপদ কলেজে মন বসে না, ঘরেও টিকতে পারে না। বিষম অশান্তিতে মনে মনেই কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে। এত যে বইয়ের প্রতি প্রীতি, এ কলেজের বিরাট বিখ্যাত লাইব্রেরী হাতের মধ্যে, একটা লোক ক্রমাগত পড়ে গেলে তার কুড়ি বছর লাগবে বই শেষ হতে—তাও পারবে কি না সন্দেহ—সে তো, একটা বইতেও মন বসাতে পারে না। চিরদিন ইতিহাসের বইয়ের দিকে ঝোঁক, মোটা মোটা বই নেয়, কলেজ লাইব্রেরী থেকে। লাইব্রেরিয়ান ঈষৎ কৌতুক ঈষৎ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকান ওর এই বইয়ের নির্বাচনী দেখে।

নিশ্চয়ই ভাবেন ছোকরা চাল দেখাবার জন্যে নিচ্ছে শুধু।

আর দাঁড়ায়ও তাই। নেয়, পাতা ওল্টায়, খানিকটা পড়ে হয়ত, কোনটাই শেষ হয় না। আগেকার দিন হলে, এত বই হাতের কাছে দেখে আনন্দে পাগল হয়ে যেত। এখন কতকটা হরিষে বিষাদ, তার চেয়েও বেশী, ট্যাণ্টালাসের অবস্থা। তৃষ্ণা অগাধ, তীব্র—সামনে সুপেয় পানীয়—তবু তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারছে না।

অথচ কারণটা এত তুচ্ছ আজ মনে হলে নিজেরই হাসি পায়।

পরীক্ষা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সহপাঠীরা সবাই একটা করে টিউশানী ধরেছিল। কেউ কেউ দুটোও, মানে যোগাড় করতে পারলে। সকলকারই হাত-খরচা দরকার। বাবা দাদা এঁদের কাছে চাইতে অসুবিধে অনেকেরই। এখন এমন একটা বয়স এসেছে—সব প্রয়োজনের কথা বলাও যায় না। সিগারেট ধরেছে অনেকেই। অভ্যাসটা এখনও পাকা হয় নি হয়ত, দু এক টার ওপর দিয়েই চলছে, তবু তারও খরচা লাগে।

আরও তুচ্ছ তুচ্ছ কিন্তু রকমারী খরচা। বন্ধু-বান্ধবরা খাওয়ালে তাদেরও একদিন খাওয়াতে হয়। সে সময় খাওয়ানোর খরচা আজকের তুলনায় হাস্যকর—তিন পয়সা জোড়া ডিমের অমলেট, এক পয়সায় এক পীস বড় রুটি, এক পয়সার চা। কলেজ স্কোয়ারের খাবারের দোকানে ঘিয়ে ভাজা লুচি ছিল এক পয়সায় একখানা। এক আনার লুচি নিলে, দু তিনবার ডাল আর আলুর তরকারী নেওয়া চলত, তাতেই পেট ভরে যেত।

তবে পয়সার দামও ঢের। আয়ও কম—সেও হাস্যকর। টিউশ্যানীর মাইনে যৎসামান্য—পাঁচ ছ টাকা, নিচের ক্লাসের ছাত্র পড়ালে। আর তার জন্যেও যথেষ্ট উমেদারী করতে হয়। বিনুর প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। দাদার যা আয় তাতে ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। তাঁর কাছ থেকে এক পয়সা চাইতেও লজ্জা করে। তাও, অভাব বলেই—চাইলেও বিনা কৈফিয়তে পাওয়া যায় না। প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝলে তবে দেন।

মুশকিল হচ্ছে উমেদারী করার। কোথায় কাকে ধরবে? বিনুর আত্মীয় কেউ নেই, পরিচিতদের পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ফলে সবাই যখন ছেলে পড়াতে শুরু করে দিয়েছে, ও তখনও আকাশ-পাতাল ভাবছে, কাকে ধরলে কাজ হয়। দু একজনকে যে বলে নি তা নয়। তবে বন্ধুরা নিজেই প্রার্থী। একাধিক পেলেও তো অসুবিধে নেই, বরং সুবিধে। এখন তিন চার মাস অফুরন্ত সময়—তার পরও, যদি পাস করে এবং কলেজে ভর্তি হয়—দুটো টিউশ্যানী অন্তত অনেক দিন করা চলবে, ফার্স্ট ইয়ারটা তো বটেই।

ললিতের বাবা ধনী না হলেও পাড়ার সম্মানিত লোক। তাঁর ছেলের টিউশ্যানী পাবার অসুবিধে হবে না সে তো জানা কথাই—হয়ও নি। সে পরীক্ষা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার এক মাঝারি-গোছের সরকারী অফিসারের মেয়েকে পড়াতে শুরু করেছিল। এদের পরিবারের সঙ্গে ললিতদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, বহুদিনের হৃদ্যতা। বোধ হয় খুঁজলে একটা সম্পর্কও বেরোবে—বারেন্দ্রদের তো সকলেই সকলের আত্মীয়। মেয়ে পড়ানোর

দায়িত্ব বিশেষ জানাশুনা না থাকলে তখন অল্পবয়সী ছেলেকে কেউ দিত না। মেয়েটি অবশ্য ছোট, বছর দশ এগারো বয়স—সিক্সথ না সেভেনথ্ ক্লাসে পড়ে—কিন্তু মাইনে সে তুলনায় অনেক, দশ টাকা। রীতিমতো ঈর্ষা করার মতোই টিউশানী।

শেষে যখন সকলেই কোথাও না কোথাও লেগে গেল—মাইনে কম-বেশী যাই হোক, একা বিনু বেচারাই শুকনো মুখে ঘুরছে—অজিত বলে এক বন্ধু প্রায় ওকে ডেকে এক টিউশ্যানী ব্যবস্থা ক'রে দিল। দুটি ছেলেকে পড়াতে হবে, একজন সিক্সথ আর একজন সেভেনথ ক্লাসে পড়ে—মাইনে ছ টাকা। বাবার সামান্য আয় কি সব টুকটাক অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করেন, এর বেশী দিতে পারবেন না।

মনটা দমে গেল খুব। দুটো ছেলে দু ক্লাসে পড়ে—ছ টাকা।

অজিত পিঠ চাপড়ে বললে, 'ও কিছু ভাবিস না। ব্লাইন্ড আঙ্কল ইজ বেটার দ্যান নো আঙ্কল। ব্রাদার, ঝুলে পড়ো। ভাল টিউশ্যানী পাও, এটা ছেড়ে দিও। ছেলে দুটো অগা—ওদের যে লেখাপড়া হবে না সে ওদের বাবাও জানে। পাড়ার কারুরই জানতে বাকী নেই, এমন গুণবান ছেলে। তবু এখন থেকেই গাড়োয়ান কি মুটে মজুরদের সঙ্গে মিশলে ষোল বছরেই তাড়িখোর পকেটমার হয়ে দাঁড়াবে—এই ভয়ে নামমাত্র ইস্কুল আর মাষ্টার দিয়ে একটু আটকে রাখা। এই আর কি।'

অগত্যা তাই নিতে হল। না নিয়ে উপায় ছিল না। হাতে এক পয়সা নেই সতেরো আঠারো বছর বয়সে এ অবস্থা দুঃসহ। তার ওপর লজ্জারও অবধি ছিল না। বন্ধুবান্ধবদের সবাই কোথাও না কোথাও লেগে গেছে—ওরই কিছু জুটল না আজ পর্যন্ত—এ যেন ওর একটা অক্ষমতা—নিজের কাছেই লজ্জার কারণ হয়ে উঠেছিল।

অজিত ছাড়া এও পাওয়া যেত না। অপর কেউ যেচে সেধে দিত না।

এই অজিত এক অদ্ভুত ছেলে। ভাল কি মন্দ—এক কথায় হিসেব ক'রে বলা শক্ত।

বিনু এতদিন—যখন থেকে পরিচয় হয়েছে—মনে মনে একটু বিতৃষ্ণার চোখেই দেখত, ঘেন্না করত বললেও বোধহয় বেশী বলা হয় না। সাধ্যমতো এড়িয়ে চলত ওকে।

ওর সহপাঠী নয়। দুবার ইস্কুল বদল করেছে নাকি। পাড়ার ছেলে বলেই—বন্ধুর বন্ধু, এই হিসেবে আলাপ, তুই-তোকারিও চলে। তবে অজিত বন্ধুত্ব করতেও পারে। ললিতদের বাড়ি থেকে এ পাড়া কিছু দূর—তবুও ললিতও এ পাড়ায় আসে ওর সঙ্গে আড্ডা দিতে। অজিতের বয়সও হয়েছে, বিনুর থেকেও তিন চার বছরের বড়। স্বাস্থ্য যাইহোক, গঠন ভাল—বয়স বোধহয় লুকনোও যায় না। অজিত অবশ্য লুকোবার চেষ্টাও করে না। এসবে যত দোষই, থাক, খুব প্রয়োজন না হলে মিথ্যে বলে না, এটা বিনুও দেখেছে মিলিয়ে।

অজিতের বাবা নেই, অনেক ছোট বেলায় মারা গেছেন। ছাত্র যে খুব

খারাপ ছিল তা নয়—মনটা অতি অল্প বয়সেই যৌবনধর্মে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল বলে পড়াশুনোয় আর যেত না। গতবার ফেল ক'রে এবার আবার দিয়েছে—নিজেই বলে 'না আর না। দেখিস এবার ঠিক পাস করব, সেকেণ্ড কি থার্ড ডিভিশ্যন হবে হয়ত, তবে পাস করব ঠিকই।'

এত বয়সে ম্যাট্রিক দেবার এবং মন এই পথে যাবার একটা কারণ ছিল অবশ্যই। পুরো এক বছর ওর নষ্ট হয়েছে ম্যালেরিয়ায় ভুগে, তার পরও ওর মা দীর্ঘ দিন ওকে স্কুলে পাঠান নি, শরীর দুর্বল বলে, 'দু দিন খেয়ে দেখে হেসে খেলে বেড়াক—শরীর সারুক, তারপর ইস্কুলে যাবে। এই রোগা ছেলেটা আমার—দশটার সময় হাতে-ভাতে ক'রে খায়, তাতে কখনও শরীর থাকে।'

কিন্তু এই স্নেহই কাল হয়েছে। এতদিন হেসে খেলে বেড়াবার পর নতুন ক'রে লেখাপড়ায় মন দিতে পারে না। তাছাড়া অনেক কুঅভ্যাস এসে জুটেছে। সে অভ্যাস চালিয়ে যাবারও প্রধান যা বাধা—আর্থিক অসঙ্গতি—তাও ওর ছিল না।

বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে, মার হাতে কিছু গোপন সঞ্চয় আছে। বাড়ি নিজেদের, ছোট বাড়ি অবশ্য, তারও অর্ধেকটায় ভাড়া আছে। এ ছাড়া ঝিলের দিকে কিছু জমিও আছে, তাতে ঠিকে প্রজা বসানো আছে ক ঘর, কেউ বছরে ন টাকা, কেউ বারো টাকা ভাড়া দেয়। তবে প্রজাদের সঙ্গে সম্বন্ধটা ভাল—নিয়মিত খাজনা বা ভাড়া উশুল দেয়। আর কিছু হাতের পুঁজি—অল্পস্বল্প তেজারতিও করেন ভদ্রমহিলা।

সে যাই হোক—কোথা থেকে কি আসছে তা নিয়ে অজিত কখনও মাথাও ঘামায় নি, তার হাতখরচারও অভাব হয় নি কখনও। অবশ্য সে হাতখরচা বড়-লোকের মতো নয়। কখনও মা দেব না বললে, ব্রহ্মাস্ত্র তার হাতে আছে। গোপনে দোকান থেকে খেয়ে এসে, এক বেলা বাড়িতে খাওয়া বন্ধ করে, বলে 'আমার জন্যই যখন এত খরচ হচ্ছে, খাওয়াটাও বাদ দাও। নিজে রোজগার করতে পারি খাবো—নইলে খাবো না।' অতঃপর যা চেয়েছিল তার থেকে বেশী দিয়ে সন্ধি করা ছাড়া মায়ের উপায় কি ?

অজিত নিজেই গল্প করে আর হাসে।

বন্ধুরা হয়ত বলে, 'তা এমনি ক'রেই কি চলবে ?'

'চলছে তো। যদি বিয়ে-থা করতে হয় তাহলে অবশ্য তার আগে চাকরি বাকরি দেখতে হবে। তবে সে আমার এখন ইচ্ছেও নেই, বিয়ে হলেই মার দুর্গতি—সে আমি বেশ জানি। যাক না কিছু দিন। আমার দরকার তো মিটে যাচ্ছে।'

এ 'দরকার' বড় বিচিত্র, তা মেটাবার পদ্ধতিও তাই।

অসুস্থতার অজুহাতে মা ভাল ভাল ওষুধ ও পথ্য খাইয়ে পুষ্ট করেছে, বয়সও কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পেঁাছে গেছে যথাসময়েই, এখনই জীবিকার পিছনে ছোটাছুটি করার কোন কারণ নেই। ওর বাবা শিক্ষক ছিলেন, নিপাট ভদ্রলোক—তাঁর অকাল মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত, ছেলেটিকে সহানুভূতির

চোখে দেখে পাড়ার লোক। আত্মীয়ের মতো মনে করে।

যৌবনে একটা বিশেষ ক্ষুধা দেখা দেয়—অজিতের এ যৌবনধর্ম একটু অস্বাভাবিক রকমের বেশী। এর সব পরিচয় একদিনে পায়নি বিনু। ক্রমে ক্রমে শুনেছে। কিছু বলেছে অজিত নিজেই—তার কাছে এটা বাহাদুরী—কিছু শুনেছে পাড়ার বন্ধুদের কাছ থেকে। ললিতও তার মধ্যে একজন। এতটা বিশ্বাস হত না, হয়ত কিছুই হত না—তবে কিছু কিছু দুই আর দুইয়ে চার নিজেই মিলিয়ে পেয়েছে বিনু।

সুযোগও যথেষ্ট। বিশিষ্ট ভদ্রলোকের ছেলে, পরোপকারী আপাতদৃষ্টিতে ভদ্র সভ্য ছেলে, বিড়ি-সিগারেট পর্যন্ত খায় না, লোকের দায়ে অদায়ে নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। এমন ছেলেকে সবাই বিশ্বাস করে, তার ওপর নির্ভর করে।

একজনের ঘুরে বেড়ানো চাকরি, এক এক সময় বাড়িতে কেউ থাকে না, থাকার মতো তেমন কেউ নেইও—ঘরে অনুত্তীর্ণ-যৌবনা স্ত্রী এবং কিশোরী কন্যা। তাদের কে আগলায়? অজিত আছে, ভয় কি। বাড়িতে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে থাকা সত্ত্বেও এক ভদ্রলোকের স্ত্রী একা থাকতে পারেন না, ভদ্রলোককে অথচ মধ্যে মধ্যে বাইরে যেতেই হয়। সেও অজিত আছে।

তবে অজিত যে এই সব পরোপকারের মূল্য নেয়—তা ভদ্রলোকদের জানার কথা নয়, জানেও না। সে মূল্য শোধ দেয় ঐ ধরনের মধ্যবয়সী অল্পবয়সী বা কিশোরী কন্যার দল। মা ও মেয়ে একই সঙ্গে এই ভদ্রতার ঋণ শোধ করে অনেক সময়—পরস্পরের জ্ঞাতসারেই।

কারও অসুখ-বিসুখ করেছে, শক্ত অসুখ। অজিত আছে, রাতের পর রাত জাগবে। মা ব্যাকুল হন, ছেলের শরীর খারাপ হয়ে যাবে এই আশঙ্কায়—কিন্তু অজিত থামিয়ে দেয় তাঁকে, 'এই তো সারা দিন ঘুমুচ্ছি, তোমার সামনেই। একই তো কথা। ক ঘণ্টা ঘুমুচ্ছি সেটা হিসেব করো। আর পাড়াপ্রতিবেশী এদের জন্যে এটুকু না করলে আর মানুষ কি? তাদের জন্যে না করলে তোমাদের বিপদে তারা এসে দাঁড়াবে কেন?'

অসুস্থ বা মুমূর্ষু রোগীর সেবা করতে গিয়েও পারিশ্রমিক আদায় হয়। হয়ত সব ক্ষেত্রে নয়, যেখানে কেউ নেই, না মেয়ে না অল্পবয়সী ছেলে—সেখানে আর কি হবে। ঠিক এতটাই হিসেব ক'রে যে আসত রোগীর সেবা করতে তাও না, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একটা না একটা কেউ জুটে যেত। আর এ বিষয়ে ওর সাহস ও দক্ষতা অপরিসীম, হয়ত একটা চৌম্বক শক্তিও ছিল। সেটা ঈশ্বর দত্ত, নইলে খুব রূপবান কিছু নয়। বন্ধুরা বলে, অজিত নিজে তো বলেই, এদিকে দৈহিক কৃতিত্বও অসাধারণ রকমের বেশী তার। ক্ষুধাও।

অজিত শাস্ত্রেরও দোহাই পাড়ে মধ্যে মধ্যে। বলে, 'আমাদের হেড স্যার একটা গল্প বলেছিলেন, কে একটা সাপকে নাকি কেষ্ট ঠাকুর একবার কব্জা করেছিল খুব, বলে—তুই এমন ক'রে বিষ ছড়াস কেন রে, কেউ জলে নামতে পারে না। তা সে শালার সাপও তেমনি, উত্তর দিলে, তুমি তো শুনিচি সাক্ষাৎ ভগবান তুমি জানো না কেন ছড়াই। আমাকে বিষই দিয়েছ তা আমি

কি ছড়াব—চিনি? তা আমারও ঐ কথা, ভগা বেটা আমাকে যা করতে পাঠিয়েছে আমি তাই করি।'

এ বিষয়ে ওর রুচিও ছিল বহু বিস্তৃত। পক্ষপাত নির্বিশেষে। সেটাতেই রাগ হত বেশী। আগে তো বিনুর ব্যাপারটা বুঝতেই পারত না। ছেলে দিয়ে কি হয় অনেক পরে একদিন দোলু বুঝিয়ে দিয়েছিল। আগে তো বিশ্বাসই করতে চায় না, 'তুই সত্যি জানিস না ব্যাপারটা? মাইরি? যাঃ, গুল মারছিস!' তার পর বিনু দিব্যি গালতে বুঝিয়ে দিয়েছিল। শোনার পর বহুদিন পর্যন্ত অজিতকে এড়িয়ে চলত সে, পাছে সামনে পড়লে কথা কইতে হয়।

দোলুর কাছ থেকেই অনেক পরে একটা কথা শুনেছিল। ম্যাট্রিক পাশ করার পর—থার্ড ডিভিসনেই পাশ করেছিল অবশ্য, অজিত আর কলেজে পড়বার চেষ্টা করে নি—বৃথা জেনেই। টিউশানী তো করতই, আবার এক মিশনারী ফ্রি মাইনর স্কুলে বিনা মাইনেতে মাষ্টারী নিয়েছিল। সেবা করার অজুহাতে অবশ্যই। ওখান থেকে উপার্জন তো হতই না, খরচাই হত বেশী। ওপরের ক্লাসের ছেলেদের নিয়ে খাবারের দোকানে দেদার খাওয়াত, ঘুড়ি-লাটাই কিনে দিত—তারা অজিতদা বলতে অজ্ঞান ছিল। চোখের একটা বিশেষ ভঙ্গী ক'রে দোলু বলেছিল, 'বুঝতেই পারছিস।'

অথচ, সত্যি সত্যিই কিছু সৎগুণও ছিল। তার প্রমাণও বহু পেয়েছিল বিনু।

কেউ মারা গেলে লোক খুঁজতে যেতে হত না। অজিত খবর পেলে সৎকারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিত। লোকজন যা ডাকবার সে-ই যোগাড় করত, দরকার হলে পয়সাও খরচ করত; পরে তারা নিজে থেকে গরজ ক'রে শোধ দিলে তো ভালই, না হলেও ও মুখ ফুটে চাইত না।

অসুখ শুনলেও—ভারী অসুখ—সে যে নিজে থেকে রাত জাগতে যেত—সব সময়ে শুধু নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতেই নয়। যেখানে সে-রকম কোন সম্ভাবনা নেই—সেখানেও যেত। দান ধ্যানও ওর পক্ষে যতটা সাধ্য করত—তাও গোপনে। একবার একটি ছেলে মা-বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বাড়ি ছেড়ে চলে গিছল, ছেলেটির মা কেঁদে এসে পড়তেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল অজিত—ফিরল ছত্রিশ ঘণ্টা পরে ছেলেটিকে নিয়ে। এর মধ্যে কোথাও একটু বিশ্রাম করে নি। কিছু খায় নি। ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়েছে যে শার্ট গায়ে দিয়ে তার পকেটে মাত্র টাকা খানেকের রেজগি ছিল, ট্রেনে কি গাড়িতেও চড়তে পারে নি, পায়ে হেঁটেই ঘুরেছে।

তবে এই বলগাহীন প্রবৃত্তি একদিন প্রকৃতির নিয়মানুসারেই বিয়োগান্ত পরিণতির কারণ হল ওর জীবনে। একটি মেয়ে একবার ওর বলি হয়েছিল, তখনকার কথা বিনু জানত না, এখানে থাকত না বিশেষ—দোলুর মুখে শুনেছে, যেমনভাবে হয়, তার দিদির সামনেই ঘটনা, সেজন্যে চেঁচাতে পারে নি, কি তেমনভাবে বাধা দিতে পারে নি। পরে মনে মনে গুমরে গুমরেই বোধহয়—যখন একটি অত্যন্ত সৎপাত্রে বিয়ে ঠিক হয়েছে, সকলেই মেয়েটার সৌভাগ্যে

উল্লসিত বা ঈর্ষিত—মেয়েটা পাগল হয়ে গেল। বাবা মা চিকিৎসাদি যথেষ্ট করালেন, তবে আর বিয়ে দেবার মতো প্রকৃতিস্থ হল না। বাড়িতে থাকত কদাচিৎ, পথে পথেই ঘুরত, একদিন ট্রেনে কাটা পড়ল।

এই পাগল হওয়া দেখেই অজিত যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। আর কোথাও যেত না, কারও বাড়িতেই না। এমন কি বিপদে-আপদেও যেত না আর। একটা কি সামান্য চাকরিও যোগাড় ক'রে নিয়েছিল—আপিসে যেত আর বাড়িতে বসে থাকত। বিয়ে করতে রাজী হয় নি কিছুতেই। মার বিস্তর কান্নাকাটিতেও না। মা মারা যাবার পর এক খুড়তুতো বোনকে বাড়ি-ঘরে বসিয়ে তীর্থ করতে যাবার নাম ক'রে বেরিয়ে গিছল, আর বাড়ি ফেরে নি। কেউ বলে সে সন্ন্যাসী হয়েছে, কেউ বলে ঋষিকেশের এক আশ্রমে গোরুবাছুর দেখে, সেখানেই খেতে পায়—এইভাবে দিন গুজরাণ করছে। বিনুর এখন মাঝে মাঝে দুঃখ হয় ওর জন্যে—ওর কথাটা একদিক দিয়ে ঠিকই, কালীয় নাগের উদাহরণ—বিধাতা বিষই দিয়েছে, সে বিষই ছড়িয়ে গেল।

॥ ৩১ ॥

ললিত দূরেই ছিল, তবু স্কুল জীবনে প্রতিদিন দেখা হত, টেস্ট-এর পরও হয় ললিত আসত নয় বিনু যেত। কিন্তু পরীক্ষার পর যেন কেমন হয়ে গেল।

ললিত যে পাড়ায় আসে না তা নয়। আসলে আগে যে গাম্ভীর্য ছিল, যেটার জন্যে ওকে ভাল লেগেছিল প্রথম, সেটাই চলে গেল। অন্য ছ্যাবলা বন্ধুদের সঙ্গে অনায়াসে মিশে গেল। বিনুর মতে যে দলটা একান্ত অনভিপ্রেত সেই দলেই গিয়ে পড়ল। এ দল ছিল, তবে আড্ডা দেবার এমন অখণ্ড অবসর ছিল না। এখন এই আড্ডাই যেন সবচেয়ে লোভনীয় হয়ে উঠল ললিতের কাছে। সকালে একদফা দুপুর পর্যন্ত—বিকেলেও চারটে থেকে সাতটা—কোন মাঠের গাছতলায়, নয়ত পুকুর পাড়ে—নয়ত কারও রকে বসে—শুধুই বাজে কথার মালা গাঁথা—এই চলত। সাতটার পর সকলেরই টিউশ্যনী, উঠে পড়তেই হত। রবিবার টিউশ্যনী থাকত না, সেদিন সিনেমা থাকত, না হলে রাত্রি সাড়ে নটা দশটা পর্যন্ত এই আড্ডায় কাটত।

বিনুও এ দলে মেশবার চেষ্টা করেছে। এখন অভিভাবকের এত কড়াকড়ি নেই, সময়ও বেশী। ললিতের সান্নিধ্য পাবে বলেই শুধু নয়—ললিতকে এই সংসর্গ থেকে মুক্ত ক'রে নিজস্ব ক'রে পাবে—এই আশাতেও।

কোনটাই হয় নি। ললিত নিজে কি করে, কতটা করে, সে পরের কথা, তবে এই সব আলোচনা ঠাট্টা ইয়ার্কিতে রস পায়—এটা ঠিক। স্পষ্টই দেখা যায় সকলেই মিথ্যে বলছে বা বাড়িয়ে বলছে—শুধুই বাহাদুরী নেবার প্রতিযোগিতা, তবু তার মোহ থেকে মুক্ত হতে পারে না। নিজেও যতটা সম্ভব বাড়িয়ে বলে, মিথ্যে বড়াই করে।

বিনু এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে না। তার বাড়িয়ে বা বানিয়ে বলার ইচ্ছাও নেই, উপায়ও নেই। সকলেই জানে যে সে কারও বাড়ি যায় না,

বন্ধুদের বাড়ি গেলেও বাইরে থেকে কথা কয়ে চলে আসে। তার বাড়িতেও কেউ আসে না, অন্তত কোন তরুণী মেয়ে নয়। এমনিই ওর মা দিন-রাতই ব্যস্ত থাকেন, গেলে গল্প করার জুৎ হয় না বলে পাড়ার গিন্নীস্থানীয়রাও বড় একটা কেউ আসেন না দরকার না পড়লে। সুতরাং কাকে নিয়ে কাহিনী চয়ন করবে? মেয়েদের সঙ্গে মেশার একটা সুযোগ আসে বিয়ে বাড়িতে, ওর নিজের বাড়ি কি আত্মীয়ের বাড়ি বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

ওর ছাত্রীও নেই। ছাত্র যা আছে তাদের বাড়িতে ছাত্রর মা ছাড়া কেউ নেই। ললিত যাকে পাড়ায় সে অবশ্য ন দশ বছরের মেয়ে, তবে তার চোদ্দ পনেরো বছরের দিদি আছে। তাকে কেন্দ্র ক'রে বহু প্রণয় কাহিনী রচনা করে ললিত। বিনু এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করলে বন্ধুরা থামিয়ে দেয়, 'যা যা! তুই এসব কি বুঝিস? তোর সেই বুড়ো ইয়ারদের সঙ্গে আড্ডা দিগে যা!'

ললিত যে বাহাদুরী দেখাবার জন্যে, এদের ঈর্ষা জাগাবার জন্যেই প্রতিদিন একটা ক'রে নতুন নতুন গল্প বানাত, তা আজ বোঝে—সেদিন এমনই নিজের একটা কল্পিত জগতে বাস করত মনের মধ্যে—এসব কোন কিছুই মাথাতে যেত না। অথচ, যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে সংসার ও মানুষ সম্বন্ধে তাতে এটা ভেবে দেখা চলত অনায়াসে। কিন্তু সে চেষ্টাও করে নি, এই সব গল্পই সত্যি বলে ধরে নিয়ে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছে। কথাগুলো শোনামাত্র ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে যেত বলে যা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট—তা ওর চোখে পড়ত না।

আজ এটাই ভেবে অবাক লাগে কেন এমন বুদ্ধু হয়ে গিছল সে।

সে হাতে লেখা মাসিকে গল্প উপন্যাস লিখত বটে, তখনও ছাপা কাগজের জগতে প্রবেশাধিকার পায়নি—এবং এসব কাগজই পাড়ার (বা অন্য পাড়ার) ছেলেরাই চালাত, তারাই উদ্যোক্তা ও উৎসাহী,—তবু ছেলেদের কাগজ তো এগুলো নয়। আর সাধারণভাবে 'ছেলেরা' বলা হলেও তাদের বয়স কারও সতেরো আঠারোর কম নয়—ওদিকে ত্রিশ বত্রিশ পর্যন্ত।

দু একজন—যেমন সর্বজিৎ রায়। ওদের পাড়ায় সব চেয়ে ভাল কাগজ—মানে রূপ-সজ্জার দিক থেকে, নয়নাভিরাম যাকে বলে—'বনফুলে'র সম্পাদক তিনি, বিনুরা ম্যাট্রিক পাস করার অনেক আগে এম-এ পাস করেছেন এবং তিনি তার পরও দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন। এই একটিই কাগজ যা এতদিন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। শেষের দিকে তিনটি কর্মীতে ঠেকে ছিল, একজন রূপসজ্জা করত, একজন অক্লান্তভাবে হাতে কপি করত (বিয়ের পর ছেলেপুলে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত চালিয়ে ছিল), আর লেখা বলতে একা বিনু—নামে, বেনামে—গল্প-প্রবন্ধ, নাটক, যা দরকার যোগাত।

এইসব কাগজে কেউ 'ছেলেদের লেখা' বলতে যা বোঝায়—বর্তমানের ভাষায় 'বাচ্চাদের জন্যে'—তা কেউ লেখে না। আবার অভিভাবকদের যদি চোখে পড়ে এই ভয়ে বড়দের জন্যে যেমন সব লেখা হয়—প্রেম, যৌন-আবেগ ইত্যাদি নিয়ে, তাও লিখতে সাহস করে না। কিন্তু বিনু প্রথম বছর দুই বাদ দিয়ে যা লিখেছে বড়দের লেখাই। প্রেমের গল্পই বেশী—তবে তাতে অসভ্যতা অশ্লীলতা থাকে না। থাকার কোন প্রয়োজন বোধ করে নি। ওটা তার মাথাতেও তেমন আসে

না। ভাল গল্প লিখতে পারলে জঘন্যতার পিঁয়াজ রসুন দিতে লাগে না—এখনও ওর এ বিশ্বাস আছে।

সে যাই হোক, প্রেমের গল্প যে লেখে মানুষের মনের গোপন অন্তঃপুরের কোন খবর রাখবে না সে, তা সম্ভব নয়। অন্য সব সময়ে এতদিনের এত বই পড়ার অভিজ্ঞতা কাছে লাগে, লাগে না শুধু এই একটি ক্ষেত্রে।

এমনকি, ওর চিরদিনের 'মোহমুদ্গর' বন্ধু দোলু যখন অবস্থাটা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করত, তখনও ঠিক তার ওপর পুরোপুরি ভরসা করতে পারত না।

দোলুর ভাষা তার চিরদিনের মতোই, স্পষ্ট ভাষণ, 'এঃ, তুই এমন রামবোকা তা তো জানতুম না! রামপাঁঠা নয়, রাম গাধা! এইসব গালগল্প বিশ্বাস করিস এখনও? তোর বয়েস হয় নি, এদের চিনতে পারিস নি! প্রেম এত সস্তা নয়। ওঃ! খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, অমনি সব সুন্দরী মেয়েরা ডজনে ডজনে এসে তোর এই কেলো-ভুলো-হাঁদুদের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে! শুনে যা এই পঙ্জন্ত। কান আছে শুনবি বৈকি! ও নিয়ে ভাবিস কেন, ভাবাটাই তো লোকসান!'

'তবে যে ললিত বলে, 'যেদিন বলবি সেদিনই দেখিয়ে দোব। বাইরে বাঁশবাগানে কি ওদের বাগানে আবডালে দাঁড়িয়ে থেকো—তোদের চোখের ওপর ছাত্রীর দিদিকে চুমো খাবো। তাহলেই হবে তো। আমি একটা চুমো খাবো এই লোভ দেখিয়ে যা খুশি তাই করাতে পারি। বলে সে দিদি ওর কোলে এসে বসে, গায়ে গা দিয়ে দাঁড়ায়, ঘাম মুছিয়ে দেয়—এসব যে কোন দিন বাগানে গিয়ে দাঁড়ালেই নাকি দেখা যায়!'

'সে বলে বলেই তুমি অমনি বেদবাক্যির মতো বিশ্বাস করবে। তুই এক নম্বরের হাঁদারাম। এসব না বললে টেক্‌কা মারবে কি করে? ও তো ভাল ক'রেই জানে তোদের—কে ঐ বাঁশবাগানে মশার কামড় খেয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছে। তাছাড়া সকলেরই তো ঐ সময়ে টিউশ্যানী আছে।...বেশ তো—এক কাজ কর না, একদিন ওকে বলিস যে দোলু বলেছে তার ফেলে দেওয়া মাল, বিশ্বাস না হয় সে ভজিয়ে দেবে।'

'সত্যি?' বিনু আবারও বোকার মতো প্রশ্ন করে, 'তোর মধ্যেও এত রস আছে?'

'ধ্যুস! তুই বড্ড ক্যাবলা, সত্যি! তোর মতো আনাড়ি দেখি নি আর। এই জন্যেই যে যা বলে তাই সত্যি ধরে নিয়ে মনে মনে এত কষ্ট পাস।...কে ভজাতে যাবে তাই শুনি। তাহলে তো মেয়েটাকে ডেকে এনে একটা নির্জন জায়গায় দাঁড় করাতে হয়। সে আসবে কেন!'

তারপর ভুরু পাকিয়ে বলে, 'তা তুই-ই বা এ নিয়ে গোচ্ছার মাথা ঘামাস কেন? তোর শখ থাকে নিজে একটা খোঁজ, আর যদি না থাকে—গ্যাঁট হয়ে বসে থেকে আপনার কাজ করে যা। যে যা করছে করুক না, তোর এত মাথাব্যথাই বা কেন!'

দোলু খুবই ভাল বন্ধু ওর প্রতি টান আছে সেটাও সত্যি—তবু মাথাব্যথা যে কেন সেটা বোঝানো যায় না ওকে।

কাউকেই কি বোঝাতে পারবে কোন দিন?

একদিন একটা তুচ্ছ কারণে—এই ধরনের প্রণয়-প্রসঙ্গেই—কথা কাটাকাটি হয়ে গেল ললিতের সঙ্গে। যে কখনও কটু কথা বলে না, সে প্রথম বলতে গেলে একটু বেশী কঠিন হয়ে যায়, তবু হঠাৎ যে ললিত তার জবাবে অত রূঢ় কথা বলবে, বলতে পারে ওকে—তা কখনও ভাবে নি। আর এই উপলক্ষ ক'রে যে ওর সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেবে—পথে দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে, বিনুর অপ্রতিভ হাসিহাসি মুখে একরাশ কালি ঢেলে দিয়ে—তাও ভাবতে পারে নি।

এ কি করতে কি হয়ে গেল!

এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য।

প্রদীপটা উজ্জ্বল করতে গিয়ে একেবারেই অন্ধকার হয়ে গেল ওর জগৎ, ওর জীবন!

আবার মনকে এক-একবার বোঝাবার চেষ্টা করে, এ এক রকম ভালই হল। সম্পর্ক তো ছিলই না বলতে গেলে—মিছিমিছি লোকদেখানো একটা কল্পিত অন্তরঙ্গতা, মিথ্যা আন্তরিকতা, সৌহার্দ্য রাখার অর্থ কি! এই ভাল এই আঘাতে যদি ওর এবার চৈতন্য হয়।

বোঝার চেষ্টা করে—ললিত এটা চাইছিল অনেক দিন থেকেই। বিনুর এ অভিভাবকত্ব তার ভাল লাগছিল না। এ একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কোন পক্ষেই – ওর মার ভাষায় 'ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা'র প্রয়োজন রইল না। বৃথা মনোকষ্ট—দুজনেরই একটা কপট প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থহীন চেষ্টা—এসবের দায় থেকে অব্যাহতি পেল দুজনেই।

যা নেই, হয়ত ছিলও না কোন দিন—তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে শুধুই হাস্যাস্পদ হওয়া—সকলের কাছে, নিজের কাছে—তাই নয় কি?

কিন্তু এসব সান্ত্বনা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। বাস্তব সত্যকে কোন যুক্তি দিয়ে আবরিত করা যায় না।

শুধু চোখের দেখার জন্যে মন এমন আকুলি বিকুলি করে, কোন স্নেহের বা প্রেমের সম্পর্ক নেই তা প্রমাণিত হওয়ার পরও—তা কে জানত!

দেখা অবশ্য কিছুদিন থেকেই বিরল হয়ে এসেছিল। কদাচিত দেখা হত দুজনের ইদানীং। এখন একেবারেই হয় না। হয় না এই কারণে—পাছে এই বিচ্ছেদটা জানাজানি হয়ে বন্ধুমহলে টিটকিরির তুফান তোলে, সেই জন্যে দূরে থেকে বন্ধুমহলের আড্ডা বা গজালি কোথাও চলছে দেখলে সরে পড়ত বিনু।

কেবল নিজের তরফ থেকেই নয়। দু-একদিন কাছাকাছি গিয়েও দেখেছে, ললিতেরও হয়ত সেই আশংকা, এই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে বহু স-ব্যঙ্গ প্রশ্ন এবং অসুবিধাজনক কৈফিয়তের সামনে পড়তে হবে,—সেও দু-একটা আলতো কথা, তা বিনুকে সম্বোধন করেও হতে পারে বা সাধারণ সকলের উদ্দেশ্যেও হতে পারে—এই ভাবে যেন শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে কোন একটা জরুরী প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ে।

মিছে এ উভয়ে পক্ষেই অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে লাভ কি?

কিন্তু দিন যে বিষাক্ত হয়ে ওঠে, রাত্রে ঘুম নামে না চোখে—এটাও অস্বীকার করা যায় না।

কলেজ যাওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গেল। কোন কোন দিন এক আধবার যায়, এক-আধটা ক্লাস করে, দাদার চেনা অধ্যাপক অনেক আছেন তাঁরা ক্রমাগত পরপর না দেখতে পেলে পাছে দাদার কাছে খোঁজ করেন বা খবর দেন এই ভয়েই—নইলে শুধুই পথে পথে ঘোরে।

আগে গোলদীঘিতে গিয়ে বসত, বসেই থাকত পুরো কলেজের সময়টা। কিন্তু দু-একদিন যেতে যেতেই বুঝল এখানে বড্ড চেনা লোকের ভীড়।

ধনী সন্তান যারা তারাই বেশী। প্রক্সির ব্যবস্থা করে এখানে চলে আসে—সিগারেট খেতে আর বড়মানষী ও সাহেবীয়ানায় পরস্পরকে টেক্কা মারতে—তারা কলেজের মধ্যে যে কোন দিন ওকে লক্ষ্য করেছে বা সহপাঠী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে কখনই মনে হয় নি ওর। কিন্তু এখানে একা এইভাবে বসে থাকতে দেখে—চুপচাপ মুখ শুকিয়ে, সিগারেটও খাচ্ছে না—কাছে এসে দাঁড়ায়, উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বা প্রশ্ন করে। 'ওয়েল হাণ্ড্রেড এ্যাণ্ড ওয়ান, আপনি চলে এসেছেন, কোন প্রক্সির ব্যবস্থা ক'রে আসেন নি—পরে অসুবিধেয় পড়বেন যে!' কিম্বা কেউ বা বলে, 'কি হয়েছে আপনার? অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি? থাকেন কোন্ পাড়ায়? আমার কার কিন্তু রেডী আছে—ছেড়ে দিয়ে আসবে?' এছাড়াও, ওর মতো দু-চার জন নিম্ন মধ্যবিত্ত সহপাঠী আছে, তারা ওখানে দেখলে আন্তরিক উদ্বেগ প্রকাশ করে, এখন থেকে এত ফাঁকি দিলে পরে বিপদে পড়তে হবে সে বিষয়ে সতর্ক করে।

এর চেয়ে পথে পথে ঘোরা অনেক নিরাপদ।

এই দুর্দিনে পাড়ায় ওর একটি আশ্চর্য বন্ধু জুটে গেছে ঠিক দুর্দিনের বন্ধু যাকে বলে, যে দুঃখের ভাগ নিতে চায়।

সে কেষ্ট, বা কেষ্টা।

ভদ্রলোকের ছেলে, ললিতেরই দূর সম্পর্কে আত্মীয় হয়। মা ছাড়া পৃথিবীতে কেউ নেই, মানে তার হয়ে ভাববার তাকে দাঁড় করিয়ে দেবার কেউ নেই। চালচুলো বলতেও কিছু নেই, একজনদের বাড়ির পাকা-দেওয়াল-খড়ের-চাল ঘরে ভাড়া থাকে, তারও ভাড়া বাকী বোধহয় বছর খানেক, মা চেয়ে চিন্তে—বলতে গেলে ভিক্ষে দুঃখু করে সংসার চালান—কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই কেষ্টার। এক বর্ণও বোধহয় লেখাপড়া জানে না, বাংলা পড়তে পারে, হাতের লেখা—দেবেরও অসাধ্য পাঠোদ্ধার করা, ইংরেজী হরফগুলো চেনে এই পর্যন্ত। বিশ্ববকাটে বয়ে যাওয়া ছেলে বলেই পরিচিত। পয়সা নেই বলে মদ খায় না, বা অন্য নেশা করতে পারে না। থিয়েটার করার প্রচণ্ড ঝোঁক, কোন না কোন পাড়ার ক্লাবে পড়ে থাকে, মেয়েদের পার্ট করে, তার জন্যে মেয়েদের মতোই বড় চুল রেখেছে—গর্ব ক'রে বলে, 'আমার পরচুলো লাগে না—হুঁ হুঁ বাবা!' নাচতে বা গাইতেও পারে একটু আধটু—কাজ চলা গোছের। সেখানেই চা আর বিড়ি মেলে, যত খুশি, মাষ্টারদা বা ঐ শ্রেণীর কর্তা-ব্যক্তিরা দু-চারটে পয়সাও দেন—বাকী সময়টা চালাবার মতো। একবার কি একটা বই, 'দোকানদার' না কি নাটকে খুব ভাল পার্ট করতে চীনে সিল্কের পাঞ্জাবী পেয়েছিল সেক্রেটারীর কাছ থেকে।

এই কেষ্টর সঙ্গে বিনু এ অবধি দুটো চারটের বেশী কথা বলেছে কিনা সন্দেহ। তাও যা বলেছে, ললিতেরই খাতিরে—তার আত্মীয় বলে, যদিও ললিত এ পরিচয় বিশেষ দিতে চাইত না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন, সন্ধ্যার সময় অন্ধকারে ললিতের ছাত্রীর বাড়ির সামনের রাস্তার পাশে—যেখানে বাঁশবনে আর একটা বড় তেঁতুল গাছে অনেকখানি অন্ধকারের সৃষ্টি করেছে—সেইখানে গিয়ে একটু উঁচু জায়গা খুঁজছে যেখান থেকে ওদের জানলার মধ্যে দিয়ে ভেতরটা দেখা যাবে—কেষ্ট কোথা থেকে এসে ধরল। বরং বলা যায় লাফিয়ে গায়ের ওপর এসে পড়ল।

পাতলা গোছের চেহারা কেষ্টর, দেখলে মনে হয় ছিপছিপে গোছের কিন্তু রোগা নয়। বয়স হয়ত উনিশ কুড়ি হবে, তবে ক্রমাগত চা আর বিড়ি খেয়ে—অন্য কোন পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে—মনে হয় অনেক বেশী আরও। অল্প বয়সে বোধ হয় কিছু দিন ব্যায়াম করেছিল, সে জন্যে বুকের গঠনটা ভাল হয়েছে, ওপর হাতের গুলি দুটোও বেশ গোলালো, একটু শক্ত হলে পেশীবহুল বলা চলত। বোধহয় নাচার অভ্যেস ছিল বলেই ঐ ছিপছিপে ভাবটা আছে।

খুব ঘামত কেষ্ট, জামা যখনই যা পরুক—খুব শীতের সময় ছাড়া ভিজে সপসপ করত। পাঞ্জাবীই পরত বেশির ভাগ, অস্তিন গুটিয়ে, ফলে দুই হাত দিয়ে স্নান-করে ওঠার মতো দিনরাত ঘাম গড়িয়ে পড়ত দরদর করে।

সেই ঘামসুদ্ধু একটা হাত কতকটা থাবার মতো ক'রে হঠাৎ কাঁধের ওপর বসিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বললে, 'কী দোস্ত্, বন্ধুকে দেখতে এসেছ? তা এখেনে কেন? ...ওহো, হো, সেদিন মনে হল বটে ভাবগতিক দেখে যে কথাবার্তা বন্ধ। ঝগড়া হয়েছে বুঝি? কী, এ বাড়ির ঐ ছুঁড়িটাকে নিয়ে? তুমি মিছে ভাবছ দোস, তোমার যা চেহারা একখানা, তুমি গিয়ে দাঁড়ালে ওসব নলে লাহিড়ী ফাহিড়ী ভেসে তলিয়ে যাবে। তুমিও যেমন!'

চাপাগলায় বললেও, কথাটা কতদূর যেতে পারে, সেই ভেবে বিনুও দেখতে দেখতে ঘেমে নেয়ে উঠল। চারপাশে অন্য বাড়ি আছে, এদেরও বাগান কিছু বিঘেখানেকের নয়—তাছাড়া এ বাঁশবাগান দিয়ে অজিতের যাওয়া আসা আছে রাত্রিবেলা অন্ধকারে—অনেকেই বলাবলি করে শুনেছে, সাপ-বিছের ভয় নেই ওর—এই জন্যেই আরও বলে। সে যদি এসে পড়ে কী কাণ্ড ক'রে বসবে কে জানে। সে আস্তে কথা বলার লোক নয়।

বিনু কথাটা চাপা দেবার জন্যে বলতে গেল, 'না না, যাঃ। ওসব কিছু নয়। এই এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম তাই—'

আবারও একটা সেই থাবার থাপ্পড়।

'বুঝেছি দোস, বুঝেছি। আমরা ঘাস খাই না। আমি কেষ্ট মিত্তির, আমার চোখে যে ধুলো দেবে সে এখনও মায়ের পেটে! তুমি ক'দিন প্রাণের ইয়ার পঞ্চাতেলিকে না দেখে থাকতে পারো নি তাই পাঁদাড়ে বাঁশবনে এসে দাঁড়িয়েছ।' বলতে বলতে বলতে তেমনি নিচু গলায় এক কলি গান ধরে দিল, 'আজু কাঁহা মেরি হৃদয় কি রাজা, কাঁহা কাঁহা ঢুঁড়ত হি হাম!' হাওড়া ডোমজুড় থেকে এক ক্লাব ডাকতে এসেছিল বলে চন্দ্রশেখরে পার্ট করতে হবে—ওমা

দু'দিন গেলুম। গানও গটানো হল—গাড়িভাড়ার পয়সা দেয় না। কে যাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে। হট্। আমি আর যাইনি।'

তারপরই বর্তমানে ফিরে আসে, 'তা ও তো পড়ায় ওদিকের ঘরে, যাতে গিন্নি রাঁধতে রাঁধতে নজর রাখতে পারে—তবে তাতেও যে ননীচোরা ননীচুরি করতে পারে না তা বলছি না—। তবে এখেন থেকে তো দেখার কোন উপায় নেই।'

তারপর কাঁধ ছেড়ে খপ ক'রে ডান হাতের বাহুমূলটা চেপে ধরে কানের কাছে মুখ এনে বলে, 'কেন বাবা বন্ধু বন্ধু ক'রে জান কয়লা করছ। পুরুষে পুরুষে পিরীত হয়? ছোঃ! সেই বিল্বমঙ্গল নাটকে আছে না, চিন্তামণি বলছে এই ভালবাসাটা একটা বাজে মেয়েমানুষকে না দিয়ে যদি ভগবানকে দিতে তো কাজ হত—আমি একবার বাদায় গিয়ে বিল্বমঙ্গল পালা যাত্রা গেয়ে এইচি, আমি থাকোর পার্ট করেছিলুম—এসব আমার মুখস্ত। ঐটেই আমি একটু ঘুরিয়ে বলতে চাই—বন্ধুর জন্যে জীবন যৌবন বিসর্জন না দে যদি কোন মাগীকে ভালবাসতে, সে তোমার পায়ের জুতো হয়ে থাকত!'

তখন বিনু প্রাণপণে চেষ্টা করেছে ঐ বাড়ি থেকে যতটা সম্ভব দূরে যেতে. কেষ্টর বক্তৃতা সহজে থামবে না সে বুঝেছে। গলা ক্রমেই চড়াবে, থিয়েটার করার গলা।

হলও তাই। কেষ্টও ওর সঙ্গে সঙ্গে এসে মাঠে পড়ল, পুকুরপাড়ে একটা নারকোল গাছের গুঁড়ির গায়ে বসে পড়ে ওকেও হাত ধরে জোর ক'রে পাশে বসিয়ে বলল, 'মাইরি বলছি, এই তোমার গা ছুঁয়ে—তুমিও বামুনের ছেলে—মা কালীর দিব্যি—ভালবাসতে হয় তো কোন মাগীকে বাস, কি জিনিস তুই ভাবতে পারবি না। (এক কথায় কেমন করে 'তুমি' থেকে 'তুই'-তে চলে এল, অবাক হয়ে ভাবে বিনু, এত অন্তরঙ্গতা কোন দিনই হয়নি এ পর্যন্ত!) এর স্বাদ পেলে পাগলা হয়ে যাবি—বুয়েছিস? এসব বন্ধু-টন্ধু সিকেয় উঠবে তখন।...এই যে আমি দুটো মাগী কেড়েছি, দুটোই আমার চেয়ে বয়েসে ঢের বড়, একটা বিধবা, আর একটার আধবুড়ো বর আছে, তার চোখের সামনেই পা টেপে বসে বসে, সে জুল জুল ক'রে দেখে। এ নিয়ে কত লোক কত কি বলে, আমি বলি আমার এই ভাল। কচি মেয়ে ধরো, তার পিছু পিছু তোমায় ঘুরতে হবে। খোশামোদ করতে করতে দিশে পাবে না। নিত্যি মান-ভঞ্জনের পালা। আর এ? এরাই আমায় খোশামোদ করে, হাতে পায়ে ধরে।...সত্যি বলতে কি, চ্যাংড়া ছ্যাবলাদের কাজ নয়, ভালবাসা কি জিনিস বুঝতেও মেয়েদের একটু বয়েস হওয়া দরকার! এই যে আমার দু নম্বরটি, চল্লিশের মতো নাকি বয়েস—তা হতে পারে, তাতে কি এল গেল আমার? আমি বেশ আছি, আমার এতেই বেশী সুখ। ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে আমি যদি রাগ করি। যদি বলি, এই, আমার জুতোটা চাট—তাই চাটবে। গরিবের সংসার, বুড়োটা তো ঐ কি চানাচুর-মানাচুর তৈরি ক'রে ইষ্টিশানের ধারে বসে বিক্কিরি করে—কটা পয়সাই বা আসে—তাই থেকেই নিজের ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত ক'রে আমার হাতখরচা যোগায়! এই যে পাজামা দেখছিস, ওর পয়সায়!'

আরও অনেক কথা বলে কেষ্ট। বিনু অবাক হয়ে শোনে। এওকি সম্ভব? এ-যা বলছে সব সত্যি?

এরপর থেকে কেষ্ট যেন তাকে পেয়ে বসে। দেখা হলেই হল, আজকাল আবার দেখা হওয়ার জন্যে ওৎ পেতে বসেও থাকে।

আসলে তার কমবয়সীরা কেউ তাকে বড় একটা ঘেঁষ দেয় না। একটু বোধহয় নিচু চোখেই দেখে। সেটা স্বাভাবিকও, কেষ্টও তা স্বীকার করে। অথচ তারও মনের কথা কাউকে বলা দরকার।

অনেক সুখ-দুঃখের কথা বলে বিনুকে। নিজের জীবনটা নিজেই বরবাদ করেছে, দোষ আর কারো নয়।

'দুষী যদি কাউকে বলতেই হয় তো সে বরং আমার মা। বাবা শাসন করবে—আমি ইস্কুলের ছেলে রাত্তির বেলা বেরিয়ে চলে যাই, দেড়টা দুটোয় বাড়ি ফিরি—মা বালিশে নেপ চাপা দে চুপ ক'রে সদরের কাছে আঁচল জড়িয়ে বসে থাকত। তাও ডাকবার জো ছিল না, বাবা জানতে পারলে কেটে দুখানা ক'রে ফেলবে, মা সেই ঠায় রাস্তার দিকে কান পেতে বসে আছে—পায়ের শব্দ চিনে আমি আসছি বুঝে, নিঃসাড়ে দরজা খুলে দেবে। ভাবত খুব ভাল বাসছে ছেলেকে। আহা, বকুনি খাবে দুধের বাছা! ···দুধের বাছা রাত দুটো পর্যন্ত কি করত, কেন অত রাত অবদি বাইরে কাটিয়ে আসত—তা একবার ভেবেও দেখত না। আশ্চর্য! মাইরি, মা জাতটা এত বোকাও হয়। ঐ যে নাটকে বলে না, স্নেহে অন্ধ—এও তাই।'

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বলে, 'তার ফল এখন ভুগছে! পাড়ায় পাড়ায় ডোকলা সেধে এনে আমাকে খাওয়াতে হচ্ছে। নে ভোগ, আমি কি করব। আমার জীবনটা যে এইভাবে নষ্ট ক'রে দিলি, তার কি? তুই তো দুদিন বাদে পটল তুলবি, আমার গতি কি হবে? দুধের ছেলে আদরের ছেলেকে পথে বসে ভিক্ষে করতে হবে তো!'

'তা তুমি তো ভাই এখনও চেষ্টা করতে পারো। লেখাপড়ার সময় মানুষের যায় না!' বিনু বলে, 'না হয়, স্কুলে যেতে লজ্জা করে প্রাইভেট পরীক্ষা দেবে। কীই বা বয়েস তোমার। সত্যি দ্যাখো, তোমাকেই তো ভুগতে হবে। গোটা জীবনটাই পড়ে আছে!'

'দূর, সে আর হয় না। বুড়ো শালিকের গায়ে রোঁ। কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ। য়্যাদ্দিন করলুম না, আর এখন মন বসে? ঐ নর নরৌ নরা কি লেট এবিসি বি এ ট্রায়াঙ্গেল—এসব পড়তে গেলে হাসি পাবে। না, ও আর হয় না।'

'খুব হবে, হয় না কেন।' বিনু গলায় জোর দেয়, 'এই তো এখনও এইসব মনে আছে তোমার। আর যাই হোক তুমি তো বোকা নও। নিজের ভুলও বুঝেছ, ভবিষ্যতের ভয় আছে। এখন পড়তে বসলে পড়ায় দেখতে দেখতে এগিয়ে যাবে। বল তো আমার অনেক বই এখনও আছে, সেগুলো তোমাকে দিয়ে দিই, কিছু যদি মনে না করো আমিও তোমাকে একটু আধটু সাহায্য

করতে পারি।'

'আরে দোস, বোকা নই বলেই তো বুঝি যে আমার দ্বারা এ বয়সে আর হবে না। যে ছেলের মাথায় অল্প বয়সে মেয়েমানুষ ঢুকেছে—আমার তো পাছার ফুল না ছাড়তে ছাড়তে—তার আর জীবনে কোনো আশা নেই। ঐসব মুখস্থ বলছিস? এ তো এত বাড়ি ঘুরি—ভালবাসে আমাকে অনেকে, পাগলাছাগলা বলে কিছু দোষঘাট নেয় না—তা সেসব বাড়িতে ছেলেরা পড়ে, কানে যায় না?'

তারপর হঠাৎ বলে ফেলে, 'আমি কিন্তু কোন মেয়েকে বকাই নি ভাই, মেয়েছেলেরাই প্রথম আমাকে বকিয়েছে। কিছুই বুঝতুম না তখন। তারপর অব্যেস হয়ে গেল—' বলে চুপ ক'রে যায়।

বিনু আগের কথার জের ধরে, 'তুমি এত বাড়ি ঘোর, তোমাকে পাত্তা দেয়? এই—এইসব ক'রে বেড়াও, থিয়েটার যাত্রা, অন্য দোষও আছে—তারা খবর রাখে না?'

কেমন এক রকমের শান্ত স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'জানে, তবে এও জানে—যারা বিশ্বাস করে, স্নেহ ক'রে বাড়ির ভেতর যেতে দেয় আমি তাদের সে বিশ্বাসের অমর্যাদা করব না। বেইমানী বড় পাপ, বুঝলি। আমার অনেক দোষ আছে স্বভাবে—তবে ওটা নেই। আমি ঐ অজিত নই, বুঝেছিস? যে স্বেচ্ছায় আসে সে আসে। তাও ঐ রকম আধা ভদ্দরলোক—এর ওপরে কখনও উঠি নি। যদিও আমায় প্রেথম যে জুটিয়েছে সে মস্ত ঘরের মেয়ে—এখন বিরাট বড়লোকের বৌ। তবে তখন বলতে গেলে অজ্ঞান ছিলুম। এখন অনেক বুঝি। আমার যিনি দু' নম্বর, এককালে অবিশ্যি সেও বড় ঘরের মেয়ে ছিল, কিন্তু এমন পুরুষের হাতে পড়ল, অমানুষ, বাঁধা চাকরি ছেড়ে ঘরে এসে বসল।···ছেলেমেয়ে মানুষের জন্যেই অল্প বয়েস থেকে পাড়ার বাবুদের মন যোগাতে হয়েছে। নইলে ঐ ভাতারের মুখেও অন্ন জুটত না। সে সব খবর নেবার পর আমি ধরেছি। আমি তো ওদের কিছু দিতে পারি না, ও নিজেই আমাকে চায়। তাতে দোষ কি—বল!'···

আবার কোনদিন বলে, 'কেলাবের মাষ্টারদা, বলে সেও লোভ দেখায়—একটা কারখানা-মারখানায় ঢুকিয়ে দেবে, কিম্বা ওদের তো সরকারী আপিস, বেয়ারার কাজ জোগাড় ক'রে দেবে। সেই জন্যেই কাদায় গুণ ফেলে পড়ে আছি—। আরও একটা বছর দেখব, তারপর আমিও ভাগব।'

'কোথায় যাবে?' বিনু প্রশ্ন করে, 'খেতে তো হবে?'

'সেই জন্যেই তো ওদের কেলাবে জল তোলা থেকে ঘর ঝাঁট দেওয়া সব করি। গোপাল মামা তো ঐ গম্ভীর মানুষ পুজোপাট নিয়ে থাকে, বয়সও হয়েছে ঢের, এ বছরই শুনছি চাকরি ছাড়তে হবে তার মানে ধর ষাট—কিন্তু লোকটা নাচ জানে। কতকগুলো ছোটলোকের ছেলে ধরে এনে তাদের দিয়ে সখীর নাচ নাচায় দেখিস না? গোপাল মামা নাকি শখ ক'রে বড় থিয়েটারের কোন ডান্সিং মাষ্টারের কাছ থেকে নাচ শিখেছিল। ওর কাছ থেকে দু-একটা কাজ আদায় ক'রে নিতে পারলে পশ্চিমের কোন শহরে চলে যাবো। আরে,

এখানে আমি বামুনের ছেলে ভদ্দরনোকের ছেলে—সেখানে কে চিনবে? এখনও বয়েস আছে, গায়ে ক্ষ্যামতা আছে, প্রেথম প্রেথম যদি দরকার হয় কুলিগিরি করব, তাতে কি।···আমাকে একজন বলেছে, সে পেরায়ই ওষুধের ব্যাপারে বাইরে যায় আরা পাটনা মজঃফরপুর গয়া কাশী এলাহাবাদ—সব চষে ফেলেছে—সে আমাকে বলেছে এখেনে যেমন কোন কোন সিনেমায় ছবির সঙ্গে ইণ্টারভ্যালে নাচ দেখায়—সেখেনেও আজকাল তেমনি হচ্ছে। তা চার আনার টিকিটে ছবি নাচ এত যারা দেবে তারা কি আর বাইজীর নাচ দেখবে? আমার মতো নাচিয়েই রাখতে হবে। আমি যখন নাচি এখেনে আমি যে মেয়েমানুষ নই কেউ ধরতে পারে? দেখিচিস তো আমাকে প্লে করতে—বল।'

বলতে বলতে ওর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা দেয়, 'তারপর একবার ইদিকে নাম হয়ে গেলে—। দেখি, অন্য মতলব আছে। উদিকের সব শহরে বেস্তর বাঙালী বাবু আছে তারা মেয়েদের নাচ শেখাতে চায়। সে লোক কে ওখানে?···একবার তেমন কোন লোকের নজর পড়ে গেল—একটা কোন আপিসেও ঢুকিয়ে দিতে পারে। লেখাপড়া না জানি, আদব-কায়দায় হার মানব না, বলি বেয়ারাও তো লাগে আপিসে!···আসলে মা-টার বড়ই খোয়ার হচ্ছে এখেনে। টাকা পয়সা তো আমিই উড়িয়েছি, আমার জন্যেই আজ এমন দুগগতি—বলতে গেলে পথের ভিখিরি—যতই হোক্ মা তো। কোথাও যদি একটু নুনভাত জোটারও ব্যবস্থা হয় মাকে নিয়ে চলে যাবো এখেন থেকে—চিরদিনের মতো।'

বিনু ওর কোন অভিনয়ই দেখে নি, তবু ব্যথা দেবার ভয়েই চুপ ক'রে থাকে।···

মুখে যাই বলুক' ওর দুঃখও বোঝে কেষ্ট। বোধহয় ওই একমাত্র বোঝে।

বলে, 'তুই যেমন। তুই যা চাস, ওকে ভাল পথে আনবি, বড় করবি—ও তার মর্ম কোন দিনই বুঝবে না। তোর এতটা ভালবাসার যুগ্যি নয়। বিশ্বাস কর। আমার রাগ আছে বলে বলছি না। এই হৈ হৈ ক'রে বেড়ানো, আমোদ আহ্লাদ ফুর্তি ক'রে দিন কাটাবে—তারপর একটা চাকরি-বাকরি বে-থা ক'রে ঘর-কন্না করবে—এই বোঝে। এই গোত্তরের লোক, অত বড় বড় কথা বোঝে না।'

আবার বলে, 'দ্যাখ, তোরা তো তবু আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলিস, এই তো পাড়ার এত বাড়িতে যাই—'কই গো মাসিমা, কি কই গো কাকীমা এক গেলাস চা হবে নাকি?' বলে বসি গিয়ে, তারা বকে ঝকে, মানুষ হতে বলে, মায়ের দুঃখু দূর করতে বলে—কিন্তু সে ভালবাসে বলেই বকে, আবার চাও দেয়—তার সঙ্গে যার ঘরে যা থাকে রুটি হোক, পরোটা হোক—নিদেন এক গাল মুড়ি দিয়েও দেয়, কেউ ঘেন্নায় মুখ ঘুরিয়ে নেয় না। ওরা তো আমার আত্মীয়, আমি না হয় বকা, লোচ্চা, বাউণ্ডুলে—কোন দিন আমার মারও তো খবর নেয় না। পরের বাড়ি ঘর জোড়া ক'রে পড়ে আছে—সেই যে বলে না, বসতে লাথি উঠতে ঝ্যাঁটা—সেইভাবে দিন কাটছে। সেও যাক—পুজোর সময় একটা সুতোর খি দিয়েও তো উদ্দিশ করে লোকে! তাও তো মনে পড়ে না। তবে এসা দিন নেই রহে গা বাবা, তাও বলে দিচ্ছি।

॥ ৩২ ॥

শেষে মন স্থির ক'রেই ফেলে বিনু। সে কলেজ ছেড়ে দেবে।

সে যে পড়াশুনো করে না, কলেজেও আসে না, বা এলেও বেশীক্ষণ থাকে না—এটা জানাজানি হয়ে গেছে। সবাই অবজ্ঞার চোখে দেখতে শুরু করেছে, দু-একজন টিটকিরিও দেয়—মিছিমিছি এতবড় কলেজের বেঞ্চি জোড়া ক'রে রেখেছে বলে। ক্রমশঃ দাদার কানেও উঠবে। নিজের ভাগ্য তো ডুবছেই—তাঁর মুখ ডুবিয়ে লাভ কি ?

এ পড়া ওর কিছুই মাথায় ঢোকে না, গোড়া থেকেই অবহেলা করেছে—ইংরেজী বাংলার ক্লাস ছাড়া কোনটাই মন দিয়ে শোনে নি, এখন চেষ্টা করলেও পাস করতে পারবে না। তার থেকে এ পাট চুকিয়ে দেওয়াই ভাল।

তবে তার পর ?

লাঞ্ছনা যা হবার তা তো হবেই। দাদা বসে খাওয়াবেনও না—এটা ঠিক। রোজগার যা হোক একটা করতেই হবে। যেখানে সেখানে—তেমন হলে বামুন মার বোনপোদের বলে কোন কারখানায়, রাজগঞ্জের চটকলে বা লিলুয়ায় রেলের কারখানায় ঢুকতে হবে।

দাদাকে দোষও দিতে পারে না সে। তাঁরও বহু আশা-ভঙ্গ সহ্য করতে হয়েছে। চরম দুঃখ বা অভাবের মধ্যে পড়াশুনো করা, না খেয়ে বলতে গেলে, একখানা কাপড় একটি জামায় দিন কাটিয়ে; বর্ষার দিনে রবিবারও একটু বিশ্রাম হয় নি—সারাদিন মরা উনুনের ওপর কাপড় ধরে শুকোতে হয়েছে—তার মধ্যে টিউশ্যনী—তবু যে এম. এসসিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন এই তো ঢের।

দাদার কতটা আশায় ঘা পড়েছে, কী আশা ছিল, তাও জানে বিনু। বড় লোক হবার নয়, বড় হবার আশা।

বিজ্ঞানেই গবেষণা করবেন, ডক্টরেট পাওয়ার পর অধ্যাপনা করবেন। কিন্তু প্রথম না হওয়ার জন্যে রিসার্চ স্কলারশিপ পাওয়া গেল না। তখন আর অপেক্ষা করবারও সময় নেই। 'নিত্যভিক্ষা তনুরক্ষা' অবস্থা। ঐ যা একটি টিউশ্যনি ভরসা। দুটো করতে হলে আর পড়াশুনো করা যায় না। তখনও বড় চাকরির আশা ছাড়তে পারেন নি। তবু তখনকার দিনের অবিশ্বাস্য মাইনে—পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু তা থেকে তো আটাশ টাকা বাড়ি ভাড়াই চলে যায়। তিনটে লোকের খাওয়া-পরা চলে কিসে ?

এতদিন তবু কনক সত্তর টাকা ক'রে দিতেন। অন্তত দেবার কথা। তবে সে একবারে নয়—দু' কিস্তিতে দিতেন, চল্লিশ আর ত্রিশ ক'রে। কিন্তু এরও কোন নির্ধারিত তারিখ ছিল না, বিস্তর হাঁটাহাঁটি করতে হত প্রতি কিস্তির বেলায়ই। ফলে সব মাসে দু' কিস্তি আদায়ও হত না। এমনিভাবে ছাড় যেতে যেতে কত যে বাদ চলে গেছে, তার হিসেব নেই। ইদানীং ওটাকে মাসিক পঞ্চাশ ক'রে ধরে নিয়েছিলেন দাদা।

এখন তিনি স্পষ্টই বলে দিয়েছেন আর তিনি দিতে পারবেন না। রাধাপ্রসাদকে দিয়ে বলাবার চেষ্টা করেছিলেন মা, তাঁকে উত্তর দিয়েছেন কনক, 'একজনকে মানুষ ক'রে দিয়েছি, চারটে পাস করেছে—আমার চেয়ে বেশী বিদ্বান হয়েছে—আর আমার কোন দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে করি না।'

আসলে বিনুর মনে হয় রাজেন এম এসসি পড়ায় উনি বিরক্ত হয়েছেন, এটাকে স্পর্ধা বলে মনে করেছেন। হয়ত ঈর্ষাই এটা। সেই জন্যেই একটা আক্রোশ অনুভব করেন।

অথচ তিনিও অনায়াসে পড়তে পারতেন, তা পড়েন নি। সবাইকেই বলেছেন, 'ওটা সময়ের অপব্যয়। যে মাষ্টারী কি ওকালতী করবে না, তার গ্র্যাজুয়েট হবার পর পড়ার কোন দরকার নেই। একটু লেখাপড়া জানা দরকার, সে তো হয়েই গেল। রোজগারই যখন করতে হবে তখন অল্প বয়স থাকতেই সে চেষ্টা করা ভাল—দ্য সুনার দ্য বেটার।'

তিনি নিজে উনিশ বছর বয়সে বি-এ পাশ করার পরই ও পর্বে ইস্তফা দিয়েছেন, হাতে অনেক টাকা—ব্যবসায় নামার জন্য অধীর, ব্যস্ত। ব্যবসা সম্বন্ধেও কিছু শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় প্রয়োজন, এটা তাঁর মাথায় যায় নি। অভিজ্ঞতা তো নেই-ই, কোন ধারণা পর্যন্ত নেই। পৈতৃক কনট্রাক্টরি ব্যবসা ধরলেও পিতৃবন্ধুদের সাহায্য পেতেন—গেলেন অনেক লাভের কিংবদন্তী শুনে —এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসা করতে।

ছেলেমানুষের হাতে অনেক টাকা—'মধুগন্ধ লোভী' মোসাহেবের দল তো এসে জুটবেই। তারা যে ওর মাথায় হাত বুলোতে এসেছে এটা বোঝার মতোও অভিজ্ঞতা নেই। অপরের দেখে বা শুনেও সাবধান হতে পারতেন—আসলে এদের স্বার্থান্বেষী চাটুকার বলে ভাবতেও পারেন নি। কাকাদের সঙ্গে পরামর্শ করাটাকে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির অবমাননা ভেবেছেন। এইসব চাটুকারদের হাতেই ব্যবসা চালানোর ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ঘরে ততদিনে সুন্দরী বধূ এসে গেছে—সে নেশা তো একটু লাগবেই।

সে বয়সটা ভবিষ্যৎ ভাবার বয়স নয়। ব্যবসায় যে লাভ না-ও হতে পারে —সে কথা মাথাতেই যায় নি। পৈতৃক বাড়ি বিক্রী করে যে যার অংশ নিয়ে নিয়েছিলেন। সে টাকাতে একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনে নিতে পারতেন, তাও করেন নি। বাড়ি কেনা মানে টাকা ব্লক করা—সে টাকা ব্যবসায় খাটালে ভাড়ার বহু গুণ আদায় হয়ে আসবে—এই তাঁর ধারণা, ফলে সে টাকাও উড়ে গেছে। এখন একটি হোসিয়ারী ব্যবসার কথা একজন বন্ধু বলছেন। সম্ভবত সেটাই হবে। মাসিকপত্রের কথাও মাথায় আছে নাকি।

দাদার আশাভঙ্গ একটা নয়—বহুবিধ। বড় বড় চাকরির দিকেই ঝুঁকেছেন, স্বভাবতই। সে সব পরীক্ষায় পাসও করেছেন কিন্তু তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে সে কাজ পান নি। দিল্লীতে তদ্বির করার লোক ছিল না বলেই এটা হয়েছে, কিন্তু সরকারি চাকরির এ রহস্য জানা ছিল না তখন। স্বাস্থ্য ভাল নয় এ অজুহাতে বার দুই গেছে, স্বাস্থ্য বেশী ভাল এ অজুহাতেও। একবার চোখের জন্যে,

একবার বুকটা পুরো দুই ইঞ্চি ফোলে নি— মাত্র দেড় ইঞ্চিতে থেমে গেছে এটা স্বাস্থ্য খারাপের লক্ষণ, তার মানে বুকে চর্বি। আর একবার সাহেব সার্জন-জেনারেল আবিষ্কার করলেন—মাথাতে চর্বি জমেছে, গোরু খাবার পরামর্শ দিলেন।

শেষে দুরবস্থার শেষ সীমায় পেঁছে সবচেয়ে লজ্জাকর কাজই বেছে নিতে হল—ওঁর উচ্চাশার পক্ষে লজ্জাজনক—সরকারী আপিসের "কনিষ্ঠ কেরাণী"। এ চাকরির পরীক্ষাও দিয়ে প্রথম হয়েছিলেন আগেই, চোখে বেশী পাওয়ার বলে কাজ হয়নি, এবার একজনের সুপারিশে একদিনেই হয়ে গেল। ওঁর ছাত্রের বাবা নামকরা ডাক্তার, এক বড় অফিসার তাঁর মক্কেল, মানে সে বাড়ির ডাক্তার তিনি —তিনি বলাতেই সমস্ত আইন-কানুন ভেঙ্গে অফিসারটি পরের দিনই যাকে বলে 'টুলে বসিয়ে দেওয়া' তাই দিলেন। তখনকার মতো অস্থায়ী। তবে স্থায়ী হতে বেশী দেরীও হয় নি। বিভাগীয় পরীক্ষা দিয়ে উন্নতিও হয়েছে। কিন্তু সেও, যতটা উন্নতি হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি, শেষ পর্যন্তও।

এ অবস্থায় বিধবা মেয়ের মতো বাড়িতে বসে থেকে দাদার ভাত ধ্বংস করা। দাদা যদি বা বসিয়ে খাওয়ান; কঠিন কথা বললেও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন না, মার মুখ চেয়ে—কিন্তু সে কোন্ লজ্জায় কি ক'রে থাকবে? মা নিত্য চোখের জল ফেলবেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবেন। বাইরে বেরোলে বন্ধুর দল আছে। টিটকিরি যদি বা সহ্য হয়, নানাবিধ প্রশ্ন, উপদেশ ও ভাসা ভাসা সহানুভূতি সহ্য হবে না।

কলেজ ছাড়লে বাড়িও ছাড়তে হবে। এ দেশই ছেড়ে চলে যেতে হবে। এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে কেউ চিনবে না, কেউ প্রশ্ন করবে না—এ বয়সে কেন লেখাপড়া ছাড়লে!

এখানে ওর সম্বন্ধে এখনও অনেকের উচ্চ ধারণা আছে। মাধববাবু প্রভৃতি বৃদ্ধের দল ছাড়াও—সাধারণ প্রতিবেশীরাও অনেকে—যারা বাজারে বা লাইব্রেরীতে দেখলে ডেকে কুশল-প্রশ্ন করেন—তার কথায়-বার্তায় ভদ্র চাল-চলনে ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভেবে রেখেছেন, সে কথা বলেনও পরস্পরকে, ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে। তাঁদের কাছে মুখ দেখানোই তো সবচেয়ে কঠিন কাজ।

দুটো দিন রাত ধরে ভাবল। অবশ্য শুধুই এলোপাতাড়ি ভাবা। তার মন আবেগপ্রধান, মাথাতে একটা কিছু ঢুকলে সেটা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত শান্তি পায় না। এ দুদিনও যে ইতস্তত করল, দেরি করল, মার কথা দাদার কথা ভেবেই আরও। মার শরীর খারাপ, সে সাংসারিক কাজকর্মে তাঁকে অনেক সাহায্য করে—এখন সে সব কাজই তাঁর ঘাড়ে এসে পড়বে। সকাল নটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এই নির্বান্ধব পুরে—শূন্য বাড়িতে একা থাকতে হবে।

দাদাকেও কম ফৈজৎ সহ্য করতে হবে না। ইন্দ্র বা বিনু কোথায় গেছে—এ প্রশ্নর উত্তর দিতে হবে অবিরাম। ভাই লেখাপড়া ছেড়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে—এ কথাটা বলাও বড় লজ্জার, বড় গ্লানির।

অথচ সেও আর পারছে না এ ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে।

ছায়া? না, ছায়াও না। মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ধারণা মাত্র, স্বপ্ন-

কল্পনার একটা বিদেহী মূর্তি। তার দুর্গ্রহ আসলে, দুর্ভাগ্যই ঐ ছায়ামূর্তি হয়ে তাকে ধ্রুব থেকে শুভ থেকে তাড়না করছে—অনিশ্চিত অধ্রুব ভবিষ্যৎ-এর দিকে, হয়ত ব্যর্থতার দিকে।

কিন্তু তা জেনেও লাভ নেই। যা তাকে টেনে নিয়ে বা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তার শক্তি অসীম, অমোঘ তার বিধান।

লেখাপড়া কিছুই হল না, হবে না। তাই বলে এখানে বিধবা মেয়ের মতো সংসারের কাজ ক'রে এক ঘরে-বাইরে-বিড়ম্বিত জীবন যাপন করতে পারবে না। অকূলেই ভাসবে, দেখবে ভাগ্য কোথায় নিয়ে যায়।

অনেক ভেবে একদিন ভোরবেলা বাজারটা ক'রে দিয়েই 'আসছি' বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এক বস্ত্রে, পকেটে বাজার-ফেরৎ মাত্র সাত আনা পয়সা।

কোথায় যাবে ?

কি করবে ? কি খাবে ?

সে পরে দেখা যাবে। যেতে যেতে ভাববে। এখনও কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। যেখানে হোক যাবে। হাওড়ায় গিয়ে একটা ট্রেনে চড়বে, ই. আই. আরের। কাশী এলাহাবাদ পাটনা লক্ষ্ণৌ—না না, কাশী নয়। সেখানে এখনও চেনা লোক আছে অনেক। কাশী ছাড়া অন্য কোন শহরে যাবে। বিনা টিকিটে যাবে। পথে চেকার ধরে নামিয়ে দেয়, নেমে যাবে, আবার একটা গাড়ি ধরবে। মারধোর করবে—.? মার খেতে হবে।

শহরে কেন ? শহর ছাড়া ভবিষ্যৎ জীবিকা খুঁজে বার করা বা অবলম্বন করার পথ কোথাও পাবে না। অন্তত সে পারে না। পাড়াগাঁয়ে চিরদারিদ্র্য, সীমিত সম্ভাবনা। কাজ বলতে চাষের কাজ, সারাদিন মাঠে রোদে পুড়ে জলে ভিজে কাজ করলে দিনে দশ এগারো পয়সা মজুরি আর এক সরা মুড়ি। ওদের কেষ্টবাবু মাস্টারমশাই ছিলেন বীরভূমের লোক, তাঁর মুখে অনেকবার শুনেছে।

শহরে অনেক রাস্তা উপার্জনের। মোট বইতে পারে, ঠোঙ্গা গড়ে বিক্রী করতে পারে। চায়ের দোকানে বাসন ধোয়ার কাজ আছে। নিদেন কিছু না জোটে লোকের বাড়ি রান্না করবে। গলায় পৈতে আছে, চেহারাটাও নিহাৎ ছোট জাতের মতো নয়। বামুন না মনে করার কোন কারণ নেই। রাঁধতে জানেও। বাড়িতে মার সঙ্গে রান্না করেছে, মার নির্দেশমতো। যদি চোর ডাকাত ভাবে, এই চেহারার লোক রান্নার কাজ খুঁজতে এসেছে বলে বদ মতলব ভাবে ? স্বদেশী ডাকাত ভাবাও আশ্চর্য নয়। সে স্পষ্ট বলবে, 'বাড়িতে থাকতে না দিতে চান দেবেন না, আপনারা আমাকে দিয়ে রাঁধিয়ে নিন—বাকী সময়টা আমি বাইরে বাইরে থাকব। বাইরের রকে কি রাস্তার ফুটপাথে শোব। তাহলেই তো হল !'

কোনটারই কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। অভিজ্ঞতা থাকা তো সম্ভবই নয়। নিজের কল্পনায়, উপন্যাস পড়া বিদ্যের ওপর নির্ভর ক'রে একটা ভবিষ্যতের ছবি আঁকে, নিজেই মনে মনে তার পক্ষে বিপক্ষে যুক্তির উতোর চাপান দেয়।

দিতে দিতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

বাস্তব ছবি যেটা—বিষাদের ছবিও—সেটা বাড়ির অবস্থা।

মা, দাদা। কিন্তু তা ভেবে লাভ কি ?

বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা গিয়েই অপেক্ষাকৃত একটা চওড়া রাস্তা। এটাই এখানের বড় রাস্তা। সে পথ ধরে কিছুদূর গেলে রেল লাইন, লাইন পেরিয়েও খানিকটা গেলে বালিগঞ্জের দিকে যাওয়ার বড় রাস্তা পড়বে। সেখানে পেঁছিতে পারলে চেনা লোকের ভীড় অত থাকবে না। নিরাপদে চলে যেতে পারবে। আরও অনেকটা হাঁটলে একটা বাস, তাতে মাত্র ছ পয়সা খরচ করলে হাওড়া পেঁছানো যাবে। এই এগারোটা নাগাদ একটা এক্সপ্রেস ছাড়ে, পাটনা যায়। সেদিনই মাধববাবু বলেছিলেন, মাধববাবুর সেজছেলে মধুপুর যাবেন।

কিন্তু অতদূর যাওয়া গেল না। তার আগেই বাধা পেল।

বাধা, কিন্তু আজ মনে হয় শুভবাধা।

লাইন পেরিয়েই মোড়ের মাথায় ছগনলালের বড় খাবারের দোকান। অজিত সেখানে গোটা-দুই বছর বারো-তেরোর ছেলেকে কচুরি জিলিপি খাওয়াচ্ছে।

দূর থেকেই বিনুকে দেখেছে অজিত। বিনু অত লক্ষ্য করেনি। তার তখন চোখ ঝাপসা। বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ছে। মার জন্য দুঃখ তো বটেই, বহুদিনের নিবিড় সম্পর্ক, সে-ই মার একমাত্র অবলম্বন, অন্তত তাঁর দিক থেকে। এ ছাড়া, কোন দিন কোথাও কোন তীরে আশ্রয় পাবে কিনা—এই একূল ও অকূল দুই চিন্তাতেই সমস্ত চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে আছে—তার চোখে পরিষ্কার কিছুই পড়ছে না।

অজিত কিন্তু দূর থেকেই দেখে ওকে চিনেছে শুধু নয়, অবস্থাটাও লক্ষ্য করেছে এর ভেতরই। কোথাও একটা কিছু বিপর্যয় ঘটেছে—এটা অনুমান ক'রে নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই।

'এই, তোরা খা, আমি আসছি। লালু এরা যা খায় দিস, আমি ওবেলা এসে দাম দিয়ে যাবো।' বলতে বলতেই একরকম দ্রুত এগিয়ে এসে হাতটা ধরল, এবং কোন প্রশ্ন করার আগেই এক পাশে, একটু ওরই মধ্যে ফাঁকা জায়গায় টেনে এনে প্রশ্ন করল, 'এই, কোথায় যাচ্ছিস রে, এত সকালে ? মুখ-চোখের অবস্থা এমন কেন ? কারো সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি।···চোখে তো জল ভরে আছে দেখছি। দাদা বকেছে ? না কি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছিস ?'

'কিছু না, ছাড়। যেতে দে। আমার তাড়া আছে।' বলে বিনু হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে অজিত আরও জোরে চেপে ধরল ওর হাতটা। বললে, 'মিথ্যে কথা বলা অব্যেস নেই তো, পারবি কেন। আমার মতো খচ্চর ছেলে হলে বলতিস, মার খুব অসুখ, ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি। তাহলে এ অবস্থাটার সঙ্গে মানিয়ে যেত। শোন, ওসব চালাকি ছাড়। আমাকে তো চিনিস, লজ্জা-ঘেন্না নেই। এখুনি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব। বলব, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। ওপারে বাজার, এখন সবচেয়ে ভীড়, লোকের অভাব হবে না। এক পাল লোক মিলে ধরে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে হাজির করব—সেইটে

ভাল হবে ?'

তারপর নরম গলায় বলল, 'তার চেয়ে কি হয়েছে সোজাসুজি বল। মনের কথা বলার লোক তোর বেশী নেই তা জানি। আর আমাকে বলার কি সুবিধে জানিস তো, যাইহোক, যা-ই ক'রে থাকিস আমার কাছে মন খুলতে লজ্জার কোন কারণ নেই, কেন না আমার আর কোন্ কুকর্ম বাকী আছে ?'

এবার আর বিনুর চোখের জল বাধা মানে না।

রুমাল বার করতেও তর সয় না, জামার হাতায় চোখ মুছতে থাকে।

'এঃ, কেঁদেই ফেললি। চল চল, এখানে না। লোকে হাঁ করে দেখবে। চল, ইস্টিশানে যাই, ওদিকের ডাউন প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা—ওভার ব্রীজের সিঁড়িতে গিয়ে বসি চল।'

এতটা সহানুভূতি এর আগে বিনু অন্য কোন বন্ধুর কাছ থেকে—ওর মতে ভাল ছেলে যারা, বন্ধুত্বের উপযুক্ত—পায় নি।

তা ছাড়া, সে যা করতে যাচ্ছে—কী করবে সেটাই তো বড় কথা—এ ব্যাপারে কারও সঙ্গে পরামর্শও তো করা হয় নি এ পর্যন্ত। কাউকে না বলেও তো থাকতে পারছে না। একজন কাউকে বলতে পেলেও যেন বেঁচে যায়—এই অবস্থা।

ওধারের প্ল্যাটফর্ম তখন একেবারেই জনবিরল। ওভারব্রীজের নিচের দিকের সিঁড়ি কটায় একটু ছায়াও আছে, পাশেই বড় কাঠচাঁপার গাছ একটা। তখন আর যেন তার দাঁড়াবারও শক্তি নেই, গিয়ে নিচের ধাপটাতেই বসে পড়ল। তারপর অজিতের অল্প দু এক কথার প্রশ্নে, আন্তরিকতার আশ্বাস পেয়ে সব কথা খুলে বলল।

বলল অবশ্য—কারণটা নয়, শুধু কার্যটাই। কলেজে পড়া আর তার দ্বারা হবে না, আর তা না হলে বাড়িতেও থাকতে পারবে না। সুতরাং তাকে পালাতে হবে। যেখানে হোক। সেই উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে এসেছে, আজই পালাচ্ছে। এখনই। কোথায় যাবে জানে না। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে যে কোন পশ্চিমের দিকের গাড়িতে চড়ে বসবে। বিনা টিকিটে যাবে। যে কোন একটা শহরে নেমে পড়বে, সেখানে কাজকর্মের চেষ্টা করবে। যতদিন না কোন ভদ্র কাজ পায়, মোট বইবে কিম্বা লোকের বাড়ি বাসন মাজা ঘর মোছার কাজ করবে। সেটা তো পাবে।

'তুই পাগল হয়েছিস। তুইও কাজ চাইতে গেলে লোকে পুলিশ ডাকবে। ভাববে ডাকাতের দলের লোক সন্ধান নিতে এসেছে। মোটও বইতে পারবি না, মুখে যা ই বলিস। সে অভ্যেস থাকা চাই। এক মণ চাল মাথায় ক'রে তুই বিশ পা চল দিকি, তোর চেয়ে ঢের রোগা-পাতলা লোক দেখবি আড়াই মণি বস্তা নিয়ে তেতলায় উঠে যাচ্ছে।···ওসব কথার কথা। এ মতলব ছাড়, এ নিহাৎই বোকামি। কোন একজন জানাশুনো লোক না থাকলে ওভাবে বিদেশে গিয়ে কিছু করা যায় না। না না, ও হবে না। তা ছাড়া ভাত-ভিক্ষের চেষ্টা দেখতে গেলে কলকাতার মতো জায়গা আর কোথাও নেই ইণ্ডিয়ায়।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, 'তুই এখানে

বোস, নয়ত যা ঐ মন্মথর পরটার দোকানের ভেতরে গিয়ে বেঞ্চিটায় ঘাপটি মেরে বসে থাকগে, ওর যা খাবার তৈরি হয়েছে একটু কিছু খেয়ে নে। আমি দেখি মাকে বাকতাল্লা দিয়ে কটা টাকা যদি বাগিয়ে আনতে পারি। আপাতত কোন মেসে তো তোকে থিতু ক'রে দিই। একটা মেস আছে জানাশুনো—আমার মামাতো ভগ্নিপতি ছিল কিছুদিন, আধ মাসের টাকা আগাম দিলে এখন এক মাস নিশ্চিন্ত। মেসটা খুব সস্তা হবে না, আরও সস্তায় মেস আছে হুজুরীমল লেন কি চাঁপাতলার গলির মধ্যে, শুনেছি আট টাকায় সে সব মেসে থাকা-খাওয়া হয়—তবে তাতে দরকার নেই। তোর আখের দেখতে হবে তো—এ মেসটাতে অনেক মাস্টার থাকে শুনেছি, যদি কাউকে জমিয়ে টমিয়ে দুটো একটা টিউশ্যনী যোগাড় করে নিতে পারিস—মেসের খরচটা তো চলবে, বল-মা-তারা-দাঁড়াই-কোথা হবে না। ধর গোটা পনেরো টাকা হলেই আপাতত তোর চলে যাবে।'

বিনুকে একরকম জোর ক'রেই ধরে নিয়ে গিয়ে খাবারের দোকানটার উত্তর দিকে পরোটার দোকানে বসিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে একটা সিকি গুঁজে দিয়ে বললে, 'খবরদার কোন পাগলামি করার চেষ্টা করিস নি। মা কালীর দিব্যি রইল। আমি যাবো আর আসব।'

এলও তাই। বোধহয় কুড়ি পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই চলে এল।

কিন্তু একা নয়। সঙ্গে কেষ্টও এসেছে। এক হাতে লম্বা চুলে চিরুণী চালাচ্ছে, আর এক হাতে কম্বলে মোড়া একটা কি বাণ্ডিল, বিছানার মতো।

একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে অজিত বলল, 'টাকা এনেছি আটটা, মার হাতে আর ছিল না—কিন্তু এর ওপর বিছানা চাইলে কি হত জানিস, মা ঠিক ভাবত আমি কোনদিকে ভাগব, কেঁদে চেঁচিয়ে হাট বসাতো, কেলেঙ্কারির শেষ থাকত না।...আমি ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি—কেষ্টার সঙ্গে দেখা। মনে হল ও তো অনেক জায়গায় যায়-আসে, যাকে বলে সাত হাটের কানাকড়ি—তা ওকে বলতে দোষ কি! তখনও তোর নাম করিনি। বলেছি, এই একটা কম্বল চাদর আর বালিশ যোগাড় ক'রে দিতে পারিস? ভাবছি কোথাও ভাগব মাসখানেকের জন্যে—! তা বলার সঙ্গে সঙ্গে—শালা এমন খচ্চর—বলে কি, 'উঁহু, তুমি তো সে চীজ নও, তোমার রস আলাদা, আর কারও জন্যে'—বলতে বলতেই বলে, 'বিনু, না? কদিন ধরেই দেখছি মুখ কালি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন কথা জিজ্ঞেস করলে জবাব মেলে না, যেন কোন ঘোরে আছে—দু-তিনবার বলার পর জবাব দিলেও আন বলতে ধান বলে। তাই ভাবছিলুম, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। ও শালা বন্ধু বন্ধু ক'রেই গেল।'...তখন আর কি করি, ভাঙতেই হল কথাটা। তা ওস্তাদ আছে, যাই বলিস, আমি মার কাছ থেকে টাকাটা বাগিয়ে রাস্তায় পা দিতেই দেখি ইয়ার আমার রেডী।'

কেষ্টার তখন সিঁথি কাটা শেষ হয়েছে—সরল সোজা বিধবার সিঁথির মতো সাদা রেখা না হওয়া পর্যন্ত শান্তি হয় না ওর—তবে আয়নায় না দেখেও সিঁথি সিধে করতে পারে—বলল, 'কম্বলটা আমার পৈতৃক, 'পেটারন্যাল প্রপার্টি'

আমার—একটু আধটু ফুটো আছে তবে পাতনুচি হিসেবে দিব্যি চলবে, আমাদেরও বিছানার তলাতেই পাতা ছিল, বার ক'রে এনেছি, মা বাড়ি ছেল না ভাগ্যিস, বোদেদের বাড়ি কি সব কন্না করতে গেছে ওদের বাড়ি বে না কি—আর চাদর নিলুম একজনের কাছ থেকে, ফরসা চাদর, কেবল বালিশটাই আমার দুনম্বরের, ওয়াড়টা তাড়াতাড়িতে কাচা হয়নি, পালটে আর একটা দিয়েছে, সেও তেমনি—ভদ্দরলোকের পাতে দেবার মতো নয়, তবে বালিশের ওপর যদি চাদরটা ঢেকে দিতে পারিস বালিশের আবস্তা অত কেউ বুঝবে না।'

দুজনে সঙ্গে গিয়ে পটলডাঙ্গায় গোপাল মল্লিক লেনের এক মেসে থিতু ক'রে দিয়ে এল। মাসে এগারো টাকার মতো পড়ে নাকি, সিটরেন্টে মাসে তিন টাকা, আর খাওয়া সাড়ে সাত আট পর্যন্ত পড়ে যায় এক মাসে। তবে ফী রবিবার মাংস হয়, মাসে একদিন 'ফিস্টি'।

'এখানের চালটা একটু অন্যরকম। তুমি তো জানই অজিত ভাই। আমরা চাই না যে বাজে দুখচেটে লোক আসে। একটু ভদ্রভাবে থাকতে চাই আর কি।' ম্যানেজার বাবু বললেন।

তাঁর হাতে সাতটা টাকা দিয়ে অজিত বাকী টাকাটা বিনুর পকেটে গুঁজে দিল। কেষ্টা বললে, 'বিকেলে আবার আসব, কাপড় জামা তো চাই। দেখি কি করতে পারি। গামছা আমারটা এনেছি—এই যে, পকেটেই থেকে যাচ্ছিল আর একটু হলে—যদি ঘেন্না হয় একটু গরমজল চেয়ে নিয়ে কেচে নিস। তবে কোন খারাপ অসুখ টসুখ হয় নি আমার—বিশ্বাস কর। বাইরে তো যাই নি কখনও। এখন জামা। জামা যে কার কাছ থেকে চাইব, তাই ভাবছি। তোমার যা শ্রীগতর একখানি। না না, তোমার নাম করে চাইব না, ভয় নেই। আমি যখন কারও কাছ থেকে কিছু চাই—কৈফিয়ৎ দিই না। কৈফিয়ৎ যে নেবে না, তার কাছ থেকেই নেব।'

কিন্তু বিকেলে সে আর এল না। এল অজিতই। তবে একটা জামা আর ধুতি কেষ্টই যোগাড় ক'রে দিয়েছে। তার আজ ক্লাবে রিহার্স্যাল আছে—কী একটা নাটকের, সে আসতে পারবে না।

ধুতি কাচা ধোপদস্ত, আর পাঞ্জাবী নয়—শার্ট। তা ছাড়াও একটা গেঞ্জি ঐ মাপের। গেঞ্জিটা নতুন। সেই সঙ্গে দুটো টাকাও পাঠিয়েছে সে—কোথা থেকে বাগিয়েছে—বলেছে, 'এটা ওর কাছে রাখতে বলিস, হাত খরচ তো চাই।'

যাবার সময় অজিত বলে গেল, এবার তোমার হিম্মতে যা পারো! চাকরি-বাকরির আশা ছাড়। গোটা দুই দশ টাকা মাইনের টিউশ্যনী যদি জোটাতে পারো—তাহলেই তো আপাতত মেসের খরচা চালাতে পারবে। সেই চেষ্টাই দ্যাখো।

॥ ৩৩ ॥

তবু ওরা কেউ বিকেলে আসবে—এই একটা আশা ও প্রতীক্ষা নিয়ে এতক্ষণ একরকম ছিল। এবার সেটুকু আশাও ঘুচল, ঘুচল ওখানকার সঙ্গে সমস্ত

সম্পর্ক। আজ এই পৃথিবীতে সে একেবারে একা। কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই এভাবে জীবন কাটাবার, এই ধরনের পরিবেশেও বাস করে নি এ পর্যন্ত। কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষাও নেই, হাতের কাজ বলতে যা বোঝায় তা জানে না—যাতে, কোন বড় না হোক, ছোটখাটো কারখানাতেও কাজ ক'রে খেতে পারে।

একটি ক্ষীণ আলো সামনে আছে, ঘন তমসার মধ্যে—বামুন মার বোনের বাড়ি যাওয়া। তার ছেলেরা একজন রাজগঞ্জের কলে কাজ করে, একজন লিলুয়ার কারখানায়। গিয়ে ধরে পড়লে আঠারো টাকা ছ আনা মাসিক মাইনের একটা কাজ কিম্বা দশ আনা রোজের—জুটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু সে বড় লজ্জার। জানাজানি হবে, তারা বোঝাতে শুরু করবে কাজটা ভাল হচ্ছে না। বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার পড়াশুনো করাই উচিত। হয়ত ওর লজ্জা কমানোর জন্যে সঙ্গে ক'রে এসে পেঁছে দিতে চাইবে। বাড়িতে তখনই অন্তত একটা খবর পাঠাবে—সে বিষয়ে সে নিশ্চিত।

না, সে আর হয় না। এপারে এসে নৌকো ডুবিয়ে দেওয়া যাকে বলে ইংরিজিতে—তাই সে দিয়েছে।

অথচ, চুপ ক'রে মেসে বসে থাকলেও অন্য লোকের সন্দেহের কারণ ঘটে।

প্রশ্নও করবে অনেকে।

কিন্তু কোথায়ই বা যায়।

এপাড়া ওর কলেজের পাড়া। এদিক দিয়ে অনেকে যাতায়াত করে। পথেঘাটে যদি কোন সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? এমনি কেউ বড় একটা তার সঙ্গে কথা বলে না, দু-একজন—যারা তার পাশে বসে তারা ছাড়া। কিন্তু তবু হঠাৎ প্রশ্ন করে বসাও আশ্চর্য নয়, 'কী, আজকাল ক্লাসে যে একেবারেই আসেন না। কি ব্যাপার?'

এই ভয়টাই তার সবচেয়ে বেশী। তার দাদার এত সময় নেই যে, পথে পথে খুঁজে বেড়াবেন।

তবু ভরসা ক'রে সন্ধ্যের আগে একটু বেরিয়েই পড়ল। পথঘাটগুলো চিনে রাখা দরকার। শুনেছে ইউরিনালগুলোয় টিউটার চাই ও টিউশ্যনী চাই—দুরকম বিজ্ঞাপনই হাতে লেখা কাগজে সাঁটা থাকে। সেগুলোও দেখা দরকার।

ঘুরতে ঘুরতে মির্জাপুর স্ট্রীটে পড়ল। সামনে একটা বিখ্যাত কেবিন অর্থাৎ চা-টোস্টের দোকান।

পকেটে তিনটি টাকা আছে এখনও। চা আর কত দাম হবে—দু পয়সা, হাফ কাপ এক পয়সাতেও পাওয়া যায় শুনেছে। চা সে অবশ্য খায় না, এ পর্যন্ত দু'বার দিনের বেশি খায় নি—সর্দি-কাশি হলে বামুনমা ক'রে খাইয়েছেন। টোস্ট তো খাওয়া হয়ই না বাড়িতে। কিন্তু এখন কিছু খাওয়া দরকার। মনের এই হতাশাটা কি চা খেলে কাটবে? সে একটু চা-ই খাবে আজ। চা আর একটা টোস্ট।

এক আনা খরচ। তাতে খাওয়া তো যাবেই, অনেকক্ষণ বসে থাকা যাবে বহু বিচিত্র মানুষের মধ্যে! সেটাও কম লাভ নয়।

আসলে সারাদিন মেসে বন্ধ থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে।

কাজ নেই, বই নেই। চেনা লোকও নেই।

এ কোথায় এসে পড়ল সে।

বারো ফুট গলির মধ্যে বাড়ি, তবু এই দিকটাই যা খোলা। বাকি তিন দিকে বড় বড় বাড়ি। নিরন্ধ্র ভারি দেওয়াল। এদিকে মানে রাস্তার ধারে যে ঘর, তাতে বাইরের দিকে জানলা আছে, বাকি সব ঘরেই, যদিবা জানলা থাকে, সে উঠোনের দিকেই। দুবেলা উনুনে আঁচ দেবার সময় কী ভয়াবহ অবস্থা দাঁড়ায় না জানি।

যে-ঘরটা ওকে দিয়েছেন ম্যানেজারবাবু সেটা ফালিপানা লম্বা ঘর। সামনের দিকে এক স্কুল-মাস্টার থাকেন—নিশীথবাবু, তার কারণ, পিছনের যে জানলা—যার কাছে বিনুর বিছানা পাতার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে, সে জানলা খুললে একটা তিন ফুট মতো পথ আছে, ময়লা জল নিকাশীর জন্যে হয়ত—'সিওয়াড্ ডিচ' বলে লেখা—সেটা এখন আসার সময় লক্ষ্য করেছে,—কোন পথ নয় আদৌ। জানলা খুললেই একটা দুর্গন্ধ আসে। তার চেয়ে ভেতরের উঠানের দিক তবু ভাল, দরজা দিয়ে খানিকটা আলো আসে, হাওয়াও আসে খুব সম্ভব।

চিরদিনই ওদের ফাঁকায় থাকা অব্যেস। জ্ঞান হয়ে যে-বাড়ি দেখেছে, তার ছাদ ছিল, সে এক বিপুল মুক্তি। তার কোন দিকে কোন বাধা ছিল না। আর গলিটা ছোট হোক তাতে দুর্গন্ধ ছিল না। কাশীর বাড়ির দক্ষিণ অবারিত খোলা, বহুদূর অবধি। রাস্তাটা ষোল ফুটের মতো হলেও সামনে কোন্ খাঁ জমিদারদের একটা খোলা জমি পড়ে ছিল, ফলে অনেকখানিই ফাঁকা।

এখানে আসার পরও সামনে-পিছনে বাগানের মতো ছিল একটু—দাদা বলেন বাগানের অপভ্রংশ।

কিন্তু বাগান ছাড়া কি বলবে তাকে? দুটো কলাঝাড় ছিল, আমগাছ, সজনেগাছ, একটা আমড়াগাছ, ওরা দু-তিন রকমের ফুলগাছও লাগিয়েছিল আশেপাশের বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে এনে উঠোনে। এছাড়া গয়লা নটের তো কথাই নেই, রাশি রাশি হত। কাঁটা-নটের একটা একটা ক'রে শাক তোলা হাঙ্গামা, নইলে খেতে খুব মিষ্টি। একটা পাকা উচ্ছের বিচি থেকে উচ্ছেগাছ হয়েছিল। এসবে হাত বুলিয়েও আনন্দ পাওয়া যেত।

এখনকার বাড়িটা একেবারে রাস্তার ওপরে, দুফুট একটা বারান্দা মতো আছে শুধু, কিন্তু ভেতর দিকে অনেকটা খালি জমি আছে। বিনু নিজে আগের বাড়ির আসামী চাঁপাকলার তেউড় এনে বসিয়েছে, একঝাড় বিচেকলা আপনিই হয়েছে। আঁটি পড়ে একটা আমগাছ হয়েছে, সেও বেশ মাথাচাড়া দিয়েছে, হয়ত দু-এক বছর পরেই বোল আসবে। গাঁদাফুল বেলফুলের গাছ লাগানো হয়েছে—দুটো-চারটে ফুলও ফোটে।

আসলে এতদিনের জীবনে আলো-হাওয়ার অভাব বোধ করে নি কোনদিনই। এখানে এই তিনদিক চাপা বাড়িতে সে থাকবে কি ক'রে? সকালে দশটা নাগাদ ও ঢুকেছে; তখন—যারা আপিসে কাজ করে, তারা বেরিয়ে গেছে, মাস্টার-মশাইরা একে একে বেরোচ্ছেন। একটি দুটি ছাত্রকেও দেখল বই-খাতা নিয়ে

স্কুলে যেতে। বোধ হয় বাবা কি কাকা কি মামা—কারও সঙ্গে থাকে। নিশীথবাবু ছিলেন। তিনি ওকে দেখে একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বেজার মুখে বললেন, 'এ-ঘরে আবার দুজন দিচ্ছেন ম্যানেজারবাবু, উনি থাকবেন কি ক'রে? ঐ পচা নর্দমার ওপর একফালি জানলা—না আলো, না হাওয়া—। আমার আবার ছাত্রটাত্র পড়তে আসে; সেও ওঁর খুব অসুবিধে হবে।'

ম্যানেজার অমায়িকভাবে হেসে বললেন, 'আপনাকে তো বললুম স্যার, আর পাঁচটা টাকা আপনি বেশি দিন, ঘর আপনারই থাক। টু সিটেড রুম, বরাবরই দুজন থাকেন। কলকাতার মেসবাড়িতে অত আলোবাতাস খুঁজতে গেলে চলবে কি ক'রে বলুন। তিন টাকা সীট রেণ্ট নেওয়া হয়, তা বৈ একটা লোকের খাওয়ানতেও কিছু মার্জিন থাকে। আমি তো অলেহ্য কিছু বলি নি। আপনিও তো মাস মাস হিসেব দেখেন আমাদের। আপনারাই ধরে ক'রে আমাকে পারমানেণ্ট ম্যানেজার ক'রে দিলেন। আমাকে তো চালাতে হবে। এই তাই ঠাকুর দুজন নিত্যি ঘ্যান ঘ্যান করছে, দুটাকা ক'রে বাড়াতে হবে।'

এরপর আর কিছু বলতে পারেন নি নিশীথবাবু। বোঝা গেল পাঁচ টাকা খরচ ক'রে একাধিপত্যর বিলাস তাঁর ইচ্ছা নয়। হয়ত আয়ত্তেরও বাইরে।

আরও চার-পাঁচদিন যেতে বুঝেছিল কেন আয়ত্তের বাইরে, এবং এত বিরক্তির কারণও।

সন্ধ্যার অনেক পরে মেসে যখন ফিরল, তখন সব ঘরেই আলো জ্বলেছে। কেরোসিনের আলো। টেবিল ল্যাম্প হ্যারিকেন ইত্যাদি। রান্নাঘরে দুটো কুপি।

নিচের রান্নার গন্ধ ও ধোঁয়ার সঙ্গে এতগুলি, অন্তত দশ-বারোটি, কেরোসিন আলোর ধোঁয়া মিলে সমস্ত বাড়িটারই হাওয়া ঘন ক'রে তুলেছে, নিঃশ্বেস নিতে কষ্ট হয়, চোখ জ্বালা করে।

একবার মনে হল ছুটে বাইরে চলে যায়, রাত দশটা পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আসে। কিন্তু দৈহিক ক্লান্তিও অপরিসীম। সারাদিনের উদ্বেগ দুশ্চিন্তা, যাদের চিরকাল নিজের থেকে নিম্নস্তরের জীব ভেবেছে, তাদের কাছ থেকে সাহায্য ও উপদেশ নেওয়ার গ্লানি ও অপমান, আত্মীয়-বিচ্ছেদ-ব্যথা··· এবং অবিশ্রাম ঘুরে বেড়ানো, হাঁটা—সব জড়িয়ে পা যেন ভেঙে আসছে।

আর, এইখানেই তো থাকতে হবে, দিনের পর দিন। কতদিন তাই বা কে জানে।

সুতরাং কোথাও আর যাওয়া হল না। কোনমতে ঘরে ঢুকে সেই নালার ধারের ঘুলঘুলি মতো জানলাটা খুলে দিয়ে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। জামাটা খোলারও আর ক্ষমতা নেই যেন। জানলা দিয়ে পচা গন্ধ আসছে, তা আসুক। তবু বাতাস আসছে একটু—আর সে এত ভারি বা ঘনও নয়।

নিশীথবাবু তখন একটি ছাত্রকে পড়াচ্ছেন। একটা চ্যাটাইয়ের এক প্রান্তে বিছানাটা গুটনো, ওঁরা তার পাশে সেই চ্যাটাইয়ের ওপরই বসেছেন দুজনে। সামনা-সামনি নয়, পাশাপাশি, বোধহয় আলোর অসুবিধার জন্যেই।

ক্ষয়া-ঘষা গোছের চেহারা নিশীথবাবুর। ঠিক বেঁটে বলা যায় না—সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা হবেন হয়ত। পাকাঁসিটে চেহারার জন্যেই বয়স আন্দাজ করা শক্ত, চল্লিশও হতে পারে, পঞ্চাশ হওয়াও অসম্ভব নয়। দু-একগাছা চুলে পাক ধরেছে, সরু করে কামানো গোঁফের মধ্যেও লক্ষ্য করলে পাকা চুল দু-একটা দেখা যাবে। আদ্দির পাঞ্জাবী পরা, মাথায় সযত্নরচিত য়্যালবার্ট টেরি। অর্থাৎ তরুণ সাজবার চেষ্টা।

ও যখন ঘরে ঢুকল, নিশীথবাবু তখন ছাত্রটির পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে কি বোঝাচ্ছিলেন বা গল্প বলছিলেন কিছু। বিনুকে দেখে সরিয়ে নিলেন হাতটা। বিরস কণ্ঠে শুধু ভদ্রতার প্রয়োজনেই নিতান্ত অপ্রয়োজন প্রশ্ন করলেন, 'কী, ঘুরে এলেন ?'

বিনুও সংক্ষেপে 'আজ্ঞে হ্যাঁ' বলে ভদ্রতার কর্তব্য সেরে শুয়ে পড়ল।...

একটু পরে, ক্লান্তি ও অবসাদ এবং দুঃসহ হতাশার একটা মানসিক যন্ত্রণা কিছুটা কমতে, অথবা জোর ক'রেই তা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসল। পরিবেশটা দেখার ঔৎসুক্যে সমস্ত অবসাদ ছাড়িয়ে উঠবে এও স্বাভাবিক। অল্প বয়স, সমস্ত মানসিক দুঃখের মধ্যেও জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল যেতে চায় না।

দেখল—শুধু এ-ঘরই নয়, মোটামুটি মেসের ভিতরের চেহারাটাও এখান থেকে যতটা দেখা ও বোঝা যায়। সব ঘর থেকেই বেরোতে বা ঢুকতে হলে—অন্তত এই দোতালায়—দুহাত চওড়া বারান্দাটুকু ভরসা। সকলেই সামনে দিয়ে যাতায়াত করছে। ওপরে একটা বাথরুম আছে—যাওয়া-আসা এ সময় সেজন্যে আরও বেশি, তাদের কথাবার্তা কানে যাচ্ছেই, তাতেই অনেকটা দেখা বা বোঝা হয়ে যায়।

ক্রমশ, আর একটু রাত হতে একে একে সবাই ফিরলেন। মাস্টারমশাইয়ের দল, আর যাঁরা দোকানে কাজ করেন—তাঁরা ফিরবেন রাত সাড়ে ন'টা-দশটায়। মাস্টারমশাইরা স্কুলের ছুটির পর কেউ দু-তিন দফা কোচিং ক্লাস করেন, কেউ দু-তিনটে টিউশ্যনী। আপিসের পর বাবুরাও অনেকে টিউশ্যনী করেন—তাঁদেরও এইটে ফেরার সময়। এই সময়টায় যেন রূপকথার ঘুমন্ত পুরী নতুন ক'রে জাগল। হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজব, খেলার ফলাফল আর রাজনীতিক জ্ঞান সম্বন্ধে প্রচণ্ড তর্ক—তার সঙ্গে খিস্তিখেউড় ইত্যাদিও।

এই সময় কিছু কিছু স্নানের পালাও দেখা গেল, কেউবা শুধুই গা ধুলেন কেউ অত রাত্রেই কাপড়ে সাবান দিতে বসলেন, সকালে তাঁদের সময় হয় না।

কেরোসিনের ধোঁয়া তো ছিলই, রান্নার তেলের ধোঁয়াটা একটু কমে এসেছিল এতক্ষণে, এখন অন্য ধোঁয়া যোগ হয়ে বাতাস দুগুণ ভারি হয়ে উঠল। অসংখ্য বিড়ির ধোঁয়া। একজন আসবার সময় দু-আনায় একভাগা ইলিশ মাছ এনেছিলেন, তাঁর ঘরে শিশিতে একটু তেল থাকেই—তিনি ঠাকুরকে খোশামোদ ক'রে তা ভাজিয়ে নিচ্ছেন। ফলে সব মিলিয়ে একটা বিশ্রী গন্ধ।

ধোঁয়া আর কোলাহল। এঁদের সরব (উচ্চরব বলাই উচিত) তর্ক-বিতর্ক আলোচনার মধ্যেই যে দু-চারটি ছাত্র আছে তারা চেঁচিয়ে পড়ছে। এটা

অভিভাবক আসার সময়, সুতরাং ঘুম পেলে চলবে না, পড়তেই হবে। অনেক অভিভাবকের সেটা পড়াবারও সময়। চারিদিকের এই হট্টগোল এবং আদিরস-ঘেঁষা ইয়ার্কি'র মধ্যে তাদের মাথায় বা মনে কি ঢুকছে কে জানে। এইসব হাল্‌কা আলোচনা ও সাধারণ আচরণের মধ্যেও কিছু কিছু নীচতা ও মন-কষাকষিও প্রকট হয়ে উঠছে। আজ প্রথম দিন। তবু এই সামান্য সময়ের মধ্যেই তা বুঝতে অসুবিধে হল না।

আরও লক্ষ্য করার সুবিধা, বিনু অন্ধকারেই নিঃশব্দে শুয়েছিল, ওর অস্তিত্বই কারও টের পাবার কথা নয়। ও যখন এসেছে এঁরা তখন ছিলেন না, এখনও তার অস্তিত্ব ওদের গোচরের বাইরে। অবশ্য টের পেলেও যে কারও কিছু যেত আসত তা নয়। তেমন কোন বিবেচনা বা অন্য সুবিধা-অসুবিধা ভাববার মতো দুর্বলতা থাকলে বোধহয় মেসে বাস করা যায় না।

অন্ধকারে শুয়েছিল তার কারণ ও আসার পরই নিশীথবাবু গুজগুজ ক'রে অনেকক্ষণ ছাত্রর সঙ্গে কি কথা বললেন, পড়াচ্ছেন কিনা তা ঠিক বোঝা গেল না—তারপরই যেন শূন্যে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে অদৃশ্য বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে বললেন, 'এ-গোলমালে মা সরস্বতী নিজে এলেও পালাতেন। তুই-ই বা কত রাত করবি আর, আবার আমাকেই এগিয়ে দিতে যেতে হবে—চল, বরং ছাদে যাই—এটুকু সেরে দিই—'

তারপর বিনুর সুবিধা বা অসুবিধা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না ক'রেই, ঘরের অদ্বিতীয় আলোটি নিয়ে চলে গেলেন ছাত্রর সঙ্গে। 'আপনি তো শুয়েই আছেন, আলো নিয়ে গেলে খুব অসুবিধে হবে না তো?' এটুকু শুধুলেই যথেষ্ট হত—বিনুর আপত্তি করার কোন কারণ নেই, কিন্তু নিশীথবাবুর সেটুকু ধৈর্য বা ভদ্রতাবোধও দেখা গেল না। নিশীথবাবুর ওর অস্তিত্বটাই যেন মনে পড়ল না। তবে এটাও স্পষ্ট যে, সেই অস্তিত্বের জন্য তাঁকে ছাদে যেতে হল।

তবু তখন বিনু ভেবেছিল হ্যারিকেনটা নিশীথবাবুর সম্পত্তি, পরে এক চাকর—বনমালী বলে—একদিন সব আলো সাফ করা ও তেল ভরার সময় বলেছিল, প্রতি ঘরে একটা করে আলো এ-মেসের এজমালি ব্যাপার, তার বেশি দরকার হলে বাবুরা মোমবাতি কেনেন।

তবু একটু একটু ক'রে নিশীথবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়। একঘরে বাস যতই হোক, কথা না বলে তিনিও থাকতে পারেন না।

পূর্ববঙ্গে বাড়ি, বাবাও সেখানের এক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, এখনও কোন এক মাইনর স্কুলে পড়ান, বারো টাকা মাইনেয়। জমিজমাও আছে কিছু—তেমনি পরিবারও বড়। একান্নবর্তী সংসারে উনত্রিশটি প্রাণী নিশীথবাবুকে বাদ দিয়েও। তাতেই বসে খাওয়ার কোন উপায় নেই।

নিশীথবাবু বিয়ে করেছেন, একটি সন্তানও হয়েছে, কিন্তু দেশে যে বিশেষ যান না সেটা তাঁর কথাবার্তা থেকেই কিছু কিছু বোঝা গেল। বনমালীও বলল অনেক কথা। বনমালী কে জানে কেন, দুদিনেই বিনুর অনুরক্ত হয়ে উঠল খুব। শুধু সে কেন, ছোকরা ঠাকুরটিও। তার নাম পুরুষোত্তম,

এদের সকলেরই কটক জেলায় বাড়ি, পুরুষোত্তম অপেক্ষাকৃত ছেলেমানুষ, তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স হবে বড়জোর।

ঠাকুর-চাকরদের তার প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণ—এ-মেসের বড় একটা কেউ এদের মানুষ বলে মনে করেন না; এরা চোর, এবং বদমাইশ ধরেই নিয়েছেন সকলে, সেইভাবেই কথা বলেন। কেউ কেউ অকারণেই তিম্ব করেন মধ্যে মধ্যে, বলেন, এদের ঢিট রাখতে গেলে এটা দরকার, নইলে মাথায় উঠে বসে।

বিনুই বোধ করি প্রথম ব্যতিক্রম। সে সদয় আচরণ নয়—তার মধ্যেও একটু অমর্যাদার ব্যাপার আছে, আর সে বিষয়ে এরা সচেতন—সহৃদয় আচরণ করত, সমানে সমানে কথা বলত, ঠাট্টা-তামাশা করত, ওদের সুখ-দুঃখের গল্প শুনত, দেশের কথা, তাঁদের সামাজিক নিয়ম-কানুন, প্রথা ও আচার, সংসারের হাল—প্রশ্ন ক'রে ক'রে জানত। দারিদ্র্য তো অপরিসীম, তবু এদের এখনও কিছু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট আছে, যা ঐ বাবুদের নেই।

বিনু পুরুষোত্তমের গায়ে হাত দিয়ে কথা কইত, হাত ধরে টেনে নিজের কম্বলে বসাত। ঘরে কাজ করতে এলে বনমালীকে ফরমাশ করত যথেষ্ট কুণ্ঠার সঙ্গে—'কোথাও থেকে এক পয়সার বেগুনি কিনে আনতে পারো বনমালী?'

তাতেই ঠাকুর চাকররা তিন-চারদিনের মধ্যে ওর আপনজন হয়ে উঠল। পুরুষোত্তমের হাতে ওর ভাত বেড়ে দেওয়ার পালা এলে ভাতের মধ্যে বা চচ্চড়ির সঙ্গে অতিরিক্ত একখানা মাছভাজা গুঁজে দিত। বনমালী দু-তিন বাবুর চা আনলে তা থেকে ঠিক একটু বাঁচিয়ে ওকে দিয়ে যেত।

দুপুরবেলা স্নানাহারের আগে, বাবুদের পালা মিটলে বনমালীর একটু বিশ্রাম ক'রে নেওয়ার অভ্যাস ছিল। কোথাও পা ছড়িয়ে বসে দু-হাতে নিজের পায়েই হাত বুলোতে খানিকটা বকতে পারলে তার সকাল থেকে চরকির পাক ঘোরার কষ্ট খানিকটা লাঘব হত। সে-সময় বিনু ছাড়া অন্য কোন বোর্ডারই থাকতেন না। সুতরাং আড্ডাটা ওর ঘরেই জমত। বনমালী বক্তা, বিনু শ্রোতা। বিনুই তাকে জনমেজয় ও বৈশম্পায়নের কথাটা শুনিয়েছিল—মহাভারতের কথা সাধারণের মধ্যে কেমন ক'রে প্রচার হল—সেই প্রসঙ্গে! তাতে বনমালীর আরও মজা লাগত এক এক সময় নিজের বক্তব্য বন্ধ রেখে বলত, 'কেমন আপনার সেই জন্মশোধ না কি—তার মতো লাগছে?'

এ-আড্ডায় বয়স্ক ঠাকুরটি—পুরুষোত্তমের কাকাও এসে বসত মাঝে মাঝে। তবে সে দৈবাৎ। পুরুষোত্তমই আসত বেশি। এদের কাছে প্রতিটি বোর্ডারেরই কিছু না কিছু খিটকেল জমা আছে। ওদের তো বলবারই ইচ্ছে—কাউকে ভাগ দিতে না পারলে এমন মজাদার সঞ্চয় অর্থহীন হয়ে পড়ে। বোর্ডারদের মধ্যে এতদিন এ-রসের রসিক শ্রোতা পায় নি। এখন বিনুকে পেয়ে তাদের যে গল্পের ঝুলি খোলার উৎসাহ বেড়ে যায়। বিনুর তো জানার উৎসাহ আছেই। মানুষের গল্প শোনার কৌতূহল ওর আজীবন।

এদের সঙ্গে মিশে, এদের মুখে বাবুদের গল্প শুনে নতুন একটা জগৎ খুলে গেল ওর চোখের সামনে। এতদিন ওর দৃষ্টি আর অভিজ্ঞতা যেন বাঁধানো আয়নার মতো ঘরের আলমারির মধ্যে বন্ধ ছিল। মার বুক-কেসের বইগুলোর

মতোই ধারণা কল্পনা ছিল সংকীর্ণ, একটা গণ্ডীর মধ্যে আবন্ধ। এতদিনে সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষ, আসল মানুষের সঙ্গে দেখা গেল যেন।

এদের কাছে এসব নির্দোষ কৌতুক মাত্র। বিনুর যে বিস্ময় তা তো ওদের নেই-ই—কোন ঈর্ষা বা অপমান-বোধের জ্বালাও নেই। এসব বাতিক বা আধা-পাগলামি বলেই ধরে নিয়েছে ওরা। সহজ ও স্বাভাবিক হিসেবেই।

এই সঙ্গে একটা কথা এই প্রথম বুঝল বিনু—এইসব সেবক-শ্রেণীকে যারা মূর্খ বা নির্বোধ কি অন্ধ ভাবে—তারাই মূর্খ ও নির্বোধ।

বোধহয় নিজেদের চেয়েও এরা বেশি চেনে বাবুদের। তাঁদের সব দুর্বলতাই এদের কাছে ধরা পড়ে যায়। এই তথাকথিত 'বাবু' বা মনিবদের মনের অতি সংকীর্ণ গলি-পথেও এদের অবাধ গতিবিধি।

এর অনেক বছর পরে—তখন প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পা দিয়েছে বিনু—এক ট্যাক্সী ড্রাইভারের মুখে শুনেছিল এই কথাটাই। এই ধরনের কথা। হাসতে হাসতে বলেছিল, 'বাবুরা গাড়িতে বসে যেতে যেতে যে সব কথা বলেন আর যে সব কীর্তি করেন—শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। আমরাও যে এক একটা রক্ত-মাংসের মানুষ, আমাদের চোখ আছে, কান আছে—সেটা ওঁদের মনেই থাকে না।'

সেদিন সঙ্গে সঙ্গেই ওর এই বনমালী আর পুরুষোত্তমের কথাগুলি মনে পড়ে গিছল। 'কাছে আছে যারা' তাদের অস্তিত্বের কথা কত সহজে ভুলে যায় মানুষ—আর কী ভুলই করে।

নিশীথবাবুর স্বভাবও—যা বুঝল—অজিতের ধরনের। সেই জন্যেই স্বতন্ত্র ঘর প্রয়োজন ওঁর, অথচ সেই কারণেই স্বতন্ত্র ঘরের জন্যে তিন টাকা অতিরিক্ত সীটরেণ্ট দেবার সামর্থ্য নেই।

কথাটা শুনতে হেঁয়ালির মতো লাগলেও হেঁয়ালি নয়, অতি পরিষ্কার। নিশীথবাবু ছাত্রদের বেছে বেছে নেন, যাদের পছন্দ হয় তাদের—টাকা নিয়ে পড়ান খুব কম। টাকা দেবার ছাত্র যে জোটে না তা নয়—বড় ইস্কুলে কাজ করেন, ছাত্রর অভাব কি? কিন্তু টাকা নিয়ে পড়াতে গেলে বেশির ভাগই গবেট বা 'আনইণ্টারেষ্টিং' ছাত্রকে পড়াতে হয়। সে ওর ভাল লাগে না। (এই 'আনইণ্টারেষ্টিং' শব্দটা বনমালীর উচ্চারণ হয় না, অনেক চেষ্টা ক'রে পুরুষোত্তম তবু কিছুটা বলেছিল, তা থেকে অনুমান ক'রে নেওয়া যায় তবু)।

ওঁর ছাত্ররা অধিকাংশই ওর কাছে এসে পড়ে যায়। সন্ধ্যার সময় যখন মেস নিরিবিলি থাকে অথবা ছুটির পর বিকেলে—তখন তো একেবারেই জনহীন বলতে গেলে—ঠাকুর-চাকররা পালা ক'রে একজন থাকে, বাকীরা বেড়াতে যায়—কিম্বা হঠাৎ কোন দিন আগে ছুটি হলে দুপুরেও নিয়ে আসেন।—পড়ার জন্যে। এদের কাছ থেকে টাকা নেন না। কেউ হয়ত দু টাকা চার টাকা কবুল করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও দেয় কিনা সন্দেহ।

টাকা তো নেনই না, বরং ছাত্ররা পড়তে এলে দু পয়সা চার পয়সা খরচ করেন। লজেঞ্জস, বিস্কুট, চানাচুর কিম্বা গরমের দিন হলে গোলাপছাড়ি। মানে যা দু-এক পয়সায় হয়। এর বেশী খরচ করা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

স্কুলে সব কেটেকুটে নিয়ে হাতে পান চল্লিশ বিয়াল্লিশের মতো। দেশে কিছু পাঠাতে হয়। স্ত্রী আছে, একটি মেয়েও আছে বোধ হয়। অন্যরা তো আছেনই। সেই জন্যে সকালে একটা টিউশ্যনী করেন এই পাড়াতেই, সেখানে কুড়ি টাকার মতো পান। তাতেই কোনমতে চলে যায়।

এতদিন এ ঘরে কোন বোর্ডার বিশেষ আসে নি। কেউ এলেও থাকতে পারে নি বেশি দিন। দু-চার দিন পরে অন্য মেস ঠিক ক'রে চলে গেছে। ফালিপানা সরু ঘর, ভেতরের দিকে যে থাকবে তাকে নিশীথবাবুর বিছানার পাশ দিয়ে অতিকষ্টে যাতায়াত করতে হবে, কখনও কখনও যে বিছানা মাড়িয়ে যাবে না এমন কথা বলা যায় না। মুক্তি বলতে ঐ গবাক্ষটুকু—তাও খুললেই নর্দমার পচা গন্ধ। কতদিন এ নর্দমা এইভাবে আছে, না হয় পরিষ্কার, না ঢোকে সূর্যের আলো কি বাতাস।

বনমালীদের সেই আশঙ্কা। এ বাবুও বেশীদিন টিকতে পারবে না। পুরুষোত্তম তো বলেই ফেলল, বাবুর যদি ঘেন্না না করে তো তাদের ঘরে গিয়ে থাকতে পারেন। একতলায় ঘর কিন্তু ঐ পচা গলির ধারে ওপরের ঘরের চেয়ে ঢের ভাল। তবু একটু আলো বাতাস খেলে। সীটরেণ্ট লাগবে না। খাওয়ার খরচটুকু দিলেই হবে। ওর জন্যে পুরুষোত্তম তার চৌকীটাও ছেড়ে দিতে রাজী আছে।

বিনুও সত্যিই চলে গেল মেস ছেড়ে উনিশ দিনের মাথায়।

সে নিজের ইচ্ছায় বা চেষ্টায় যায় নি। কারণ যত অসহ্যই হোক—তার উপায় ছিল না কোথাও যাবার। যেখানেই যাবে কিছু টাকা আগাম দিতে হবে, এখানের প্রাপ্য শেষ না ক'রেও যাওয়া যাবে না। সে টাকা পাবে কোথায়? এইতেই ভাবতে ভাবতে পেটের ভাত চাল হতে যাচ্ছিল, আজ হোক কাল হোক ম্যানেজারবাবু বাকী টাকা চাইবেন তখন কি জবাব দেবে? শেষ অবধি হয়ত পুরুষোত্তমের কাছেই হাত পাততে হবে—তিন চারটে টাকার জন্যে।

সে দুশ্চিন্তা ও সম্ভাব্য লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন নিশীথবাবুই।

নিশীথবাবু প্রথমটায় খুব রুষ্ট ও বিরক্ত হয়েছিলেন বিনুর ওপর। ভাগ্যক্রমে সেই সময়ই, পর পর দু-তিনটে বিভিন্ন কারণে—সেক্রেটারী ও ভাইস প্রেসিডেণ্টের মৃত্যু, মুসলমানদের অতি সামান্য একটা উৎসবহেতু—এক পিরীয়ড পরেই ছুটি হয়ে গেল। ছাত্রদের এনে পড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু ঘরে বিনু প্রস্তরীভূতো রক্ষের মতো স্থাণু হয়ে বসে। এ পড়ানোয় পরিশ্রমই সার হয়, চিত্তবিশ্রামপ্রাপ্তি ঘটে না।

'ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ, সম্মোহাৎ বুদ্ধিবিভ্রম'—উষ্ণ হয়ে থেকে উত্ত্যক্ত করা ছাড়া ওকে বিতাড়নের কোন পথ দেখতে পাচ্ছেন না। যতদিকে সম্ভব ওর অসুবিধা সৃষ্টি ক'রে বিনুকে বাঁকা বাঁকা কথাতে আঘাত দিতেও কম করেন নি, কিন্তু যার কোন উপায় নেই তার সহ্য করা ছাড়া গতি কি।

তারপর—কয়েকদিন পরে বোধ হয় মাথাটা খুলল। হঠাৎ যেন ভোল পাল্টে গেল তাঁর। খুব স্নেহপরায়ণ ও হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠলেন।

এর আগে ওঁকে এবং অন্য যা দু-একজন শিক্ষক থাকেন মেসে তাঁদের কাছে টিউশ্যনীর কথা তুলেছিল বিনু। নিশীথবাবু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেছিলেন, গ্রাজুয়েট মাষ্টাররা ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইউরিনালে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে—ম্যাট্রিক পাস ছেলেকে কে টিউশ্যনী দেবে বলুন।'

আর একজন বলেছিলেন, 'পেলে তো আমিই একটা করি আরও। পরকে দেব কেন বলুন।'

ইউরিনালে বা ইলেকট্রিক পোস্টের গায়ে বিজ্ঞাপন দেখে দু চার জায়গায় বিনুও যে চেষ্টা করে নি তা নয়—কিন্তু সে সব জায়গাতেই বি-এ এম-এ পাস শিক্ষকরা উমেদার, তার কথা কেউ ভেবে দেখতেও রাজী হয় নি।

সেই নিশীথবাবুই সেদিন রাত্রে খাওয়ার পর বিড়িটি ধরিয়ে ওরই কম্বলে এসে বসে গলায় অমায়িক অন্তরঙ্গতার সুর এনে বললেন, 'আমি একটা কথা ভাবছিলুম মিঃ মুখার্জি। আপনি তো এখনও কিছু পেলেন না। এত সহজে পাবেনও না। ধরা-করার লোক না থাকলে আজকাল টিউশ্যনীও পাওয়া যায় না। আপনার যা দেখছি, কেউই তো তেমন নেই। অথচ খরচা তো আছেই, আপনার অবশ্য নেশাটেশা তেমন নাই যা দেখি—তবু কিছু না হোক মেসের খরচা, জলখাবার-টাবার নিয়ে মাসে পনেরো টাকা তো লাগবেই। তা ধরেন যদি এই খরচাটা আপনার বাঁচিয়ে দেবার একটা ব্যবস্থা করি ?'

বিনু তখন যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

'কি রকম ?' এই সামান্য প্রশ্নটাই গলায় আটকে যাচ্ছে।

অবশ্য প্রশ্ন করার প্রয়োজনও রইল না। নিশীথবাবু নিজেই নিজের প্রস্তাবের টীকা করলেন।

'একটি ছেলে আর একটি মেয়ে—দু ভাই বোনকে পড়াতে হবে, ছেলেটি বছর দশেকের, মেয়েটি সাত। দুজনেই ইস্কুলে যায়, কাজেই খুব বেশী খাটতে হবে না। ওঁরা থাকার জায়গা দেবেন খেতে দেবেন কিন্তু নগদ টাকা কিছু দিতে পারবেন না। তবে সে যদি আপনি অন্য কোন কাজ কি টিউশ্যনী ক'রে রোজগার ক'রে নেন—ওঁদের কোন আপত্তি থাকবে না। ভেবে দেখেন—করবেন এ কাজ ?'

'সেধো ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথায় ?' কথাটা শোনাই ছিল এতকাল—আজ তার পূর্ণ অর্থটা বুঝল বিনু।

তবু, এতক্ষণে কিছুটা সামলে নিয়েছে, খুব বেশী ব্যগ্রতা প্রকাশ করল না। শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'জায়গাটা কোথায় ? ভদ্রলোক কি করেন ?'

'জায়গাটা এই হাতীবাগানের কাছেই, ভালুকবাগান বলে। ভদ্রলোক বেশ ভাল চাকরিই করেন, তবে পাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ে—আর সম্প্রতি চার কাঠা জায়গা কিনে বড় বাড়ি ফেঁদে একটু টানাটানিতে পড়েছেন। তাই মাইনে দিয়ে লোক রাখতে পারছেন না। বাড়ির উঠোনে—তৈরী হওয়ার আমলে মালপত্র পাহারা দেবার লোকটির জন্যে একটা টিনের চালাঘর করা হয়েছিল, সেটা পড়েই আছে, সেইখানেই একটু সাফসুৎরো ক'রে থাকতে দেবেন—আর ভাত হাঁড়ির ভাত।—অত গায়ে লাগবে না। এই জন্যই বাড়িতে রাখতে চান। বোঝেন না। তা

সুযোগ তো আপনারই—গার্জেন টিউটার হয়ে আছেন বলতে পারবেন। দেখেন, ভেবে দেখেন।'

ভেবে দেখার কিছু নেই। এ প্রস্তাব তখন ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতোই শোনাচ্ছে। সেকথা স্বীকারই করল বিনু। আসলে যে কারণেই চেষ্টা করুক—লোকটি সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা বোধ না ক'রেও উপায় নেই, সে বলল, 'ভেবে আর কি দেখব মাষ্টার মশাই, এটুকু না পেলে তো পথেই দাঁড়াতে হবে। কোথাও একটা আশ্রয় আর খাওয়া—এইটুকু পেলেই এখন বেঁচে যাই।'

'তাইলে তো ভালই। কাল সকালেই চলেন আপনাকে নিয়ে যাই। কথা আমার বলাই আছে একরকম। তবে একেবারেই মালপত্র নিয়ে গিয়ে ওঠা ভাল দেখায় না, একবার আমার সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'রে আসেন আগে, তারপর ম্যানেজারবাবুকে বলে মালপত্র—মালই বা কি বিছানাটা তো শুধু—নিয়ে চলে যাবেন!'

আশায় আশঙ্কায় উত্তেজনায় অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হল না বিনুর। একেবারে শেষ রাত্রেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, নিশীথবাবু বাড়তি সময়টুকু হাতে রাখার জন্য ভোরবেলাই উঠে ওকে তাগাদা লাগিয়ে তুললেন, কোনমনে মুখটা ধুয়ে নিয়েই বেরিয়ে পড়তে হল।

মির্জাপুর স্ট্রীট থেকে ভালুকবাগান—মাইল দেড়েকের পথ তো হবেই—তবু নিশীথবাবু যখন বললেন, 'এইটুকু তো রাস্তা, চলেন হেঁটেই যাই। তিনটে পয়সা খামাকা ট্র্যাম কোম্পানীকে দিয়ে লাভ কি?' তখন বিনুও আর আপত্তির কারণ খুঁজে পেল না।

সেখানে পৌঁছে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল না। তিনি অত সকালেই কি কাজে বেরিয়েছেন। স্ত্রী এসে কথা কইলেন। বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়স, এককালে বেশ সুশ্রী চেহারা ছিল তা বোঝা যায়—এখন তার ভগ্নাবশেষে দাঁড়িয়েছে। শীর্ণ চেহারা ও অপরিসীম ক্লান্তি—তাঁর দিকে চাইলে এই কথাটাই প্রথম মনে আসে। কিন্তু কথাবার্তায় ও কণ্ঠস্বরে ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্বর ছাপ সুপরিস্ফুট।

নিশীথবাবু পরিচয় ক'রে দিতে বললেন, 'ওমা, এ যে নেহাৎই ছেলেমানুষ। তা ভালই হল—বাড়ির মধ্যে একটা বেশী বয়সের ভারিক্কী ধরনের গম্ভীর মেজাজের মানুষ চলাফেরা করলে অসোয়াস্তি লাগত। তা তুমি—আপনি আর বললুম না—এইটুকু তো ছেলে—পড়াতে পারবে তো? না না, তোমায় লেখাপড়া শেখানোর কথা বলছি না—ছাত্তর ছাত্রীকে বাগ মানাতে পারবে তো? একটু শাসন করা দরকার, তোমাকে দেখে যে ভয় পাবে ওরা, তা তো মনে হয় না।'

মহিলাটিকে দেখে বিনুর খুব ভাল লেগেছে, একটু ভরসাও বেড়েছে, তবু সে মাথা হেঁট ক'রেই ছিল, সেইভাবেই হাসিহাসি মুখে বলল, 'শাসন, করা আমার অব্যেস নেই, ও আমি পারব না—তবে ভালবাসতে পারব। আরও তো পড়িয়েছি—ছাত্ররা সাধারণত আমাকে ভালই বাসে।'

'ব্যাস, ব্যাস, তাহলেই হল। কবু, এই কবু—ইদিকে আয়। শিগগিরি আয় বলছি। রমা—'

একটি বছর এগারোর ছেলে হাফ প্যাণ্ট পরা, উঠোনে লাট্টু খেলছিল, সে ছুটে এল'—কী মা ?'

ছেলেটির গায়ের রং শ্যামলা, কিন্তু টিকলো নাক আর বড় বড় চোখের জন্যে মুখখানা ভারী মিষ্টি দেখায়।

তার মা বললেন, 'ইনি তোমার নতুন মাস্টারমশাই। আজ থেকেই পড়াবেন, এখানেই থাকবেন। এঁর সব কথা শুনবে। ওঁকে প্রণাম করো।'

ছেলেটি প্রণাম করার চেষ্টা করতেই বিনু তাকে বুকের কাছে টেনে নিল, আর সে ছেলেটি—কবু ও—কি বুঝল কে জানে, এইটুকু প্রশ্রয়েই একেবারে ওকে জড়িয়ে ধরল দু হাতে। বলল, 'কোন ঘরে থাকবেন মা—মাস্টার মশাই ?'

'মাস্টার মশাই কথাটা বড় লম্বা, তুই দাদাই বলিস, দাদা বলার লোক তো তোর নেই—একটা হল তবু। উনি ঐ যে নিচের ঐ ঘরটাতে থাকবেন। ঐখানেই ওঁর বিছানা ক'রে রাখব।'

'আমি ওঁর কাছে থাকব মা। দুজনে কুলোবে না ? খুব কুলোবে !'

হেসে ফেললেন কবুর মা, বাঃ ইন্দ্র তো দেখছি রীতিমতো বশ করার মন্তর জানে। এর মধ্যেই কি মন্তর পড়লে। 'তারপর ছেলেকে বললেন, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে। এখন ওকে ছাড়—জিনিসপত্র নিয়ে আসুক। যাও বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি ওখানের পাট চুকিয়ে চলে এসো। এখানেই খাবে এবেলা।'

॥ ৩৪ ॥

কবুর মা সুভদ্রা ছেলের ঐ প্রস্তাব নিয়ে মাথা ঘামান নি। ছেলেমানুষের কথার কথা--একটা ঝোঁক এসে গেছে মাথায়—কথাটা বলেছে, এখনই ও ভুলে যাবে।

তিনি তাই তাঁর আগের হিসেব মতোই উঠোনের পাহারাদারের জন্যে তৈরী পাঁচ ইঞ্চি দেওয়াল টিনের চাল ছোট ঘরটিতে একটা তক্তপোশের ওপর উদ্বৃত্ত তোশক এনে কাচা চাদর পেতে ওরই মধ্যে বেশ ভদ্র বিছানা ক'রে রেখেছিলেন। বসবাসযোগ্য ক'রে তোলার অন্য আয়োজনও ভোলেন নি। দুটো পেরেকে তার বেঁধে একটা আলনা, একখানা লোহার চেয়ার। নড়বড়ে একটা আমকাঠের টেবিল, একটা জলের কুঁজো আর গ্লাস—কিছুরই অভাব রাখেন নি। মায় একটা একপাতা ছোট্ট ক্যালেণ্ডারও। ঘরটাতে সম্প্রতি চূণকাম হয়েছে। সুভদ্রা নিজে হাতে ঝেড়েমুছে ঘরের মেঝে ধুয়ে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন।

মেসের ঐ নরককুণ্ড থেকে এসে বিনুর ভালই লাগল। মনে হল এই কদিনের পর এই প্রথম যেন নিঃশ্বাস ফেলল সে। বেশ অনেকটা খোলা উঠোন—কলকাতার বাড়ির তুলনায় অনেকখানি—এইটুকু ঘরে বড় একটা জানলাও আছে, সবচেয়ে বড় কথা তার মধ্যে দিয়ে আকাশের একটা কোণও দেখা যায়। এত পরিচ্ছন্ন ছিমছাম তাদের বাড়িও আজকাল রাখা সম্ভব হয় না সব সময়—মা অত পেরে ওঠেন না।

সুভদ্রা নিজের হাতেই সব করেছে। সেটা পরে জেনেছিল বিনু। ওদের

একটি তিন টাকা মাইনের ঠিকে ঝি মাত্র আছে—সে বাসন মেজে কয়লা ভেঙ্গে দিয়ে যায়—আর কোন লোক নেই কাজ করার। কবুর বাবা পিনকীবাবু এর মধ্যে চাকরির ফাঁকে কী একটা ব্যবসা ফেঁদে ছিলেন, তাতে কিছু টাকা লোকসান গেছে—তার ওপর এই বাড়ি শুরু ক'রে একতলার সংকল্প নিয়ে কাজে হাত দিয়ে দোতলাই ক'রে ফেলেছেন, ফলে প্রচুর ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। চাকর কি রাতদিনের ঝি রাখা সম্ভব নয়।

সুভদ্রার এত শীর্ণতা ও ক্লান্তির কারণও এই।

এই বয়সেই ছটি সন্তানের মা—তার একটি গেছে—কিন্তু পাঁচটির ধকলই যথেষ্ট। শেষেরটি প্রায় সদ্যোজাত। তার ওপর এই খাটুনি—শরীর সারবার অবসর কোথায়। স্বামীর উচ্চাশার দায় উনিই সম্পূর্ণ বহন করছেন প্রায়। দোতলা বাড়ির ঝাড়ামোছা পর্যন্ত করতে হয় ওঁকেই, সম্প্রতি রমা একটু বড় হয়ে তবু অনেকটা হাতে হাতে সেরে নেয়।

বিনুর সে কম্বলের বিছানা আর খোলবার দরকার হল না। সে বাঁচলে তাতে, চাদরটা একদিন বনমালী জোর করে কেচে দিয়েছিল—ক্ষারে ফুটিয়ে, তাতে ময়লা গেলেও নীলের অভাব লালচে ধরে গেছে, তারপর কদিন শোওয়ার ফলে আরও ময়লা দেখাচ্ছে। এই নতুন আশ্রয়ের ব্যবস্থাটা এত অতর্কিতে হয়ে গেল—চাদরটা আর একবার কেচে নেবার সময় হল না।

স্নান সেরেই এসেছিল। ম্যানেজারবাবু বিশেষ পুরুষোত্তম ওকে এবেলা খেয়ে আসতে বলেছিল, সুভদ্রার কথা ভেবে সে রাজী হতে পারে নি, তিনি বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছেন যখন এখানে খাবার কথা—তখন সে কথা রাখাই উচিত।

এখানে এসে বুঝল ভালই করেছে সে। ওর আসতে আসতে বেলা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। এঁদের রান্না প্রস্তুত—ওর জন্যেই অপেক্ষা করছে সকলে। পিনাকীবাবু আপিস গেছেন, রমা ইস্কুলে। কবুরও যাবার কথা, সে কিছুতে আজ যেতে রাজী হয় নি, দাদার সঙ্গে খাবে বলে জেদ ধরে থেকে গেছে। ইস্কুল কলেজের সময় ধরেই রান্না হয়—এরা বাদ দিয়ে যে দুটি শিশু খাবার মতো, তাদের জন্যে আর পৃথক ব্যবস্থা হয় না, তাদের ঐ সঙ্গেই খাইয়ে দেওয়া হয়। বাকী মা আর ছেলে—এবং বিনু।

আহারের আয়োজন সামান্য। ডাল আলুভাতে চচ্চড়ি এবং একটুকরো মাছ—তবু তাই খেতে খেতে যেন বিনুর চোখে জল এসে গেল। প্রায় তিন সপ্তাহ পরে মার হাতের রান্নার স্বাদ পেল সে।

খেয়ে এসে আরাম ক'রে নিজের কোটরে শুয়ে পড়েছে, আরামে চোখ বুজে এসেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—শ্রীমান কবু তার মাথার বালিশ নিয়ে এসে হাজির।

'আমি আপনার কাছে যে শোব দাদা!'

'এসো এসো,' অগত্যাই বলতে হয় বিনুকে, একটু সরে জায়গা ছেড়েও দিতে হয়, 'কিন্তু আমার কাছে শুতে হলে আপনি বলা তো চলবে না, তুমি বলতে হবে। এই নিয়ম।'

দেখা গেল কবু আর যাই হোক বোকা নয়। সে বালিশ পেতে ঝুপ ক'রে ওর পাশে শুয়ে পড়ে বলল, 'কে করেছে এ নিয়ম?'

বিনু বললে, 'আমি।'

'ভাল করেছ।' ওর হাতের খাঁজে মুখটা দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, কবু, 'আপনি বলতে আমারও ভাল লাগছিল না।'

সুভদ্রা প্রথমটা বুঝতে পারেন নি, রান্নাঘর ধুয়ে তালা দিয়ে ওপরে উঠে কবুর বিছানা শূন্য আর বালিশ অনুপস্থিত দেখে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন।

তাড়াতাড়ি ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, 'ওমা, এ কী কাণ্ড। তুই সত্যি সত্যিই এখানে শুতে এলি। এইটুকু বিছানা, দুজনে শুলে দাদার যে কষ্ট হবে রে।'

বিনু একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, সে অবসর না দিয়েই নিশ্চিন্তভাবে কবু বলল, 'হোক গে। একটু কষ্ট হলে আর কি হয়েছে। তুমি যাও, আমি বেশ থাকবখন।'

'দ্যাখো, ছেলের পাগলামি। আচ্ছা, এখন তো একটু ঘুমোতে দে ওকে, তারপর না হয় রাত্রে শুবি এখন।'

'না, না, আমি বেশ আছি। দাদা ঘুমোক না, আমিও তো ঘুমোব।' কবু বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

'তাহলে ইন্দ্র তুমিই চলো। ওর খাট বিছানা তো পড়েই আছে। মানে আমাদেরই বড় খাটটায় ও এখন শোয়। আমি খাটে শুতে পারি না। ছোট দুটো আর মেয়েটাকে নিয়ে মেঝেয় শুই। উনি একটা ছোট খাটে মেজো ছেলেকে নিয়ে থাকেন। একা শোয় বলে দিনকতক মেজো কানুকেও দিয়েছিলুম, তা তিনি আবার বাপ-অন্ত প্রাণ, বাপের পাশে না হলে শোওয়া হয় না।···নাও, ওঠো, সব গুটিয়ে নিয়ে চলো। মিছিমিছি আর এখানে থেকে লাভ নেই। টিনটাও তাতে খুব অবিশ্যি, আর আমার ছেলের যা ঘাম, তোমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে থাকলে একটু পরে তোমারই মনে হবে, নেয়ে উঠলে।'

অর্থাৎ, এককথায়—সেদিন এ বাড়ি ঢোকার দেড় ঘণ্টার মধ্যে বিনুর ডবল প্রমোশন লাভ হল। বাইরে দারোয়ানের ঘর থেকে খোদ কর্তার খাটে চলে গেল।

পিনাকীবাবুর সঙ্গেও আলাপ হল। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে (ওঁরা কায়স্থ, বিনু ব্রাহ্মণ) মুখটা একটু প্রসন্ন হল—তবে মোটামুটি, দু-একদিন যেতে না যেতে বুঝল বিনু—তিনি এ বন্দোবস্তে খুশী নন। একটা পর লোক বাড়ির মধ্যে ঢুকল, তাছাড়া—দুবেলা খাওয়া জলখাবার—কি কম খরচার ব্যাপার! দশ টাকা মাইনে দিয়ে মাস্টার রাখলে দুজনকেই স্বচ্ছন্দে পড়াতে পারত। এদের আর কি এমন পড়া, ম্যাট্রিক পাস ছেলে যা পড়াতে পারছে, একজন ইস্কুলে-মাস্টার সে যদি নিচের ক্লাসের শিক্ষকও হয়—তা পড়াতে পারত না? ঢের ভাল পড়াত। ওদের মার মাথায় এক ভূত চাপল। এখনই তো মাস্টারের মাথায় চড়ে বসে আছে আদুরে ছেলে—তাকে বাগে আনতে পারবে এ মাস্টার?

পিনাকীবাবুর এ নীরব স্বগতোক্তি বুঝতে কোন অসুবিধে হল না বিনুর। হবার কোন কারণও নেই। তাঁর বক্তব্যে সামান্যই ছদ্ম আবরণ দিয়েছেন, স্ত্রীর সম্মানরক্ষার্থে যেটুকু দেওয়া দরকার। বরং বিনুর মনে হল তাঁর বক্তব্য ও বুঝুক

সেটাই তিনি চান।

এ ক্ষেত্রে তার উচিত হচ্ছে মানে মানে এখনই সরে পড়া।

অথচ সেইটেরই কোন উপায় নেই। আর, উপায় নেই বলেই সে বোকা সেজে রইল, স্পষ্ট ইঙ্গিতগুলোও বুঝতে চাইল না, নেলসনের কানা চোখে দূরবীণ লাগানোর মতো।

তবে, সে যে পিনাকীবাবুর মনোভাব বুঝেছে, সেটা সুভদ্রারও বুঝতে কোন অসুবিধে হল না।

তিনি জোরগলায় বললেন, 'কখনও না। আমার ছেলেকে আমি চিনি। ঐ এক ঘণ্টা লক্ষ্মীপুজোর ফুল ফেলার মতো পড়িয়ে চলে গেলে ওদের কিছু হবে না। যে মাস্টারকে ওর ভাল লাগবে না, তাঁর কাছে ও পড়বেই না। তোমাকে ভাল চোখে দেখেছে। তোমার কথা শুনবে, পড়বেও মন দিয়ে। ওঁর কথায় তুমি কান দিও না, মন খারাপও করো না। মানুষটা খারাপ নন, তোমার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করবেন না। আসলে মানুষটা একটু দৃষ্টি-কৃপণ স্বভাবের বুঝলে না! আপিসেও হিসেবের কাজ করেন। টাকা আনা পাইয়ের হিসেবের মধ্যে দিয়েই দুনিয়াটা দেখেন। ইংরিজীতে কি কথা আছে বুঝি, তুমি যদি পেনির যত্ন নিতে পারো, পেনি তোমার পাউণ্ডের ব্যবস্থা করবে। উনি সে কথাটা প্রায়ই বলেন, নিজেও তাই টাকা ফেলে কেবলই পাই সামলাতে ব্যস্ত থাকেন।'

তারপর একটু থেমে বলেন, 'ঐ জন্যেই তো ব্যবসা চালাতে পারলেন না। গোড়া থেকেই অত হিসেব ক'রে চললে ব্যবসা চালানো যায় না। প্রথম দিকে টাকার চার ছাড়লে তবে লাভের মাছ ওঠে। আমি ব্যবসায়ীদের মেয়ে, ব্যবসাদারদের ভাগ্নী—ওটা আমি বুঝি। যে কারবার উনি জমাতে পারলেন না সে কারবারে কত লোক লাখোপতি হয়ে যাচ্ছে।'

আবার এক সময় বলেন, 'আসল কথাটা কি জানো, ওঁর হিসেবটা শুধুই টাকা আনার পথ ধরে চলে, তার মধ্যে আমার কোন ঠাঁই নেই। উনি আপিস যান, ছেলেমেয়ে—যে দুটো ওরই মধ্যে একটু মাথা-ধরা হয়ে উঠেছে, তারা চলে যায়—বাকী তিনটে তো গুয়ের গোবলা বলতে গেলে—আমি একা সারাদিন কি ভরসায় থাকি বলো তো! বড় ভয় করে। যদি একটা জা-ননদও থাকত, ঝগড়া হোক, ঝাঁটি হোক—তবু একটা মানুষ। আর সত্যি কথা বলতে কি ঝগড়াঝাঁটি একটু মধ্যে মধ্যে হওয়া ভাল। মনের গ্যাসটা বেরিয়ে যায় তবু। ধরো যদি আমি পিছলে পড়ে যাই, ওরা বাড়ি ফিরলে দোর পর্যন্ত খুলে দিতে পারব না। কেউ টেরই পাবে না আমার অমন অবস্থা হয়েছে। কি—ঈশ্বর না করুন—এদের কারও হঠাৎ অসুখ করল, কাকে বসিয়ে ডাক্তার ডাকতে কি পাড়াঘরে কাউকে খবর দিতে যাবো বলো দিকি!...আমি তাই চেয়েছিলুম, একটা ভদ্দরলোকের ছেলে বাড়িতে থাক, উপকারই দেবে! ভাত হাঁড়ির ভাত খাবে—বাড়তি খরচা এমন কিছু লাগবে না।'

পিনাকীবাবুকে বাদ দিলে বিনুর মন্দ কাটছিল না।

কবু তো এমন ন্যাওটো হয়ে উঠল—দাদাকে ছেড়ে সে কোথাও—এমন কি বিকেলে খেলতে যেতেও চায় না আজকাল। বিনু যদি বেড়াতে বেরোয় একটু তাহলেই সে বেরোয়, সঙ্গে যায়।

সবচেয়ে চরম হল একদিন—একটা পারিবারিক নিমন্ত্রণ, সবাই যাবে বলে তৈরী—কবু বেঁকে বসল, সে যাবে না, দাদার কাছে থাকবে।

ওর মা সুদ্ধু অবাক, 'কী খাবি? দাদার মতো তো শুধু খাবার ক'রে রেখেছি।'

'ঐ যা আছে দুজনে ভাগ ক'রে খাবো। একদিন একটু কম খেলে দাদা মরে যাবে না।'

নিশ্চিন্তভাবে উত্তর দেয় সে।

রাত্রে শোয় প্রত্যহ বিনুকে জড়িয়ে ধরে।

এমন আকস্মিক, কিছু-পূর্ব-পর্যন্ত অপরিচিত মানুষকে অবলম্বন ক'রে প্রবল ভালবাসা স্থায়ী হয় না—এতদিনের পড়াশুনোয় এ বোধ হয়েছিল বিনুর। ঝোঁকের মাথায় পছন্দ হয়েছে, হঠাৎ একদিন এমনি তুচ্ছ কারণেই অপছন্দ হবে বা অন্য কাউকে এইভাবে আবার ভালবাসবে—তখন আর কারও কথা মনে থাকবে না। আবার তাকেও ভুলতে দেরি হবে না।

এ সবই ভেবেছে সে। তবু মন্দ কি! ভালবাসার কাঙ্গাল সে, এতেও খানিকটা মন ভরে সে প্রাণপণ চেষ্টা করে যত্ন করে ওকে পড়াতে, কিন্তু সেইখানেই একটা বিরাট অসুবিধা। আবেগপ্রবণ মনটা ওর যতই ভালো হোক, পড়াশুনোয় বেশী দিতে পারে না। অথবা দিতে চায় না। এই ভালবাসার বিলাসেই মেতে থাকতে চায়—নইলে বুদ্ধি যে খুব কম তাও তো নয়।

রমা অনেক ভাল। শান্ত ভদ্র, লেখাপড়া করতে চায়। মাথাটা তত সাফ নয়—তবে পড়ায় আগ্রহ আছে। এই বয়সেই মাতৃত্বের ভাবটা বেশী। ভাই-বোনদের দেখা, মাকে গৃহকর্মে সাহায্য করা—এই দিকেই বেশী আসক্তি। এর মধ্যে একদিন সুভদ্রা কুক্ষণে বলে ফেলে ছিলেন, 'ইন্দুর সঙ্গে তোর বিয়ে দোব।' সে কথাটা রমার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গিছল, তাই বিনুর সামনে লজ্জা ও সংকোচের অবধি ছিল না সেদিনের পর থেকে। ওরই মধ্যে গোপনে একটু যত্ন করবারও চেষ্টা করত। মা যেমন করেন বাবাকে, সেই ভাবের যত্ন। ঘামলে বাতাস করা, জলের গ্লাস এনে দাঁড়িয়ে থাকা—লজ্জা-বিনয় ভাবে এটা ওটা হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়া—এই ধরনের সেবা করতে চাইত।

বাকী তিনটি ছেলের একটি সামান্য দুরন্ত তবে অসভ্য কেউ নয়। ছেলে-গুলোকে ভালই লাগত। কানুর সামান্য পড়া, এতদিন সে বাবার কাছেই পড়ত—বিনু জোর ক'রে সে ভারটা নিজের ওপর তুলে নিল। কানু প্রথমটা যথেষ্ট বাধা দিয়েছিল, এ ব্যবস্থায় একটুও খুশী হয় নি—সে অতিরিক্ত বাপের ন্যাওটো—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও বিনুর অনুরক্ত হয়ে উঠল।

পিনাকীবাবু অবশ্য এতে খুশীই হলেন। ঠাট্টা ক'রে বললেন, 'যাও বা ছিল একটা বিনি মাইনের ঠিউশ্যনী চাকরি—তাও গেল। কবুর মাস্টারদাদা ভাঙ্গিয়ে নিলেন আমার ছাত্তরটা!'

আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, খাওয়া-দাওয়া—কোন দিকেই কোন অসুবিধে নেই। সুভদ্রা রাঁধেন ভাল, অনেকটা ওর মার মতোই। আয়োজন সামান্য, দৈনিক চার-পাঁচ আনার বাজার হয়—তার মধ্যেই যেটুকু সম্ভব তরিবৎ করেন। ব্যঞ্জনের স্বল্পতা প্রায়ই দুধ আর গুড় দিয়ে পুষিয়ে দেন। পিনাকীবাবু এদিকে যতই 'হিসেবী' হোন—দুধের বেলা কার্পণ্য করেন না। গুড়ও আসে এক নাগরি করে প্রতিমাসে। যে দোকান থেকে 'উটনো' আসে তারা নিজেরা দিলে একটু ভারী নাগরিই পাঠায়। কবু গুড়ের ভক্ত বলেই এই ব্যবস্থা। এখন দাদাকেও তার দলে দেখে উৎসাহ আরও বেড়ে গেছে তার। মাকে সগর্বে বলে, 'দেখলে, ভদ্রলোক মাত্রেই গুড় ভালবাসে।'

এক-একদিন বিনুকেই বাজারে পাঠান সুভদ্রা। বলে দেন, 'পয়সা বেশী দিতে পারব না, তবে এর মধ্যে যা পারো তোমার পছন্দসই জিনিস নিয়ে এসো।'

'যদি মোচা এনে হাজির করি? কি কচুর শাক?'

'এনো না। স্বচ্ছন্দে। আমি তাতে ভয় পাই নাকি? রাত্তিরে কুটে রাখব, পরের দিন রান্না হবে। ওটুকু বাড়তি খাটুনিতে আমার কিছু এসে যাবে না। বলে, সমুদ্রে যার শয্যে তার শিশিরে কি ভয়!'

না, এসব দিকে কোন অসুবিধে নেই। নিজের বাড়ির মতোই মনে হয়, বরং তার চেয়ে বেশী আদর, বেশী স্বাধীনতা। ব্যক্তিগত সেবা, হাতের কাছে সব জিনিস সময় মতো পাওয়ার সুখ তো এতখানি বয়সে এই প্রথম পেল রমার আর সুভদ্রার কল্যাণে।

বিরাট অসুবিধে অন্যত্র। টাকা পয়সার অভাব। হাতে একটাও পয়সা নেই, এ বড় অসহ্য অবস্থা। আশপাশে যদি একটা চার-পাঁচ টাকার টিউশ্যনীও পাওয়া যেত। সুভদ্রাকে একবার বলেও ছিল সে মুখ ফুটে—একটু খোঁজ ক'রে দেখতে—কিন্তু দেখল তাতে ওঁর কেমন একটু অনিচ্ছা। এত স্নেহ করেন বিনুকে, অথচ ওর এই প্রয়োজনটা বোঝেন না কেন এটা কিছুতেই বিনুর মাথায় যায় না।...ওঁর বিরূপতা বোঝার পর নিজে থেকে কিছু চেষ্টা করবে, পাড়ায় কারও কাছে খোঁজ-খবর করবে—সে সাহস হয় না। ইচ্ছেও করে না।

কাপড়-জামার অবস্থা শোচনীয় দেখে সুভদ্রাই পিনাকীবাবুর একটা পুরনো ধুতি আর পাঞ্জাবী বার ক'রে দিয়েছেন। পিনাকীবাবু একটু বেঁটে ওর চেয়ে—তেমনি হাত দুটো সে তুলনায় বেশী লম্বা, তাই খুব একটা বেমানান হয় নি। পুরনো ধুতি-জামা হাত পেতে নেওয়া—ভিখিরীর মতো—লজ্জায় মাথা কাটা যায় বৈকি।

অথচ উপায়ই বা কি। সুভদ্রা অবশ্য ওর মনোভাব বুঝতে পারেন, গলা নামিয়ে বললেন, 'তুমি কিছু মনে করো না, দুঃসময়ে অনেক দীনতা সইতে হয়। আমি কি লুকিয়ে তোমাকে দুটো টাকা দিতে পারতুম না। চিরদিন আলমারী বাক্সর খাঁজে কোণে এক-আধ টাকা রাখার অভ্যেস, তা ছাড়াও একেবারে হাত খালি করা গেরস্ত বাড়িতে কোন মতেই উচিত নয়। ছেলেপুলের ঘর, একটা আতান্তর হয়ে পড়তে কতক্ষণ। দু-চার টাকা আছে বৈকি। একখানা ধুতি আর একটা লংক্লথের জামা—দু টাকা হলেই হয়ে যায়। কিন্তু কি জানো

—নতুন জামা-কাপড় দেখলেই উনি হাজারটা কৈফিয়ৎ চাইবেন, আমি দিয়েছি বললেই কুরুক্ষেত্তর, কেননা উনি অনেকবার দশ-পাঁচ টাকা চেয়েছেন আমি দিই নি, নেই বলে দিয়েছি। বিপদ-আপদের জন্যে যা রেখেছি তাও ওঁকে দিয়ে বোকা বনতে চাই না। উনি নিলে আর দেবেন না জানি তো, বলবেন এ তো আমারই টাকা, তুমি তো আর রোজগার কর না। আবার আমি দিয়েছি যদি না বলি তোমাকে চোর মনে করবেন, ভাববেন নিশ্চয় কিছু সরিয়ে বিক্রী করেছ, নইলে হঠাৎ টাকা পেল কোথায় ?'

এর পর আর কি বলবে। বলার আছেই বা কি! সত্যিই তো সে আজ ভিখিরী! বরং তারও অধম। এখানে এসে পড়তে না পারলে হাত পেতে ভিক্ষেই করতে হত।

সুভদ্রার দৃষ্টি খুব সাফ। অবস্থা বুঝে নিয়ে বিনু মুখ ফুটে কিছু বলার আগেই ব্যবস্থা করেন। মুখ ফুটে এসব ছোট ছোট দৈন্য জানাতে ওর যে মাথা কাটা যাবে তা তিনি ওকে দেখেই বুঝেছেন। কদিন আগেই, চান ক'রে উঠে বাড়িতে পরার জন্যে নিজের একটা শাড়ি দিয়ে রেখেছেন, ছেঁড়া নয় তবু পুরনো, পাড়ের রঙ চটা, বলেছেন, 'পাট ক'রে পরো। তাতে কোন দোষ নেই। কে আর দেখছে। আর বাড়িতে অনেকেই বোয়ের শাড়ি পরে কাটায়। নিজের কাপড় না কিনে বৌকে দেয়, তাতে বৌ খুশি হয়—অথচ নিজেরও কাজ চলে যায়।'

বলে খুব খানিকটা হেসে ছিলেন।...

সবই ভাল এখানের। মানুষ দুটো ভাল, ছেলেমেয়েরা ভাল—শান্ত নিশ্চিন্ত জীবন, নিস্তরঙ্গ কিন্তু নিরুদ্বিগ্ন। আরামে আলস্যে জীবন কেটে যাচ্ছে বেশ—কিন্তু তারপর ? তা ছাড়া ?

এভাবে তো চলবে না। চিরদিন তো নয়ই, বেশী দিনও চলা উচিত নয়। জীবন সামনে প্রসারিত, কত দূর কত দীর্ঘ এ পথ তা কে জানে।

কি করবে, কিভাবে দাঁড়াবে এ জীবনে। দু-চার পয়সার হাত খরচা, তারই সংস্থান নেই, এমনভাবে তো চলতে পারে না। অথচ কিভাবে চলতে পারে, ওর কিভাবে চলা উচিত, কোন পথে—জীবিকা উপার্জনের জন্যে—তাও তো বুঝতে পারে না। অন্য কোন পথই চোখে পড়ে না যে।

এ শহরে তার চেনা লোক কেউ নেই। চির দিনই তারা যেন কৌটোর মধ্যে বন্ধ থেকে মানুষ হয়েছে। আত্মীয়স্বজন কেউ কোথাও ছিল না, আর ছিল না বলেই পাড়া ঘরেও বিশেষ কারও সঙ্গে মিশতে পারে নি ওরা। মা কোথাও যেতেন না, ওদেরও যেতে দিতেন না। নেমন্তন্নে যাওয়া ঘটত না প্রায় কখনই। এক ও পাড়ার আনন্দময়ী তলা থেকে কালীপুজো দুর্গাপুজোয় প্রসাদ আসত, তাঁরা চাঁদা নিয়ে যেতেন প্রসাদ দিতেন—যেমন সকলকেই দেন। আর দু-একটা বাড়ি থেকে ক্রিয়াকর্মে খাবার আসত কিছু কিছু, তাও মা খেতে দিতেন না। অশ্রদ্ধার দান, অপমানের দান বলেই কি ? কে জানে। মুখে বলতেন, 'ওসব ঘাঁটা-চটকানো খাবার কে কি হাতে তুলে দিয়েছে—ও আর খেয়ে কাজ নেই।'

বরং কাশীতে ঐ ব্যারাক বাড়ির মধ্যে ক্রিয়াকর্মে ব্রতপার্বণে নেমন্তন্ন হত, দিদিমা নিজে বুকে ক'রে খাবার পৌঁছে দিয়ে যেতেন, দু-চার জায়গায় ওরাও গেছে। দাদার বন্ধুদের বাড়ি পৈতেয় বিয়েতে নেমন্তন্ন হয়েছে, গেছেও।

বস্তুত কাশীটাই ওদের দেশের মতো। এটা একেবারেই বিদেশ—'নিজ বাসভূমে পরবাসী' কথাটা ওদের পক্ষেই প্রযোজ্য।

এখানে চেনা বলতে তো ঐ বামুনমার বোন—বোনপো-বোনঝিরা, তাদের যা সাধ্য—বাড়িতে রেখে দু মুঠো খেতে দিতে পারবে, রেলের কারখানায় কি রাজগঞ্জের চটকলে আঠারো-উনিশ টাকা মাইনের একটা চাকরিও যোগাড় ক'রে দিতে পারে।

না না। তার চেয়ে আত্মহত্যা করাও ভাল। সেই কথাই মনে আসে—ভাবতে গেলেই রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণীর সেই লাইনটা মনে পড়ে কুমারের—'বল বোন তার চেয়ে মৃত্যু ভাল!'

এক একবার ভাবে ছোট কাকার কাছে যাবে? তাঁর কাছে কোন অবস্থাতেই যেতে বোধ হয় লজ্জা নেই।

পরমুহূর্তে নিজেই বোঝে তাতে কি ফল হবে। অর্থাৎ কিছুই হবে না।

দাদা যোগাযোগ রেখেছেন, সব খবরই পাওয়া যায়। তারাপ্রসাদের নিজেরই দৈন্যদশা চরমে উঠেছে। তাঁর দ্বারা কী উপকারই বা হতে পারে। কীই বা চাইবে তাঁর কাছে। বড়জোর একটা টিউশ্যনীর কথা বলতে পারে। তাতে লাভ কি? যাঁরা ভাল অবস্থা থেকে অভাবে পড়ে যায়, তাদের বন্ধু-বান্ধবরা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। প্রত্যেকের কাছেই হয়ত কখনও না কখনও কিছু ধার করেছে, দিতে পারে নি—তার পর আর প্রীতির সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়।

চাকরি। সেও সেই একই ব্যাপার। তাঁকে ধরে কোন সুবিধে হবে না। সরকারী মহলের সঙ্গে যোগাযোগ কখনই ছিল না। বড় সওদাগরী আপিসের সঙ্গে কাজ কারবার থাকবে এমন ব্যবসাও তিনি করেন নি। কাকে বলবেন চাকরির কথা।

আর, চাকরি করতেও ঠিক মন চায় না।

তবে?

তবে যে কি করবে, কি করতে চায়—সেটা সে নিজেও যে বুঝতে পারে নি এখনও।

আজকাল বিকেলের দিকে কবু ইস্কুল থেকে ফেরার আগেই বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। কবু সঙ্গে থাকলে বেশী দূর পর্যন্ত ঘোরা যায় না, আর সে অনর্গল কথা বলে, তার সঙ্গে বেড়ালে নিজের মতো ক'রে কিছু ভাবা যায় না।

একা একাই ঘোরে। আপন মনে পথে পথে হেঁটে বেড়ায়।

কী যে ভাবে তা নিজেও জানে না। ধারাবদ্ধভাবে কোন কিছুই ভাবে না। মানুষ দেখে। পথে বেড়ানোর এই একটা সুখ। বহু বিচিত্র মানুষ দেখা যায়। চিরদিনই ওর কাছে এটা একটা বিস্ময়ের আর আকর্ষণের জিনিস—এই মানুষের মিছিল। এইতেই যেন ভাল উপন্যাস পড়ার কাজ হয়।

এখানে থাকার এই একটি মাত্র অসুবিধে। ওর কাছে এটা বড় বেশী

অসুবিধে। বইয়ের অভাব।

এ বাড়িতে একখানা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি আর ক বছরের পকেট পাঁজি ছাড়া কোন বই নেই। গীতাঞ্জলিখানা ওঁদের বিয়েতে পাওয়া। আরও কিছু বই নাকি পেয়েছিলেন, প্যাডে বাঁধানো সস্তা অথচ চকচকে বই সব—সেগুলো আত্মীয়স্বজনরা পড়তে নিয়ে গেছে, আর ফেরৎ দেয় নি।

আছে যা, ছেলেমেয়েদের বই। ইস্কুলের পাঠ্য বই। ওদের মতো কোন গল্পের বই কিনে পয়সা খরচ করার অবস্থা নয় এখন পিনাকীবাবুর। ওর মনের কথা বুঝে সুভদ্রা সামনের দত্ত বাড়ি, পিছনের মিত্র বাড়ি থেকে দু-একখানা বই মাঝে মাঝে চেয়ে এনে দেন। বিনুর সেগুলো প্রায় সবই পড়া। তবু নতুন বইয়ের অভাবে আবার একবার ক'রে পড়ে। তবে সে-ই যা কতক্ষণ? তাদের বাড়িতেও বইয়ের সংখ্যা বেশী নয়, সেও যা কোন কোন বিয়েতে পাওয়া। বাংলা কি ইংরিজী গল্পের বই তখন কেউ কিনত না।

বই পড়ার জন্যেই এক-একদিন হাঁটতে হাঁটতে কলেজ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত চলে যায়। কাগজওলাদের কাছ থেকে—একটা তো বেশ স্টল-মতোই আছে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন মাসিক সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা নিয়ে পড়ে। তার পর ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যায় হেয়ার-প্রেসিডেন্সীর দিকে। এখানে ফুটপাথে বা রেলিং-এ চিরদিনই পুরনো বইয়ের কারবার চলে। অগুনতি লোভনীয় বই ঝুলছে, পুরনো বই, তার মধ্যে অনেক দুষ্প্রাপ্য বইও আছে। দামও সস্তা, ওর মনে হয় খুবই সস্তা, এক টাকার বই চার আনা পাঁচ আনায় পাওয়া যায়—পরে জেনেছিল এগুলো এক আনা পাঁচ পয়সা হিসাবে ওদের কেনা—তবু যতই সস্তা হোক, সেটুকু দাম দেবার মতোই বা ওর সামর্থ্য কই।

মুসলমান এই সব বইয়ের দোকানদাররা—দোকানই বলতে হয়, আর কি বলবে,—অদ্ভুত মানুষ। স্কুল-কলেজের লেখাপড়া কারও নেই, বাঙ্গালীও কেউ নয়—তবু এই কারবার করতে করতেই ভাল বইয়ের মর্ম বোঝে, কোনটা দুষ্প্রাপ্য কোনটার চাহিদা হবে—এসব ওদের নখদর্পণে। মানুষগুলোও ভাল। আগে আগে ভয় করত, এখন একটু একটু ক'রে সাহস বেড়েছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই, কোন ভাল বই পেলে অনেকক্ষণ ধরে পড়ে, কেউ কিছু বলে না। বরং অভয় দেয়, 'পাড়িয়ে না বাবু। উসমে কেয়া হায়। জেরা ঠিক সে পাকড়কে পাড়িয়ে কিতাব টুট না যায়—জেরা হোঁশ রাখিয়েগা, ব্যস।'

বিনু দেখে অনেক বড় বড় অধ্যাপক পণ্ডিতেরও এই রোগ আছে—প্রায় প্রত্যহই এঁরা এখানে অনেকক্ষণ ধরে ঘোরেন।

কিন্তু এক্ষেত্রেও ওর একটা মস্ত অসুবিধে—খুব সন্ধ্যে ক'রে ছাড়া দাঁড়িয়ে পড়তে ভরসা হয় না। বিকেলের দিকে সহপাঠী কারও এসে পড়ার সম্ভাবনা, আশংকাই বলা উচিত। অথচ অন্ধকার হয়ে গেলে আর পড়া যায় না। তাছাড়া বাড়ি ফেরার তাড়া আছে। পিনাকীবাবু রাত আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে খেয়ে নেন, ছেলেমেয়েরা ঐ সময় খায় সবাই, এক কবু ছাড়া। ওরা তিনজন বাকী থাকে, সুভদ্রাকে নিয়ে, সে পাটও নটার মধ্যেই চুকে যাওয়া উচিত। দেরি হওয়া মানে সুভদ্রারই কষ্ট, তাঁর শরীর সন্ধ্যের পর থেকেই যেন

ভেঙ্গে পড়ে।

বই পড়া ছাড়া আর একটি মাত্র উপায় বা পথ আছে তার—দুশ্চিন্তা ও হতাশা থেকে পালিয়ে যাওয়ার।

সে পথ ওর নিজের সৃষ্টির মধ্যে। লেখা ও আঁকা।

তবে 'সৃষ্টি' কি কিছু সত্যিই—ওর এই প্রয়াস?

শব্দটা মনে মনে উচ্চারণ করতে গেলেও লজ্জা করে।

ঐ শব্দটাকে প্রয়াস প্রসঙ্গে উচ্চারণ করাও কি ধৃষ্টতা নয়?

এই সব ছাইভস্ম লেখা আর আঁকা—এর কি কিছু মাত্র মূল্য আছে? হাস্যকর উপহাসযোগ্য ছেলেখেলা নয় কি? ওদের শিক্ষক বিভূতিবাবু একটা শ্লোক প্রায়ই আওড়াতেন—'মন্দঃ কবিযশপ্রার্থী গমিস্যাম উপহাস্যতাস'—যে কবিযশ প্রার্থীরা যুগে যুগেই উপহাসের পাত্র হয়েছে—বিনু হয়ত তাদেরই একজন।

একে সৃষ্টি না বলে সৃষ্টির চেষ্টা বললে তত হয়ত ধৃষ্টতা হয় না।

কবু আর রমার পুরনো খাতাপত্র একটা তাকে জড়ো করা ছিল—এমনি আছে অনেক দিন—বোধহয় দু বছরের খাতা হবে।

ইস্কুলের হোমটাস্কের খাতা, প্রতিদিন ক্লাসে ব্যবহারের জন্যে রাফ খাতা। কোনটার কিছু কিছু অংশ এখনও সাদা পড়ে আছে। কোনটার বা কিছু কম, অপর দু-একখানার প্রায় অর্ধেকটাই সাদা আছে।

দেখেই মনে হত এই কাগজগুলো ব্যবহার করার কথা। দুচারদিন তবু ইতস্তত করেছিল। তারপর যখন শুনল—রমাকেই প্রশ্ন ক'রে জেনে নিল—এগুলো স্রেফ শিশিবোতল-ওলার আবির্ভাবের অপেক্ষায় পড়ে আছে, তারা যে আসে না এ পাড়ায় তাও না, তাদের সময়ে আর সুভদ্রার অবসরে মেলে না বলেই এখনও বিক্রী হয় নি—তেমন সুযোগ ঘটলেই চলে যাবে—তখন আর দ্বিধা করল না।

বিক্রী যে কবে হবে তার ঠিক নেই যখন, কালও হতে পারে—বিনু পর পর দুটো দিন সুভদ্রার দুপুরের ঘুমের অবসরে বসে বসে খাতাগুলো থেকে নিষ্কলঙ্ক পাতাগুলো পরিপাটি ক'রে কেটে নিল।

এই সময়টাই ওর নিজস্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনে সামান্য একটু চাতাল, তার দুদিকে ঘর। একটাতে সুভদ্রা শুতেন তাঁর তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে, আর একটায় বিনু একেবারে একা। নিজেকে নিয়ে থাকার মতোই অবসর।

ছবি আঁকতে ইচ্ছা করত খুব কিন্তু না আছে রং না আছে তুলি। কাজেই সে ইচ্ছা মনে দেখা দেওয়া মাত্র ঠেলে বার ক'রে দিতে হ'ত। লেখাতে এসব কিছু দরকার হয় না, কাগজ আর কলম হলেই চলে, তাই দিয়েই চিন্তার ছবি আঁকার চেষ্টা করত। হয়ত হিজিবিজি, হয়ত অস্পষ্ট—হয়ত অর্থহীন, মূল্যহীন। তবু ওরই মধ্যে মুক্তির আস্বাদ পেত। সেটার মূল্য—ওর কাছে অনেক। অন্ধকার ভবিষ্যৎ, হিম হতাশা—ঐ সময় এই একটা স্থানে ঢুকতে পারত না।

সুভদ্রা বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত ওর এ প্রচেষ্টার সন্ধান পান নি। কল্পনাও করেন নি।

সন্ধান দিল রমাই। বিকেলে বিছানার চাদর পাল্টাতে গিয়ে একটা জায়গায় কি একটা উঁচু হয়ে আছে মনে হয়েছে। তোশক তুলে একরাশ খাতা ছেঁড়া কাগজ দেখে, উল্টে দেখতে গিয়ে দেখেছে দাদার হাতের লেখা। অনেকগুলো কাগজেই পুরো পাতা জুড়ে কি সব লেখা। বাংলা লেখা।

কৌতূহল হতে পড়ে দেখেছে। পড়ার চেষ্টা করেছে বলাই ঠিক। কারণ কিছু বুঝেছে, বেশির ভাগই বোঝে নি। তারপরই ব্যাপারটা আঁচ করে মার কাছে এসে খবর দিয়েছে 'মা, দাদা বই লেখেন।'

'সে কি রে!' সুভদ্রা অবাক হয়ে যান, 'যাঃ কে বললে তোকে ঐটুকু ছেলে আবার কি বই লিখবে।'

'হ্যাঁ গো, আমাদের পড়ার বইতে যেমন সব গল্প আছে না, তেমনি ধারা লেখা, আমি দেখলুম যে!' চোখ বড় বড় ক'রে বলে রমা।

'কৈ দেখি, চ তো।' সুভদ্রার তবু বিশ্বাস হয় না।

দেখলেন এ ঘরে এসে, পড়েও দেখলেন। গল্পই বেশির ভাগ। কোনটা শেষ হয়েছে, কোনটার খানিকটা লেখা। কোনটা বা সবে শুরু। মনে হয় যেদিন যা মনে এসেছে লিখতে আরম্ভ করেছে, একটা শেষ হবার আগেই আর একটা মাথায় এসেছে, সেটার হাত দিয়েছে এটা ফেলে। দু একটা নাটকও—ঐতিহাসিক পৌরাণিক—সবই দু একটা দৃশ্যে লেখা।

শুধুই লেখা নয়, ছবিও আছে।

রঙ্গীন নয়, কলম দিয়ে আঁকার চেষ্টা করেছে। ওর একটা ব্ল্যাকবার্ড কলম আছে, প্রায়ই গল্প করে প্রথম টিউশ্যনীর টাকা পেয়ে কেনা, দু টাকা দু আনা দিয়ে—প্রথম যেদিন কেনে, সেদিনই বসে একটা কবিতা লিখে ফেলেছিল। শুনেছিলেন, তত গুরুত্ব দেন নি, এমন একটু-আধটু কবিতা তো সব ছেলেই লেখে।

নিশ্চয় ঐ কলম দিয়ে ছবি আঁকার চেষ্টা করেছে। এমন কিছু নয়—তবে আঁকায় যে হাত আছে তা বেশ বোঝা যায়।

তখনই বসে দু তিনটে লেখা পড়ে ফেললেন সুভদ্রা।

দুটো শেষ করা গল্প দুটোই করুণ কাহিনী, কয়েকটা অর্ধ-সমাপ্তও। বেশ লাগল। ইদানীং আর পড়াশুনো করতে পারেন না, আগে তাঁরা যেখানে থাকতেন সেই পাড়াতেই চৈতন্য লাইব্রেরী—সেখান থেকে বই আনিয়ে পড়তেন। দুতিনটি ছেলেমেয়ে হবার পর আর সময়ে কুলোয় না, তাই আর লাইব্রেরী খোঁজার চেষ্টা করেন না!

তবে মোটামুটি ওর ভেতরেই অনেকে লেখা পড়েছেন। প্রভাত মুখুয্যে, চারু বাঁড়ুয্যে, শরৎ চাটুজ্যে, অনুরূপা, নিরুপমা—রবি ঠাকুরের উপন্যাসও পড়েছেন এক আধখানা। এ নামগুলো করেন প্রায়ই।

কাজেই সাহিত্য সম্বন্ধে সামান্য কিছু ধারণা আছে। ওঁর মনে হল এর লেখার হাত আছে। পড়তে গেলে ভাল লাগে, তাঁর লাগছে, এটাই তাঁর বিচারের

প্রধান মাপকাঠি।

তখন আর সময় ছিল না। অসুমের কাজ পড়ে আছে। লেখাগুলো তেমনি চাপা দিয়ে রেখে চলে যেতে হল।

কে জানে কেন, এই ছেলেটা সম্বন্ধে একটা গভীর মমতা বোধ জেগেছে মনে, এই দুই আড়াই মাসেই। নিতান্ত আপন মনে হয়, সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসতে দেরি হলে উদ্বেগ বোধ করেন, মাঝে মাঝে উঠে এসে সদর দরজা ফাঁক ক'রে দূর বড় রাস্তাটার দিকে চেয়ে থাকেন। মোড়ের মাথায় সেই বিশেষ চলবার ভঙ্গীটা চোখে পড়ছে কিনা। এ কোনদিন তাঁদের ছেড়ে যাবে মনে হলেই খারাপ লাগে, কেমন যেন একটা শূন্যতা বোধ করেন চিন্তাটা জাগা মাত্রেই।

আজ এই লেখাগুলো পড়ে ঠিক সেই কারণেই, তেমনিভাবেই একটা অকারণ গর্বে বুক ভরে গেল। নিজের একান্ত আপন জন—পুত্র বা স্বামী বা ভাই—এই ধরণের কারও কৃতিত্বে যেমন গর্ব বোধ করে মেয়েরা।

সেদিন বিনু বেড়িয়ে ফিরে দেখল রান্নাঘরের সামনে—ঠিক রান্নাঘর বলে কিছু ছিল না, ভেতর দিকের দালানেরই একটা প্রান্তের সামনে একটুখানি আধা পাঁচিল মতো গেঁথে একটা দরজা বসানো হয়েছে, পাঁচিলের ওপরটা তারের জাল দেওয়া বেড়ালের ভয়ে—বসে অল্পবাতির আলোয় প্রায় চোখের সামনে ধরে কি একটা দেখছেন সুভদ্রা, কতকগুলো কাগজের মতো জিনিস। ওদিকে ভাত চাপানো আছে, বোধহয় তার জল কমে এসেছে, আর একটু পরেই তলা ধরে যাবে—মার সঙ্গে রান্নাঘরে থেকে থেকে বিনুর এসব অভিজ্ঞতা যথেষ্ট, গন্ধে ও ভাত ফোটার শব্দেই টের পায়—সেদিকে হুঁশই নেই ভদ্রমহিলার।

'কী এত মন দিয়ে পড়া হচ্ছে? ওদিকে ভাত যে পুড়ে গেল।'

'চুপ করো চুপ করো, এক বড় লেখকের উপন্যাস পড়ছি, এখন বিরক্ত ক'রো না।' বলতে বলতেই কাগজগুলো ভাঁজ ক'রে বুকের জামার মধ্যে পুরে ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি ভাতে এক ঘটি জল ঢেলে ভাতটা নাড়তে থাকেন।

বলার ভঙ্গীতে, চাপাহাসির আভাসে—বিনু ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গেই আন্দাজ ক'রে নিয়েছেন।

তারই নির্বুদ্ধিতা, লেখাগুলো কবুদের পুরনো পরিত্যক্ত বইখাতার মধ্যেই রাখা উচিত ছিল। কিছু তাই আছেও। কিন্তু সব সময়ে বইখাতা সরিয়ে নামিয়ে বার করার অসুবিধে বলেই কিছু কিছু তোশকের নিচে রাখছিল। তবে সেটা যে এত পুরু হয়ে উঠেছে তা অত খেয়াল করে নি।

এতটা হেঁটে আসায়, আজ হেদোর মোড় থেকে আসছে, ওখানেও কিছু লোক পুরনো বই নিয়ে বসে—এমনিই ঘেমে গিয়েছিল। এখন দেখতে দেখতে নিমেষ মাত্রে সে ঘামে বড় বড় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়তে লাগল। কান মাথা, সমস্ত দেহ দিয়েই সেই ঘামের মধ্যেও যেন আগুন বেরোচ্ছে মনে হল।

এদিকে চেয়ে দেখল দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রমা মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও মুখের মুচকি হাসিতে কৌতুকটা ঢাকতে পারে নি।

তবু অনেক কষ্টে গলায় তাচ্ছিল্যের সুর আনার চেষ্টা ক'রে বলে, 'হ্যাঃ!

এতবড় লেখক তা কুঁচো কাগজে লেখা কেন ? বই ছাপে নি কেউ ?'

'অঃ। বই হবার আগে কাগজে লিখতে হয় না বুঝি ? লিখতে হয় কাটাকুটি করতে হয়—তাও জানো না বুঝি ? অমনি মন থেকে কি একেবারে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে নাকি ?'

'কী জানি। আমি অতশত কি ক'রে জানব। তা এতবড় লেখকটি কে ?'

'কে তুমি চিনবে না, তুমি বঙ্কিম রবি আর শরৎ ছাড়া কারও লেখা পড়েছ ? প্রভাত মুখুজ্যে, শৈলজা মুখুজ্যে—এদের নাম জানো ? তার পরও কত লেখক হয়েছেন—তাদের কারও খবরই রাখো না। এ হ'ল শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, খুব বড় লেখক, আরও বড় লেখক হবেন। আর শিল্পীও। দেখো না একদিন কত বড় হবেন। অনেক, অনেক বড়।'

বলতে বলতে সুভদ্রার গলাটা যেন গাঢ় হয়ে আসে।

এটা কি সত্যিকারের প্রশংসা—মনের ভাব ? না শুধুই স্নেহ ও প্রশ্রয় ! উৎসাহিত করার জন্যে বলা ? না কি ব্যাঙ্গ ?

বিনু যেন কেমন হয়ে যায়—আশায় ও আশঙ্কায়।

'এই যাঃ। কী ইয়ার্কি' হচ্ছে। যাঃ। কাগজগুলো ফেরৎ দিন। নিশ্চয়ই রমার কাজ—।...সময় কাটে না তাই ছেলেখেলা—। দিন, দিন বলছি।'

'না দিলে জোর ক'রে নেবে নাকি ? নাও, পারো তো।'

আর একটু এগিয়ে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ান সুভদ্রা। দুই চোখে সত্যকার স্নেহ। কৌতুকে উজ্জ্বল—তবে সস্নেহ কৌতুক।

লেখাগুলো যেখানে আছে সেখানে হাত দিয়ে নেওয়া যায় না। সে একটা হতাশার ভঙ্গী ক'রে বলে, 'যাঃ। আপনি বড় ইয়ে—

বলতে বলতেই আনন্দে তৃপ্তিতে—সংশয় তখন কেটে গেছে—চোখে জল এসে যায় বিনুর, সেটা ঢাকতেই হেঁট হয়ে একটা প্রণাম ক'রে বসে।

সুভদ্রাও আশীর্বাদের ভঙ্গীতে ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'সত্যিই ভাল হয়েছে, আমি মিছে বলছি না। খুব ভাল লেগেছে আমার। তুমি বড় হবে, খুব বড়—এই আমি আশীর্বাদ করছি। অবশ্যি তুমি বামুনের ছেলে—তোমাকে আশীর্বাদ করার অধিকার আছে কিনা আমার তা জানি না—তবু বয়সে তো বড়, আর আমাকে যখন প্রণামই করলে—'

অনেক কথা ভীড় করে ম'নে আসে বলেই বোধহয় বেশী কিছু বলতে পারে না।

সুভদ্রা গোপনে ওকে রঙ তুলির জন্যে পাঁচটা টাকা দেন।

বলেন, 'তুমি দেখে যা দরকার পছন্দ ক'রে নিয়ে এসো।'

বিনু তো অবাক। বেশ কিছু পরে বলে, 'তারপর ? কর্তা যদি জানতে পারেন ? কি বলবে ?'

'আপনি' আর 'তুমি' ব্যবধান প্রায়ই আজকাল থাকছে না।

প্রথম প্রথম হঠাৎ 'তুমি' বা তার উপযুক্ত অন্তরঙ্গ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ফেললে লজ্জা পেত, জিভ কাটত। এখন আর অত লজ্জাও পায় না দুজনের

কেউই। সুভদ্রা তো অভয়ই দিয়েছেন, বলেছেন, 'সংকোচ একদিন কেটে যাবে, তুমিই বলবে—এ আমি জানি, তাই জোর করি নি। এইভাবেই কেটে যায়—আপনার জন আপনার জনের সঙ্গে কথা কইবার ভাষা ঠিক খুঁজে পায়।'

কি বলে এঁকে সম্বোধন করবে সেই তো এক সমস্যা।

'বৌদি' বললেই ঠিক মানায়—কিন্তু যার ছেলেমেয়েরা দাদা বলে ওকে, তাকে বৌদি বলে কি ক'রে? তাই কদাচ কখনও খুব দরকার হ'লে কোনমতে 'মাসিমা' বলে ফেলে—তবে ডাকার ভঙ্গীটা নিজের কাছেই বড় আড়ষ্ট শোনায়।

প্রথম যেদিন মাসিমা বলেছিল, সুভদ্রা একটু দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে বলেছিলেন, 'কেন মাসিমা কেন? কাকীমা নয় কেন?'

ওঁর প্রসন্ন প্রশ্নে অভয় পেয়েছিল বিনু, সেও প্রশান্ত মুখেই উত্তর দিয়েছিল, 'মাসি অনেক আপন, কাকী তো পরের মেয়ে। আর কাকী বলার আগে যথার্থ আপন কাকা খুঁজে পাওয়া দরকার। তাই না?'

তারপর থেকে কোন কারণে রেগে গেলে সুভদ্রা বলতেন 'আমি কিন্তু তাহলে কাকী হয়ে যাবো বলে দিচ্ছি। আর মাসি বলতে দেবো না।'

'যা বলব সেটা আমার হাতে—উত্তর দেবেন কিনা আপনি জানেন। আর তেমন হয় আমি কিছু বলেই ডাকব না, 'শুনছেন' 'এই যে'—এই ভাবেই কাজ চালাবো।...আর মাসিও তো কাকী হয় কোথাও কোথাও। দুই বোন দুই জা এতো আখছারই হচ্ছে।'

ইদানীং তাই আর এই আপনি তুমির ব্যবধান নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। দুজনেরই সয়ে গেছে সাময়িক স্খলনটা।

আজও ওটা তত লক্ষ্য করলেন না। সুভদ্রা বললেন, 'সে জবাব কি ভেবে রাখি নি? বলব সামনের দত্ত গিন্নীর কাছ থেকে টাকা পাঁচটা ধার ক'রে ওকে দিয়েছি, তুমি মাইনে পেলে তাকে দিয়ে আসব। আহা ওঁর আবার রাগ!...মুখ ভার করবেন হয়ত, তবে কিছু বলবেন না। টাকাটা দিয়েও দেবেন। ধার যখন হয়েই গেছে তখন তো আর বারণ করার রাস্তা নেই। শোধ দিতেই হবে। নইলে ইজ্জতের প্রশ্ন।'

তারপর একটু মুচকি হেসে আরও বলেন, 'বলবেন না কিছু—কেন না উনি বেশ জানেন, বললেই আমি এক ঝুড়ি কথা শুনিয়ে দোব। আমার বাবার দেওয়া একটি বাকস গয়না উনি খুইয়েছেন ব্যবসা করতে আর বাড়ি ফাঁদতে গিয়ে। নতুনবাজার থেকে গিল্টির চুড়ি হার আনিয়ে রেখেছি—এমনি অবশ্য কোথাও নেমন্তন্নে যাই না—তবে আত্মীয়দের বাড়ি কোন কাজ হলে তো যেতেই হয়, দিদি আছেন, ভাই আছে, ননদ আছেন এই শহরেই, না বলা যায় না—গেলে ঐ চুড়ি হারই পরি, আবার সিঁদুর দিয়ে মেজে তুলে রাখি। উনি তো কখনও একখানা গয়না দেনই নি, খোকা হবার সময় সাধে শাশুড়ি নিজের গয়না ভেঙ্গে গড়িয়ে দিয়েছিলেন যা, তখনও তিনি বেঁচে ছিলেন—তাও নিয়েছেন সব। আমি কখনও সেজন্যে একটা কথাও বলিনি, কোনদিন কিছু চাইও নি। একটা শাড়ি কিনতে বলি না। ঐ গিল্টির চুড়ি হার উনিই এনে দিয়েছেন, নিজের প্রেস্টিজ বাঁচাতে। নইলে আমি শাঁখা লোহা পরেই যেতে পারি। আত্মীয়রা

তো সব জানেই—তাদের কাছে আর অসম্মান কি! এ সব কথা আমার মনে চুপড়ি চাপা আছে তা তিনি বেশ জানেন, কিছু বললেই চুপড়ি খুলব না!'

তুলি রঙ কাগজ—পাঁচ টাকায় কুলোয় না, সামান্য সামান্যই আনে। ছবি আঁকেও। প্রাণপণেই সুভদ্রার স্নেহের যোগ্য হবার চেষ্টা করে।

এর মধ্যে একদিন বেড়াতে বেড়াতে গঙ্গার ধারে গিয়ে পড়েছিল। তখন সূর্যাস্তের সময়, বসে বসে সে ছবি দেখেছে প্রাণভরে। একটা পালতোলা বড় নৌকো যাচ্ছিল, পালে অর্ধেকটায় ছায়া অর্ধেকটার রাঙা রোদ—দৃশ্যটা ভুলতে পারেনি। হাঁড়ি কলসী নিয়ে যাচ্ছে নৌকোটা, ঘাটাল থেকে আসছে হয়ত, বাগবাজারের খড়ো ঘাটে নামবে।

তখনই সেটা আঁকবার জন্যে মনটা আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠেছিল। কিন্তু কোন আয়োজনই নেই, শুধু ইচ্ছায় কি হবে? চেষ্টা করে সেই ছবিটাই আঁকতে—সেই অনির্বচনীয় অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা ফুটিয়ে তুলতে, তার আস্বাদ আনতে তুলিতে রঙে কাগজে।

প্রাণপণেই এঁকেছিল, ওর সামান্য শক্তি প্রয়োগ ক'রে।

কেমন দাঁড়াল তা ঠিক বুঝতে পারে না। সংকোচ হয় মনে মনে—ছবিটা অপরকে দেখাতে। কিন্তু সুভদ্রা প্রচুর প্রশংসা করেন। পিনাকীবাবুও বলতে বাধ্য হন যে, 'ছোকরার আঁকার হাত ভাল।'

সেই দুর্বলতাটুকুর সুযোগে তাঁর কাছ থেকে দশ আনা পয়সা চেয়ে নিয়ে বাঁধিয়ে নেন সুভদ্রা, নিচের বাইরের ঘরে নিজে হাতে টাঙিয়ে দেন ভাল ক'রে।

এই প্রথম নিজের সৃষ্টির স্বীকৃতি পেল বিনু।

॥ ৩৫ ॥

এ দিনটা ওর চিরকাল মনে থাকবে।

তবু মূল প্রশ্ন দুটো থেকেই যায়। হাত খরচার টাকা এবং তার চেয়েও যেটা বড়—ভবিষ্যৎ।

যত দিন যায় আর যেন লেখাতেও মন বসে না। এ লেখারই বা পরিণাম কি? কেউ কি ছাপবে কোন দিন? ছাপলেই কি কেউ পড়বে? বই হয়ে কি বাজারে বেরোবে কখনও?

এসব প্রশ্ন নিরুত্তরিতই থেকে যায়। কোন রকম আশা করতে—এমন কি স্বপ্ন দেখতেও যেন ভরসায় কুলোয় না। জীবনে ভরসা বা আশার মুখ তো দেখে নি এতাবৎ কাল। ওর ভাগ্যে শিল্পী কি লেখক বলে স্বীকৃতি! দ্যুৎ। কি ক'রে হ'তে পারে তাই তো কল্পনার অতীত।

মনে পড়ে যায় বিভূতিবাবুর সেই শ্লোকটা। কবিযশঃপ্রার্থীদের যুগে যুগেই এক অবস্থা।

এরা খুবই ভাল, কিন্তু এটা ওর ঘর নয়। এখানে থাকা নিতান্তই দয়ার উপর নির্ভর ক'রে।

মার কথা মনে পড়ে, দাদার কথাও। সেটাই ওর ঘর, তারাই আপন। মা

ভেতরে ভেতরে ভেঙ্গে পড়বেন তবু মচকাবেন না। কিন্তু তাঁর দৈহিক ও মানসিক কষ্ট কতটা হচ্ছে তা সকলের চেয়ে বেশী ও-ই জানে।

সেখানের দরজা খোলাই আছে। কিন্তু এইভাবে হার মেনে গিয়ে দাঁড়াবে। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে শুধু হাতে মাথা হেঁট ক'রে!

মা তিরস্কার করবেন, আজকাল তাঁর ভাষা কঠোর কঠিন হয়ে উঠেছে দিন দিন। দাদা বাঁকা বাঁকা কথা শোনাবেন। মাকেই বলবেন কথাগুলো, ওকে শুনিয়ে।

হয়ত বলবেন, 'এখনও ঢের সময় আছে, একটা বছর গেছে যাক, কোন একটা অল্প মাইনের কলেজে গিয়ে ভর্তি হও। নয়তো চাকরি বাকরি খুঁজে নাও। বিধবা বোনের মতো বসে খাওয়াতে পারব না।'

পড়া আর হবে না। সহপাঠীদের থেকে এক বছর পিছিয়ে থেকে—ছিঃ! এমনিই বয়স ঢের হয়ে গেছে, এখন আবার শিশু ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশতে পারবে না। আর চাকরি। ম্যাট্রিক পাশ ছেলের কি চাকরিই বা হতে পারে—এই বিশ্বজোড়া মন্দার বাজারে। হয়ত অনেক ধরাধরি অনেক ঘোরাঘুরি করলে কোন মুদীর দোকানে বা ছোট-খাটো লন্ড্রীতে কাজ পেতে পারে কুড়ি কি পঁচিশ টাকা মাইনেয়। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব করতে হবে, ভোর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। একেবারে মরবার সময় হয়ত মাইনের অংকটা চল্লিশ কি বড় জোর পঁয়তাল্লিশে পেঁছিবে।

না। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকের লাইনটাই মনে পড়ে যায়, 'তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।'···

আবার এক এক সময় নিজের মধ্যে একটা বিরাট উদ্দীপনা—অপরিসীম বল বোধ করে—অগাধ ভরসা, বিপুল শক্তি।

ভগবান তাকে বড় একটা কিছু করার খুব বড়—সনদ দিয়ে পাঠিয়েছেন। অনেক বড় হবে সে। নিজের পথ নিজে ক'রে নেবে। স্বনামধন্য বিখ্যাত লোক হবে—কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। আজ যারা করুণার চোখে দেখছে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে হয়ত—তারাই বিস্ময় বোধ করবে ওর সে অভাবনীয় অভ্যুত্থানে, সমীহ করবে, সম্মান করবে। ওর সামান্য অনুগ্রহের জন্যে ধর্না দেবে।

এখন হয়ত পথ দেখতে পাচ্ছে না—কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাবে। পথ ক'রে নেবে। নইলে ভগবান তাকে এমন কল্পনা আর উচ্চ আশা দিয়ে পাঠাতেন না পৃথিবীতে।

খুব, খুব বড় হবে সে।

রবীন্দ্রনাথের মতো লেখক হবে, অবনীবাবুর মতো শিল্পী। পড়াশুনো করলে সে অধ্যাপক হ'ত, পণ্ডিত হ'ত যথার্থ। পৃথিবীর লোক তার নাম শুনলে সম্ভ্রমে দু হাত ঠেকাত মাথায়।···

লেখাপড়া ছেড়ে দিলেও পড়াশুনো তো ছাড়ে নি। লিখবে সে, ভাল ভাল বই লিখবে। অপরের বই, কলেজের বই পড়বে না বলে মা ধিক্কার দিচ্ছেন, তার বই লক্ষ লক্ষ লোক পড়বে। সবাই যেন এ কথাটা সে সময় মিলিয়ে নেয়।

এই সব সহসা-অনুভব-করা আশা-উদ্দীপনার দিনগুলোতে সে স্থির থাকতে পারে না। এই ঘরে, এই খাটের ওপর ছোবড়ার গদীর শক্ত বিছানায় শুয়ে থাকা—অসহ্য লাগে। ছটফট ক'রে বেরিয়ে পড়ে হন-হন ক'রে হাঁটতে থাকে।

কিছু একটা করতে হবে তাকে। ধরিত্রীর মধ্যেকার তরল আগুনের মতো তার উত্তেজনা ভেতরে ফুটতে থাকে। আর কিছু না পেলে যেচে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ করে।

কোন দোকানে কেউ চুপ ক'রে বসে আছে—বিনু কোন একটা উপলক্ষ ক'রে আলাপ জুড়ে দেয়। হেঁদো কি শ্যাম স্কোয়ারে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসে পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করে। কেউ বিস্মিত হন, কেউ শঙ্কিত—পুলিশের গোয়েন্দা ভেবে। কেউ বা মজা দেখেন। বিনু অত লক্ষ্য করে না, মাথাও ঘামায় না। সে যেন তখন একটা ঘোরে থাকে।

আরও—তার কেমন মনে হয় এইভাবে নতুন নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করতে করতে একদিন সৌভাগ্যের পথটা খুঁজে পাবে, এদেরই কারো দ্বারা উপকৃত হবে। অথবা কারও মুখ থেকে পাবে যে পথের ইঙ্গিত—কল্পনার স্বপ্নপুরীর ঠিকানা।

এই ভাবেই একদিন দত্ত মশাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

হেঁদোর কাছে একটি পুরনো ফার্ণিচারের দোকান। তারই মালিক দত্তবাবু সামনের দিকে আড়াআড়ি ক'রে রাখা একটা বেঞ্চির এক পাশে—রাস্তার দিকের পাশে—বসে ক্রমাগত বিড়ি টানেন। দুটি ছোকরা কর্মচারী আছে—সাগরেদ গোছের, বোধহয় মাইনে টাইনে বিশেষ দেন না—তারা, কাজ যে জোর চলছে সেটা দেখাবার জন্যে কেউ বা স্পিরিটে গালার গুঁড়ো দিয়ে বার্নিশ তৈরী করে, কেউ বা পুরনো আসবাবের গায়ে আলতো হাতে বালি-কাগজ ঘষে।

কে জানে কেন—এই দোকানটা সম্বন্ধে বিনু একটা দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করে।

দু একটা নতুন আলমারী কি খাট যে নেই তা নয়—মিস্ত্রীদের কাজ দিয়ে হাতে রাখবার জন্যে তাও করাতে হয়—তবে আসল ব্যবসা ওঁর পুরনো আসবাবেরই। কোথাও কেউ ভাল আসবাব বিক্রী করছে শুনলেই দত্ত মশাই পেট কাপড়ে কিছু টাকা বেঁধে নিয়ে ছোটেন। মালগুলো কোন নীলামওলার কাছে গিয়ে পড়বে, দত্ত মশাইয়ের সাধ্যর বাইরে চলে যাবে—উনি চেষ্টা করেন তার আগেই গিয়ে হাতাতে। সাহেবরাই ভাল ভাল ফার্ণিচার ব্যবহার করে—বিক্রীও ক'রে দেয় কথায় কথায়—তবে সে সব মাল ধরা বড় মুশকিল। তারা একেবারে এক লটে বেচতে চায়, সোজাসুজি নীলামওলাদের ডেকে ছেড়ে দেয়—কিন্তু বাঙ্গালীবাবুদের অন্য রকম। যে সব সম্ভ্রান্ত লোক এককালে খুব ধনী হয়ে উঠেছিলেন বা জমিদার ছিলেন, তাঁদের বংশধররা সে সব পয়সা ক্ষোয়ালেও তাঁদের ইজ্জৎ-জ্ঞানটা থাকে টনটনে। পয়সার চেয়ে মানসম্মান নষ্ট হওয়ার ভয়টা অনেক বড়। তাঁরা গাড়ি ডেকে এক লপ্তে সব ছাড়তে পারেন না, একটা একটা ক'রে ছাড়েন। দত্ত মশাই—শকুনি যেমন ভাগাড়ে গরু পড়ার অপেক্ষায়

থাকে—এমনি কটি বিখ্যাত বনেদী ঘরের দিকে চোখ-কান খোলা রাখেন সর্বদা।

এদের ঘরের আসবাব সেই কারণেই জলের দামে বিক্রী হয়! এমন পুরনো ফার্নিচারের দোকান আরও আছে। তবে তারা নাকি ওঁর মতো এত সুবিধে করতে পারে না। সেজন্যে দরও ওঁর মতো দিতে সাহস করে না।

দত্ত মশাই হেসে বলেন, 'বোকা, বোকা। শালারা ঘরে মাল তুলেই শিরীষ কাগজ ঘষে সাফ করতে লেগে যায়। পুরনো রঙ চেঁচে তুলে নতুন রঙ ক'রে চকচকে ক'রে তোলে নতুনের মতো। আহাম্মক বেটারা জানে না, মদ থেকে শুরু করে আসবাব পর্যন্ত পুরনোরই কদর বেশী। আরে—আগে খদ্দের আসুক, দেখুক সাবেক মাল কিনা—তারপর তার কাছে বায়না নিয়ে তবে বালি-কাগজ আর বার্নিশে হাত দোব—তার ফরমাশ মতো। পুরনো ছোপ তুলে দিলে নতুন কাঁচা কাঠের আসবাবের সঙ্গে পুরনোর তফাৎ কি রইল। কাঠের ফাইবার দেখে বুঝবে—কী কাঠ, কদ্দিনের কাঠ এমন জহুরী কলকাতায় কটা আছে। হুঁঃ।'

দত্ত মশাইয়ের সঙ্গেও একদিন যেচেই আলাপ করেছিল, ভাল লেগেছিল মানুষটিকে। তার পর থেকে প্রায়ই আসে, কিছুক্ষণ বসে দত্তবাবুর বক্তৃতা শুনে যায়। বেশ লাগে এসব ব্যবসার গোপন রহস্যগুলো, ভাল লাগে এই সব দামী পুরনো আসবাবগুলোকেও।

কাঠের সে কিছুই চেনে না, কাকে সেগুন বলে, তার মধ্যে কোনটা বার্মা টীক, আর কোনটা সি. পি—কোনটা মেহগ্নি কোনটা আবলুষ—আবার কোনটাই বা কাষ্ঠ সমাজে অপাংক্তেয় নিহাৎ ব্রাত্য জারুল—কিছুই বুঝতে পারে না। অনেক কষ্টে বেশ কয়েকদিনের চেষ্টায় দত্তবাবু মেহগ্নি ও আবলুষের রঙটা চিনিয়ে দিয়েছেন।

উনি বলেন, 'তোমার ভাগ্যি ভাল ছোকরা, এই সময়েই অমর বোসের এই মালগুলো এসে পড়েছে। নইলে শীলেদের বাড়ির মাল চলে যাওয়ার পরে—অনেকদিন আর আবলুষের চেহারা দেখি নি। আবলুষ তো এসব অঞ্চলে হয় না, অন্তত আমি জানিনে কোথায় হয়, মেহগ্নি হয় অবিশ্যি, কেষ্টনগরে দেখে এইচি রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ—আবলুষ গাছ কখনও দেখি নি। মেহগ্নিই থাকে তবু দু একটা কিন্তু আবলুষ? রাম কহো। বাঙ্গালীর দেড়ছটাকে কাঁপা, কাঁপা কাকে বলে জানো তো? আধখানা নারকেল মালা, মাপ মতো, কোনটা এক ছটাকে, কোনটা দেড় ছটাকে—একটা কাঠে পরিয়ে তেলের টিনে ডুবিয়ে রাখে, অল্পস্বল্প তেল আর বার বার পাত্তর সুদ্ধ ওজন করতে হয় না। ঐ কাঁপা গুন্তি করে খদ্দেরের শিশি কি বাটিতে ঢেলে দেয়।—হ্যাঁ, যা বলছিলুম, বাঙালীর এক ছটাকে বড় জোর দেড় ছটাকে কাঁপা, এ কাঠ কে ব্যবহার করবে। করে এক রাজা মহারাজারা আর করে সায়েবরা। তাও সে সব খানাদানী সায়েব ক্রমেই কমে আসছে। পুরনো লোক যারা এসবের কদর বুঝত তারা বেচে কিনে বিলেতে ফিরে যাচ্ছে, নতুন যারা তারা—হাল ফ্যাশানের ফঙ্গবেনে মাল কিনছে। এ বেটারা ভাল মাল চেনেও না, কদরও বোঝে না। এক বেটা সাহেব এসেছিল বলে আয়রণউডের মাল নেই? আয়রণউড বুঝলে? লোহা কাঠ। লোহা যখন

তখন খুব মজবুত হবে। বোকা ব্যাটাদের বুদ্ধি!'

বিনুও এসব চেনে না। তবে এই ধোঁয়া ময়লার চিট ধরে যাওয়া বড় বড় আলমারী আর ভারি ভারি পালংকগুলো ওর দেখতে বেশ লাগে।

দত্ত মশাই এই প্রীতিকে ব্যবসায়িক আকর্ষণ বলে ভুল করেন। তিনি চেনাতে চেষ্টা করেন কোন কাঠের কি লক্ষণ—কি কি দেখে চিনবে কোনটা সীজনড্ টিক আর কোনটা নয়—কেমন ক'রে তা পরীক্ষা করা যায়, ইত্যাদি। এসব যে ওর মাথায় ঢোকে না তা নয়, এদিকে মন দিতে পারে না।

এসব আসবাব দেখতে দেখতে ও যেন চলে যায় বহু দূরে—কল্পনা ও কাহিনীতে গড়া এক সুদূর অতীতে, সেখানেই ওর মন নব নব পুরাতন কাহিনী বা ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত থাকে।

এই দামী কাঠে সুদক্ষ মিস্ত্রীকে দিয়ে তৈরী করানো আসবাব অথবা নাম করা ফার্ণিচারের দোকান থেকে খরচার বহুগুণ বেশী দাম দিয়ে কেনা—যাঁরা এসব করেছিলেন না জানি তাঁদের কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত অভিমান বা অহংকার ছিল সেদিন, এই অকারণ বিলাসের পিছনে। না জানি তাঁরা কেমন লোক ছিলেন, কী মেজাজের মানুষ, কত পয়সা তাঁদের, না জানি পয়সা নিয়ে কি ছেলেখেলা ক'রে গেছেন সামান্য সামান্য খেয়াল চরিতার্থ করতে বা জেদ বজায় দিতে—আর তাঁদের বংশধররাই পেটের দায়ে অভাবে পড়ে এই সব জিনিস জলের দামে বেচে দিচ্ছে বাধ্য হয়ে।

হয়ত তাঁরা এর দাম, এদের ইজ্জৎ কিছুই জানে না, চেনেও না কী জিনিস তারা এমনভাবে জলের দামে ছেড়ে দিচ্ছে। সেটুকু শিক্ষাও তাদের পূর্বপুরুষরা দিয়ে যেতে পারেন নি।

এই সব ভারি বিচিত্র অলংকারে সমৃদ্ধ পালংকে কারা শুত। ব্রাহ্মণের ঘরের বিবাহিতা স্ত্রী, না বাইরের বাইজী, না বাবুরা ক্ষণিকের কদর্য কামনা চরিতার্থ করতে সামান্য দাসীকে নিয়ে শুতেন এই সব মহার্ঘ্য শয্যায়? যারা শুত যারা করিয়েছে এসব, কে তারা? কি তাদের পরিচয়? এই পালংকে শুয়ে কত মেয়ে হয়ত রাতের পর রাত তার ভর্তা বা দয়িতের অপেক্ষা করেছে, ব্যর্থ হয়ে হতাশার চোখের জল ফেলেছে সেই প্রতিটি রাত্রেই। আবার হয়ত কত কুরূপা মেয়ের কানের কাছে তার রূপবান স্বামী প্রণয় কূজন করেছে দীর্ঘ রাত্রি ধরে। কত অবিশ্বাসিনী স্ত্রী হয়ত প্রতীক্ষা করেছে স্বামীর ঘুমিয়ে পড়ার—তারপর উঠে গেছে উপপতির সামান্য কঠিন শয্যায়।

এই খাট, এই পালংক, এইসব আলমারী, বুককেস বা দেরাজগুলো, না জানি কত বিচিত্র অবিশ্বাস্য ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। কত মর্মন্তুদ ব্যথা কত অব্যক্ত বেদনা আজও এদের এই কাষ্ঠ-হৃদয়ের কোষে কোষে সঞ্চিত আছে। কত বিয়োগান্ত নাটকের সাক্ষী এরা, কত দুর্দশা কত দুর্ভাগ্যের ইতিহাস বহন করছে। কত কুমারী মেয়ের বাপ হয়ত এইসব আসবাব দিয়েছেন তার বিবাহে, কিন্তু সে মেয়ে হয়ত একদিনও সুখে কি শান্তিতে ভোগ করতে পারে নি এসব, হয়ত আদৌ ভোগে আসে নি—হয়ত ফুলশয্যার রাত্রেই তাঁর স্বামী গাড়ি জুতিয়ে বেরিয়ে গেছেন তাঁর রক্ষিতার বাড়ি, কিম্বা সে মেয়ে হয়ত একমাস কি দুমাস

কি এক বছরের মধ্যে বিধবা হয়েছে।

এইসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে হাত বুলোয় সে। এগুলোকে স্পর্শ ক'রেও যেন একটা অনুভূতি জাগে, সৃষ্টির প্রেরণা। কল্পনার সিংহদ্বার খুলে যায় মনের সামনে। আজও এইসব আলমারী খুললে কোনটায় ন্যাপথলিনের গন্ধ কোনটায় আতর বা উগ্র বিলিতী সৌরভের গন্ধ মেলে। এরা মৃত নয়, এরা এখনও জীবিত, শুধু নীরব হয়ে আছে। এই দরিদ্র পরিবেশ, এই অগৌবরের মধ্যে এসে পড়ে নিঃশব্দে পূর্ব গৌরবের রোমন্থন করছে। এদের কাছে সে মনে মনে ভিক্ষা জানায়—সেই বিস্মৃত বিচিত্র আনন্দবেদনায় ভরা ইতিহাসের কিছু শোনাতে, ওর অনির্বাণ গল্প শোনার আর গল্প পড়ার ক্ষুধা খানিকটা অন্তত মেটাতে।

এইসব ভাবতে ভাবতে এক এক সময় বিভোর হয়ে যায়—চমক ভাঙ্গে দত্তমশাইয়ের তিরস্কারে, 'না, তোমার কিছু হবে না, একদম মন নেই তোমার। ভেবেছিলুম বুদ্ধিমান ছেলে, লেখাপড়া শিখেছ, জিনিসটা ধরে ফেলতে পারবে চট ক'রে। চাই কি পরে এই ব্যবসাই ক'রে খেতে পারবে। তা মনই দিতে পারো না। শিখবে কি?'

অপরাধীর মতো মুখ ক'রে বিনু বলে, 'আসল কথাটা কি জানেন, এই কাঠগুলো দেখতে দেখতে এদের মালিকদের কথা মনে পড়ে যায়—আর আপনার কথা মাথায় ঢোকে না!'

'আরে ছোঃ। তাদের কথা ভাবারই বা কি আছে, শোনারই বা কি আছে! মাতাল নোচ্চা, কোন গতিকে বরাতের জোরে লক্ষ্মীবন্তর ঘরে এসে পড়েছিল। বাপ পিতোমো ফন্দি ফিকির ক'রে খেটে খুটে দুটো পয়সা ক'রে রেখে গেল তো ব্যস, শুরু হয়ে গেল মদ জুয়া আর খানকীর রেলা! কাপ্তেনী ক'রে মোসায়েব পুষে বেড়াল কুকুরের বে দিয়ে পঞ্চাশ বছরের সঞ্চয় তিন বছরে উড়িয়ে দিলে। তারপর আর কি, রইলেন তার পরের পুরুষ—যো-সো করে টিকে থাকতে পারল হয়ত কোনমতে, কিছুটা ঠাট বজায় দিয়ে—তারপরেই ভাঙ্গাবাড়ির ভাগ কিম্বা পুরনো আসবাব বেচে দিন কাটানো—রোগের ডিপো এক একটি বাবু। অন্ধকার ঘরে বসে হাঁপাচ্ছেন দেখগে যাও। সেই কথায় আছে না—এক পুরুষে কেনারাম, তারা কিনে এসব মজুত করে, বাড়িঘর জমিদারী আসবাব গহনা গাড়ি জুড়ি—পরপুরুষে রাজারাম, নবাবী চালায় সেই বেটারাই—তার পরের পুরুষে বেচারাম, ঠাকুর্দার আমলের মাল বেচে বেচে খায়।'

তার পর নিভে যাওয়া বিড়িটা পথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন, 'এইসব ল্যাজারাসের বাড়ির জিনিস, খাঁটি মেহগনির—একো একো আলমারী তখনকার দিনেই সাতশো আটশো টাকা দাম ছিল। আর সে জায়গায় এই তো আমিই দুটো আলমারী আর দুখানা পালং চীনেমিস্ত্রির হাতের কাজ করা—হাজার টাকায় নিয়ে এইচি। অমর বোসের বাবা গৌরাঙ্গ বোসের অনেক কুকুর ছিল, দামী দামী বিলিতী কুকুর চোদ্দপুরুষের কুলুজী মিলিয়ে তবে আনাত বিলেত আমেরিকা থেকে—ঐসব কুকুরের স্যাবা করার জন্যে ত্যাখনকার দিনেই পাঁচশো টাকা মাইনে দিয়ে সায়েব চাকর পুষেছিল। তাতেও জলজ্যান্ত একটা জামাইকে

খেয়ে ফেলেছিল কত্তার পোষা ডাল-কুত্তা। রাত্তিরে ছাড়া থাকত, জামাইকে বলে দিয়েছিল বৌকে না ডেকে কলঘরে যেও নি—তা সে বেটার নেহাৎ ঘনিয়ে এয়েচে—অত খেয়াল করে নি। অধম্মের পয়সা বোধহয়—বের তিন মাসের মধ্যে মেয়ে রাঁড় হল।'

আবার একটু দম নিয়ে বলেন, 'অবিশ্যি অমর বোস কাপ্তেনী ক'রে ওড়ায় নি এটা বলব। উকীল ছিল, নামকরা উকীল। কিন্তু অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, আরও টাকা করব ফুসমন্তরে, ভেবে ফাটকা খেলতে গিয়ে সব ডুবল। অমন মান্যমান লোকটাকে এইসব মাল বেচে বেচে খেতে হচ্ছে, জলের দামও নয়, ঘোলাজলের দামে। গেরো, নইলে উকীল, দুদিনেই ফের কামিয়ে নিতে পারত। এক বিধবার সম্পত্তি দেখাশুনো করত, মাস মাস ফী নিত তার জন্যে, টাকা খাটিয়ে দেবে এই কথা—অগাধ বিশ্বাস করত মেয়েছেলেটা, অমর বোস ফাটকার দেনা সামলাতে সব খেয়ে বসে রইল। সে বুড়ি হয়ত বিশেষ কিছু করতে না, 'মা' 'মা' করে খুব ভিজিয়ে দিচ্ছিল বুড়িকে অমর বোস, কিন্তু বুড়ির ভাইপোরা ওয়ারিশ্যান, তারা ছাড়বে কেন? দিলে চারশো সাত ধারায় না আট ধারায় মামলা ঠুকে! বোসের পো লড়েছিলেন খুব—কিন্তু শেষ রাখতে—পারলেন না। এক ঘর-জামাই গোছের বোনাই ছিল, দূর সম্পর্কের—তবে ছিল গৌরবোসের আমল থেকে—তাকে অপমান ক'রে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিছিল—সে-ই ভগ্নীপোতই আদালতে গিয়ে ওদের হয়ে সাক্ষী দিলে, মায় পুলিশে জানিয়ে আসল কাগজপত্তর কোথায় আছে সে সন্ধান দিয়ে—একেবারে হাতে নাতে ধরিয়ে দিলে। ব্যস। আর কি, জেল হয়ে গেল। বেশী দিনের কয়েদ হয়নি—মানী লোক তো, কিন্তু উকীলের খাতা থেকে নাম কাটা গেল—আর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে হল না। এখন বাপের এইসব দামী দামী জিনিস বেচে খাচ্ছে। বড়লোক শ্বশুর কিছু কিছু মাসোহারা দেয়—তবে তাতে কি পুরো সংসার চলে? আর, একবার বড়মানুষী ধাতে এসে গেলে—মানুষ হাজার কষ্টেও হাত গুটোতে পারে না।'

এই পর্যন্ত বলে আর একটা বিড়ি ধরিয়ে একটু চুপ ক'রে বসে সেটা টানেন দত্ত মশাই। তারপর হঠাৎ বলে বসেন, 'তা দ্যাখো না ছোকরা, তুমি তো ভ্যাগাবেনের মতো ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছো—দু-চারটে বড়লোকের বাড়ি যাও না। শুনছি এখন মা লক্ষ্মী ভবানীপুর ছেড়ে বালিগঞ্জে নতুন বাসা করেছেন—ঐদিকেই সব উঠতি বড়লোকরা গিয়ে বাড়ি করছে। দেখেশুনে—আগে হালচাল দেখবে, কেমন কাপড় শুকোচ্ছে বাড়িতে, আস্তাকুঁড়ে বড় মাছের আঁশ না কুঁচো চিংড়ির খোলা—হ্যাঁ হ্যাঁ, হেসো না, এতেই বুঝতে হয় বাড়ির মালিকের নজর কেমন, পয়সা কেমন—তেমন বুঝলে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে কথাটা পাড়বে। দামী ফার্ণিচার জলের দামে বিকুচ্ছে, বাবুরা রাখবেন?'

তারপর অকারণেই গলাটা নামিয়ে বলেন, 'অবিশ্যি মেহগ্‌নি কাঠ আর ল্যাজারাসের বাড়ি এসব হয়ত বানান করে বোঝাতে হবে বাবুদের, এক পুরুষে পয়সা তো, এসব জিনিসের মর্ম বুঝবে না। দু একজন হয়ত নাম শুনেও থাকতে পারে। দ্যাখো না, যদি পারো বেচে দেওয়াতে, তোমাকে কিছু দোব।

কিছু মানে দু-এক টাকা নয়, ভালই দোব—যদি অবিশ্যি তেমন দাম তুলতে পারো। দ্যাখো না, বেকার বসে আছ—এও একটা লাইন, সেলসম্যানশিপ। ভাল লাইন। দালাল বললে খারাপ শোনায়, আর এ ঠিক তা নয়তো—ভাল কাজ। যদি এলেম থাকে এই ক'রেই অমন লাখো টাকা কামাতে পারবে জীবনে। ভেবে দ্যাখো গে।'

ভেবে দ্যাখে বিনু, সত্যিই ভাবে।

ওর মনে হয় এটা দৈবেরই ইঙ্গিত, ভগবানই এদিকে যেতে বলছেন। নইলে ঐ বুড়ো মানুষটার সঙ্গে অত ভাবই বা হবে কেন, আর ও লোকটাই বা দুম ক'রে একথাটা পাড়বে কেন?

উত্তেজনায় আগ্রহে অস্থির হয়ে পড়ে। কিন্তু কল্পনা বা আশাকে বাস্তবে পরিণত করায় অনেক বাধা। এমন অনেক বাধা বা অসুবিধা আছে যা লোককে বলা যায় না এতই সামান্য, অথচ তার জন্য অনেক উজ্জ্বল সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যায়। হাতে একটা পয়সা নেই। বালিগঞ্জ এখান থেকে বিস্তর দূর। বেলেঘাটা থেকে ট্রেনে ক'রে গেলেও পাঁচ পয়সা ক'রে দশ পয়সা খরচ আর—এখান থেকে ষ্টেশন অবধি হেঁটে যাওয়া-আসাতেই তো একটি ঘণ্টা চলে যাবে। সকালে হবে না। বিকেলে গিয়ে বালিগঞ্জ, সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে বালিগঞ্জের বড়লোক পাড়ায় ঘুরে ফিরে আসতে, যদি এক ঘণ্টাও ঘোরে ওখানে—রাত দশটা বেজে যাবে। এঁদের আশ্রমপীড়া ঘটানো হবে।

তাছাড়া—ওখানে যারা বড়লোক বলে গণ্য তারা সব উকীল ব্যারিষ্টার ডাক্তার ব্যবসাদার, সকাল ক'রে বাড়ি ফেরার লোক নয় কেউ তারা। কে কখন আসে—এলেও হয়ত নানা কাজে ব্যস্ত থাকবে। উকীল ডাক্তার হলে তো কথাই নেই, রাত বারোটা পর্যন্ত লোক ঘিরে বসে থাকে। তখন এসব কথা শুনবে কে?

না, এসব কাজে যাবার সময় হল সকাল বেলা। সে এক রবিবার ছাড়া সম্ভব নয়।

তাও, এক রবিবারেই না হয় যেত—কিন্তু রেস্ত বলতে মোট এক আনা পয়সায় ঠেকেছে, দুদিকের ট্রেন ভাড়াই তো আড়াই আনা—কে দেবে?

সুভদ্রাকে বললে অবশ্যই দেবেন—কিন্তু না, সে বড় জুলুম করা হয় ভদ্র-মহিলার ওপর। অবস্থা তো সে নিজেই দেখছে, একটি পয়সার আজির—এমনভাবে দিন কাটান। গোপন যা দু-এক টাকা আছে বিপদের দিনের জন্যে আগলে রেখে দিয়েছেন—ছেলেমেয়েদের অসুখের জন্যেই আরো—নির্লজ্জের মতো তার ওপর নজর দিতে পারবে না বিনু।...

ভাবতে ভাবতে হতাশই হয়ে পড়েছিল, হঠাৎই মনে পড়ে গেল নামটা।

অনাদিপ্রসাদ। ওর সেজ কাকা।

তিনি খুব ধনী না হলেও অবস্থাপন্ন তা শুনেছে। কোথায় বড় বাড়ি ফেঁদেছেন, মোটর গাড়ি কিনেছেন একখানা। তিনি নিলেও নিতে পারেন। অন্তত তিনি ও জিনিসটার কদর বুঝবেন নিশ্চয়।

আরও একটা সুবিধা—তিনি ওকে চেনেন না, স্বচ্ছন্দে সাধারণ ক্যানভাসার বা সেলস্‌ম্যান হিসেবে গিয়ে দেখা করতে পারবে।

কথটা যত ভাবে, যত তোলপাড় করে, ততই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কোন কাজ করতে গেলে ভালমন্দ দুটো দিকই ভাববার কথা—প্রসন্নবাবু মাস্টারমশাই প্রায়ই বলতেন—কিন্তু যেখানে উত্তেজনা ও আগ্রহ এত প্রবল সেখানে অন্ধকার দিকটা কেউই ভাবে না, ভাবতে চায় না।

অবশেষে পরের রবিবারে সত্যিই বেরিয়ে পড়ে—ওর নিতান্ত অপরিচিত অথচ একান্ত আপন নিজের কাকার বাড়ির উদ্দেশে।

ঠিকানাটা ঠিক জানা না থাকলেও মোটামুটি একটা ধারণা ছিল। রাস্তার নামটা মনে পড়েছে যখন, অনাদির নামটা বলে জিজ্ঞাসা করতে করতে গেলে এক সময় বেরোবেই, বাড়িটা। সেই ভরসাতেই বেরিয়ে পড়ল সেদিন।

খুব ভোরে উঠেই তৈরী হয়েছিল। হেঁটে যেতে হবে। বালিগঞ্জের মতো দূর না হলেও—এও বেশ দূর। অনেকখানি সময় লাগবে যাতায়াতে। চৌরঙ্গী পাড়া অঞ্চলে থাকেন আজকাল। আগে ছিলেন দর্জিপাড়ার দিকে, সে হলে তো কথাই ছিল না। ভালুক বাগান থেকে আর কতদূর। পয়সা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোধহয় এসব পাড়া অসহ্য লেগেছে কিম্বা কাছাকাছি এত আত্মীয়-স্বজন ভাল লাগে নি। সাহেব পাড়ায় অনেক টাকা ভাড়া দিয়ে এই বাড়ি নিয়েছেন—সাড়ে তিনশো না চারশো টাকা দেন মাসে। তবে সুবিধে এই সাহায্যপ্রার্থীরা এখানে আসতে সাহস ক'রে না। এখানেও নাকি থাকবেন না। বালিগঞ্জে নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে, সেখানেই চলে যাবেন।

এসব খবর বাড়ি ছাড়ার আগেই শুনে এসেছিল। রাজেনই বলেছিল একদিন, আপিসে নাকি কার মুখে শুনেছে সে। এঁদের সম্বন্ধে উগ্র কৌতূহল বলে মন দিয়ে শুনেছিল বিনু—মনে ক'রেও রেখেছে।

বাড়ি খুঁজতে অবশ্য সত্যিই বেশী সময় লাগল না। রাস্তাটায় পড়ে যাকে জিজ্ঞাসা করেছে সে-ই বলে দিয়েছে সন্ধান! পাড়াটায় বেশীর ভাগই মুসলমান বা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—কিন্তু তারাও সকলে জানে দেখা গেল। তবু এতটা হেঁটে এসে জিগ্যেস ক'রে ক'রে বাড়ি খুঁজে পেঁছিল তখন একটি ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, সাড়ে সাতটা বাজে।

তবে ভাগ্য প্রসন্ন ছিল বলতে হবে, সাহেব তখন উঠেছেন যে শুধু তাই নয়, আপিস ঘরে কাজে বসে গেছেন। চাপরাশী একজন তখনই মোতায়েন হয়ে গেছে ঘরের বাইরে। সে প্রথমটা ঢুকতে দিতে চায় নি—ওর ঐ আধময়লা বেশভূষা দেখে বোধহয় ভিখিরী কি আর একটু ভদ্র—'সাহায্যপ্রার্থী' ভেবেছিল—কিন্তু 'ইম্পিরিয়াল ফার্ণিচার এক্সচেঞ্জ' থেকে আসছি বলাতে বিশেষ কিছু না বুঝেই সাহেবকে খবর দিতে রাজী হ'ল।

এবং সাহেবও কি ভেবে—পরদার ওপাশ থেকে ওদের কথাবার্তা বোধহয় শুনে থাকবেন—ভেতরে নিয়ে আসার হুকুম দিলেন।

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, বহুদিন বহু কথা শুনেছে—তবু এই প্রথম সাক্ষাৎ ওদের।

কে জানে কেন—একেবারে অকারণেই—বিনু সেই বড় ফ্যানের নিচেও বসে

গল গল ক'রে ঘামতে লাগল। আর প্রথমদিকে কথা বলতেও বেশ একটু অসুবিধা বোধ করল। মনে হ'ল যেন জিভও টাকরা শুকিয়ে আসছে, গলা দিয়ে আওয়াজ বার করতে বেশ একটু চেষ্টা করতে হচ্ছে।

এ কি পরিচয় ধরা পড়ার ভয় ?

জানতে পারলে হয়ত কত কি অপমানের কথা বলবেন এই আশংকা ?

কে জানে কি। এসব গুছিয়ে ভাবার কি যুক্তি-প্রয়োগের সময় ছিল না।

হেঁট হয়ে বড় একটা টাইপ করা কাগজের কোণে নিজের হাতে কি লিখছিলেন, একেই বোধহয় নোট দেওয়া বলে—সেটা শেষ ক'রে মুখ তুলে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কী চাই আপনার ?'

যাক—তাহলে চিনতে পারেন নি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল বিনু।

যদিচ তখনও গলা কাঁপছে।

'আমি—আমি ইম্পিরিয়াল ফার্নিচার একসচেঞ্জ থেকে আসছি।'

'কেন ?'

ঠিক এ প্রশ্নের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না বিনু। শুষ্ক সংক্ষিপ্ততম প্রশ্ন, অথচ যাকে প্রশ্নটা করা হল তাকে বিহ্বল ক'রে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সে আরও ঘাবড়ে গেল।

কিন্তু চুপ ক'রে থাকাও চলবে না।

চশমার ভেতর দিয়ে কঠিন দুটি চোখের কঠোর (অন্তত ওর তাই মনে হল) দৃষ্টি ওর মুখের ওপর নিবদ্ধ !

সে জড়িয়ে জড়িয়ে কোনমতে বলল, 'আ—আমরা পুরনো দামী ফার্নিচার কেনাবেচা করি। খুব ভাল দুটো মেহগনীর আলমারি হাতে এসেছে, সেই সঙ্গে দুটো পালংক আর একটা খাটও—ল্যাজারাসের বাড়ির তৈরী সব—'

ওর এত কষ্টে তৈরী করা বক্তৃতায় বাধা দিয়ে অনাদিবাবু বললেন, 'তা আমার কাছে কেন ?'

'না, মানে—এই যদি আপনি ইণ্টারেস্টেড্ হন—এ একেবারে দুষ্প্রাপ্য জিনিস, একটা খাটও আছে বর্মী মিস্ত্রীর কাজ করা—'

আবারও শাণিত অস্ত্রের মতো প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হল, 'আমার নাম ঠিকানা কে দিলে আপনাকে ?'

বিনুর মনে হল আরও কঠোর হয়ে উঠেছে ওঁর গলার স্বরটা, প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে ওঠার পূর্ব-অবস্থা বোধহয়। ওর হাতের চেটো ও পায়ের তলাও ঘেমে উঠল এবার।

নিশ্চয় এখনই দারোয়ান ডেকে গলাধাক্কা দিতে বলবেন—এইভাবে কাজের সময় বাজে কথা বলতে এসে সময় নষ্ট করার জন্যে।

বিপন্ন দিশাহারা হয়ে কি বলবে ভাবতে গিয়ে কথাগুলো মুখে এসে গেল। বললে, 'আমাদের প্রোপাইটারই কতকগুলো নাম ঠিকানা দিয়ে দিয়েছেন, পসিব্‌ল্ পারচেজার হিসেবে। এঁদের সকলের কাছেই যাবো। আ—আপনার কাছেই প্রথম এসেছি—'

'কেন ?' আবারও সেই সাংঘাতিক প্রশ্ন।

এবারও দুষ্টসরস্বতী সদয় হলেন, 'না, মানে এই এ. বি এইভাবে নামগুলো ধরেছি—'

আরও কিছুক্ষণ সেইভাবে স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, আপনাদের ঠিকানা রেখে যান, কাল বিকেলের দিকে আলমারী দুটো দেখে আসব।...কার্ড আছে ?'

বললেন, কিন্তু বোধহয় বেশভূষা দেখেই 'ইম্পিরিয়ালের' অবস্থা বুঝে নিয়েছিলেন, উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে একটু স্লিপ-কাগজ আর একটা পেন্সিল ঠেলে দিলেন ওর দিকে।

তারপর যখন ঠিকানা লিখে দিয়ে বিনু উঠে দাঁড়িয়েছে তখন প্রশ্ন করলেন, 'কত দাম, আপনাদের ?'

'ও'রা—বোধহয় দুটোর বারোশো টাকার মতো ধরবেন। মানে আমার যা ধারণা—'

ততক্ষণে অনাদিবাবু আবার তাঁর আপিসের কাগজে মন দিয়েছেন। কথাটা শেষ করার কোন দরকার হল না।

পরের দিন ঠিক বেলা পাঁচটার সময় দত্ত মশাইয়ের ইম্পিরিয়াল ফার্নিচারের সামনে গাড়ি থামল অনাদিপ্রসাদের।

বিনু দত্ত মশাইকে আগের দিনের ঘটনাটা বলে রেখেছিল—পরিচয়ের সূত্রটা বাদে—আর সে যে নামের লিস্ট ক'রে দেওয়ার কথা বলেছে—তাও। দত্ত মশাইও কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তা তুমিই বা ওঁর নাম জানলে কি ক'রে ?'

'এমনিই, শোনা ছিল আগে থেকে—। তাই ভাবলুম একবার দেখি না কপাল ঠুকে।'

দত্ত মশাই আর কিছু বলেন নি। কিন্তু সেদিন গেঞ্জির ওপর জামাটা চড়িয়ে এক প্যাকেট সস্তার সিগারেট কিনে আনিয়ে অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাবেই ধনী মক্কেলের প্রতীক্ষা করছিলেন।

অবশ্য বিনুর অত সাবধান না হলেও চলত। অনাদিবাবু কোন উচ্চবাচ্যই করেন নি, নাম ঠিকানা জানার ব্যাপারে।

সোজাই এসে বলেছিলেন, 'কাল একটি ছোকরা গিছল আপনাদের এখান থেকে—কি মেহগ্নির আলমারী আছে—নাকি ল্যাজারাসের তৈরী—?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আসুন, আসুন।'

দত্ত মশাই শশব্যস্ত অভ্যর্থনা ক'রে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে কতকটা স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'ছোঁড়াটা থাকলে ভাল হ'ত—তা সে আবার আজই এল না—'

আলমারি খুঁটিয়ে দেখলেন অনাদিপ্রসাদ। দেখা গেল তিনি কাঠ চেনেন, শুধু তাই নয়—ল্যাজারাসের যে বিশেষ 'এল' অক্ষরের চিহ্ন থাকে ট্রেডমার্কের মতো—তাও তাঁর অজানা নয়।

'দাম কত ?' দেখা শেষ হলে প্রশ্নটা অতর্কিতে যেন ছুঁড়ে মারলেন।

ঢোঁক গিলে, হাত কচলাতে কচলাতে দত্ত বাবু বললেন, 'বারোশোই ধরা

ছিল, মানে সিক্স ইঁচ, তা আপনি যখন দুটোই একসঙ্গে নিচ্ছেন—এগারোই দেবেন—।'

'না।' কঠিন নিরসকণ্ঠে বললেন অনাদিবাবু, 'সাড়ে নশো পর্যন্ত দিতে পারি—নট এ পাই মোর। দরদস্তুর আমি করি না, যা বলি শেষ কথা। দিতে হয় দিন, য়্যাডভান্স দিয়ে যাচ্ছি, মুটে দিয়ে পাঠালে তাদের হাতে বাকী টাকা দিয়ে দোব।'

দত্তমশাই সোজা কথার সোজা উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'রঙ পালিশ কিছু ক'রে দিতে হবে?'

'না। ঠিক এই অবস্থায় চাই আমি।'

পঞ্চাশ টাকা বায়না দিয়ে চলে গেলেন অনাদিবাবু।

দত্ত মশাই খুশী হয়ে যত না হোক বিনুকে খুশী করার জন্যেই পুরো একশোটি টাকা দিলেন কমিশন হিসেবে। বললেন, 'তোমার তো বেশ এলেম আছে দেখছি ছোকরা। লেগে যাও, লেগে যাও, আমি তোমাকে ঠকাবো না। মেহন্নত করো—পুরো মজুরী পুষিয়ে দোব—।'

টাকা নিয়ে বেরিয়ে আগে ঠনঠনের কালীবাড়ি পুজো দিল। নিজের জন্যে কাপড়জামা জুতো কিনল—কবুর জন্যে একটা ভাল শার্ট, রমার জন্যে ন-হাতী তাঁতের শাড়ি। সুভদ্রার জন্যেও একখানা শাড়ি কেনার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সাহস হল না। বকুনি খাবার ভয় তো ছিলই—কী জানি যদি ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়? যদি উনি এটাকে ওর স্পর্ধা বলে মনে করেন? তার বদলে নিল শরৎ চাটুজ্যের দুখানা বই। সুভদ্রা খুব ভাল বাসেন, বাড়িতে একখানাও নেই বলে দুঃখ করেন। সেই সঙ্গে কিছু মিষ্টিও নিল—ভেবে ভেবে, পিনাকীবাবু যা ভালবাসেন। সে-ই মিষ্টি।...

টাকাটা হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ইচ্ছা ওর মনে দেখা দিয়েছিল।

এই ওর প্রথম উপার্জন, এ থেকে মাকে কিছু দেওয়া উচিত। ছোটবেলায় বাজারের ফেরৎ আধলাগুলো জমাত সে, সাতটা হলে মাকে দিয়ে এক আনা নিত, পনেরো আনা দিলে মা খুশী হয়েই একটা টাকা দিতেন। অবশ্য এক টাকা জমতে ঢের সময় লাগত। একবার এক চরম দুর্দিনে বিনু তেরো চোদ্দটা টাকা মাকে বার ক'রে দিয়ে ছিল। মা খুব খুশী হয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর ক'রে বলেছিলেন, 'যাক, খোকনের আগে ছোট বেটার রোজগার খেলুম।' সে খুশি, সে বাষ্পার্দ্র উজ্জ্বল দৃষ্টি আজও ভোলে নি বিনু।

বাড়িতে থাকলে আগেই মার কাপড়, একটা মটকার চাদর—এই সব কিনত, নিজের জন্যে কিছু না কিনেও।

তা তো আর হল না। না হোক; মাকে কিছু টাকা পাঠানো যায়।

আগে হলে সাহসে কুলোত না। কিন্তু সম্প্রতি—খুব সম্প্রতি একটু ভরসা পেয়েছে, আশ্বাসই বলা যায়।

মাত্র দিন পাঁচ ছয় আগে গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ওর সেই ইস্কুলের বন্ধু দোলুর সঙ্গে দেখা হয়ে গিছল।

দোলু ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে নি, চেষ্টাও করে নি আর। কোথায় যেন কোন টেক্‌নিক্যাল স্কুলে ড্রাফ্‌টসম্যানের কাজ শিখছে। এই দোলু বড় অদ্ভুত ধরনের বন্ধু ওর। ওকে যে খুব ভালবাসে সে প্রমাণ একাধিকবার পেয়েছে বিনু। ঠিক যেন মন বুঝে ওর মন-খারাপের দিনগুলোতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বার বার, সান্ত্বনা বা আশ্বাস দিচ্ছে তা বিন্দুমাত্র জানতে না দিয়ে—কিন্তু কার্যত তাই করেছে।

প্রসাদের বাড়ি থেকে বেরোবার সময় সেই যে যথার্থ বন্ধুর মতো পাশে এসে ওর দুঃখ বুঝে, অপমান ও লজ্জার বোঝা লাঘব করেছিল—অতি সহজে, অতি সাধারণ ভাবে—সেই শুরু, কিন্তু সেই শেষ নয়, তার পরও বহুবার এমন ঘটনা ঘটেছে।

তখন হয়ত বুঝতে পারে নি অত, এখন এই জীবন সায়াহ্নে এসে যত ভাবে ওর আচরণগুলো, বিনুর একান্ত দুঃখের দিনে এসে ওর নিজস্ব কাঠ-খোট্টা ভঙ্গীতে ভরসা দেবার ধরণ—যত মিলিয়ে রেখে, তত বোঝে ওর ভালবাসার গভীরতা ও আন্তরিকতা।

বরং বিনুই নিমকহারাম, যা পেয়েছে তার মূল্য বোঝে নি। পাওয়াটা স্বীকৃতির সঙ্গে গ্রহণ করতে, এমন কি অনুভব করতেও পারে নি। যেন প্রাপ্য বলে ধরে নিয়েছে। তার বদলে ওরও যে ভালবাসা উচিত তাও মনে পড়ে নি। অন্যত্র যা দেওয়া হয়ে গেছে তা আর ফিরিয়ে নিয়ে দিতে পারে নি।

আশ্চর্য, দোলুর ভাবভঙ্গীতেও কোন দিন প্রকাশ পায় নি যে সে এই নিঃস্বার্থ ভালবাসার বদলে একটু স্বীকৃতি কি ভালবাসা চায়।

এই গঙ্গার ধারে দেখা হতে জানল বিনু, যে এ দেখা হওয়াটা আকস্মিক নয়, দোলু কদিন বিকেলে নাকি ওরই খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে একদিন হেদোতে ঘুরেছে, একদিন গোলদীঘিতে। চাঁদপাল ঘাটেও গিছল একদিন। কোথায় আছে জানে না—তবু বিনুকে চেনে বলেই বেড়াতে যাবার জায়গাগুলোই ঘুরেছে।

দোলুর সঙ্গে একদিন নাকি বিনুর দাদা রাজেনের দেখা হয়েছিল এর মধ্যে। রাজেন খবর পেয়েছেন যে সে উত্তর কলকাতায় কোথাও একজনের বাড়িতে থেকে মাষ্টারী করছে। তবে ঠিকানা তিনি জানেন না, জানলেও তাঁর এমন সময় নেই যে খোঁজ ক'রে গিয়ে সেখান থেকে ভাইকে ফিরিয়ে আনবেন।...আর তার মাও যেতে দেবেন না। তাঁর অভিমানে প্রচণ্ড ঘা লেগেছে, তিনি মরে গেলেও যেচে ফিরিয়ে আনবেন না।

তবু রাজেন বলেছেন, 'যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয় তো ব'লো বাড়িতে ফিরে আসতে। পেট-ভাতাতে কাজ ক'রে তো ভবিষ্যতের কোন ব্যবস্থা হবে না। লেখাপড়া করতে না চায় না-ই করল, কাজকর্মের চেষ্টা দেখুক। বাড়িতে এসে বসে থাকলেও আমার কিছু উপকার হয়। আপিসের কাজ, দুটো টিউশ্যনী—তার ওপর দোকান-বাজার—আমি আর পেরে উঠছি না।'

কথাগুলো বলে দোলুও খুব পীড়াপীড়ি করেছিল বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে। বলেছিল, 'মার কাছে কি নিজের দাদার কাছে মাথা হেঁট ক'রে যেতে কোন লজ্জা

কি অপমান নেই।' তবু বিনু তখনই রাজী হতে পারে নি। বলেছিল, 'একটু ভেবে দেখি ভাই—একেবারেই ভিখিরির মতো গিয়ে দাঁড়াতে ঠিক ইচ্ছে নেই, দেখিই না আর দুটো চারটে দিন।'

দোলুকে বলেছিল পরের রবিবার এখানেই আসতে। বিনুও আসবে। গঙ্গার ধারে বসে গল্প করবে একটু।

সে রবিবার কালই। কিন্তু না, দোলুর হাত দিয়ে পাঠানো ঠিক হবে না। সে মনে মনে কালী দুর্গা প্রভৃতি স্মরণ ক'রে পঞ্চাশটি টাকা মনি-অর্ডার ক'রে দিলে। এখানকার ঠিকানাই দিল—ঠিকানা জানলে ওঁরা কেউ এখান থেকে ফিরিয়ে নিতে আসবেন—সে সম্ভাবনা যখন নেই তখন আর ভয় কি?

॥ ৩৬ ॥

এ বাড়ির উঠোনের দক্ষিণপূর্ব কোণে পাঁচিলের ওপারে যাঁর বাড়ির উঠোন—তিনি এক বিখ্যাত কলেজের নামকরা ইতিহাসের অধ্যাপক। তাঁর অনেক কলেজ-পাঠ্য বই আছে। কিছু প্রশ্নোত্তর আকারের নোটও আছে—যা হাজার হাজার বিক্রী হয়।

অধ্যাপক বিদ্যুৎবাবুকে বিনু দেখে নি, তাঁর কাছে পড়ার ভাগ্য তো হয়ই নি। তবে নাম শোনা ছিল। শুনেছে অনেকের মুখেই। এখানে এসে যখন সুভদ্রার মুখে শুনল ওটা তাঁরই বাড়ি, আর তিনি ঐ বাড়িতেই বাস করেন—তখন যথেষ্ট সসম্ভ্রম কৌতূহল বোধ করেছিল। দু একদিন ওপরের বারান্দা থেকে দেখেওছে তাঁকে। অবশ্য জানলার পর্দা দেওয়া ঘরের মধ্যে নজর চলে না—তবে সিঁড়ি দিয়ে তো যাতায়াত করতেই হয়, সেই সময়েই দেখেছে। সুভদ্রাই দেখিয়ে দিয়েছেন।

ভদ্রলোক সুপুরুষ তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাহেবদের মতো লাল ফর্সা রঙ, প্রতিদিন ধোপদুরস্ত কাপড় জামা পরে বেরোতেন—ফলে যখন কলেজ যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতেন—মনে হত যেন তাঁর চারপাশ আলো হয়ে উঠত।

তবে ওঁকে দেখার কৌতূহল ছিল, কারও খুব নাম হয়েছে শুনলে তাঁকে দেখার যেটুকু কৌতূহল স্বাভাবিক—সেইটুকুই, তার বেশী কিছু নয়। দিন-দুই দেখার পরই আর ও বাড়ির দিকে চাইবার কি চেয়ে থাকার কোন প্রয়োজন হয় নি, এমন কোন আকর্ষণ বোধ করে নি। বলতে গেলে ওদের অস্তিত্বই ভুলে গেছল।

সুভদ্রাই আবার ও বাড়ি সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিলেন।

স্বামী আর বড় দুই ছেলেমেয়ে বেরিয়ে গেলে কুঁচোগুলোকে চান করিয়ে খাইয়ে দেবার পর সকাল থেকে প্রথম যেন একটু হাঁফ ছাড়বার ফুরসুৎ মিলত ওঁর। সেই সময়টাই ছিল বিনুর সঙ্গে ওঁর গল্প করার অবসর। উনি চুল খুলে চিরুনী হাতে ক'রে এসে দাঁড়াতেন—স্নানের পূর্ব পরিচ্ছেদ হিসেবে, বিনুকেও স্নানের তাগাদা দিতেন। তার মধ্যেই চলত কিছু কিছু খোশ গল্প, কিছু বা

ফষ্টি-নষ্টি।

এই সময়ই একদিন, খাটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে বিনু একটা গল্প লিখছে, চুলের বিনুনি খুলতে খুলতে ঘরে ঢুকে সুভদ্রা বললেন, 'আচ্ছা, তুমি কী? রক্ত-মাংসের মানুষ, না চিনে-মাটির পুতুল?'

বিনু হকচাকিয়ে গেল একেবারে। একেই লেখার মধ্যে তন্ময় হয়ে ছিল, হঠাৎ একটা আক্রমণের মতো অনুযোগ—তার সে অনুযোগটাও স্পষ্ট নয়। তার যেন মাথাতেই কিছু ঢুকল না অনেকক্ষণ।

'তার মানে?' বেশ খানিকক্ষণ পরে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল সে।

'মানে আবার কি! তোমার পানে চেয়ে চেয়ে মেয়েটার দু' চোখ খরে গেল বলতে গেলে—তুমি একবার ফিরেও তাকাও না! কেন, এত কি রূপের দেমাক।'

বিহ্বলতা আরও বাড়ে।

'সে আবার কি! আমার পানে চেয়ে চেয়ে—কী যেন, কি বললে? কার চোখ কি হচ্ছে?'

ইদানিং 'আপনি'টা প্রায়ই তুমি হয়ে যাচ্ছে! সুভদ্রা যেন এতে খুশী,—এ অন্তরঙ্গতা, এই একান্ত আপন ভাবটা পছন্দই করে। কিন্তু বিনুর ভয় করে কোনদিন না পিনাকীবাবুর সামনে 'তুমি' বলে ফেলে। সতর্ক হওয়ার চেষ্টাও করে—তবু এ যেন আপনিই বেরিয়ে যায় মধ্যে মধ্যে।

'ঐ যে মেয়েটা' সুভদ্রা বলেন, 'বিদ্যুৎবাবুর ভাগ্নী—লাবণ্য, মামার মতোই রূপটা পেয়েছে। যেমন মুখ চোখ, তেমনি রঙ, তেমনি গড়ন। মোটে এই ষোল বছর বয়েস—কে বলবে, মনে হয় পূর্ণ যুবতী। তা অমন রূপসী মেয়ে,—পাড়ার ছেলেরা তো পাগল হয়ে গেল, বেচারীর ইস্কুল যাওয়াই বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন ওর মামা, এমন উপদ্রব। এখন ইস্কুলের গাড়ি আসে তাই আবার যাচ্ছে।...তা সে যাই হোক—ও ছুঁড়ি যে তোমার জন্যে পাগল হয়ে গেল একেবারে, ফাঁক পেলেই সিঁড়ির গোড়ায় এসে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে এইদিকে। ঐ কোণটা থেকে এ ঘরের মধ্যেটা পর্যন্ত দেখা যায়—আমি একদিন ওদের বাড়ি গিয়ে নিজে দেখেছি।...তোমাকে দেখে ওর আশ মেটে না।'

'আমাকে দেখে। বাঃ! তোমার যত সব আজগুবি কথা। আমাকে ক্ষেপিয়ে মজা দেখতে চাও, না? অত সুন্দরী মেয়ে বলছ—আমার চোখে তা কৈ তেমন কেউ পড়ে নি—আমি অবিশ্যি ওদিকে চাইও না বিশেষ—তা হলেও তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি—তা সে আমার দিকে চাইবে কেন, কোন দুঃখে! এই বেঢপ চেহারা!'

'তুমি ওদিকে চাও না তা আমি জানি, অনেক দিন আড়াল থেকে ওৎ পেতে থেকেছি—ধরতে পারি নি একদিনও। তাই তো মনে হয়—হয় তুমি দেবতা না হয় তো পাথর। লাবণ্যর যা রূপ, মাটির পুতুলও দেখে চঞ্চল হয়ে উঠবে। কিন্তু তোমার নিজের চেহারাটা আয়নায় চোখে পড়ে না? কেন চেয়ে থাকে, কেন অন্য মেয়ে হলেও চেয়ে থাকত—বোঝ না?'

'না, আয়নায় নিজের চেহারা দেখলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়।'

'আবার দেমাক দেখানো হচ্ছে।'

'সত্যি বলছি, এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি—আপনার দিব্যি ক'রে কখনও মিছে কথা বলব না এটা ঠিক—আয়নায় নিজের চেহারাটার দিকে চাইলে আমার একটুও ভাল লাগে না। বরং অন্য সময় ভুলে থাকি, দু-একজন যে চেহারা ভালো বলে নি তা নয়—অনেকক্ষণ আয়নার দিকে নজর না পড়লে এক এক সময় মনে হয় খুব খারাপ নই হয়ত দেখতে—কিন্তু আবার আয়নায় মুখখানা চোখে পড়লে সে ভুল ভেঙ্গে যায়।'

'আশ্চর্য লোক তুমি। সত্যি! তোমার চেহারা খারাপ লাগে তোমার? এমন তো কখনও শুনি নি। সকলেই নিজেকে রূপবান আর বুদ্ধিমান ভাবে।... তা জিগ্যেস করি, যারা ভাল দেখতে বলে তারা কি সবাই মিথ্যে কথা বলে, না মন জুগিয়ে বলে?'

'তা জানি না। আশু পণ্ডিত মশাই প্রায়ই বলতেন সুন্দর। আমার রুচিতে এ ধরনের চেহারার কোন আকর্ষণ নেই। রঙটা ফর্সা এই পর্যন্ত—তার বেশী কিছু নয়।'

তখনও সুভদ্রা অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে সে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, আপনি একটা সত্যি কথা বলবেন?'

বাধা দিয়ে সুভদ্রা বলেন, 'বেশ তো এতক্ষণ তুমি তুমি হচ্ছিল, আবার আপনি শুরু হল কেন?'

'ওটা বদ অব্যেস, ভাল নয়। কোনো দিন যদি কর্তা শোনেন—কি ভাববেন? সে যাক গে, আবারও এক সময় তুমিই বলে ফেলব হয়ত, এখন বলুন না, সত্যিই কি আপনার মনে হয় আমার চেহারা ভাল? ভাল, না বিচ্ছিরি, না চলনসই?'

'হ্যাঁ গো মশাই, ভাল, ভাল, ভাল। হয়েছে? এখন উঠে চান সেরে নিয়ে আমার মাথাটা কিনুন।'

তাড়া খেয়ে বিনুকে উঠতে হয়। সত্যিই ভদ্রমহিলার এই যা একটু বিশ্রামের সময়, খেতে অযথা দেরি করলে সেইটুকু সময় থেকেই বাদ পড়ে যাবে।

দু'জনে একই সঙ্গে স্নান করতে যাওয়া যায়। নিচে বাইরে একটা টিনে ঘেরা বাথরুমের মতো আছে, বোধহয় কখনও দিন-রাতের ঝি চাকর রাখা হলে তারা ঐখানেই স্নান করবে—এই উদ্দেশ্যে; বিনু ওখানেই স্নান করে। নিচে একটিই বাথরুম, সেখানে ভীড় বাড়াতে কেমন সংকোচ বোধ হয়।

তখনই উঠে বাইরে আসতে—সেই প্রথম লক্ষ্য করল বিনু—বিদ্যুৎবাবুর বাড়ির সিঁড়ির মুখে স্থির হয়ে এদিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। এই ঘরের দিকেই চেয়ে আছে। ওর চোখে চোখ পড়তে মাথা নামাল কিন্তু সরে গেল না।

সত্যিই সুন্দরী তাতে সন্দেহ নেই। বিনুর চোখ বরাবরই ভাল, অনেক দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখে। এ মেয়েটিরও মুখ চোখ দেখতে কোন অসুবিধা হল না। যাকে দুধে-আলতা বলে তেমনি রঙ, বড় বড় টানা চোখ, চোখে ঘন পাতা, সুন্দর দুটি ভ্রূ, ঠোঁটের ভঙ্গী কপাল—সবই দেখার মতো। কবিরা সু-রূপার যেমন বর্ণনা দেন—তেমনিই।...

বিনু সারাটা দিনই অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

এ একটা নতুন খবর। ওর কাছে একেবারে অজানা জগতের খবর।

এ জিনিসটার সঙ্গে পরিচয় ওর অনেক দিনের—তবে সে বইয়ের মধ্যে দিয়ে। এতদিন যত বই পড়েছে—অনেক পড়েছে সে—তার বেশির ভাগই তো নর-নারীর প্রণয় কাহিনী নিয়ে লেখা—গল্প উপন্যাস কাব্য—সবই তো প্রায়। তবু এতকাল কেমন মনে হয়েছে—এ জানবার জিনিস, পড়বার জিনিস—কিন্তু দূরের জিনিসও। এ যে সত্যিই কারও জীবনে ঘটে বা ঘটতে পারে—তা এমন স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষভাবে দেখে নি, অনুভব করে নি। এতদিন জানত, এসব ঘটলেও অপর কারুর জীবনে ঘটতে পারে—ওর জীবনের সঙ্গে এ-সবের কোন সম্পর্ক নেই। ওকে কেন্দ্র ক'রে এমন ঘটনা ঘটতে পারে না।

আজ সেই ধারণার মূলেই একটা প্রচণ্ড নাড়া লেগেছে।

শুধু সুভদ্রার মুখের কথাতেই এতটা হ'ত না—নিজের চোখেই তো দেখল, এ নাটকের বা উপন্যাসের ও-ই নায়ক।

ওর চিন্তার ওর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এ জিনিসের কোন যোগ ছিল না বলেই এ ধরনের কোন ঘটনা কল্পনা করে নি। যদি কখনও বিয়ে সে করে—সে অন্য কথা। তার বহু বিলম্ব। করবে কিনা সেও তো সন্দেহ।

যৌন জীবন আছে। সে ওদের বন্ধু অজিতকে দিয়ে, কেষ্টকে দিয়েই তো জানে। অনেক কদর্য—বীভৎস পর্যায়েও ফেলা যায়—কাহিনী শুনেছে, তবু তা ওকে অতটা আঘাত দিতে পারে নি এই জন্যে যে ও নিজে ছিল এসব জিনিস থেকে বহুদূরে।...প্রেম-ভালবাসাও আছে, সে তো থাকবেই, তবে সেও পড়বার ব্যাপার, লেখবার ব্যাপার—তার সঙ্গে ওর ব্যক্তিগত সম্পর্ক কি?

আর সে ওর জীবনে যদি আসেও—তার এখনও অনেক, অনেক দেরি—এই ভেবেই এসব চিন্তা বা কল্পনাকে যেন ঠেলে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

আজ সত্যিসত্যিই সেই প্রেম বা ভালবাসা বা আকর্ষণ ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এ যেন বিশ্বাসই হয় না।

এই তো মোটে ওর আঠারো বছর বয়েস, আঠারো বছর ক'মাস, ঊনিশ চলছে—তবু এর মধ্যেই এসব কেন?

হ্যাঁ, বন্ধুরা একথা অনেক দিনই আলোচনা করতে ভাবতে শুরু করেছে বটে। কিন্তু সে—

হয়ত এই-ই নিয়ম।

ভগবান তাকেই নিয়মের বাইরে রেখে পাঠিয়েছেন।...

নিজের কথাও ভাবে বৈকি।

সত্যিই কি তার চেহারা ভাল? তাকে ভালো দেখতে? তার মধ্যেও আকর্ষণের কিছু কারণ আছে?

কে জানে। আয়নাতে নিজের মুখ দেখে কিম্বা পানের দোকানে বা প্রসাদদের বাড়ির বড় আয়নায় পুরো অবয়বটা দেখে তো কখনও তা মনে হয় নি। বরং এমন চেহারার জন্যে মনে মনে একটা কুণ্ঠা বোধ করেছে। কেমন একরকম হতাশা ও দুঃখ বোধ করেছে। ক্ষুব্ধ হয়েছে বিধাতার অবিচারে।

লম্বা চওড়া চেহারা, বয়সের তুলনায় অনেক বেশী লম্বা চওড়া—সেই জন্যেই

বন্ধুদের মধ্যে বেমানান। তাদের পাশে দাঁড়ালে মনে হয়, কত বয়েস হয়ে গেছে ওর। মুখেও কোন অসাধারণত্ব নেই। গোল ধরনের মুখ—পুরুষের পক্ষে যা একান্ত বেমানান। অন্তত মেয়েদের কামনা করার মতো কিছু নেই সে মুখে।

তবু, এটাও স্বীকার করতে হবে, কেউ কেউ আকৃষ্ট হয়েছে বৈকি!

আজ নতুন ক'রে মনে পড়ছে সেসব কথা।

এই নব অভিজ্ঞতার আলোকে সেসব ঘটনার আসল চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে।

শুরু হয়েছে তো সেই কবে থেকেই।

সেই কাশীতে যখন পড়ছে।

য়্যাংলো বেঙ্গলী স্কুলের অনেক বেশী বয়সের সহপাঠী, দু-একটি ওপরের ক্লাশের ছেলেও, ওকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল তাদের সদ্য-জাগ্রত যৌবনতৃষ্ণা মেটাতে।

বিনু তখন সেসব আচরণের কোন অর্থই বুঝত না। বুঝেছে অনেক পরে। সেদিন বোঝে নি বলেই নাকি অব্যাহতি পেয়েছে। 'মড়া'কে দিয়ে কোন সুখ হয় না, তৃষ্ণা মেটে না।

অর্থ না বুঝলেও ঝাপ্‌সাভাবে একটা উত্তেজনা বোধ করেছে—তবে তা এতই গোপন—ঐসব বন্ধুরা সে জাগরণের সন্ধান পায় নি। ওর কাছ থেকে তাদের আবেদনের উপযুক্ত সাগ্রহ উত্তর না পেয়ে অবজ্ঞায় ওকে ত্যাগ করেছে।

আরও একটা প্রায়-ভুলে-যাওয়া ইতিহাস মনে পড়ছে ওর।

কাশী থাকতে থাকতেই মা ওকে সঙ্গে ক'রে একবার এলাহাবাদ গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য তীর্থ করা—প্রয়াগে মাথা মুড়িয়ে স্নান করবেন। 'প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা, মরগে পাপী যথা তথা'—একথা সবাই শুনেছে, মাও শুনবেন এ তো ঠিকই। তাছাড়াও, দিদিমার নাকি এ সাধ খুব ছিল, সেটা দারিদ্র্যের জন্যে হয় নি। মাকে নাকি অনেকবার বলেছিলেন, 'যখন যাবে মা, যদি কখনও যাও, আমার কথা মনে ক'রে একটা ডুব দিও।'

কাজেই এত কাছে, কাশী পর্যন্ত এসে একেবারে সেরে যেতে চাইবেন—সে খুবই স্বাভাবিক। অনেক সধবা মেয়ে যেতে চায় না—মাথা মুড়োতে পারবে না বলে—কিন্তু সে বিধানও নাকি আছে, সধবা বা কুমারী মেয়ের নিজের আঙুলে আট আঙুল মেপে চুলের ডগা কেটে ফেললেই কাজ হয়। মার তো সে সব ভয়ই নেই। মাথা তো তিনি কামিয়েছেন আগেই। এসব অবান্তর কথা —কিন্তু ঐ চিন্তাটা মাথায় ছিল বলেই প্রসঙ্গটা ঘুরে ফিরে উঠত।

তীর্থ কাছে, বেশী খরচের প্রশ্ন নেই। ট্রেনে চার ঘণ্টার পথ।

কিন্তু কোথায় থাকবেন? কে সঙ্গে যাবে?

সে ব্যবস্থাও একসময় হয়ে গিছল, ক'রে দিয়েছিলেন কমলা দিদিমার স্বামী, ওদের দাদামশাই।

তাঁর দেশের এক লোক ওখানে থাকেন, ডাক বিভাগে একটা মাঝারি ধরনের কাজ করেন। আগে বয়রানা না দারাগঞ্জ কোথায় থাকতেন এখন কর্নেলগঞ্জে একটা বাড়িও করেছেন। ব্রাহ্মণ, বিনুদেরই সগোত্র, ভারী ভদ্রলোক রত্নেশ্বরবাবু, নির্বিরোধী, ধর্মভীরু। ইদানীং জপতপেই অনেকটা সময় কাটে। স্ত্রীটিও

সেকেলে মানুষ, অনেক লোক নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। দু-তিন দিনের জন্যে গেলে কোন অসুবিধেই হবে না। দাদামশাই বার বার অভয় দিলেন।

যদিও বহুকাল—কুড়ি-একুশ বছর দেখা-শুনো নেই—তবু দুজনেই দুজনের খোঁজখবর রাখেন, বিজয়ার পর পত্র-বিনিময় বজায় আছে। রত্নেশ্বরবাবুর দাদা এই দাদাশমাইয়ের বন্ধু ছিলেন, সেই সুবাদে তিনি বন্ধুর মতো ব্যবহার করলেও দাদার মতোই মান্য করেন।

দাদামশাই মার কথা জানিয়ে চিঠি দিতে, সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এসে গেল। সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁরা। বিশেষ অনুরোধ করেছেন—ওঁরা যেন অবশ্যই যান। কি কি আনতে হবে আর কি কি হবে না—পরিষ্কার ক'রে লিখে দিয়েছেন। বিছানা-পত্রের দরকার নেই, কাপড়জামা আর তীর্থকৃত্যর সরঞ্জাম নিয়ে এলেই হবে। তবে গরম জামা যেন যথেষ্ট নিয়ে যান, মাঘ মাসে গঙ্গাতীরে বরফের মতো ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়।

তখন রাজেনের যাবার উপায় ছিল না। দাদামশাই প্রায় স্থবির, তাঁর নড়া-চড়া করা মুশকিল – কিন্তু মার কান্নাকাটিতে তিনিই সঙ্গে যেতে রাজি হলেন। মা কখনও একা যান নি কোথাও, অচেনা জায়গা, অজানা মানুষ—সেখানেই বা কোথায় কার কাছে যাবেন? আর দাদামশাই ছাড়া সে পক্ষকে চেনেন তেমন তো কেউ নেইও।

সেখানে পেঁৗছে দেখা গেল মানুষগুলি সত্যিই ভাল। অভ্যর্থনায় বাহুল্য ছিল না, আন্তরিকতা ছিল। কর্তার তিনটি ছেলে, বড়টি চাকরি করে, তার বিয়েও হয়ে গেছে, মেজ প্রহ্লাদ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, ছোট ধ্রুব ক্লাস নাইনে। শ্যাম বর্ণের বলিষ্ঠ চেহারার দুটি ছেলে, সরল কথাবার্তা, সহজ ব্যবহার, যাওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই তারা বিনুর আপন হয়ে গেল। এদের স্বাস্থ্য ভাল, খেলাধুলোও করে কিন্তু পরে খবর পেয়েছিল, প্রহ্লাদ—অত যার ভাল চেহারা যে তখনই রাত্রে কুড়িখানা রুটি খেত—তারই বি-এ পরীক্ষার মুখে থাইসিস হয়ে যায়। এক বছর উদয়পুরে থেকে ভাল হয় কিন্তু ভরসা ক'রে বিয়ে করতে পারে নি।

সে রাত্রে তো মা রইলেন এ বাড়ি, পরের দিন ভোরবেলাই সঙ্গমের ধারে চলে গেলেন। ওখানে গঙ্গাতীরে একমাস কল্পবাস করার নিয়ম, সম্ভব না হ'লে অন্তত তিন বা একদিন; তাছাড়া বড় তীর্থ স্নানের আগে একদিন বা সম্ভব হলে তিন দিনও উপবাস করে থাকতে হয়। মা এক সঙ্গে দুই কাজ করবেন, ঐখানেই সেদিন থাকবেন; পরের দিন সকালে মাথা মুড়িয়ে স্নান করবেন। তখন অবশ্য বিনুও যাবে।

সে পুরোদিন ও রাত বিনু এদের সঙ্গেই কাটাল। আগের দিনও ওরা কিছু কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল—সে দিন দু'জনেই স্কুল-কলেজ কামাই ক'রে সারা দিনই প্রায় ঘুরল। সেদিক দিয়ে—প্রথমত একটা স্বাধীনতার স্বাদ, নতুন জায়গা দেখা—আনন্দেই কাটল। এ ছেলেগুলির সাহচর্যও ভাল লাগল, এরা দু'জন ছাড়াও বিকেলের দিকে ওদের দু-তিনজন বন্ধুও এসে দলে যোগ দিল—তারাও ভারী ভাল, ফুর্তিবাজ। অবশ্য কথাবার্তায় কোন

অশালীনতা নেই। দলের দুজন মাত্র সিগারেট খেল। হয়ত প্রহ্লাদও খায়— তবে ওর সামনে অন্তত খেল না।

বিনুর মনে হচ্ছিল এ দিনটা শেষ না হলেই ভাল হয়। এই প্রথম মুক্তির স্বাদ পেল জীবনে। অভিভাবক ছাড়া, শাসন ও অনুশাসনের বাইরে একটা দিন কাটানো যে এত আনন্দের তা কে জানত।

এই দুটি ছেলের সম্বন্ধে তার মনে কৃতজ্ঞতার অন্ত রইল না। দাদার বয়সী ধ্রুব, দু-এক বছরের বড়ই হবে, প্রহ্লাদ তো আরও বড়, কিন্তু দাদা ওর সঙ্গে তো কৈ এমনভাবে মিশতে পারে না। এরা কত হাসিঠাট্টা কত গল্পগুজবে ওকে মাতিয়ে রেখেছে।

রাত্রে ও প্রহ্লাদের সঙ্গেই শোবে ঠিক হল। আগের দিন এরা যে বিছানার ব্যবস্থা করেছিলেন তাও খুব ধোপদস্ত নয়. বিনুরা দুজনে খুবই আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে ছিল—কখনও পরের ব্যবহার-করা বিছানায় শোওয়ার অভ্যাস নেই, একটু অস্বস্তিই বোধ হয়—গোপনে বলতে আপত্তি নেই—একটু ঘেন্নাও করে। তবে প্রচণ্ড শীতে লেপ-কম্বল ছাড়া শোওয়া সম্ভব নয় বলে কোনমতে চোখ-কান বুজে শুতে হয়েছিল।

এদিন আর স্বতন্ত্র শয্যার ব্যবস্থা রাখেন নি ওঁরা—এইটুকু ছেলের জন্যে। প্রহ্লাদের বিছানাও একজনের পক্ষে একটু বড়ই, মশারীও তাই, বিনু অনায়াসে শুতে পারবে এই কথা জানিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন প্রহ্লাদের মা।

এ বিছানা আরও ময়লা, তেল-চিটে গন্ধ—তবু এতই ভাল লেগেছিল প্রহ্লাদকে যে ঘেন্নার ভাবটা জোর ক'রে চেপে হাসি মুখেই শুল প্রহ্লাদের পাশে এক লেপের মধ্যে, এবং গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘুমনো গেল না। সেই অঘোর ঘুমের মধ্যেও একটা কি অস্বাভাবিক ব্যাপারের আভাস পেয়ে আস্তে আস্তে স্বপ্নের ভাবটা কেটে এল।

সেদিনকার সে ঘটনার বা প্রহ্লাদের দুর্বোধ্য আচরণের অর্থ অনেকদিন পর্যন্ত বুঝতে পারে নি বিনু। কি চায় প্রহ্লাদ, কি করতে চেয়েছিল তা জানার জন্যে অপেক্ষাও করতে পারে নি অবশ্য। যাকে গত দু দিন এত ভাল লেগেছে তাকেই যেন তখন ভয়াবহ বোধ হল। ভয় পেয়েই একটা অজানা আতঙ্কে সে কোন মতে ওর হাত ছাড়িয়ে মশারির বাইরে মেঝেয় এসে পড়ল।

প্রহ্লাদ বোধ হয় অনুতপ্ত হয়েই তখন ওর গায়ে হাত বুলিয়ে হাত জোড় করার ভঙ্গী ক'রে—সেটা ওর হাতের ওপর রেখে দেখাতে হল, হ্যারিকেন কমিয়ে রাখা আবছা আলোয়, নইলে দেখানো যায় না—আবার ভেতরে আনবার চেষ্টা করল। তারপর বিনু কাঠ হয়ে শুয়ে আছে দেখে লেপের খানিকটা মশারির বাইরে বার ক'রে দিল, এই দুঃসহ শীতের কিছুটা অন্তত আসান হবে বলে। তাও নিল না বিনু। দাঁতে দাঁত লেগে যাবার মতো শীতও কোনমতে সহ্য করল। একটু পরে ধ্রুব ওকে ঐ অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখে নিজের বিছানায় আসতে ইঙ্গিত করেছিল—কিন্তু বিনুর এতই ভয় হয়ে গেছে তখন—সে কাঠ হয়ে সেই ভাবেই পড়ে রইল। কারো বিছানাতেই গেল না।

এর পরে—বছর খানেক পরে একবার কি কারণে কাশীতে এসে ওদের সঙ্গে দেখা করেছিল প্রহ্লাদ, সেই সময়ে এক ফাঁকে একটা পেন্সিলে লেখা চিঠি ওর হাতে গুঁজে দিয়েছিল—সম্ভবত সেটা ক্ষমা প্রার্থনারই একটা চেষ্টা কিন্তু বাংলা ভাষায় জ্ঞান অল্প বলে, চিঠি লেখাও হয়ত অভ্যেস ছিল না—আর আইন বাঁচাবারও একটা চেষ্টা সেই সঙ্গে—তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে নি বিনু।

মনে পড়েছে ওর বামুনমার বোনপো-বৌয়ের কথাও।

সেও ওকে বিয়ের কয়েক দিনের মধ্যেই স্বেচ্ছায় অনেকখানি স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিল। স্বামী সম্বন্ধে কথা প্রসঙ্গে বলেছিল, 'তোমার মতো সুন্দর বর পাব আশা করি নি এ সালের অদৃষ্টের জোটে না তা জানি, লেখাপড়া জানা বরও সকলে পায় না—একটু ভদ্দরলোকের মতো চালচলন—বামুনের ছেলে বলে পরিচয় দিতে যাতে লজ্জা না করে—এটুকু আশা করাও কি অন্যায়, তুমিই বলো।'

এ ওর দুঃখের কথা, কিন্তু ভাষাটা শুনে বিনু না হেসে থাকতে পারে নি, 'আমার মতো সুন্দর। বেশ বললে কিন্তু বৌদি। আমি যদি সুন্দর তবে কুচ্ছিত কে ?'

বৌদিও সুভদ্রার মতোই উত্তর দিয়েছিল, 'অ! রূপের বড্ড অহংকার, না ? কথাটা আর একবার শুনতে চাও বুঝি, যাতে আরও জোর দিয়ে বলি।'

সেদিন তখনও কিন্তু ওর বিশ্বাস হয় নি যে ওর চেহারা ভাল, তার মধ্যে অপরের পছন্দ করার মতো কোন আকর্ষণ আছে।...মনে হয়েছিল বৌদিটা যেন কি, আস্ত পাগল একটা। আর, কীই বা বয়েস, হয়ত বিনু ওর চেয়েও ছোট, বিনুর চেহারার সঙ্গে কি স্বামীর তুলনা দেওয়া যায়। কী চেহারা দাঁড়াবে তার ঐ বয়েসে তা কে জানে।

এই বৌদিটি সুখী হয় নি। ইস্কুল কলেজে বিশেষ না পড়লেও একটু মার্জিত রুচির রোমান্টিক ধরনের মেয়ে, ভদ্রলোক বিশেষ ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর কতকগুলো উচ্চ ধারণা মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। স্বামীটির প্রবৃত্তি জান্তব, আচরণ কথাবার্তাও একটু ইতর ধরনের। স্বামীকে ভক্তি করতে পারল না, সেইহেতু ভালবাসতেও পারল না—এই ব্যথাই তাকে সবচেয়ে বেজেছিল। তাই, সন্তান হবার পরও, বলতে গেলে ইচ্ছা ক'রেই মৃত্যুবরণ করল, না খেয়ে খেয়ে, শরীরকে একটু বিশ্রাম না দিয়ে—একটু একটু ক'রে শুকিয়ে গেল।

এক পুজোর পর দেখা করতে এসে ছিল ওরা, আড়ালে দেখা হতে বিনু শিউরি উঠে বলেছিল, এ কী চেহারা তোমার হয়েছে বৌদি, 'এ যে খাটে তুললেই হয়। অত সুন্দর চেহারা তোমার। ইস।'

বৌদি এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ফুল ফোটে কিন্তু তার জন্যে উত্তাপ চাই, গাছের গোড়াতেও জল ঢালা দরকার। সে ব্যবস্থা না থাকলে কুঁড়িতে শুকিয়ে যাবে, এই তো নিয়ম ভাই। তুমি

তো গাদা গাদা বই পড়—নিজের মনের উত্তাপ দিয়ে আর একটি মনকে ফুটিয়ে তুলতে হয়—স্নেহ আর সহানুভূতি দিয়ে, মন বোঝার চেষ্টা ক'রে, তবে পরকে আপন করতে হয়—এই কথাই বলে না বইতে ?'

সেদিন আর উত্তর দিতে পারে নি, চোখে জল এসে গিয়েছিল।

॥ ৩৭ ॥

বাড়ি ফেরার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠলেও তখনই হয়ত সে কথা সুভদ্রাকে বলতে পারত না—কিন্তু ভাগ্যই সে ব্যবস্থা ত্বরান্বিত ক'রে তুলল।

অথবা বলা যায়—ভাগ্যরূপিনী দুটি নারী।

লাবণ্যকে ঐভাবে দিনের পর দিন একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এটাকে পূজা বা ওর জন্যে তপস্যা বলে ধরে নিয়ে একটু যে বিচলিত হয় নি, তা নয়। সেই সঙ্গে আরও একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বোধ করেছিল—দেহে একরকমের অননুভূত উত্তেজনা একটা যা, এর আগে কখনও বোধ করে নি। একজনকে আশ্রয় দেবার, প্রশ্রয় দেবার, তাকে আদর করার আপন করার দুর্নিবার ইচ্ছাও। একটু সান্নিধ্য, ঘনিষ্ঠতাও যেন চেয়েছিল সামান্য কিছু কালের জন্য। তবে বেশীক্ষণের জন্যে নয়—মুহূর্তের একটা অভিজ্ঞতা মুহূর্তেই মিলিয়ে গিয়েছিল। ওসব কথা আর মনেও আসে নি তার। ব্যাপারটা মন্দ লাগছে না, এই পর্যন্ত।

কিন্তু পূজারিণীর নীরব পূজা, দৃষ্টি প্রদীপের আরতি চির দিনই নীরব আর নিষ্ক্রিয় প্রতীক্ষায় থাকবে তা সম্ভব নয়।

কয়েক দিন পরেই—সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বাইরের কলতলা থেকে স্নান সেরে বেরোচ্ছে—ঠক ক'রে কী একটা পায়ের কাছে এসে পড়ল।

নিচু হয়ে দেখল কাগজ জড়ানো কি একটা বস্তু। সন্দেহ হল—দূরবর্তিনীর কাণ্ড নিশ্চয়ই।

তুলে নিয়ে দেখল একটা ঢিলের সঙ্গে জড়ানো একখানা ভাল কাগজ—চিঠি, রঙিন রেশমী সুতো দিয়ে বাঁধা। খুলে ঢিলটা ফেলে দিয়ে কাগজখানা মুঠো ক'রে নিয়ে ওপরে চলে এল।

আলোতে এনে খুলে দেখল তাতে লেখা—'আপনার একটিবার দেখা কি পাব না? একটা কথাও বলবেন না? আমি কাল সন্ধ্যাবেলা বড় রাস্তার সামনে অপেক্ষা করব, দয়া ক'রে আসবেন।'

সই নেই, ঠিকানাও না। তবে মেয়েলি হাতের আঁকাবাঁকা লেখা—বুঝতে দেরি হয় না এ চিঠি কার।

সুভদ্রা তখন নিচে রান্না করছেন। দালানে ছোটগুলোকে সামলাচ্ছে রমা। কবু স্কুলে খেলতে গেছে, তখনও ফেরে নি। ওপরতলা জনহীন। ঘর থেকে উঠোনের দিকের বারান্দায় বেরিয়ে এল বিনু। সন্ধ্যা পার হয়ে গেলেও শুক্ল-পক্ষের চাঁদ তখনই অনেকটা উঠে গেছে। খুব জোর আলো না হলেও মূর্তিটা দেখা যেতে অসুবিধে নেই।

ঠিক সিঁড়ির সামনে তেমনি স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে পূজারিণী, দেবতার প্রসন্নতার অপেক্ষা করছে। বিনু ডান হাতটা তুলে এদিক থেকে ওদিক বার কতক নাড়ল—অর্থাৎ, না। সে এ গোপন সাক্ষাতে রাজী নয়।

তারপর আঘাতটা আহতকে কতটা বাজল তা দেখার জন্য অপেক্ষা না ক'রে দ্রুত নেমে এল।...

একবার ভাবল চিঠিখানা সুভদ্রাকে দেখায়, কিন্তু তার পরই মনে পড়ল কুন্তীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের অভিশাপ, মেয়েদের পেটে কথা থাকবে না। সুভদ্রাকে বলা মানেই পাঁচ কান হওয়া। দত্তদের মেজ বৌয়ের সঙ্গে খুব ভাব ওঁর, এখনই হয়ত গিয়ে বলে আসবেন। এমন কি উচিত শিক্ষা দেওয়ার অহংকারে ওদের বাড়িতে গিয়েও বলে আসা অসম্ভব নয়। তারপর নিশ্চিত একটা তুলকালাম কাণ্ড হবে ও বাড়িতে, মেয়েটার ওপর নির্যাতন চলবে।

কী দরকার, মিছিমিছি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবার। ইংরেজীতে যাকে বলে য়্যাডিং ইনসাল্ট টু ইনজুরী—আঘাতের সঙ্গে অপমান যোগ করায়!

সে চিঠিখানা কুচি কুচি ক'রে রাস্তার দিকের জানালা দিয়ে বাইরে ছড়িয়ে দিল।

প্রথম প্রথম একটু অপ্রীতি ও—অজ্ঞাতকুলশীল ছোকরাকে অন্তপুরে ঢোকানোর জন্যে সন্দেহের চোখে দেখলেও, এ ব্যবস্থায় ওঁর আপত্তি ছিল বলে এ ব্যবস্থায় উদাসীনও—ক্রমশ পিনাকীবাবু ওর প্রতি একটু প্রসন্নই হয়ে উঠেছিলেন।

পড়ানো ছাড়াও—পড়ায় যে মন দিয়ে, তাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—ফাইফরমাস অনেক খাটেও, বাজার তো বেশির ভাগ দিনই, অনেক চিঠিপত্র লিখে দেয়। এই সব কারণে একটা হৃদ্য সম্পর্কই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

ইদানীং কিন্তু সে প্রসন্নতা যেন একটু একটু ক'রে লোপ পাচ্ছে। কথা-বার্তার মধ্যে কাঠিন্য, ব্যবহারে প্রথম দিককার ঔদাসীন্য ফিরে আসছে। কিছু-দিন আগে তো এমন হয়েছিল—খেতে বসে খাওয়ার পরও বহুক্ষণ গল্প করতেন ওর সঙ্গে—এখন স্পষ্টতই কথা বলাও এড়িয়ে যান। বিনু যেচে কথা বললেও 'হুঁ' 'না' করে উত্তরের দায় সারেন। কখনও বা সম্পূর্ণ ওকে উপেক্ষা ক'রে অন্য কারও সঙ্গে অন্য কথা পাড়েন।

এটা একদিনে বুঝতে পারে নি বিনু। মনোভাব পরিবর্তনের প্রকাশটা হয়েছে অল্প অল্প, হঠাৎ নজরে পড়ার কথাও নয়।

লক্ষ্য করার পরও কারণটা খুঁজে পায় নি। কোথায় ওর কি অপরাধ ঘটল সেটাই বোঝার চেষ্টা করেছে প্রাণপণে, আর ধরতে না পেরে অকারণেই নিজেকে অপরাধী বোধ ক'রে উদ্বিগ্ন, কিছুটা বিহ্বল হয়ে উঠেছে।

তারপর আলোটা দেখা গেছে। ভাবতে ভাবতে কারণটা—সব না হোক কিছুটা বুঝেছে।

হিসেবটা পরিষ্কার। সুভদ্রা যত একটু একটু ক'রে ওর প্রতি বেশী প্রসন্ন বেশী স্নেহ-মমতাশীল হয়ে উঠছেন—পিনাকীবাবুর অপ্রসন্নতা ততই বাড়ছে।

কথাটা মনে আসার পর আরও ভাল ক'রে লক্ষ্য করেছে—ফলে এই বিশ্বাসটাই দৃঢ় হয়েছে।

প্রথম প্রথম হাসি পেত ওর।

এ কি ছেলেমানুষী ভদ্রলোকের। উনি কি কচি খোকা?

পিঠোপিঠি ভাইরা মায়ের স্নেহ নিয়ে এমনি ঝগড়া মারামারি করে। এমনি অভিমান করে কথায় কথায়।

সুভদ্রার স্বভাবটাই অতিমাত্রায় মমতা-পরায়ণ, তাছাড়া একটু ছেলেমানুষও। হাসিঠাট্টা গল্পগুজব এসব ভালবাসেন। পিনাকীবাবু অর্থের সাধনা ছাড়া কিছু বোঝেন না। তাঁকে পাওয়াও যায় না, সর্বদাই ব্যস্ত থাকেন। সুভদ্রা এত অল্পকালের মধ্যে পাঁচটি সন্তানের মা হয়েছেন—এদের মানুষ করা, এতবড় বাড়ির বিবিধ ও বিচিত্র কাজ, রান্না—এতগুলি ছেলেমেয়ের যাবতীয় জামা সেলাই—এতে শুধু ক্লিষ্ট নন, মনে মনে পিষ্টও হচ্ছিলেন, সংসারের অকরুণতায় আর অবিচারে।

যখন প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছে চারিদিক থেকে—ঠিক সেই সময়, বতকটা মরুযাত্রীর সামনে ওয়েসিসের মতোই সহসা বিনু এসে পড়েছিল।

অল্পবয়সী ছেলে, হাসি-খুশী, ঠাট্টা-তামাশা করলে বোঝে, পাল্টা জবাবও দিতে পারে—অথচ পড়াশুনো আছে, গভীরভাবে ভাবতে ও তলিয়ে বুঝতে পারে—এমন ঠিক এই বয়সী ছেলে এ বয়সের মধ্যে দেখেন নি সুভদ্রা। স্নেহ দয়ামায়া যথেষ্ট নয়—বরং তারও বেশী; সুভদ্রার শরীর খারাপ হতে এর মধ্যে দুদিন পুরো রান্না ক'রে দিয়েছে সে দুবেলা, জোর ক'রেই। তার মধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের রান্নাঘরের সামনে বসিয়ে পড়া বলে দিয়েছে—সে কাজেও ফাঁকি দেয় নি। আবার দুপুরবেলা বসে মাথায় জলপটি দিয়ে হাওয়া করেছে। এরপর যদি তাঁর স্নেহের বা যত্নের পরিমাণ একটু বেড়ে যায় তাতে পিনাকীবাবুর অসন্তুষ্ট হবার কি আছে? ছোট ভাই বা দেওর থাকলে তার প্রতি যতটা আদর-যত্ন মায়া পড়ত—তার বেশী তো নয়।

গম্ভীর প্রকৃতির বিষয়-সর্বস্ব জীব হয়েও কেন পিনাকীবাবুর এই অকারণ বিদ্বেষ এই প্রশ্নই কদিন ওকে বিস্মিত সেই সঙ্গে উৎকণ্ঠিত ক'রে তুলেছিল, তার উত্তরও একদিন সহসাই পেয়ে গেল।

লাবণ্যর চিঠি পড়বার চার পাঁচদিন পরে একদিন সুভদ্রা বিকেল বেলা ওর ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলেন, 'ও ছুঁড়িটার কি ব্যাপার বলো তো, আর তো কৈ দাঁড়াতে দেখি না!'

প্রশ্নটা গম্ভীর মুখে করলেও দৃষ্টিতে একটু মুখটেপা গোছের হাসি ছিল সেটা বিনুর চোখ এড়ায় নি। লাবণ্য যে দাঁড়াচ্ছে না—তা সেও লক্ষ্য করেছে কিন্তু এখন উদাসীনভাবে বলল, 'ও, আর দাঁড়ায় না বুঝি? শখ মিটে গেছে বোধ হয়! কিম্বা এবার সত্যি সত্যি মনের মানুষ পেয়েছে!'

'ওমা, ও যে দাঁড়াচ্ছে না, তা তুমি লক্ষ্যও করো নি বুঝি। ধন্যি মানুষ। মেয়েটা তোমার জন্যে বুক ফেটে মরে যাচ্ছে—আর তুমি বসে পা নাচাতে নাচাতে বলছ মনের মানুষ পেয়েছে! কী তুমি!'

'তবে এই তো তুমিই বলছ—আর দাঁড়ায় না। আমার ওপর টান থাকলে এখনও দাঁড়াবে এই তো নিয়ম!'

'এই তো নিয়ম। সব নিয়ম জেনে বসে আছ না! ও এখনও তোমার জন্যে তেমনি পুরোদস্তুর পাগল হয়ে আছে, জানো! তুমি ফিরে তাকাও না বলেই বোধ হয় আর দাঁড়ায় না কিন্তু দিনরাত নাকি গুম খেয়ে বসে থাকে, খায় না, চান বলতে দু'ঘটি জল ঢেলে বেরিয়ে আসে, গায়ে সাবান দেয় না, একখানা ভাল কাপড় পরে না—ব্যাপার-স্যাপার দেখে মামী বুঝি বলেছিল বিদ্যুৎবাবুকে সম্বন্ধ দেখতে, তা ছুঁড়ি বলেছে, বিয়ে এ জীবনে সে করবে না, তেমন কোন চেষ্টা না করা হয়।'

একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় বিনু। খুশী হবার কথা, এমন ক'রে কেউ তাকে চাইছে, এ বয়সে এর চেয়ে খুশী হবার আর কি আছে ছেলেদের। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ব্যথাও অনুভব করে। সে তো এর কোন প্রতিদানই দিতে পারবে না, তেমন কোন অনুরাগও তো বোধ করছে না মেয়েটি সম্বন্ধে। একি অপাত্রে এই প্রীতি দিল মেয়েটা, অকারণে কষ্ট পাচ্ছে!

কানে গেল সুভদ্রা বলছেন, 'সত্যি! তুমি একবার ফিরেও চাইলে না অমন সুন্দর মেয়েটার দিকে। এ যে রাজার ছেলেও পেলে ধন্যি মানবে!...কী তুমি!'

তারপর গলাটা একটু গম্ভীর ক'রে বলেন, 'দ্যাখো, আমি আগে বলতুম যে আমার সাত বছরের মেয়েকেও কোন পুরুষের সঙ্গে একা কোথাও ছাড়ব না। পুরুষ জাতে আমার এমন ঘেন্না! এখন তোমাকে দেখে বুঝছি অন্য রকমও আছে! তোমাকে ষোল বছরের মেয়ের সঙ্গে দোর বন্ধ ক'রে সারারাত রেখে দিলেও তুমি তার কোন অনিষ্ট করবে না!'

'পুরুষ জাত সম্বন্ধে এমন উচ্চ ধারণা হল কেন তোমার?' হেসে বলে বিনু, 'এত পুরুষ কবে দেখলে? না কি কর্তাকে দেখেই।'

কৃত্রিম কোপে চোখ পাকিয়ে সুভদ্রা বলেন, 'য়্যাই! খবরদার! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার এমন দেবতা স্বামী সম্বন্ধে এমন সন্দেহ!'

'তা এই দেবতাটিকে এতদিন দেখে এমন দেবতার সঙ্গে এত বছর ঘর ক'রেও তাহলে পুরুষজাতে এমন ঘেন্না এল কেন? এত সন্দেহ!'

বিনু জোরের সঙ্গে উত্তর দেয়। কারণ মুখে যাই বলুন সুভদ্রা, তাঁর চোখের অভয় দৃষ্টি ওর চোখ এড়ায় নি।

সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে পা ছড়িয়ে ওদের ঘরের মেঝেতে বসে কবুকে তিনটে পয়সা দিয়ে মোড়ের কালুরামের দোকান থেকে আলুর বড়া আনতে পাঠান সুভদ্রা। তারপর বলেন, 'তোমার বকশিশ, বুঝলে, সচ্চরিত্রতার পুরস্কার—যাই বলো!'

'ঐ তিন পয়সা পুরস্কার। তাও নগদ নয়, আলুর বড়া!'

'তা আবার কত! বারোখানা আলুর বড়া কি কম। বলি এখনও তো তোমার বয়েস পড়ে আছে গো। এখন ভালমানুষ, ভাজা মাছ উল্টে খাও না, চব্বিশ পঁচিশে যে রাক্কস হয়ে উঠবে না কে বললে! সে বয়েস দেখে তারপর না হয় আলুর বড়ার জায়গায় মাংসর চপ বকশিশ করব!'

তারপর গলা নামিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলেন, 'না না, তামাশা নয়—সত্যিই এমন মেয়ে, বাঙালীর ঘরে এত রূপ খুব কমই দেখা যায়।...তাতেও তোমার মন পেল না কেন ?'

'ও আমার ভাল লাগে না। তা ছাড়া এসবে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিকও নয়। এখনই এসব কি ! জীবনে একটা বড় কিছু করব, মানুষ হবো, লোকের সম্মানভাজন হবো—এই আমার একমাত্র চিন্তা এখন। প্রেমটেম করার ঢের সময় পড়ে আছে।'

'তবু—। মানুষ সুন্দর দেখে তো ভোলে, সুন্দরই চায় সবাই। পুরুষ মাত্রেই চায় সুন্দরী বৌ—বোয়েরা চায় সুন্দর বর বা পুরুষ। সুন্দর দেখে কে না গলে। তুমি কি বিয়ের সময় সুন্দর বৌ খুঁজবে না ?'

'না।' গলায় বেশ জোর দিয়ে বলে বিনু, 'না, বিয়ে করা মানে তো ঘর করা তার সঙ্গে, জীবন কাটানো। সেখানে রূপের কথাটাই কি আগে বিচার করা উচিত ! তুমি তো এমন কিছু সুন্দর দেখতে নও, তবু বলব পিনাকীবাবুর বহু জন্মের তপস্যার ফল ছিল তাই তোমার মতো স্ত্রী পেয়েছেন।'

চোখে কি হঠাৎ এক ঝলক গরম জল এসে যায় সুভদ্রার ?

মুখ চোখে কি কেউ আলতো গোলা লাগিয়ে দেয় খানিকটা ?

তিনি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'কে জানে—সে তো মনে করে না তা !'

তার পরই যেন জোর ক'রে হাল্কা হতে চেষ্টা করেন, 'কেন মশাই, আমি কি এতই কুচ্ছিৎ ? বয়েস কালে ভাল দেখতে ছিলুম তা বলে। তোমার ঐ অমুকবাবু বাসরে গান গেয়েছিল, এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।'

ইতিমধ্যে কবু আর তার সঙ্গে অন্য ছেলেরা হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢোকে, রমাই কেবল শান্ত হয়ে ছিল। বাকী সকলেরই—একেবারে ছোটটা ছাড়া—নজর কবুর হাতের শালপাতার ঠোঙাটার দিকে।

কোন মতে বহু প্রসারিত হাতের ওপর দিয়ে ছোঁ মেরে ঠোঙাটা নিয়ে সুভদ্রা খান তিনেক বড়া বিনুকে দিতে পারলেন, বাকী, সব কেড়ে বিগড়ে নিল ছেলে-মেয়েরা, বেচারী মুখচোরা রমা একখানার বেশী পেলই না।

ওদের দেওয়া হতে সুস্থির হয়ে সুভদ্রা বিনুর দিকে তাকাবার অবকাশ পেলেন। বিনু তখন শেষ বড়াটা মুখে তুলছে।

'বা রে ছেলে ! তোমার তো খুব বিবেচনা। আমি আগে ভাগে তোমার কাছে বেশী ক'রে জমা দিলুম, তুমি আমার জন্যে একখানাও রাখলে না ! দেখে নিলুম তোমার বিবেচনা।'

বিনু বিষম লজ্জা পেয়ে মুখে তোলা বড়াটা হাতে নিয়ে বলল, 'ইস। আপনি যে একেবারে রাখবেন না, তা কেমন ক'রে জানব ! এখন উপায়। দাঁড়ান, আমি আরও দু-পয়সায় নিয়ে আসছি।'

'না, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। আমি কি বাজারের বড়ার পিত্যেশী, তা হলে তো নিজেই একটা রাখতে পারতুম। তোমার সঙ্গে ভাগ ক'রে খেতে পারলে তবেই বড়ার দাম।'

'কিন্তু এই—মানে এই একটা—এটাও যে আমি মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে

ছিলুম খানিকটা।' কোনমতে অপ্রতিভ কণ্ঠে স্বর ফুটিয়ে বলে।

'তাতে কি হয়েছে। ভাগ ক'রেই তো খাব বলছি। ঐ থেকেই একটু খাবো।'

'এটা? ওমা—এ যে এঁটো!'

'তাতে কি হয়েছে। দেবে না তাই বলো—মিছিমিছি এত বায়নাক্কা করছ কেন!'

'না না, যাঃ! এই নাও। এঁটো কিন্তু। জিভে ঠেকেছে। ঘেন্না করবে না? এর পর আমাকে যেন দোষ দিও না।'

'হ্যাঁঃ। তোমার এঁটো খাবো তাতে আবার ঘেন্না! সেদিন তোমার পাত থেকে কচুর ঘণ্ট তুলে নিয়ে খেলুম না!'

'সে তো আর মুখের মধ্যে দেওয়া না। এই নাও। খেলে তো ভালই, আমার ভাগ্যি!'

'ওমা, ই কি! পুরোটা দিচ্ছ কি। তুলেছিলে, মুখের জিনিস—এমনভাবে পরকে দিতে আছে! তুমি অর্ধেকটা কেটে নাও দাঁতে—'

'না না, ঐটুকু তো জিনিস, তার আবার অর্ধেক।'

সুভদ্রা এবার যেন নিজ মূর্তি ধরলেন, তাঁর অভ্যস্ত শান্ত গম্ভীর শাসনের সুরে বললেন, 'তাহলে কিন্তু আমি আর স্পর্শও করব না। আজও না, জীবনেই নয়। এ জিনিসের এই শেষ!'

'আচ্ছা বাবা! ঘাট হয়েছে। দাও দাও, আমি খানিকটা ছিঁড়ে নিচ্ছি!'

'না, যা বলেছি তাই। কেটেই নিতে হবে দাঁতে। ছিঁড়ে নিয়ে তুমি জিভে লাগা দিকটা নেবে, আর ভাববে আমি সেই জন্যেই এত ফন্দী করছি। তা হবে না।'

এই বলে ওর উদ্যত হাতটা টেনে সরিয়ে দিয়ে আলুর বড়াটা প্রায় বিনুর মুখে গুঁজে দিলেন।

অগত্যা বিব্রত লজ্জিত বিনু কোনমতে প্রায় অর্ধেকটা কেটে নিল, সুভদ্রা বাকীটা মুখে পুরে বললেন, 'কী সামান্য জিনিস নিয়ে কত কাণ্ডই করতে পারো। সত্যি! তুমি সত্যিই লেখক হবে, এইবার বুঝছি!'

—প্রথম খণ্ড সমাপ্ত—

আদি আছে অন্ত নাই

দ্বিতীয় খণ্ড

সেদিন সারারাত ভাল ক'রে ঘুম হল না বিনুর।

কবু তার অভ্যাসমতো ওকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে শুয়েছে, ছেলেটা ঘামেও অসম্ভব, তবু—এ তো তার এই চার পাঁচ মাসে সয়েই গেছে, তাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। বরং ঘুমের মধ্যে যখন পরম নির্ভরতায় ওর গলার খাঁজে মুখটা গুঁজে দেয় তখন ওর চুলে সুড়সুড়ি লাগে, ওর কপালের অতিরিক্ত ঘামে ও চাপে বিনুর নিজেরও ঘাম হয় খুব বেশী, তবু কবুর ঘুম ভেঙ্গে যাবার ভয়ে বা পাছে সরিয়ে দিলে দুঃখ পায়—বিনু ওর মাথাটা সরাবার চেষ্টাও করে না, সহ্যই করে। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে—আর ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।

সেদিন ঘুম হল না তার অন্য কারণে।

আজকের এ ঘটনাটা অভিনব, অপ্রত্যাশিত।

ওর জীবনে রীতিমতো একটা স্মরণীয় ঘটনা।

এমনভাবে যে ওকে কেউ ভালবাসতে পারে, এতটা নির্ঘৃণ হয়ে—এতখানি অন্তর দিয়ে—এ তো বিনুর কল্পনা এমন কি স্বপ্নেরও অগোচর।

এ আনন্দ এ গর্ব শুধু অনাস্বাদিত-পূর্বই তো নয়—চিন্তা ও বুদ্ধিরও অতীত। এমন যে কারও জীবনে ঘটে, ঘটতে পারে, তাই তো ওর ধারণা ছিল না।

জীবনে এই প্রথম—মা বামুনমাসী বাদে—একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলার কাছ থেকে এমন বুকভরা ভালবাসা পেল। এ যে কী ক'রে ও অনুভব করবে, কত রকমে তা যেন ভেবেই পাচ্ছে না। একটা সামান্য উপলক্ষ থেকে এমন একটা পুলক-শিহরণ এমন অনির্বচনীয় আনন্দ পাওয়া যায় তা তো কখনও ভাবে নি। এখনও যেন এই অনুভব ও অনুভূতি বিশ্বাস হচ্ছে না। মনের মধ্যে বর্ণনাতীত এই সুখের বিভ্রান্তিটুকুও কি পরমাশ্চর্য।

তবু, এই একান্ত বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ও উত্তেজনাই কি সেদিনের নিদ্রা-হীনতার একমাত্র কারণ ?

না, তা নয়।

এই বিপুল সহানুভূতি ও পুলকাবেগ ছাপিয়ে কোথায় যেন একটা অস্পষ্ট ও অব্যক্ত বেসুরও শোনা যাচ্ছে। যেন একটা কি কষ্টকর আশঙ্কার ইঙ্গিত পাচ্ছে মনে—একটা স্বয়ং-উদ্ভুত সতর্কতা।

ভাল নয়, ভাল নয়। এ ভাল নয়, এতটা ভাল না।

এ স্বাভাবিক নয়—এতটা।

এর ঠিক পিছনেই বা পরেই আছে একটা সুগভীর অতল-স্পর্শ খাদ, বিপুল বিনষ্টির অন্ধ গহ্বর—যেখানে পড়লে আর ওঠে না মানুষ, জীবনে আর উঠতে পারে না।

অথচ এও ঠিক—এ বিপদ, এ ভয়ের কারণ ও সে পতনের প্রকরণ সম্বন্ধেও ওর পুরোপুরি বা স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। অভিজ্ঞতা নেই বলেই ধারণা করা

সম্ভব নয়। এ স্নেহ যে বাৎসল্যর সীমা ছাড়িয়ে অন্যত্র বা অন্য পথে যেতে পারে—তাও ঠিক জানে না, তেমনভাবে ভাবতে পারছে না।

শুধুই অস্বস্তি একটা।

আসন্ন অথচ অজ্ঞাত বিপদের আবছা একটা সম্ভাবনা সম্বন্ধে সহজ পূর্বাভাস। সহজাত সচেতনতা, প্রকৃতির রক্ষা-প্রবণতা।

আজ মনে হয় অল্প বয়সে অসংখ্য বই পড়ার জন্যে অবচেতনেই এর অনেকটা জানা হয়ে গিছল, জীবনের অভিজ্ঞতা যোগ না হওয়ায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না—তবু সেই অননুভূত পুস্তকাহরিত অভিজ্ঞতাই ঐ অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে।

ও যতই মনকে শাসন করার চেষ্টা করে, তর্জন করে—কিসের জন্যে ভাল নয় তা বুঝিয়ে দাও, ততই মন আপন মনে মাথা নাড়ে, না না। এ ভাল নয়, এ ভাল নয়।

এর পর কদিন শুধু যে বিনুই একটু গম্ভীর, একটু উন্মনা হয়ে রইল তাই নয়—সুভদ্রার মধ্যেও একটা ভাবান্তর দেখা দিল।

অকস্মাৎ ঝোঁকের মাথায় মাত্রাতিরিক্ত ভাবাবেগ প্রকাশ ক'রে ফেলে তিনি লজ্জিতও হয়েছেন। হয়ত তিনিও মনের মধ্যে সেই হুঁশিয়ারী শুনতে পাচ্ছেন—এ ভাল নয়, এতটা ভাল নয়।

লজ্জা বিনুর কাছেই বেশী কি নিজের কাছে—কে জানে। সুভদ্রা শুধু ওর দিকে নয়, ছেলে-মেয়েদের দিকে বা স্বামীর দিকেও মাথা তুলে ভাল ক'রে তাকাতে পারলেন না কদিন!

দুজনের এই ভাবান্তর এতই স্পষ্ট যে, সন্দিগ্ধ বিদ্বিষ্ট পিনাকীবাবুর চোখে না পড়ার কথা নয়। ফলে তিনি আরও গম্ভীর আরও তিক্ত হয়ে উঠলেন। আর সেটা ওদেরও চোখে পড়ে—ওরা আরও বিব্রত কুণ্ঠিত হতে লাগল।

এখান থেকে যেতে হবেই—শুধু কেমনভাবে সে পর্বটা সমাধা করবে সেইটেই দিন-রাত ভাবছে। সুভদ্রা কবু, এমন কি নীরব রমাও তার অতন্দ্র মনোযোগ ও প্রায়-অস্বাভাবিক সেবা দিয়ে তাকে যেন আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছে—তাদের কাছে কথাটা পাড়বে কি ক'রে, সেইটেই প্রধান চিন্তা হয়ে উঠেছে ওর। ফলে আরও শুষ্ক আরও অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে বিনু—এমন সময় দৈবই ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন, অর্থাৎ মরীয়া ক'রে তুলে সব কুণ্ঠা ও বিবেচনা ঝেড়ে ফেলতে।

এর মধ্যেই একদিন হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজে—অনেকক্ষণ ভিজে-জামা-জুতো গায়ে থাকার ফলে—বিনুর এসে গেল প্রবল জ্বর।

কবুই সেটা আবিষ্কার করে। সে সারা রাত দাদাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকে, ঘুমের ঘোরে হয়ত বন্ধনটা একটু শিথিল হয়ে আসে, ঘুম থেকে ওঠার সময় সেটা দ্বিগুণ পুষিয়ে নেয়। চেপে ধরে থেকে অনেকক্ষণ ধরে পিঠের খাঁজ কি হাতের খাঁজে মুখ ঘষে, কখনও কখনও গালে চুমো খায়। আজও সেই সময়টাতেই

টের পেয়েছিল সে। লাফাতে লাফাতে উঠে নিচে এসে খবরটা দিয়েছিল মাকে।

সুভদ্রাও শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ওপরে উঠে এসে হাত দিয়ে দেখেছিলেন, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। বাড়িতে থার্মোমিটার নেই বহু দিন, ছুটে গিয়ে নিজেই দত্তদের কাছ থেকে চেয়ে এনে দেখলেন—একশ দুইয়ের ওপর জ্বর। প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে এসে স্বামীকে বললেন—অনেকদিন পরে, এই প্রথম বিনুর প্রসঙ্গে স্বামীর সঙ্গে কথা তাঁর—'কী হবে, হ্যাঁ গো, ছেলেটার গা যে পুড়ে যাচ্ছে একেবারে।'

শুষ্ক নিরাসক্ত কণ্ঠে পিনাকীবাবু বললেন, 'জলে ভিজে জ্বর হয়েছে—সর্দি জ্বর—ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো, ওতে টেম্পারেচার একটু বেশীই ওঠে। তার জন্যে এত ব্যস্ত হবার কি আছে! আমার নিজের ছেলেদের একটু জ্বরজাড়ি হলে কখনও ডাক্তার ডেকেছি বলে তো মনে পড়ে না!...তবে যদি মনে হয় এখনই চিকিৎসা শুরু করা উচিত, দত্তদের জটাকে বল একটা রিক্সা ক'রে নিয়ে গিয়ে কারমাইকেল কলেজে ভর্তি ক'রে দিয়ে আসুক। গণ্ডা-তিনেক পয়সা বরং দিয়ে দাও রিকসা ভাড়া, কি চার আনাই দাও, জটাকে আবার ফিরতে হবে তো।'

ঠিক গালে একটা চড় খাওয়ার মতো অপমানিত হয়ে ফিরে এলেন সুভদ্রা।...

এর পর চিকিৎসার কথা ভাবা যায় না, তবু সুভদ্রা স্থিরও থাকতে পারলেন না।

দত্তদের পিছন দিকে এক বড় কবিরাজ থাকেন, তাঁর এক কম্পাউন্ডার বা ওষুধ-প্রস্তুতকারক আছে। সে গোপনে অল্পদামে পাড়ার লোককে কিছু কিছু ওষুধ দেয়। অবশ্য তার জ্ঞান বা শিক্ষামতো। দত্তদের মেজবাবুর ছেলে জটার সঙ্গে তার খুব ভাব। আলমারিতে পাতা বাদামী কাগজের তলা থেকে সংকট-কালের জন্যে জমানো অতি সামান্য পুঁজি ভেঙ্গে দুটি টাকা বার ক'রে এক ফাঁকে গিয়ে দিয়ে এলেন জটাকে—সর্দি-জ্বরের যদি কিছু ওষুধ পাওয়া যায়।

এ ছাড়া নিজেরও যথাসাধ্য যা করবার সবই করলেন। আদার কুঁচি রসুন দিয়ে চিঁড়ে ভেজে দিলেন, সাবুটাকে পায়েসের মতো ক'রে দিলেন—তেজপাতা ছোটএলাচ প্রভৃতি দিয়ে। কিন্তু বিনুর তখন খাবার ইচ্ছা নেই একটুও। সাবুটাই খেল—চিঁড়ে ভাজা ছেলেদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিল।

কবিরাজী ওষুধ সত্ত্বেও বিনুর জ্বর কমল না, বরং সন্ধ্যের দিকে আরও বাড়ল। পিনাকীবাবু বাড়ী ফিরে কর্তব্যবোধে একবার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন, মাথার যন্ত্রণা বা গায়ের ব্যথা আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন, তারপর একটা য়্যাসপিরিনের বড়ি দিয়ে আবার কি একটা কাজে বেরিয়ে গেলেন।...

রাত্রের রান্না সেরে আবার যখন সুভদ্রার ওপরে আসবার সময় হল তখনও পিনাকীবাবু ফেরেন নি। ছেলে-মেয়েরা ও ঘরে গোল হয়ে বসে পড়ছে, ছোটগুলো পড়া-পড়া খেলা করছে—একেবারে কচিটা ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্য দিন হলে এ ঘরেই পড়ত ওরা, আজ দাদার অসুখ করেছে বলে সতর্ক ক'রে দেওয়ায় কেউ এদিকে আসে নি, গোলমালের ভয়ে এদিকের দরজাও বন্ধ আছে। এটা কবুই করেছে কেউ বলে দেয় নি।

কবুর আসলে একটুও ভাল লাগছে না। দাদার পাশে শুতে দেবে না মা, সে তো জানা কথাই, দাদার কাছে বসারও হুকুম পায় নি। মা হয়ত অতটা বাড়াবাড়ি করতেন না, বাবাই কড়া নির্দেশ দিয়ে গেছেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা ছোঁয়াচে রোগ—কেউ না ও ঘরে যায়, খেয়াল রেখো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছোট্ট একটা চাতালের মতো, সেখান দিয়ে ভেতরের খোলা বারান্দায় যাওয়ার পথ—এই চাতাল বা ল্যাণ্ডিংয়ের দু পাশে দুটো ঘর। মধ্যে অনেকটাই ব্যবধান, তবু সকাল থেকে পিনাকীবাবু শিঁটিয়ে আছেন, জ্বরের বীজাণুটা যদি ওঁদের ঘরেও গিয়ে পেঁছিয়—এই ভয়ে।

সুভদ্রাকে সাবধান করা যাবে না তা অবশ্য তিনি জানতেন, সে চেষ্টাও করেন নি। বিনুও তা জানত, সে অনেকক্ষণ থেকেই সুভদ্রাকে আশা করছিল। এ আশা নিজের গরজেই করা, নইলে সে বিলক্ষণ জানে যে এ সময় তার মাথায় সংসারের সহস্র কাজ, রান্না করা, ছোটদের খাওয়ানো তাদের ঘুম পাড়ানো—ওপরের বিছানা পাতা—তবু ওর অবুঝ মন—মাথা ও কোমরের ব্যথায় ছটফট করতে করতে যেন একটু অভিমানই বোধ করছিল। যার অসুখ-বিসুখ বিশেষ করে না, বিশেষত অল্প বয়সে—সামান্য অসুখেই কাতর হয়ে পড়ে। তখন সে চায় মা বা অমনি কেউ এসে কাছে বসুক, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিক। বিনুর মনও তেমনি একজনকে চাইছিল। এমন কি মনে হচ্ছিল রমার কথাও, সে অন্য দিন কত কি ছোটখাট সেবা করার চেষ্টা করে, আজ সেও যদি আসত, বলত পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে। কিম্বা কবুও যদি অন্য দিনের মতো চেপে জড়িয়ে থাকত বোধ হয় আরাম লাগত। তারা যে আজ কেউ একবার উঁকি মারছে না, সেজন্যে বেশ একটু ক্ষুন্নই বোধ করছিল বিনু, একটু আহত। এই সামান্য জ্বর—তাও কেউ ছোঁয়াচের ভয় করতে পারে, ওদের এ ঘরে আসতে বারণ করতে পারে, একথা ওর কল্পনারও বাইরে।

সুভদ্রা যখন এলেন তখন কিন্তু আর জ্বরটা সামান্য নেই। ছেলে-মেয়েদের জ্বর দেখে অভ্যস্ত সুভদ্রার মনে হল একশো তিনেরও বেশী। আচ্ছন্নর মতো পড়ে আছে, তবু তার মধ্যেও 'আঃ!' 'উঃ' 'মাগো' করছে—কতকটা অর্ধচেতন অবস্থায়।

ঘরের আলো নিভনো ছিল। সারা রাত সিঁড়ির চাতালে একটা ছোট কেরোসিনের আলো জ্বলে, তা থেকে আর বিদ্যুৎব্যবুদের বাড়ির সিঁড়ির মুখের বেশী পাওয়ারের বাল্বটা থেকে যা একটু আলোর আভাস মতো এসে পড়েছে ঘরে। তাতে ভাল ক'রে মুখচোখ দেখা যায় না, তবু সুভদ্রার মনে হল বিনুর মুখটা লাল, থমথম করছে।

এ অবস্থায় কপালে জলপটি দিয়ে হাওয়া করাই উচিত ছিল, কিন্তু সে কথা তাঁর মনে এল না একবারও। তাঁর দু চোখ দিয়ে তখন অবিরল ধারে জল ঝরে দুই গাল বেয়ে বোধহয় বুকও ভাসাতে শুরু করেছে। তিনি ওর পাশে আধশোয়া ক'রে বসে ওকে জড়িয়ে কপালে নিজের গালটা রেখে তাপটা বোঝার চেষ্টা করলেন। অসহ তাত—ভিজে গাল সত্ত্বেও পুড়ে যাচ্ছে একেবারে—কিন্তু রোগীর সেইটুকু আর্দ্র স্পর্শেই আরাম বোধ হল। অস্ফুট

কণ্ঠে 'আঃ' বলে একটা আরামদায়ক শব্দ ক'রে মাথাটা ওঁর গলার খাঁজে গুঁজে দেবার চেষ্টা করল সেই অর্ধ-চৈতন্য অবস্থাতেই।

সুভদ্রা আর দ্বিধা করলেন না। সংকোচের কোন কারণ আছে, তাও তাঁর মাথায় গেল না বোধহয়—তিনি একেবারে ওর মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন।

সুভদ্রা শীত গ্রীষ্ম কোন সময়েই গায়ে জামা রাখতে পারতেন না। বাইরের কেউ না থাকলে এমনি শাড়িটাই আলতোভাবে জড়িয়ে থাকতেন। কোন অপরিচিত কেউ কি কুটুম্বসাক্ষাৎ এলে সময় থাকলে একটা জামা পরে নিতেন, নইলে—হঠাৎ কেউ এসে পড়লে—শাড়িটাই ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিতেন। রোগাটে ধরনের চেহারা হলেও তাঁর ঘাম হত প্রচুর। গরম সইতে পারতেন না মোটে। আসলে একহারা চেহারা হলেও কাঠির মতো কাঠিন ছিলেন না, একরকম নরম নরম ভাব ছিল, অর্থাৎ চামড়া আর হাড়ের মধ্যে সামান্য মাংসও ছিল। তাতেই বোধহয় অত ঘামতেন ভদ্রমহিলা।

এবারও বিনুর মাথা মুখে ওঁর দেহের স্পর্শ লেগে বেশ আরাম বোধ হ'ল। ঘামের সঙ্গে চোখের জল মিশে ওঁর গা ঠাণ্ডা লাগছে, জ্বরের উত্তাপের মধ্যে সে স্পর্শে আরামই লাগার কথা? কিন্তু এত জোরে চেপে ধরেছিলেন সুভদ্রা যে প্রথমটা নিঃশ্বাস নেওয়াতেই কষ্টবোধ হচ্ছিল।

তবে আচ্ছন্ন ভাবটা একটু একটু ক'রে কেটে এল এবার, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হ'ল, সেই সঙ্গে যে মানুষটা একান্ত স্নেহে ও দুর্ভাবনার আবেগে বুকে চেপে ধরে আছে—তার সম্বন্ধেও।

আকুল হয়ে কাঁদছেন সুভদ্রা। ওর জন্যে আশংকাতে তো বটেই—চিকিৎসার কিছু করতে পারছেন না, পারবেনও না সে জন্যে লজ্জায় ও অপমানেও বটে। নিজের অসহায় অবস্থার জন্যেই আরও এই অপমানবোধ। আর, যেখানে সত্যকার নির্ভেজাল স্নেহের সম্পর্ক—সেখানে তার কষ্ট ও কাতরতা নিজের বলেও অনুভূত হয় খানিকটা।

নীরব অথচ আকুল কান্নার নিরুদ্ধ বেগে ওঁর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে, বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ছে বললে ঠিক বর্ণনা হয় না—যেন প্রচণ্ড একটা ঝড় বইছে।

সে কি সবটাই আশংকায়?

এই অসুখের চিন্তায়?

ভাল লাগছে, খুবই ভাল লাগছে। এমন একটি স্নেহময়ীর সকরুণ উদ্বেগ—এ বয়সে আর কি বেশী চায় মানুষ!

তবু বিনুর আবারও মনে হ'ল—সেদিনের মতো—ভাল না, ভাল না, এ ভাল নয়।

বড় বেশী বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছে সে। তার চেয়েও বেশী জড়িয়ে পড়ছেন সুভদ্রা।

কিন্তু তবু সে যে এই অবস্থাটা উপভোগ করছিল তাতে সন্দেহ নেই। সহসাই একটা প্রবল আঘাত লাগল। আঘাত বলাও হয়ত ভুল, কে যেন

প্রজ্বলিত শলাকা দিয়ে অন্ধকারটা কাটিয়ে দিল মানসিক দৃষ্টির।

নিচের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। পিনাকীবাবুই এসেছেন নিশ্চয়। রমা ছুটে নেমে গেল দরজা খুলে দিতে। সুভদ্রা যেন কিসের একটা ভয়ে—না সংকোচে?—সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। সে চমকটা যে সংকোচ তা বিনুর বুঝতে দেরি হল না। তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে কাপড়টা গায়ে জড়াতে জড়াতে ভেতরের বারান্দার কোণে বাথরুমটায় ঢুকে গেলেন—বোধ করি মুখে মাথায় জল দিয়ে কান্নার চিহ্নটা মুছে ফেলতেই।

খুব জ্বর, অসহ্য যন্ত্রণা—তবু এ সংকোচের ভাবটা অগোচর রইল না। আকস্মিক ছন্দভঙ্গ বলেই এতক্ষণের আধা-আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গিয়েছিল, যেন একটা রূঢ় আঘাতে ঘুম ভাঙ্গার মতো—তাতেই আবরণটা কে যেন একটা পরুষ টানে সরিয়ে দিল চোখের ওপর থেকে!

সেদিনই সে প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেলল—অসুখটা কমলেই সে এঁদের কাছ থেকে বিদায় নেবে। কবু কষ্ট পাবে, রমা বোধহয় কদিন কিছু মুখে দেবে না, সবচেয়ে আঘাত পাবেন সুভদ্রা নিজে—তবু এদের শান্তির ঘরে অশান্তি ডেকে আনতে সে রাজি নয় কোনমতেই।

সুভদ্রাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করবে। যদি বুঝতে না চান, সে নাচার।

এসব ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও—ইংরেজীতে যাকে বলে ষষ্ঠ অনুভূতি—তাই দিয়েই এই ধরনের ঘটনার পিছনের আশঙ্কাটা বোঝে সে, ইদানীং বুঝছে। সতর্ক হওয়া প্রয়োজন—সেটাও।

তবে, এই বয়সেই ওর নিজের এদিকে কোন আগ্রহ বা চিন্তা কি স্বপ্ন না থাকলেও—অভিজ্ঞতাও হল বৈকি কিছু কিছু। তিক্ত অভিজ্ঞতাই।

বামুনমার সেই বোনপো-বৌ, ওর রোমান্টিক বৌদি, সম্প্রতি নাকি আত্মহত্যা করেছেন। বাড়ি ছাড়ার আগেই শুনে এসেছে বিনু। আত্মহত্যা বলছেন না ওঁরা, বলছেন এক রকম ইচ্ছে ক'রে না খেয়ে খেয়ে ম'ল। তা সে তো ঐ একই কথা। মা বলেছেন, ও তো ওরই মধ্যে একটু লেখাপড়া জানা মেয়ে, বেশ একটু সভ্যভব্যও ছিল, আর ওরই জুটল ঐ বর। কারখানার মিস্তিরি বলে নয়, বিড়ি খেয়ে দাঁতে ছ্যাতলা, চ্যাটাং চ্যাটাং কথা, কাঠখোট্টা ধরনের চেহারা তেমনি মেজাজ—প্রেম ভালবাসার ধার ধারে না, ওর কাছে বৌ একটা যন্তরের মতোই—এই তফাৎটা বরদাস্ত করতে পারল না বেচারী।

কিন্তু বিনুর মনে প্রশ্ন ওঠে—সত্যিই কি তাই? ওই অসাম্যই একমাত্র কারণ?

এই তো এখানেও, এই মেয়েটাও নাকি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, নাকি কোন ভাল কাপড় পরতে চায় না—বলেছে জীবনে বিয়ে করবে না। সুভদ্রা অবশ্য উড়িয়ে দিয়েছেন, ও কিছু নয়, দু দিনের ও মনোব্যথা দু দিনেই ভুলে যাবে। যাদের প্রেমে পড়া স্বভাব, এই বয়েসেই পাছার ফুল না ছাড়তে ছাড়তে প্রেম করতে চায়—তারা বার বারই প্রেমে পড়ে, এও শিগগিরই দেখো আবার কারও প্রেমে পড়বে, আর হা-হুতাশ করবে।

তবু এসব ভাল লাগে না বিনুর।

বড় অস্বস্তি আর অশান্তি বোধহয়।

তার চিন্তা কল্পনার পথ দূরে দিগন্ত প্রসারিত, আকাশের সীমা পার হয়ে যেতে চায়—এসব আবেগ সে-পথে শুধুই বাধার সৃষ্টি করে।

॥ ৩৯ ॥

বাড়ি ফেরার দিন কোন অভ্যর্থনা হয় নি সত্য কথা, মা অসময়েই একটা বইতে মনঃসংযোগ ক'রে নীরব হয়ে ছিলেন, দাদা আপিস থেকে এসে ওকে দেখেও কোন মন্তব্য করেন নি, খেয়ে উঠে শুতে যাবার সময় শুধু বলেছিলেন, 'কাল থেকে বাজারটা তুমি ক'রে দিও। আমার বড্ড অসুবিধে হয়।'

তবু দুজনেই যে খুশী এবং নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। দাদার আপিসের পর দুটো টিউশ্যনী সেরে ফিরতে রাত দশটা বাজে। পরের দিন সকালে উঠে আবার বাজার দোকান দুধ কয়লা এসব করতে খুবই কষ্ট হয়। বাজার অবশ্য রোজ হয় না, নিরামিষ বাজার একদিন আনলে দুদিন তো বটেই তিনদিন পর্যন্ত চলে—তবু একটা না একটা বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন লেগেই থাকে। সেগুলো সহজেই বিনুর ওপর চাপল।

তাতে অবশ্য বিনুর কোন কষ্ট ছিল না। কিন্তু প্রয়োজন ছিল দুচার টাকা হাত-খরচের, সে ব্যবস্থা করার সাধ্যও ছিল না দাদার, মনেও পড়ে নি হয়ত। কিম্বা ভেবেছিলেন অন্য কোন উপায়ে সেটা যোগাড় ক'রে নেবে বিনু।

এক্ষেত্রে একমাত্র যা উপায়—টিউশ্যনীই খুঁজতে হয়।

কিন্তু কে খোঁজ দেবে? ওর এই একান্ত বকাটে ছেলেদের মতো লেখাপড়ায় ইতি দেওয়া আর বাড়ি থেকে পালানো—এর অগৌরব সম্বন্ধে সে রীতিমতোই অবহিত ছিল। ফিরে এসে তাই পুরনো বন্ধুদের এড়িয়েই চলে। বাজারে বা স্টেশনের পথে দেখা হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে প্রথম দুচার দিন আড়ালে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছে—এখন, একেবারে এড়িয়ে চলা অসম্ভব বুঝে—চোখোচোখি হলে একটু মুচকি হেসে দ্রুত নিজের কাজে চলে গেছে।

একমাত্র যে বন্ধু ত্যাগ করে নি, আর যাকে ত্যাগ করা যায় নি—সে হল দোলু। দোলুই নিয়মিত আসে, পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিঃসংকোচে আড্ডা দেয়—যতটা সম্ভব। বিনু যে ওকে ঘরে বসাতে পারে না তার জন্যেও ওর কোন অভিমান নেই। এবাড়িতে বিনুর বন্ধুদের এনে আড্ডা দেওয়া সম্বন্ধে আগের মতো মার অসন্তোষের ভয় অত না থাকলেও সংকোচের কারণ থেকেই গেছে। বন্ধুরা বাড়িতে এলে তাদের চা না হোক, জল খাবার খাওয়ানো উচিত। না খাওয়ানো লজ্জা শুধু নয় অপমানের কথা। কিন্তু সে ব্যবস্থা এবাড়িতে কে করবে? এখন বাসন মাজার একটা ঝি পর্যন্ত নেই। তাছাড়াও ওর যে সব তথাকথিত বন্ধু—তার মধ্যে ললিত আর সুনীল ছাড়া প্রায় সবাইকারই কথাবার্তা অনেকটা বল্গাহীন। এখানে গায়ে গায়ে ঘর, সেসব ভাষা মার কানে উঠলে তিনি অনর্থ করবেন, হয়ত ওদের সামনেই কটু কথা বলবেন।

টিউশ্যনীর খোঁজ বন্ধু পরম্পরাতেই বেশী আসত তখন। কিন্তু দোলু

এসব খোঁজ দিতে পারে না। সে নিজে ইস্কুলের গণ্ডী পেরোতে পারে নি—একরকম বেকারই বসে আছে এখন। হয়ত—বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে যে একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইস্কুল হয়েছে—সেখানে ভর্তি হয়ে কিছু শিখবে। ওর বাবার অবস্থা ভাল, বড় চাকরি করেন, এখনই রোজগারের চিন্তায় দরকার নেই।

এদের দ্বারা না হলেও শেষ পর্যন্ত মাসখানেক পরে টিউশানীর একটা খবর পাওয়া গেল। সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রকে পড়াতে হবে, বারো টাকা মাইনে। অন্য কোন ম্যাট্রিক পাস ছেলে হলে ভয় পেত—অত ওপরের ক্লাসের ছেলে পড়াতে—সে ভয়টা বিনুর ছিল না। যে সন্ধান দিল, সেও ছাত্রের বাপকে সেই আশ্বাসই দিয়েছে—একটা পাস হলে কি হয়, যাকে দিচ্ছি সে বিদ্যের পিপে একটি।'

সন্ধান দিল—যার সঙ্গে একেবারেই সরস্বতীর সম্পর্ক নেই—সে-ই। অর্থাৎ কেষ্ট।

এই কেষ্ট আর অজিতকে ওর সংকোচ করা বা এড়িয়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই। করা উচিতও নয়। সেই নিঃস্ব নিঃসহায় অবস্থায় পথে-বেরোনোর দিন ওরা যা করেছিল তার ঋণ শোধ হবার নয়। অজিতের কাছ থেকেই ওর টিউশ্যনী পাবার কথা—কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই, পাড়াঘরে যার অবাধ যাতায়াত, সম্ভ্রান্ত ঘরের অন্তঃপুর পর্যন্ত যার কাছে অবারিত—সেই অজিত একেবারে যেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। বাড়ি ছেড়ে কোথাও আর বেরোয় না বড় একটা, বেরোলেও ছোটখাটো কিছু ব্যবসা করার চেষ্টায় যেটুকু বেরোনো দরকার সেইটুকু যা বাড়ির বাইরে যায়—যেমন পুকুর জমা নিয়ে মাছের চারা ফেলা, বাগান জমা নেওয়া—এই রকম, যাতে ভদ্রলোক আর পরিচিতদের সঙ্গে দেখা না হলেও চলে।

এই ক'মাসেই অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে অজিতের। সেই অপরিমাণ আত্মবিশ্বাসী ও যৌবন বিলাসী বেপরোয়া অজিতকে আজ আর চেনা যায় না। কেমন যেন 'থুম'-মেরে গেছে। দেখা হলে ক্লিষ্ট হাসি হাসে। চাকরির কথা ওর মা দুচার জনকে বলেছেন বটে কিন্তু ও কারও বাড়ি যেতে চায় না, চাকরি হবে কেমন ক'রে!

এর কারণটা দোলুর মুখে শুনেছিল আগেই। একটি ওর-উচ্ছিষ্ট-করা মেয়ের আত্মহত্যা থেকেই নাকি এই পরিবর্তন, কিন্তু পুরোটা শুনল কেষ্টর মুখ থেকে। বিশ্বাস হয় না, তবে কেষ্ট সাধারণত মিথ্যে বলে না। এই জন্যেই কেমন একটু ধোঁকা লাগে। ঐ পরমাসুন্দরী মেয়েটিকে অবাধে ভোগ করার জন্যেই মেয়েটির এক বছরের ছোট ভাইটিকেও দলে টেনে ছিল। ঠিক সে সময়ে মেয়েটা বাধা দিতে পারে নি—কেন পারে নি তা সে নিজেও বোধহয় জানে না, কেলেঙ্কারীর ভয়, কৌতূহল, অভাবনীয়ের বিস্ময়—সবটা জড়িয়েই বোধহয়—কিন্তু গ্লানি একটা ছিলই, সেটা দিন দিন বাড়ছিলও। সে গ্লানি পরবর্তীকালে ওর সে ভাইয়ের মধ্যেও লক্ষ্য করেছে অনেকে। সে ভাল লেখাপড়া শিখে বড় সরকারী চাকরিতে ঢুকলেও কেমন যেন নিজেই নিজেকে

একঘরে ক'রে রেখেছিল, বিয়ে-থাও করে নি।

মেয়েটার আরও বেশী আঘাত লেগে থাকবে। সুপুরুষ, ভদ্র, বিদ্বান, উচ্চবংশীয় স্বামীর পূজা-করার মতো ভালবাসা মুক্ত মনে নিতে না পারার জন্যই—অপরাধ-বোধের প্রাচীর কিছুতেই ভাঙ্গতে না পেরেই বোধহয়—প্রাণটা দিল। বোধহয় ভাবল এই অপবিত্র দেহটা দিয়ে এমন একটা মানুষের নির্মল ঐকান্তিক প্রেমকে প্রবঞ্চিত করার অধিকার তার নেই।

কে জানে; হয়ত নিজের প্রাণ দিয়ে আরও অনেক মেয়েকে রক্ষা ক'রে গেল সে—ঐ যোনিকীট পশুটার বল্‌গাহীন সম্ভোগেচ্ছা পূরণের প্রচেষ্টা বন্ধ ক'রে দিয়ে। কেষ্টর কথা যদি সত্য হয়, ঐ আঘাতেই অজিত এমন জড়ভরত হয়ে গেছে।

কেষ্টও সুখে নেই। যে পরিবারে সে নিত্য অতিথি তাদের অর্থ-কষ্ট চরমে পেঁাচেছে। কেষ্টরও এমন কোন আয় নেই যে মাসে অন্তত কুড়িটা টাকাও তাদের দিতে পারে। যে মেয়েটার নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্ত সেবা ওকে ওখানে বেঁধে রেখেছিল, সেই মেয়েটাকেই এক বাড়িতে রান্নার কাজে লাগাতে হয়েছে। শুধু রান্নাই নয়, বর্তমান কালের ধরণ অনুযায়ী তাকে 'কমবাইন্ড হ্যান্ড' বলেন তাঁরা—অর্থাৎ ঘর মোছা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা সব কাজই করতে হয়। আর তাতেও পরিত্রাণ পায় না, কালো সাধারণ চেহারার মেয়ে হলেও স্বাস্থ্য ভাল—ফলে, প্রায়ই নির্জন অবসরে বাড়ির বড় ছেলেটির তুষ্টি বিধান করতে হয়। প্রথমে মেয়ের বাড়ির সবাই ক্ষেপে উঠেছিল কিন্তু সে ছোকরা এর মধ্যে মাঝে মাঝে দু-পাঁচ টাকা বাড়তি দেয়, একবার দশ টাকা দিয়ে একখানা ভাল কাপড়ও কিনে দিয়েছে, মাইনেও ভাল দেন কর্তা। কোনপ্রকার-উপার্জন-হীন পরিবারে আত্মসম্মান জ্ঞান বিলাস মাত্র।

কেষ্টর এর জন্যে ক্ষোভের অন্ত নেই। নিজের অসামর্থ্যে তার চোখে জল এসে যায়। সে বলে, 'এবার আমি কাটব ভাই। মার কষ্টও আর দেখা যায় না। মা আমার জন্যেই পথের ভিখিরি বলতে গেলে, ভদ্রভাবে ঝি-গিরি করতে হচ্ছে। এখনও যদি কিছু রোজগারের চেষ্টা না দেখি, তাহলে এরপর গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া পথ থাকবে না।'

'কোথায় যাবে?' বিনু জিজ্ঞাসা করে, 'কি করবে সে সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ?'

'কোথায় যাবো এখনও ঠিক করি নি। ভেবেছি পশ্চিমের দিকে কোন শহরে চলে যাবো। কাশী ছাড়া কোন শহরে। কাশীতে বেস্তর চেনা লোক। আত্মীয়-স্বজনই একগাদা। পাটনা যেতে পারতুম—কিন্তু বিহারে পয়সা নেই, সবাই বলে। তাই ঠিক করেছি বিনি টিকিটে যাবো, কাশী পেরিয়ে যেখেনে নামিয়ে দেয় সেখেনেই নেমে পড়ব। পৈরাগ, লখনৌ, দিল্লী যেখেনে হোক। কি করব? জানার মধ্যে তো জানি এই একটু ধেই-ধেই করতে নাচ, কোন-মতে মেয়েলি গলায় একটু গাইতেও পারি। কাকার দৌলতে দুচার ঘা বেত খেয়ে যেটুকু হয়েছে। যদি পারি ঐ দিকটা বজায় রেখে কিছু রোজগার করতে, সেই চেষ্টা আগে দেখব—না হলে যা পাই তাই করব। চানাচুর বিক্রী,

কিম্বা মুটে গিরি, শেষমেষ কারও বাড়ি রান্নার কাজ। মাংসটা ভালই রাঁধি, কোন চায়ের দোকানেও কাজ জুটতে পারে। যেখেনে কেউ চেনে না, সেখেনে তো আর লজ্জা পাবার কিছু নেই। মোদ্দা কথা দু'বছরের মধ্যে, মানে মার শরীরটা একেবারে ভেঙ্গে পড়ার আগে এসে ওকে নিয়ে যেতে হবে। তা নইলে এই সত্যি বলছি, সে ক্ষেত্তেরে গঙ্গায় গিয়ে ডুবব। ছেলে হয়ে মার ঢের ক্ষোয়ার করেছি—শেষ বয়েসে যদি ছেলের রোজগারে বসিয়ে না খাওয়াতে পারি তাহলে আমার না-বাঁচাই ভাল, তাই না ? বল!'

কেষ্ট সত্যিই এই কথার মাস-ছয়েক পরে একদিন উধাও হয়ে গেল। বিনু ওর সেই 'বন্ধু পরিবারে' নিজেই গিয়ে খবর নিয়েছিল একদিন, তাঁরাও ওর কাছে কোন সংকোচ করেন নি। যাবার সময় মনিব বাড়ি থেকে পাওয়া একটা নতুন গামছা আর পুরনো ধুতি একখানা ঐ মেয়েটাই দিয়েছিল। বাড়ি থেকে কিছুই নিতে পারে নি, প্রথম তো নেবার মতো কিছু ছিল না, দ্বিতীয় মার টের পাবার ভয়! অপর কারও বাড়ি থেকে চেয়ে-চিন্তে কিছু নিতে গেলেও মা টের পেয়ে যাবে।

ঐটুকু সম্বল ক'রেই অজানা ভবিষ্যতে ঝাঁপ দিয়েছিল সে। হয়ত বিনু দুচারটে টাকা দিতে পারত—কেষ্টরই দৌলতে পাওয়া টিউশ্যনীর টাকা থেকে—কিন্তু পাছে বাধা দেয়, সেই ভয়ে হয়ত চায় নি।

কোথায় গেছে, কি করছে কিছুই জানা যায় নি। কে ই বা আছে পয়সা খরচ ক'রে কি উদ্যোগ ক'রে খবর করবে। মার নামে প্রায়-অবোধ্য হাতের লেখায় একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল অবশ্য, তবে তাতে তিনি শান্ত হতে পারেন নি, বিনু গিয়ে তার মনোভাব ও প্রতিজ্ঞার কথা জানাতে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

এর দু'বছরের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে নি অবশ্য, তবে বার-দুই গোটা পঞ্চাশ ক'রে টাকা পাঠিয়েছিল মাকে। মনি অর্ডারে নয়, লোক মারফৎ। এমন লোক এসেছিল দিতে, সে কেষ্টর নামটা মাত্র জানে—কী করে কোথায় থাকে কিছুই জানে না। মানে তারা তাদের কোন বন্ধু মারফৎ এই টাকা আর ঠিকানা পেয়েছে। পাছে তার খোঁজ পায় আর কেউ খোঁজ করে—বোধহয় সেই জন্যেই এত সতর্কতা।

খবর প্রথম পেয়েছিল বিনুই। তার সঙ্গেই প্রথম দেখা হয়েছিল।

সে কেষ্টর আকস্মিক অন্তর্ধানের বছর তিনেক পরের কথা।

বিনু আর ললিত গেছে যুক্ত প্রদেশে—যেটায় পরবর্তীকালে নাম হয়েছে উত্তর প্রদেশ—কিছু উপার্জনের চেষ্টায়। পাঠ্য পুস্তকের ক্যানভাসিং, তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া কাজ। অর্থাৎ তারই যাওয়ার কথা, মে মাসে ওদিকে যেতে সাহস হয় নি বলে কাজটা ওদের দিয়েছিল। একজনেরই করবার কথা, ললিতের সান্নিধ্য-লালায়িত বিনু ওকে সঙ্গে নিয়েছিল এক রকম জোর ক'রেই। বলেছিল, 'রোজগার না-ই বা হোল, দেশ ভ্রমণটা তো হোক।'

কাশী এলাহাবাদ মির্জাপুর হয়ে ওরা লক্ষ্ণৌতে পৌঁছেছিল। সকালে

দুটো স্কুল সেরে বেলা দশটা নাগাদ প্রখর রোদে ওরা আমিনাবাদের রাস্তায় ঘুরছে—হঠাৎ চোখে পড়ল, কে একটি লোক একটা সিনেমা হাউসের দু'চাকার বিজ্ঞাপনের গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এ গাড়ি এখনও চলে মফঃস্বলে, কলকাতাতে আগে চলত খুব, এখনও একেবারে অদৃশ্য হয় নি। দুটো তাসে ওপর দিকে মুখোমুখি ঠেকিয়ে যেমন বাড়ি করার চেষ্টা করে ছেলেরা, তেমনি ভাবে প্রকাণ্ড দুটো ফ্রেমে আঁটা ক্যাম্বিসের পর্দায় ছাপা ছবি সেঁটে কিম্বা হাতে এঁকে চলতি কি আগামী ছবির বিজ্ঞাপন করা হয়।—এ দুটো ফ্রেম-এর নিচে দুটো চাকা লাগানো আছে, একদিকে হ্যাণ্ডেলের মতো, একটা লোক ঠেলে নিয়ে যায়।

আগে এটাই দৈনিক বিজ্ঞাপনের বড় উপায় ছিল, তখন খবরের কাগজে সিনেমার বিজ্ঞাপন খুব একটা কেউ দিত না। কলকাতাতেও তাই। লাগসই ছবি, অর্থাৎ যা অল্প-শিক্ষিত মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে, তারই বিজ্ঞাপন বেশী করা হত। অনেক সময় ছাপা ছবিটা প্রযোজকরাই দিতেন, কাগজে ছাপা পোষ্টার, সেগুলো সেঁটে কোন হল্-এ হচ্ছে সেটা এক কোণে হাতে লিখে জানানো হ'ত। ইংরিজী ছবির হিন্দী পরিচয়ও দেওয়া হ'ত আলাদা কাগজে—সিরিয়াল বা ক্রমশঃ প্রকাশ্য ছবির বিশেষ ক'রে—মানে লম্বা চব্বিশ রীল কি ত্রিশ রীলের ছবি, তিন সপ্তাহে ভাগ করে দেখানো হ'ত। ভাল ছবিও যে এমন একেবারে আসত না তা নয়—বিখ্যাত 'লা মিজরাব্ল' বইয়ের ফরাসী ছবি এমনি দু সপ্তাহে দেখানো হয়েছে, বিনুই দেখেছে। এর মধ্যে মারামারি লাফালাফি বোম্বেটে ডাকাতদের ছবিই বেশী জনপ্রিয়, এগুলোর হিন্দী পরিচয় দেওয়া দরকার। "এডি পোলো কি ধরতি কাম" (চোর পুলিশ খেলার ব্যাপার কতকটা) "পার্ল হোয়াইট কি ঘোড়ে কি কাম" এমনি বর্ণনায় লোভ দেখানো হ'ত দর্শকদের।

এই গাড়িটায় কি একটা ইংরেজী ছবির পোষ্টার মারা ছিল দুদিকেই, তার সঙ্গে হাতে আঁকা এক ছবি—এক তথাকথিত সুন্দরী নারীর নৃত্যরতা মূর্তি, ছবিটা অবশ্য আঁকার গুণে দাঁড়িয়েছে এক বীভৎস ডাইনী গোছের—তার নিচে বড় বড় হরফে ছাপা 'এতৎসহ স্টেজের উপর ঢানসার মাষ্টার মৈত্তিরের আরতি নৃত্য দেখানো হবে—প্রতিবার ইণ্টারভ্যালে, আধ ঘণ্টা করে।'

অন্য পদবী হলে যেমন অন্যমনস্ক ভাবে কথা কইতে কইতে যাচ্ছিল তেমনি এগিয়ে চলে যেত—কিন্তু পদবীটা চোখে পড়তে দুজনেই থেমে গেল। এ নিতান্তই বাঙ্গালীর পদবী—আর ওদের যেন বিশেষ পরিচিত।

সচেতন হতে এক মুহূর্তের বেশি সময় লাগে নি, আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই চোখ গিয়ে পড়ল যে লোকটি গাড়ি ঠেলছে তার ওপর। গাড়ি ঠেলছে কিন্তু তার সঙ্গেই আশ্চর্য কৌশলে দুদিকে ইংরেজী হিন্দীতে ছাপা হ্যাণ্ডবিল বিলোচ্ছে।

এ মূর্তি ভুল হবার নয়। কুচকুচে কালো রঙ—এদেশের লোক সাধারণত এত কালো হয় না—প্রায় মেয়েদের মতো বড় বড় চুল পিঠ ছেয়ে এলিয়ে আছে, তেমনিই মধ্যে সিঁথি, মুখে একটি জলন্ত বিড়ি, পরনে একটা গেঞ্জি আর

খাকি হ্যাফ প্যাণ্ট, গলগল ক'রে ঘামছে। এটা কেষ্টর বিশেষত্ব, শীতের দিনেও এমনি ঘামে ও।

চিনতে পেরেছে কেষ্টও, তবে কিছুমাত্র অপ্রতিভ বা কুণ্ঠিত নয় সেজন্যে, পাছে এরা ওর সমান পর্যায়ের লোক কেউ ভাবে, সেই সম্মানটা বাঁচাতেই, চেঁচিয়ে বলল, 'জরুর আইয়েগা বাবু সাহেব, খেল বহুৎ আচ্ছা হ্যায়, উসকে সাথ নাচ ভি হ্যায় উমদা। এহি কৃষ্ণা টকীজ মে, হিঁয়াসে নজদিগ, একদম বরাব্বর।'

তার পর গাড়িটা দাঁড় করিয়ে কাছে এসে গলা নামিয়ে বললে, 'একটু দাঁড়া, ঐ শ্রীরাম রোডের মোড়টায়। আমি আসছি।'

প্রায় মিনিট খানেকের মধ্যেই কোথা থেকে একটি এদেশী লোককে ধরে নিয়ে এল, তার হাতে হ্যাণ্ডবিলের গোছাটা ধরিয়ে দিতে দিতে বললো, 'তুম যাতে রহো —একদম হল মে আ জানা ওয়াপিস! আচ্ছা?'

তারপর খুব সহজভাবেই ওদের বলল, 'আয় আমার সঙ্গে—আমার আস্তানায়।' যেন ওদের আসারই কথা, আশা করছিল এতক্ষণ, ওরা পূর্ব বন্দোবস্ত মতোই যথাসময়ে এসে পড়েছে।

বিনু বললে, 'তা গাড়ি?'

কেষ্ট বললে, 'ঐ যে, ওকে দিয়ে দিলুম। মালিকের কাজচলা চাই, কে চালাচ্ছে সেটা তো বড় কথা নয়। ও একটা কলে কাজ করে, আজ ওর ছুটি, সুবিধে হয়ে গেল। মধ্যে মধ্যে ওকে বিনি পয়সায় সিনেমা দেখাই, ও আমায় অনেক বেগার দিয়ে দেয় এমনি। তা ছাড়াও, ওকে সামনে দেখলুম তাই, নইলে আমার লোকের অভাব হ'ত না। আশপাশে এই কাজ করে এমন ছোকরা বহুৎ আছে, এই তো পট্টি, আমিনাবাদ—আমরা সকলেই একে অপরের কাজ করে দিই দরকার হ'লে—দোস্তির ইজ্জৎ রাখি। এরা বলে কামরাদারি—কী বুঝি ইংরেজী কথা আছে একটা—কমরেডারি না কি—তাই থেকে নিয়েছে।'

কাছেই ওর কৃষ্ণা টকীজ। বড় সিনেমা হ'ল তবে এখনও বাইরের কাজ পুরো হয় নি—'ফিনিশ' যাকে বলে। হল বড়, স্টেজও প্রকাণ্ড, সিনেমা না হয়ে থিয়েটারও হ'তে পারত।

কেষ্ট এক রকম ওদের টানতে টানতে নিয়ে গেল। কাঁচা ইঁট খোয়া ছড়ানো জমি দিয়ে একদম পিছনের দিকে নিয়ে গিয়ে খিড়কির দোর দিয়ে ঢুকল। স্টেজের সামনের দিকে ছবির পর্দা ফেলা। পিছনে অনেকটা জায়গা। তারই এক পাশে একটা পাট করা তেরপল, সেটাই নাকি ওর বিছানা, পাশে একটা টিনের সুটকেস। পেছনের দেওয়ালে একটা দড়ি টানা আলনা, তাতে একটা লুঙ্গি, একটা জাঙ্গিয়া আর একটা গেঞ্জি। তেরপলের ওপর হয়ত একটা কিছু বিছিয়ে শোয়, সম্ভবত হয়ত এই স্যুটকেসটাই মাথায় দেয়।

কেষ্ট বেশ যেন উৎফুল্ল মুখেই বলল, 'এস্টেটপত্তর বলতে এই যা। কাপড় জামা বিশেষ নেই, একটা পাজামা আর পাঞ্জাবী, ভদ্দরলোক সাজতে হলে সে দুটো পরি, না হলে এই যা দেখছিস। রঙ, পরচুল, আর টুকিটাকি মেকাপের জিনিস। আমার ধুনুচি নৃত্য আর আরতি নৃত্য ফেমাস, পেরায় রোজই

নাচতে হয়—তার ব্যবস্থা হাতের কাছে না রাখলে চলবে কেন। এ ধুনুচি, পঞ্চ প্রদীপ—আমার কেনা, যদি এদের সঙ্গে না বনে, অন্য কোথাও গেলে অসুবিধে হবে না।'

সে ওদের সেই তেরপলের ওপর বসিয়েই ছুটে চলে গেল বাইরে। দারোয়ান একজন আছে, তার সঙ্গে বোধহয় খুব ভাব, তাকে যাবার সময় বলে গেল, 'হামারা রিসতেদার, মুলুক সে আয়া!'

দারোয়ান তাড়াতাড়ি নিজের ঘর থেকে একটা চারপাই এনে পেতে দিল ওদের বসবার জন্যে, একটা তালপাতার ঘুরনো পাখাও। সত্যিই বিনুদের খুব কষ্ট হচ্ছিল, ওদিকে পর্দা ফেলা এদিকে নিরেট দেওয়াল—যা ঐ দরজাটা খোলা আর গোটা কতক ঘুলঘুলি।

দারোয়ান অতঃপর প্রশ্ন করল, 'পানি পিজিয়ে গা?' আর প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই দুটো বিড়ি আর দেশলাই বার ক'রে সসম্ভ্রমে ডান হাতের কুনুইয়ে বাঁ হাত ঠেকিয়ে বাড়িয়ে ধরল।

একটু পরেই ফিরল কেষ্ট। সে দোকানেরই একটি বাচ্ছা চাকরের হাতে দুটো বড় পুরুয়া করে লস্যি বা ঘোলের শরবৎ আর নিজে কতকগুলো ঠোঙ্গায় কচুরি অমৃতি নিয়ে এসেছে।

বিনু ললিত দুজনেই বিস্তর প্রতিবাদ করল, কেষ্ট কোন কথাই শুনল না, বলল, 'না হয় দুপুর বেলা আর খাওয়া হবে না। এই তো! তা না-ই বা খেলি। খাওয়া তো ঐ যা বললি, ভাতে-ভাত নয় তো আলু-ভাতে খিচুড়ি—আর ওর বেশী হবেই বা কি, ধরমশালার [illegible] ঘরে নিজেরা রেঁধে খাওয়া। তাও এত বেলায় গিয়ে এই গরমে আবার রাঁধতে বসা—আমি নিজেও ঐ কম্ম করি তো, জানি কত কষ্ট। আর ঐ মুন্নেলাল ধরমশালা। নমস্কার। শালার এত নোংরা। আসলে পুরনো তো, বহুৎ যাত্রী আসে—আর সেই পাইখানার ধারে রান্না ঘর। আমি ওখেনে কাটিয়েছি তো অনেক দিন, সব জানি। আর একটা ধরমশালা আছে কাছেই, বেশ পরিষ্কার, মাঝে অনেকটা বাগান, দিব্যি জায়গা, ওখানে চলে যাস বরং।'

নিজের কথাও কিছু বলল বৈ কি।

এই বিজ্ঞাপনের গাড়ি ঠেলা, হ্যান্ডবিল বিলোনো আর নাচ—সব মিলিয়ে এক টাকা রোজ। তিনটে শো, সব শোতেই মধ্যে আধ ঘণ্টা নাচ। ছুটি নেই। তবে মালিক খুশী হয়ে মাঝে মাঝে বাড়তি দু-এক টাকা দেন বকশিস। কোন কোন দিন মালেকান পরোটা আর খাবার পাঠিয়ে দেন, রাত্রের খাবার। নইলে ঐ টাকাতেই খাওয়া পরা সব।

অবিশ্যি সব আর কি। কেষ্ট বুঝিয়ে দেয়, 'গেঞ্জি গায়েই দিন কেটে যায়! জামা একটা আছে, ভাল পাঞ্জাবী, কোন ভদ্দর লোকের বাড়ি যেতে হলে সেটাই গায়ে গলিয়ে যাই। মুশকিল হয়েছে দুটো, বুঝলি, সময় আর পোশাক। কোন ভাল রইস লোকের বাড়ি যে নাচের টিউশানী খুঁজতে যাবো—সে উপায় নেই। বিকেলের দিকে কি সন্ধ্যের দিকে যাবো—সে তো এখানে বাঁধা। বেলা তিনটে থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত, কোথাও নড়বার উপায় নেই। সকালে

যাবো—ঐ এক গাড়ি ঠেলা আছে। কী করব খেতে পাচ্ছিলুম না, ওপোস করে দিন কাটছেল, সেই অবস্থায় এরা কাজ দিয়েছে—বেইমানি করতে পারি না।···তাছাড়া একটা কাজ না পেয়েই বা ছাড়ি কি ক'রে। এর মধ্যে যে ভাল জামা বা পোশাক করতে পারতুম না তা নয়—কিন্তু মাকে কটা টাকা না পাঠিয়ে নিজের কাপড় জামায় খরচা করব সে আমার মন সরে না। এই তাই মাকে আনতে পারছি না—মা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে জানি তো—ভাবলে নিজের মুখে ভাত ওঠে না, মাইরি বলছি।'

ললিত বলে 'তা এতো সস্তা-গণ্ডার দেশ—মাকে এনে রাখলেই পারিস। তিরিশ টাকায় কত লোক ওখানেই সংসার চালাচ্ছে।

কেষ্ট বলে, 'সস্তাগণ্ডা তো বুঝি তবু খরচও তো রকমারি। দ্যাখ এই রেঁধে খাই, তাও দারোয়ানের সঙ্গে ভাগে। কাঠ কয়লার খরচটা আধাআধি পড়ে, ও একদিন রাঁধে আমি একদিন রাঁধি—তবু দোনো বখৎ চুলহা তো জ্বালতে হয়। মাস গেলে দশটা টাকা বেওজর চলে যায়। এছাড়া চা আছে, জলখাবার আছে, বিড়ি আছে এক বাণ্ডিল রোজ, তিন পয়সার কম হয় না—এত খাটুনী তিভুবন ঘোরা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে, দৈনিক দেড় ঘণ্টা নাচ ধেই ধেই ক'রে—পেটে না খেলে চলবে কেন? পোশাকের বালাই নেই সত্যি কথা, গেঞ্জি প্যাণ্ট তাও তো কিনতে হয়। মাথার তেল, চিরুনী, জুতো—নেই কি। একটু সাবান লাগে, মেকাপ তোলা তার নারকোল তেল চাই—হরেক হরেক খরচা। টাকা তো টানলে বাড়ে না। বল।···তবে আমিও দমবার পাত্তর নই, যা হয় একটা উপায় করবই, দেখে রাখিস। এক কাপড়ে বেরিয়ে বিদেশ-বিভুঁই এসেও যখন না খেয়ে মরিনি, তখন মাকেও মরতে দোব না দেখিস।'

তা দেখেছিল বিনু—সত্যিই।

এর মাস ছয়েক পরেই নাকি একবার একদিনের জন্যে এসে মাকে নিয়ে গিছল। কোথায় তা কেউ বলতে পারল না, কাউকেই নাকি বলে নি। বিনু তখন এখানে ছিল না, হয়ত ওকে বলত।

বিনুদের সঙ্গে দেখা ওর বছর দুই পরে। এলাহাবাদের রাস্তায়। গাড়ি ঠেলা আর নেই, তবে সিনেমার নাচটা আছে এখানেও। বাড়তি দুটো টিউশানী করে নাচ শেখাবার। একটা বৈরানায়, একটা কাটরায়। মোট আঠারো টাকা পায়। হেঁটে যাতায়াত, তবে তাতেই চলে যায় ওর। হিউয়েট রোডে একটা বাড়ির দোতলায় একটা ঘর ভাড়া ক'রে মাকে রেখেছে, মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়া। ভদ্র পাড়ায় ভদ্র পরিবারে মাকে রাখতে পেরেছে তাতেই সবচেয়ে তৃপ্ত ওর।

ওদের একদিন রাত্রে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েও ছিলেন ওর মা। জিরো রোডে এক সিনেমায় কাজ ওর, এখানে রাত নটার শোতে নাচ নেই, তবে কোন কোন ছুটির দিন দুপুরে বাড়তি শো থাকলে নাচতে হয়। মাইনে ঐ ত্রিশ টাকাই। 'এক রকম ক'রে চলে যাচ্ছে ভাই', কেষ্ট বলল।

তখন অবশ্য চলে যেত। ভালভাবেই চলত দুটো প্রাণীর।

এরপর যুদ্ধ বাধতে কেষ্টর একটা—ওর ভাষায়—'মোকা মিল গিয়া'। তখন

যুদ্ধ-ক্ষেত্রের যারা সামনের দিকে মানে 'ফ্রণ্টে' থাকত—সেই প্রায়-মৃত্যু প্রতীক্ষারত সৈনিকদের মনের অবসাদ ও দুশ্চিন্তা দূর করতে কিছু কিছু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মার্কিন মুলুক থেকে ফ্র্যাঙ্ক সিন্তারা, ড্যানি কে, বব হোপ—আরও অনেক স্ত্রী-পুরুষ নামকরা শিল্পী দূর প্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে এসে নাচগান ক'রে গেছেন, অনেকে মিশরে এমন কি ভারতেও এসেছেন।

শোনা যায় এক বিখ্যাত সুন্দরী অভিনেত্রী বোম্বের হাসপাতালে আহত সৈনিকদের আনন্দ ও সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেন—দেখতে ও দেখা দিতে—একটি আহত সৈনিক বলে ফেলেছিল, 'তুমি আমার জীবনের স্বপ্ন, তোমার সঙ্গে একটা রাত কাটাতে পারলে আর মৃত্যুতে কোন দুঃখ থাকত না।'

সে বিখ্যাত অভিনেত্রীটি তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে একরাত্রি এক শয্যায় কাটাতে সম্মত হয়েছিলেন—হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদন করেন নি!

কেষ্টও কী কৌশলে—এলাহাবাদের অনেকেই ওকে স্নেহ করতেন, সেই প্রভাবেই—এই একটি মনোরঞ্জন দলে ঢুকে পড়েছিল। বর্মা সীমান্তে অনেকদিন ঘুরেছে—মণিপুর কোহিমা—এমন কি নেপাল পর্যন্ত। টাকা ও রকমারি শৌখিন জিনিস বিস্তর এনেছিল আসার সময়। এলাহাবাদের পথে কলকাতায় নেমেছিল কদিনের জন্যে, যে সব আত্মীয়রা ওকে ঘেন্নার চোখে দেখেছে এককালে কথাও কয় নি—তারাই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনতে ও নানাবিধ জিনিস—তখনই এদেশে অপ্রাপ্য হয়ে উঠেছে সেসব জিনিস—উপহার পেতে যথেষ্ট আত্মীয়তা প্রকাশ করেছিল।

এর পর, কবে বা কিভাবে তা বিনুরা জানে না, কেষ্ট এলাহাবাদ থেকে তার 'হেড কোয়ার্টার' গোরখপুরে নিয়ে যায়। বোধ হয় ওখানকার লোক ওর ছবির ফাঁকে ফাঁকে ফাউ হিসেবে নাচার কথা ভুলতে পারে নি—সেই কারণেই তার নাচ শেখাবার মতো কতটা শিক্ষা আছে সে তথ্যটাকে সন্দেহের চোখে দেখত বলেই চলে গেল এখান থেকে এমন জায়গায় যেখানে ওর এই ইতিহাস পৌঁছয়নি, যুদ্ধ প্রান্তের 'সার্টিফিকেট' দেখিয়েই প্রতিষ্ঠা পেতে পারবে।

গোরখপুরে ওসব কাজ করে নি। সোজাসুজি টিউশ্যনীই ধরে ছিল। তাতে বেশ চলেও যেত। শেষ জীবন ওর মার সুখেই কেটে ছিল। তবে কিছু অশান্তি নিয়েই মরতে হয়েছে তাঁকে—কারণ ছেলে বিয়ে করল না, হয়ত আর করবেও না।

বিনু একবার মাত্র কেষ্ট থাকতে গোরখপুর গিয়েছিল। দেখল ওর স্বভাবে এখন অনেকটা স্থৈর্য ও বিবেচনা এসেছে। মেয়েদের নাচ শেখায়—অধিকাংশই অল্প বয়সী এবং কুমারী, সুন্দরীও দু-একটি অবশ্যই থাকবে তার মধ্যে, কিন্তু কোনদিন তার কোন বেচাল দেখে নি কেউ, দু-একজন স্থানীয় ডান্সিং মাষ্টার যে অপদস্থ করার চেষ্টা করে নি তাও নয়—কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ দিতে পারে নি। সেই জন্যেই তার চাহিদা ক্রমশ বেড়েছে, টিউশ্যনীর অভাব হয় না, বরং এক এক সময় নতুন ছাত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হয়।

অথচ, বয়স হওয়া সত্ত্বেও—তখন পঞ্চাশের কাছে পৌঁছে গেছে—স্বাস্থ্য ভাল ছিল, বরং তখন তাকে আরও ভাল দেখাত। হাতের পেশী আর বুক

ছোটবেলা থেকেই সুগঠিত বিনা ব্যায়ামেই, এখন এই দৈনিক নাচের ফলে শরীরের অন্য অংশও ভাল হয়েছে, সে কারণে বেশ ভাল দেখায়, রং কালো হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে আকর্ষণের কারণ ছিল যথেষ্ট।

বিনু যখন গেছে খোদ পুলিশ সুপারের মেয়েকে নাচ শেখাচ্ছে সে, ষোল বছরের মেয়ে। দেখতেও ভাল—সে কেষ্টর প্রেমে প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। কেষ্ট তার গোছা গোছা চিঠি বার ক'রে দেখিয়েছে বিনুকে। প্রত্যহই একটা ক'রে চিঠি দিত, একদিন নাকি গভীর রাত্রে ওর বাসাতে এসে হাজির হয়েছিল।

কেষ্ট বলে, 'ভাই, এ কি জ্বালা হল বল্ তো। নিজের যে লোভ নেই তা তো নয় কিন্তু সাক্ষাৎ পুলিশের বড় সাহেব—যদি কোনদিন এক বুঁদ সোবে এসে যায় তো রাতারাতি গুম ক'রে দেবে, কেউ জানতে পর্যন্ত পারবে না এ নামের কোন লোক কোথাও ছেল কিনা।'

বিনু বলে, 'তা কাজ ছেড়ে দাও না।'

'সে চেষ্টা কি করি নি ভাবছিস। তাতেও সাহেব ভাববে যে তনখা বাড়াবার জন্যেই এই সব বাহানা করছি। সেটা সে অপমান বলে মনে করবে। অথচ কী করব তাও ভেবে পাইনে। মা কালী কি কিরা, এখন মেয়েটার কাছে গেলে আমার হাত-পা কাঁপে, বুকের মধ্যে যে কি হয় কি বলব। আমি তো ভীষণ ঘামি জানিস, ওর কাছে গেলে আরও কুল কুল ক'রে পাসিনা ঝরতে থাকে—আর ছুঁড়ি সেই বাহানায় কাছে এসে ঘাম মুছিয়ে দেবার ভান করে গায়ে গা ঘষে। হপ্তায় দুদিন যাই, দুদিনই ফিরে এসে শুয়ে থাকতে হয় দু-তিন ঘণ্টা, শরীর এত বেএক্তার লাগে।'

এই প্রসঙ্গে কেষ্ট একদিন বড় মজার কথা বলেছিল, 'অল্পবয়িসী মেয়েদের শরীর থেকে একটা হিট বেরোয়—গরম ভাপরা একটা—তুই হাসছিস, দেখিস—মুমূর্ষু রুগীর পাশে বসিয়ে দে, তার গা গরম হয়ে উঠবে। শীতকালে কাছে বসলে দেখবি গা থেকে পাসিনা ছুটবে দরিয়ার মতো। হ্যাঁ রে, সাচ।'

যাই হোক কেষ্ট সম্মান রেখেই গেছে। বেশী দিন বাঁচে নি, মার মৃত্যুর দু-তিন বছর পরেই মারা যায়—হয়ত অস্বাভাবিক কাম-প্রবৃত্তি অতিরিক্ত দমনের ফলেই—হার্ট য়্যাটাক হয়। শহরের বহু লোক—প্রাক্তন ছাত্রীদের অভিভাবকরা ছাড়াও—এসে সেবা করেছে, টাকা খরচ ক'রে চিকিৎসা করিয়েছে, রাত জেগে পাহারা দিয়েছে। মরার পর বড় খাটে ফুল দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে গেছে। এক কালের অগৌরবের জীবনের সগৌরব সমাপ্তি ঘটেছে।

কেষ্ট ইদানীং একটা কথা প্রায়ই বলত, 'তুলসী যব জগমে আয়ো, জগ হাসে তুম রোয়। য়্যায়সা করনা কর চলো ভাই তুম হাসে জগ রোয়।'

নিজের জীবনে সেই সার্থকতাই লাভ করেছে সে।

॥ ৪০ ॥

কেষ্ট যে টিউশ্যনী ওকে যোগাড় করে দিয়েছিল—তার মাইনে তখনকার দিনে ম্যাট্রিক পাশ ছেলের পক্ষে অনেক—বারো টাকা। তবে দায়িত্বও বেশী। সেকেন্ড ক্লাসের ছেলে, প্রায় এক বছর পরেই ম্যাট্রিকে বসবে—তার ওপর মাথায়

মাঠো। বয়সও হয়েছে ঢের, আঠারোর কম নয়, স্বাস্থ্য ভাল বলে আরও বেশী মনে হয়। তবে ভারী ঠাণ্ডা প্রকৃতির, দু-চার দিনের মধ্যেই বিনুর অনুগত হয়ে গেল।

এ ভদ্রলোকরা ক্রীশ্চান। এই এক পুরুষেই, মানে ইনিই ক্রীশ্চান হয়েছিলেন। অতি সুপুরুষ, সাহেবদের মতো ইংরেজী বলেন। কী একটা দুষ্কার্য ক'রে ফেলে আইনের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে ক্রীশ্চান হয়েছিলেন, তারপর চেহারার জোরে এক ধনী বিধবা মহিলাকে হাত ক'রে তার কৃষ্ণবর্ণ মেয়েটিকে বিবাহ করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেন।

টাকা নাকি তিনি পেয়েছিলেন অনেক, মদ ভাঙ্গ খেয়ে কি রেস খেলেও ওড়ান নি—তবে জুয়া খেলার মতোই হঠাৎ বড়লোক হবার কয়েকটা ব্যবসা ফাঁদতে গিয়ে সে সব টাকাই নষ্ট করেন। এখন একটা প্রাইমারী স্কুল করেছেন, তার জন্যে বড় বিলিতি অপিসে সাহেবদের কাছ থেকে চাঁদা তোলেন—তাতে ইস্কুল চলার দরকার হয় না, তাঁর সংসার বেশ সচ্ছলেই চলে যায়। ঘোড়ায় টানা গাড়িও আছে একটা, প্রয়োজন মতো বেরোয়।

বারো টাকা টিউশ্যনীর পারিশ্রমিক হিসেবে কম নয়, তবে এক উঠতি-বয়সী ছেলের খাওয়া বাদে যাবতীয় খরচের পক্ষে নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। দত্তমশাইকে ছাড়ে নি বিনু কিন্তু সেই বিশেষ মওকার পর আর কোন তেমন সুবিধে করতে পারেন নি। এখন বোধহয় দত্তমশাই সেদিনকার বদান্যতার জন্যে একটু অনুতপ্তই। বড়জোর এক আধটা সাধারণ খাট কি আলমারী বিক্রী হয়—বিনু পায় কেঁদে-ককিয়ে পাঁচ কি সাত টাকা—তার জন্যে যা ঘুরতে হয় আর নানান ধরনের বাঁকা কথা শুনতে হয় তাতে মজুরী পোষায় না।

কি করবে ভাবছে, পেলে আর একটা টিউশ্যনীই করত—কিন্তু কোথায় খুঁজবে কে যোগাড় ক'রে দেবে সেই সনাতন সমস্যা তো থেকেই গেছে—এই ছাত্রের বাবাটি যেন দৈব-প্রেরিত হয়েই ওকে পথ দেখালেন। 'এই বাজারে ফার্নিচার বেচবে কাকে? লোকে খাট আলমারী কেনে মেয়ের বে দেবার সময়—তাতে পুরনো ফার্নিচার চলবে না। বাড়িতে শখ ক'রে কিনে এসব রাখবে কোথায় লোকে? ভাল জিনিস কিনবে বেশী দাম দিয়ে তেমন শাঁসাল লোক কটা আছে? এসব ছাড়ো, রোজগার করতে চাও তো জমি ধরো। জমিই লক্ষ্মী, ফসল ফলাতেও জমি, আবার কিছু না ক'রে লাভ করতেও জমি। এখন এদিকটাই ডেভেলাপ করছে। লোকে শহরে থাকতে না পেরে এদিক সেদিক শহরতলীতে যেতে চাইছে। জমির দালালী ধরো, বেশ টু পাইস রোজগার হবে। শতকরা দু টাকা, দামের ওপর বাঁধা কমিশন—টু পার্সেন্ট—তেমন গোলমেলে জমি হলে দশ-পনেরো পার্সেন্টও আদায় হবে। দেন অবশ্য যিনি বেচছেন তিনিই—ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলে, মানে গরজ বেশী বুঝে মোচড় দিতে পারলে যে কিনবে তার থেকেও কিছু হাতাতে পারবে। অনেকেই এখন জমি বেচতে চায়, দু-একজনের সঙ্গে কথা কয়ে যা বুঝেছি, শুধু খদ্দেরকে সে খবরটা কি করে জানাবে ভেবে পায় না। সামান্য দামের জমি, অভাবে পড়ে বিক্রী—বিজ্ঞাপন করার খরচ জোটাবে কোত্থেকে। আর অত শত জানেও না।

দু-একজন জোচ্চোর দালাল আছে—পেটি জোচ্চোর—তারা 'খদ্দের দেখে দেবো ঘোরাঘুরির খরচা দাও' বলে দু এক টাকা নিয়ে সরে পড়ে—ঘোরাঘুরি ক'রে খদ্দের যোগাড় করার ধৈর্য থাকে না। তুমি কারও কাছ থেকে আগাম কিছু চেয়ো না, একটু চেষ্টা করো—খদ্দের আর বেচবার লোক কোনটারই অভাব হবে না।'

কথাটা মনে লাগলেও জমির খোঁজ কে দেবে এ একটা মহা সমস্যা মনে হয়েছিল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না।…দোলু চিরদিনের বিপত্তারণ—সে যেন বিনুর কথাটা মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বলে উঠল, 'আছে রে আছে, আমাদের পাড়াতেই পঞ্চা ঘোষ কাঠা তিনেক জমি বেচবে বলছিল। পাঁচ শো ক'রে কাঠা বলছে, তা এমন কিছু বেশি চাইছে না। খুব জরুরী, বেচা দরকার, মেয়ের বিয়ে সামনে। দ্যাখ না যদি একটা খদ্দের পাস।'

বলে একটু থেমে ভুরু কুঁচকে বলল, 'খদ্দেরও আমি একটা আঁচ বলে দিতে পারি। সত্যবাবু তো তোর বড় ইয়ার একজন, তোর বুড়ো বন্ধু সত্যবাবু রে —উনি জামাইকে থিতু করবেন বলে মন করেছেন। যা না একবার তাঁর কাছে।'

'যাঃ। এই মুখ নিয়ে সত্যবাবুর কাছে। ছিঃ।'

'নেকু। এই তো দু মাস পেরোয় এসেছ, বাজার হাটও করছ, তিনি কি আর তোমার মুখ এর মধ্যে দেখেন নি একদিন। ওসব পোশাকী লজ্জা রাখ দিকি। জগতে উন্নতি করতে গেলে অত লজ্জা ঘেন্না রাখলে চলবে না। নে তুই চ দিকি—পঞ্চার কাছে, এখনই কথাটা মুখোবালা করিয়ে দিই। ব্রোকারেজের কথাটাও সাক্ষীর সামনে পাকা হয়ে যাক।'

অগত্যা লজ্জা-ঘেন্নার মাথা খেয়ে যেতে হ'ল সত্যবাবুর কাছে।

তিনি লাফিয়ে উঠলেন একেবারে, 'ঠিক এই দরের মধ্যেই আমি চাইছিলুম। চলো, এখুনি জমিটা দেখে আসি।'

ওর যে কেন লেখাপড়া ছেড়ে জমির দালালী করার প্রয়োজন ঘটল, সে কথা একবারও তিনি তুললেন না। ইচ্ছে ক'রেই। ওকে লজ্জার হাত থেকে রেহাই দিতে।

জমি দেখে পছন্দ হল সত্যবাবুর। তিন-চার দিন পরে পাঁজিতে শুভ দিন দেখে একশো এক টাকা বায়নাও করলেন। এরপর কাগজপত্র উকীলকে দেখিয়ে দলিল তৈরী করতে যা দেরি। দোলুর চাপে বায়নার টাকা থেকেই পঞ্চা ঘোষ পাঁচ টাকা আগাম দিলেন, একমাস পরে রেজেস্ট্রীর দিন আদালতেই বাকী পঁচিশ টাকা বুঝিয়ে দিলেন ওকে।

ত্রিশ টাকা উপার্জন! এত সহজে!

বিস্ময় আর উৎসাহের সীমা রইল না বিনুর।

লেখাটা চলছিলই।

গোপনে দু'একটি লেখা যে কোন কোন মাসিকপত্রে না পাঠিয়েছে তাও না, কিন্তু কোন উত্তর পর্যন্ত কোথাও থেকে মেলে নি।

অবশ্য তা সে ঠিক আশাও করে নি।

কত দীর্ঘদিন ধরে নৈরাশ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে লেখক ও শিল্পীরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে—তার ইতিহাস সে কিছু কিছু জানে বৈকি। নানা জীবনী গ্রন্থে সে অসম যুদ্ধের, সে কৃচ্ছ্রসাধনা, সে তপস্যার কথা পড়েছে।

স্বয়ং ডিকেন্সই তো ত্রিশটি লেখা 'বজ' ছদ্মনামে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে পাঠিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এর সবগুলোই যদি ফেরৎ আসে তো জীবনে আর কখনও এ চেষ্টা করবেন না। তাদের মধ্যে ঊনত্রিশটিই ফেরৎ এসেছিল, কেবল একটি ছাপা হয়েছিল, সেই সঙ্গে সম্পাদকের চিঠি ও পাঁচ পাউণ্ডের চেক। সম্পাদক অনুরোধ জানিয়েছেন আরও লেখা পাঠানোর জন্যে।

যে বইতে সে পড়েছে ঘটনাটা তাতে লেখা আছে যে আনন্দে ডিকেন্স হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে বালিশগুলো ছিঁড়ে তুলো উড়িয়ে ছড়িয়ে, সর্বাঙ্গে সেই তুলো মেখে এক কাণ্ডই ক'রে বসেছিলেন।

কিন্তু বিনু ভাবে অন্য কথা।

যদি ও লেখাটাও ফেরৎ আসত। শুধু ইংরেজী সাহিত্য বলে নয়—সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যেরই কী অপূরণীয় ক্ষতি হ'ত।

তবে এর মধ্যে নিজের লেখা ও নাম ছাপার অক্ষরে দেখার সৌভাগ্যও হয়েছে বৈকি।

কলেজে গিয়েই সে কলেজ ম্যাগাজিনের জন্যে একটি গল্প আর একটি কবিতা দিয়েছিল। ও যতদিন ছিল তার মধ্যে তা ছাপা হয় নি, সে কথা ওর মনেও ছিল না। সুভদ্রাদের বাড়ি থাকতেই পথের ধারে বই দেখতে দেখতে একখানা 'প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিন' পড়ে থাকতে দেখে, এমনিই, অলস কৌতূহলে হাতে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু পাতা ওল্টাতেই প্রথম চোখে পড়েছে ওর নাম—ইন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। এ কি! এ যে গল্প কবিতা দুটোই ছাপা হয়েছে। ও কলেজে যাওয়া বন্ধ করেছে বলেই ওকে দিতে পারে নি তারা।

অতি দুঃখের ছটি পয়সা গুণে দিয়ে সেটা কিনেছিল সে।

বাড়িতে এনে একমাত্র সুভদ্রাকে দেখিয়েছিল, ছাত্রকেও দেখায় নি। সে এসব বুঝবে না, মাঝখান থেকে চেঁচিয়ে হাট বাধাবে।

তবে ভেবেছিল, হয়ত মনের কোণে একটা ক্ষীণ আশাই ছিল যে, সুভদ্রা পিনাকীবাবুকে অন্তত দেখাবেন। কিন্তু কে জানে কেন তিনি দেখান নি। ওদেরই বিছানার নিচে গুঁজে রেখে বলেছিলেন 'থাক, কাল দুপুর বেলা পড়ব।'

সেদিন ক্ষুণ্ণই হয়েছিল একটু, আজ কারণটা বোঝে।...

আশা রাখে নি বলেই আশাভঙ্গের বেদনা তত বাজে নি।

হতাশ আর নিরুৎসাহ করতে পারে নি।

সে লিখেই যাচ্ছিল। আর সে বাড়ি ফিরেছে শুনে পাড়ায় হাতে লেখা কাগজের 'পরিচালক'রা আবার যথারীতি আসতে শুরু করেছে। 'শেফালি' 'শান্তি' 'ধারা' 'বিজয়'—আরও কত। সেও অকৃপণ হাতে লেখা আর ছবি দিয়ে যাচ্ছে। তার মনে যেন সৃষ্টির জোয়ার জেগেছে, সে না লিখে থাকতে পারে না। কে নিচ্ছে, এসব লেখা কেউ পড়বে কিনা, এ ছবি কেউ দেখবে বা মুগ্ধ হবে কিনা—এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না সে। লিখতে হবে

বলেই তো সে লিখছে, না লিখে থাকতে পারে না বলেই।

সেদিনের কথাটা ওর স্পষ্ট মনে আছে।

এত বছরের ব্যবধানেও কিছুমাত্র অস্পষ্ট বা মলিন হয় নি সে স্মৃতি।

এর মধ্যে ওরা বাড়ি বদল ক'রে আরও অল্প ভাড়ার বাড়িতে উঠে এসেছিল। ভাড়া কম বলে নয়। আগের বাড়ি বিক্রী হয়ে গেল, নতুন বাড়িওলা নিজে বসবাস করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

এ নিয়ে ঝগড়া বিবাদে যাবার অবস্থা বা সময় কোনটাই ছিল না ওদের। তাই তাড়াতাড়ি এই বাড়িটা ঠিক ক'রে উঠে এল। প্রথম এ পাড়ায় আসে ওরা ছত্রিশ টাকা ভাড়ায়, তারপর বড় রাস্তায় নতুন বাড়ি হতে আটাশ টাকা ভাড়া ঠিক ক'রে উঠে যায়। এ বাড়িটার পঁচিশ টাকা ভাড়া। তাছাড়াও দুটো বড় সুবিধে পাওয়া গেল—নতুন বাড়ি, বাড়িওলা নিজস্ব টিউবওয়েল করিয়ে দিলেন। তেমনি অসুবিধেও একটা ছিল, বড্ড গলির মধ্যে, আলো আর হাওয়া দুটোই কম, ইলেকট্রিকের তো প্রশ্নই ওঠে না। মা একটু খুঁৎ খুঁৎ করেছিলেন, দাদা বললেন, 'বেগার্স কান্ট বি চুজার্স'। আমার যা আয় তাতে এ ভাড়া দেওয়াই কষ্টকর। এর চেয়ে ভাল বাড়ি নিতে গেলে অন্তত পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া পড়ত।'

আর কিছু বলেন নি মা।

এই বাড়িতেই সেদিন, সন্ধ্যা হবো হবো সময়ে—অর্থাৎ একটু দূরের বড় রাস্তায় এখনও বেশ আলো থাকলেও, এ গলিতে বেশ ঘোর হয়ে এসেছে—কে একজন বাইরে থেকে ডাকলেন, 'ইন্দ্রজিৎবাবু আছেন ?'

ইন্দ্রজিৎবাবু !

তাকে আবার এ পাড়ায় কে এত সম্ভ্রমের সঙ্গে ডাকবে।

তার বন্ধুরা দাদার বন্ধুরা তো বটেই, পাড়ার বয়স্ক লোকেরা সকলেই 'বিনু' বলে জানে, সেই নামেই ডাকে।

তা ছাড়া এ একেবারে অপরিচিত গলা।

বিনু তখন গামছা পরে টিউবওয়েল পাম্প ক'রে মার জল তোলার সাহায্য করছিল। 'কে !' বলে সাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি ধুতিখানা কোমরে জড়িয়ে বেরিয়ে এল।

অন্ধকার হয়ে এসেছে বটে, তবে বিনুও বিশেষ আলো থেকে আসে নি। তখনও ওদের বাড়ি কেরোসিনের রাজত্ব—তাও, সে আলো জ্বলে নি, জ্বালাতে গেলে ওকেই জ্বালতে হবে, এ জলের পর্ব শেষ ক'রে তবে সে অবসর মিলবে। সুতরাং সে এই ঝাপ্সা আলোতেই—একটু কাছে গিয়ে বেশ দেখতে পেল।

বড় বড়, একটু বিস্ফারিত গোছের চোখ, আর প্রায় মেয়েদের মতো বড় লম্বা চুল—প্রথমেই এই দুটি জিনিস চোখে পড়ল ওর, সে চুল পিঠের আধ-ময়লা পাঞ্জাবীটার ওপর পড়ে সেখানটায় বেশ একটা গাঢ় ধুলো ও তেলের কালিমা রচনা করেছে। পরনের ধুতিটা হয়ত খাটো মাপের নয়—কারণ মিলের চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বহরের ধুতি, এ ভদ্রলোকের নাতিদীর্ঘ আকৃতির পক্ষে যথেষ্ট, ওঁর পরার ধরনেই সেটা প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি উঠেছে।

এই বেশভূষা ও অতিসাধারণ ধরনের চেহারায় কোন শ্রদ্ধা কি প্রীতি অনুভবের কোন কারণ নেই, বরং সাহায্যপ্রার্থী ভেবে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠারই কথা—কিন্তু বিনু ওঁর মুখের দিকে চেয়ে নিমেষে মুগ্ধ হয়ে গেল। অত বিস্ফারিত চোখে যে এমন প্রসন্নতা ও আন্তরিকতা ফুটে উঠতে পারে তা বিনুর জানা ছিল না। আর মুখে তেমনি হাসি। বেশভূষায় যার দারিদ্র্য স্পষ্ট ও প্রকট, তার মুখ দেখলে মনে হয় বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য, সুখ ও বিলাসবস্তু ওঁর করায়ত্ত, ওঁর পৃথিবীতে অন্তত কোন মালিন্য দুঃখ শোক অভাব কিছুই নেই।

বিনুকে দেখে এগিয়ে এসে একেবারেই ওর হাত দুটি ধরলেন। বেশ চেপেই ধরলেন, তারপর বললেন, 'আমার নাম মুরারি সেন, আপনাদের এই পাড়াতেই এসেছি। একটু লিখিটিখি। আজ এখানের লাইব্রেরীতে রাখা হাতে-লেখা মাসিকগুলোর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎই আপনার একটা গল্প আমার চোখে পড়ে। তারপর খুঁজে খুঁজে অনেকগুলো লেখা পড়ে ফেলেছি, আর পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। আপনার মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা আছে, আপনি একদিন বড় লেখক হবেনই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই কনগ্র্যাচুলেশন্স জানাতে আসাই প্রধান উদ্দেশ্য—তবে স্বার্থও একটু আছে। সম্প্রতি একটা সাপ্তাহিকের ভার আমার হাতে এসেছে। প্রধানত এটা একটা আশ্রমের কাগজ, ধর্মের কথা, গুরুর উপদেশ এই সবই থাকবে বেশী, কিন্তু পপুলার করার জন্যে কিছু কিছু গল্পও দেবার কথা হয়েছে। তবে টাকা পয়সা কাউকে দেবে না, ওঁদের বিশ্বাস ওঁদের গুরুর নামে সবাই বিনা পয়সায় লিখবে—বরং লিখতে পেরে কৃতার্থ হবে। তাই, কোন নামকরা লেখকের কাছে তো যেতে পারব না, ভেবেছি নতুন যাঁরা লিখছেন—যাঁদের লেখার মধ্যে বেশ প্রমিস আছে—তাঁদেরই লেখা চাইব। সামনের সপ্তাহে আমাদের প্রথম সংখ্যা বেরোবে—দেবেন একটা গল্প?'

বিনুর প্রথমটা মনে হ'ল সে ভুল শুনছে।

তারপর—বিদ্যুৎ চমকের মতোই অত্যল্প সময়ে—একবার এমনও মনে হ'ল, এটাও স্বপ্নই দেখছে।

এসবটাই স্বপ্ন, এই সন্ধ্যা, এই ঝাপসা আলো, এই অদ্ভুত মানুষটি—যে নিমেষে অপরকে আপন ক'রে নিতে পারে—এই প্রস্তাব—সবটা, সবটাই স্বপ্ন।

কিম্বা বিকার একটা। ওর মনের সুতীক্ষ্ন ঈপ্সা, ছাপার অক্ষরে ওর লেখা বা ছবি ছাপা হওয়ার—যে বাসনা বাস্তবে পরিণত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই সে জানে—জানে বলেই এমন পাগল করা বাসনা আর হতাশা—ওর মস্তিষ্কে বিকারের রূপ ধারণ করেছে।

অল্প সময়, অতি অল্প সময়, বলতে গেলে কয়েক লহমার মধ্যে কথাগুলো খেলে গেল মাথায়।

যত কথাই সে ভাবুক, সবটার মধ্যেই একটা বিপুল অবিশ্বাস। নিজের চোখকে অবিশ্বাস, নিজের কানকে অবিশ্বাস।

হয়ত মুরারিবাবুও কথাটা বুঝলেন। হাতটা ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে

হেসে বললেন, 'দেবেন তো? অবশ্য নতুন কাগজ, কজনই বা পড়বে, তবু হাতে লেখা কাগজের থেকে বেশী পাঠক পাবেন তো নিশ্চয়। দিন না, একটা বেশ ভাল দেখে জোরালো গল্প, যাতে আমার কর্তার তাক লেগে যায়!'

আর অতটা অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকে না।

তবে উত্তরটাও খুব সহজে দিতে পারে না, অবিশ্বাসের স্থান তখন অধিকার করেছে একটা অবর্ণনীয় আবেগ।

আনন্দ, প্রত্যাশাতীত আনন্দ।

কল্পনাতীত সৌভাগ্যের আকস্মিক আবির্ভাবে যেমন অবশ, বিহ্বল করা আনন্দ আর আবেগ অনুভূত হয়।

ফলে উত্তর দিতে দেরিই হয়।

যেন ভাষা খুঁজে পায় না সে, এ প্রস্তাবের উত্তর দেবার মতো।

গলায় স্বরও আসে না যেন।

কি বলবে সে, কোন ভাষায় ধন্যবাদ দেবে!

কেমন ক'রে জানাবে যে ঠিক এই মুহূর্তে যদি সে মরেও যায় তো ওর কোন দুঃখ কোন আপসোস থাকবে না। এরচেয়ে সৌভাগ্য সে ভাবতেও পারে না, এই ওর এতদিনের আশাহীন ভবিষ্যৎহীন সাধনার যথেষ্ট পুরস্কার, কল্পনাতীত সাফল্য।

বরং যথেষ্টরও বেশী।...

অনেক কথা যখন বলবার থাকে, তখন তার কোন কথাটাই বুঝি বলা হয়ে ওঠে না। তাই সে হঠাৎ প্রায় অস্পষ্ট, কেঁপে যাওয়া গলায় একটা অবান্তর প্রশ্নই করে বসে, 'কর্তা! আপনি সম্পাদক নন?'

'আমিই আসল সম্পাদক কিন্তু নাম থাকবে ওঁদের এক প্রধান শিষ্যের— তিনিই অবশ্য আসল উদ্যোক্তা, শাঁসালো শাঁসালো ভক্তদের কাছ থেকে টাকা যোগাড়ও তিনিই করেছেন। আমার লাভের মধ্যে মাসে কুড়িটি টাকা।'

'কুড়ি টাকা!' নিজের বিস্ময়ের আঘাতটা সামলে নেয় সে এই বিস্ময়ে, 'সম্পাদকের মাইনে কুড়ি টাকা!'

'তবে আর কত হবে! এই কটা টাকাই পেলে এখন বেঁচে যাই। কোন নিশ্চিত আয় বলে তো কিছু নেই—আজ ওখানে কাল এখানে—মধ্যে মধ্যে দুটো পাঁচটা টাকা পাওয়া যায়, এই তো ভরসা। বিয়ে করেছি, ছেলেও হয়েছে—বাবার চাকরিটা আছে তাই রক্ষা। লিখি তো গাদা গাদা, কিন্তু টাকা দেয় কজন!'

দুঃখের স্মৃতিটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে বুঝি সেই সদাপ্রসন্ন উজ্জ্বল মুখে একটা বেদনা, একটা পরাজয়ের ছায়া এনে দেয়। তবে সে ঐ কয়েক মুহূর্তই। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত ব্যথা ও দুঃখকে উড়িয়ে দিয়ে হাসিতে ভরে ওঠে সে মুখ, বলেন, 'তবে আপনার কোন ভয় নেই। আপনি অনেক, অনেক বড় হবেন। টাকাও পাবেন, আপনাকে দেবে টাকা। তা আমার লেখাটা তাহলে কবে দিচ্ছেন।'

সে প্রসন্নতা বুঝি সংক্রামক। বিনুও ওঁর হাতে একটা চাপ দিয়ে বলে,

'কবে চাই বলুন। আমি কালই দিতে পারি। গল্প দু-তিনটে লেখাই আছে, তবে আপনাকে আরও ভাল একটা গল্প দেব। আজকের সন্ধ্যেটা পেলেই হয়ে যাবে।'

'বেশ, লিখুন আপনি। আমি দুপুরে বারোটা সাতাশের গাড়িতে বেরুই, তার আগে এসে নিয়ে যাবো।'

তখন সন্ধ্যা আরও ঘোর হয়ে এসেছে। এ সময়টায় মুহূর্তে মুহূর্তে অন্ধকার গাঢ় হয়। বাড়িতে এখনই আলো জ্বালা দরকার। নইলে হয়ত মা পড়ে যাবেন—কোথাও অন্ধকারে চলতে গিয়ে। তাই বিনুও আর ওঁকে বাধা দিল না। উনি দ্রুত সেই গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

অনেক কথা বলার ছিল।

অনেক, অনেক ধন্যবাদ দেবার ছিল। অনেক ঋণ স্বীকার। কিছুই বলা গেল না। যখন ঘোরতর নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে জীবনে, এখনকার সন্ধ্যার মতো, কোনো আলো কোথাও দেখা যাচ্ছে না, ভবিষ্যৎ বলতে আর কিছু চোখে পড়ছে না—তখন দেবদূতের মতোই এই সাধারণ চেহারায় বিত্তহীন লোকটি এসে যেন চিরকালের মতো আশার একটা অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল ওর প্রাণে। এর যে তুলনা নেই, সে কথাটাও বলা হল না ওঁকে।

এ বুঝি ঈশ্বরেরই আশ্বাস আর অভয়। লোকটি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বটে, কিন্তু আশ্বাসের যে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল তা বুঝি সূর্যালোকের মতোই প্রাণে ভরা।

সে দুহাত তুলে সেই অন্ধকারেই একটা প্রণাম করল।

॥ ৪২ ॥

তখনই লিখতে বসবে—মুরারিবাবুকে এমনিই একটা আভাস দিয়েছিল। কিন্তু সেটা হয়ে উঠল না।

হ'ল না—বাইরের কোন কারণে নয়।

এই প্রথম ওর লেখা ছাপা হতে যাচ্ছে, একটা নতুন সাপ্তাহিক কাগজের প্রথম সংখ্যায়—খুব ভাল কিছু লিখতে হবে, এই চিন্তাতেই সমস্ত চিন্তা কল্পনা যেন এলোমেলো হয়ে যায়।

গল্পের পর গল্প মাথায় আসে, কোনটাই যেন যথেষ্ট ভালো বলে মনে হয় না। পুরনো যে তিনটে গল্প লেখা ছিল সেগুলোও পড়ে দেখল, পছন্দ হল না। শেষে যেন হতাশ হয়েই শুয়ে পড়ল।

শুয়ে পড়ল বটে; তবে ঘুম এল না।

এ অবস্থায় ঘুম আসা বুঝি সম্ভবও নয়।

এক-একবার এমনও মনে হ'ল, তবে কি তার কল্পনার শক্তি ফুরিয়ে গেল ?

লক্ষ্যে পৌঁছে, সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে নিঃস্ব হয়ে গেল! এ প্রাসাদে ঢোকার অধিকার সে পাবে না!

চিন্তাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবলভাবে মাথা নেড়ে যেন দৈহিক

শক্তিতেই সেটাকে তাড়িয়ে দেয়।

না, অনেক লিখবে সে। অনেক লেখার আছে।

কাঁচা লেখা হোক, সে এই এদের জন্য—হাতে লেখা কাগজের জন্যে তো কিছু না ভেবেই লিখতে বসে, লিখতে লিখতে গল্প তৈরী হয়ে যায়। এক একদিন দুটো তিনটে পর্যন্ত লেখে। সে কেন এখনই এই বয়সে রিক্ত হয়ে পড়বে।

ধ্যুৎ! যত সব বাজে চিন্তা।...

শেষ পর্যন্ত রাত চারটেয় উঠে ঘরের বাইরে রকে বসে সেই স্বল্প প্রভাতী আলোতেই লিখতে শুরু করে। প্রথম যে গল্প, মাথায় আসে—বিচার না ক'রে দ্বিধা না ক'রে লিখতে শুরু করে। এবং শেষও হয়ে যায় ছটার মধ্যে।

নিজে বুঝতে পারে না ঠিক কেমন হল। এটা তার চিরদিনের ব্যাপার। কেমন হ'ল নিজে কোনদিনই বুঝতে পারে না। বুড়ো বয়সেও এই মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারে নি—অনেক বই লেখার পরও।

পরে প্রশংসা করলে আশ্বস্ত হয়, তখন মনে হয় মন্দ লিখি নি।

মুরারিবাবু এগারোটার পরই এসে হাজির হন।

সেই কাঁধে চুলের তেল লাগা ময়লা পাঞ্জাবী, খাটো করে পরা আরও ময়লা ধুতি, জামায় বহুদিনের সঞ্চিত ঘামের গন্ধ—মুখে সেই প্রসন্ন পরিতৃপ্ত, আত্ম-বিশ্বাসে পূর্ণ হাসি।

এবার বাইরের ঘরের দোর খুলে দিল বিনু।

এবাড়িতে এসে এই একটা সুবিধা হয়েছে। এটা অবশ্য ওই দাদারই শোবার ঘর। তবে সে একটা একানে লোহার খাট—সেটা পাতার পরও অনেক জায়গা থাকে, একটা ওদের পুরনো আমলের শ্বেত পাথরের টেবিল আর দুটো চেয়ার পাতা গেছে। একটা কাঠের আর একটা লোহার। এছাড়া একটা কাঠের বাক্সও আছে সেটাতেও বসার কাজ চলে প্রয়োজন হলে।

এ ব্যবস্থাটা ওর দাদাকেই করতে হয়েছে। তাঁরই বন্ধু-বান্ধব মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে হাজির হন, তাঁদের না বসালে চলে না। এর আগে অবশ্য বিনুর কাউকে বসাবার দরকার হয়নি, আজ হল।

মুরারিবাবু সেই কাঠের বাকসটার ওপরই ধপ ক'রে বসে পড়ে গল্পটা তখনই আদ্যোপান্ত পড়ে ফেললেন, তারপর সেদিনও ওর হাত দুটো ধরে বললেন, 'অপূর্ব! অপূর্ব। আমার এখন আপসোস হচ্ছে এটা এই নতুন কাগজের জন্যে নিচ্ছি বলে। এ গল্প আপনার ভারতবর্ষ কি প্রবাসীতে ছাপা উচিত ছিল।'

পরবর্তী কালে সে গল্প পড়েছে বিনু। বছর দশেক পরেই গল্পটা একদিন চোখে পড়ে পড়ার চেষ্টা করেছে। নিজেরই লজ্জা করেছে এ গল্প তারই লেখা মনে করে। তবে এও বুঝেছে, যত দিন যাচ্ছে বেশী করে বুঝছে, সেদিন এ উৎসাহটুকুর প্রয়োজন ছিল।

বাস্তবিক মুরারিবাবুর কাছে ওর ঋণের অন্ত নেই।

অদ্ভুত মানুষ ছিলেন এই মুরারিবাবু। অল্প বয়সে মারা গেলেন ভদ্রলোক, নইলে পরবর্তীকালে সে কিছুটা তাঁর কাজে লেগে সে ঋণের সবটা না হোক—সবটা শেষ করা বুঝি সম্ভবও নয়—কিছুটা শোধ করতে পারত।

মুরারিবাবুর সঙ্গে যখন ওর প্রথম পরিচয় হয় তখন ভদ্রলোকের কোন স্থায়ী আয় নেই। কিছু স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত ছেলেদের নাটক, যা এককালীন কপিরাইট বিক্রী করতে হত—দাম পেতেন বই পিছু কুড়ি থেকে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ টাকা, এবং সে প্রতিটি অঙ্কই কয়েক কিস্তিতে শোধ হত—দু টাকা পাঁচ টাকা তিন টাকা হিসেবে। একদিন প্রকাশক 'তবিল' ঝেড়ে দেড় টাকাও দিয়েছেন—বিনু নিজের চোখে দেখেছে। এছাড়া কারও একটা জীবনী লিখতে হবে, ছোটদের উপযোগী ক'রে, প্রকাশকের নামেই বেরোবে—সেও হয়ত ঐ বিভিন্ন দফার ছ মাস ধরে উশুল হত, কুড়ি কি পঁচিশ টাকায় কপিরাইট। এছাড়া ওখানে দু' টাকা পাঁচ টাকা—বিবিধ বিচিত্র বিষয়ের টুকরা-টুকরা লেখায়। অনেক পরে, এক উৎসাহী বয়স্ক প্রকাশকের সনির্বন্ধ অনুরোধে দুখানা 'গরম গরম' অশ্লীল বই লিখে দিয়েছিলেন, সেই বোধ হয় জীবনে প্রথম ও শেষ এক-একটির জন্যে একশ টাকা ক'রে পেয়েছিলেন। অন্তত পাবার কথা। তবে তাতেও তো ঐ কিস্তি। এ বই দুটি বেরোবার পর, প্রকাশক মশাইকে জেলে যেতে হয়েছিল ছমাসের জন্যে, পুরো টাকাটা দিয়ে ছিলেন কিনা ঘোরতর সন্দেহ আছে।

এই ধর্মীয় সাপ্তাহিকেই তাঁর প্রথম চাকরি, বিশ টাকা বেতন, তবে তাও বেশী দিন টেঁকেনি। ভদ্রলোকরা যতটা চলার বা বিজ্ঞাপন পাওয়ার আশায় নেমেছিলেন—তার কিছুই হল না দেখে দমে গেলেন। খরচ কমাতেই হবে, তাছাড়া যে মহাদেব কর্মকারের নাম সম্পাদক হিসেবে ছাপা হত—তিনি বোধহয় মনে করলেন কাগজ চালানোর রহস্যটা মোটামুটি তাঁর জানা হয়ে গেছে—তিনি মুরারিবাবুকে জবাব দিলেন। মাস তিনেক বোধহয় কাজটা ছিল মুরারিবাবুর। তবে সে সাপ্তাহিক বিখ্যাত গুরুর বহু ধনী শিষ্য থাকা সত্ত্বেও ভালো মতো চালানো যায় নি, কিছুদিন পরে তুলেই দিতে হয়েছিল।

এর পর একখানা এক পয়সার দৈনিকে সহঃ সম্পাদকের কাজ পেয়েছিলেন। বেতন আঠারো টাকা। কাজ অবশ্য কমই, বিকেল পাঁচটায় যেতে হত—নটা সাড়ে নটায় ছুটি। ঘুড়ির কাগজে—অর্থাৎ হলদে কি মেকানিকক্যাল কাগজে ছাপা হত, এখনকার দিনের সাধারণ দৈনিক পত্রের চেয়ে আকারে সামান্য ছোট, চার পৃষ্ঠা। একবারের ইলেকশন উপলক্ষে কোন কোন ভোটপ্রার্থীর হয়ে তাঁদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঠেসে গালাগালি দেবার ও কুৎসা রটাবার জন্য শুরু হয়েছিল, পরে 'ব্ল্যাকমেল' ক'রে কিছু অর্থ উপার্জন করার সুবিধা হয় বলে থেকেই গিয়েছিল। সংবাদ সংস্থাকে চাঁদা দেবার বালাই ছিল না, অন্য কাগজের বাসি খবর সরবরাহ ক'রেই সংবাদপত্র নামটার সার্থকতা প্রতিপন্ন হত।

মোট তিনজন সহঃ সম্পাদক নিয়ে কাগজ চলত, সর্বোচ্চ বেতন ছিল চল্লিশ। এঁরাই সংবাদ লেখক, সংবাদ সৃষ্টিকারী—আবার প্রুফ রীডারও। সংবাদ সৃষ্টিকারী অর্থে—যখন একটু-আধটু জায়গা ভরাবার মতো কোন খবর হাতের কাছে মিলত না—তখন কল্পিত খবর দিয়ে ভরাতে হত। এমন খবর দেওয়া

হত যার সত্যতা যাচাই করা হঠাৎ সম্ভবও নয়, তেমন গরজও করবে না কেউ। যেমন 'হনলুলুতে বিরাট ভূমিকম্প' 'চীনের ফুচাও শহরে একটি তিন ঠেঙ্গে বাঘের উৎপাত হয়েছে' ইত্যাদি। এই সব সংবাদ রচনার কাজে—মুরারিবাবু ছিলেন অদ্বিতীয়। কোন কোন দিন বিনুও এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।

কিন্তু এমনই মুরারিবাবুর ভাগ্য, এই তিনজনের মধ্যে দুজন পরে এক বিখ্যাত দৈনিকে কাজ পেয়েছিলেন, একজন তো কালক্রমে সংবাদ-সম্পাদকই হয়েছিলেন বোধহয় দু হাজার টাকা মাইনেতে—কিন্তু মুরারিবাবুর সে ভাগ্য হয়নি।

অবশ্য মুরারিবাবু তাতে বিন্দুমাত্র দমেছেন মনে করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি দুর্দম নন, অদম্য। অপরাজেয় বললেই ঠিক বলা হবে।

এই সব উঞ্ছবৃত্তির তলে তলে তিনি অনেকগুলি কাগজ বার করেছেন। করেছেন অর্থে—করিয়েছেন। সামান্য পুঁজির মহাজন ছাড়া তাঁকে ভরসা করবে কে? সুতরাং তার কোনটাই চলে নি। খান তিনেক সাপ্তাহিক, একটা মাসিকের কথা তো বিনুর মনেই আছে। মাসিকটা বোধহয় মাস পাঁচেক চলেছিল। সাপ্তাহিকগুলিও প্রায় তাই, কোনটা তিন মাস কোনটা বা হয়ত পাঁচ মাস। এই টাকায় যে কদিন চলবে তার মধ্যে যে কোন সাময়িক পত্র স্বনির্ভর হওয়া সম্ভব নয় তা মুরারিবাবুও জানতেন। তবু করতেন তার মানে প্রতিবারই মনে করতেন—এই যে 'সম্পাদক—মুরারি সেন' ছাপা হচ্ছে এই দেখিয়ে অন্য কোন ভদ্র কাগজে একটা স্থান ক'রে নিতে পারবেন।

তা অবশ্য হয় নি।

তবে তার জন্যে কি খুব একটা দুঃখিত বোধ করেছিলেন মুরারিবাবু?

আশাভঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছিলেন?

তা সম্ভব নয়। যাঁরা মুরারিবাবুকে জানতেন তারাই বলবেন, মুরারিবাবু হতাশ হবার লোক নন, ভেঙ্গে পড়া সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

তাঁর মধ্যে কোথায় একটা ইস্পাতের দৃঢ়তা ছিল—আত্মবিশ্বাসে ও আশায় তৈরী—যাকে ভাঙ্গবার জন্যে বিধাতার সংগ্রাম ওঁর সেই বাল্যকাল থেকে, হার মেনে ক্রুদ্ধ বিধাতা বুঝি শেষ পর্যন্ত পৃথিবী থেকে অকালে সরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলেন।

দারিদ্র্য সম্বন্ধে প্রধানত দু রকম মনোভাব দেখতে পাই আমরা। এক সদা সংকুচিত, সদা লজ্জিত—দারিদ্র্যকে অপরাধ ভেবে তাদের কুণ্ঠা ও ত্রাসের সীমা নেই, আর একদল মনে মনে সেই ভাব বোধ করলেও সেটা টাকার জন্য একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলে, দারিদ্র্য নিয়েই অহংকার করতে বা সেটা দেখাতে চেষ্টা করে। সে অহংকার বার বার অপরের কানের কাছে ঢাক পিটিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে।

মুরারি সেন এ দুদল থেকেই পৃথক, স্বতন্ত্র।

তাঁর একান্ত দারিদ্র্য বা প্রায় নিঃস্বতা সম্বন্ধে তিনি একেবারেই অনবহিত ছিলেন। সে সম্বন্ধে উপেক্ষা বা অবহেলা ছিল বললে একটু ভুল বলা হয়, এমন কি তিনি উদাসীন ছিলেন বললেও বর্ণনা মাত্র হয়, ব্যঞ্জনা হয় না। তিনি একেবারেই নির্বিকার ছিলেন। তাঁর ঘরে কাচা লালচে হয়ে যাওয়া মোটা

লংক্লথের পাঞ্জাবীর কাঁধের দিকে লম্বা চুলের তেল ও ধুলোতে যে একটা বেশ চওড়া কালো দাগ লোকের চোখে পড়ছে, ঘামের গন্ধ কোনমতেই ঢাকা যাচ্ছে না—সে ব্যাপারটায় কোন বোধই ছিল না।

একদিন ঘরে থাকলে অবশ্যই স্ত্রী কেচে থালা দিয়ে ইস্ত্রী ক'রে দিতেন, কিন্তু সেই একটা দিনই সময় মিলত না ভদ্রমহিলার।

দুঃখের ধান্দায় ঘুরতেন প্রতিদিন, অষ্টপ্রহর ?

না, সেই সঙ্গে সুখের ধান্দাও যে ছিল।

সংবাদপত্র বা সাপ্তাহিকপত্র, তা এক পয়সা দামেরই হোক আর রঙীন মেকানিক্যাল কাগজেই ছাপা হোক—তাদের আপিসে নিমন্ত্রণ আসে রাশি রাশি। ফিল্মের বিশেষ শো, থিয়েটারের প্রথম রজনী বা পরবর্তী উৎসব অভিনয়, টিসেস কমিটির (পরবর্তী কালের টি বোর্ড ?) বিজ্ঞাপন—চিত্র প্রদর্শনী, এমনকি কোন কোন বড় আপিসেও নানা উৎসবে নিমন্ত্রণ আসত। সেসব সমাবেশে বড় বড় অফিসার, বড় বড় সাহিত্যিক ধনী ব্যবসায়ী এবং অন্য ক্ষেত্রের বিশিষ্ট লোকও অনেক আসতেন, বরং তাঁদের দলই ভারী। সামাজিক নিমন্ত্রণও এই সম্পাদক-পরিচয়-সূত্রে কম আসত না। সভা-সমিতি তো ছিলই। লাইব্রেরীর বার্ষিক উৎসব সরস্বতী পুজোর প্রদর্শনী—আরও কত কি, অজস্র।

এর একটাও—আমন্ত্রণ আহ্বান বা যাওয়ার সুযোগ বাদ দিতেন না ভদ্রলোক। এবং নির্বিকার নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাসে সুবেশ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশে গিয়ে বসতেন, তাদের সঙ্গে আলাপ করতেন সমানে সমানে বরং এক এক সময় মনে হত একটু ওপর থেকেই করছেন। সভা-সমিতিতে গিয়ে বক্তৃতা করতে কি সভা-পতিত্ব করতেও আটকাত না।

বিনুর আজও ওঁর কথা মনে পড়লে একটা সত্যকার বেদনা বোধ হয়। আজ যখন সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সামনে অসংখ্য সুযোগ-সুবিধা—অকল্পনীয় অর্থ প্রাপ্তির ব্যবস্থা, সে সময় সে ভদ্রলোক রইলেন না। ওঁর চেয়ে অনেক কম ক্ষমতার লোক—তাঁরই সম-সাময়িক—অনেক বেশী উপার্জন করেছে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মুরারিবাবু বোধহয় মাত্র ম্যাট্রিক পাস, কোন ডিগ্রি ছিল না। কিন্তু যে কোন বিষয়ে লিখতে বা বক্তৃতা করতে পারতেন মাত্র কয়েক মিনিটের নোটিশে। দ্রুত লেখার শক্তি ছিল অসাধারণ এবং যে বিষয় কিছুই জানতেন না, সে বিষয়েও চমৎকার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি ক'রে আসল কথা কিছুই না বলে অনেক কথা লিখতে বা বলতে পারতেন। সামান্য কিছু সময় পেলে—দুটো কি তিনটে দিন—কোন লাইব্রেরী থেকে বই পড়ে নিতে পারলে তো কথাই নেই। তাঁর ঐ সীমিত জীবনের মধ্যেই অন্তত কুড়ি-পঁচিশটি বই লিখে গেছেন, ছেলেদের থেকে বড়দের—যখন যা ফরমাশ এসেছে—প্রকাশকদের কাছ থেকে, অবশ্যই তা বেনামে।

আর এই সব বই লেখার দাম পেয়েছেন কুড়ি পঁচিশ—বড় জোর পঞ্চাশ। ঘোরতর অশ্লীল বই লিখে দুবার একশো করে পেয়েছিলেন।

মানে—পাবার কথা। কিন্তু এমনই ভাগ্য ভদ্রলোকের যে, এর কোনটারই টাকা একসঙ্গে পান নি। পাঁচ টাকা দশ টাকা কিস্তি, এক টাকা দু টাকা পর্যন্ত।

তাও অনেক টাকাই পুরো শোধ হয়নি। অনেক ঘুরে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

বলতেন, 'ওর পেছনে ঘুরে যত সময় নষ্ট করব, ততক্ষণে নতুন কিছু লিখলে অন্তত পাঁচটা টাকাও তো পাবো। ও দিলেও কি আর একদিনে ওর বেশী দিত।'

মুরারিবাবুর কাছে বিনুর ঋণ অনেক।

এমন বন্ধু তার জীবনে খুব বেশী আসেনি, কারও জীবনেই বোধহয় আসে না।

'আপনি এত ভাল লেখেন, আজ পর্যন্ত কোন প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি?' টাকরায় টক টক ধরনের একটা শব্দ ক'রে বলতেন, 'এ হতেই পারে না। এর একটা বিহিত করতেই হবে।'

করলেনও একদিন। ওঁর যে প্রকাশক অশ্লীল বই লিখিয়ে নিজে জেল খেটে ছিলেন পরে—তাঁর কাছেই নিয়ে গেলেন।

বয়স্ক ভদ্রলোক। বেঁটে খাটো, অধিকাংশ সময়ই মোটা পৈতের গোছা দেখিয়ে খালি গায়ে বসে থাকতেন। চোখে মুখে ধূর্ত চাহনি। সর্বদা চালাকির দ্বারা যারা জীবনটা সফল ও সার্থক করতে চায়—সেই দলের। অপরকে প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত করতে পারলে মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করেন এঁরা, এটাকে একটা শক্তির পরিচয় বলে মনে করেন।

বিনুর আপাদমস্তক বার দুই চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'এ তো একেবারে পোলাপান মুরারিবাবু। এ কি লিখবে।'

'আমাদের অনেকের চেয়েই ইনি ভাল লেখেন, একটা কাজ দিয়ে দেখুনই না।'

আবারও সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আপাদ-মস্তক অবলোকন।

তার পরই একটা বোমা ছুঁড়ে মারলেন, 'সেক্‌সোলজী পড়া আছে কিছু? মানে যৌনতত্ত্ব? যৌনবিজ্ঞানের বই লিখতে পারবেন?'

এটা সত্যিই পড়া ছিল। বিনু নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় ঘাড় নাড়ল, 'পারব।'

'বেশ। দম্পতির ব্রহ্মচর্য এই নামে একটা বই লিখে আনুন। মানে বিয়ে করার পরও যে ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজন আছে আর তা রাখা যায়—এইটে বলতে হবে। পারবেন?'

এ আবার কি উদ্ভট কথা।

বিবাহিত জীবনে আবার ব্রহ্মচর্য কি! ব্রহ্মচর্য পালনের জন্যে কি কেউ বিয়ে করে!

কিন্তু এ একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। বিশেষ হাতের পাশা আর মুখের কথা একবার বেরিয়ে গেলে আর ফেরানো যায় না।

বিনু গলায় একটা অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলল, 'পারব।'

'বেশ, করে আনুন। পাঁচ ছ' ফর্মার বই। পছন্দ হলে ত্রিশ টাকা দেব, কপি রাইট। তবে আপনার নামে বেরোবে না, এক সাধুগোছের নাম দেব অথর হিসেবে, তাতে ওজনটা একটু বাড়বে বইয়ের।'

ওখানে যত কথাই বলুন, বাইরে বেরিয়ে এসে মুরারিবাবু একটু ইতস্তত

ক'রে বললেন, 'পারবেন তো লিখতে—এ তো এক আজগুবি সাবজেক্ট।'

বিনু হেসে জবাব দিল, 'আপনিই তো পথ বাতলে দিয়েছেন এর আগে—যে বিষয় জানেন না সে বিষয় লিখতে হলে অনেক একথা-ওকথা বলে বেশ খানিকটা ধোঁয়া রেখে ছেড়ে দেবেন।'

'ঠিক ঠিক।' সশব্দে চারপাশের লোককে সচকিত ক'রে হেসে উঠলেন মুরারিবাবু।

কিন্তু বিনু ঠিক ওপথে গেল না। সে তার অধমতারণ পতিতপাবন প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিং-এরই শরণাপন্ন হল।

এর আগে দেখেছে সে, যৌনতত্ত্বের ওপর নানারকম চটি চটি বই বিক্রী হয় ওখানে। কিছুবা আমেরিকায় ছাপা, কিছুবা লণ্ডনে। কিছু ফরাসী বইও আছে, কিন্তু সে তো তার কাছে অপাঠ্য।

সেদিনও অনেক ঘুরে খানতিনেক সস্তা দামের চটি বই ছ'আনায় সংগ্রহ করল। ওদেশেও এমন অশিক্ষিত বা সামান্য শিক্ষিত পাঠক ঢের আছে যাদের সাধ্য সামান্য, জ্ঞানপিপাসাও সীমিত। যারা এসব বইতে জ্ঞান খোঁজেও না, অত কিছু বোঝার ক্ষমতাও নেই—যৌনতত্ত্বের বই পড়ে যৌন উত্তেজনাই শুধু অনুভব করতে চায়। এসব বই তাদের জন্যেই লেখা ; ওর মতো, মুরারিবাবুর মতো লেখকদের দ্বারা।

তিনখানা চটি বই—একরাত্রেই পড়ে নিল বিনু।

তারপর কাগজকলম নিয়ে বসে গেল লিখতে।

অসুবিধা হল মাকে নিয়ে। ইদানীং দু-চারটে লেখা ছাপা হতে মা ওর লেখা সম্বন্ধে একটু যেন সচেতন হয়েছেন।

'কি লিখছিস রে?' এমন প্রশ্ন তিনি করেন না। কারণ তাহলে নাকি ওকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। দাদা বলেছেন, 'এসবে কিছু হবে না। বাংলাদেশে সাহিত্য ক'রে পেটের ভাত হয় না। অন্য চাকরিবাকরি ক'রে করা যায়। চারু বাঁড়ুয্যে প্রবাসীতে কাজ করেন, মাস্টারী কি প্রফেসারীও করতে পারেন, তাঁর পেটে বিদ্যে আছে। সৌরীন মুখুজ্জে উকীল। এক শরৎ চাটুয্যে, তা তিনিও আগে চাকরিই করতেন। করতে করতেই লিখে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে তবে কাজ ছেড়েছেন। আর রবি ঠাকুর শরৎ চাটুয্যে সবাই হয় না, হতে পারে না। ছেলেকে বলো, সাহিত্য করতে হয় একটা ভাতের ব্যবস্থা ক'রে করুক। লেখাপড়া শিখল না, গ্র্যাজুয়েট হলে নিদেন একটা ইস্কুলমাস্টারীও করতে পারত, উপরি সাহিত্য করে করুক। এখন উপায় আছে সরকারী একটা লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরি। তবু কেনোমতে পেটের ভাতটা হতে পারবে। সেইমতো তৈরী হতে বলো। পরীক্ষা দিক। মন দিয়ে পরীক্ষা দিলে পাশও করতে পারবে।'

না, প্রশ্রয় মা দেন না, কিন্তু আড়ে যে চেয়ে চেয়ে দেখেন তা বহুদিন লক্ষ্য করেছে বিনু। মার দৃষ্টি বরাবরই তীক্ষ্ন তবে আগে একটা ধারণা ছিল, সম্ভ্রান্ত লোকদের কৌতূহল প্রকাশ করতে নেই—এখন তাঁর স্বভাবের বহু পরিবর্তনের সঙ্গে সে মতেরও পরিবর্তন হয়েছে। ঐ আড়ে দেখাতেই অনেক কিছু দেখে নেন।

সুতরাং মা দুপুরে ঘুমোলে কিম্বা দাদা আপিসে বেরিয়ে যাবার পর মা যখন রান্নাঘরে রাত্রের খাবার করতে ব্যস্ত থাকেন বা দিনের অবশিষ্ট রান্না সারতে —তখন যা ঘণ্টাখানেক সময় পাওয়া যায়। ভোরে উঠে লিখতে বসলে কৌতূহল হবে—কী এমন জরুরী লেখার দরকার হল।

আরও বিপদ, সেই বইগুলো পড়াও দরকার। মা অত বুঝবেন না, দাদা বোঝেন। তিনি একদিন একটা বই দেখেও ফেলেছিলেন, তিরস্কারও করেছেন খুব, 'যৌন তত্ত্বের বই পড়তে হয় ভাল ভাল বই আছে—তাই পড়ো। এসব চোতা বই শুধু এক শ্রেণীর লোকের উত্তেজনার খোরাক যোগাতেই লেখা হয়। মূর্খরা লেখে, মূর্খরাই পড়ে। তোমার এসব প্রবৃত্তি কেন?'

অগত্যা সেসব বই পুরনো কাগজের গাদায় ঢেকে রাখতে হয়েছে। লেখার গতিও সেই কারণে ইচ্ছা এবং শক্তি সত্ত্বেও দ্রুততর করা যাচ্ছে না।

এ বইগুলোর মূল্য বা মূল্যহীনতা বিনুও যে না বোঝে তা নয়। এর প্রয়োজন অন্য। ঐ প্রকাশক লোকটিকে সে বিলক্ষণ চিনে নিয়েছে। তিনি বিষয়বস্তুর নামটাই ভাঙিয়ে খেতে চান। এ বিষয়ে যে লেখবার কিছু নেই—তা তিনিও জানেন। তিনি ধোঁয়াই চান, বিনুও ধোঁয়া লিখতে পারবে। তার মধ্যে মধ্যে কিছু ইংরেজী বুকনি ও ইংরেজী বই থেকে উদ্ধৃতি দিলে, ধোঁয়াকে ধোঁয়া বলতে সাহস করবে না অল্পশিক্ষিত পাঠকরা। আর তারাই তো এ বই পড়বে। কোন্ বই থেকে এসব উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে তা কেউ জানবে না—মানে কোন শ্রেণীর বই থেকে। এখনও ইংরেজী ভাষার ঢের কদর আছে। কোন একটা গালভারি বইয়ের নাম থাকলেই পাঠকরা অভিভূত হবে। সেইজন্যেই এসব বই ওল্টানো দরকার।

দেরি হচ্ছে, দেরি হবে—তা মুরারিবাবুও জানতেন।

তিনিও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। ওকে লেখা বাবদ কটা টাকা পাইয়ে দেওয়াটা তাঁর মাথাব্যথা, তাঁর কর্তব্য হয়ে উঠেছে যেন।

এর মধ্যে একদিন এসে বললেন, 'ইন্দ্রজিৎবাবু, একটা ছেলেদের নাটক লিখে দিতে পারবেন? চট্ করে? সামান্যই টাকা দেবে, তবু তো নিজের উপার্জন। দিন না।'

যেন অনুনয়ের সুর তাঁর কণ্ঠে।

'ছেলেদের নাটক? সেটা আবার কি বস্তু?'

কথাটা শুনেছে বিনু, কিন্তু জিনিসটার সঙ্গে পরিচয় নেই।

'আরে, স্ত্রী-চরিত্র থাকবে না, ছেলেরা গল্পটা বুঝবে, অভিনয় করতে পারবে —এই আর কি! ছাপা চল্লিশ পৃষ্ঠার মতো হলেই হবে, ইস্কুলের ছেলেরা এক ঘণ্টার বেশী টাইম দিতে পারবে না। 'চিতোর-গৌরব' পড়েন নি? আমারও একটা বই আছে—'বৃন্দাবনের রাজা'—খুব চলে। দেখবেন? কাল দিয়ে যাবো।'

দেখার দরকার হল না। সেইদিনই বসে বিনু ছকে নিল ব্যাপারটা। ঐতিহাসিক নাটক সে লিখবে! জালিম সিংহের গল্পটা মনে আছে, ছেলেদের বইতে বারো বছরের ছেলে নায়ক—সেই তো ভাল। সে পরের দিনই—দু-

তিনবারে একটানা লিখে সেই একদিনের মধ্যেই নাটকটা শেষ ক'রে ফেলল। 'বালক বীর' নাম দিল। ওরই মধ্যে তিন অঙ্ক ছিল বোধহয়, গোটা পাঁচেক দৃশ্য।

ওঃ, মুরারিবাবুর সে কী আনন্দ! মনে হল এটা তাঁর একটা ব্যক্তিগত জয়লাভ হল। বিনুর প্রতি তাঁর বিশ্বাস মিথ্যা বা অন্তঃসারশূন্য প্রতিপন্ন হয় নি, বরং উল্টোটাই হয়েছে, এতেই আনন্দ এত বেশী।

তিনি সেই দিনই নিয়ে গেলেন এই নতুন প্রকাশকের কাছে।

কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপর দোকান, পাঁচরকম গল্প উপন্যাসের বই আছে, বিভিন্ন প্রকাশকের। খুব যে একটা বিক্রী হয় তা হয় না। তবে দরকারও নেই। মুরারিবাবু বুঝিয়ে দিলেন, ওঁদের জাতে গ্র্যাজুয়েট ছেলে এবং সচ্চরিত্র বড় বংশের—খুব বেশী নেই। কাজেই বি-এ পাশ করেছেন এই কৃতিত্বেই এক ধনী ব্যক্তি একমাত্র কন্যাকে ওঁর হাতে দিয়ে কৃতার্থ হয়েছেন। সেই টাকাতেই এ দোকান করা। নিজের বাড়ি আছে হাতীবাগানে, একতলা দুতলা ভাড়া—তেতলায় নিজে থাকেন। ভাড়ার আয়েই সংসার চলে। এখানে যা বিক্রী হয়—তাতে ঘর ভাড়া আর একটি ভৃত্যের মাইনে চলে গেলেই যথেষ্ট।

এ এক আবার বিচিত্র লোক। জয়ন্তবাবুকে দেখে মনে হল, কোন কিছুতেই তিনি মনস্থির করতে পারেন না। সর্বদাই দ্বিধাগ্রস্ত! আস্তে আস্তে থেতিয়ে থেতিয়ে কথা বলেন। কথায় কথায় একটা 'য়্যাঁ, কী বলেন তাই না!' বলা অভ্যাস, এটা কতকটা যেন আত্মজিজ্ঞাসাই। একটু বিড়বিড় ক'রে আপন মনেও কথা বলেন।

তিনি যে ছেলেদের নাটকের ফরমাশ দিয়েছিলেন প্রথমত সেটাই তাঁর মনে নেই। মুরারিবাবু মনে করিয়ে দিলে এ বইয়ের চলবার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করলেন। ফলে মুরারিবাবুকে আবার একটা জোরালো বক্তৃতা করতে হল। ভরাট জোর গলা তাঁর, আত্মবিশ্বাসে দৃঢ়। এই যুক্তিপ্রয়োগ বোধহয় ইতিপূর্বেও করতে হয়েছে, সবটারই পুনরাবৃত্তি করতে হল।

তখন নূতন প্রশ্ন, পুরুষচরিত্র বর্জিত মেয়েদের নাটক লিখলেই বা কেমন চলে?

মুরারিবাবুর সব দিকেই সমান উৎসাহ। তিনি আর একটি দীর্ঘ বক্তৃতার অবতারণা করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন সত্যেন দত্তের পর একথা আর কেউ ভাবেনি, এই 'ওরিজিন্যাল' থিংকিং-এর জন্যেই মুরারিবাবু জয়ন্ত শীল মশাইকে এত শ্রদ্ধা করেন।

এইভাবে ঘণ্টা দুই কাটাবার পর স্থির হল—এ নাটকটি ছাড়াও একটি ছেলেদের নাটক ও দুটি মেয়েদের নাটক লিখে দিতে হবে। বিষয় স্থির হয়ে গেল, লক্ষ্মণ মেঘনাদ, সীতা আর সাবিত্রী। কপিরাইট—মোট পঞ্চাশটি টাকা দেবেন জয়ন্তবাবু। অবশ্যই বিভিন্ন দফায়।

এবং—

সেই শর্তটাই মারাত্মক। উনি এই লেখাটা বাড়ি নিয়ে যাবেন, পড়ে

দেখবেন, একটু ভাববেন। যদি ভাল লাগে তো এই সব প্রস্তাবটাই কার্যকর হবে, নইলে নয়। দুদিন পরে আসতে হবে সেই অভিমতটা জানতে।

মনটা দমে যাবারই কথা। দমেও গেল। সেটা বোধহয় মুখ দেখেই বুঝতে পারলেন মুরারিবাবু। বললেন, 'আরে না না। আপনি ভাববেন না। এক কথায় রাজী হয়ে যাওয়াটা ওঁর পক্ষে একটু ইয়ে, কী বলে—উনি ভাবেন তাতে বুঝি প্রমাণ হয়ে যাবে, উনি কিছু বোঝেন না। পড়বেন, ভাববেন—তবে তো ওঁর বিচারবুদ্ধি প্রমাণ হবে। ঠিকই নেবেন, নইলে এত কথা বলতেন না। পঞ্চাশ টাকায় চারখানা বইয়ের কপিরাইট কে দেবে? বিশেষ আবার ফরমাশের দৌড়টা দেখলেন তো, মেয়েদের নাটকগুলো চার ফর্মা করতে হবে।'

তবু সন্দেহ ঠিক গেল না। কিন্তু দুদিন পরে দেখা গেল মুরারিবাবুর কথাই ঠিক। যেতে আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বিড় বিড় করে, 'মুম্—কি করব বুঝি না, খরচ তো কম হবে না, চলবে কিনা। মুম্, ভাষা—অবিশ্যি আপনার মন্দ নয়, ছেলেটাকে পড়তে দিয়েছিলুম—সে তো একটা ল্যাঠি নিয়ে আপনার জালিম সিংহের পার্ট করতে লেগে গেল।...তা ও একটা পাগল। মুম্—আচ্ছা যতদূর মনে হচ্ছে ঠাকুরবাড়ির দপ্তরে এক জালিম সিং আছে—এ সে নয়?'

'ঠাকুরবাড়ির দপ্তর?' মুরারিবাবু বিপন্ন ভাবে চান, বিনুর দিকে।

বিনু বাঁচিয়ে দেয় তাড়াতাড়ি। বলে, 'হ্যাঁ, ইউজিন সুর ওআণ্ডারিং জুর অনুবাদ। না না, সে তো উপন্যাসের ক্যারেকটার, ঐ ইহুদীটার রক্ত কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে কত জাতের লোক সে অভিশাপ বহন করছে সেটা দেখাবার জন্যেই একটা ভারতীয় চরিত্র সৃষ্টি করা। এ জালিম সিং তো ইতিহাসের লোক।'

'মুম্—ইতিহাসের লোক বলছেন। অ!'

এমনি আরও বহু বখেড়া ক'রে, অনেক 'মুম্' অনেক 'অ' আর অনেক 'ও' উচ্চারণ করার পর জয়ন্তবাবু একটি ভাউচার বার করলেন, তারপর অনেক কিছু লিখে, ওকে দিয়ে সই করিয়ে পাঁচটি টাকা বার ক'রে দিলেন, বললেন, 'একটা পার্ট পেমেণ্ট নিয়ে যান, আরও কপি আনুন—তারপর সব চুকিয়ে দোব। অবিশ্যি পাঁচ সাত টাকা ক'রেই নিতে হবে। তা মুম্—মারব না, তাড়াতাড়িই দোব।'

হোক অগ্রিম আংশিক, লিখে উপার্জন এই ওর প্রথম। ছবি এঁকে ক' টাকা পেয়েছে, কিন্তু পরে, সুভদ্রার অন্য আচরণে বুঝেছে, সেটা ভালবাসার দান, মূল্যটা ছদ্মবেশ মাত্র।

পাঁচটা টাকা হাতে পেয়ে মনে হ'ল অগাধ ঐশ্বর্য।

লিখে তাহলে সত্যিই টাকা পাওয়া যায়।

ওর খরচের মধ্যে তো দু পয়সার একখানা খাতা, আর একটু কালি। ব্ল্যাকবার্ড কলমটা তো আছেই।

একটা ছুতো করে মুরারিবাবুকে সরিয়ে দিল, তারপর মির্জাপুরের মোড়ে

ইস্টবেঙ্গল সোসাইটিতে এসে ভীড় ঠেলে—দোকানটায় সর্বদাই ভিড় থাকত—প্রথমেই মার জন্যে একখানা থান ধুতি কিনল, ওদের ভাষায় সুপারফাইন—একটাকা দু আনা দিয়ে, তারপর এক নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের (পরবর্তীকালের বিধান সরণি) একটা দোকান থেকে এক টাকা এক আনা দিয়ে নিজের একটা ভাল লংক্লথের পাঞ্জাবী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের তিন নম্বর বাজারের পাশের সরু গলি থেকে দেড় টাকা দিয়ে ঠনঠনের চটি জুতো। তারপরেও অনেক পয়সা রইল দেখে শিয়ালদার মোড় থেকে একটু রাবড়ি কিনে যখন বাড়ি ফিরল—মা রাবড়ি ভালবাসেন—তখনও সেই অগাধ ঐশ্বর্য একেবারে নিঃশেষিত হয় নি।

বিস্ময়ের যেন শেষ থাকে না। সেই একটা কথাই মনে হয়—'লিখে টাকা পাওয়া যায়! সত্যিই পাওয়া যায় তাহলে!'

সে যৌনতত্ত্বের বইও লেখা শেষ হল একদিন। মুরারিবাবু সেদিনও সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন। এ লোকটাকে দেখে কে জানে কেন, ওর গা ঘিনঘিন করে—মনে হয় ওর বুদ্ধিতে বা প্রস্তাবে শুধু নয়, কথায় চাহনিতে একটা ক্লেদ আছে, অবাঞ্ছিত মালিন্য। জয়ন্তবাবু যতই দ্বিধা প্রকাশ করুন, মানুষটা ভাল, ভদ্রলোক। তার কাছে গেলে শারীরিক অস্বস্তি বোধ হয় না।

তবু যেতেই হয়। নইলে মনে হবে বিনু পারল না, যতই বাহাদুরী ক'রে থাক, এসব লেখা লিখতে সে সক্ষম।

তবে এই চতুর বা ধূর্ত মানুষটি আর যাই হোক, কাজের লোক। সময়ের মূল্য বোঝেন।

তিনি পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে তখনই ওলটাতে শুরু করলেন, স্থানে স্থানে এক টানাও পড়লেন চার পাঁচ পৃষ্ঠা করে, বিশেষ ইংরেজী উদ্ধৃতিগুলি বেশ মন দিয়েই দেখলেন, তারপর মুখ তুলে বললেন, 'আমাকে একটু মেরামত করতে হবে। সে তো করতেই হবে, নতুন লেখক—ছেলেমানুষ—তবে চলবে। অচল নয়। তা সামনের সপ্তাহে আসবেন, কিছু দোব।'

প্রথম কথাটায়—অকারণ মুরুব্বিয়ানা সত্ত্বেও বিচলিত হয় নি—এ তো বলতেই হবে, মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করলে বেশী রয়াল্টি দেবার দায় বর্তাবে—সে চটে গেল শেষের কথাটায়। ওকে অত তাগাদা দিয়ে লিখিয়ে এখন 'কিছু' দেবার কথা আসছে কেন, তার সেই কিছুই যদি নিতে হয়, সামনের সপ্তাহে কেন?

হঠাৎ মুরারিবাবুকে সচকিত ক'রে সে বেশ রুক্ষ কণ্ঠেই বললে, 'কিছু যদি দেন, কিস্তিতে, তবে আবার সামনের সপ্তাহ কেন? আজ পুরো কপি আমার কাছ থেকে নিলেন, পড়ে যাচাই করে—কিছুটা আজ দিতে হবে। আমার অন্য কাজ আছে, আমি দিনের পর দিন ঘুরতে পারব না।'

ভদ্রলোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল।

'না দিলে?'

'ঐ ম্যানাসক্রিপ্ট নিয়ে আপনার সামনেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাবো।

বুঝব যে ওটা হাতমক্স করেছি। তাতে হাঁটাহাঁটি করার দায় থেকে তো অব্যাহতি পাবো।'

মুরারিবাবু তো স্তম্ভিত, ওর এই দুঃসাহস দেখে।

সে ভদ্রলোকও এতটা আশা করেন নি।

তিনি কিছুক্ষণ সেইভাবে কৌতুক ও ব্যঙ্গমিশ্রিত দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকারপর গলায় একটা অদ্ভুত শব্দ এনে বললেন, 'হুঁ'! এ যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি দেখছি। বিষ নেই কুলোপানা চক্কর। আচ্ছা এক বিচ্ছু লেখক জুটিয়েছেন তো দেখছি মুরারিবাবু!'

বললেন, কিন্তু বাড়ির মধ্যে গিয়ে একখানা ছাপা কনট্রাক্ট ফর্ম এনে সই করিয়ে দশটি টাকা হাতে দিলেন শেষ পর্যন্ত। বললেন, 'সামনের মাসে এসে আর এক কিস্তি নিয়ে যাবেন।'

সামনের মাসে না দিলেও ক্ষতি নেই—এই তখন বিনুর মনোভাব।

একে তো দশ টাকা অনেক টাকা ওর কাছে, দ্বিতীয়ত এটা ওর একরকম নৈতিক জয়লাভ।

সেকথা মুরারিবাবুও বললেন, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় পড়ে।

'নাঃ, আপনার খুব সাহস আছে, যাই বলুন। মোরাল কারেজ যাকে বলে। আমার এত সাহস হ'ত না। অবিশ্যি আপনার তো এটা ভাত-ভিক্ষে নয়, আমার পাঁচটা টাকা হলে দেড় মণ চাল কেনা হবে।'

মুরারিবাবুর অবস্থা বিনু জানত। এই ভদ্রলোক ওঁকে দিয়ে নানাবিধ কাউকে বলা যায় না এমন কাজ করিয়ে নেন। বর্তমানে এমনি এক ক্ষুধার্ত ফোটোগ্রাফার ও উপার্জনহীন পতিতাদের দিয়ে কতকগুলি অশ্লীল ছবি তুলিয়ে ওঁকে দিয়েছেন, প্রতি ছবি ধরে ধরে কতকগুলি কবিতা লিখিয়ে নিতে। দাম ঠিক হয়েছে, প্রতি কবিতায় দু টাকা, তাতেও চল্লিশ টাকার মতো পাওনা হবে। আগের পাওনা তো আছেই। টাকা দেন দু টাকা এক টাকা ক'রে, যেদিন বেশী হয় পাঁচ টাকা। কিন্তু বেশ কদিন না ঘুরিয়ে দেন না একবারও।

সে বলল, 'আপনার এত খেটে এইভাবে ঘুরে দু টাকা এক টাকা ভিক্ষের মতো ক'রে নিয়েই বা কি লাভ হয়? এতে কি আপনার সংসার চলে!'

'আমার কি জানেন, রাই কুড়িয়ে বেল। সত্যি, যদি মাসে ত্রিশটা টাকাও একসঙ্গে থোক পেতাম—সংসারটা চলে যেত, মাইরি বলছি।'

মুরারিবাবুর যতই দুঃখ থাক—নিজের জীবনে—হতাশা বা ব্যর্থতা, ওঁর পরোপকার প্রবৃত্তিকে ছায়াচ্ছন্ন করতে পারে নি একটুও।

বিনুকে উনি নিজেই স্বেচ্ছায় 'প্রটিজী' ক'রে নিয়েছেন, তার উপকার উনি করবেনই।

সেটা একদিনও বন্ধ নেই।

এর মধ্যে এক পিপলাই লাইব্রেরী ধরেছিলেন উনি, মুরারিবাবুর দুখানা ছেলেদের বই নিয়েছিলেন ভদ্রলোক, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিনুর কথা তুলেছেন এবং বিরাট বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে বা বিশ্বাস করিয়ে দিয়েছেন যে,

ইন্দ্রজিৎ মুখার্জি কালে তার বিরাট প্রতিভা প্রমাণ ক'রে দেবে আর সেদিন, অপরিণত বয়সের লেখা প্রকাশ করার দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে পেরেছেন বলে মন্মথ পিপলাই গর্ববোধ করতে পারবেন।

সুতরাং সেখানেও একদিন যেতে হয়।

একটি ছেলেদের নাটক, মহারাণা প্রতাপ তখনই ব্যবস্থা হয়ে গেল—মানে ফরমাশ। আর একটি অদ্ভুত কাজের ভার দিলেন ভদ্রলোক, তিনি নিজে একটি বই লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু খানিকটা লেখার পর আর সাধ্যে বা ধৈর্যে কুলোয় নি, সেইটে শেষ করার ও কিছু সম্পাদন করার ভার দিলেন বিনুকে। বিষয়টা অবশ্য জানা, মহাত্মা গান্ধীর জীবনী, 'ছোটদের মোহনদাস' নাম দিয়েছেন, এক ফর্মা মানে ষোল পৃষ্ঠা ছাপাও হয়ে গেছে। বললেন, নাটকটির কপিরাইটের জন্যে কুড়ি আর এই 'রিভিস্যনে'র জন্য কুড়ি, মোট চল্লিশ টাকা দেবেন।

বিনু রাজী হয়ে গেল। কারণ টাকাটা তার কাছে বড় কথা নয় আদৌ, সে যে লেখার কাজ পাচ্ছে, তার লেখা ছাপা হচ্ছে এইটেই বড় কথা। বিশেষ এই বয়সে ওকে বিশ্বাস করে মন্মথ পিপলাই সম্পাদন ও সংশোধনের কাজ দিয়েছেন—এতেই তার আনন্দের সীমা নেই, মন্মথবাবু এক পয়সা না দিতে চাইলেও সে ক'রে দিত।

অবশ্য দিয়েছিলেন এঁরা। জয়ন্ত শীল মাস দুইয়ের মধ্যে বিভিন্ন কিস্তিতে পঞ্চাশ টাকাই শোধ করেছিলেন, যদিও ওর মধ্যে মাত্র দুখানা ছেপেছিলেন, তারপর ব্যবসার সাধই তাঁর মিটে গেল, ব্লাডপ্রেসারের দোহাই দিয়ে চাটি বাটি তুলে দিয়ে বাড়িতে গিয়ে বসেছিলেন। বলা বাহুল্য সে পাণ্ডুলিপি আর ফেরৎ পাওয়া যায় নি। দেব দেব ক'রে যখন খুঁজতে শুরু করেছিলেন তখন তা বোধ হয় কীটদষ্ট, তিনি খুঁজেও পান নি আর, দুঃখ প্রকাশ করে বারকতক 'মুমু' 'তাইতো' বলে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তবে বিনু দুঃখ বোধ করেনি একটুও।

ওসব লেখার কীই বা মূল্য, যাওয়াই ভাল।

টাকা মন্মথবাবুও দিয়েছিলেন, তিন কি চার কিস্তিতে।

কেবল আদায় হয়নি সেই ধূর্ত ভদ্রলোকের কাছ থেকে পুরো টাকাটা।

সেই দশ টাকার পর একবার পাঁচ আর একবার দুই—ওয়াদার ত্রিশ টাকার মধ্যে মোট এই সতেরো টাকা পেয়েই খুশী হতে হয়েছিল।

সেদিন পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলার প্রস্তাবটা বোধহয় ভদ্রলোক ভোলেন নি, সেটার শোধ নিলেন, ওর জুতো ছিঁড়িয়ে। অন্তত চল্লিশ দিন হাঁটাহাঁটি করেছে—তাতেও বাকী টাকা মেলে নি।

তখন আর করবার কিছু ছিল না।

সে বই ছাপা হয়ে লেখক হিসেবে জনৈক সন্ন্যাসীর (কল্পিত) নাম দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এ বই যে ওরই লেখা বা এ বাবদ কিছু টাকা পাওনা আছে সেটা প্রমাণ করবে কেমন ক'রে।

লিখিয়ে নেবার যা কিছু তিনিই লিখিয়ে নিয়েছেন, বিনুকে কিছু লিখে

দেন নি। বিনুর অত মনেও হয় নি।

তা হোক, মোটের ওপর সৎলোকের সংখ্যাই বেশী, একটা অসৎ লোকে কি যায় আসে।

বেশী লোভ করতে গিয়ে মুরারিবাবুর লেখা বইয়ের দায়ে জেল খাটতে তো হল!

তাতেই তৃপ্তি ওর। তেরো টাকা না পেয়ে কি আর সে ভিখিরী হয়ে গেছে!

মুরারিবাবু অনেক কাগজ বার করেছিলেন, কোনটা বা সাপ্তাহিক, কোনটা বা মাসিক, কোনটার সঙ্গে সম্পাদনার সম্পর্ক, কোনটায় বা শুধুই লেখা যোগাড় করা ও কিছু এটাওটা লেখার কাজ—ছাগলের তৃতীয় ছানার মতো খাদ্যে বঞ্চিত হয়ে শুধুই নেচে বেড়ানো। এসব কাগজের প্রাথমিক রসদ অর্থাৎ টাকা সংগ্রহ করার জন্য বিস্তর হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে—প্রকাশের পূর্বে তো বটেই, পরেও। সকলের চেয়ে বেশী পরিশ্রম ঘোরাঘুরি উনিই করেছেন—অথচ পাওনা হয় নি বিশেষ কিছুই, যাও বা দু'চার টাকা পেয়েছেন কখনও-সখনও—বোধহয় তাঁর ট্রাম বাস ভাড়াতেই বেরিয়ে গেছে। একটা গালাগালির মাসিক বার করিয়েছিলেন—সাহিত্যিক ব্যঙ্গবিদ্রূপ—তার দু সংখ্যার একটি লেখা বিনুর—বাকী সব লেখাই মুরারিবাবুকে লিখতে হয়েছে। কিন্তু ঐ কাগজ থেকে একটি পয়সাও পান নি, বরং যিনি সামান্য কিছু টাকা দিয়েছিলেন তিনি অনেকবার নালিশ করার ভয় দেখিয়েছিলেন লোকসানের টাকাটা আদায়ের জন্যে।

এসব কাগজে বরং সুবিধা হয়েছিল বিনুরই।

আগেও এমন কাগজের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, সে খবর ও রাখে না। ওর সঙ্গে পরিচয়ের পর কোন কাগজের সূচনা বা সম্ভাবনা মাত্রেই আগে এসে ওকে বলতেন, 'এবার খুব একটা ভাল গল্প ধরেন, সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে চাই।' কিংবা প্রথম সংখ্যার 'প্রথম গল্প আপনার থাকবে' ইত্যাদি।

কিন্তু বিনু সম্বন্ধে মুরারিবাবুর শ্রদ্ধা বা প্রীতি যে কত গভীর, কত সত্য, কত দৃঢ়মূল ছিল তার পরিচয় পেতো এইসব গল্পের বেলাই।

সব গল্প সব সময় ওতরায় না, যে গল্প সত্যিই খুব ভাল হ'ত—সে গল্প পড়ে প্রায়ই ফেরৎ দিতে আসতেন। বলতেন, 'এ কি করেছেন! না না, এমন ক'রে এত ভাল ল্যাখাটাকে নষ্ট করবেন না। এ গল্প প্রবাসীতে ছাপা হলে তবে এর যোগ্য মর্যাদা পেতেন, নিদেন ভারতবর্ষ হলেও বহু পাঠক পেতেন। এ কাগজে কটা পাঠক পাবেন। নতুন কাগজ স্বল্প পুঁজি—কখানাই বা ছাপবে। ছাপলেই বা কত বিক্রী হবে। এক হাজার পাঠকও পাবেন না। না, না, আপনি আমাকে আর একটা অন্য ল্যাখা দ্যান।'

বিনু ফেরৎ নিত না। বলত, 'আপনার ভাগ্যে ভাল লেখা উতরে গেছে, আপনিই নিন। ভাল গল্প বেরোলে আপনারই মুখ থাকবে। ভারতবর্ষ প্রবাসী আমার গল্প ছাপবে কেন বলুন। আজ অবধি সাহস ক'রে পাঠাতেই পারি নি। আপনি নিন।'

নিয়েছেন, খুব অনিচ্ছায়। ছাপা হওয়ার পরও আপসোস করেছেন, এমন গল্প নষ্ট হয়ে গেল বলে। দু-তিনবার—এইসব গল্প যা মুরারিবাবুর মতে

'ক্লাসিক রচনা'—একটা কাগজে ছেপে তৃপ্তি হয় নি, ওরই মধ্যে, ওঁর পরিচিত গণ্ডীর ভেতর যে কাগজের কিছু বেশী পাঠক সংখ্যা আছে বলে জানতেন—সেই কাগজে আরও একবার ছেপেছেন ঐ পুরনো লেখাই।

বলেছেন, 'কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করলাম। তবু, যদি দু-তিনশো পাঠক বেশী পান, মন্দ কি!'

শুধু প্রকাশক মহলে বা সাময়িক পত্রিকার মহলেই পরিচিত করেন নি মুরারিবাবু, এক বিখ্যাত সাহিত্যিক আড্ডায় নিয়ে গিয়ে, বড় বড়—তখনকার দিনের অগ্রগণ্য বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বিনু তারপর থেকে সেখানে নিয়মিত যেত। সেটা একটা প্রধান সৌভাগ্য বলে মনে হয় আজও।

বিনুর দুর্ভাগ্য সে ওঁর কাছ থেকে স্নেহ ও সাহায্য দুহাত ভরে নিয়েই গেল, ওঁর কাজে আসতে পারল না। তার সে অবস্থা হবার আগে মুরারিবাবু—অপরাজেয় অপরাজিত মানুষটি—হঠাৎ একদিন চলে গেলেন। একেবারেই অকালে।

অনেক ব্যর্থতা, অনেক হতাশা—বহু অকারণ শত্রুতা ও ঈর্ষার মধ্যে অল্প যে দু'তিনটি লোকের আন্তরিক স্নেহ ও প্রশ্রয় ওকে জীবনের পাথেয় জুগিয়েছে, আশার আলো জেলে সাফল্যের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে—মুরারিবাবু তার মধ্যে অন্যতম, প্রথম ও প্রধান।

॥ ৪৩ ॥

সে-বছর নভেম্বরের প্রথমেই বিনুর দাদা উপার্জনের একটি নতুন পথের সন্ধান দিলেন; সন্ধান নয়, প্রস্তাবই দিলেন।

তিনি এই ক'মাসেই ভাইকে বিলক্ষণ চিনে নিয়েছিলেন।

এর মধ্যে দুটো চাকরির পরীক্ষায় জোর ক'রে বসিয়েছিলেন—একটা, সেক্রেটারিয়েটের লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কশিপের আর একটা, টেলিগ্রাফের কি কাজ। একটার শুরু পঁয়তাল্লিশ টাকায়, আর একটার ষাট।

পরীক্ষা তো দিতেই হবে। কিন্তু অনেক কৌশলে পাস করার, মানে তালিকার গোড়ার দিকে নাম থাকার দায় এড়িয়ে গেল সে। তবে সেটা ওর দাদার অনুমান এড়াতে পারে নি। ও যে ইচ্ছে ক'রেই পরীক্ষায় এগিয়ে যেতে পারেনি—না যাওয়ার চেষ্টাই বেশি করেছে—সে বিষয়ে বোধহয় ওর নিজের থেকেও দাদা নিশ্চিত ছিলেন।

এর পর এ-চেষ্টা করা নিরর্থক।

তবে খুচরো উপার্জনের চেষ্টা হয়ত করতে পারে—এই ভেবেই এ-কথাটা পেড়েছিলেন।

এই সময়টা বহু স্কুল-পাঠ্য বইয়ের প্রকাশক ইস্কুলে-ইস্কুলে প্রতিনিধি পাঠান—যার চলতি নাম ক্যানভাসিং। প্রতিনিধিদেরও বলা হয় ক্যানভাসার। এরা নিজেদের বইয়ের ঢাক পিটে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে তাদের বই-ই সবচেয়ে ভাল, এবং এইটেই পাঠ্য করা উচিত।

এ-কাজে জেলাওয়ারি লোক যায়, প্রকাশকদের সামর্থ্য অনুযায়ী। ছোট হলে দুই জেলার ভার একজনকে দেওয়া হয়, বড় জেলা হলে একজনই যায়। এরাই স্কুলে-স্কুলে ঘোরে, নিজ নিজ এলাকা ধরে। যেসব প্রকাশকদের অল্প কয়েকখানা বই ভরসা—মানে শিক্ষাবিভাগ থেকে অনুমোদিত বই—তাঁরা বেশি লোক পাঠাতে পারেন না, অন্য কোন এমনি স্বল্প পুঁজির প্রকাশক পেলে—যাঁদের সঙ্গে স্বার্থসংঘাত ঘটবে না—দুজনে মিলে লোক পাঠান, অন্যথায় গোটা বাংলাদেশ ধরে চার-পাঁচজন লোক ঠিক করেন, তারা মোটামুটি বড় ইস্কুলগুলো ঘুরে চলে আসে।

এদের পারিশ্রমিক স্থির হয় কাজের পরিমাণ হিসেব ক'রে নয়—প্রকাশকের সামর্থ্য ও ঔদার্য অনুসারে।

এক-একজন আছেন তাঁরা ধরেই নেন, এরা সবাই চোর আর ফাঁকিবাজ। বিল এলে প্রতিটি পাইপয়সা ধরে ধরে হিসেব করেন এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, এ-খরচার প্রতিটি দফাই অন্যায় বা অসত্য!

কেউ কেউ বা চুক্তিতেও দেন। বই ধরাতে পারলে বই-পিছু স্কুল পিছু বইয়ের দাম হিসেবে দুই থেকে চার টাকা। দশ আনার রীডার ধরালে দু টাকা, দু টাকার ট্র্যান্সশ্লেশন বা বীজগণিত হলে চার টাকা। আবার আড়াই টাকার 'এসে' বই ধরালেও দু টাকা, কারণ সে-বই সবাই কিনবে না।

যাদের একেবারে ঘরে হাঁড়ি-সিকেয়-তোলা অবস্থা, তারা এইসব অপমান বা অবিচার সহ্য ক'রেও দুর্মুখ সন্দিগ্ধ প্রকাশকদের কাছে ঘোরাঘুরি শুরু করে—পুজোর আগে থেকেই।

রাজেন বিনুকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি যে-প্রকাশকের কথা বলছেন, তাঁরা এরকম নন। টাকাকড়ির ব্যাপারে কৃপণও নন, সন্দিগ্ধও নন। তাঁদের বইও অনেক, বেশির ভাগই চালু। এত হিসেব করার দরকারও হয় না, সময়ও নেই।

আরও বললেন, নভেম্বরের মাঝামাঝি রওনা দিতে হবে, ডিসেম্বরের আট-দশ তারিখ পর্যন্ত ঘুরলেই চলবে। খরচ-খরচা ছাড়া তাঁরা পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেবেন।

পঞ্চাশ টাকা! সে যে অপরিমেয় ঐশ্বর্য!

অচিন্তিত, কল্পনাতীত অঙ্ক।

তবে ওর কাছে যেটা টাকার চেয়েও বড় কথা—ওর মন নেচে উঠল যে কারণে, এর মধ্যে একটা মুক্তির আহ্বান আছে, কলকাতার বাইরে না-দেখা দেশ দেখার সম্ভাবনা আছে।

সে তখনই রাজী হয়ে গেল। টিউশ্যনী আছে? থাক। নভেম্বরের মধ্যে মোটামুটি পড়ানো হয়েই যাবে, কারণ, ঐ মাসের শেষের দিকেই পরীক্ষা। ক্রীশ্চান ছাত্রটির জন্যেই চিন্তা, তবে তার বাবা আশ্বাস দিলেন, 'এতদিন পড়ে যদি তৈরি হতে না পারে তো কি আর এই কদিনেই পারবে? তুমি চলে যাও। তবে এ-এক মাসের মাইনে দেব না।'

অনাবশ্যক বোধেই বিনু মনে করিয়ে দিল না যে, ইতিমধ্যেই দু মাসের মাইনে বাকি পড়ে গেছে তার।

একদিন দাদার সঙ্গে গিয়ে পরিচয় ক'রে আসার পর বিনুকে তিনদিন যেতে হ'ল।

বিরাট কারবার এঁদের। প্রকাশক তো বটেই, ইস্কুল কলেজের পাঠ্যবই অনেক, তার মধ্যে কতকগুলি বেশ চালু, তবে তার চেয়েও বড় এবং বেশী পরিচিত পুস্তকবিক্রেতা হিসেবে। মানে অন্য প্রকাশকদের বই রেখে বিক্রী করেন, বিলিতি আমেরিকান বড় বড় প্রকাশকের বই পাইকিরিও বেচেন। বরং এই ব্যবসাটাই প্রধান, বস্তুত, যাকে বলে ফলাও।

কদিন হাঁটাহাঁটি ক'রে আর অনেকক্ষণ ধরে বসে থেকে বিনু দেখল, এত বড় ব্যবসা কিন্তু চলে কতকটা আপনা-আপনিই। স্টক ভাল বলে—বিশেষ ইংরেজি বইয়ের—বড় বড় অধ্যাপকরা বাঁধা খদ্দের, তাঁরা নিজেরাই এসে অনেক সময় খুঁজে পেতে বই বার ক'রে অনেক সাধ্যসাধনায় ক্যাশমেমো করিয়ে নিয়ে যান। এইরকম খদ্দের ওঁদের ভারতব্যাপী। সব কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাই বাঁধা খদ্দের একরকম।

মালিকরা দুভাই এই ব্যবসা দেখেন। বড় যিনি—তিনি দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আড্ডা দেন, তাঁদের বুদ্ধি যোগাবার ও কাজের ভুল ধরবার স্বেচ্ছাকৃত দায়িত্ব নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। খদ্দর পরেন, নস্যি নেন, আদর্শ মানব হিসেবে সেই নস্যির অসংখ্য রুমাল ও নিজের খাটো ধুতি নিজে কাচেন। ব্যবসাটা তাঁর কাছে একটা তথ্য মাত্র—তুচ্ছ।

ছোট ভাই আধা-সন্ন্যাসী, তিনিও কাচা খুলে খদ্দর পরেন, জামা গায়ে দেন না, নিরামিষ খান। কতকটা জ্ঞানতপস্বী গোছের, ভাল ভাল মূল্যবান বই কোথায় প্রকাশিত হ'ল বা হচ্ছে তার খবর রাখা ও প্রকাশমাত্রে সংগ্রহ করাটা তাঁর নেশা, অধ্যাপকরা ভাল বইয়ের খবরাখবর তাঁর কাছেই জানতে চান, মতামত নেন—এইটেই তাঁর প্রধান গর্ব, বই বার ক'রে বা সংবাদ জানিয়েই তিনি খুশি, টাকাটা আসছে কিনা এসব অনাবশ্যক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান না।

এঁদের প্রকাশন বিভাগের ভার আগে যাঁর হাতে ছিল, তিনি খুব নাকি চৌকোশ লোক। এই যে চালু বই সব প্রকাশিত হয়েছে, বইয়ের প্রচার ও কাটতি হচ্ছে, বড় বড় হেডমাস্টার ও অধ্যাপকের দল বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে হাঁটাহাঁটি করেন—এ-সবই নাকি তাঁর অবদান। খেটেছেন খুব, কিন্তু কর্তাদের অর্থ জিনিসটা সম্বন্ধে প্রকট ঔদাসীন্য দেখে তিনি নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মন দেবেন, সেটা স্বাভাবিক। হাজার ষাটেক টাকার কি একটা গোলমাল ক'রে তিনি একদা সরে পড়েছেন। এখন এই বিপুল প্রকাশনা বিভাগের ভার যাঁর হাতে এসে পড়েছে—সুরেনবাবু, তিনি আগে সামান্য কেরানী ছিলেন, পরে ক্যাশমেমো কাটার কাজ করছিলেন, তা থেকে একেবারে এই বিরাট কাণ্ডকারখানার মধ্যে এসে পড়ে হকচকিয়ে গেছেন।

এটা এক বছর আগের ঘটনা। কিন্তু বিনু দেখলেন তাঁর সে-বিস্ময়-বিহ্বলতা এখনও কাটে নি। এখনও কাজটা কোন দিক দিয়ে ধরবেন, বোঝার চেষ্টা করবেন, এখনও ভেবে পাচ্ছেন না।

ভদ্রলোক পান-জর্দা খান, সর্বদাই মুখে সেটা থাকে বলে কথা কম বলেন।

কেউ এলে বিশেষ বিনুর মতো কর্মপ্রার্থী, ফস ক'রে একটা কাগজ টেনে নিয়ে এমন মনোনিবেশ করেন যে মনে হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তু কোন কাজ বা লোক সম্বন্ধেই তাঁর কোন জ্ঞান নেই। কাজটা এতই জরুরি আর জটিল—যে আর কোনদিকে মন দেওয়া সম্ভব নয়।

ফলে বিনু আসে, ঘণ্টাখানেক বসে থাকে—তারপর এক সময় শোনে—পান-দোক্তারুদ্ধ কণ্ঠ থেকে—'আমি তো এখনও কিছু ঠিক করতে পারি নি, আপনি বরং পরশু একবার আসুন।'

অর্থাৎ কাজটা হবে কিনা, ওকে দেবেন কিনা, সেটাও স্থির হয় না।

এ এক অসহ্য অনিশ্চয়তা। আশা-নিরাশায় ছটফট করে বিনু। কেবল ওর দাদা অভয় দেন, 'দেবে দেবে, তোকে দেবে ঠিক। বড়কর্তা আমার সামনে ডেকে বলে দিয়েছেন, এ আমাদের একবার খুব ভাল কাজ করে দিয়েছিল—আগের দত্তমশাই বলেছেন—এর একটি ভাই আছে, তাকে একবার ট্রাই দিয়ে দেখুন—সে-কথা অমান্য করতে সাহস হবে না। এটা শুধু তোকে দেখানো, বড়কর্তার কথাই যে উনি মান্য করবেন তা নয়, আসল কর্তা উনি—উনি যা ঠিক করবেন, তাই হবে, সেইজন্যেই ঘোরানো।'

অবশ্য তাই হ'ল। চতুর্থ দিনের দিন সেই অবশ্যম্ভাবী বা অনিবার্য, যাই বলুন—কাগজ থেকে মুখ তুলে তেমনি দোক্তার রস বাঁচিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এর আগে কোথাও গেছেন, কোন জেলায়? ও, এ-কাজই কখনও করেন নি, না?'

বিনু চুপ ক'রে থাকে। এ-সবই বলা হয়ে গেছে এর আগে।

'কাজটা কি বোঝেন তো?'

'হ্যাঁ। আমার দাদা বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

'অ। তা বেশ। যান। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এই দুটো জেলা ক'রে দেখুন। এই আমাদের মহিমবাবু আছেন, উনি আপনাকে বই, ক্যাটালগ, স্কুলের লিস্ট, টাকা সব বুঝিয়ে দেবেন। মহিমবাবু ইনি আমাদের নতুন রিপ্রেজেণ্টেটিভ, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ করবেন—আপনি সব বুঝিয়ে দিন।'

অতঃপর মহিমবাবুর পালা। তিনি একদিনও ঘোরাবেন না, তা সম্ভব নয়। তিনি পরের দিন আসতে বললেন। তবে লোকটি সুরেনবাবুর থেকে ঢের বেশি কর্মঠ। এইসব বাবুদের ঝট করে নতুন লোক নিয়োগ করা যে কেবল তাঁদের পাপের ভোগ বাড়াতে—এ-কথাটা বারকতক শোনালেও, কাগজপত্র, বই, কার্ড ইত্যাদি সব নিপুণভাবে বুঝিয়ে দিলেন। নমুনা বই যা পাঠাতে হবে তার নাম লিখে রিক্যুইজিশ্যন ফর্ম হেডমাস্টারকে দিয়ে সই করিয়ে ডাকে দেবে বিনু, এঁরা এখান থেকে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠাবেন, বই ঘাড়ে ক'রে ওকে যেতে হবে না। আপাতত ত্রিশ টাকা দিলেন, হাতে কিছু থাকতে যেন চিঠি লেখে, এঁরা কেয়ার অফ পোস্টমাস্টার মানি অর্ডার করবেন।

বিলোবার জন্যে বই ঘাড়ে ক'রে যেতে হবে না ঠিকই—কিন্তু নমুনা এক কপি ক'রে যা সঙ্গে দিলেন—বাইরে এসে একটা দোকানে ওজন করাল ও—সাড়ে উনিশ সের, অর্থাৎ একটা হাল্কা ফাইবারের সুটকেসে নিলেও আধমণের

ওপর হয়ে যাবে। এইটে হাতে ক'রে এক স্কুল থেকে আর এক স্কুলে যেতে হবে।

বিনু তখন জানত না, পরে জেনেছিল, এত বই অবশ্য কেউই সঙ্গে নেয় না। কয়েকখানা বাছাই-করা বই মাত্র নিয়ে ক্যাটালগ ভরসা ক'রেই যায় বেশির ভাগ, অন্য কোন বই কোন মাস্টারমশাই দেখতে চাইলে, মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বলে, 'ও বইটা, মানে—ঠিক সঙ্গে নেই স্যার, (কিম্বা আমি আসার সময় বাঁধা ছিল না, কিম্বা বাসায় ফেলে এসেছি ভুলে)—তা তার জন্যে চিন্তা কি, আমি লিখে দিচ্ছি, তিন দিনের মধ্যে ডাকে এসে যাবে।'

কোন কোন সুজন মাস্টারমশাই হয়ত মন্তব্য করলেন, 'না—ইয়ে, যদি একেবারেই চলবার মতো না হয়, মানে আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ডের সঙ্গে না মেলে—আবার একটা বই নষ্ট করবেন!'

ক্যানভাসার মশাই একখানি জিভ কেটে বলবেন, 'ছি ছি, কী বলছেন। আপনাদের দিলে বই নষ্ট হয়! পাঁচজন তো উল্টে দেখবেন। সেই তো লাভ।'

আরও জেনেছিল পরে—চোখেই দেখেছিল—যেসব প্রকাশকরা বই সঙ্গে দেন প্রয়োজনমতো দিয়ে আসার জন্যে, মানে যাঁদের অনুমোদিত বই সংখ্যায় কম—তাঁরা হেডমাস্টারমশাইদের সই-করা রসিদ নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন, কিন্তু ক্যানভাসারমশাইরা তাঁদের চেয়ে ঢের চালাক, হেড-মাস্টারমশাইদের নিজে হাতে লিখতে না দিয়ে শশব্যস্তে নিজেই বইয়ের নাম লিখে সই করার জন্যে ফর্মটা এগিয়ে দেন—ওবলাইজ করতেই অবশ্য—তারপর স্বাক্ষর আর পূর্বে লেখা নামের মধ্যের ফাঁকটা অন্য দামী বইয়ের নাম দিয়ে ভরাট করলে কে দেখছে।

অবশ্য এঁদের অসাধু বা অসৎ বলবে না বিনু। যে ব্যবহার এরা পায়, যে কৃপণতা, যে সামান্য পারিশ্রমিকে কাজ করতে হয়—খোরাকীর জন্যে পনেরো আনা কি চৌদ্দ আনা মাত্র দৈনিক বরাদ্দ যাদের—আত্মরক্ষার জন্যেই তাদের এ-কাজ করতে হয়। উপায় কি!

পাড়াতে ওদের এক বন্ধু ছিল, তার ডাক নাম নাকি বীণা, বিনু বলেই ডাকত সবাই। ওর সহপাঠী নয়, সহপাঠীদের বন্ধু হিসেবে সৌহার্দ্য। শুনেছিল বীণার কে আত্মীয় বহরমপুরে আছেন।

বীরভূম পরের কথা, সেখানে বোলপুর শহরে দাদার এক বন্ধু থাকেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করলে খবরাখবর, পথের নিশানা পাওয়া যাবে। কিন্তু মুর্শিদাবাদে কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে কিছুই তো জানে না। মুর্শিদাবাদের সঙ্গে পরিচয় তো ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে। খোসবাগ লালবাগ ভগবানগোলা কাঁদী সবই নামমাত্র পরিচয়—আসল মুর্শিদাবাদের তো কোন খবরই রাখে না।

সে অনেক ভেবেচিন্তে বীণার কাছেই গেল।

সে বললে, 'আরে। ঠিকই তো এসেছিস। আমি ছাড়া কার কাছে যাবি। আমার জামাইবাবুরই তো হোটেল রয়েছে, মস্ত বড় হোটেল, খুব নামকরা। তুই সেখানে গিয়ে ওঠ, আমি চিঠি দিয়ে দিচ্ছি, জামাইবাবুই বাকি সুলুক-সন্ধান দিয়ে দিতে পারবেন।'

দাদা সালার স্কুলের এক হেড পণ্ডিত মশাইয়ের নামে চিঠি দিয়েছিলেন। নৃসিংহ পণ্ডিতমশাই নাকি বিখ্যাত লোক, দাদা যেখানে পড়াতেন, সে-বাড়ির গুরুদেব (যদিও সালার কোথায় বিনুর কোন ধারণা নেই, এই প্রথম নাম শুনল) আর সেই ছাত্রের বাবাই একখানা চিঠি দিলেন কাঁদীর রাজবাড়ির—আসলে পাইকপাড়ার সিংহ-রাজাবাবুদের নাকি এইটেই দেশ ও রাজধানী—এক শরিকের কাছে।

এই তিনটি চিঠি ভরসা ক'রে একদা অতি সামান্য শয্যা—ঐ যা কেষ্ট সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিল আর এক নিরুদ্দেশ যাত্রার দিন এবং একটি পাতলা সম্ভবত পাটের র‍্যাপার সম্বল ক'রে একটি নবক্রীত দুটাকা দুআনা দামের ফাইবারের সুটকেসে সেই সাড়ে উনিশ সের বই নিয়ে আর একটি অপর একজনের কাছ থেকে চেয়ে আনা ফাইবারের সুটকেসে সামান্য দু-একটা জামা-কাপড়, আয়না-চিরুনী নিয়ে রাত এগারোটার ট্রেনে কোন এক অজ্ঞাত বহরমপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হল, যেখানে পাগলাগারদ আছে, এই মাত্র শোনা ছিল। পরে অবশ্য দেখল, পাগলরাও সে-স্থান ত্যাগ করেছে।

ভোরবেলা বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে পেঁছিয় এই ট্রেনটা, রাত চারটে নাগাদ। এখান থেকে আর কটা স্টেশন পেরিয়ে লালগোলায় গিয়ে এর যাত্রা শেষ হয়।

অত ভোরে, অঘ্রান মাসে তখনও অন্ধকার থাকে, কোথায় যাবে? স্টেশনেই বসে থাকবে বলে স্থির করেছিল খানিকটা, একটু ফরসা হলে শহরের দিকে রওনা দেবে। বীণা বলে দিয়েছিল, 'স্টেশন থেকে শহর এক মাইলেরও বেশি, তবে ভেবো না, এক আনা থেকে ছ-পয়সা সওয়ারী নেয় ঘোড়ার গাড়িতে—দাঁও বুঝে। একেবারে হোটেলের দোরে নামিয়ে দেবে। স্টেশনে সব সময়েই গাড়ি পাবে।'

কিন্তু সেই একটু বসে আলো ফুটলে যাওয়াটা হয়ে উঠল না, এই ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ানদের জন্যে। প্যাসেঞ্জার নামল সামান্যই—তাদের সংখ্যার চেয়ে গাড়ির সংখ্যা বেশি, সুতরাং যাদের যাত্রী হল না, তারা প্ল্যাটফর্মের ভেতরে চলে এসে, যাকে বলে ছ্যাঁকাবাঁকা করে ধরা, তাই ধরল। খাগড়া হিন্দু বোর্ডিং? তাদের বিশেষ জানা, মুড়ির কাছে—পাশেই একটা বড় গাড়ির আড্ডা, মস্ত বড় বাড়ি, তোফা জায়গা, একেবারে সেখানে গিয়েই যখন বাবু বিশ্রাম করতে পারেন তখন মিছিমিছি এখানে বসে মশার কামড় খাওয়ায় লাভ কি? এর পর আর গাড়ি পাবেন না, সেই সাড়ে আটটায় ভোরের গাড়ি আসবে কলকাতা থেকে, তখনও পর্যন্ত বসতে হবে।

অগত্যা উঠে পড়ল। ছ-পয়সা সওয়ারী একজন বলেছিল, আর একজন তার মুখের কথা লুফে নিয়ে বলল, সে পাঁচ পয়সাতেই যাবে, তার ভাল ঘোড়া, পাঁচ মিনিটে পেঁাছে দেবে। আর দরদস্তুর করতে ইচ্ছে হল না তখন, তখনও ভাল ক'রে ফরসা হয়নি, পূর্ব দিকটায় শুধু আলোর আভাস জেগেছে—একেই বুঝি ব্রাহ্মমুহূর্ত বলে—কিন্তু হোটেলের দোরে পেঁাছে যখন পাঁচটি পয়সা বার করে দিতে গেল, তখন একেবারে অন্য মূর্তি গাড়োয়ানের।

'এ কি দিচ্ছেন বাবু। তামাশা পেয়েছেন নাকি!'

'কেন, তুমিই তো বললে পাঁচ পয়সা সওয়ারী !'

'বেশ তো, আপনি তো পুরো গাড়িটাই নিয়ে এসেছেন, অন্য সওয়ারীর জন্যে তো দাঁড়াই নি—আমরা কাছারীর টাইমে সাত-আটজন পর্যন্ত বসাই—তা আপনি যেটা লেহ্য—চারটে সওয়ারীর ভাড়া দেবেন তো। নেন, নেন—পাঁচ আনা বার করেন, সক্কালবেলা ক্যাচাকেচি ক'রে বউনিটা নষ্ট করবেন না।'

বিনুর মেজাজ গেল বিগড়ে, সেও গলা একেবারে সপ্তমে তুলল। ধুন্দুমার ঝগড়া বেধে গেল দু'জনে। কিন্তু মুশকিল বাধল, গাড়োয়ান হয়ে গেল দলে ভারি। সত্যিই হোটেলের গায়ে একটা গাড়ির আড্ডা ছিল, খান চার-পাঁচ গাড়ি, সেইমতো কটা ঘোড়াও আছে। তারা বোধহয় অনেক রাত্রে নেশাভাঙ ক'রে শুয়েছে, এখন এই আকস্মিক চেঁচামেচিতে অকালে ঘুম ভেঙ্গে তাদেরও মেজাজ খিঁচড়ে উঠেছে, তারা রীতিমতো রুখে এল ওর দিকে, চালাকি পেয়েছ, গরিব গাড়োয়ানের পয়সা মেরে দিতে চাও !

খুবই বিপদে পড়ত—যদি না সেই সময়েই হোটেলের মালিক চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে আসতেন। তিনি নিমেষে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললেন, 'এ বেটাদের রকমই এই। ঐখানে যদি কথা বলে নিতেন, ঐ প'চ পয়সাতেই আসত, এখন তো আর সাড়ে আটটার আগে কোন গাড়ি নেই। দিন দু গণ্ডা পয়সা ফেলে দিন। যদি না নিতে চায় চলুন আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে বাকী পয়সাটা থানায় গিয়ে জমা দোব। একবার আমার এক খদ্দেরের সঙ্গে এমনি চেঁচামেচি করতে গিয়ে এক বেটা বেত খেয়েছিল—বোধহয় ভোলে নি।'

বেশ প্রশান্তকণ্ঠেই বললেন তিনি, কিন্তু এদের তখন সুর বদলে গেছে। কাকুতি মিনতি করে আর দুটো পয়সা চেয়ে নিয়ে চলে গেল।

বীনা বলেছিল, মস্তবড় 'পেল্লাই হোটেল'।

বিনু দেখল বাড়িটা পেল্লায় বটে, তিন মহল বিরাট বাড়ি, দিক-দিশা নেই, কিন্তু আসলে হোটেলটি খুবই ছোট। ভেতর মহলে গঙ্গার দিকে একতলার দুখানা ঘর নিয়ে হোটেল, এটাকে ভাতের দোকান বলাই উচিত। ডে-বোর্ডারের সংখ্যাই বেশী, তাও সকালে খায় পঞ্চাশ ষাট, রাত্রে প'চিশ ত্রিশ। এখানে কেউ বিশেষ এসে থাকে না, কদাচিৎ কোন তেমন মক্কেল এলে—দেদার ঘর পড়ে আছে, ষষ্ঠীবাবু যে-কোন একটা খুলে দেন। কেউ নিষেধ করারও নেই, ভাড়া চাইবারও নেই। আসলে এটা মহারাজারই, ওঁকে মহারাজরা কেয়ারটেকার হিসেবেই রেখেছেন। গোটা বাড়িটা সাফ রাখা সম্ভব নয়—ষষ্ঠীবাবু ওঁর ভাষায় এরকম এমার্জেন্সীর জন্যে দু-তিনটে বার-বাড়ির দোতলার ঘর ঝাঁট দিয়ে ঝুল ঝেড়ে রেখে দেন। এর বেশী আর হয় না, বাড়িতে রং চুনকাম স্মরণকালের মধ্যে হয়েছে বলে মনে হয় না। নিচের ঘরগুলো গঙ্গার ধারে বাড়ি বলে একটু বরং স্যাঁৎসেঁতে। ভিজে ভিজে ভ্যাপ্‌সা গন্ধ।

বিনুকে যে ঘরখানায় থাকতে দিলেন তাতে সেভেন এ' সাইড ফুটবল ম্যাচ খেলা যায়। অতবড় ঘরে সে একা, রাত্রে সম্বলের মধ্যে পয়সায় দুটো মোমবাতি, তার ক্ষীণ আলো বাতাসে কেঁপে ঘরের অপরপ্রান্তে আলোছায়ায় একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করে। মনে হয় কতকগুলো অশরীরী প্রাণী নড়া-চড়া

করছে। এখনই হয়ত ভূতের গল্পের সেই 'তাদের' মতো খল খল হাসি শুরু করবে।

বিনু ভীতু নয়, কাশীতে মণিকর্ণিকা ও হরিশচন্দ্র ঘাটে মড়া পুড়তে দেখেছে বহুদিন, ছোটবেলায় পুরীতে গিয়েছিল, শ্মশানের ওপরই বাড়ি—সুতরাং ভয়টা অনেক কেটেও গেছে। তাছাড়া এমনিও এসব ওর মাথায় আসে না বিশেষ, কিন্তু এখানে এই এতবড় ঘরের একপ্রান্তে একটি শীর্ণতম মোমবাতির সামান্যতম আলোয় আলোর চেয়ে অন্ধকারটাকেই যেন বেশী প্রকট ও জীবন্ত ক'রে তুলত, ভয় যে করত তা অস্বীকার ক'রে কোন লাভ নেই। ভাগ্যে পাশেই এই গাড়ির আড্ডাটা ছিল, যখন ভয়ে পাগলের মতো হয়ে উঠত তখন ছুটে গিয়ে বড় জানলাটার গরাদেতে মাথা চেপে ধরে প্রাণপণে ওদের দিকে চেয়ে থাকত—ওদের মাতলামি, ঝগড়া বিবাদ খিস্তি খেঁউড় শুনলে তবু মনে হ'ত—মৃত্যুপুরী বা প্রেতপুরী নয়। জীবন্ত মানুষের মধ্যেই আছে। বেঁচে আছে সে।

অসুবিধা আরও ঢের। প্রাভাতিক হাল্কা হওয়ার কাজগুলো সারতে গেলে তিন মহল পেরিয়ে নিচে একতলায় ঐ হোটেল অংশে যেতে হ'ত। রাত্রে 'সে' ইচ্ছা প্রবল হলে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ত। একটু মুখ হাত ধুতে গেলেও তাই। ওপরে কোন জলের ব্যবস্থা নেই, স্নান অনেকটা চড়া ভেঙ্গে গিয়ে গঙ্গায়। আসলে এটা ওদের অনধিকার প্রবেশ। ঘর খুলে দেওয়াটা বেআইনী, বেশী ব্যবহার করতে সাহসে কুলোত না ষষ্ঠীবাবুর।

তবে ইন্দ্রজিৎবাবু যে কি গৌরবের মধ্যে আছেন, সে বিষয়ে সর্বদা সচেতন করে দিতে ষষ্ঠীবাবুর চেষ্টার অন্ত ছিল না। সকালে রাত্রে সামান্য সামান্য যা দেখা হ'ত তাতেই একবার ক'রে বলে দিতে ভুল হত না।

'এ বাড়ি বড় সাধারণ নয় বুঝলে ভাই, তুমিই বলছি, ছোট শালার বন্ধু, কিছু মনে করো না—মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পৈতৃক বাড়ি এটা। ইনি তো হঠাৎ মহারাজা হয়ে গেলেন—মহারাণী স্বর্ণময়ীর ভাগ্না হিসেবে, মহারাণীর তো ছেলেপিলে ছিল না। অল্প বয়সে স্বামী মারা গেলেন, কোম্পানী একটা মিথ্যে ছুতো ক'রে অপমান করেছিল এই ধিৎকারে—তবে তাই বলে ইনিও যে একেবারে গরিব ছিলেন না, এই বাড়ি দেখেই তো বুঝছ। ঐ যে ঘরে তুমি আছ, দ্যালে দেখবে বসুধারার দাগ। শ্রীশ নন্দীর অন্নপ্রাশনে—কী বলে ঐ বসুধারা আঁকা হয়েছিল। তবেই বুঝে দ্যাখো। সরকারের উচিত এ বাড়িতে পাথর বসিয়ে দেওয়া—মণীন্দ্র নন্দীর মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তি বাংলা কেন, ভূভারতে আর কেউ জন্মেছে! কী বলো। আমরা ছোঁচা জাত, হাত চিত করতেই জানি, যেন তেন প্রকারেণ কিছু পেলেই হল, হাত উপুড় করতে শিখিছি কি!'

কিন্তু বিনুর মনে হ'ত—বিরাট প্রাসাদের এই অরণ্য থেকে অব্যাহতি পাওয়ার মতো সুখ কিছু নেই। প্রতিটি রাত কাটত কোনমতে চোখ বুজে পড়ে থেকে, বাতি জ্বালা ছেড়েই দিয়েছিল, তাতে আরও ভয় করে।

অন্ধকারের একটাই রূপ—আলো জ্বাললেই ছায়ার সৃষ্টি হয়, সে শতেক ভয়াবহ কল্পনার আকার নেয়।

বহরমপুরে ছিল তিনদিন, এখানকে কেন্দ্র করে যতগুলো স্কুল সারা যায় সেরে নিয়েছিল। অনেকে আছেন—এই কদিনেই দেখল, বইয়ের স্যুটকেসেই একটা গামছা আর লুঙ্গি ভরে নিয়ে, আর একটা বইয়ের বড় গাঁঠরি অন্য হাতে ঝুলিয়ে একদিক থেকে ঘুরতে ঘুরতে যান, যেখানে সন্ধ্যা হয় সেখানে একরকম জোর ক'রে বোর্ডিং-এ একটু শোবার জায়গা ক'রে নেন, নিতান্ত না হলে ইস্কুলেরই কোন খালি ঘরে পড়ে থাকেন। এসব জায়গায় প্রায় সব স্কুলেই বোর্ডিং আছে, সুতরাং দুবেলার আহারটা ওখান থেকেই চলে যায়। স্নান কদাচিৎ, কাপড় কাচার বালাই নেই। ওরই মধ্যে যাঁরা একটু 'সম্পন্ন' তাঁরা ঐ স্যুটকেসেই আর একপ্রস্থ কাপড় জামা রাখেন, সুযোগ পেলে কোন বোর্ডিং-এ পেঁছে সন্ধ্যাবেলাই কেচে দেন (অনেক সময় ছেলেদের কাছ থেকেই একটু সাবান চেয়ে নিয়ে)। শীতের দিন, রাত্রেই শুকিয়ে যায়।

এভাবে কাজ করতে বিনু পারবে না। মনে হয় এত কৃপণতার দরকারও হবে না। যাঁরা এভাবে ঘুরছেন, তাদের সকলকারই 'কোম্পানি' যে খরচের টাকা নিয়ে কৃপণতা করেন তাও না—তবে টাকা জিনিসটা এমনিই যে যথেষ্ট পেলেও সাধ মেটে না, আরও পেতে ইচ্ছে করে।

এখান থেকে বেরিয়ে রাধার ঘাট দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে একদিন সকালে কাঁদী রওনা হল। ওপারে গিয়ে শুনল, একটি বাস ভোরবেলা—ছটায় ছেড়ে গেছে, আর একটি ছাড়বে দুপুর নাগাদ। সে দুপুরটা কখন হবে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিলই, এখন দেখল এতটা সেও অনুমান করতে পারে নি। এগারোটায় প্রথম যাত্রী চাপিয়ে গাড়ি ছাড়ল দুটো নাগাদ। যতজন যাওয়ার কথা, তার ওপর ন'জন বেশী নিয়ে। কুড়ি মাইল কি আঠারো মাইল পথ—ঠিক এখন মনে নেই—পথে আরও ক'জন যাত্রী তুলে কাঁদীতে যখন নামিয়ে দিল তখন চারটে বেজে গেছে। হেমন্তের সূর্য অনেক আগেই বড় গাছগুলোর ছায়ায় ঢলে পড়েছে।

কাঁদী রাজবংশের অনেক শরিক, সে জটিলতায় সে তখনও যায় নি, পরেও যাবার চেষ্টা করে নি। কর্তাদের মধ্যে একজনই মাত্র কান্দীতে থাকেন—গোবিন্দকে ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে আরাম করতে রাজী হন নি। বিনুর চিঠি ছিল তাঁর কাছেই—সে চিঠি আগে বাইরের কাছারী ঘরে দেখাতে একটি বয়স্ক ভদ্রলোক, সম্ভবত নায়েব বা ঐ জাতীয় কোন কর্মচারী হবেন, তিনিই চিঠিখানা পড়ে আগেই পাশের একটা ঘর দেখিয়ে দিলেন। বিশাল জোড়া দুটি চৌকিতে একটা 'সপ' পাতা—বোঝা গেল এক বা একাধিক এমন অতিথি আসেনই—সেই জন্যেই এখানে একটা বাঁধা ব্যবস্থা করা আছে। পরে জেনেছিল, এটা এমনি চিঠি-নিয়ে-আসা সাধারণ অনাহূত অতিথিদের জন্যে, এমন নাকি আরও আছে, তেমন ভিড় হলে কাছারি বাড়িতেও স্থান দিতে হয়—বিশিষ্ট যাঁরা, অভ্যাগত, বা আমন্ত্রিত, তাঁদের জন্যে দোতলায় বাথরুমওয়ালা ভাল ঘরের ব্যবস্থা আছে, বিছানা মশারি সবকিছুই আছে সেখানে।

ইনি কিন্তু শুধু ঘরই দেখিয়ে দিলেন না, হাঁকডাক করে গাড়ু জল সব আনিয়ে দিলেন, ভেতরের বারান্দায় মুখ হাত ধুতে বললেন, একটু পরে জলখাবারের ব্যবস্থাও হল। দুটি নিমকি ও দুটি রসগোল্লা, চা খাবার অভ্যাস আছে কিনা সেটাও জিজ্ঞাসা করে গেল ভৃত্যটি।

এইখানেই এ-পর্বের ইতি হবার কথা, হল না।

অতিথি সাধারণ, রবাহূতও নয়—একেবারেই অনাহূত, কতকটা অনুগ্রহ-প্রার্থী, নিরাশ্রয় লোক, রাজবাড়িতে আশ্রয় নিতে এসেছে—কিন্তু দেখা গেল, কাঁদী রাজবংশের সৌজন্যবোধ সাধারণ নয়। বোধ করি সেই লালাবাবুর আমল থেকে অথবা দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আমল থেকেই এ-বংশের এটা বিশেষ শিক্ষা।

এখানে অতিথিদের অবারিত দ্বার—অন্তত তখনও পর্যন্ত ছিল—তাই কর্মচারী ভদ্রলোক (নায়েব বা অন্য কিছু তা জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করেছিল বিনুর) চিঠি দেখে কর্তার কাছে না পাঠিয়ে আগেই আতিথেয়তার প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলোয় মন দিয়েছিলেন। তারপর, সম্ভবত ওপরে যথাস্থানে সে-চিঠি গিয়ে পড়েছিল, নিয়মমাফিক, কর্তাবাবুর দিবানিদ্রা ভঙ্গ হতে।

সন্ধ্যার সময় ময়লাপড়া হ্যারিকেনের আলোয় বসে বিনু একখানা বিলিতি গোয়েন্দা কাহিনী পড়ছে, হঠাৎ দেখল, ভেতরের দালানে বৃহৎ একটা আরাম-কেদারা পড়ল, পা রাখার একটি টুল এল, সামনে একটা রং-চটা ভারি কাঠের চেয়ার একজন এসে ঝেড়েমুছে রেখে গেল। তারপর এল একটা গড়গড়া, চারিদিকে সুগন্ধি তামাকের সৌরভ আমোদিত ক'রে।

যে-লোকটি শেষে এসেছিল, গড়গড়া নিয়ে সে এসে অকারণেই হাতজোড় ক'রে জানাল, কর্তাবাহাদুর আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।

ওর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন কুমারবাহাদুর, বা রাজাবাহাদুর।

বিনুর তো হৃৎকম্প একেবারে।

ভৃত্যটি জানাল, এঁদের এই নিয়ম, অতিথি-ফকির এলে এঁরা নিজে এসে দেখা করেন।

একটু পরেই ভদ্রলোক নামলেন। একটু বেঁটে ধরনের পাকা আমটির মতো উজ্জ্বল গৌরবর্ণের একটি বয়স্ক ভদ্রলোক। চুল সব পাকা না হলেও ছাঁটা গোঁফ ধপধপ করছে সাদা।

ঘরের মধ্যে এসে হাতজোড় ক'রে নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'আসুন, বাইরে এই দালানটায় বসি, শুনলুম আপনার সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস নেই, বন্ধ ঘরের মধ্যে তামাকের ধোঁয়ায় কষ্ট হতে পারে।'

পায়ে হাত না দিলেও বিনু অনেকখানি হেঁট হয়ে প্রতিনমস্কার জানাল, তারপর বলল, 'আমাকে আর আপনি বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন!'

খুব সহজ গলায় তিনি বললেন, 'বেশ তো, তুমিই বলব। তাই বলাই তো উচিত, তুমি আমার হয়ত নাতির বয়সী। তবে অভ্যাগত যিনি আসেন, তাঁদের প্রথমে আপনি বলাই তো বিধি, নইলে তিনি অসম্মান বোধ করতে পারেন। ধন

না থাক, ধন অপবাদটা তো আছে, আমাদের অনেক ভেবেচিন্তে চলতে হয়।'

বাইরে এসে ওকে কাঠের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে নিজে ভারি চেয়ারটায় বসলেন, তারপর ফরসীর নলটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'আপনি ডাক্তারবাবুর চিঠি নিয়ে এসেছেন? ওঁর সঙ্গে কী সূত্রে আলাপ হল? আত্মীয় নাকি? না, আপনি তো ব্রাহ্মণ।'

বিনু সত্য কথাই বলল, 'আমার দাদা ওঁর ছেলেকে পড়ান, প্রাইভেট টিউটার।'

'অ। আমার গুরুভাই উনি। আত্মীয়ের বাড়া।'

তারপর এ-কথা ও-কথা খুচরো আলাপেই সে-পর্ব শেষ হওয়ার কথা, বিনু হঠাৎ ওঁদের বংশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা তুলল। সে ছোটবেলায় মার সঙ্গে বৃন্দাবন গেছে, কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির দেখেছে, ওখানে প্রসাদের চমৎকার ব্যবস্থা, এমন আর কোন মন্দিরে নেই—গোবিন্দ মন্দিরের ব্যবস্থা তো খুবই সাধারণ—ইত্যাদি বলতে সিংহমশাইয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ফরসী রেখে সোজা হয়ে বসে বললেন, 'বাঃ, তুমি তো দেখছি অনেক কিছু জানো, তোমার অবজার্ভেশন শক্তিও তো খুব। পড়াশুনোও আছে দেখছি। তা তুমি—মানে এখানে দু-একজন আরও ক্যানভাসার এমনি এসেছেন তো, কেউ চিঠি নিয়ে, কেউবা কোন সুপারিশ ছাড়াও—আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে, তাদের সঙ্গে কথা কয়ে—না বাবা, মন ভরেনি। লেখাপড়ার লাইনে আসার উপযুক্ত নয় তারা। তা তুমি কতদূর পড়েছ?'

বিনু এই প্রশ্নটারই আশংকা করছিল, ঘাড় হেঁট ক'রে জানাল, নানা কারণে কলেজে ভর্তি হয়েও বেশি দিন পড়া হয় নি। যা পড়েছে নিজে নিজেই।

'আহা' মুখে একটা সমবেদনাসূচক চুক চুক শব্দ করে—সিংহমশাই বললেন, 'বেচারী। তোমাদের মতো ছেলেরই তো পড়া দরকার বাবা। অনেকদূর যেতে পারতে। যাই হোক, কলেজে না পড়েও লেখাপড়ার পাট যে উঠিয়ে দাও নি, এই ভাল।' তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'বৃন্দাবন এত ভাল লাগে তোমার, বৈষ্ণব সাহিত্য কিছু পড়েছ—।'

'দেখুন, বৈষ্ণব সাহিত্য তো বিশাল, অত বই পাইওনি হাতের কাছে, আর চেয়েচিন্তে পড়ব সে-সময় বা অতটা ঠিক ইচ্ছেও বোধ করি নি। এমনি পুরাণ-গুলো পড়েছি সব, পাড়ার লাইব্রেরীতে ছিল, মহাভারত হরিবংশ তো বাড়িতেই আছে, পড়েওছি ভাল করে, এছাড়া শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল—'

যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন সিংহমশাই, 'য়্যাঁ! তুমি এই বয়সে চৈতন্য-চরিতামৃত পড়েছ! বল কি। তবে তো কেল্লা মেরে দিয়েছ। তা বুঝেছ বইখানা।'

'খুব ভাল বুঝেছি বললে একটু বাজে কথা বলা হয়—ভাষাটা বড় গোলমেলে তো, তাছাড়া কথায় কথায় সংস্কৃত কোটেশান, তবু মোটামুটি মহাপ্রভুর জীবনীটা জানবার চেষ্টা করেছি, তাঁর আকুলতা। বরং তার চেয়ে আমার চৈতন্যভাগবত অনেক সোজা বোধ হয়েছে।'

বোধহয় সিংহমশাইয়ের এতটা ঠিক বিশ্বাস হল না। তিনি খুব ভাল

মানুষের মতো ভাব ক'রে কয়েকটি প্রশ্ন শুরু করলেন। ভাগ্যে এই বইগুলো সম্প্রতি, বেকার অবস্থাতেই পড়েছিল, বিনুর টাটকা টাটকা মনে আছে—সে অন্তত প্রমাণ ক'রে দিতে পারল যে, পড়ার ব্যাপারে কিছু মিথ্যে বলে নি। আরও খুশি হলেন উনি, যেখানে যেখানে মহাপ্রভুর চরিত্র ওর পরস্পরবিরোধী মনে হয়েছে সে কথা বলতে সেখানে সেখানে বেশ ব্যাখ্যা করার মতোই বুঝিয়ে দিলেন, বা দেবার চেষ্টা করলেন।

তারপর একটু যেন ক্ষোভের সঙ্গেই বললেন, 'যেসব পণ্ডিত আর ভক্তরা এসব ভাল বোঝেন, এককালে তাঁরা ব্যাখ্যা করতেন কথকতার মতো—ইতরলোক, আমাদের মতো সাধারণ লোক উপকৃত হত। এখন ক্রমেই সে-পাট উঠে যাচ্ছে। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, প্রাণগোপাল গোস্বামী এঁরা যখন ব্যাখ্যা করেন, তখন যেন ওঁর বাণী ছবির মতো আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—'

বিনু কতকটা এই প্রসঙ্গে ছেদ টানবার জন্যেই বলল, 'আমি কিন্তু ছেলে-বেলায় বৃন্দাবনে গোপীনাথ মন্দিরে অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর ব্যাখ্যা শুনেছি, ঐ অংশটা ব্যাখ্যা করছেলেন—রামানন্দ সংবাদ, এহ বাহ্য আগে কহ আর। কিছুই বুঝিনি অবশ্য, তখন অত পড়াও ছিল না, তবু ওঁর বলবার ভঙ্গী ভাল লেগেছিল এত, উঠে আসি নি একদিনও।'

'আরে! তুমি ওঁর ব্যাখ্যা শুনেছ। তুমি তো মহাভাগ্যবান দেখছি। তোমাকে দেখলেও পুণ্য হয়।'

ঠিক সেই সময়ে ভৃত্য এসে জানাল, বিনুর খাবার জায়গা হয়ে গেছে, ঠাকুর নিয়ে আসছে।

কর্তাবাবু যেন মহাবিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রেই খাবার আনছে! দেখছিস আমি কথা কইছি ওঁর সঙ্গে। যাকগে—যা, ঠাকুরকে বলে আয়—এখনও এবেলার ভোগ সরেনি—সকালের-দুপুরের যা আছে—কিছু কিছু প্রসাদ এই সঙ্গে দিতে। আবার তার সঙ্গে মাছ-টাছ না দেয়। এইখানে আমার সামনে দিতে বল, খেতে খেতে যাতে গল্প করতে পারেন।'

সেই ব্যবস্থাই হ'ল। ভৃত্যমহলে যে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে তা বিনু ওঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতেই টের পেল। সাধারণ অতিথি, নিতান্তই এক ক্যানভাসার—এমন তো ফী বছরই আসে গোটাকতক—সে কি ক'রে, আর কেন অসাধারণ অতিথি হয়ে উঠল সেটা ওদের বুদ্ধির অগোচর।

আসন দেওয়া, ঠাঁই করা সব হল। রুটি ডাল তরকারীর (ভাত খাবে না রুটি খাবে, তা আগেই জেনে গিয়েছিল একজন) সঙ্গে মাটির খুরিতে খুরিতে ও শালপাতায় বিভিন্ন বিচিত্র সব মিষ্টান্ন, নিঃসন্দেহেই প্রসাদ, যে বাসনে মাছ মাংস খাওয়া হয়, সে বাসনে প্রসাদ দেওয়া চলে না—শক্তির প্রসাদ ছাড়া—এটুকু বিনুর জানাই ছিল। সে হাত-মুখ ধুয়ে গিয়ে পায়ে করে আসনটা সরিয়ে থালার সামনে বসে পড়ল, মেঝের ওপরই।

প্রায় তীক্ষ্ম কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কর্তাবাবু—'আসনটা সরিয়ে দিলেন যে! নোংরা মনে হল?'

'না না। নোংরা কেন? এ তো দেখছি সব প্রসাদ এসেছে। আসেন

বসে প্রসাদ পাওয়ার তো বিধি নেই।'

ভিনি ভিডি ভিসি—এই কথাই না বলেছিলেন সীজার?

বিনুরও তাই হ'ল বোধ হয়। কর্তাবাবুর চিত্তজয়ের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, এই এক ব্যাপারেই তা সারা হয়ে গেল। তিনিও চেয়ার থেকে উঠে এসে ওর সরিয়ে দেওয়া আসনটা পেতে নিয়ে সামনে মেঝেতেই বসলেন, তারপর হাঁক-ডাক ক'রে দুটো আলো আনিয়ে সামনে রেখে একটা একটা ক'রে প্রসাদের খুরি দেখিয়ে এ-সব ভোগ কার, কোন্ রানী কবে বরাদ্দ ক'রে গিয়েছিলেন তার ইতিহাস বলে যেতে লাগলেন। একজনের রাত দুটোর সময় উঠে খুব পিপাসা পেয়েছিল, তিনি নিজে একটু মিষ্টি আর জল খেয়ে খুব তৃপ্ত পেয়েছিলেন। ঠাকুরেরও এমনি প্রয়োজন হতে পারে ভেবে, পরের দিনই একটি গ্রাম দেবোত্তর ক'রে দেওয়া হল, গভীর রাত্রে ঠাকুরকে দুটি মিষ্টি আর জল ভোগ দেওয়া হয়। একজন দুধের সর আর মিছরি খেতে ভালবাসতেন, তিনি সেই ব্যবস্থা করেছেন, ইত্যাদি। সে এক লম্বা ফর্দ।

খাওয়া শেষ হলে উঠে দাঁড়িয়ে সিংহমশাই বললেন, 'কাল সকালে চা খাওয়া শেষ হলে একটু তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিও বাবা, আমি তোমাকে নিয়ে নিজে ঘুরে সমস্ত ঠাকুরবাড়ি, আমাদের এখানের যা যা দ্রষ্টব্য আছে সব দেখাবো। কাল তোমার খেতে একটু দেরিও হবে। ইচ্ছে রইল আমাদের একদিনের যতো রকম ভোগ হয়—কাল তার প্রসাদ পাওয়াবো।'

বিনু ব্যস্ত হয়ে ওঠে,—'কিন্তু আমার যে স্কুলগুলো সারতে হবে জ্যেঠামশাই, আজ তো আসতেই বেলা গড়িয়ে গেল, কাল সকালবেলাই বেরিয়ে দূরপাল্লাগুলো সেরে এসে বিকেলে এখানের স্কুলগুলো যাবার চেষ্টা করব।'

কর্তাবাবু শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কোন্ কোন্ ইস্কুল যাবে—আমাদের এখান ছাড়া?'

চার-পাঁচটা নাম বলল বিনু। কর্তাবাবু তেমনি অবিচলিতভাবে বললেন, 'ওর জন্যে তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, হেডমাষ্টাররাই কাল বিকেলে এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। তুমি যে সব ইস্কুলের নাম করলে, অহংকার না প্রকাশ পায়, এমনিই বলছি—ওর কোনটার আমি প্রেসিডেন্ট, কোনটার ভাইস প্রেসিডেন্ট, এখানেও তাই। দুটো স্কুলের সেক্রেটারী।'

'তাঁরা হয়ত আসবেন আপনার ভয়ে, কিন্তু সামান্য একটা ক্যানভাসারের সঙ্গে এসে দেখা করতে হলে মনে মনে চটে থাকবেন না? কাজ যদি খারাপ হয়?'

'সে কথাটাও তাঁদের বলে দেব, তোমার আশঙ্কাটা। বলে দেব, এঁদের কোন বই যদি না ধরানো হয় তাহলে বুঝব এই কারণেই তোমরা ধরাওনি। আমি লক্ষ্য রাখব। না, মনে হয় কাজ ভালই হবে।'

সেইমতোই সব ব্যবস্থা হল, নিখুঁতভাবে। কেবল বিপদে পড়ল প্রসাদ পেতে গিয়ে। এমন কখনও দেখে নি, ভাবতেও পারে নি। থালা ছাড়া বাটি খুরি মিলিয়ে শতাধিক। হাত বাড়িয়ে টানা মুশকিল বলে ছোট একটি

আঁকশির মতো জিনিসও দেওয়া আছে পাশে। ব্যঞ্জনের বিশেষ কোন গৌরব নেই, তার মধ্যে মুলোই প্রধান—তবে সেও সংখ্যায় বড় কম নয়। সংখ্যা আর স্বাদ বলতে মিষ্টিই বেশী—পায়েস, ক্ষীর, লাড্ডু, প্যাঁড়া, সন্দেশ ইত্যাদি, অগণিত।

সে সব খাওয়া সম্ভব নয়। একটু একটু ঠুকরে মুখে দেওয়াই অসম্ভব প্রায়। একেবারে অস্পর্শিত সরিয়ে দেওয়া যায় না, প্রসাদের অমর্যাদা হবে, সিংহমশাই সামনেই বসে আছেন তার উপর।

ঐ একটু ক'রে ভেঙ্গে খেয়েই এমন অবস্থা হ'ল—সে রাত্রে তো কিছু খেতে হ'লই না, পরের দিন পর্যন্ত তার জের টানতে হল। আহারেই অরুচি হবার উপক্রম।

মুর্শিদাবাদ ভ্রমণের মধ্যে কাঁদীর এই প্রায়-অবিশ্বাস্য অভ্যর্থনা ছাড়া আর একটি স্মরণীয় ঘটনা খাস মুর্শিদাবাদ শহরেই ঘটল।

ওখানে দুটি অবাঙ্গালীর মহত্ত্বের স্মৃতি ওর সারা জীবনের পাথেয় হয়ে আছে। লোকের দুর্ব্যবহার, অকারণ ঈর্ষা ও বিদ্বেষে যখন জীবনটা তিক্ত ও বিষাক্ত মনে হয় তখন এই একদিনের একটি অতি তুচ্ছ ঘটনা স্মরণ হলে আবার যেন মনে বল ফিরে আসে, মনোবল ও বিশ্বাস, মনে হয় পৃথিবীতে সজ্জনও তো আছে, তবে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাবে কেন?

মুর্শিদাবাদে তখন হোটেল বলতে কিছু ছিল না। কোর্ট-কাছারী আপিস-দপ্তর সব বহরমপুরেই। লালবাগ নামটা শব্দে বেশ ভারী হলেও এখানে কাজকর্ম কম। সাহেব-সুবোরা এলে নবাববাড়ির অতিথি হতেন, অফিসাররা এলে ডাকবাংলো প্রশস্ত। সে-ই প্রথম, ডাকবাংলোর ব্যাপার বিনু জানত না, কত খরচ অত এঁরা দেবেন কিনা তাও জানা নেই—কাজেই, কেউ বলে দিলেও সাহসে কুলোত না।

অনেক খুঁজে যা বেরোল তা ছোট যে একটা কাছারী আছে তারই কাছাকাছি এক উড়ে ঠাকুরের হোটেল। হোটেল না বলে ভাতের দোকান বলাই উচিত, কারণ দুবেলা বাইরের খদ্দের এসে খেয়ে চলে যায়, থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। বিনু থাকতে চায় শুনে অনেক ভেবে ঠাকুর বললেন, 'তা কত দেবেন?'

বিনু বলল, 'কত চান বলুন।'

'তিন আনা পড়বে।' মুখটা গোঁজ ক'রে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঠাকুর বললেন। এত অবিশ্বাস্য রকমের বেশী ভাড়া চাইতে বোধ হয় লজ্জা করছে, সেই চক্ষুলজ্জা ঢাকতে অন্য দিকে মুখ করা।

বিনুর অবশ্য খুব বেশী তখন মনে হয় নি, সে রাজী হয়ে গেল।

তবে তারপর, ঠাকুরকে সেই স্থানটুকু বার করার জন্যে যে মেহনত করতে হল তা দেখে বরং মনে হল আর কিছু দেওয়াই উচিত।

তখন মুর্শিদাবাদ শহরে (?) ক্লাইবের বর্ণিত 'লণ্ডনের চেয়েও ঘনবসতি' জনবহুল শহর খুঁজে পাওয়া যেত না আর। সে শহর তখন শিয়াল ও বাঘের বাসা অরণ্যে পরিণত হয়েছিল। হোটেলের ব্যবসাতে ঠাকুরের সংসার চলত না, তার সঙ্গে আর একটি 'সাইড বিজনেস' ছিল—দুধের ব্যবসা, ঠাকুর না

মানলেও তাঁর ঘরণীর কথাবার্তায় যা বুঝেছিল, এই ছোট ব্যবসাটাতেই লাভ বেশী। রান্নাঘরের পাশেই গোয়াল, গোটা দুই গরু এবং গুটি দুই বাছুর থাকত।

এর জন্যে খড় কিনে রাখা দরকার। কোথায় রাখবেন? ছোট্ট বাড়ি। নিচু একতলা খড়ের চালের দুটি ঘর, একটিতে রান্না ভাঁড়ার, একটিতে কর্তা গিন্নী মেয়ে থাকে। খাওয়া বাইরের চওড়া দালানে। বর্ষার দিনে বোধ হয় ওঁদের শোবার ঘরই খালি করতে হয়।

কিন্তু খড়ও প্রয়োজন। বাড়িতে ঢুকতেই বাঁ-হাতি একটি ছোট্ট ঘর, তাতে একটা চৌকীও পাতা আছে, কোন এক প্রাচীন যুগে বোধহয় এটা বাড়িওয়ালার বাইরের ঘর ছিল, এখন ঐখানেই খড় থাকে।

তখন বর্ষার দিন নয় বলে বাড়িওলা আর তার গিন্নী সেই কড়িকাঠ সমান খড় টেনে টেনে বাইরে উঠোনে ফেললেন, তারপর শুরু হল ঘরটা ঝাঁট দিয়ে ধুলো ঝুল ঝেড়ে বসবাস-যোগ্য করার চেষ্টা।

সেটা যদি বা একরকম হল, মুশকিল বাধল তক্তপোশ নিয়ে। তার মাঝখানটা ভাঙ্গা, নিচু হয়ে গেছে। জরাজীর্ণ ছিলই বোধহয়, বেশ জোয়ান কেউ, সম্ভবত খড়ওলাই এক লাফে নিচে থেকে উঠতে গিয়ে ঐ অবস্থা করেছে। এখন নিচে থেকে ইট দিয়ে সেখান থেকে উঁচু করে তক্তাপোশের পাশের দিক-গুলোর সঙ্গে সমান করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু দেখা গেল তিনখানা ইঁট দিলে মাঝখানে একটু খোঁদল মতো থেকেই যাচ্ছে, আবার চারখানা ইঁটও দেওয়া যাচ্ছে না, প্রথমত তা দিলে মাঝখানটা উঁচু হয়ে যাবে, দ্বিতীয়ত বা লাগাতে গেলে তাতে চৌকির মাঝের কাঠ আরও খানিকটা ভাঙ্গবে হয়ত।

অনেক চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিয়ে ঠাকুর বললেন, 'এইতেই যা হয় ক'রে চালিয়ে নেন বাবু, যদি বলেন তো দু আঁটি খড় দিয়ে দিই ঐখানটায়।'

তারপর একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, 'বরং আপনার আর ছিট-রেণ্ট বলে কিছু দিয়ে কাজ নেই, দুটো দিন তো—ভদ্দর লোকের ছেলে অমনিই থাকুন।'

'না, না তা কেন। ও একটু গর্ত, তা আর কি হয়েছে। শুতেই যদি পারি আপনার পয়সাটাই বা দোব না কেন। আপনাকেও তো ঘর ভাড়া দিতে হয়।'

'বলুন বাবু। আপনি তাই বুঝলেন। কে বোঝে। বাড়িভাড়া হিসেবে দশটি টাকা ধরে দিতে হয়। তাছাড়া সারাই খরচা আমার। যেখানে দশ পয়সায় মিল একটা, সেখানে দশ টাকা মাসে কামাই হয়—! আপনিই বুঝুন না কেন। নেহাৎ গরু দুটো আছে তাই।'

সে রাত্রি একরকম ক'রে কেটেই গেল। ভোরের দিকে কোমরের যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঐভাবে বেঁকে শোওয়া তো অভ্যেস নেই। তখন মনে হতে লাগল কআঁটি খড় নেওয়াই উচিত ছিল, তবু একটু গদির মতো তো হত। সঙ্গে বিছানা বলতে একটি পাতলা ছেঁড়া কম্বল, কেষ্টর দেওয়া, তার ভরসায় এ ঝুঁকি নেওয়া উচিত হয় নি।

কিন্তু যন্ত্রণার ওই একমাত্র কারণ নয়। মানে ভাল ঘুম না হওয়ার।

ঘরের দরজা একেবারে বন্ধ করা যায় নি, সে রকম ব্যবস্থা নেই। ছিটকিনি আছে, কিন্তু দীর্ঘকাল অব্যবহারে বাজে কাঠ বেঁকেচুরে গেছে, ছিটকিনির লোহাটা চৌকাঠের ফোকরে লাগে না। খিল আছে, খোলা আলাদা খিল, তারও সেই অবস্থা—দুটো পাল্লা ঠিকভাবে না পড়লে তা লোহার দ দুটোয় ঢুকবে কি করে।

ঠাকুর অবশ্য বললেন, 'আপনি ভাববেন না বাবু সদর দরজা বন্ধ থাকে, আর আমি বাইরের দালানে শুই—খুট ক'রে শব্দ হলেই উঠে পড়ব। তাছাড়া এখানে কেউ থাকে না, চোর এবাড়িতে আসবে না। শাঁসালো খদ্দের আসে জানা থাকলে এদিকে নজর রাখত। আর আপনার তো শুনেছি শুধু গুচ্ছের বই—ওর জন্যে চোর আসবে না।'

সেই ভরসাতেই শুয়ে পড়েছিল। তবে সেই রাত আটটা সাড়ে-আটটায় ঘুমনো সম্ভব নয়—নেহাৎ হোটেলওলা বসে থাকবেন বলেই খেয়ে নেওয়া। এখানে খদ্দেররা সব সন্ধ্যে রাত্রে সকাল সকাল খেয়ে সরে পড়ে, রাত আটটাতেই নিষুতি হয়ে যায় চারদিক।

হোটেলের একটা বিকল (তাতে কাগজের তাপ্পি মারা) হ্যারিকেন ও গোটা দুই 'লম্প' ভরসা। তার ওপর ভরসা না রেখে বিনু আগেই একটা ওরই-মধ্যে-মোটা-গোছের মোমবাতি সংগ্রহ ক'রে এনেছিল। তাতেই একখানা ইংরেজী উপন্যাস পড়তে পড়তে বেশ মশগুল হয়ে গেছে—এর মধ্যে কখন ঠাকুর এসে একবার বলে গেছে, 'লণ্ঠনটা কম ক'রে এই চলনে রেখে গেলুম বাবু, যদি ফাঁকায় যেতে হয়—নিয়ে যাবেন।' তাও অত কান দেয় নি। ফাঁকায় যাওয়ার অর্থ প্রাকৃতিক তাগিদে হালকা হতে যাওয়া—সে স্থানটা অবশ্য দূরেই, গোয়ালের পিছনে, আলো নিয়ে যাওয়াই উচিত, কিন্তু সে সবটাই একটা ভাসা ভাসা শুনেছে, জিনিসটা বুঝেওছে, অত মন দেয় নি। উপন্যাসটা বেশ জমে উঠছে, মনটা সেইখানেই।

হঠাৎ, হয়ত রাত আর একটু গভীর হয়েছে, দশটা কি সাড়ে দশটা হবে, বাইরে ঝিঁঝিঁর ডাক আর দু-একটা নিশাচর পাখীর বিশ্রী কর্কশ চিৎকার ছাড়া আর কোন শব্দ নেই—সিরাজের আমলের সেই অগণিত 'পুরসুন্দরীর নুপুর-নিক্বণ' সত্যিই এখন 'মরে গিয়ে ঝিল্লীসনে কাঁদায় যে নিশার গগন'—প্রায় নিঃশব্দে ওর ঘরের দরজা খুলে কে একজন ভেতরে ঢুকল।

ভয় পাবারই কথা—ভূতের ভয় না থাকলেও চোর-ডাকাতের ভয় থাকবে না এমন সম্ভব নয়—প্রথমটা পায় নি তার কারণ মনে হয়েছিল, চোখটা তখনও বইতে আবদ্ধ—ঠাকুরই কিছু বলতে এসেছে। কিন্তু যে ঘরে ঢুকল, বই থেকে চোখ তুলে তাকে দেখে চমকে উঠে বসল।

একটি কিশোরী মেয়ে—ঠাকুরের মেয়ে নয়, তাকে আজ অনেকবার দেখেছে—বছর সাত-আটের বেশী বয়স হবে না তার—এর অন্তত চৌদ্দ, ষোল হওয়াও বিচিত্র নয়। শ্যামবর্ণের ওপর সুশ্রী চেহারা তাতে কোন সন্দেহ নেই, একহারা, গড়ন তবে তার মধ্যেই যৌবন লক্ষণ প্রকট। গরিবের ঘরের খেটে খাওয়া মেয়ে,

অল্পবয়সেই কঠোর শারীরিক পরিশ্রম ও অপুষ্টির চিহ্ন দুটি প্রায়-শীর্ণ হাতের মোটা, বেরিয়ে আসা শিরায় আর ক্ষয়েযাওয়া নখেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তবু, ওরই মধ্যে একটু প্রসাধনের চেষ্টাও আছে, মুখে বোধহয় একটু খড়ির গুঁড়ো কি পাউডার ঘষে এসেছে, টান ক'রে চুল বাঁধা, তাতে সদ্য তেল দেওয়ার চিহ্ন, কপালে একটি কাঁচপোকার টিপ। দুটি আয়ত চোখে ভয়ার্ত অথচ মরীয়ার দৃষ্টি।

ভয়ই পেল সে, বোধহয় সেজন্যেই গলাটাও সহজ করা গেল না কিছুতে।

'কে!'

মেয়েটি কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনার গা হাত পা টিপে দোব?'

'না।' রূঢ় কঠিন হবারই চেষ্টা করে বিনু, 'কিছু দরকার নেই! কে পাঠিয়েছে তোমাকে? এত রাত্রে এখানে এসেছ কেন। আমি এখানে এসেছি তাই বা কে বললে? তুমি এইসব বদমাইশি ক'রে বেড়াও বুঝি?'

ভয়ে মেয়েটার মুখ শুকিয়ে গেল। কিন্তু মনে হল ভয় পেলে তার চলবে না। কোন বৃহত্তর ভয় তার জন্য অপেক্ষা করছে কাছেই কোথাও। সে রাস্তার ওদিকে আঙুল দেখিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'মা আমাকে পাঠিয়েছে। মা এখানে বাসন মাজে। মা দেখে গেছে তোমাকে। আমি—আমাকে দু আনা পয়সা দিলেই আমি সারা রাত তোমার কাছে থাকব, ভোর চারটেয় উঠে পালিয়ে যাবো, এ ঠাকুর মশাই টের পাবে না।'

দু আনা পয়সার জন্যে—সারারাত।

কত দুঃখে বা অভাবে বা রাক্ষসী মায়ের তাড়নায় এ প্রস্তাব দিচ্ছে কে জানে।

খুব কঠিন হওয়াই উচিত ছিল, তবু ঠিক যেন হতে পারে না।

যতদূর সম্ভব গলাটাকে তিক্ত করার চেষ্টা ক'রে বলে, 'তা তোমার মা কোনো বাড়ি কাজে লাগিয়ে দেয় না কেন।'

'কাজ করি তো বাবু। ওই ওধারে মোক্তারবাবু আছে একজন, আর পুলিশের এক দারোগা—দু বাড়িই কাজ করি। মোছা-ধোওয়া বাসন মাজা জল তোলা সব কাজই করতে হয়। মোক্তারবাবু তিন টাকা দেয় তবু, দারোগাবাবু মোটে দুটি টাকা। তাও তাগাদা দিয়ে আদায় করতে হয়। আমি পাঁচ টাকা পাই, মা এখানে দিনভর পড়ে থাকে—মার মতো খাওয়া দেয়—আর চারটে টাকা। কোনদিন কোন বাবুর পাতে পড়ে থাকলে সেই ভাতগুলো মা আমার জন্যে নে যায়।...তা ঠাকুর এমন কিপ্টের মতো চারটি চারটি ক'রে ভাত দেয়'—পাতে থাকে না।'

'তা রাত্তিরে যখন এই কাজই করতে হয়, ঘুমোতে পাও না—কোন বাড়ি দিন-রাতের কাজ নিলেই পারো।'

'সেও দিয়েছিল মা এক বাড়িতে। তারা খেতে দিত বলে মাইনে দিত না। তার ওপর সেও রাত জাগতে হত—আগে দুপুর রাত পর্যন্ত গিন্নীর গা টেপা পায়ে তেল মালিশ করা, তারপর বুড়োকত্তা টেনে নে যেত তার ঘরে—। সে আমার সহ্য হ'ল না বলে পালিয়ে এসেছিলুম।'

অনেক দুঃখের পয়সা, ত্রিশ টাকায় পুঁজি শেষ হয়ে আসছে, সুটকেস কেনা থেকেই শুরু হয়েছে—বাড়ি থেকে বেরোবার আগেই, তবু বিনু একটা সিকিই বার ক'রে দিল। বলল, 'যাও, ঘরে গিয়ে ঘুমোও গে। মাকে বলো দুরাত্তির দাম দেওয়া রইল, আমার যখন খুশি ডাকব। অন্য কোথাও না পাঠায়।'

মেয়েটা তবু যেতে চায় না। জলভরা চোখ তুলে বলে, 'সে মা বিশ্বেস করবে না। উলটে আমাকে মারবে, আমিই পালিয়ে গেছি ভেবে। থাকি না বাবু এখানে। একটু পা টিপে দিই, তারপর এই এখানে মেঝেয় পড়ে থাকব— ?'

'না।' বিনু এবার বিরক্ত হয়ে উঠল। বললে, 'মাকে বলো, আমার দাদা পুলিশে বড় চাকরি করে, এ কাজ যদি বার বার করে, তোমার মার ফাটক হয়ে যাবে, তোমাকে নিয়ে গিয়ে বোম্বে কি কোচিনে কোন আশ্রমে দিয়ে দেবে, তোমার মা আর জীবনে মেয়েকে দেখতে পাবে না।'

এবার খুবই ভয় পেয়ে গেল। যে লোকটা শুধু শুধু দু আনার জায়গায় চার আনা বার ক'রে দেয়, তার জন্যে অন্য কোন দাম না নিয়ে—তার দাদা পুলিশে কাজ করে, সেটা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য। সে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে সেইখানে মেঝের ওপরই হাঁটু গেড়ে বসে একটা গড় ক'রে আস্তে আস্তে যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে গেল।

সেদিন বহু রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারল না বিনু। এই বয়স মেয়েটার—বিয়ে থা ক'রে সংসার পাতবার কথা—নিজের মা তাকে এইভাবে সামান্য কটা পয়সার জন্যে চিরকালের মতো দুর্দশার পথে ঠেলে দিচ্ছে। এমন কত আছে এদেশে, কত লক্ষ কে জানে।

পরবর্তী জীবনেও এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে—কিন্তু ঠিক এতখানি আঘাত পায় নি কখনও। ওর চেহারা হিসেবে আসল বয়সের চেয়ে অনেক বেশী দেখায়। একবার, এই মাত্র সেদিন, তখন দত্তমশাইয়ের হয়ে ঘুরছে—গ্লোব সিনেমার সামনে এক গাড়োয়ান বলেছিল এসে কানেকানে, 'সুইট সিক্সটিন স্যার, ভেরি লাভলি, য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ল স্যার'—কঠিন দৃষ্টি হেনে পাশ কাটিয়ে চলে গিছল, কিন্তু বহু বছর পরে ঠিক ঐ জায়গাতেই একটি শ্যামবর্ণের মেয়ে জ্যৈষ্ঠের দুপুরে দাঁড়িয়ে ঘামছে—একটি প্রৌঢ় মুসলমান এসে কানে কানে বলেছিল, 'ঐ মেয়েটাকে নিয়ে যাবেন বাবু, সিনেমায় নিয়ে যান, চাইকি অন্য কোথাও—লেকের ধারে—যা দেবেন তাই নেবে। ভদ্দর লোকের মেয়ে—ঘরে নিয়ে যেতে পারবে না—। দুদিন এক পয়সাও পায়নি, একেবারে উপোস যাচ্ছে।' তখন প্রথম মনে হয়েছিল লোকটাকে একটা টেনে চড় কষিয়ে দেয়, কিন্তু মেয়েটার দিকে তাকিয়ে, ওর শুকনো মুখ আর ক্লান্ত অথচ উৎসুক চোখের দিকে চেয়ে বিনুর নিজেরই চোখে জল এসে গিয়েছিল, রাগ করতে পারে নি। বরং পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার ক'রে সেই প্রৌঢ়র হাতে দিয়ে বলেছিল, 'তুমি এটা ওকে দাও, আর আজকের মতো বাড়ি চলে যেতে বলো। আমি সন্ধ্যে পর্যন্ত এই পাড়াতেই আছি, আবার যদি দেখি এসে দাঁড়িয়েছে, আমি পুলিশে দোব।'

সে লোকটি টাকা সোজাই গিয়ে মেয়েটার হাতে দিয়েছিল, মেয়েটাও একবার যেন বিস্ময়-বিহ্বল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে তখনই চলে গিয়েছিল, হয়ত বাড়ির দিকেই।

ঠিক এই কারণেই গোপালপুরে মিসেস মুরের হোটেলে—একদিন রাত্রে স্নান-করানো নুলিয়া দুটি অল্পবয়সী মেয়েকে ঘরের মধ্যে এনে হাজির ক'রে জানতে চেয়েছিল বিনুর কাকে পছন্দ—যেটি এই দেশের—ওদের সম্প্রদায়ের মেয়ে তাকে দু টাকা দিলেই চলবে, আর একটি (তার গায়ের চামড়া এক পোঁচ ফ্যাকাসে) নাকি কোন পুরুষে য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছিল কেউ—তার দাম পাঁচ টাকা, তখন তাদের ঘর থেকে বার ক'রে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়েছিল, কিন্তু গত বছরই ওয়ালটেয়ারের নাবিক-পাড়ার এক বড় হোটেলে যে দৃশ্য দেখেছিল তাতে আবারও, এই প্রায় বৃদ্ধ বয়সেও, চোখে জল এসে গিয়েছিল।

বিনু এ হোটেলের ইতিহাস বা ঐতিহ্য কিছুই জানত না। বন্দর বা জাহাজ-কারখানার কাছে বটে কিন্তু তাও অত তলিয়ে বোঝে নি, সমুদ্রের ওপরে সে সময়টায় অন্য কোন হোটেল ছিল না, কাছাকাছি দুটো একটা যা, তার এত পুরনো বাড়ি যে পছন্দ হল না, আর ভাল যেটা তার দৈনিক পঁয়ষট্টি টাকা ভাড়া এক একটা ঘরের, তাও যে ঘর খালি ছিল তা থেকে সমুদ্র দেখা যায় না। এটায় পঁচিশ টাকা ভাড়া, ঘরে শুয়ে সমুদ্র দেখা যায়। তখনই আগাম টাকা দিয়ে ঘরের দখল নিয়ে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়েছিল।

কিন্তু সন্ধ্যা হতেই এর আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল।

সমস্ত বাগান জুড়ে চেয়ার আর টেবিল পড়ল, মদের আসর। খদ্দের সত্তর থেকে ষোল বছরের। ঘণ্টাখানেক পরেই বাচ্ছা ছেলেগুলো মাতলামি শুরু করল। ভেতরের একটা প্রকাণ্ড হলে তথাকথিত নাচের ব্যবস্থা, চল্লিশ থেকে চোদ্দ বছরের মেয়ে ও মেয়েছেলে অগুনতি। ষোল বছরের ছেলে চল্লিশ বছরের স্ত্রীলোকের কোমর ধরে নাচছে। এ মেয়েদের বেশীর ভাগই য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান—বা ইণ্ডো-য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান, মানে হয়ত তিনপুরুষ পূর্বে য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছিল, তার পর বরাবরই তাদের সঙ্গে ভারতীয়দের মিলন ঘটেছে—নামে এখনও য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান বলেই চলছে। এর মধ্যে বাইরে থেকে আমদানী করাও কিছু আছে, যে বয়টা খাবার দিতে এসেছিল তার কাছে শুনলাম, বন্দরের সুনাম রাখতে এরা কেউ এসেছে কেরালা থেকে, কেউ বা সিকিম থেকে। মহারাষ্ট্র মধ্যপ্রদেশও আছে।

সেসব পার্থক্য রাত্রে চেনার উপায় নেই, সকলেই প্রসাধনে বেশভূষায় নিজেদের য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান ক'রে তোলার চেষ্টা করেছে।

বিনুর তখন অবস্থা—ছুটে পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু অত রাত্রে এ পাড়ায় কোন গাড়ি পাবে না, হোটেলই বা কোথায় খুঁজতে যাবে। এদের সার্ভিসও আদৌ ভাল না। যে মদ খায় না বা যৌনসঙ্গিনী খোঁজে না—তার কাছে এদের উপরি পাওনার আশা কম, সেসব খদ্দেরকে এই সেবকদের দল ঘেন্নাই করে। বিকেলে চা চেয়েছিল সে চা সন্ধ্যাতেও পেঁছায় নি। বিছানার চাদর

ছেঁড়া এবং সন্দেহজনক দাগ লাগা। অনেকবার বলা সত্ত্বেও তা পাল্টানো যায় নি। শেষ পর্যন্ত রাত্রের খাবার চেয়েছে— তার জবাবে শুনেছে 'দের হোগা।'

দেখতে দেখতে ছুটোছুটি পড়ে গেল—চারিদিকে। করিডরে দুড়দুড় আওয়াজ, লঘু পদশব্দ কিন্তু সংখ্যায় অনেক। চাপা গলার একটা শব্দ বার বার শোনা গেল, রেড রেড। অর্থাৎ পুলিশ রেড্।

হাসি পেল বিনুর। এ বয়সে সে এমন রেড অনেক দেখেছে।

পুলিশের এক বিশেষ বিভাগ থেকে আসে এরা, আসতেই হয়—নইলে চাকরি থাকে না, উপরি-পাওনাও বোধহয় হয় না। এসব প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ বেআইনী ভাবে যেখানে পৃথিবীর আদিমতম পাপ-ব্যবসায় চালানো হয়— সেখানের ব্যবসায় বন্ধ হলে অনেকেরই নাকি লোকসান। এসব জায়গার উপরি পাওনা দুরকমে হয়, 'ইন ক্যাশ য়্যান্ড ইন কাইন্ড'। এসবই জানা, তবু এদের চাকরি বজায় রাখতেই ওদের অর্থাৎ ব্যবসার চালক ও যন্ত্রদের একটু পালাবার বা লুকোবার অভিনয় করতে হয়।

নিজের ঘরের দোর দেবার জন্যই উঠে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই দমকা হাওয়ার মতো দরজা খুলে ঘরে ঢুকল চারটি মেয়ে। চারটিই অল্পবয়সী, একটি তো খুবই ছোট, পনেরো-ষোল হওয়াই সম্ভব, দেহের গঠনে পূর্ণতা পেলেও মুখ দেখেই বয়স বোঝা যায়, বাকি তিনটিও কুড়ির ওপর যায় নি।

এবং—সাজসজ্জায়—যাকে 'মেক-আপ' বলে—তার জন্যে কতটা কি হয়েছে জানে না, কিন্তু চারটিকেই ঘরের আলোয় সুশ্রী মনে হল—দেহের গঠনে, মুখের লালিত্যে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় চারটি মানব-ফুল। ফুলের মতোই কমনীয়, নিষ্পাপ ধরনের মুখ।

হ্যাঁ, মদের গন্ধও সেই সঙ্গে পাওয়া গিছল বৈকি, তবে সে এদেরই কেউ খেয়েছে কিনা তা জানে না বিনু। অপরকে ঢেলে দেবার ফলও হতে পারে, খাওয়াও বিচিত্র নয়। তবে এদের মুখের দিকে চেয়ে খায়নি ভাবতেই ভাল লাগছিল সেই মুহূর্তে।

বিনু ক্রুদ্ধ হয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, ছোটটি এগিয়ে এসে ওর মুখের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে চাপা গলায় বলে উঠল, 'প্লীজ প্লীজ। লেট আস রিমেন হিয়ার ফর টেন মিনিটস। উই ইমপ্লোর ইউ। দে আর ব্রুটস। দে টর্চার মোস্ট ব্রুটালী। স্পেশালি দ্য টীনেজ গার্লস।'

বিরক্তির সঙ্গে আশংকাও যোগ হল এবার।

বিনু বলল, 'তোমরা মিছিমিছি আমাকে জড়াচ্ছ কেন? মাঝখান থেকে আমাকেও হয়ত য়্যারেস্ট করবে তোমাদের সঙ্গে।'

'না না,' বড় মেয়েদের একটি এবার একেবারে প্রাচীন ভারতীয় প্রথায় হাতজোড় করল—বিপদে পড়লে মেমসাহেবত্ব থাকে না বোধহয়—'হোটেলের কোন রেসিডেন্টের ঘরে ঢোকা বে-আইনী। তাছাড়া তুমি বাইরে থেকে মেয়ে আনতে পারো, তাতে ওদের কিছু বলবার নেই।'

আর একটি মেয়ে আরও অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, 'প্লীজ, মিস্টার, আমাদের এটুকু দয়া করো। টাকা আমাদের ম্যানেজার দেবে—কিন্তু ওরা শুধু টাকা

নিয়েও ছাড়ে না, বড় অত্যাচার করে। এখনই চলে যাবে, আধঘণ্টার মধ্যে, তারপর তুমি আমাদের যাকে খুশী একঘণ্টা এনজয় করো, তোমার কোন খরচ লাগবে না। চাও তো আমরা সকলেই কিছুক্ষণ করে থাকব—কিন্তু ওদের হাতে ধরিয়ে দিও না, ফর গডস্ সেক।'

ওরা চলে গেল দশ মিনিট পরেই। বিনু কাউকেই রাখতে চাইল না বলে আরও ধন্যবাদ দিল। ছোট মেয়েটা তো হাতে চুমাই খেল যাবার আগে—কিন্তু বিনুর সারারাত ঘুম এল না। এই অল্পবয়সী মেয়েগুলো—ফুলের মতো দেখতে—কি অনায়াসেই না নিজেদের ওর সেবায় লাগাতে চাইল। এ-পথে এই প্রায়-নিত্য নির্যাতনের আশঙ্কা জেনেও নিজেদের জীবনগুলো নষ্ট করতে আসে এরা কি জন্যে, কেন? কিসের লোভে? ওদের বাপ-মা পাঠায়? এরা বিদ্রোহ করতে পারে না? আর দুই কি তিন বছরের মধ্যেই এই মেয়েগুলোর শরীর ভেঙ্গে যাবে, খারাপ রোগের ডিপো হয়ে উঠবে। তখনকার কথা কেউ ভাবে না। এরা কি এই পথের অন্য বয়স্কা মেয়েদের দেখে নি, না তাদের পরিণাম বোঝে না?

সত্যি সত্যিই চোখে জল এসে গিয়েছিল বিনুর, বিশেষ ঐ কচি মেয়েটার সেই ভয়ার্ত দৃষ্টি মনে পড়ে।

ওর নিজের মেয়ে যদি এই অবস্থায় পড়ত। বাপরে! ভাবতেই বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে।

টাকা ফুরিয়ে আসছে বুঝেই কাঁদী থেকে কলকাতায় চিঠি দিয়েছিল—দেবেনবাবুকে। কেয়ার অফ পোস্টমাস্টার, মুর্শিদাবাদ এই ঠিকানায় পাঠাতে বলে। তাঁরা টেলিগ্রাফে টাকা পাঠান, সে-কথা বলেই দিয়েছিলেন, টাকার জন্যে কোন চিন্তা যেন সে না করে।

যেদিন এসে পৌঁচেছে এখানে, তার পরের দিন সকাল থেকে স্থানীয় চারটে স্কুল সারতেই কেটে গেল। বিশেষ নবাববাহাদুর ইনস্টিটিউশ্যানের ইংরেজ হেড-মাস্টার কি মিটিং করছিলেন শিক্ষকদের নিয়ে—দুঘণ্টা বসে থাকার পর তবে তাঁর দেখা পাওয়া গেল।

ফলে বড় ডাকঘরে যখন এসে পৌঁছল (ঐ একটিই ডাকঘর ছিল তখন) তখন চারটে বেজে গেছে, তবু পোস্টমাস্টারমশাইয়ের কাছে খবর নিতে গেল একবার।

তিনি অমায়িকভাবে বললেন, 'কী নাম বললেন? ইন্দ্রজিৎ মুখার্জি? হ্যাঁ, এসেছে। আমিই রিসিভ করেছি। কাল সকাল আটটায় এসে নিয়ে যাবেন।'

নিশ্চিন্ত হয়ে হোটেলে ফিরল। সকাল ক'রে খেয়ে শুয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি। আগের দিন ঘুম হয়নি দুই কারণে। বেঁকে শোওয়া, গর্তের মতো জায়গায়, আর ঐ মেয়েটা। আজ ঠাকুর বেশ পুরু ক'রে খড় পেতে দিয়েছেন। কোমরে ব্যথার সম্ভাবনা কম, মেয়েটাও আর বোধহয় আসতে সাহস করবে না।

নিশ্চিন্ত হয়ে শুল। সুনিদ্রাও হল। ভোরে উঠেই স্নান পর্যন্ত সেরে আটটার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নিল। চায়ের পাট নেই, বাইরের একটা দোকান থেকে ঠাকুর নিমকি আর ছানাবড়া এনে দিয়েছে—বেশি করেই খেয়েছে। ইচ্ছে আছে,

যদি টাকাটা এখনই পেয়ে যায়, এদিকে কাছাকাছি ইস্কুলগুলো সেরে ফেলবে। খাওয়ার হাঙ্গামা আর করবে না, এখন থেকে ঘুরলে সবগুলোই হয়ে যাবে। কাল রবিবার নিশ্চিন্ত হয়ে খোশবাগ আর এপারের হাজারদুয়ারী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখে নেবে।

পোস্ট আপিসে গিয়ে দেখল আগের দিনের সে-মাস্টারমশাই নেই, তাঁর জায়গায় আর একটি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী ভদ্রলোক বসে টরে-টক্কা করছেন। তিনি অনেকক্ষণ পরে (বারকতক ওঁকে দেখিয়ে নমস্কার করা সত্ত্বেও) মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, 'কী চাই ?'

তারপর প্রয়োজনটা শুনে বললেন, 'আইডেনটিটি কার্ড আছে ?'

সেটা আবার কি বস্তু ! বিনু তো নামও শোনে নি।

বাবুটি অবশ্য বুঝিয়ে দিলেন, 'কেয়ার অফ পোস্টমাস্টার টাকা পেতে হলে আপনার বাড়ি যে ডাকঘরের আণ্ডারে, সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে আপনার সই আর ফটো সার্টিফাই করিয়ে আনতে হয়। নইলে আমরা কি ক'রে বুঝব যে, আপনিই সেই লোক। এই নামে টাকা আসছে এটা অপরের জানা কিছু আশ্চর্য নয়। আপনি সেই লোক বলে নিয়ে গেলেন, কিছু পরে আর একজন এসে ডিম্যাণ্ড করল। তখন ? যদি আপনি ভুয়ো লোক হন, আমাদের যে চাকরি চলে যাবে।'

কথাটা যুক্তিযুক্ত, কিন্তু বিনু এখন কি করে।

সেই কথাটাই বলল সে, 'দেখুন আমি নতুন লোক, এই বেরিয়েছি। আমার কোম্পানির মালিকরাও একথা বলে দেন নি, বরং বলেছেন, যেমন যেমন, দরকার হবে লিখো, আমরা টি. এম. ও ক'রে পাঠিয়ে দোব।'

'ভেরি কেয়ারলেস অফ দেম। এই তো কত ট্রাভেলার আসেন, তেল সাবান বই সবেরই ক্যানভাসার লাগে আজকাল, সবাই তো নিয়ে আসে। তা আপনাকে চেনে স্থানীয় লোক কেউ আছে ? যে আইডেনটিফাই করতে পারবে ?'

'আমি তো নতুন, কে আমাকে চিনবে বলুন। এক, যে-হোটেলে উঠেছি, সেই ঠাকুরটিকে বলতে পারি। তাকে দিয়ে হবে ?'

'সে যদি সই করতে রাজি হয় আইডেনটিফায়ার হিসেবে তো চলবে। তাকেই নিয়ে আসুন।'

অগত্যা বিনু আবার হোটেলে ফিরে এল। বেশিদূর নয় এই রক্ষা। ঠাকুর তখন একটা উনুনে ভাত আর একটা উনুনে চচ্চড়ি চাপিয়েছে—একাই দুটো উনুন সামলায় সে, স্ত্রী কুটনো-বাটনা দেখে—উনুন সামলাতে পারে না। তবু বলামাত্র, একবার শুধু বিপন্ন মুখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রাজী হয়ে গেল। স্ত্রীকে বললে, ভাতটা যদি হয়ে গেছে দেখিস, হাঁড়িটা নামিয়ে রাখিস, একটু ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিস, আমি এসে ফ্যান গালব। আর চচ্চড়িটা নেড়ে দিস মধ্যে মধ্যে।'

ঠাকুরকে নিয়ে যখন পোস্ট আপিসে এল আবার, তখন আরও একটি বাবু পেঁছেছেন। তিনি বোধহয় খাম-পোস্ট-কার্ড'ও বেচেন, রেজেস্ট্রিও নেন—কিন্তু অকস্মাৎ দুজনেই একেবারে ভিন্ন মূর্তি ধারণ করলেন। বোধহয় এর মধ্যে কিছু

আলোচনা হয়ে গিয়ে থাকবে, নতুন বাবুটিই ঠাকুরকে নিয়ে পড়লেন। 'তুমি যে এঁর হয়ে জামিন দিতে এসেছ—এঁকে চেন ?'

'হ্যাঁ, বাবু দুদিন আমার হোটেলে রয়েছেন, বইয়ের দোকান থেকে এসেছেন—'

'তা তো এসেছেন, এঁর যে এই নাম কি ক'রে জানলে ? তোমার হোটেলে তো খদ্দের যাঁরা থাকবেন, তাঁদের নামের রেজিস্টার খাতা নেই। এ-টাকা যার নামে এসেছে ইনিই যে সেই লোক কি ক'রে জানলে ? ইনি যে খবর পেয়ে এই নাম বলে টাকা নিতে আসেন নি, সে-কথা তোমাকে কে বললে ? এ সরকারী টাকা, যদি গোলমাল হয়, এঁকে তো পাবে না—তোমাকে ধরবে পুলিশে। দ্যাখো ভালো ক'রে, ভেবে দ্যাখো।'

ঠাকুরের মুখ শুকিয়ে উঠল।

ওঠাই স্বাভাবিক। দশ পয়সা ক'রে মিল বেচে কিছুই হয় না ওর। শুধুমাত্র খাওয়াটা চলে যায় এই সঙ্গে—দুধ বেচা টাকা থেকে জামা-কাপড় চালাতে হয়, গতকালই বলেছে সে। যদি দুবেলা একশো ক'রেও লোক খেত—মানে খদ্দের বাঁধা থাকত, দশ পয়সা করে মিল দিয়েও কোঠা-বালাখানা ক'রে ফেলত। এখানে লোক কোথায় ?

বিনু ওর অবস্থাটা বুঝছে বলেই কিছু বলতে পারল না। আবার এমনও মনে হল, খুব যদি চাপাচাপি করে, তাতে হয়ত আরও সন্দেহটাই দৃঢ়মূল হবে ওর, কোনমতে পরের টাকা নিয়ে সরে পড়তে চায়—ভাববে।

দুজনেই বিপন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে, ঠাকুরের ভাবটা কোনমতে এখন পালাতে পারলে বাঁচে, এ-বিপদ থেকে রেহাই পায়, ওখানে এক হাঁড়ি ভাত পুড়ছে কিনা সে-চিন্তাও আছে—বিনু ভাবছে তার সম্বল মাত্র দেড় টাকা, হাতে যা নগদ আছে, এতে কি কলকাতার টিকিট হবে ?—হেমন্তর প্রভাতে এই ঘন অরণ্যময় গ্রাম্য শীতল পরিবেশেও দেখতে দেখতে ঘেমে-নেয়ে উঠেছে সে—এমন সময় কুড়ি ফুট চওড়া প্রধান রাজপথে ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠল।

সকলেই কৌতূহলী হয়ে চেয়ে দেখল, নবাববাহাদুর ইনস্টিটিউশ্যনের সাহেব হেড-মাস্টার আসছেন ঘোড়ায় চেপে—সম্ভবত প্রাতরাশ শেষ ক'রে বেড়াতে বেরিয়েছেন, অথবা ঘুরে গিয়ে সেটা খাবেন।

এদের দিকে তাকাবার কথা নয়, কিন্তু এরা চেয়ে আছে বলেই বোধহয় ওঁর চোখ পড়ল। দু-দুটো লোক বিপন্ন মুখে দাঁড়িয়ে ঘামছে, তার মানে কোথাও কোন গোলমাল বেধেছে। ঠাকুরকে তিনি চেনেন না কিন্তু বিনুকে চিনতে পারলেন। এটাও রীতিমতো বিস্ময়কর ঘটনা, কারণ আগের দিন বিকেলে মাত্র পনেরো-বিশ মিনিটের জন্যে দেখা হয়েছিল। এমন তো এখন কত ক্যানভাসার আসে, ইংরেজ হেডমাস্টারের তার একজনকে মনে ক'রে রাখার কথা নয়।

তিনি কিন্তু বোধ করি কয়েক সেকেণ্ডেই অবস্থাটা বুঝে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন, কাছে এসে বিনুকেই প্রশ্ন করলেন, 'হোয়াটস দ্য ম্যাটার বাবু, ক্যান আই ডু এনিথিং ফর ইউ ?'

মনে হল ওকে বিপন্ন দেখে সাক্ষাৎ ভগবানই পাঠিয়েছেন এঁকে। সে

গতকাল ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে কথা চালিয়েছিল, কিন্তু কালই লক্ষ্য করেছে উনি বাংলা ভালই বোঝেন। সে বাংলাতেই খুলে বলল সবটা। তার অজ্ঞানতা আর সে-জন্যেই বিপদ।

সাহেব আর ওকে কিছু প্রশ্ন করলেন না। একেবারে সোজা পোস্ট-অফিসের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সেই দুটি বাবুকে, দুটি কেন ততক্ষণে পোস্টমাটারও এসে গেছেন, তাঁদের প্রচণ্ড ধিক্কার দিলেন। বললেন, 'কত মাইনে পাও তোমরা, যদি ত্রিশ টাকা গুণাগারই দিতে হয়—তোমরা কি মরে যাবে না খেয়ে! তোমার দেশেরই একজন বাঙ্গালীর ছেলে—বিদেশে এসে বিপদে পড়েছে, একটা অন্য প্রভিন্সের লোক, সামান্য রোজগার করে লোকটা—সে এসে জামিন হতে চাইল—তোমরা তাকেও ভয় দেখাচ্ছ! লজ্জা করে না। গরিব মানুষ, সে যেটা রিস্ক নিতে পারে, তোমরা পারো না!'

সাহেবের তাড়নায় এবার বাবুদের ঘামবার পালা।

তখনকার দিনেই এই হেডমাস্টার মাসিক আটশো টাকা মাইনে পেতেন। বহু এদেশী হেডমাস্টারের এক বছরের আয়। উনি যদি এঁদের নামে ওপর-ওলাদের কাছে রিপোর্ট করেন (রিপোর্ট করার মতো কোন অপরাধ এঁরা করেছেন কিনা, সেটা ভেবে দেখার সময় কোথায়!) তাহলে কত কি হতে পারে, তার কোন স্পষ্ট চেহারাটা ধারণায় না থাকলেও—ঘামবেন বৈকি!

এঁদের সেই বেপথুমানা নববধূর অবস্থা দেখে, আর অতবড় একটা সাহেবকে বিনুর পক্ষাবলম্বন করতে দেখে—এর মধ্যে কিন্তু ঠাকুরটি মনস্থির ক'রে ফেলেছেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'না বাবু আমি সহি দিব, যা থাকে কপালে। তিরিশ তঙ্কার জন্য মরিব না। গরিব মানুষ অছি, গরিবই থাকিব। দেন কোথায় কি সহি দিতে হবে, আমার চুলা খালি যাচ্ছে, আর দাঁড়াতে পারব না।'

দিতে পারলেই তো তখন বাবুরা বাঁচেন, আর দেরি হবে কেন?

॥ ৪৫ ॥

ললিত পড়াশুনোয় মাঝারি ছাত্রদেরও একটু ওপরের দিকে ছিল বরাবরই। প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে যতই মাতামাতি করুক—তার জন্যে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ফেল করবে সে—একথাটা মনে হয় নি একবারও।

যে মেয়েটি সম্বন্ধে ওর বেশী দুর্বলতা, দোলুর কাছেই খবর পায়—দোলুই ওর 'ওয়াকিয়ানিগার-ই-কুল' বা প্রধান সংবাদ-সরবরাহকারক চিরদিন—সে মেয়েটির অবশ্য ইতিমধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে। পাত্রটি ইঞ্জিনীয়ার, সুন্দর দেখতে, ভাল চাকরি করে—তাকে মেয়ে না দিয়ে এক, আই. এসসির ছাত্রর জন্য অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা ক'রে বসে থাকবেন—মেয়ের মা-বাবা অবশ্যই তেমন বোকা নন। দেখা গেল মেয়েটিও সে সম্বন্ধে একেবারে ভাবাবেগমুক্ত। সে নাকি ললিতকে বলেই দিয়েছে, 'এসব একটু-আধটু যা করি, সে এই পর্যন্তই ভাল। জীবনের মতো ঘর বাঁধব যার সঙ্গে, আমাকে বইবার শক্তি তার কতটা তা দেখে নেব না!'

এতে মন ভাঙ্গা স্বাভাবিক। তবে এ পুরো ঘটনাটাই তো পরীক্ষার পর ঘটেছে। তার জন্যে পরীক্ষা খারাপ হবে কেন?

আসলে পড়াশুনো থেকেই মনটা সরে গিয়েছিল বোধহয়।

কিন্তু সে যা-ই হোক, নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে বিনুর কোন দ্বিধা কি সংশয় ছিল না।

যা নিঃস্বার্থ ও ঐকান্তিক ভালবাসা, তার মধ্যে আঘাতের বেদনা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রত্যাঘাতের কি প্রতিহিংসার তৃপ্তি নেই। বিপদের দিনে ভালবাসার পাত্রের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধ সান্ত্বনা দিয়ে বাস্তবের রূঢ়তা থেকে, কষ্ট থেকে অপমান থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করাতেই—যে ভালবাসে তারও অন্তর ভরে ওঠে।

বিনুর খবরটা পেতে কোন অসুবিধা হয় নি। যে যার কলেজে খবর নিতে গিয়েছিল, ললিতদের কলেজের পরীক্ষার্থীরাও গেছে। তাদের মধ্যে যারা উল্লাসে লাফাচ্ছে তাদের একজনকে ধরে ললিতের খবর জিজ্ঞাসা করতেই দুঃসংবাদটা পাওয়া গেল। সে উচিত-মতো একটা বিষণ্নতা মুখে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'আর বলিস নি! স্যাড, ভেরি স্যাড। ওর এইটে পাস করার ওপর অনেকখানি নির্ভর করছিল। ওর বাবা চাকরি ঠিক ক'রেই রেখেছিলেন। ছ-মাস ট্রেনিং, তারপরই একেবারে ষাট টাকা মাইনে। ওর কেরিয়ারটাই বোধহয় রুইনড্ হয়ে গেল। এরপর পাস করলেও বোধহয় একাজ পাবে না।'

ললিতের বাড়ি গিয়ে শুনল, সে বাড়িতে নেই। ললিতের বাবা প্রশ্নের উত্তরই দিলেন না, অগ্নিদৃষ্টিতে চাইলেন, অর্থ—এইসব বন্ধুদের পাল্লায় পড়েই তাঁর ছেলেটা গেল। বিনুর সঙ্গে যে ললিতের দীর্ঘকাল দেখাশুনো নেই—এসব সামান্য তথ্য তাঁর জানার কথা নয়। ললিতের বিমাতা বিরসবদনে জানালেন, 'দ্যাখো গে যাও, বোধহয় সুনীলের ওখানে গিয়ে পড়ে আছে। একই ব্যাথার ব্যাথী তো!···খেয়েদেয়ে নিলে তবু আমি ছুটি পেতুম। না খেয়ে আর কদিন লজ্জা দেখাবি!'

তার মানে সুনীলও ফেল করেছে।

অবশ্য সুনীল ফেল করার অনেক কারণ আছে। সুনীল কলেজে পড়ে নি, শেষ-মুহূর্তে মনস্থির করে প্রাইভেট দিয়েছে। মাস্টারী করে সেই অজুহাতেই অনুমতি পেয়েছে। কিন্তু পেয়েছে পরীক্ষার মাত্র কদিন আগে। তৈরী হবার সময় পায় নি। তাছাড়া ওর পারিবারিক অশান্তি ও দারিদ্র্য যা—এভাবে পরীক্ষা দিতে যাওয়াই—তাড়াহুড়ো করে—উচিত হয়নি।

সুনীলের বাড়িতে ওরা থাকবে না—বিনু জানত, সে জায়গা নেই। ওর দূর সম্পর্কের এক বোনের বাড়ি কাছেই, তার পিছনের দিকে একটা একটু অন্ধকার মতো খালি ঘর পড়ে থাকে, পড়াশুনোর দরকার বা নির্জনে থাকার ইচ্ছা হলে সেইখানেই যায় সুনীল। একটা মাদুর আর হ্যারিকেন লণ্ঠন সেখানে রাখাই থাকে।

বিনু সরাসরি সেখানেই গেল।

দেখল তার অনুমানে ভুল হয় নি। দুজনেই আছে সেখানে।

সুনীল চুপ ক'রে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে, ললিত একেবারেই ধরাশায়ী বলতে গেলে—মাদুরের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

বিনুর মনে পড়ল সেই মেয়েটির কথা।

তার কাছে হার-মানার লজ্জাই বোধহয় বেশী বেজেছে। তার কাছে এখবর পৌঁছবেই একদিন, হয়ত এতক্ষণ পৌঁছে গেছে। তার হিসাব-বুদ্ধি যে অভ্রান্ত, সে যে ওর উন্নতির ওপর ভরসা করতে রাজী না হয়ে নিজের দূরদৃষ্টিরই পরিচয় দিয়েছে—এইটেই প্রমাণিত হবে, বা হয়েছে। এ আঘাতটাই বোধহয় ষাট-টাকা মাইনের চাকরির সম্ভাবনা চলে যাওয়ার থেকেও বেশী।

তবে, দুঃখ যতই মর্মঘাতী হোক, প্রথমটা দুঃসহ বোধ হোক—অল্প বয়সটাই তার সর্বাধিক সান্ত্বনা, আশার প্রলেপ দেয়। সময়ে সমস্ত রকম ক্ষত নিরাময় করা যায়, অন্তত প্রদাহটা কমে।

এ বয়সে ক্ষতির পরিমাণ ও পরিণাম চোখে পড়ে না। পশ্চিমের আকাশ দূরের বস্তু, বহুদূরে—প্রভাতের আলো সামনে, সে অপরিমাণ আশার বাতাস বহন ক'রে আনে।

বিনু অকারণ কোন সান্ত্বনার দিক দিয়ে গেল না। একেবারেই ভবিষ্যতের কথা তুলল।

বলল, 'তুমি আবার এ এগজামিনের ফাঁদে পা দিও না, যখন ঐ চাকরিটারই আশা রইল না, তখন ফের একটা বছর চর্চিতচর্বণ! মনে হবে আগেকার বন্ধুরা, পরের সহপাঠীরা করুণার চোখে দেখছে—কী লাভ, যদি জীবিকার সন্ধানই করতে হয়, আগে থেকে করাই ভাল। খামকা বয়স বাড়িয়ে লাভ কি! মনে করো না, আমি ল্যাজকাটা শিয়াল বলে সকলের ল্যাজ কাটতে চাইছি। কথাগুলো ভেবে দ্যাখো।'

'জীবিকার সন্ধান আর কি!' ললিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'ঐ বড়মামার আপিসই তো এখন একমাত্র ভরসা। যা ভয় করি তাই করতে হবে।'

এই বড়মামাকে বিনু জানে। অনেকবার দেখেছে। ললিতের আপনমামা ইনি। বেঁটে-খাটো গৌরবর্ণ মানুষটি, কী এক সওদাগরী-জাহাজের-সার্ভে-আপিসের বড়বাবু সেটা কি বস্তু তা বিনু আজও জানে না, মানে কি কাজ করতে হয়—তবে সে আপিসেও একদিন গিছল। ডালহাউসি স্কোয়ার পাড়ায় দুশো বছরের একটা বাড়ি, ত্রিশ ইঞ্চি দেওয়াল, ফলে সর্বদাই স্যাঁৎস্যাঁৎ করে, কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ। নিচে কি একটা কীটাণুনাশক পদার্থের গুদোম, তার দুর্গন্ধ তো আছেই। তারই মধ্যে পুরো অন্ধকার একটা ঘরে ভাঙ্গা চেয়ারে বসে কাজ করেন বড়মামা। কানে সর্বদা একটা পেন্সিল গোঁজা থাকে। খুব কাজের লোক সেটা প্রমাণ করার জন্যেই। কান থাকে সায়েবের পার্টিশান দেওয়া ঘরের দিকে। তিনি কখন ডাকেন তা আর কেউ শুনতে পায় না। উনি ঠিক শোনেন এবং 'ইয়েস স্যার, কামিং' বলে শশব্যস্তে ছোটেন।

আপিসে ঐ একটিই মাত্র চেয়ার। সেটা ঐ মাত্র আধ ঘণ্টা থেকেই লক্ষ্য করেছিল, বাকী যারা কাজ করছে—টুলে বসে। বড়মামা বললেন, 'চেয়ার

পেলেই বাবুরা ঢুলবেন। সেই জন্যে এই অবস্থা। আমিই করেছি।' ভাঙ্গা চেয়ার বদলান না কেন, তার জবাবে বলেছিলেন, 'বাপরে, এ চেয়ার আমার লক্ষ্মী, এই চেয়ারে বসেছি পনেরো টাকা মাইনেয়, এখন সাড়ে তিনশোয় উঠেছি। যেদিন চাকরি ছাড়ব, এটাও চেয়ে নে যাবো।'

বড়মামা বহুবার বলেছেন সত্যিই, ওর সামনেই বলেছেন, 'যেদিন, বলবি তিরিশ টাকা মাইনের কাজ একটা ক'রে দিতে পারব। আমার ভাগনেকে আনব—সায়েব কখনও না বলবে না। পাস ক'রে কি করবি, এই টুলে বসবার জন্যেই দেখগে যা গণ্ডা গণ্ডা এম-এ পাস ছেলে ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথম তিন মাস অবিশ্যি প'চিশের বেশী পাবিনি—এটাকে ওরা বলে ট্রেনিং পিরীয়ড্। তারপর তিরিশ টাকা বেওজর। আর আমি যদি বেঁচে থাকি, তিন বছরে পঞ্চাশ টাকা ক'রে দিতে পারব। তাছাড়া এ আপিসে উপরির ব্যাপার আছে। বড় বড় সায়েব ফার্ম সব আমাদের ক্লায়েণ্ট, বড়দিনের সময় মোটা মোটা টাকা বকশিস দিয়ে যায়। সে ধরো যারা নতুন সবে, তাদেরও পঞ্চাশ ষাট টাকা হয়ে যায়। তাছাড়া বাইরের কাজ করলে, ঘোরাঘুরি—ট্র্যামভাড়া দেয়, সেটা তো সবই বাঁচে—বেশী টাইম অবদি কাজ করলে সময়টা হিসেব ক'রে আধ-রোজ এমন কি একরোজও ওপর-টাইম দেন সায়েব।'

কিন্তু সে পছন্দ হয় নি ওদের, হবার কথাও নয়।

ললিত বলে, 'আর কি ভবিষ্যৎ বল, কী বা শিখেছি, কি করতে পারি। ঐ অন্ধকার দুশো বছরের বাড়িতে ভ্যাপসা গন্ধের মধ্যে টুলে বসেই জীবন কাটাতে হবে।'

'ধ্যুস!' বিনু যেন ধমক দিয়ে ওঠে, 'এ যুগের ছেলে তুমি, অন্ধকার ঘরে টুলে বসে জীবন কাটাবে কি। না না, অনেক ফিল্ড পড়ে আছে—টাকাই যদি কাম্য হয় ব্যবসা ধর। আয়, আমরা তিনজনেই একসঙ্গে লেগে যাই!'

সুনীল চুপ ক'রে থাকে, তার মুখে কেমন একটা রহস্যময় হাসির আভাস।

ললিত বলল, 'হ্যাঁ, ব্যবসা করব। এক পয়সা পুঁজি নেই ব্যবসা করব কি! ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার! বাবার এমন অবস্থা নয় যে পাঁচ দশ হাজার বার ক'রে ছেলেকে ব্যবসা করতে দেবে। এখনও তাঁর মেয়েদের বিয়ে বাকী, ছেলেদের লেখাপড়া। আর কি ভরসাতেই বা বার করবে। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আই-এস সি যে পাস করতে পারে না, তাকে কে ব্যবসা করার টাকা দেবে বল!'

'ঐ যে যারা বড়বাজারের এঁদো গলিতে একটা তোশকে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে—ওরা বুঝি সব বি-এ, এম-এ পাস? ওরে, কলেজে ইউনিভার্সিটিতে পাস ক'রে তো এই কেরানীগিরিই ভরসা, তারা কি ব্যবসায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমাদের দাদা অত ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট, সেই তো কেরানীগিরিই করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, শিক্ষা সব লাইনেরই আছে। ব্যবসারও-শিক্ষানবিশী আছে বৈকি। কেরানীগিরির জন্যে কলেজে টাকা গুনে দাসত্বের শিক্ষা না নিয়ে সেই সময়টা কোন দোকানদারের কাছে য়্যাপ্রেণ্টিস থাকলে

অনেক কাজে দেবে।'

'সে আর কোথায় এখন এই বয়সে করতে যাবো বল। মুদির দোকানে গিয়ে ঘর ঝাঁট দোবো?'

'তা কেন, এখন নিজেকে ঘুরে ঠেকে ঠেকে শিখতে হবে।'

এবার বিনু ওর কথা কিছু বলার সুযোগ পায়।

ব্যবসা কতরকম হতে পারে। জমি বাড়ির দালালীও তো একরকম ব্যবসা। শতকরা দু-টাকা দালালি বাঁধা, সেটাই নিয়ম। তাছাড়াও তেমন গোলমেলে কি এঁদো জায়গায় প্রপার্টি হলে আরও বেশী আদায় করা যায়। বিনু প্রথমটাতেই ত্রিশ টাকা পেয়েছিল। ওর মামার আপিসে চাকরির এক মাসের মাইনে। তারপর আর একটা বাড়ি বিক্রি করেছে—সাড়ে চার হাজার টাকায়, সেও নব্বুই টাকা গুনে দিয়েছে তারা। এই সম্প্রতি ক'দিন আগে হালতুর দিকে একটা প্রায়-জলা জমি বেচিয়ে দিয়েছে, বিপিনবাবু—ওদেরই বন্ধুর বাবা কিনেছেন, সাড়ে তিন বিঘে জমি তেত্রিশশো টাকায়—সে ভদ্রলোক পুরো টাকা দিয়েছেন। বিপিনবাবুও ওকে কুড়ি টাকা দিতে চেয়েছিলেন খরচখরচা বাবদ। ও নেয় নি।

আরও বলল বিনু—নিজের কথা।

সে ঠিক এই একটা কাজেই থেমে নেই। বা একটাকেই ধরে নেই।

সে লিখছেও, হাতে লেখা কাগজে নয়, তার লেখা ছাপা হচ্ছে। অনেক কাগজে লেখা ছাপা হয়েছে তার। সাপ্তাহিক মাসিক পাক্ষিক নানা কাগজে। বইও বেরিয়েছে। প্রকাশকরা পয়সা খরচ ক'রে ছেপেছেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। দু-তিনটে ছেলেমেয়েদের নাটক, একটা যৌন-বিজ্ঞানের বই। এখন একটা জীবনী লিখছে, সেও প্রকাশকের তাগাদা। এতেও টাকা পাচ্ছে। গত ক' মাসে যা পেয়েছে তাতে মাসে পঁচিশ টাকার মতো হয়।

ললিতও লিখুক না। সে তো বেশ ভাল ছবি আঁকত, ওদের হাতে লেখা কাগজে। এখনও নিশ্চয় পারবে, একটু চেষ্টা করলেই হবে। ওর যেসব প্রকাশকরা ছেলেমেয়েদের বই ছাপেন, তাঁদের বইয়ের ছবি বা মলাটের জন্যে কিছু কিছু টাকা দেন আর্টিস্টদের, ইস্কুলের বই—ইতিহাস বা রীডারে লাগে। ভেতরে ছবি দু টাকা ক'রে, মলাট দশ পনেরো টাকা। বড় আর্টিস্ট যাঁরা তাঁরা চল্লিশ-পঞ্চাশও পান। কাঁচা আর্টিস্টরাই তো চার পাঁচ টাকা ক'রে নিয়ে যায়।

ছবি আঁকা লেখা—ললিত চেষ্টা করলে দুটোই পারবে।

এর একটা আলাদা সুখ, আলাদা মূল্য। নিজের কৃতিত্বের গৌরব তো আছেই—তা ছাড়াও মাস গেলে ত্রিশটা টাকা রোজগার করতে পারলেও তো ঐ মামার আপিসের কেরানীগিরির আয়। অথচ এতে স্বাধীনতা আছে, যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ানো যায়, ইচ্ছে হল একদিন বেরোলাম না। কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, সাহিত্যিকদের সঙ্গ লাভ হয়—এরই কি দাম কম।

সম্প্রতি ওর একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেটাও না বলে থাকতে

পারে না। নিজের সাফল্যের কথা এক্ষেত্রে বলা হয়ত আরও মর্মপীড়ার কারণ হবে এদের কাছে, তবু—উৎসাহিত করতে গেলে এ কাজে অনুপ্রাণিত করতে গেলে সাফল্যের কথা না বললেও তো চলবে না।

কালিঘাটের কাছে এক বিখ্যাত কবির বাড়ি প্রতি রবিবার সাহিত্যিকদের মজলিশ বসে। চা ঘুগনি খাওয়ান তিনি। এ কবির কবিতা সবাই পড়েছে ইস্কুলের বইতে। ছেলেদের মতো কবিতা ছাড়াও অন্য কবিতা বহু লেখেন। সেসব কবিতাই বেশী। বিনু অনেক ছোটবেলাতেই এঁর একটা আধা-প্রেমের আধা-ভক্তিমূলক কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, মুখস্থ করেছিল আপনিই—তার মিষ্টিমধুর ছন্দের জন্য।

সেখানে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসেন, কালীনাথ বসু, কালীদা বলেন সবাই—তাঁর একটি পাক্ষিক কাগজ আছে, ফুলস্ক্যাপ চারপেজী সাইজ, লম্বা ধরনের, অল্প ছাপেন, কটা বিজ্ঞাপন বাঁধা আছে—তাতেই তাঁর সংসার চলে যায়। সেই কাগজের জন্যে লেখা যোগাড় করতেই আসেন তিনি ঐ মজলিশে, সেই সূত্রেই পরিচয়। পরিচয় আর কি, বিনু গিয়ে একপাশে বসে থাকে, অপরদের কথা শোনে। তার এখনও কিছু লেখক বলে নাম হয় নি, তেমন কারণও নেই—তবু কালীদারও কাগজের পাতা ভরাতে হবে, আজকাল বড় লেখকরা এসব সাময়িকপত্রে লেখার জন্যে টাকা নেন, কালীদার সে সামর্থ্য নেই—তিনি একদিন ওকে প্রশ্ন ক'রে জেনেছিলেন যে, ও গল্প লেখে, নানা কাগজে ছাপাও হয়। তখনই বলেছিলেন একটা লেখা দিতে, আর দেওয়া মাত্র তা ছেপেওছেন।

এই কালীদা মানুষটির কাছে বিনুর অনেক ঋণ। টাকা দেবার সামর্থ্য ছিল না, বিনুরও তা চাইবার মতো যোগ্যতা হয়েছে বলে সে মনে করে না—কিন্তু সেই ফাঁকটা কালীদা উৎসাহ দিয়ে প্রশংসা ক'রে ভরিয়ে দিতেন। এটাও তো করে না কেউ, অথচ ওর সে বয়সে টাকার থেকে এই প্রশংসা ও উৎসাহেরই বেশী প্রয়োজন ছিল।

তিনি এই মজলিশে বসেও ওর লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, কেউই কান দেয় নি, কেউ বা এটাকে ছেলেভোলানো ব্যাপার মনে ক'রে মুচকি হেসেছে। বিনুও এটাকে মিথ্যা ভাবতে পারত, কিন্তু কালীদা এখন অবিরাম ওর লেখার জন্যে তাগাদা দেন। যত্ন ক'রে প্রুফ দেখেন, লেখার তাগাদা ক'রে চিঠি দেন। এই সমাদরেই মন ভরে যায়, মন ভরে ওঠে কৃতজ্ঞতায়। তবু এও সব নয়, এর মধ্যে একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে গলদঘর্ম হয়ে ওর বাড়ি এসে হাজির হয়েছিলেন, 'ও ইন্দ্রজিৎ, আমার কাগজটা কি উঠিয়ে দিতে চাও! তোমার লেখা কৈ! আমার গ্রাহকরা যে তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই আমি বসলুম, তুমি ভাই যা হোক একটা লিখে দাও।'

এর মধ্যে একটা চিঠি দিয়েছেন তাতে লিখেছেন 'তুমি কালে শৈলজা-টৈলজাকে ছাড়িয়ে যাবে ভাই, এই আমি বলে দিচ্ছি, শরৎবাবুর মতো নাম হবে তোমার।' সে চিঠিখানা ওর দাদার হাতেই এসে পড়েছিল, তিনি হাসাহাসি করেছিলেন। তবে তার পর থেকে আজকাল বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে

দিয়ে বলেন, 'ও তো আজকাল লিখছে-টিখছে, সম্পাদকরাও তো দেখি তাগাদা ক'রে লেখা চান,—বাড়িতে এসেও তাগাদা দেন কেউ কেউ।'

বলতে যেটা পারল না, ললিতের বর্তমান মানসিক অবস্থা ভেবে—পাছে তার মনে হয় নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে ব্যাখ্যা না ক'রে তারই এতদিনের অবহেলার শোধ নিচ্ছে—সেটাই বলার জন্যে মন ছটফট করছে কাল থেকে। সম্ভব হলে অক্‌টারলোনি মনুমেন্টের মাথা থেকে চিৎকার ক'রে প্রচার করত কথাটা—সাফল্যের চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে। নিজের এতদিনের কোন সত্যকার আশাহীন অক্লান্ত পরিশ্রমের পুরস্কার হিসেবে—শুধু ভবিষ্যতের আশা না রেখে তাই নয়, এসব লেখা যে কোনো পাঠকই পড়ছে না সেকথাও না ভেবে।

গতকালই একটি ছাপা পোস্ট কার্ড এসেছে।

দৈনিক নন্দনবাজার পত্রিকা থেকে বিখ্যাত তরুণ কবি নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত—আসন্ন পুজা সংখ্যার জন্য একটি ছোট গল্প চেয়ে।

যথাসাধ্য সম্মান-মূল্য দেওয়া হবে—নিচে এক লাইনে সে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।

নাই বা বলতে পারল। একদিন ছাপা হলে তো দেখবে সবাই।

আরও দিন-দুই নানা রকমে উৎসাহিত করার পর ললিত সঞ্জীবিত হয়ে উঠল আবার। কেবল সুনীল ওদের সঙ্গে ব্যবসায়ে নামতে বা ভাগ্যকে চ্যালেঞ্জ করতে রাজী হল না। সে তার কুড়ি টাকা মাইনেয় পাড়ার মিডল স্কুলের শিক্ষকতাই ধরে রইল। অন্য কোন বৃহত্তর ক্ষেত্র বা উচ্চ আশার কথা বলতে গেলে শুধু মুচকি হাসে।

সে হাসির অর্থ বোঝা গিয়েছিল বছর দুই বাদে—মার মৃত্যুর পর। এসব ছেড়ে—বাড়ি, আত্মীয় চাকরি—মানুষের যা কিছু কাম্য, যত কিছু বন্ধন—সব ছেড়ে চলে গিয়েছিল এক আশ্রমে। কলকাতার মধ্যেই আশ্রম তবে পরে ঐ আশ্রম কর্তৃপক্ষই তার নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা দেখে দূরে গঙ্গার ধারে এক নির্জন আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার মধ্যেও এক পাশে একটি মাটির ঘর বেছে নিয়েছিল সে। গেরুয়া নেয় নি, তবে সাধন ভজন ধ্যান তপস্যা নিয়েই থাকে, দিন দিন সেটাতেই যেন ডুবে যাচ্ছে, বাইরের জীবনের কোন তরঙ্গই তাকে নড়াতে বা দোলাতে পারে না।

এখনও বেঁচে আছে, কিন্তু যেন ওদের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। দেখা করতে গেলে দেখা করে, হাসে গান গায়—কিন্তু তপস্যার সময় ওর কঠোরতা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে, অন্য আশ্রমবাসীরা বলেন।

অবশ্য সুনীল চিরদিনই দূরের মানুষ। স্নিগ্ধ স্বভাব, প্রয়োজন মতো বন্ধুকৃত্য করতে বিলম্ব করেনি কখনও কিন্তু তাকে কাছে পাওয়া সম্ভব নয়। কাছে পাবার কথা মনেও হয় নি কখনও। আবেগ এমনই জিনিস—যার মধ্যে কিছু মাত্র আবেগ নেই তার দিকে কখনও আকৃষ্ট হয় না।

ললিতই তার সেই বন্ধু যাকে কাছে পেতে ইচ্ছা করে, যাকে একান্তভাবে পেতে ইচ্ছা করে। সেটা যদি না হয় অন্তত কাছেই থাক।

ওকে নিয়ে বিনু বিভিন্ন প্রকাশকদের কাছে ও সাময়িক পত্রের আপিসে ঘুরল। বেশ কিছুদিনই ঘুরতে হত। যার সঙ্গে এই ধরনের জীবন সংগ্রামের পরিচয় নেই তার হতাশ হবারই কথা। ললিতও হ'ত বিনু না জোর করলে। বিনুর সঙ্গে এর মধ্যে যাদের যোগাযোগ হয়েছে—তাদের সাধ্য সামান্য, অল্প-স্বল্পই কাজ হয়—ডিজাইন বা ইলাস্ট্রেশ্যান বাবদ বেশী খরচ করতে পারেন না তাঁরা, কাজেই তাঁরাও এই ধরনের শিল্পীই খোঁজেন। ললিতকে একেবারেই অনভিজ্ঞ দেখে দেড় টাকা ক'রে সাধারণ ছবি, এক টাকা ক'রে হেডপিস আর তিন টাকা মলাট—এর বেশী কেউ দিতে রাজী হলেন না।

ললিতের কাছে এও স্বপ্নাতীত অবিশ্বাস্য। তবে কোন শিক্ষাই নেই, অভ্যাসও কম—স্বভাবজ দক্ষতার ওপর নির্ভর এক এক ছবি দুবার তিনবার বদলাতে হয়। মলাট একটা পাঁচবারের বার পছন্দ হল।

মুশকিল আরও—কোন রঙের সঙ্গে কোন রং মিশলে কী দাঁড়ায় সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। শুধু রেখায় ডিজাইন ক'রে আলাদা রঙের চার্ট দিলে ব্লকের খরচ কমে, সেটাও করতে পারে না।

শেষে বিনু ওকে এক ব্লকের কারখানায় নিয়ে গেল। মালিক অজিতবাবু নিজে ওস্তাদ কারিগর, বৃদ্ধ মানুষ, ভারী স্নেহময়, ভদ্র—তিনিই ওকে মোটা-মুটি রহস্যটা শিখিয়ে দিলেন। আর একটি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন, শরীর-গঠন বিজ্ঞান জানা না থাকলে মানুষের দেহ আঁকা যায় না, আঁকতে গেলে হাস্যাস্পদ হতে হয়—আর্ট স্কুলে সেটাই আগে শিক্ষা দেয়—তুমি ওপথে যাওয়ার চেষ্টা ক'রো না, যতটা পারো এড়িয়ে যেও।'

তবু এতে চলবে না, জীবিকার সংস্থান হবে না পুরোপুরি—তা বিনু জানত। যেখানে বড় বড় পাস করা শিল্পীরা কুড়ি টাকা পঁচিশ টাকায় মলাট করেন—বিনুর একটা ছোটদের বই-এর মলাট করেছেন একজন প্রধান শিল্পী, তিনি শুধু পাস করা শিল্পীই নন, নামকরা শিশুসাহিত্য লেখকও—মাত্র কুড়ি টাকায় তিন রঙ্গা মলাট ক'রে দিয়েছেন, মলাটটা যে খুবই ভাল হয়েছে তা বিনুও স্বীকার করতে বাধ্য। ভদ্রলোক হেঁদোর কাছে ওরই মধ্যে একটু পরিচ্ছন্ন মেসে থাকেন, আরও কজন লেখক নাট্যকারও থাকেন সেখানে—ফলে খাওয়া থাকা নিয়ে চৌদ্দ-পনেরো টাকা পড়ে যায়—সে টাকাটা যেমন ক'রেই হোক প্রতি মাসে যোগাড় রাখতে হয়। কেবলমাত্র লেখার ওপর—বিশেষ ছেলেদের মতো লেখার ওপর ভরসা করে থাকলে চলে না। সে তো বিনু নিজেকে দিয়ে মুরারিবাবুকে দিয়েই দেখছে। কাজেই এসব কাজ করতে হয়—আর বইয়ের বাজার হিসেবে সস্তাতেই করতে হয়।

অবশ্য ললিতকে লিখতেও বলছে, সেই প্রথমদিন থেকেই। নিজের সৃষ্টির নেশা না ধরলে জীবনে আশার আলো দেখতে পাবে না, খাটতেও পারবে না। মামার সে মাসিক ত্রিশ টাকার নিরাপত্তাটুকু তো আকর্ষণ করছেই। যে ডুবছে সে বড় সহজেই নাকি হাল ছেড়ে দেয়, এও কতকটা সেই অবস্থা।

হাতে কিছু টাকা এলে অন্তত সেই বইয়ের দোকানের ক্যানভাসিংটা এবারও

যদি পায়—সব জড়িয়ে একশো টাকার মতো তো পাবেই—একটা সাপ্তাহিক কাগজ বার করবে। দ্‌জনের নাম ছাপা হবে সম্পাদক হিসেবে। সে সময় জোর ক'রে লেখাবে, সেই হাতে লেখা মাসিকের মতো খানিকটা লিখে বলবে—বাকীটা তুমি শেষ করো।

তা পাবে, মনে তো হয় কাজটা পাবে। আর তা হলে হয়ত একশো টাকার বেশিই পাবে। স্‌রেনবাব্‌ই তাঁর প্রথমবারের বিল ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি যদি এত কম খরচা দেখাও অন্য ক্যানভাসাররা বিপদে পড়বে যে। অনেকেরই তো বছরে এই একটা মাস রোজগার, তাই বলে তোমাকে প্‌কুর চুরি করতে বলছি না, তবে এই যে তুমি বলছ, হোটেলওলা শোবার জায়গা দিতে পারে নি, বলছ তার একটিই ঘর সে সপরিবারে থাকে বাইরের বারান্দায় তিনখানা বাঁশের ওপর বসে রাত কাটিয়েছ তাই সে কিছ্‌ চার্জ করেনি, লাভপ্‌রে নিমন্তিতে নলহাটিতে হেডমাস্টার মশাইরা খাইয়েছেন—তা হোক, এগ্‌লো তুমি অনায়াসে ধরতে পারো। দৈনিক অন্তত দেড়-দ্‌ টাকা তোমার খাওয়া জল-খাওয়া বা চা খাওয়া—এসব বাবদ। কাটোয়াতে ডাক বাংলোয় ছিলে, তার খরচ দেখিয়েছ, কৈ, কালনায় থাকার কোন খরচ লেখোনি?'

'ওখানে ডাকবাংলো তো দিতে চায়নি—ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বলে—এধারে হোটেলেও থাকার কোন ব্যবস্থা নেই, আসলে ওসব জায়গায় হোটেল বলতে সবই ভাতের দোকান প্রায়—বলে, মালটা আমাদের চৌকির নিচে রেখে যেতে পারেন, শোবার ব্যবস্থা কোথাও ক'রে নিতে হবে নইলে ঐ বাসটা ভোরবেলা ছাড়ে যেটা, ওতে অনেক বাব্‌রা গিয়ে শ্‌য়ে থাকেন, তাও থাকতে পারেন—বিপদে পড়ে শেষে কতকটা মরীয়া হয়ে একটা চিঠি লিখে সাহেবের চাপরাশীকে দিয়ে সাহেবের কাছে পাঠাতে, তিনি হ্‌কুম দিলেন, রাত নটার পর এ পাশের ঘরে গিয়ে শ্‌তে পারি—তিনি ওপাশের ঘরে থাকবেন, মাঝখানের হলঘরে ওর চাপরাশী আর চৌকীদার থাকবে—ভোর ছটার মধ্যে ভেকেট করতে হবে। এই রকমভাবে রাত কাটানো বলেই চৌকীদার কিছ্‌ চার্জ করেনি, কিম্বা সাহেব থাকতে বলেছেন—আমাকেও সরকারী লোক ভেবেছে হয়ত।'

'তা হোক, তুমি বিলে ওগ্‌লো ধরে দাও।'

তাতেই মাইনে ষাট টাকা ছাড়াও চল্লিশ টাকার মতো পেয়েছিল, ওর কাছে যা খ্‌চরো ছিল—সব জ্‌ড়িয়ে একশো টাকারও বেশি। দেবেনবাব্‌ দ্বিতীয়বার আর বিল ফিরিয়ে দেননি, তবে শ্‌নিয়ে দিয়েছিলেন—এর ওপর আরও ত্রিশ-চল্লিশ টাকা বিন্‌ অনায়াসে বিলে ধরে নিতে পারত।

হয়ত সবটাই অন্য ক্যানভাসারদের জন্যে মাথাব্যথা নয়।

ওঁকেও যেতে হয় মধ্যে মধ্যে এখানে-ওখানে, সে-বিলের সঙ্গে ওদের বিলের খ্‌ব তফাৎ না হয়, সেটাও মাথায় ছিল। তাছাড়া তাঁর একটি শালাও এই কাজ করে। তার স্বার্থটাও দেখা দরকার।

অথচ, ঐ কাটোয়ার ডাকবাংলোর খরচা নিতেই ওর ভয়-ভয় করছিল। এক ম্যাকমিলন-লঙম্যানের রিপ্রেজেন্টেটিভরা ছাড়া অন্য কাউকেই তো

ডাকবাংলোয় যেতে দেখে নি। দেখে নি মানে—কোন ডাকবাংলো আসলে চোখেই দেখেনি তার আগে, স্কুলে দেখা হলে শুনেছে তাঁরা ডাকবাংলোয় উঠেছেন। তাছাড়া যারা আসে, তাদের অনেকে তেমন যে কোন-কিছু আছে তাই জানে না, যারা জানে তারাও জানে ওগুলো সাহেবসুবো আর জেলা-হাকিম এস ডি ও থাকার জায়গা।

তাও বিলিতী কোম্পানীর এঁরাও যে সর্বত্র ডাকবাংলোয় থাকতেন—তা মনে করবার কোন হেতু নেই। বর্ধমান শহরে চলনসই একটা হোটেল দেখে (রাণীগঞ্জ বাজারের মধ্যে) বিনু সেখানেই উঠেছিল প্রথম বছর, চার আনা সীটরেণ্ট, চার আনা মীল—রাতে আবিষ্কার করল ওর ঘরেই দুটি বিখ্যাত বিলিতী কোম্পানীর লোক, আর একজন পাশের ঘরে।

তবে তাঁদের মধ্যে একজন স্পষ্টই বলেছিলেন, 'এ কি আর আমরা বিল-এ দেখাব—ডাকবাংলোয় ভাড়া, চৌকিদারের রেঁধে দেবার খরচা—এসব দেখাতে হবে বৈকি। এ থেকে গিন্নীকে যদি ভরি দুই সোনা কি একখানা সিল্কের শাড়িও না দিতে পারি—এতকাল করলুম কি। আমরা তো মাইনে-করা লোক, আলাদা তো কিছু পাই না, এই থেকে যা বাঁচে।'

বিনু যে কাটোয়া ডাকবাংলোয় উঠেছিল সে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই।

সন্ধ্যার কিছু আগে আমোদপুর-কাটোয়া লাইনের ছোট ট্রেনে পৌঁছেছিল। একেবারেই অজানা জায়গা, এক গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, 'ভাল হোটেল যদি চান বাবু, সুশীলার হোটেলে চলুন। একটু হয়ত দু-চার পয়সা বেশি পড়বে—তবে পোষ্কার-পরিচ্ছন্ন, যত্ন করবে খুব। হোটেল তো বেস্তর শহরে, কালিদাসীর হোটেল আছে, পারুলের, চন্ননের—সে বাবু আপনার থাকার যুগ্যি নয়। কলকাতার মানুষ আমরা দেখলেই বুঝতে পারি।'

অগত্যা সুশীলাই সই। চার আনা সীটরেণ্ট, বারো পয়সা অর্থাৎ তিন আনা খাওয়া—এর চেয়ে সস্তায় তার থাকার দরকার নেই।

হোটেলে পৌঁছেও অত কিছু বোঝেনি। সুশীলা মানুষটি ভাল, কালো-কালো মোটাসোটা, নিচের হাতে বিশেষ কিছু না থাকলেও (বোধহয় কাজ করতে সোনা ক্ষয়ে যাবে বলেই) গলায় মোটা বিছে হার, ওপর হাতে ভারি অনন্ত, পয়সা আছে বোঝা যায়। তবু হাতজোড় করেই অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, 'না না, নিচোয় নয়, নিচোয় নয়—ইদিকে নেসো, দোতালায়।' বলে চাকরকে দিয়ে মাল তুলিয়ে দিয়েছিল। হাত-পা ধোবার জল এনে দিয়েছিল বারান্দায়, চা আনিয়ে দিতে হবে কিনা (ইদিক সামলাতেই পেরে উঠিনে বাবু, ওসব পাট আর রাখিনি), তামুক খাবার অব্যেস আছে, কিনা, তাও প্রশ্ন করেছিল।

শুধু তাই নয়, অকারণেই ঠাকুরকে ধমক দিয়েছিল। যদিচ রাত্রের আলো দিতে এসে চাকরটি চুপিচুপি শুনিয়ে গিয়েছিল, 'ঐ বাঁকড়োর বামুন ঠাকুরটি যে দেখছেন, ও-ই সব গেরাস ক'রে বসে আছে, মালিকের মালিক, বুইলেন না, মালিককে মালিক, ম্যানেজারকে ম্যানেজার, মনিবকে হাতের মুঠোয় করেছে কোন দিনে সব্বস্য নে পালাবে! সেই যে বলে না, পুরুত ঠাকুরকে পুরুত

ঠাকুর জলখাবারকে জলখাবার—তা আমাদের এখেনে তাই হয়েছে বিত্তান্ত।

ওর সামনেই ঠাকুরকে ডেকে বলেছিল, 'এ তোমার হেটুরে মামলার ফেরৎ খদ্দের নয় ঠাকুরমশাই, এ হল গে কলকেতার বাবু, মান্যিবর লোক, ভাল ক'রে রান্নাবান্না করো বাপু, নইলে হোটেলের বদনাম হয়ে যাবে।'...

খাওয়াটা সন্ধ্যের মধ্যেই সেরে নিয়েছিল বিনু, কারণ সকাল দশটায় গাড়ি চড়েছে, তারপর আর পেটে কিছু পড়েনি, চাকর একটা হ্যারিকেনও বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ঘরে। চৌকী নেই, দোতলায় ঘর বলেই সম্ভবত, মেঝেতেই ওর সেই নামমাত্র বিছানা পেতেই শুয়েছিল, ওরই মধ্যে আরাম করেই, অন্য বইয়ের অভাবে ওদের কোম্পানীর একটা কম্পোজিশনের বই-ই পড়েছিল—অনেক ছোট ছোট গল্প আছে—এমন সময়, ঠিক পাশের বিছানা যাঁর, সেই ভদ্রলোক এসে পড়লেন।

তিনি সম্ভবত কোন মামলার তদ্বিরেই এসেছিলেন, কারণ আপন মনেই 'শালার উকিলদের' চৌদ্দ পুরুষকে গালাগাল দিতে দিতেই ঘরে ঢুকলেন, কিন্তু খেয়ে এসে বিছানা নিতেই বিনুর চক্ষুস্থির। ভদ্রলোক হাঁপানি রুগী, শ্লেষ্মাজনিত হাঁপানি, তার ওপর বিড়ি খাওয়ার অভ্যাস আছে। তিনি সারারাত বসে কাশলেন এবং শ্লেষ্মা ফেললেন মেঝেতে, নিজের বিছানার তিনদিকে, অর্থাৎ সোজাসুজি বিনুর দিকে ছুঁড়লেন না। ভদ্রলোকের বিছানা থেকে ওর বিছানা মাত্র হাতখানেক দূরে, একেবারে ওর বিছানা লক্ষ্য ক'রে না ফেললেও মাথার দিকে পায়ের দিকের মেঝেতে পাশের দেওয়ালে এমনভাবে যথেচ্ছ ফেলতে লাগলেন যে, তার কতকগুলো ওর চার-পাঁচ আঙুল ব্যবধানের মধ্যে এসে পড়তে বাধ্য।

ঘরটা নিতান্তই ছোট, ন' ফুটের বেশি কোনমতেই নয়—ন-বাই দশ সম্ভবত এই মাপ। সুতরাং দেখতে দেখতে এমন অবস্থায় দাঁড়াল—বিনুর মনে হল তার বিছানা গয়ের, বিড়ির টুকরো ও ছাইয়ের এক সমুদ্রে ভাসছে।

সারারাত ঘুম হ'ল না, বলাই বাহুল্য। ঘেন্না তো বটেই, এমনিতেও সাধ্য হত না। একটা লোক যদি কানের একেবারে পাশে ক্রমাগত কাশে আর হাঁপায় এবং নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টায় একটা ওঁ-ওঁ ক'রে অপ্রাকৃত শব্দ করতে থাকে, দুই কাশির ধমকের ফাঁকে ফাঁকে—কোন মানুষ ঘুমোতে পারে?

কোনমতে সেই আপাতদীর্ঘ রাত—কষ্টের ও দুঃখের রাতের একটা বিশেষ দৈর্ঘ্য থাকে, যা মিনিট ঘণ্টার হিসেবে মাপা যায় না—ভোর হতেই এ আশ্রয়টা ছাড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে এ স্বাভাবিক। তবু তখনও অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার শেষটুকু বাকী ছিল। তখনও তথাকথিত বাথরুম ও প্রাকৃতিক কার্য সারার স্থান দুটি দেখা হয় নি।

বাথরুম বলতে দোতলাতেই সামান্য একটু পাঁচিলঘেরা ছাদ। সেখানেই যত এঁটো বাসন মাজার ব্যবস্থা। উনুনের ছাই, বাসন মাজার শালপাতা আর উচ্ছিষ্টেই সে ছাদ ভরে গেছে, তার দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে, সবটা ছড়িয়ে নরকের সৃষ্টি হয়েছে প্রায়—সেখানেই এক বালতি জল বসিয়ে দিয়ে

গেছে অদ্বিতীয় চাকরটি স্নানের জন্যে। স্নান না করলেও চলবে কিন্তু প্রভাতের অত্যাবশ্যক কাজটা সারা দরকার, সেই নরকের মধ্যে দিয়ে পিছল ছাদে পা টিপে টিপে সেখানে যেতেই হল—অত দুঃখের মধ্যেও মনে পড়ল ছেলেবেলায় শোনা কথাটা, নরকের পথ দারুণ পিচ্ছিল—বেরিয়ে এসে মনে হ'ল এ পর্যন্ত যদি কিছু পাপ ক'রে থাকে, তার—এমন কি আগামীকালের পাপের জন্যেও—নরক ভোগটা হয়ে গেল।

সুশীলা অবশ্য ব্যাকুল হয়ে বার বার হাত জোড় করতে লাগল, কি অসুবিধা হয়েছে বললে সে অবশ্যই তার 'প্রিতিকার করবে—কিন্তু বিনু সে অনুনয়ের দিকে কান না দিয়ে নিজেই বেরিয়ে খুঁজে পেতে একটা গাড়ি ডেকে আনল আর তাকে সোজা ডাকবাংলোয় যেতে বলল।

ডাকবাংলো বলতেই একটা সম্ভ্রম বা ভয়ের ভাব দেখা দিত ওর মনে। ভয় খরচের অংক শুনে। এত খরচ কি কর্তারা দেবেন? না দেন না হয় মজুরী থেকেই কেটে নেবেন—মরীয়া হয়ে এই আশ্বাসই অবলম্বন করেছিল সে। শ্রেষ্ঠ হোটেলের অবস্থা দেখে বাকীগুলো পরীক্ষা করার আর সাধ ছিল না।

খরচটা অবশ্য অপরকে জিজ্ঞাসা করেই জানা। দৈনিক একটাকা ঘর ভাড়া, আলো জল আর কমোড সাফ করার খরচটা আরও আট আনা। চার আনা সীটরেন্টের ঠিক ছ গুণ। কিন্তু উপায় বা কি, ঐভাবে সে থাকতে পারবে না।

ডাকবাংলো কাটোয়া শহরের বাইরে! বেশ কিছু দূরে। শহরের দশ ফুট (না বারো?) চওড়া বাজার ঘেরা প্রশস্ত রাজপথ ছাড়িয়ে এক সময় অপেক্ষাকৃত চওড়া পথে পড়ল বটে, তেমনি লোকালয়ের চিহ্নই রইল না কোনোদিকে। দুদিকে ধানের ক্ষেত, সবে শস্য কাটা হয়েছে, গাছের গোড়াগুলো শুধু কণ্টকিত করে রেখেছে ক্ষেতের শুকনো জমি।

এর মধ্য দিয়ে মাইলখানেক যাওয়ার পর কেতোয়ালী পড়ল, ওদিকে শ্মশান, তারপর গঙ্গার ধারে একটা জায়গায় নিয়ে গেল—সেখানে দুটি মাত্র বাড়ি; একটি ডাকবাংলো, পাশেরটি মহকুমার হাকিমের কোয়ার্টার বা সরকারী বাসা।

গাড়োয়ান ডাকবাংলোর উঠোনে এসে কোন মতে বারান্দার ওপর মালগুলো নামিয়ে দিয়ে গজগজ করতে করতে তখনই সরে পড়ল। 'এখানের চৌকিদার কোথায় একটু ডেকে দেবে?' বলতে এমন খিঁচিয়ে উঠল যে, বিনু ভয় পেয়ে দু পা পিছিয়েই এল। তার নাকি বিস্তর বাঁধা খদ্দের নষ্ট হয়ে যাবে এই ধাব-ধাড়া গোবিন্দপুরে নিয়ে আসার জন্যে। যদিও ফেরার সময় খালি ফিরতে হবে এই অজুহাতে বিনুর কাছ থেকে পুরো বারো আনা ভাড়া আদায় করেছে, যেখানে ছ আনা পাবার কথা।

এখন যা করতে হবে নিজেকেই।

কিন্তু এ কি অবস্থা!

এই নাকি ডাকবাংলা। সাহেব সুবো ও বিশেষ লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট। তার সামনে এই যে একতলার ইমারতটি—এটি ওদের ধারণা অনুসারে

বিরাট তাতে সন্দেহ নেই। মধ্যে বড় একখানা হলঘরের মতো, দুপাশে আর দুটো ঘর, সেও আকারে এক একখানা দুটো সাধারণ ঘরের সমান; সামনে অনেকখানি খোলা বারান্দা, চওড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। বড় বড় জানালা ও বিরাট দরজা। দেখার মতো বটে।

তবে সবই খোলা, হাঁ হাঁ করছে। প্রায় দু ইঞ্চি পুরু ধুলো, জানালাগুলো সাহেবী মেজাজের—যাকে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো বলে, অর্থাৎ গরাদ নেই, বড় বড় খড়খড়ি দেওয়া কপাট শুধু। গরাদের কর্তব্য বজায় রাখতেই বোধহয় মাকড়শারা পুরু জাল বুনে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

'চৌকিদার' 'চৌকিদার' বলে বার দুই ডাক দিল বিনু।

সে ডাক সেই খালি বাড়ি, চারিদিকের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আর গঙ্গার চড়ায় কেমন একটা বিকৃত, যেন হতাশ নিঃশ্বাসের মতো শব্দ তুলে এক সময় মিলিয়ে গেল, কোন মানুষের কণ্ঠে তার উত্তর জাগাতে পারল না।

তবে ডাকবার পরই ওর নজরে পড়ল, একটি বছর পঞ্চাশের মোটা গোছের ভদ্রলোক একটা পুরু গেঞ্জি গায়ে ধুতিটা দুদিকে হাঁটু পর্যন্ত তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মালিকে দিয়ে বাগানের কাজ করাচ্ছেন। অনুমানে বুঝল ইনিই মহকুমা হাকিম হবেন। দুই বাড়ির হাতার মধ্যে ছাঁটা গাছের বেড়া মাত্র—কোমর সমান উঁচু—পরস্পরকে দেখতে কোন অসুবিধে নেই।

বিনু কাছে এগিয়ে এসে সবিনয়েই প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা দয়া করে বলতে পারেন এ বাংলোর চৌকীদার কোথায় থাকে? ওদের তো এখানেই থাকবার কথা—কোথাও তো চিহ্ন দেখছি না।'

মুখ তুলে তাকিয়ে ওকে দেখা মাত্র ভদ্রলোকের মুখের যে অবস্থা দাঁড়াল, তা অবর্ণনীয়। সামনে ভূত দেখলে মানুষের মুখের যেমন চেহারা হয়—এ-উপমাটা বহু বইতে পেয়েছে সে। নিজে কখনও ভূত দেখেনি, দেখলেই বা নিজের মুখের চেহারা কেমন করে বুঝবে—অপরেও কেউ ওর সামনে ভূত দেখেনি যে তার মুখের অবস্থা লক্ষ্য করবে। তবে যে যেমনই প্রাকৃত-অপ্রাকৃত ভয়ংকর দৃশ্য দেখুক—এর চেয়ে আতংকের ছায়া মুখে ফুটে ওঠা সম্ভব বলে মনে হয় না। ইংরেজীতে যাকে 'য়্যাবজেকট টেরর' বলে—এ বোধহয় সেই রকমই ভয় পাবার চেহারা। সমস্ত মুখখানা ছাইয়ের মতো বিকট হয়ে গেল দেখতে দেখতে, অসহায় দৃষ্টিতে একটা প্রকট সর্বনাশের আশংকা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

তিনি বিনা উত্তরে দ্রুত গিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে সশব্দে কপাটটা বন্ধ করে দিলেন।

বিনু তো অবাক। বহুক্ষণ পর্যন্ত সে বুঝতেই পারল না, কী এমন অস্বাভাবিক আচরণ করল সে, ভদ্রলোক কেন এত ভয় পেলেন—যে সহজ সৌজন্যে 'জানি না' এটুকু বলার কথাও মনে পড়ল না।

তারপর আস্তে আস্তে বিহ্বলতা বা চিন্তার জড়তা কেটে গিয়ে মনে

পড়ল কথাটা।

সে শিক্ষিত (অন্তত চেহারা দেখে তাই মনে হয়েছে ওঁর) হিন্দু তরুণ—অর্থাৎ সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতীক, ইংরেজ-শাসন-ব্যবস্থার নির্মমতম শত্রু। ওঁদের মনে হত হিন্দু লেখাপড়া-জানা কিশোর, বিশেষ কৈশোরোত্তীর্ণ ছেলে মাত্রেই তখন ম্যাজিস্ট্রেট, এস ডি. ও. কমিশনার প্রভৃতির প্রতি বোমা, বন্দুক পিস্তল উদ্যত ক'রে তাঁদের হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। 'টেররিস্টারা সকলেই হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে আসে—এই ওদের ধ্রুব বিশ্বাস। এ বিষয়ে ওরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একমত, মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত ছেলেরা ছাড়া আইডিয়ার জন্যে প্রাণ দিতে কেউ পারে না।

ব্যাপারটা বোঝার পর বিনুর মনে হল খুব খানিকটা হা-হা ক'রে হাসে, অতিকষ্টে সে ইচ্ছে দমন করল। সে হাসিকে ওর অপরাধেরই একটা চিহ্ন বলে ধরে নিয়ে সাহেব পুলিশ ডাকবেন হয়ত।

তখন এত কথা ঠিক জানত না, ঘুরতে ঘুরতে ঠেকে শিখে এটা আরও ভাল বুঝেছে।

এর বছর দুই পরে এই কাজেই একবার মেদিনীপুর জেলায় ঘুরতে হয়েছিল। যে মুহূর্তে সে খড়্গপুরে নেমেছে সেই মুহূর্ত থেকে যতদিন সে ঐ জেলায় ছিল, ফেরার সময় আবার সুবর্ণরেখা পার হওয়া পর্যন্ত একটি লোক সব সময় সর্বত্র ছায়ার মতো সঙ্গে লেগে ছিল। প্রায় প্রকাশ্যভাবেই। গোপন করার একটা চেষ্টা যে ছিল না তা নয়—কিন্তু সেটা নিতান্তই লোক-দেখানো, অর্থাৎ সরকার দেখানো। বিনুর বরং মনে হয়েছিল লোকটা গোয়েন্দাগিরি করছে নিতান্তই পেটের দায়ে, মনে-প্রাণে সে এই টেররিস্টদেরই দলে। এ ছোকরা যদি সত্যিই তাই হয়, পিছনে পুলিশের নজর আছে জেনে সতর্ক হোক—এই রকম যেন তার মনোভাব।

মালপত্র বাংলোর বারান্দায় ফেলে রেখেই ভাঙ্গা ফটক দিয়ে বেরিয়ে এল বিনু। তখন বেশ রোদ উঠে গেছে, লোকজন মাঠে আসা সম্ভব। কাউকে দেখতে পেলে অন্তত চৌকিদারের কথাটা জিজ্ঞেস করা যায়।

পেলও দেখতে। বছর ছয়-সাতের উলঙ্গ ছেলে একটা। গোটা-দুই তিন ছাগল নিয়ে এইদিকেই আসছে, বোধহয় বাংলোর তৃণবিরল মাঠেই ওদের কোন খাদ্য কোথাও এখনও আছে কিনা সেই খোঁজে। বিনুকে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

'এই খোকা, এখানের চৌকিদার কোথায় গেছে জানো ?'

ছেলেটি গম্ভীরভাবে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তোমার নিবাস ? কোথা থেকে আসছ ?'

এ প্রশ্ন থেকে এখানে অব্যাহতি নেই। এ সর্বত্র। অপরিচিত লোক দেখলে সর্বপ্রথম এ প্রশ্ন সার্বজনীন। কেবল ভাষায় তারতম্য। কোন বয়স্ক লোক হলে এক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করত, 'মশায়ের নিবাস ? কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?' ক'দিন সমস্ত খোঁজখবরের উত্তরে এই প্রশ্ন শুনতে শুনতে মেজাজ

খারাপ হয়ে আছে। সে বেশ চড়া গলায় বলল, 'সে খবরে তোর দরকার কি! অসভ্য ছেলে কোথাকার। একরত্তি ছেলে পাকা পাকা কথা! যা বলছি তার জবাব দে, নইলে চড়িয়ে সামনের গাল পিছনে ফিরিয়ে দোব।' তারপর একটু হেসে বলল, 'চৌকীদার কে, চিনিস?'

ছেলেটা এবার ভয়ে ভয়ে জবাব দিল, 'হে্ঁ, সি আমার মামা হয়।'

'যা এক্ষুণি গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়। বল গে সরকারী লোক এসে দাঁড়িয়ে আছে, আর একটু দেখে পুলিশে খবর দিয়ে রিপোর্ট ক'রে দেবে, চাকরি থাকবে না। যা, ছাগল এখানে থাক, তুই দৌড়ো।'

আর কিছু না জানুক, চৌকিদারের ভাগ্নে—সরকারী লোক পুলিশ চাকরি একথাগুলো সম্বন্ধে ঝাপসা একটা ধারণা আছে। সুতরাং আর বলার দরকার হল না, ছেলেটা পাঁই পাঁই করে দৌড়ল আলের ওপর দিয়ে। একটু পরে হাঁপাতে হাঁপাতে চৌকিদারও এসে পৌঁছল সঙ্গে তার বছর আষ্টেক-নয়েকের ছেলে, সেও উদম ন্যাংটো।

এবার ঘরদোরে ঝাঁট পড়ল, বাথরুমের নৌকো টবে জলও ভরা হল। চা এনে দিতে হবে কিনা প্রশ্ন করল। সেটা নাকি তার বাড়ি থেকে করিয়ে আনতে হবে। রান্নাবান্না ক'রে দেওয়ার দরকার হবে না শুনে একটু দমে গেল, তবে বেশী কিছু আর বলল না।

খাওয়া তো পরের কথা, এই ক'দিনের মধ্যে অনেক ক'দিনই পাউরুটি আর টিনের দুধ খেয়ে কাটিয়েছে, সিঙাড়া নিমকি খেয়ে দুপুরের খাওয়ার কাজও সেরেছে—তা নিয়ে ওর তত মাথা-ব্যথা নেই। ঘুরে ঘুরে বাড়ির পুরো হাল দেখে ওর সর্বাঙ্গ হিম হয়ে যাবার যোগাড়।

একটা জানলার ছিটকিনিও—অব্যবহারেই—কাঠের গোবরাটের নির্দিষ্ট স্থানে ঢোকে না, তার মানে বন্ধ হয় না। দরজাও তাই। ভেতর থেকে বন্ধ ক'রে বা বাইরে যাবার সময় দরজায় চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে সে উপায় নেই

মনে মনে হিসেব ক'রে দেখল খাটটা ঠেলে একপাশে ক'রে দিলে একটা জানলা আটকানো যায়, বাথরুমের দোর ঐ ভারি জলসুদ্ধ টবটা দিয়ে ঠেকনো দেওয়া যেতে পারে, রাত্রে শোবার সময় টেবিল চেয়ারগুলো সরিয়ে একটার পিছনে একটা দিয়ে বাকী জানলা দরজা কতদূর আটকানো যাবে তা কে জানে। এইভাবে রেখে কপাটে তালা দিয়েই বা কতটুকু শান্তি থাকবে?

সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'এ কি হাল করে রেখেছ দোর জানলার। চুণকামও তো হয়নি দেখছি অন্তত দশ বছর। বছর বছর মেরামতের নাম ক'রে টাকা নিয়ে নেশা ভাঙ করো বুঝি শুধু? আমি যদি ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করি!'

বিনু যে নির্ঘাৎ সরকারী লোক সে বিষয়ে চৌকীদারের আর কোন সন্দেহ রইল না। সে খপ ক'রে ওর পায়ে একটা হাত দিয়ে বললে, 'মাইরি বাবু, এই আপনার দিব্যি বলছি, শ্যামসুন্দরের দিব্যি আমার হাতে এক পয়সাও দেয় না, উল্টে পিডব্লুর বাবুরা এসে আমাকে দে টিপ সই করিয়ে নেয়—এই এই মেরামত হ'ল বলে। আমরা আর কত খেতুম হুজুর, গরিব লোক, সব্বস্ব পেটে

পুরতে ধকে কুলোত না। এ বড় বড় বাবু সব, তেনারা সব পারে। অবিশ্যি তাও বলি, রাগ ক'রো নি ঘাট করো নি—কে আসছে হুজুর, এখানে এলে গেলে তো দুটো পয়সা পাই তবু রান্নাবান্নার হুকুম হলে পেটের ভাতটা চলে যায় নিজের—তা সে লোক কৈ? কদাচ কখনো দৈবেসৈবে ভবিষ্যতে এক-আধজন আসে। যা মাইনে পাই তাতে চলে? আপনিই বলো—এতগুলো ছানা পোনা নিয়ে? তাতেই তো পরের জমিতে একটুন আধটুন খেটে দিতে হয়—ইদিকি আর তত নজর দিতে পারি নে।

বিনু তার বক্তৃতায় বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু আমি যে কদিন এখানে থাকব—রাত্রে তোমাকে থাকতে হবে, সক্কালবেলা জল তুলে দে পালাবে, তা হবে না। আর মেথর যেন দুবেলা আসে ঠিক, হুঁশ রেখো।'

'যে আজ্ঞে, থাকব বৈকি, আপনি যখন বলছ। তবে মেথর, সি লাট সায়েব, কবে আসে না আসে—তবে তার জন্যে ভেবো নি, আমি তো রইব, হুজুরের কোন অসুবিধে হতে দোব না। সি না আসে আমিই সাফ ক'রে দোব।'

এসব পয়সা খুচরো যা আদায় হয় তা সরকারে জমা পড়ার কথা। জমাদার চৌকীদার সবই মাইনে করা। সেক্ষেত্রে জমাদার সম্বন্ধে এত উদারতার একটিই মাত্র অর্থ দাঁড়ায়—এ লোকটিই অন্য নামে সে মাইনে নেয়।

চৌকীদার রাত্রে এসেছিল ঠিকই!

শহর থেকে খাওয়ার পাট সেরে সন্ধ্যার সময়ই ফিরে এসেছিল বিনু সঙ্গে পড়বার মতো বই না থাকায় কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসেছিল টেবিল ল্যাম্প জেলে। আলোয় তেল ভরা ছিল, চিমনি অন্ধকার। নিজেই ভিজে কাগজে সেটা মুছে পলতে পরিষ্কার করে আলোটা অনেকখানি উজ্জ্বল ক'রে নিয়েছিল।

লিখতে লিখতে নিবিষ্ট হয়ে গেছে—লেখায় মন বসলে এমনিই হয়ে যায় সে। কতক্ষণ কাটল জ্ঞান থাকে না, কটা বাজল কেউ জানিয়ে না দিলে হুঁশ হয় না—তন্ময় হয়ে পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছে, হঠাৎ একই সঙ্গে গালে একটা গরম হাওয়া আর নাকে উগ্র ধেনোমদের গন্ধ আসতে, চমকে চেয়ে দেখল কখন নিঃশব্দে চৌকিদার এসে একেবারে চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়েছে, কাগজ কলম নিয়ে এত কি লিখছে বাবুটা, রিপোর্ট লিখছে নাকি, সেই কৌতূহলে হেঁট হয়ে দেখছে, তাতেই ওর মুখটা বিনুর মুখের কাছে এসে গেছে।

ভয় যে পেয়েছিল সেকথা অস্বীকার ক'রে কোন লাভ নেই। দরজা খোলা ছিল, ও যখন এসেছে তখনও ছটা বাজে নি, তখন থেকে ঘরে কেরোসিনের আলো জেলে দরজা জানলা বন্ধ করা উচিত হবে না এই ভেবেই বন্ধ করে নি। এর মধ্যে একেবারে সাড়ে আটটা বেজে যাবে তা কে জানত!

চৌকিদারের সঙ্গে ওর সে ছেলেটাও এসেছে, সেই নাকি ওর বড় ছেলে। তেমনি উদোম ন্যাংটো। দুজনেরই চক্ষু রক্তবর্ণ, দুজনেই টলছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। ঠোঁটের দুপাশে গ্যাঁজলা—

বিনু জলে উঠল। ভয় পাওয়ার লজ্জাটাই রাগ আরও বাড়িয়ে দিল বোধ-

হয়। বলল, 'ঐটুকু ছেলেকে মদ খাওয়াও। তুমি কি মানুষ। তোমাকে জেলে দেওয়া উচিত।'

সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল চৌকিদার, 'আজ্ঞে। আপনি ঠিকই বলছ। আমি মানুষ নই বাবু জানোয়ার। তবে কি করব হুজুর, শালার ছেলে শোনেনি যে কিছুতে। না দিলে বলে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিব।...আবার তাও ভাবি এই জাড়ের দিন চলছে—গায়ে তো একটা ট্যানাও দিতে পারি না, দু ঢোক পেটে পড়লে আর ওসব কিছু লাগে না।...আচ্ছা হুজুর নমস্কার। এই মাঝের ঘরটাতেই আমরা পড়ে রইলুম আজ্ঞে, যখন ডাকবেন ছুটে আসবে আপনার ছি চরণের দাস।'

বলে অকারণেই বারদুই আরও নমস্কার ক'রে টলতে টলতে গিয়ে হলঘরের মেঝের ওপরই বোধহয় ইঞি দুই ধুলোর ওপরই—অনাবশ্যক বোধে সকালে এটায় ঝাট দেয় নি—শুয়ে পড়ল এবং মিনিটখানেকের মধ্যেই দুজনের নাক ডাকতে শুরু হল।

॥ ৪৬ ॥

কাগজ বার হল। সাপ্তাহিক—কাগজ—রয়্যাল চারপেজী—তখনকার দিনের বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'নাচঘর' আকারের। সেইটেই মনের মধ্যে আদর্শ ছিল, সেই ভাবেই সাজানো হয়েছিল।

মোটামুটি তখনকার দিনের—অবশ্যই একেবারে সর্বোচ্চ শ্রেণীর ঔপন্যাসিকরা ছাড়া—সব বড় লেখকই, অল্পবয়সের ছেলে—দুটির ওপর করুণার্দ্র হয়ে দু-একটি লেখা দিয়েছিলেন—নজরুল ইসলাম, কালিদাস রায় (গদ্যপদ্য দুইই), কুমুদ মল্লিক, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শৈলজানন্দ থেকে শুরু করে অনেকেই। অপেক্ষাকৃত স্বল্পখ্যাতরা তো দেবেনই। দেবেনই মানে—লেখা ছাপা হলেই কিছু পারিশ্রমিক আশা করবেন—সে কথা তখন কেউ ভাবতেই পারতেন না।

না, লেখা, সাজানো, ছবি, পাঠ্যবস্তুর বৈচিত্র্য—কোনদিক দিয়েই কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু দুটি মাত্র মানুষ যদি লেখাসংগ্রহ, কাগজকেনায় ও ছাপাখানার টাকার ব্যবস্থা এবং প্রুফ দেখার কাজেই সর্বশক্তি এবং দিনরাতের চব্বিশ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে—বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে কে?

ফল যা হবার এসবের—তাই ফলল। ঠিক তিনটি মাস পরেই, দুজনের মিলিত পুঁজি নিঃশেষিত হলে কাগজটি সগৌরবে প্রকাশ বন্ধ করল। 'সাধনোচিত ধামে গমন করল' বললেই ঠিক বলা হয়।

তা হোক, এতে পরিচয়টা একটু এগিয়ে গেল নানা মহলে। ললিতকেও ওর এই এক বিশেষ জগতের লোক—খুব সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই অবশ্য—চিনলও।

বিনুরও আগের চেয়ে একটু প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ওর লেখা যে শুধু নন্দনবাজার পত্রিকায় নিয়মিত ছাপা হয় তাই নয়, দৈনিক যুগবিপ্লব, সাপ্তাহিক দেশবিদেশ প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতীতেও বেরোতে শুরু করেছে কিছু কিছু। টাকাও আসে দুটো চারটে ক'রে। নন্দনবাজার প্রথম দিয়েছিল সাত টাকা—তাতেই বিস্ময়ের সীমা ছিল না বিনুর। একটা গল্পর জন্যে এত টাকা

পাওয়া যায়। এখন তো বিশেষ সংখ্যায় বারো টাকা পর্যন্ত পাচ্ছে। ভারতবর্ষ ছ' টাকা দেয়। ছেলেদের বইও—আরও ক'জন প্রকাশক ছেপেছেন, বিক্রীও হচ্ছে।

কিন্তু এদিকেও সে টিউশ্যনী ছেড়ে দিয়েছে, ঘোরাঘুরি বেড়ে যেতে নিয়মিত এক জায়গায় একই সময় হাজিরা দেওয়া আর সম্ভব হয় না। লেখার টাকা এত আসে না যে নিজের জামাকাপড় হাতখরচা বাঁচিয়ে সংসারে কিছু দেওয়া যায়।

অবশ্য একেবারে সংসারের জন্যে খরচ করছে না কিছু তা নয়। মা রাত্রের খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বহুকাল, সেই বামুনমার মৃত্যুর পর থেকেই, শুধু একপোয়া ক'রে দুধ খেতেন, এখন বিনু দুটো ক'রে মিষ্টি এনে দেয় আজকাল। এটা ওটা—কপি কমলালেবু আমের সময় আম—এসবও আনে। তবে তাতে সংসার খরচের এমন কোন সুরাহা হয় না!

অথচ সেটাও দরকার। দাদা কিছু না বললেও সে বোঝে। দাদাও প্রকারান্তরে নোটিশ দিচ্ছেন—তাঁর বিয়ে করার কথা নয়, প্রয়োজন হয়েছে। এই ভূতের বেগার খেটে যাচ্ছেন, সকাল সাড়ে নটায় বেরিয়ে যান, চাকরি টিউশ্যনী সেরে ফিরতে রাত নটা বাজে। এখন একটু সেবা একটু কোমল সাহচর্য দরকার বৈকি।

বিনু বোঝে কিন্তু এতদিনের অক্লান্ত বিরামহীন পরিশ্রমের পর—একেবারেই ভূতের বেগার ভাবত সবাই—সবে দূরে সাফল্যের স্বর্ণরেখা দেখা দিয়েছে, প্রভাতের ইঙ্গিতের মতো লম্বা মসীকৃষ্ণ অন্ধকার টানেলের মধ্যে যেমন আলোর বিন্দু দেখা যায়—বহুদূরে হলেও তা আলোই, মরীচিকা নয়—সেই রকম, ক্রমে তা উজ্জ্বলতর ও বিস্তৃততর হবে মানুষ আশা করে, সাগ্রহে অপেক্ষা করে আর কিছু পথ অতিক্রমের পর আলোয় আসবে সে—এখন কোথাও চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার চাকরিতে ঢুকতে ইচ্ছা হয় না। আর তার জন্যেও তো কিছু ঘোরাঘুরি ধরাধরি করতে হবে।

ব্যবসা তারা নানা রকম করছে, বিনা পুঁজিতে যতটা হয়। দুজন মানে সে আর ললিত। বাড়ির দালালী, জমির দালালী। এমন কি বার দুই হ্যান্ড-নোটের দালালীও করেছে। তাতে টাকা আসে, তেমনি রোজ কিছু এসব সুযোগ ঘটে না, অথচ ঘোরাঘুরি হাঁটাহাঁটি করতে হয় প্রত্যহই। তাতে কিছু কিছু ট্রামভাড়া বাসভাড়াও লাগে।

'দুজন কেন, তুমিই বেশী খাটছ, আর একজনকে মিছিমিছি লাভের ভাগ দেবার দরকার কি?'

এ প্রশ্ন প্রায়ই করেন শুভানুধ্যায়ীরা। উত্তর দেয় না বিনু। সব কথা সকলকে বোঝানো যায় না। এছাড়া ললিতকে কাছে পাবার গতানুগতিক জীবন থেকে তুলে আনার কি উপায় ছিল? এখনও তার মামা সেই টুল নিয়ে বসে আছেন। প্রথম থেকেই ত্রিশ টাকা করিয়ে দেবেন সে ভরসাও দিয়েছেন। কিন্তু ললিত ঐ বদ্ধ অন্ধকূপে ঢুকলে তার জীবনটা তো নষ্ট হবে বটেই, দুজনের জীবন দু খাতে বইবে, মধ্যের ব্যবধান দিন দিন বেড়েই যাবে, কোনদিনই আর

মিলবে না।

অবশ্য শুধু কি ঐ একটাই কারণ? একা এই ধরনের অবিরাম পরিশ্রম করে গেলে শুধু যে ক্লান্তি আসে তাই নয়, হতাশাও জাগে প্রচণ্ড। কাজটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তখন সামান্য পাওনা—এখন যা আশা জাগায় মনে, তখন সেটাই যেন পরিহাস করতে থাকে।

কাগজ যে-কদিনই চলুক—কিছু সুবিধা হয়েছিল। যেটা আশা করেছিল বিনু সেটা হয়েছেই। লেখা সম্বন্ধে যে একটা মস্ত বড় সংকোচ ছিল ললিতের মনে—সংকোচ বললেও ঠিক বোঝানো যায় না—ওর ধারণা ছিল যে কোন কালে লেখক হতে পারবো না—কিন্তু প্রেস বসে আছে, এখনই কিছু কপি দেবার নাম ক'রে জোর করে লেখার দায় ওর ওপর চাপিয়ে লেখা বার ক'রে নিয়েছে। ফলে সে ভয়টা গেছে। এখন নিজেই লেখে, নিজের মনের তাগিদে—নেশাটা পেয়ে বসেছে। কিছু কিছু লেখা ছাপা হচ্ছেও, দু-একখানা ছেলেদের বইও চুক্তি হয়েছে প্রকাশকদের সঙ্গে। সেই সঙ্গে ছবির কাজও পাচ্ছে দু-চারটে। তবে পুরোদস্তুর শিক্ষা না থাকায় খুব উন্নতি করতে পারছে না। পারবেও না, সেটা বিনু বুঝছে।

সেই জন্যেই সে আরও লেখার দিকে চাপ দিচ্ছে।

কিন্তু তারপর? এতেই কি জীবিকা হবে? ভবিষ্যতের সংস্থান?

দুজনে অন্য কোন ব্যবসা কিছু করবে ভাবছে।

এর মধ্যে একটা বাজার সে আবিষ্কার করেছে। স্কুলের পাঠ্য বইয়ের ক্যানভাসিং করতে করতেই এটা মাথায় গেছে বিনুর। এই তো ব্যবসার একটা ভাল জায়গা।

সব স্কুলেই একটা ক'রে লাইব্রেরী আছে, বছরে একবার প্রাইজও দেওয়া হয়। কিছু কিছু বই তো কিনতেই হয় এদের। পাঠ্য-বইয়ের এই ব্যস্ত সময়টা—বার্ষিক পরীক্ষার সময়ও এটা—বাদ দিয়ে লাইব্রেরীতে রাখার মতো প্রাইজ দেবার মতো বই নিয়ে ঘুরলে কি হয়?

অবশ্য মফঃস্বলের বে-সরকারী স্কুলের পুঁজি সামান্যই ছিল সে সময়, অনেকেরই বছরে ষাট টাকা ছিল মাত্র—লাইব্রেরী ফাণ্ড য়্যালোকেশন, মাসে পাঁচ টাকা পড়ে হিসেব করলে। তার মধ্যে থেকে পুরনো ছেঁড়া বা নজগজে বই বাঁধাবার খরচাও দিতে হয়। প্রাইজও একশো বড়জোর দেড়শো টাকা। অনেক স্কুল স্পেশিমেন কপি—যা ক্যানভাসাররা দিয়ে যায়,—চকচকে দেখে প্রাইজে চালিয়ে দেন।

সরকারী গ্র্যাণ্ট পাওয়া স্কুলের অবস্থা আর একটু ভাল, রেলের স্কুল—রেল কর্মচারীদের ছেলেদের জন্যে যা করা হয়েছে বা বড় বড় কারখানার আনুকূল্যে যা স্থাপিত—এদের অবস্থা আরও ভাল, তবে সে আর কতই বা। বেসরকারী স্কুলই বেশী।

অবশ্য ওঁদের টাকাও যেমন কম, বইয়ের দামই বা কত। আট আনা ছ' আনা—সবচেয়ে মোটা ভালো বই দেড় টাকা। স্কুল-লাইব্রেরীতে কিছু প্রবন্ধের বই,

কাব্য বড় জীবনী—এসবও চলে। তারও দাম—খুব বেশী হলে আড়াই-তিন।

এ ব্যবসাতেও পুঁজি লাগার কথা। সেটা ওদেরই নেই। ভরসা তার প্রতি প্রকাশকদের আস্থা। এর মধ্যে কিছু কিছু মাঝারি প্রকাশকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। বিনু ব্যবহারে আর কথাবার্তায় তাঁদের কিছুটা বিশ্বাসভাজনও হতে পেরেছে। এঁদের মধ্যে যাঁদের এই ধরনের মানে স্কুল লাইব্রেরী বা প্রাইজে চলবার মতো বই বেশী, তাদের দু একজনের কাছে কথাটা পাড়ল।

ওরা দুজনে ওঁদের বই নিয়ে মফঃস্বলে বিক্রী করতে যাবে, যেমন বিক্রী হবে, দাম পাঠাবে। খরচ ওদের, কমিশনও বেশি চায় না—যা ওঁরা দেন, শতকরা পঁচিশ টাকা, তাতেই ওরা খরচ চালিয়ে নেবে। বিশ্বাস ক'রে দেবেন কিছু কিছু বই ?

কেউ কেউ ভেবে দেখবার জন্যে সময় চাইলেন ! একজন তো স্পষ্টই বললেন, অনেক ছোকরা এভাবে এসে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে নিয়ে গেছে—কেউ-ই এক পয়সা ঠেকায় নি। দেখাও করে নি আর। তারপর একটু রসিকতা করেও বলেছেন, 'আই লস্ট মাই মানি য়্যাণ্ড মাই ফ্রেণ্ডস।'

তবু তিনি শেষ পর্যন্ত একটু নরম হয়ে বললেন, 'একশো সওয়াশো টাকার মতো বই আমি দিতে পারি—এর বেশী ঝুঁকি নেবো না।'

কেবল মনোরঞ্জনবাবু বলে এক ভদ্রলোক, তাঁর বইও অনেক, ভাল বই-ই বেশী—এক কথায় বললেন, 'যা খুশি যত খুশি নিয়ে যাও, ফিরে এসে দাম দিও। কোন তাড়া নেই।'

প্রথমবারেই চারশো টাকার বই বিক্রী করেছিল ওরা। স্কুল কমিশন ও নিজেদের খরচা ছাড়াও চল্লিশ টাকা লাভ হয়েছিল দশ বারো দিনে। তবে খরচা খুব বেশী লাগে নি ওদের। এই সব স্কুলের সঙ্গেই একটা ক'রে বোর্ডিং থাকে—হেড মাষ্টারমশাইদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে আসতে অসতে, ছেলেমানুষ আর কতকটা য়্যামেচার বলে, তাঁদের অধিকাংশই বিনুকে স্নেহের চোখে দেখেন, তাঁরাই খাওয়া—প্রয়োজন হলে থাকারও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এক জায়গায় হেডমাষ্টারমশাই নিজের বিছানা ছেড়ে দিয়ে অন্য ঘরে শুয়েছেন—এমনও হয়েছে।

এই সব স্বল্পবিত্ত বিশাল হৃদয় হেড-মাষ্টারমশাইদের কাছ থেকে সে বলতে গেলে আজীবন সস্নেহ ব্যবহার ও আনুকূল্য লাভ করেছে—সে স্নেহ ভোলার নয়। জীবনের সেটাই বরং বড় পাথেয়। অদ্ভুত এই মানুষগুলি, নিজেদের কথা ভাবতেনই না দু-একজন ছাড়া—তা সে ব্যতিক্রম তো থাকবেই। গরিব ছাত্রদের জন্যে উদ্বেগের অবধি ছিল না। দিন পালটেছে ওর চোখের সামনেই। বাঘ নররক্তের স্বাদ পেয়েছে, জীবনের জটিলতাও বেড়েছে, তাঁদেরও খুব দোষ দেওয়া যায় না—তবু প্রাচীনকালের সে সব মাষ্টারমশাইদের কিন্তু বদলাতে দেখে নি। এক প্রধান শিক্ষককে পুলিনবাবু নাম তাঁর ছাত্ররা বাড়ি ক'রে দিল অবসর নেবার সময়ে—

—ভাল জমি দেখেই তারা দিতে চেয়েছিল—তিনি বললেন, 'না যদি দিস

এমন জায়গা দে, যেখান থেকে শুয়ে শুয়েও স্কুলটা দেখতে পাবো।'

এ'রা যদি তপস্বী না হন তো সে শব্দের অর্থ কি তা বিনু জানে না।

স্কুলে ঘোরার পর সাহস কিছু বেড়ে গেল বৈ কি।

এ ধারেও অনেক দোর খুলে গেল। ওরা ফিরে এসে দাম মিটিয়ে দেয়। বেশী টাকা সঙ্গে নিয়ে ঘুরলে খোয়া যাবার ভয় আছে বলে মধ্যে মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মনি অর্ডার করেও পাঠায়—এ কথা শোনবার পর 'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে'র মতো লোকমুখেই ছড়াল; অনেকেই ধারে বই দেখার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলেন। যাঁরা আগে 'না' বলেছিলেন তাঁরা ঠিকানা জেনে বাড়িতে এসে দেখা করলেন।

ভরসা বাড়তে বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিকে যাত্রা শুরু করল ওরা—পাটনা, ভাগলপুর, মুঙ্গের, জামালপুর, কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্নৌ, কানপুর। সর্বত্রই ভাল অভ্যর্থনা, বইয়ের বিক্রীও ভাল।

দেশবিদেশ ঘোরার সঙ্গে কিছু কিছু উপার্জন, এ এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা। কষ্ট অবশ্যই করতে হয়। ধর্মশালায় থাকা অথবা সস্তাদামের অপরিচ্ছন্ন হোটেল, যে জীবন দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে আদৌ সুখপ্রদ নয়। সঙ্গে রান্নার সরঞ্জাম নেই, মাটির হাঁড়ি কিনে কাঠ জেলে রান্না করা, খুন্তির বদলে পাতলা কাঠই ভরসা। পাতায় খাওয়া, ডাল রেঁধে মাটির পাত্রে ঢেলে রাখা—বাজার থেকে রুটি কিনে এনে রাত্রে খাওয়া, কিম্বা কাঁচা রুটি ফেলে ডালের সঙ্গেই ফুটিয়ে নেওয়া। কিন্তু ওদের তখন নবীন বয়স, অবারিত জীবন সামনে পড়ে। আশার প্রাসাদে ঢুকে সৌভাগ্যের মণিরত্ন আহরণে যাত্রা ওদের—এসব কষ্ট দুঃখ দিতে পারে না, বরং দুজনে থাকায় নিত্য পিকনিকের আনন্দ বহন ক'রে আনে।

তা ছাড়া পশ্চিমের দিকে তখন কিনে খাবার মতো সুখাদ্য প্রচুর পাওয়া যেত। ভাল ঘিয়ে ভাজা খাবার, উৎকৃষ্ট দুধ, দই, রাবড়ি—দাম অবিশ্বাস্য রকমের সস্তা। পাটনাতে দু' আনা সের ভাল ছোলার ছাতু। এক পোয়া কিনলেই দুজনের প্রাত্যহিক 'নাস্তা' হয়ে যেত। এলাহাবাদে পাঁচ পয়সায় এক পোয়া ঘিয়ে ভাজা জিলিপী ও তিন পয়সার দই—দু' আনায় নবাবী মেজাজের জল খাবার। পাটনায় বেনারসীর ছ' পয়সার কুলপী বরফ খেলে রাত্রে খেতে হত না আর। কলকাতার ছ' আনা দামের বরফও তার কাছে নিকৃষ্ট। আগ্রা কানপুর লখনউতে ছ' আনা আট আনা রাবড়ির সের ছিল, বৃন্দাবনে চার আনা।

হাতে পয়সার স্বাচ্ছল্য থাকলে এই সবই খেত ওরা। কখনও কখনও দু'বেলাই পুরী খেয়ে থাকত, প্রচণ্ড গরমেও। পয়সা কম থাকলে তিনবেলা খিচুড়ি খেতেও অসুবিধে নেই। এইটেই য়্যাডভেঞ্চার—অফুরন্ত আনন্দের উৎস—এই নানা ধরনের জীবন-যাপন।

এর মধ্যে একটা সত্যিকারের য়্যাডভেঞ্চারও ঘটে গেল।

যত কাজই থাক, কলকাতায় থাকলে বিকেলে একবার প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিং-এর পুরনো বইয়ের বাজারটা দেখা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করত বিনু।

সেদিনও প্রথমটা কিছু অলস কৌতূহলে ঘুরলেও হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল। লক্ষ্য করল দুটি বিখ্যাত লেখকের অনেক বই, সম্ভ্রান্ত প্রকাশকের ছাপা—একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত যেন রেলিং মুড়ে দিয়েছে পুরনো বইওলারা।

চমকে ওঠার মতোই। একই লেখকের দশ-বারো রকমের বই অনেক কপি ক'রে—এভাবে বাজারে আসে না, তাও এমন অমলিন অবস্থায়। ফেদারওয়েট য়্যান্টিক কাগজে সুন্দর ঝকঝকে ছাপা, সবটাই সেলাই করা, মায় দপ্তরীরা যাকে তসমাসিলি করা বলে সেই অবস্থায়, শুধু মলাটটা লাগানো নেই। বোর্ড লাগিয়ে রঙীন সুদৃশ্য মলাট দিয়ে ছাপা হয় কোনটা পুরো কাপড়ে কোনটা বা অর্ধেক কাপড়ে অর্ধেক কাগজ। সেইটেই হয় নি।

এতদিনে এ জগতের রহস্য কিছু কিছু আয়ত্ত হয়েছে বিনুর, সে বুঝতেই পারল—এ কোন বিশেষ দপ্তরী বাড়ি থেকে চোরা পথে বেরিয়ে এসেছে। মলাটগুলো বোধহয় প্রকাশক নিজের কাছে রাখেন। যেমন যেমন বাঁধিয়ে আনা প্রয়োজন হয়—একশো বা পঞ্চাশ দপ্তরীদের বার ক'রে দেন। ছাপা কাগজ সবই দপ্তরীদের জিম্মায় থাকে, এ নিয়ম সনাতন স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে। দ্রুত কাজের সুবিধার জন্যে অবসর সময়ে ওরা সেলাই ক'রে ক'রে রেখে দেয়—তাতেই এইভাবে বেরিয়ে এসেছে, কেবল মলাট পায় নি বলেই একেবারে নতুন বইয়ের চেহারা দিতে পারে নি।

তা হোক—এ এমন একজন লেখক যাঁর নাম তখন প্রায় সর্বাগ্রগণ্য বলে ধরা হত। এই লেখকের আট-দশ রকম বই, আর রহস্য লহরী সিরিজেরও বারো-তেরো রকম—সেও এই একই অবস্থায় এসেছে। বিভিন্ন প্রকাশক কিন্তু দপ্তরী বোধহয় এক।

রহস্য লহরী সিরিজের দাম কম কিন্তু চাহিদা বেশ। বিনুর মাথায় চকিত এক মতলব খেলে গেল। ওখানের সব বইওলাই ওর অল্পবিস্তর চেনা। এ বই এদের সকলের কাছে কিছু থাকলেও কোন একজন লট কিনেছে এটা ঠিক। সেটা জানতেও দেরি হল না। তার সঙ্গে কথা বলে দরদস্তুর ঠিক করে ফেলল ও পাইকিরি হিসেবে অনেক বই কিনবে শুনে সে গড়ে ঐ বিখ্যাত লেখকের সব বই পাঁচ আনা ক'রে আর রহস্য লহরীর বই তিন আনা ক'রে দিতে রাজী হ'ল।

রহস্য লহরীর নতুন দাম বারো আনা, অন্য বইগুলি পাঁচসিকে, দেড় টাকা, দু' টাকা এমন কি একখানা তিন টাকাও আছে। এগুলো ওর কেনা পড়ছে সিকিরও কম দামে।

ওখান থেকে বেরিয়ে দুজনে এল বর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের বই পাড়ায়। এতদিনে অনেক প্রকাশকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে, কিছু কিছু ক'রে চেয়ে শ' দেড়েক টাকা ধার পেতে অসুবিধা হল না। হাতেও বিশ-পঁচিশ টাকা ছিল। কলেজ স্ট্রীটে ফিরে এসে আগেই একটা বড় ট্রাঙ্ক কিনল তাতে যত বই ধরে ঠেসে নিয়ে বাকী কতক বই একটা বড় প্যাকেট করল, তারপর সেই রাতের ট্রেনেই

বেরিয়ে পড়ল ভাগলপুর।

বই বাঁধাবার কথাও মাথায় এসেছিল। কিন্তু মলাট ছাড়া এমনি বাঁধিয়ে লাভই বা কি? আরও খরচ বৃদ্ধি—আরও আয়তন বৃদ্ধি।

ওরা সোজাসুজি লাইব্রেরীগুলোয় গিয়ে, কিছু কিছু অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি, সেই সঙ্গে বার লাইব্রেরী ইত্যাদি স্থানে গিয়ে প্রস্তাব দিল—যা পাঁচসিকে লেখা আছে তা দশ আনায় দেবে, তিন টাকারটা দেড় টাকায়। রহস্য লহরীর বই ছ' আনা হিসেবে।

ভাগলপুর আর পাটনার মধ্যেই সব শেষ ক'রে বারো দিনে মোট চারশ টাকা লাভ ক'রে ফিরে এল ওরা।

॥ ৪৭ ॥

কিন্তু—ততঃকিম?

সেই মূল প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে। এ সবই তো জীবনের বহিরঙ্গ দিক।

সাহিত্যজগতে কিছু কিছু—প্রতিষ্ঠা না হোক—স্বীকৃতি পেয়েছে। বড়লোক কোন কোন দ্বারপ্রান্তে—অপেক্ষমাণ নিঃস্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ওপরে উঠে যান সর্বদা। কাউকে সামান্য একটু মাথা হেলিয়ে পরিচয়টাকে স্বীকার মাত্র ক'রে যান। যাকে ইংরেজীতে 'নড' করা বলে।

বিনু এতদিনে সেই স্তরে পৌঁচেছে, পরিচিত কৃপাপ্রার্থীদের মধ্যে গণ্য হয়েছে। এই তো তার কাছে কল্পনাতীত ছিল—কিছু দিন পূর্বেও।

বই ছাপছেন প্রকাশকরা, কিছু কিছু টাকাও পাচ্ছে। তাতে অন্তত ওর নিজের খরচা চালিয়েও সংসারে কিছু কিছু দিতে পারছে। সাময়িকপত্রে দুহাতে লিখছে—তাদের প্রতিষ্ঠা বা পারিশ্রমিক দেবার ক্ষমতা চিন্তা না করেই। এখন অবশ্য প্রায় সব কাগজই টাকা দেন—কেউ বেশী কেউ কম। অংকটা নিয়ে মাথা ঘামায় না, কেউ এসে ধরলে বিনা পয়সাতেও দেয়। অনেক সৃষ্টি-বা কর্মশক্তি ওর ভেতরে যেন টগবগ করে ফুটছে—না লিখে থাকতে পারে না।

সবচেয়ে বড় কথা ললিতকে কাছে পেয়েছে। সে এখন একরকম নিত্য সাথী। দিন-রাতের অধিকাংশ সময়ই একত্রে কাটে।

তবু কেন মন ভরে না ওর? সেই যে একটা কি অবর্ণনীয় বিপুল তৃষ্ণা তা যেন বেড়েই যায়।

মধ্যে মধ্যে যেন পাগল হয়ে ওঠে সে, আকূতির নিষ্ফলতায়।

ওর নাম হয়েছে—যেটুকু হয়েছে মিষ্টি প্রেমের গল্প লেখে বলে। এ কথাটা ছড়িয়েছে লেখক মহলেই। তা সে তাঁদের কারও কারও কাছ থেকেই শুনেছে।

কিন্তু সে প্রেম ওর জীবনে এল কৈ?

জীবনে যা পেল না—তার স্বাদ কি নিজের সৃষ্টির মধ্যে, মিথ্যার মধ্যেই পেতে চায়? সাধ মেটাতে চায় নিজের সৃষ্ট পাত্র-পাত্রীদের দিয়ে!

ললিতকে কাছে পেয়েছে ঠিকই, দুজনের জীবন অনেকটা জড়িয়ে গেছে। সেও একটু একটু ক'রে স্বীকৃতি পাচ্ছে। বিশেষ নাটকের দিকে বেশ নাম

হয়েছে ওর। অভিনয় হচ্ছে অনেক জায়গায়। ওদের দুজনেরই কিছু কিছু গল্প ফিল্ম হয়েছে, হচ্ছেও। রেডিওতে দুজনেই বলছে মধ্যে মধ্যে। ওদের গল্প নাটক হয়ে অভিনীত হচ্ছে। দিন রাতের অধিকাংশ সময়ই তাই এক-সঙ্গে কাটে।

কিন্তু তবু সে কি বহু দূরে নয়?

সেই একটা পাগলামি, ওর একান্তভাবে পাবার—ভালবাসবার ও ভালবাসা পাবার স্বপ্ন সাধ সেকি মিটল এতে?

না, বরং কাছে থেকেও কাছে না পাবার যন্ত্রণা আরও বেশী।

দোষ ও ললিতকে দেয় না। দোষ ওর নিজেরই।

দোষ ওর বিচিত্র মানসিক গঠনের।

ললিত ওকে ভালবাসে—তার মতো করে। সাধারণভাবে বন্ধুকে যেমন ভালবাসে বন্ধু, তার চেয়ে বেশীই হয়ত বাসে। তবে সে সাধারণ মানুষ, তার মধ্যেও কাউকে পাবার, কাউকে ভালবাসার, কারও ভালবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকবে বৈকি!

সে 'কেউ' অবশ্যই মেয়ে, মেয়েছেলে। আর তাই তো স্বাভাবিক। তাইতো উচিত। বিশেষ যে কৈশোরেই মেয়েদের প্রেমে পড়েছে—সে আরও পড়বে।

এর মধ্যে পড়েওছে সে। সেই জন্যেই ললিতের কর্মজীবন মানে তার সৃষ্টিকর্মের জীবন বিঘ্নিত ব্যাহত হচ্ছে। বিনুর গতিতে তার চলা সম্ভব নয়। সৃষ্টি এমনই জিনিস—তা সে ছবিই হোক লেখাই হোক আর গান বাজনাই হোক—সেখানে কোন সপত্নীজাতীয়ার সহাবস্থান চলে না। সেখানে শিল্পীকে একক, নিঃসঙ্গ, অনন্যচিন্ত হতে হবে।

বিনু বলতে গেলে দুহাতে লেখে। পরিমাণে সেই সময়ে ললিতের সিকিও হয়ে ওঠে না। ছবির চাহিদা কমেছে, কিন্তু লেখার চাহিদা বাড়ছে। লিখে যা টাকা পায় তা ছবির থেকে বেশী। সে লেখাটাও হয়ে ওঠে না, সময় মতো দিতে পারে না।

কেন হয় না তাও বলে সে বিনুকে। বোধহয় একমাত্র তাকেই বলে সব কথা। একাধিক মেয়ে তার প্রেমে পড়েছে। সে যে তাদের সম্ভোগ করে তা নয়—তাদের আকুতি তাদের আকুলতা উপভোগ করে। আর তা করতে হলেও কিছুটা সময় তাদের দিতে হয়।

ললিত বলে, তার এ ব্যাপারটা নতুন নয় কিছু, বলতে গেলে বাল্যকাল থেকেই চলছে। কত মেয়ে যে ওর জীবনে এল। ওর যখন পনেরো বছর বয়স তখনই শুরু হয়েছে এ পর্ব। এখন নানা সূত্রে পরিচয় বেড়েছে সেই সঙ্গে প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণীদের পরিধিও।

ললিতের মধ্যে কি আকর্ষণ আছে তা সে নিজেই নাকি জানে না। হয়ত তাই। তবে তার জন্যে যে রীতিমতো গর্ব অনুভব করে সেটা বিনুর লক্ষ্য এড়ায় না।

ললিত বুঝতে পারে না তার প্রিয় বন্ধুর এই মনের কথা নিবেদনে সে

বন্ধুর মনের ব্যথা কী পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তীব্র জ্বালা অনুভব করে সে—গভীর অন্তহীন হতাশা।

তবে এর জন্যে কাকে দোষ দেবে সে ?

বিনু কি চায়—তা কি নিজেই ঠিক বোঝে ? ললিত যদি প্রশ্ন করে তাকে বোঝাতে পারবে ?

ওর বারবারই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই লাইন কটা—

'আকুল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম,
কস্তুরী মৃগ সম।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।'

আশা ভঙ্গ তার বারবারই ঘটেছে। সে জন্যে ও নিজেকেই দোষ দেয়—আর বোধ হয় ভাগ্যকেও দেওয়া চলে।

সেই ভাগ্যই তার মনে চিরকাল আশা ও কল্পনায় মেশা এক স্বপ্নলোক সৃষ্টি ক'রে রেখেছে, যা কেউ পায় নি, পাওয়া সম্ভব নয়—এমন জিনিসের ছবি সামনে ধরে রেখেছে—সাধারণ লোকের মতো জীবন নিয়ে সুখী ও নিশ্চিন্ত হতে দেয় নি।

দাদার বিয়েও তো এমনি এক আশাভঙ্গের ইতিহাস—যে আশার চেহারাটা এমনই এক কল্পনার রঙে আঁকা—যার সঙ্গে বাস্তবের মিল হয় না, হওয়া সম্ভব নয়।

দাদা অনেকদিন অপেক্ষা ক'রে ক'রে অবশেষে মন স্থির করেছিলেন। বিবাহের প্রয়োজন হয়েছিল অনেকদিনই, কিন্তু নিজের সঙ্গতির কথাটা হিসেব ক'রেই সে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। এখন চাকরিতে বেশ কিছু উন্নতি হয়েছে—যা হয়েছে অন্তত তাতে স্ত্রী-পুত্র কন্যা নিয়ে সংসার চালানো যায়—একটু জমিও কিনেছেন, পাড়াতেই আপিস থেকে ধার পাবেন তাতে ছোট্ট একটা বাড়ি করার অসুবিধা হবে না—এখন আর অপেক্ষা করার কারণ নেই।

কারণ কোন দিকেই যাতে না থাকে রাজেন সে ব্যবস্থাও করেছেন। বিনুকে ডেকে আগেই বলেছেন, বিয়ে করলে খরচ বাড়বে, বিনুকে এখন থেকে প্রতি মাসে নিয়মিত কিছু টাকা সংসারে দিতে হবে—কত দিতে হবে কম পক্ষেও তাও জানিয়েছেন।

বেশী কিছু নয়, যা চেয়েছেন তা বিনু দিতে পারবে, সে সহজেই রাজী হয়েছে। এখন তার বই আর কাগজের লেখা মিলিয়ে—আজকাল প্রায়ই বেনামে স্কুলের সহজপাঠ্য বই লিখছে সে,—এককালীন টাকার ব্যবস্থা, বই ভাল চললেও বেশী পাবে না, না চললেও লোকসান নেই—মাসে পঞ্চাশটাকা হয়। কোন মাসে বেশী পায়। কোন মাসে হয়ত খুবই কম—এইভাবে। এছাড়া

ছোটখাটো ব্যবসার ব্যাপার তো আছেই, মাঝে মাঝে দমকা কিছু কিছু টাকা এসে যায়। এগুলোতে জামা-কাপড় থিয়েটার সিনেমা সার্কাস কিছু শৌখিন দেশ-ভ্রমণ চলে, মাকেও কিছু কিছু দেয়।

আরও আসবে। লেখার চাহিদা বেড়েছে। গল্প অনেকেই চাইছেন। বড় উপন্যাসও একটা বড় সাপ্তাহিক ধারাবাহিক বার করবে—সম্পাদক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সে লেখাতেও হাত দিয়েছে। তবে এটা তাড়াহুড়ো করবে না সে। আস্তে আস্তে লিখবে। যে ছোট গল্প বেশী লেখে তার উপন্যাস লিখতে অসুবিধা হয়। সেটা জয় করতে হবে, সময় লাগবে তাতে।

মোটের ওপর দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বরং আনন্দ-সংবাদ।

ওদের বর্ণহীন একঘেয়ে সংসারে আলোকের বার্তা আনবে একটি মেয়ে, চিরদিন অন্ধকারই দেখেছে ওদের অন্তরঙ্গ জীবনে, সেখানে আলো জ্বলবে, প্রভাত হবে দীর্ঘ রাত্রিশেষে।

বিয়ের আগে যে পর্ব—পাত্রী নির্বাচন সে ভারটা ওর ওপর—ওদের ওপরই এসে পড়ল প্রধানত, ওর আর ললিতের ওপর।

ওরা পছন্দ করলে মা দেখবেন। দাদা দেখবেন না। বলেই দিয়েছেন, বিস্ময়টা নষ্ট করতে চান না, আগে দেখলে অভিনবত্ব চলে যায়।

বিনুর মহা উৎসাহ। অনেকদিন পরে নতুন আশার স্বপ্ন দেখছে সে। বিচিত্র অভাবিত কল্পনার উৎস খুলে গেছে। প্রবল একটা আবেগের দোলায় দুলছে মন। স্বর্গ রচনা করে চলেছে সে, বহু বর্ণাঢ্য বহু অভিজ্ঞতার—অতন্দ্রী চিত্র অঙ্কিত হচ্ছে চিন্তা-ভাবনায়।

বৌদি।

পাতানো নয়, পাড়া সম্পর্কে নয়। আপন বৌদি।

ছোটখাটো সুশ্রী একটি মেয়ে, হাসিখুশী প্রাণোচ্ছল।

দুটি কোমল অপটু হাতে সংসারের খুঁটিনাট কাজ ক'রে যাচ্ছে, দাদার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করছে। বেচারী দাদা এতখানি বয়সে যা কখনও পায় নি। বাইরে দেখে এসেছেন আনন্দের হাট, বাড়িতে যার আভাস মাত্র পাওয়া সম্ভব হয়নি। ঐ নতুন মেয়েটি প্রেম দিয়ে মাধুর্য দিয়ে তাঁর সেই বহুদিনের বুভুক্ষা, আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিবারণ করছে, অমৃত সিঞ্চনে মরুভূমিতে স্বর্গোদ্যান রচনা করছে। এতদিনের ক্লিষ্ট জীবনসংগ্রাম, শ্রান্ত দেহ ও মনে নতুন উদ্যম সঞ্চার করছে।

নতুন উৎসাহ উদ্যম সঞ্চার করবে বুঝি বিনুর জীবনেও।

তার কাছে আবদার করবে, ফরমাস করবে নানাবিধ, তার ফরমাস খাটবেও। ওর ছোটখাটো স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করবে সে। সর্বোপরি পরিহাসে রসিকতায় সহানুভূতিতে সহবেদনায় ওর সকল ব্যথা ওর বিপুল শূন্যতাবোধ ভুলিয়ে দেবে।

নতুন ক'রে দ্বিগুণ উৎসাহে পরিশ্রম করবে, তাতেই আজকের এই সামান্য সাহিত্যিক পরিচয়ে বিপুল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা আসবে। এক অঙ্কুর স্নেহমমতা

রসিকতার বারিনিষেকে বিরাট মহীরূপে পরিণত হবে।

একেবারে অসম্ভব কল্পনা কিছু নয়। বড় বেশী আশা করছে না সে।

এমন দেখেছে বৈকি।

বহু দেশে এখন যাতায়াত। বহু গৃহে অতিথি হতে হয়েছে। সাধারণ নিম্নবিত্ত গৃহস্থবাড়ি থেকে অধ্যাপক, ধনী—সব রকম পরিবারেই এক আধ দিন থাকতে হয়েছে। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের বাইরে দাঁড়িয়ে একটি ভদ্রলোক —দীন বেশ মলিন মুখ—ঘি বিক্রী করছিলেন; মুড়াগাছায় বাড়ি, আশে-পাশের গ্রাম থেকে ঘি এনে ব্যবসা করছেন, বা করার চেষ্টা করছেন। এক বাঙ্গালী ফার্মে কাজ করতেন সে ফার্ম উঠে গেছে তাতেই এই দুর্গতি। সামান্য দু চার বিঘে জমি আছে, একান্নবর্তী পরিবার তাই ভিক্ষে করতে হচ্ছে না একেবারে, তবে সংসারও বড়, কিছু না আনলে ঋণের দায়ে ওটুকু জমিও চলে যাবে।

কথায় কথায় আলাপ জমে উঠল। বিনুর তখন মাথায় গেছে বাইরে থেকে ভাল ঢেঁকিছাঁটা চাল কিনে এনে পরিচিতদের মধ্যে সরবরাহ করবে। ওর কাছে কথাটা পাড়তে উনি খুব আগ্রহ দেখালেন। ওঁদের দেশের চাল বড় মিষ্টি, দামেও সস্তা। বিনু যদি যায় উনি ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘাঁৎঘোঁৎ সব দেখিয়ে দেবেন, মহাজনদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন, সাহায্য যতটুকু যা করতে পারেন তার কোন অভাব ঘটবে না।

খুব আগ্রহ দেখালেন। সেদিনই ধরে নিয়ে যেতে চান। দিন কতক পরে সত্যিই একদিন গেল বিনু। বিকেলের ট্রেনে গিয়ে রাত হল পেঁছিতে। সে-রাত্রি ওঁদের বাড়ি অতিথি হওয়া ছাড়া উপায় নেই। একান্তই নিম্ন মধ্যবিত্তের সংসার। দাদা এক স্থানীয় মহাজনের গদীতে খাতা লেখেন, বাকী সবটাই নির্ভর ছ-সাত বিঘে জমির ওপর। বাড়ি পাকা, তবে কতকাল মেরামত হয়নি, এমন কি চুনও পড়েনি তা অনুমান করতে ভয় করে। অনেকগুলি লোক। খাওয়া—ওর জন্যেই একটু বিশেষ আয়োজন হয়েছে তা বুঝতে পারল। খুবই সাধারণ।

কিন্তু তবু কি আনন্দের হাট। বৌদি বয়স্কা। তৎসত্ত্বেও রসে রঙে যেন টলটল করছেন। তিনি নিজের বিবাহযোগ্যা মেয়ে, ছোট জা, দেওর স্বামী—সকলের সঙ্গেই প্রতি মুহূর্তে রসিকতা করছেন, আর তার ফলে বাড়িময় অট্টহাস্য উঠছে। বিনুকেও রেহাই দিলেন না। প্রথম পরিচয়ের জড়তা ভাঙ্গতে যা দশ-পনেরো মিনিট দেরি। তারপরই শুরু হয়ে গেল তাঁর কণ্টকহীন কথার খোঁচা। আর তেমনি কথায় কথায় ছড়া। এত ছড়াও জানেন ভদ্রমহিলা।

ওখানে ব্যবসায় কোন সুবিধা হয়নি। তবে সে রাত্রের স্মৃতি চিরদিন অম্লান হয়ে আছে ওর মনে।

এই শহরেও দেখেছে বৈকি। কলকাতাতেও কত বাড়িতে যেতে হয়। অনেক পরিবারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছে। দেওর বৌদির মধুর সম্পর্ক অনেক দেখেছে। বইতে পড়ছে তো আবাল্য। এক এক সময় মনে হয় এর

চেয়ে মধুর সম্পর্ক পৃথিবীতে নেই, 'কাম গন্ধ নাহি তায়।'—কলুষিত কামনা বাদ দিয়ে মেয়েরা পুরুষের জন্যে স্বর্গ রচনা করে—করতে পারে দুই রূপে। মা দেন অমৃত, সঞ্জীবনী সুধা, বৌদিরা দেন মাধুর্য বিকশিত হবার উপাদান। একটা বাঁচার আর একটা বেঁচে থাকার শক্তি, যুদ্ধ করার ক্ষমতা যোগায়। মেয়েরা বাপের কাছে পায় অনেক, দিতে পারে কতটুকু? তাদের স্বতন্ত্র জীবন তাদের সংসার মনের অন্য দিকগুলোকে আবৃত আচ্ছন্ন করে রাখে। বোনেরাও তাই। নিজের সংসার নিজেদের স্বার্থ সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা ক'রে তবে বাবা কি দাদার কথা ভাবার সময় পায়।

আশা উত্তুঙ্গ শিখরে পেঁছিলে তার পতন বোধ করি অনিবার্য, সে পতনের বেদনাও বড় দুঃসহ। উঁচু থেকে পড়লে যেমন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে যায়—মনেরও তেমনি ভাঙ্গে। বোধ হয় এ ক্ষতি আরও বেশী।

বৌদি এলেন, বিনুই পছন্দ করল, মা অনুমোদন করলেন শুধু।

ভদ্রঘরের মেয়ে, কিছু লেখাপড়াও জানেন, গানের গলা মিষ্টি, শান্ত ভদ্র, সংসারে মন আছে। অল্প বয়স—সেখানটায় কল্পনার সঙ্গে মিলে যায়। অপরূপ সুন্দরী কিছু নন, মোটামুটি চলনসই চেহারা, নিন্দা করার মতো নয়।

কাজকর্ম কিছু জানতেন না, কিন্তু শেখার আগ্রহ ছিল, অজ্ঞানের ঔদ্ধত্য ছিল না। মার কাছ থেকে সবই শিখে নিলেন। রান্নাবান্না, ঘরদোরের শ্রী বজায় রাখা, দাদার দরকারী জিনিস হাতে হাতে গুছিয়ে দেওয়া—একে একে সবেতেই অভ্যস্ত হয়ে এলেন, পারিপাট্যও আয়ত্ত হল।

দাদা তৃপ্ত, মাও। বধূদের সম্বন্ধে শাশুড়ির স্বাভাবিক ঈর্ষা বা বিদ্বেষও প্রকট হতে পারে নি বৌদির শান্ত স্বভাবের গুণে। বরং এক এক সময় মার আচরণেই বিনু অবাক হয়েছে—এত বই পড়া ও অপরের সংসার দেখার অভিজ্ঞতা সত্বেও। শাশুড়ি ও ননদ সব দেশেই সমান এ ইংরেজী বই পড়ে ও জেনেছে। 'ঈস্টলীন উপন্যাসে বেচারী ইসাবেলের জীবনটা নষ্ট করে দেন অনূঢ়া ননদ কর্ণেলিয়া। এতো ছেলেবেলাতেই পড়েছে। তবু অবাক হয়েছে, ওর সেই দেবীর মতো মা—মহিমময়ী সহনশীলা, শান্ত, সংযতবাক মা—তিনি প্রবলতম আঘাতেও ধৈর্য হারান নি—সে মা বহুদিনই হারিয়ে গেছেন, তবুও অপর সাধারণ গৃহিণীদের মতো তিনিও পুত্রবধূ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা বোধ করবেন—তা সে ভাবেনি।

তা হোক—তৎসত্বেও শান্তির সংসারই ওদের—মানতে হবে।

শুধু বঞ্চিত হল, অশান্ত রইল বিনুই। ওরই অদৃষ্ট ওর সঙ্গে আবারও বড় রকম পরিহাস করল একটা, ওর স্বপ্ন একটা রূঢ় আঘাতে ভেঙ্গে গেল, ভেঙ্গে দিল ওর ভাবপ্রবণতাকে, আবেগকে।

বৌদি ও দেওরের মধুর সম্পর্কটা কিছুতেই গড়ে উঠল না ওদের মধ্যে। বৌদি রসিকতা তত বোঝেন না, করতেও পারেন না। বিনু চেষ্টা করতে গেলে

হিতে-বিপরীত হয়েছে। কোনো সূক্ষ্ম কোমলতা—মন বোঝার চেষ্টা তার তত আসে না। কোথায় যেন তার প্রবল স্নেহের ঢেউ আশ্বাস দেবার আশ্রয় পাবার প্রয়াস আহত হয়ে ফিরে আসে। সেই সুরটি বাজে না যার জন্যে তার প্রাণ তৃষ্ণার্ত উৎসুক ছিল।

একটু কি নিষ্প্রভ, প্রাণের উত্তাপহীন। অথবা উদাসীন, ইংরেজীতে যাকে বলে 'ক্যালাস' সেই রকম উদাসীন? অনুভূতি কম?

তাহলেও বিনুর বিশেষভাবে অনুযোগের কোন কারণ নেই। সে ভাব তাঁর স্বামী সম্বন্ধেও এমন কি সন্তানদের সম্বন্ধেও লক্ষ্য করেছে। বাড়াবাড়ি আদিখ্যেতা—ওঁর আসে না। 'অত মনে থাকে না বাপু কিংবা ঘরে খাবার থাকে জানেই তো, তৈরী হয় তো রোজই—চেয়ে নিতে পারে না? মনে করিয়ে দিলে কি হয়?' এই সব ছিল তাঁর যুক্তি। দাদা আপিসে বেরিয়ে যাবার পর কিছু রান্না হলে দাদার অংশ রাত্রের জন্যে তোলা থাকে। সেটা অর্ধেক দিনই তাক থেকে পেড়ে বা ঢাকা থেকে বার ক'রে দিতে ভুল হয়ে যায়। পরের দিন ফেলে দেবার সময় তিনিই অনুযোগ করেন, জানে তো থাকেই। একবার কেউ মনে করিয়ে দিলেও তো পারে। যত দায় যেন আমার।'

কথাটা সত্য। মাও জানেন, বিনু জানে, দাদারও অনুমান করা উচিত।

সুতরাং বিনুর নিজেকে বিশেষভাবে বঞ্চিত বা অবহেলিত মনে করার কোন কারণ নেই। রসিকতাবোধ—করা বা উপভোগ করা—ঠাট্টা তামাসার প্রবণতা, এ সকলের থাকে না। এর জন্য প্রত্যেকের দৈহিক তথা মানসিক গঠনই দায়ী—মানুষ কি করবে। দোষ দিতে হলে সৃষ্টিকর্তার দোষ দিতে হয়, প্রকৃতির খেয়ালকে দায়ী করতে হয়।

এ সবই বোঝে বিনু, তবু সেই একটা প্রচণ্ড আশাভঙ্গের দুঃখ অবলম্বনহীনতা শূন্যতা বোধও না করে পারে না।

বড় বেশী আশা করে, বড় বেশী চায় বলেই তাকে বারবার জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমন আঘাত পেতে হয়।

পৃথিবীতে শিল্পী মাত্রেই একক ও নিঃসঙ্গ। বিধাতার ছন্নছাড়া সৃষ্টি। ঘরছাড়া বন্ধুছাড়া ক'রেই তাদের পাঠান। তাদের আবেগ, তাদের প্যাসন, তাদের নিজস্ব বিচার বিবেচনা, প্রাপ্য সম্বন্ধে ধারণা—কারও সঙ্গে মেলে না, বলেই তাদের নিয়ে বই লেখা হয় পাঠকরা জীবনকাহিনীর মধ্যে দিয়ে তাদের মনের গতিটা বুঝতে চেষ্টা করেন।

বিনুই বা অন্যরকম হবে কেন? সে কত বড় শিল্পী অথবা আদৌ শিল্পী কিনা—সে নিরবধি কাল বিচার করবেন। সে শিল্পী হতে চায়, সেই মানস নিয়েই জন্মেছে, ভবঘুরে সৃষ্টিছাড়া সে। তার জীবনে বাইরে থেকে যতই যা পাক—ভেতরটা শূন্যই থাকবে চিরদিন।

এইটে মেনে নিতে পারলেই হয়।

আশা না করলে আশাভঙ্গের প্রশ্ন ওঠে না।

অনেক দিন আগে প্রবাসীতে এক প্রাচীন পারসিক চিত্রের প্রতিলিপি বেরিয়ে

ছিল, সেই সঙ্গে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অজ্ঞাতনামা এক ফার্সী কবির দু-তিনটি শ্লোকও।—সেগুলি অনুবাদ করে দিয়েছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তার একটা শ্লোক আজও মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে—অবশ্য যদি স্মৃতি তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা না করে থাকে—

'জীবনপথে যাহা আসে,
যে বা আসে সামনে তোমার
হাস্যমুখে তারেই বরো,
মুক্ত রেখো বক্ষ আগার।'

বোধ হয় ওর পরের শ্লোকটায় ছিল,

'সেই তো ভাল, ধন্য তুমি,
দিলে না মোর মিটতে আশা,
বেদন নিয়ে নিলাম মরণ,
বিদায়, ওহো ভালবাসা।'

এই দুটো শ্লোক আজও বার বার মনে হয়।

তবু ঐ আগের শ্লোকের সত্যটা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারে কৈ?

॥ ৪৮ ॥

পিতৃকুলের সঙ্গে যোগাযোগ নেই দীর্ঘকাল। অনাবশ্যক বোধেই সেটা রাখার চেষ্টা করে না ওরা। কেবল মহামায়া সুযোগ-সুবিধা পেলেই সংবাদের টুকরো সংগ্রহ করেন। শ্বশুর-কুলের সংবাদ সম্বন্ধে আজও তাঁর আগ্রহ ও কৌতূহলের অন্ত নেই। এমন কি এক-একসময়ে তা আকুলতার পর্যায়ে পেঁছয়। ইচ্ছা প্রবল বলেই সুযোগের অভাব হয় না।

ওঁর কাছে খবর পেঁছয় বলেই তা বিনুদের কানেও আসে। তারাপ্রসাদ বন্ধুদের ধরে ও জড়িয়ে অনেক ব্যবসার পত্তন করেছেন এমন কি ভাইপো কনককেও বাদ দেননি। তাকে অংশীদার ক'রেও একটা কাজে নেমেছিলেন। লোকটি বুদ্ধিমান, কর্মঠ—মোটামুটি সৎ, তবু অদৃষ্ট গুণেই একটাও দাঁড়ায় নি। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে কোনমতে জীবনধারণের জন্যে অবিরাম যুদ্ধ ক'রে যেতে হচ্ছে। তবে পাঁচজনের চেষ্টায় বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে, খুবই অল্প বয়সে—কিন্তু ভাল পাত্র বলে তারাপ্রসাদ দ্বিধা করেন নি। সেদিক দিয়ে একটা অভিভাবকই হয়েছে বলতে হবে।

রাধাপ্রসাদ মধ্যে শেয়ার মার্কেটে বড় লোক হবার চেষ্টা করেছিলেন, তাতে প্রচণ্ড ঘা খেয়েছেন, মধ্যে ইনসলভেনসিও নিতে হয়েছিল। এখন পূর্নমূষিকো। নিজের বৃত্তির ওপর নির্ভর ক'রেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

অনাদির অবস্থাই সবচেয়ে ভাল। মোটা মাইনের চাকরি। তার এখন আয় মাসিক আড়াই হাজার ছাড়িয়ে গেছে। কৃপণ নন। হিসেবী মিতব্যয়ী মানুষ। কাজেই টাকা কিছু হাতে জমেছে।

কনকের খবরও পায় বৈকি।

সে ইতিমধ্যে অনেক কারবার দেখে এখন একটা কাগজ বার করেছে। মাসিক ও সাপ্তাহিক।

কোন ব্যবসাই চালাতে পারে নি। এটাও পারবে না। লেখাপড়া জানে, ইংরাজী ভাল লিখতে পারে, বুদ্ধিমান—ব্যবসা চলে না অতিরিক্ত অলস বলে। ভাগ্যক্রমে সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছে—ফলে ঘর ছেড়ে কোথাও যায় না। মনে হয় যেন স্ত্রীকে চোখের আড়াল করতে ভরসা পায় না। কেউ কেউ বলে, বিশ্বাস করে না বলে পাহারা দেয়।

এসব ক্ষেত্রে অল্পবয়সী ছেলেদের হাতে টাকা পড়লে যা হয়—কতকগুলি মোসাহেব জুটেছে। যত ব্যবসাই করতে যাক, ঐগুলি এসে পড়ে তার মধ্যে, কাজের ভার নেয়। তাদের উন্নতির অবধি নেই, এক একজন ঘরবাড়ি করে ফেলেছে এর মধ্যেই—লোকসান খাচ্ছে কনক।

সেজকাকা অনাদি একটা ভাল চাকরি দিতে চেয়েছিলেন। বিলিতি ফার্মের চাকরি। তাদের সঙ্গে অনাদির বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক আছে—তারা গোড়াতেই আড়াইশো টাকা দিতে চেয়েছিল। 'ও আমার ভাল লাগে না' বলে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। এই ধরনের উপদেশ আর উপকারের চেষ্টার উত্তর দিতে হবে এই ভয়ে সে কাকাদের বাড়ি কখনও যায় না—তাঁরাই আসেন খবর নিতে।...

এসব সংবাদ নানা সূত্র থেকে সংগ্রহ করেন মহামায়া, তা বিনুর কানেও যায়।

ইদানীং তার মাথায় এই কনকের কথাটা ঘুরছে।

সাময়িক পত্র। সাপ্তাহিক ও মাসিক।

বিনুর হাতে যদি পড়ত।

অনেকদিন ধরে নানাদিক বিচার ক'রে কোন কথা ভাবা বিনুর ধাতে নেই। সে কয়েকদিনের মধ্যেই মন স্থির ক'রে ফেলল। স্টলে কাগজ দেখে ঠিকানা যোগাড় ক'রে একদিন আপিসে গিয়েও হাজির হল।

যাঁরা আপিসে ছিলেন—দুজন বেশ সুবেশ ভদ্রলোক, তাঁরা একটু অবজ্ঞার চোখে তাকালেন, একজন রুক্ষস্বরে বললেন, 'কনকবাবু, এখন আপিসে নেই, কখন আসবেন বলতে পারি না।'

বিনু অসহায়ভাবে ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। একপাশে একটি রোগামতো ছোকরা বসে কি খাতা লিখছিল। বিনু এ ভদ্রলোকদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে তার কাছে গেল। ছোট ডেস্ক, এপাশে একটা টুল। বিনা আমন্ত্রণেই টুলে বসে একটু সাহায্য পাওয়ার ভঙ্গীতে প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল।

সেই লোকটি বা ছোকরাটি বোধহয় এঁদের উপর খুব তুষ্ট নয়, সে অনেক খবর দিল। কতক এঁদের শ্রুতিগোচর করে, কতক ও দুজনের কানে না যায় এমনভাবে গলা নামিয়ে—এই বাড়ির ওপরতলাতেই কনকবাবু থাকেন কিন্তু

তিনি আপিসে আসেন সপ্তাহে একদিন, সেটা পর্যায়ক্রমে আটদিন বাদ বাদ গিয়ে পড়ে। তেমন কোন নিয়ম ঠিক বাঁধা নেই, কিন্তু উনি যা তারিখ দেন তাতে ঐরকমই দাঁড়ায়। মানে এ সপ্তাহে মঙ্গলবার এলে পরের সপ্তাহে বুধবার আসেন। এবারে শুক্রবার—অর্থাৎ আসছে কাল আসবার দিন।

আরও বলল ছেলেটি।

এ'রা বাবুর বন্ধু, এ'দেরই কাজকর্ম দেখার কথা, এ'রা এসে শুধু মুহুর্মুহু চা আনান, মধ্যে মধ্যে সিগারেট—আপিসেরই খরচায়—অথচ সে টিফিন তো দূরের কথা, এক কাপ চাও পায় না। খানিকটা এমনি সভা সাজিয়ে বসে থেকে খরচার নাম ক'রে কিছু টাকা নিয়ে সরে পড়েন। একবার শুধু নিয়ম ক'রে ওপরে ওঠেন, বিরাট কাজের ফিরিস্তি দেন, বাবুর উপদেশ শোনেন—বাবু ভাবেন এদের মতো কর্মী আর জগতে হয় না। অথচ এদিকে প্রুফ দেখার একটা লোক নেই, প্রেস যা ভাল বোঝে তাই করে, ফিল্ম কোম্পানীর লোক এসে দয়া ক'রে কিছু কিছু ব্লক দিয়ে যায় তাই সাপ্তাহিকে ছবি ছাপা হয় —যে সব লেখা ডাকে আসে—প্রেস কপি চাইলে তাই কতকগুলো বার ক'রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এইভাবে কাগজ চলবে? কোন কোন বড় লেখকের কাছে বাবু মধ্যে চিঠি দেন লেখার জন্যে, কিন্তু তাঁদের কি গরজ তাঁরা এসে লেখা পৌঁছে দিয়ে যাবেন? একে তো টাকা দেন চোদ্দ মাস পরে, যতটা সম্ভব কম। তার ওপর এ'রা কেউ তাগাদাতেও যান না। কাউকে পাঠানও না, যদি বাসভাড়া বলে গাদা গাদা পয়সা নেন। একটু লক্ষ্য ক'রে বুঝল বয়স হয়েছে—বিনুর থেকে অনেক বেশী। বেশ হাসিখুশী; একটু কথা বলেই মনে হল সে দেখেছে অনেক। খবরও রাখে—সেটা ঐ বাঁকা মন্তব্য থেকেই বোঝা গেল। কিন্তু বিষ নেই, এসব মন্তব্যের মধ্যে রসিক দর্শকের সুরটাই বেশী বাজে।

তারও বিনুকে ভাল লেগে থাকবে, সে চুপিচুপি বলে দিল, পরের দিন বেলা দুটো নাগাদ আসতে। ঐসময় বাবু নেমে একটু হিসাবপত্র দেখেন—সে সময় মোসায়েবরা কেউ বড় একটা আসে না।

পরের দিন ঠিক দুটোতেই পৌঁছল বিনু। কিন্তু কনক তার আগে থেকেই আপিসে এসে বসেছেন, রাখাল খাতাপত্র সামনে সাজিয়ে দিয়েছে।

কনককে এই প্রথম দেখল বিনু। সুপুরুষ শুধু নয়—সুন্দরও। অনেকটা রাজেনের মতো ধাঁচ আসে, তবে এ'র রঙ একেবারে সাহেবদের মতো—চোখ দুটিই বিশাল। মনে হয় সব পৃথিবীটা একেবারে দেখতে পারেন, একসঙ্গে।

'কি চাই?' বেশ ভদ্রভাবেই প্রশ্ন করলেন কনক। পূর্বদিনের বাবুদুটির মতো ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞার ভাব নেই এ'র, তবে একটু কৌতুক আছে চোখে। অর্থাৎ নবীন কবি, কবিতা এনেছে, ছাপাবার আশায়—সে তো দেখাই যাচ্ছে।

বিনু সেটা বুঝেই সোজাসুজি কাজের কথা পাড়ল।

সে লেখে, বহু কাগজেই। তার লেখা ছাপা হয়েছে, 'নন্দনবাজার' 'যুগবিপ্লব' 'দেশবিদেশ' পুজোসংখ্যায় বার্ষিক সংখ্যায় তার গল্প ছাপেন।

গল্প প্রবন্ধ নাটক সবই লিখতে পারে। বড় লেখকদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় আছে, তাঁরা স্নেহ করেন। পরিশ্রম করতে পিছপাও হবে না। সে বইয়ের ক্যানভাসার হিসেবে বাংলাদেশের বহু জেলা ঘুরেছে, এখন বাংলার বাইরেও যায় কোন কোন প্রকাশকের হয়ে।

তাকে একটা চাকরি দেবেন ওঁরা? সামান্য মাইনেতেও সে কাজ করতে রাজী আছে। সে কৃতিত্ব দেখাতে পারলে নিশ্চয় ওঁরা তার কথা বিবেচনা করবেন, আর সে কৃতিত্ব দেখাতেও পারবে—সেটুকু আত্মবিশ্বাস তার আছে।

কনকবাবু অনেকক্ষণ বড় বড় চোখ মেলে ওর দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'আমার খবর কে দিলে তোমায়?'

চমকে উঠল বিনু।

তুমি! ওকে দেখে কেউ কখনও প্রথম পরিচয়ে তুমি বলে নি।

তবে কি উনি চিনতে পেরেছেন ওকে!

সে মাথা নিচু করে উত্তর দিল, 'স্টলে কাগজ দেখে ঠিকানা যোগাড় করেছি। কালও একবার এসেছিলুম, শুনলুম আপনি আজ আসবেন আপিসে।'

আবারও সেই নীরবতা আর স্থির দৃষ্টি। যেন মনে হয় ওর আপাদমস্তক দেখে ওর কর্মশক্তি অন্দাজ করতে চান। একটু পরে বললেন, 'আমি তোমার দু-একটা লেখা পড়েছি। কাগজ সবই আসে, তবে বেশী সময় পাই না পড়ার। শরীরও ভাল থাকে না। মাথাধরার অসুখ আছে—অধিকাংশ সময়ই ওষুধ খেয়ে পড়ে থাকি।...তা কাজ তুমি করতে পারো—সম্পাদকের দায়িত্ব যদি কিছু নিতে পারো তো ভাল হয়। ডাকে যেসব লেখা আসে সেগুলো পড়া, বড় লেখকদের বাড়ি হাঁটাহাঁটি করা—এগুলো দরকার। তবে মাইনে এখন আমি দিতে পারব না। কাজ করো—একসপিরিয়েন্স হবে, সেটাই তো তোমার বড় লাভ। ট্রাম-ভাড়া টাড়াগুলো দিতে পারি। এই পর্যন্ত।'

এ আবার কি অদ্ভুত প্রস্তাব। কাজ করতে পারো—তবে এটা তোমার চাকরি নয়। বিনা মাইনেয় বেগার দিয়ে কৃতার্থ হওয়া।

বিনু কিছুকাল বিমূঢ়ভাবে বসে থেকে রাজী হয়ে গেল।

এ যা দেখছে—এখানে তো কেউ অভিভাবক নেই, ন তাত ন মাতা—স্বাধীনতা তো পাবে।

কখন আসবে, কি কাজ করতে হবে মোটামুটি বলেই দিলেন। কোথায় লেখা থাকে তাও। ততক্ষণে সে বন্ধু দুটিও এসে গেছেন। তাঁরা খুব খুশি হলেন না—বলাই বাহুল্য। এই ছোকরা কাল এসেছিল ভয়ে ভয়ে - আজ এখানে কাজে লেগে গেল—কী ব্যাপার? এই তাঁদের মুখের ভাব। সন্দিগ্ধ ও বিস্মিত। তবে কিছু বললেন না। এটা, মানে এখানের পরিশ্রম তাঁরা বন্ধুকৃত্য হিসেবেই করেন, সে ভাবটা বজায় রাখা দরকার। তাছাড়া ওঁর সামনে একটু কর্মব্যস্ততাও দেখাতে হবে। একজন কতকগুলো ধুলিধুসর লেখার বাণ্ডিল নিয়ে বসে গেলেন, আর একজন বিজ্ঞাপনের খাতা খুলে রাখালকে ধমক দিতে লাগলেন।

বিনু এঁদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা না করে—জলে বাস করতে গেলে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা যায় না—হাত তুলে সবিনয়েই নমস্কার জানাল, কিন্তু ভবিষ্যতের কাজকর্ম যতদূর সম্ভব রাখালের কাছেই বুঝে নিল, এঁদের সামনেই।

কাজ সেরে বিদায় নিয়ে উঠতে যাবে—কনকবাবু যেন একটি বোমা ছুঁড়লেন। ধীরে মৃদু কণ্ঠে, অত্যন্ত সহজভাবে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি একদিন সেজকাকার কাছে গিয়েছিলে? একটা পুরনো আলমারি বেচতে?'

উত্তর দিতে বেশ একটু সময় লাগল।

সদাসপ্রতিভ বিনুও যেন কিছুক্ষণ কোন শব্দ বা কণ্ঠস্বর খুঁজে পেল না। তারপর কতকটা আমতা আমতা করেই বলল, 'তিনি—তিনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন? কিন্তু আমি তো পরিচয় দিই নি।'

'তোমার চেহারা দেখেই চিনেছেন। আমি চিনলুম কি ক'রে!'

এবার বিনু আর থাকতে পারল না। বহুদিনের নিরুদ্ধ অভিযোগ, বেদনা ও তিরস্কার বেরিয়ে এল ওর চাপা গলায়, 'তা যদি পেরেছিলেন, এতই যখন সাদৃশ্য চেহারায়—আমাদের স্বীকৃতি দেন না কেন? সেদিন দেননি কেন?'

কনক একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'সেজকাকা আমার বাবাকে খুব ভক্তি করতেন, মাকে মানে ওঁর বৌদিকে দেবী ভাবতেন। তোমাদের স্বীকার করলে বাবা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হন, মার অপমান করা হয়—সেটা উনি সহ্য করতে পারবেন না। তোমার কথাবার্তা ব্যবসা-বুদ্ধির খুব তারিফ করেছেন অবশ্য, তবু তুমি আর কখনও যেয়ো না—উনি এই স্মৃতিটাতেই বড় আপসেট হয়ে পড়েন।'

কাগজ দুটি নিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম শুরু করল বিনু।

আপিসে বসে তিন চার ঘণ্টা তো বটেই, কিছু কাজ—যেমন ডাকে-আসা লেখার তাড়া—বাড়িতেও নিয়ে যেতে লাগল। ঘোরাঘুরির তো অন্ত রইল না।

প্রথম প্রথম লজ্জায় ট্রাম বাস ভাড়াও চাইতে পারত না, রাখালই জোর ক'রে এক টাকা দু টাকা গছিয়ে দিত—ভাউচার সই করিয়ে।

'আপনি যেমন ন্যাকা। দেখছেন ঐ রাঘব বোয়াল মোসায়েবগুলো যথাসম্ভব হাতিয়ে নিচ্ছে। লোকটাকে তো দেউলে খাতায় নাম লেখাতে হল বলে।...আর বাবু যে আপনার খাটুনি দেখে কাজ দেখে নিজে থেকে গাড়ি ভাড়া কি অন্য খরচা দেবেন—সে আশা মনেও ঠাঁই দেবেন না। তেমন লোকই নয়।'

অগত্যা নিতে হয় এই টাকাটা। এখানে এতটা সময় যাবার ফল ওদিকের উপার্জনে ক্ষতি হচ্ছে। এত পয়সা পাবেই বা কোথায়?

॥ ৫৮ ॥

শেষ পর্যন্ত এমন হল—সেই হাতে-লেখা কাগজের মতো গল্প-উপন্যাস, গোয়েন্দা গল্প, মায় প্রবন্ধ পর্যন্ত লিখতে হত ওকে। যেসব লেখা ডাকে আসে

তার বেশির ভাগই কাঁচা, খুবই কাঁচা। অনেক সময় সেগুলোই নতুন ক'রে লিখে দিত, তাদের নামেই ছাপা হত। ওর কোন লাভই হত না—বরং পরিশ্রম বেশী হত।

এছাড়া থিয়েটার সিনেমার সমালোচনার কাজটাও ওর ওপর এসে পড়ল ক্রমশ। যে দুই বন্ধু এসব দেখতেন তাঁরা দুজনেই এখানের অভিজ্ঞতা ও পরিচয়ের পুঁজিতে দুখানা সাপ্তাহিক কাগজ বার করেছেন, তাঁদের এসব কাজ আর ভাল লাগে না। এখানের 'রস'ও কমে আসছে দ্রুত—তাঁরা নিজেদের কাগজেই ভর করছেন বেশী, খাটতেও হচ্ছে—তাঁরা এদিকেও আর বিশেষ আসেন না।

কনক কাগজ থেকে কিছুই আর করতে পারেন না; সাপ্তাহিকটায় মাসে দুশো আড়াইশো টাকা আসে তবু, মাসিকটা ডাহা লোকসান। বন্ধু দুজন অন্য পথ ধরেছেন। এইসব চোতা এক পয়সা দু পয়সা দামের কাগজ—ভদ্রতা সভ্যতা রুচি বজায় রাখাটা এদের পক্ষে খুব প্রয়োজন বা বাধ্যতামূলক নয়। বরং এসব কাগজের পাঠকরা রঙ্গরস গালাগাল খিস্তি খেউড়ই পছন্দ করে। সুতরাং এতে 'ব্ল্যাকমেল' করার খুব সুবিধে—অর্থাৎ অপদস্থ করার ভয় দেখিয়ে ধনী বা পদস্থ লোকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা। তাই তাঁরা দুচার টাকা বিজ্ঞাপন সংগ্রহের ধান্দায় না ঘুরে—সেই দিকটাতেই বেশী মন দিয়েছেন, তাতে আসছেও কিছু।

কনকের এসব ধাতে সয় না। এতটা নিচে নামতে পারে না সে। তাছাড়া নিজের বহির্জগতে যাতায়াত না থাকলে কার কোথায় কি গোপন ক্ষত তা জানা সম্ভবও নয়। বিনু মাস ছয়েকের মধ্যেই ব্যাপারটা দেখে নিয়ে ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করল মাসিকটা বন্ধ করে দেওয়াই শ্রেয় তাতে লোকসানটা বন্ধ হবে। বরং সেই সময়টা আরও মনোযোগ সাপ্তাহিকের দিকে দিলে বেশী কাজ দেবে।

উনি রাজী হলেন না। তবে প্রতি সংখ্যা সাপ্তাহিকে পর্যায়ক্রমে ভূতের গল্প বা গোয়েন্দা গল্প লেখার জন্যে মাসে দশ টাকা বরাদ্দ করলেন, আর প্রুফ ইত্যাদি দেখার জন্যে প্রতি সপ্তাহে দু টাকা।

টাকা পয়সার দিক দিয়ে কিছু না হলেও—অন্য সুবিধে হল এতে।

এত দ্রুত লেখার ক্ষমতা যে ওর আছে, আগে তা নিজে কখনও ভাবে নি। আত্মবিশ্বাস অনেকখানি বাড়ে, সেই সঙ্গে উৎসাহও। তাছাড়া সম্পাদনায় দোষ ত্রুটি দুর্বলতা—এবং কি কি প্রয়োজন—সেগুলোও বুঝতে পারে। আরও একটা সুবিধে হয়েছিল, সেই সঙ্গে সাহায্যও—ললিতকে এখানে টেনে নিতে পেরেছিল। কিছু কিছু কাজ তার দ্বারাও হতে লাগল, তারও কলমের জড়তা বা সংকোচ ঘুচল।

মনে হত, প্রতি পদেই, মুরারিবাবুর কথা। তিনি—তিনি যদি থাকতেন, বললেই এসে কাজে লেগে যেতেন, পারিশ্রমিকের কথা তাঁর মনেও আসত না।

কিছু থোক টাকা একবার পেয়ে গেল কনকবাবুর কাছ থেকেই।

প্রধান উপলক্ষ একটা নির্বাচন। কলকাতা পুরসভার। যেসব প্রার্থীরা

নিজেদের ঢাক বাজাতে চান, তাঁদের কাছ থেকে—আইনসঙ্গতভাবেই—'কিঞ্চিৎ' নিয়ে সে কাজটার ভার নিলেন ওঁরা।

আইনসঙ্গতভাবে ছাড়া কনকবাবু কিছু করবেন না। সুতরাং ঠিক হল, সাপ্তাহিকের একটা বিশেষ সংখ্যা বার করা হবে, তাতে এই নির্বাচন-প্রার্থীদের মধ্যে থেকে যাঁরা 'পৃষ্ঠপোষকতা' করতে চান তাঁদের ছবি-সমেত জীবনী ও 'কীর্তি'র পরিচয় দেওয়া হবে। বিশেষ সংখ্যার দামটা একটু বেশীই হবে, বারোআনা বা এক টাকা : এঁরা এলাকা বুঝে দুশো কি আড়াইশো কপি ক'রে কিনে নেবেন সেই সংখ্যা, নিজেদের হুদোর ভোটদাতাদের মধ্যে বিতরণ করার জন্যে। সকলকে দেবার তো দরকার নেই, ঘাঁটি বুঝে বুঝে দিলেই অনেকে পড়বে।

পরিকল্পনা অবশ্য কনকের। তবু একটু নতুন ধরনের কাজ। বিনুর উৎসাহের সীমা রইল না। কদিন অনাহারে অনিদ্রায় ভোর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে, প্রেসে বসে প্রুফ দেখে—একদিন তো সাতারাতই কাটল প্রেসে—অতিকষ্টে ঠিক সময়ে কাগজ বার হল।

এইসব প্রার্থীদের জীবনী তো সব নিজেদের লিখতে হলই—তার মালমশলা যোগাড় করতেই প্রাণান্ত। মিথ্যে কথাই বেশী লিখতে হবে, তবু একটা সত্যের কাঠামো তো চাই। সেটা কোথায় পাওয়া যাবে? যাঁরা দেবেন তাঁরা পাগলের মতো ঘুরছেন, তাঁদের ধরাই তো প্রায় তপস্যার ব্যাপার।

হিসেব ক'রে দেখা গেল মোট সাতশো তেত্রিশ টাকা লাভ হয়েছে—এই সংখ্যার বাবদ। কনকবাবু ছশো টাকা নিয়ে সপরিবারে দার্জিলিং চলে গেলেন একশো 'তেত্রিশ টাকা এদের নিতে বললেন। বিনু অবশ্য তা থেকে তেত্রিশ টাকা রাখালকে দিয়েছিল—সে নিতে না চাইলেও। জোর ক'রেই দিয়েছিল।

পরিশ্রমের তুলনায় পারিশ্রমিক সামান্যই। তবু বিনুদের বেশ একটু আনন্দ হয়েছিল। নতুন কাজ—একটা নতুন জগতের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। এমন যে হয়, এইভাবে নির্বাচন জিততে হয়—এ ওদের জানা ছিল না। ভাবতেও পারে নি কোনদিন।

অভিজ্ঞতাটা খুব প্রীতিপদ নয়, তবে প্রয়োজনীয় তাতে সন্দেহ নেই।

জীবনের পথে চলতে গেলে—বিশেষ যাদের লড়াই করে করে এগোতে হয়—তাদের মানবচরিত্রের সব দিকটাই জেনে রাখা ভাল।

॥ ৪৯ ॥

এখানে কাজ করায় সবচেয়ে বড় লাভ বোধ হয়—রাখালের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব। বয়সের বেশ খানিকটা তফাৎ—তবু দুদিনেই রাখালের সঙ্গে ওর প্রগাঢ় সখ্য জমে উঠল।

মোটা না হলেও গোলগাল ধরনের চেহারা, গোলগাল মুখ, হাসিটি ভারি মিষ্টি।

জীবন সম্বন্ধে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা ওর, বলতে গেলে মানুষ সম্বন্ধেই বিশ্বাস হারিয়েছে, কিন্তু তাই বলে ভালবাসা হারায় নি। সাধারণভাবে সকলের

প্রতিই একটা অদ্ভুত স্নিগ্ধ মনোভাব—তাদের বহু দোষ জানা সত্ত্বেও।

জানে অনেক, দেখেছে অনেক। বসে বসে সে সব গল্প করে। মনে হয় অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ওর অফুরন্ত।

যে রবিবার আপিসে বেরোতে হয় না—এখানে ছুটি বলে কিছু নেই, দরকার থাকলেই বেরোতে হয়—রাখাল খুঁজে খুঁজে বিনুর বাড়ি আসে। ভাল ক'রে বসানো যায় না, জলখাবার যদি বা খাওয়ায়, চা খাওয়াতে পারে না (তখনও দাদার বিয়ে হয় নি, বৌদি আসেন নি), অথচ রাখাল চা ভালবাসে। চা শুধু তার পানীয় নয়, বলতে গেলে প্রধান খাদ্যই। সিগারেটও খায়, তবে খুব একটা আসক্তি নেই তাতে, এক পয়সার 'হাফ-কাপ' চা কিনেই খায় দশ-বারোবার—বিনুর তিন চার ঘণ্টা আপিস থাকা কালেই—এমনি আপিসেও যখন বাবুর বন্ধুরা কি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসেন তাঁদের জন্যে আনা চা থেকেও ভাগ পায়।

ওর গল্প থেকে মানুষের অনেক গ্লানিকর, এমন কি কুৎসিত বীভৎস জীবনেরও সংবাদ মেলে। বিনুর কাছে এ একটা অনাবিষ্কৃত জগৎ। বইতে পড়েছে অনেক, কিন্তু সত্যি সত্যিই বিশিষ্ট ভদ্র-সমাজে, ওদের দেশে এমন ঘটতে পারে তা জানা ছিল না। অথচ এর অধিকাংশ ঘটনাই রাখালের আত্মীয়দের মধ্যে ঘটা, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সত্য। নাম ক'রেই বলে সে, বিনুর কাছে কেন, সে পরিচয় কারও কাছেই গোপন রাখার প্রয়োজন বোঝে না

তাই বলে ভাল কথা কিছু যে বলার নেই, তাও না।

ছোটবেলায় বাবা-মা মারা গেছেন, কেউ কোথাও নেই। কাকারা আছেন, বাবা তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে ঠাকুর্দার জীবদ্দশাতেই বিষয়-সম্পত্তির ভাগ নিয়ে পৃথক হয়ে গিছলেন বলে তাঁরা কেউ দেখেন না। মার মৃত্যুর পর মাস দেড়েক রাখাল এক কাকার বাড়ি ছিল, তাঁরা এমনই ব্যবহার করেছিলেন যে মনে হয়েছিল, তার থেকে রাস্তায় বাস করা ও ভিক্ষে করে খাওয়াও ভাল। শুধু তাই নয়, তখন ওর মাত্র ষোল বছর বয়স, তখনই ষোল ও চোদ্দ বছরের দুটি খুড়তুতো বোন ওর পুরুষত্বর পরীক্ষা নিয়ে ছেড়েছে।

অন্য কাকাদের বাড়িতে চেষ্টা করে দেখেছে সে। কোথাও আশ্রয় মেলে নি। চাইলে এক-আধ টাকা ধার দিয়েছেন, তার বেশী দেবার ভরসা নেই তাও জানিয়ে সে টাকাটা দিয়েছেন। গেলে চা আর বিস্কুট দেন—সামনে নিজেদের ছেলেমেয়েরা বসে লুচি বা পরটা খায়, তা কখনও ওর ভাগ্যে জোটে নি।

একটু স্নেহ করতেন ন কাকা, তিনিই পুজোয় জামা, শীতে সোয়েটার কিনে দিতেন প্রয়োজন মতো—সেখানের পথ বন্ধ করল তাঁরই এক মেয়ে—প্রচণ্ডভাবে প্রেমে পড়ল। পরে জেনেছিল রাখাল, প্রেমে পড়াটা তার ব্যাধি, বাড়ির ঠাকুর, সামনের বাড়ির গুর্খা দারোয়ান কাউকেই বাদ দেয় নি সে। যে এক অক্ষর বাংলা জানে না, তাকে রাশি রাশি প্রেমপত্র লিখত—এ পাগলামি বা রোগ ছাড়া কি? সেই প্রেমপত্র রাখালের পকেটে গুঁজে দেওয়া শুরু হতে—বিশেষ একদিন সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরতে ভয় পেয়ে সে কাকার বাড়ি যাওয়া বন্ধ

করল। ঐ বয়সেই এটুকু জ্ঞান ওর হয়ে গিছল—ধরা পড়লে কাকা তাকেই লাঞ্ছনা করতেন, নিজের কচি মেয়ের কোন দোষ দেখতে পেতেন না।

আশ্রয় দিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত মামাই। তাঁর অবস্থা ভাল না, জামালপুরে চাকরি করেন, এককালে কুড়ি টাকায় লিলুয়ার কারখানায় ঢুকেছিলেন,—তা থেকে বেড়ে মাইনেটা সত্তর টাকায় দাঁড়িয়েছিল। তাঁরও ছেলেপুলে আছে। স্কেল আশি টাকায় শেষ। তারপরে চাকরি যদি বা থাকে—মাইনে আর বাড়বে না। সুতরাং ম্যাট্রিক পাস করিয়ে তিনি ওকে জীবনের পথে—রাখলের ভাষায় 'ভবের মাঠে' ছেড়ে দিয়েছিলেন। স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন এর বেশী কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। চাকরিও তিনি ক'রে দিতে পারবেন না। কলকাতায় গিয়ে সে যেন এবার নিজের বরাত যাচাই ক'রে দেখে।

অবশ্য ধারদেনা ক'রে ত্রিশটি টাকাও দিয়েছিলেন মামীমা, হয়ত মামাকে গোপন করেই। সেই সম্বল করেই কলকাতায় এল। একদিন এক কাকার বাড়ি থেকে একটা সস্তার মেসও খুঁজে নিল রামকান্ত মিস্ত্রী লেনে। যতই সস্তা হোক, খাওয়া থাকার খরচ ছাড়াও চা-জলখাবার আছে, ধোপা নাপিতের খরচা আছে। মাসে কম পক্ষেও তেরো-চৌদ্দ টাকা দরকার। তবু মেসের ম্যানেজারই একটা টিউশানী জুটিয়ে দিয়েছিলেন, তাই রক্ষে। অবশ্য সে আট টাকায় দুটো ছেলে পড়ানো, তবু অন্তত অর্ধেক খরচা তো উঠবে—এই ভেবেই নিল। তারপর এক সূত্রে এই চাকরিটা পেয়ে যেতে নিশ্চিন্ত হয়েছে। পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে, মেসের খরচ জামা-কাপড় সবই এক রকম ক'রে এতে চলে যায়। টিউশ্যনীটা ছাড়তে হয়েছে, কিন্তু তাতে দুঃখ নেই। ওই অগা ছেলেদের সঙ্গে রোজ দেড় ঘণ্টা ক'রে বকা ওর ভালও লাগছিল না। কিছু হবে না বুঝতেই পারছে, তাদের সঙ্গে মিছিমিছি বকে লাভ কি ?

'দিন কেটে যাচ্ছে একরকম ক'রে, তাতেই খুশী আছি ভাই। আশা কম তাই দুঃখও কম।' নিজের এ তাবৎ ইতিহাস বিবৃত ক'রে মন্তব্য করে রাখাল।

'তারপর ? বিয়ে থা করবেন না ? সংসার পাততে হবে না ?'

বিনু প্রশ্ন করে।

'ধুস ! এ কাঠামোয় আর সে চান্স নেই। এই আয়—তাতে বিয়ে ক'রে কি ডুবব।'

'বাঃ ! আর কি আয় বাড়বে না ? অন্য কোন চাকরির খোঁজ করুন। উঠে-পড়ে লাগলে কি না হয়।'

'ক্ষেপেছেন ! চাকরি এত সস্তা। বি-এ এম-এ পাস পাত্তররা ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাকে দেবে চাকরি। বয়েস চৌত্রিশ ছাড়িয়ে গেছে কবেই। জন্মের সন তারিখ তো জানি না, বাবা-মা নেই, কে আর বয়সের হিসেব রাখে বলুন। ম্যাট্রিক-এজই চৌত্রিশ, কোন না দু-এক বছর কমিয়ে দিয়েছিল মামা। ছত্রিশ হওয়াও আশ্চর্য নয়। এখন আবার নতুন চাকরি কোথায় খুঁজব, কেই বা দেবে।'

'চাকরি খুঁজতেই হবে। এখানেই কি আর থাকতে পারবেন। এ ব্যবসার

অবস্থা তো দেখছেনই।'

'তা দেখছি। বাবুকে তো কতবার বলেছি, এক এক সংখ্যায় মাসিকের এই যে আট-দশ ফর্মার ছাপা কাগজের খরচ জলে যাচ্ছে, মাস কাটলেই তো বাজে কাগজে দাঁড়াল—সে জায়গায় মাসে একখানা ক'রে এই আট-ন ফর্মার বই ছাপলে দশ বছরেও পুরনো হবে না। সে একটা য়্যাসেট হয়ে থাকবে। হুড়হুড় ক'রে না হোক, ধীরে সুস্থেই না হয় বিক্রী হবে তবু একেবারে তো জলে যাবে না। কাগজ ওজন দরে ছ পয়সা সের, বই, অচল বইও সে জায়গাতেও সেলাই করা অবস্থায় পুরনো বাজারে নিয়ে গেলে এক টাকার বইখানা ছ পয়সা দু আনা দরে কিনবে। তা বাবুর প্রেষ্টিজ তাতে পাংচার হয়ে যাবে। দেখি চরমে পেঁছে যদি বাবুর চোখ খোলে।'

অবশ্য ততদিন অপেক্ষা করতে হয়নি।

বিনুর যোগাযোগে বছর দুই পরে এক মারোয়াড়ি ফিলম ডিষ্ট্রিবিউটারের আপিসে কাজ পেয়ে গিছল রাখল। মাইনে পঞ্চাশ টাকা, দু বছর পরে মাইনে বাড়বে সে আশ্বাস পাওয়া গেছে, এমন নাকি সে আপিসে বাড়েও। তাছাড়াও এদিক-ওদিক কিছু রোজগার আছে। পুজোর সময় ফিল্ম কোম্পানীরা বকশিস দেন—সেটা কর্মচারীরা ভাগ ক'রে নেয়। সেও ওর ভাগে চল্লিশ-পঞ্চাশ পড়তে পারে।

এইবার বহুদিনের রুদ্ধ বাসনা প্রকাশ পায়। কামনা সফল হবার পথ খোঁজে।

একদিন বলেই ফেলে সরাসরি, 'আমাকে কি কেউ মেয়ে দেবে আর, ইন্দ্রবাবু? সত্যি আর পারি না, সস্তায় মেসের খাওয়া খেয়ে খেয়ে তো ডিসপেপসিয়া ধরে গেল। বয়েস হচ্ছে, এর পর অথর্ব হয়ে পড়লে কে দেখবে?'

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বলে, 'একটা খুব গরিবের ঘরের মেয়ে পেতুম নিমুড়ো-নিছুড়ো কেউ কোথাও নেই এমন মেয়ে—তো ঝুলে পড়তুম ভরসা ক'রে। মানে গরিবের সংসারে এসে নাক সিঁটকোবে না। কি কথায় কথায় মেজাজ দেখিয়ে বাপের বাড়ি যেতে চাইবে না।…কি বলেন, আপনি?'

একটু যেন অপ্রতিভভাবে ভয়ে ভয়েই প্রশ্ন করে।

বিনু হেসে বলে, 'বলার অপেক্ষা রাখি নি রাখালবাবু, আপনার এই নতুন চাকরিতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়ে খোঁজা শুরু করেছি। সন্ধান এসেছেও দু-একটা। মনের মতো বোধ হলেই আমরা তিনজন গিয়ে মেয়ে দেখে আসব।'

'না, না, আমি আর কেন। আপনারা দেখে পছন্দ করলেই যথেষ্ট। এ বয়েসে এই অবস্থায় কি আর সুন্দরী মেয়ে আশা করব! কানা খোঁড়া না হয় এইটুকু শুধু দেখা, খাটতে-খুটতে হবে তো। মানে একেবারে কচি খুকি হলে চলবে না। এসেই হাঁড়িবেড়ি ধরতে পারে এমন মেয়ে দেখবেন একটা।'

এতদিন ভাসা ভাসা কথা বলছিল, এবার উঠে পড়ে লাগে বিনু। মেয়ে একটা পাওয়াও যায়। হাওড়া জেলার মৌড়ি গ্রামের কাছে নিবড়ে বলে গ্রাম, সেখানকার মেয়ে। হতদরিদ্র ঘর, তাও বাবার দুটি পক্ষ, এটি প্রথম পক্ষের

মেয়ে। এ পক্ষেও তিন-চারটি ছেলেমেয়ে। ভরসার মধ্যে আড়াই বিঘের একটা বাগান আর গ্রামেই একটা বিড়ির দোকান। তবে রাখালদের সজাতি, পালটি ঘরও। বংশও নিতান্ত খারাপ নয়, পূর্বপুরুষদের এককালে নামডাক ছিল। সম্পত্তিও ছিল প্রচুর।

অবশ্য রাখালের একটা শর্তে মিলল না। মেয়েটির 'অল্প বয়স, সবে ষোল পূর্ণ হয়েছে। তবে সুশ্রী, সংসারের কাজ-কর্মেও অভ্যস্ত। সৎমা যে খুব অত্যাচার করে তা নয়, কিন্তু নিজের ছেলেমেয়ে সামলাতেই তার দিন চলে যায়, কাজেই রান্না, বাড়ির-পাট, ক্ষার-কাচা সবই একে করতে হয়। সেদিক দিয়ে হিসেবটার মিল খায় রাখালের পরিকল্পনার সঙ্গে।

রাখাল অবশ্য প্রথমটায় খুব প্রতিবাদ করেছিল। 'এ যে নাতির বয়েসে পুতি মশাই। কী বলছেন। বলতে গেলে মেয়ের বয়িসী।'

'তা হোক।' বিনু জোর দিয়ে বলে, 'কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ। ছেলে মানুষ সহজে বাগ মানবে। তাছাড়া এখনও হয়ত পছন্দ-অপছন্দর বয়স হয় নি, যা পাবে তাই সৌভাগ্য বলে মনে করবে। সেখানেও তো খেতে পায় না, এখানেও না হয় উপোস ক'রে থাকবে। ভালবাসাটা তো পাবে, সেটাই হয়ত বড় লাভ জীবনে।'

রাখাল আরও দু-চারটে আপত্তির কারণ আর আশঙ্কা প্রকাশ করার পর—আশঙ্কা বুড়ো বরকে কচি মেয়ে ভালবাসতে পারবে কিনা, সে নিজ এই দাম্পত্য জীবনে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে কিনা—রাজী হয়ে গেল।

ইচ্ছা যেখানে প্রবল সেখানে আপত্তির মেঘ মনের আকাশে জমতে পায় না, প্রবল বাসনার বাতাসে ভেসে চলে যায়। তাছাড়া তার জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক বেশী (নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির জন্যেই, যাদের এ দৃষ্টি আছে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না) তার মতো পাত্রকে কেউ সহজে মেয়ে দিতে চাইবে না এটা সে জানত। কোন কূলে কেউ নেই, তার মৃত্যু হলে —যদি ছেলেপুলে বড় হয়ে মানুষ হবার আগেই মৃত্যু হয় সেটাই সম্ভব বেশী বরং—মেয়েটাকে হয় ভিক্ষে করতে হবে, নয়ত কেউ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বেশ্যাপটিতে তুলবে। এ নেহাৎ তাড়াতে পারলেই বাঁচে এই অবস্থা বলেই মেয়ের বাপ রাজী হয়েছে।

রাজী হলেও ওর হবু শ্বশুর সোজা বলে দিয়েছেন, তিনি এক পয়সাও খরচ করতে পারবেন না। হাতে লাল সুতো বেঁধে মেয়েকে সম্প্রদান করতে হবে। বড় জোর একজোড়া লাল কড়। একখানা কোরা তাঁতের শাড়ি হয়ত চেয়েচিন্তে দিতে পারবেন—আর পাড়াপ্রতিবেশীদের সাহায্যে দশ-বারোটি বরযাত্রীকেও খাওয়ানো চলবে। তাঁর এই বিবাহের দরুণ দানের কিছু বাসন আছে এখনও, রসান দিইয়ে নেবেন, তারই দু-একখানা সাজিয়ে দিতে পারবেন, দান হিসেবে। তবে নিতান্তই নিয়মরক্ষার মতো। যদিও এতে তাঁর স্ত্রীর ঘোরতর আপত্তি, তবে মেয়েছেলের আপত্তি শোনার লোক তিনি নন, সে অভয়টুকুও দিয়েছেন।

অর্থাৎ খরচ যা কিছু বরপক্ষকেই করতে হবে।

'ও মশাই, আমি কোথায় কি পাবো?' রাখাল প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে, 'আমার তো পোস্টঅফিসে বোধহয় কুড়িটে টাকাও নেই পুরো।'

'দেখি না কি করতে পারি। আপনি একটা কাজ করুন বরং—মনিবকে বুঝিয়ে শুনিয়ে শ'খানেক টাকা অন্তত ধার বলে বাগাতে পারেন—সেই চেষ্টা দেখুন।'

প্রায় অসম্ভবই সম্ভব করল বিনু। নিজে যতটা পারল দিল, বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে দু টাকা পাঁচ টাকা, কনকবাবুকে ধরে কুড়িটা টাকা আদায় করল—রাখালের নাম না করে, প্রকাশকদেরও দু-একজন কিছু কিছু দিলেন। সকলকেই বলল, এক ব্রাহ্মণের কন্যাদায়—সে যে আসলে বরপক্ষেরই লোক সেটা কাউকে জানতে দিল না।

এই চেয়েপেতে নেওয়া টাকা থেকেই বিনু দুগাছা করে চারগাছা সোনা বাঁধানো ব্রোঞ্জের চুড়ি গড়াল, একটা সরু বিছে হার। এসবই গায়ে-হলুদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল যাতে সেখানে সত্যিই কড় হাতে না মেয়েটাকে পিঁড়িতে বসতে হয়। একটা সিল্কের শাড়িও পাঠাল তত্ত্ব হিসেবে, সুতী জামা তার সঙ্গে মানিয়ে। সামান্য কিছু প্রসাধনও। একটু মাছ মিষ্টিরও ব্যবস্থা করল। একেবারে ঠিক ভিখিরীর মেয়ের মতো বিয়েটা না হয়—সাধারণ দরিদ্র ঘরের মতো মনে হয় অন্তত—প্রথম থেকে বিনুর প্রাণপণ চেষ্টার সেইটেই ছিল লক্ষ্য।

রাখালের নতুন মনিবরা ধার নয়, এককালীন পঞ্চাশটা টাকা সাহায্য হিসেবেই দিলেন, সেই সঙ্গে একটা ভাল ধুতি আর পাঞ্জাবীও। সেদিকে আর কোন খরচ করতে হল না।

তবু সমস্যা অনেক।

বৌ নিয়ে এসে তুলবে কোথায়? পরেও—বসবাস করার একটা জায়গা চাই। মেসে তো থাকা সম্ভব নয়।

অনেক খুঁজে পেতে বেলেঘাটায় একটা পুরনো বাড়ির একখানা ঘর পাওয়া গেল আট টাকা ভাড়ায়। এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে সেই ঘরই ঠিক করল বিনু। খুব ভাল কিছু ঘর নয়, কল পাইখানাও বাড়িওলাদের সঙ্গেই ব্যবহার করতে হবে, তবে এত কম ভাড়ায় আর কি পাবে। অনেক বলাতে একটু চুনকাম করিয়ে দিতে রাজী হলেন বাড়িওলা—তবে অন্য কোন মেরামতের কাজ নয়।

ভাড়া—আর একটা তক্তপোশ, কিছু বিছানা, সামান্য দু-একটা সাংসারিক সরঞ্জাম কিনতেই রাখালের মনিবের দেওয়া সে পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়ে গেল।

সরাসরি এখানে ঐ অন্ধকার ঘরে এনে তুলে একেবারে বসবাস শুরু করার চিন্তাটা ভাল লাগল না বিনুর। তার পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাখাল মামাকে একখানা চিঠি লিখল।

'মামা পারবে না ইন্দ্রবাবু, সামনের বছরই চাকরি খতম হয়ে যাচ্ছে। এখনও মেয়ের বিয়ে হয়নি, ছেলেরাও কেউ চাকরি-বাকরি পায় নি। ছোটটা তো ইস্কুলে পড়ছে তার চাকরির কথাই ওঠে না, বড়টা সবে পাস করেছে একটা,

কবে কি কাজ পা ব তার ঠিক নেই। সে ক্ষেত্রে মাথা গুঁজে থাকবে কোথায় সেই তো সমস্যা। দেশে বিষম ম্যালেরিয়া, ঘরদোর সব ভেঙ্গে গেছে—সারাতে গেলে ফাণ্ডের সব কটা টাকা তাতেই খরচ হয়ে যাবে। ঐ জামালপুরেই কোন বিহারীর বাড়ি খাপরার ঘর ভাড়া ক'রে থেকে দুটো চারটে টিউশ্যনী ধরে সংসার চালাতে হবে। তার আর এক পয়সাও খরচ করার সাধ্যি নেই।'

'আপনি লিখে দিন, তাঁকে খরচ করতে হবে না, যা করার আমরাই করব।'

মামা রাজী হলেন। শুধু খরচের প্রসঙ্গে একটু অম্লমধুর খোঁচা দিতে ছাড়লেন না। 'কিছু যে খরচ হবেই, তা তুমিও বেশ জানো। তবে সে আর কি করা যাবে। তোমাকে মানুষ করেছি, আজ ঘরবাসী হতে যাচ্ছ তার জন্যে কষ্ট ক'রেও সে খরচটুকু করতে হবে।'

তা তিনি করলেনও। গরীবভাবে হলেও বৌভাত ফুলশয্যেটা আনুষ্ঠানিক-ভাবেই সম্পন্ন হল।

মামী একজোড়া কানের ফুল দিয়ে মুখ দেখলেন, একখানা সাধারণ শাড়িও দিলেন। মামা বরের বন্ধুদের থাকার জন্যে পাশের ভদ্রলোককে বলে কয়ে তার কোয়ার্টারের একখানা ঘর ঠিক করেছিলেন—কিন্তু ওদের খাওয়া দাওয়া চা জলখাবার তিনিই যোগালেন একরকম ক'রে। সেও কম না। ললিত বিনু ছাড়াও নতুন আপিসের দুজন সহকর্মী আর পুরনো মেসের দুটি বন্ধু—মোট ছ'জন এসেছিল। তাছাড়াও রাখালের ছেলেবেলা এখানেই কেটেছে বলতে গেলে, কোন কোন বাঙালী পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তো হয়েই ছিল সে সময়ে, মামাদেরও কিছু বাধ্যবাধকতা ছিল—একেবারে নিত্য যাদের সঙ্গে মেলামেশা হয় তাদের বাদ দেওয়া যায় না—সেজন্যে স্থানীয় লোকও দু-একজন ক রে বলতে হল। ফলে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় চল্লিশের মতো।

আয়োজনটা দুপুরবেলাই করেছিলেন রাখালের মামা, যাতে আলোর হাঙ্গামা না করতে হয়। এই লোক খাওয়ানোর খরচটা বিনুই দিল। মামা একটু সংকোচ বোধ করছিলেন একেবারে অপরিচিত ছেলের হাত থেকে নিজের ভাগ্নের বৌভাতের খরচা নিতে—বিনু হেঁট হয়ে প্রণাম ক'রে বলল, 'আমিও আপনার এক সন্তান মামা, সন্তানের কাছেও লজ্জা করবেন?'

নিলেন মামা টাকাটা হাত পেতেই। তাঁরও আর বেশী উদারতা দেখানো সম্ভব নয়—সামনেই রিটায়ারমেণ্ট। তবে খরচটা যাতে বেশী না হয় প্রথম থেকে সেই চেষ্টাই করলেন। রান্নার লোক রাখতে দিলেন না তিনি, নিজে আর পাড়ার এক প্রবীণ ভদ্রলোক দুজনে মিলেই সবটা সেরে নিলেন। রান্নাও খারাপ হয়নি, নিমন্ত্রিতরা মানতে বাধ্য হলেন।

॥ ৫০ ॥

যখন মেয়ে দেখতে যায় ওরা—মেয়েটি সুশ্রী এই পর্যন্তই দেখেছিল। এখন জামালপুরে পোঁছে গায়ে তেল-সাবান পড়ে এবং সেই সঙ্গে সামান্য একটু প্রসাধনের ব্যবস্থা হতে দেখা গেল টিয়াকে সুন্দরী বললেও খুব বাড়িয়ে বলা

হয় না। বিশেষ মামীমার যত্ন ও আদরের পর পাঁচ দিনেই অনেক শ্রী ফিরে গেল —যে লাবণ্যটা অনাদরে অনাহারে চাপা পড়ে ছিল, সেটা স্বভাবের পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশিত হল।

অবশ্য কলকাতায় ফিরেই ওকে—রাখালের ভাষায় হাঁড়িবেড়ি ধরতে হল। প্রথম দিন এসে পেঁছিল দুপুর পেরিয়ে। বিনু তখনকার মতো বাজারের খাবার আনতে যাচ্ছিল, বাড়িওলারা বোধহয় কচি মেয়েটার আউতে পড়া মুখ দেখেই নিষেধ করলেন, সে বেলার মতো ওদের খাবার জন্যে বাজারে যেতে হবে না, তারাই ব্যবস্থা করছেন—বলে দিলেন। রাত্রেও ওদের মতো দুখানা রুটি করে দেবেন সে অভয়ও দিলেন।

তাই বলে পরের দিন পর্যন্ত আর সে প্রশ্রয় আশা করা যায় না, রাখাল সে সম্ভাবনাও রাখল না। বিনুর ব্যবস্থায় তোলা উনুন ঘুঁটে কয়লা আনাই ছিল, সেই সঙ্গে কিছু চা-চিনি চাল-ডালও। রাখাল ভোর বেলা উঠেই বাজার করে নিয়ে এল। বাড়িওলাকে দুধের কথা বলে রাখা হয়েছিল, তিনি গয়লাকে বলে একপো দুধের যোগান দিলেন। অর্থাৎ চায়ের ব্যবস্থা পাকা হয়ে রইল। তবে মুশকিল হল দুটো ব্যাপারে। সব এলেও বঁটি আনা হয়নি, সেটাও খুব একটা বড় কিছু নয়—সেদিনের মতো চেয়ে নিয়ে চলল—বেশী বিপদ হল টিয়া চা খায় না, ওদের বাড়ি সে পাট নেই, সুতরাং করতেও জানে না।

রাখাল অবিশ্যি ওকে দেখিয়ে দিল বার দুই, সকালেই। বাজার থেকে কিছু হালুয়া কচুরি এনেছিল সেদিনের মতো চায়ের সঙ্গে জলযোগের কাজ চলবে বলে —টিয়া সেগুলো খেল কিন্তু চা খেতে তার বিষম আপত্তি। রাখালের অনেক পীড়াপীড়িতে কোন মতে দু চুমুক খেল।

রাখাল বলে, 'আমার কিন্তু অনেক চা খাওয়া অভ্যেস—। তুমি না খেলে চলবে কি করে—।'

'আমি খাব না—তাই বলে করে দেব না? তুমি বলো যখনই ইচ্ছে হবে, করে দেবো।'

'সেকি হয়! একা একা কখনও ভাল জিনিস খেতে ভাল লাগে!'

টিয়া মুখ টিপে হেসে বলে, 'এতকাল যার সঙ্গে খাচ্ছিলে তাকেই না হয় ধরে আনো না।'

'বাঃ! এই তো বেশ বুলি ফুটেছে দেখছি টিয়া পাখির। তবে নাকি তুমি ফুলের মতো কচি আর শিশুর মতো সরল—ইন্দ্র বলে!...আরে এতকাল খেতুম ঐ সব বন্ধুদের সঙ্গে, তাদেরই তা হলে, ডেকে আনতে হয়। আনব তাই?'

'আনো না। আমার আপত্তি কি! আমি রেঁধে দিতে পারব। আর থাকা —সে না হয় রকেই পড়ে থাকব।'

এবার অনুনয়ের পথ ধরে রাখাল।

টিয়াও আশ্বাস দেয় 'আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। খেতে খেতে তো অভ্যেস হয়। একদিনেই কি তোমার মতো বিশ কাপ চা খেতে শেখে কেউ।'

সংসারটা পুরোপুরি এবং নিরবচ্ছিন্নভাবেই সেই প্রথমদিন থেকে এসে পড়ল

টিয়ার ওপর।

সে ঝিও রাখতে দিল না, বলল, 'বাপের বাড়ি গোছাগোছা বাসন মেজেছি—এই কটার জন্যে আর ঝি রাখতে হবে না।' এইভাবে ধোপার খরচও তুলে দিল সে, ক্ষারে কেচে নীল দিয়ে মাড় দিয়ে রাখে, একটা থালা দিয়ে ইস্ত্রী করে দেয়।

বাপের বাড়ি যাবারও পাট নেই। আট দিনের দিন জোড়ে যেতে হয়, শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ নিতে আসেনি, তবু রাখাল নিজেই টিয়াকে নিয়ে গিছল। পৌঁছে দেখল সেখানে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন নেই, ওঁরা এদের আশাও করেন নি। শ্বশুর বেজার মুখ করে বললেন, 'ঘরে হাঁড়ি চড়ছে না এমন অবস্থা, শুভচুনি করবে কে। এই এখন তোমরা এয়েছ কী খেতে দেব সেই সমিস্যে।'

তখনই চলে আসা উচিত ছিল। টিয়াও সেই কথাই বলল, 'তখনই বলেছিলুম তোমাকে, বাবা এসব কিছু করবে না। পারবে না সত্যি কথা, পারলেও করত না। ফিরে চলো, যেখানে হোক দোকানে কি হোটেলে কিছু খেয়ে নেবে—।'

কিন্তু রাখালের সে ধরনের প্রকৃতি নয়, নিজেই পকেট থেকে একটা টাকা বার ক'রে দিয়ে টিয়াকে বলল, 'তোমার বাবাকে দাও, যা হোক কিছু আনিয়ে নিতে বলো। এখন কলকাতায় ফিরে গেলেও হোটেলেই খেতে হবে কোথাও—সেও তো পয়সা খরচ আছে। আর সে ভালও দেখায় না। একটা লক্ষণ অলক্ষণ তো আছে।'

বাবাও 'যা হোক কিছু'ই ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। রেঁধে ছিল টিয়াই। ভাল নাজনা, খাড়া ছেঁচকি আর শুশুনি শাকের ডালনা। খেয়েই রওনা দিয়েছিল ওরা, আসার সময় 'আবার এসো' নিয়মরক্ষা হিসেবেও এ কথাটা উচ্চারণ করেন নি টিয়ার বাবা।

বরং বলেছিলেন, 'এত পয়হা খর্চা করে এখানে এসে এই খাড়া-ছেঁচকি খেয়ে গেলে। কী করব বলো, নাচার। এখানে এই আবস্তাই চলবে এখন। তবু মেয়েটা তোমার ঘরে গিয়ে দুবেলা দুমুঠো খেতে পাচ্ছে, এই আমার শান্তি।'

টিয়ার চোখে জল এসে গিয়েছিল—সেটা বাপের বাড়ির সম্পর্ক চিরদিনের মতো ঘুচে গেল বলে নয়, স্বামীর অপমান আর অযত্ন হল এই জন্যেই—সে বাবার সঙ্গে একটা কথাও কইতে পারল না।

সেই থেকেই ঐ নোনাধরা বাড়ির চার দেয়ালে বন্ধ প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবনযাত্রা। কবিগুরুর ভাষায় 'রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধা।' কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়, কোথায়ই বা যাবে! কদাচিৎ কখনও সিনেমায় যাওয়া। যে কোম্পানীতে কাজ করে সেখান থেকে পাস পাওয়া যায় মধ্যে মধ্যে—তবে সেটাই তো সব নয়, অন্য খরচ আছে। রাখালের আয় সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ, চার আনা পয়সা খরচ করতে হলেও হিসেব ক'রে দেখতে হয়। পনেরো ষোল বছর যার মেসে কেটেছে কি আরও বেশী, তার সংসারী বন্ধু বেশী থাকার কথা নয়। দু-একজন অবশ্য আছে, তবে তাদের কাছেও যেতে সংকোচ বোধ হয়। কারণ ওরা গেলেই তারা আসবে, গরিবের সংসারে চা-জলখাবারের আয়োজন করাই তো দুশ্চিন্তার কথা।

অতএব সংসার।

রান্না, ঘরমোছা, বাসন মাজা, সাবান কাচা—আর স্বামী বাড়ি থাকলে অজস্রবার চা ক'রে যাওয়া। এতে চেহারা খারাপ হয়ে যাওয়ারই কথা, কান্তি মলিন—কিন্তু বিনু অবাক হয়ে লক্ষ্য করল যে তা হচ্ছে না। বরং দিনে দিনে শতদল পদ্মের মতোই যেন বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল টিয়া। স্বাস্থ্য ভাল হ'ল আরও। সত্যিই বোধহয় বাপের বাড়ি অর্ধাহারে থাকতে হত বেশিরভাগ দিন—এখানে শুধু পেট পুরে খেতে পেয়ে আর মানসিক শান্তিতে, লাবণ্য উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে লাগল।

আর সবচেয়ে মুখখানি।

সুন্দর মুখ বলা যায় না কোনমতেই, কোন অংশই তার নিখুঁত নয়—তবু কী যে আছে একটা, এমন সরলতা আর কচি ভাব যে দেখলে সদ্যফোটা ফুলের উপমাটাই মনে পড়ে। তাও রজনীগন্ধা কি চাঁপা নয়—মনে হয় শিউলি ফুলের মতোই কোমল আর পবিত্র।

বিনু আকৃষ্ট হবে এ স্বাভাবিক। এর আগে এমনভাবে কোন অল্পবয়স্কা আর মিষ্ট স্বভাব মেয়ের সংস্পর্শে আসে নি—বোন, বৌদি কেউ না। মেয়েদের সম্বন্ধে আকর্ষণ তাই কখনও বিশেষ বোধ করেনি। বিশেষ অল্পবয়স্কা মেয়েদের সম্বন্ধে। সেই এক বৌদি এসেছিলেন—মানে কাছে আসতে চেয়েছিলেন—সে বুঝতেও পারে নি।

তবু আকৃষ্ট হয়েছে সে প্রথমটা অজ্ঞাতসারেই। এটা যে আকর্ষণ বা মোহ—তা ধরা পড়ে নি নিজের কাছে। এমন অভিজ্ঞতাও তো এই প্রথম। তারপর অবশ্য সচেতন হয়ে উঠতে দেরি হয়নি। কিন্তু তখন সে আকর্ষণের স্রোত প্রবল হয়ে উঠেছে। তাকে বাধা দেবার মতো শক্তি ছিল না। আর, বোধহয় ইচ্ছাও না। আত্মসমর্পণ ক'রেই যে সুখ এখানে।

ক্রমশ নেশার মতোই পেয়ে বসে তাকে। এই সাহচর্য, এই দু-তিন ঘণ্টার সঙ্গসুখ।

বিকেলের দিকেই ওদের বাড়ি আসে বেশিরভাগ, রাখালের আপিস থেকে ফেরার সময় নাগাদ। রাখালের ছুটির দিন ওর অবসর থাকলে সকাল দশটার মধ্যে এসে হাজির হয়। একেবারে শিয়ালদার বাজার থেকে মাছ কপি বা গরমের দিনে অন্য সব্জী নিয়ে যায়। অসময়ের ভাল কোন সব্জী নিয়ে গিয়ে টিয়াকে অবাক ক'রে দেয়। ওখানেই খায় সেসব দিন।

খাওয়ার চেয়ে, টিয়া তোলা উনুনের সামনে পিঁড়ি পেতে বসে রান্না করে—সেদিকে চেয়ে থাকতেই বেশী ভাল লাগে। সেইজন্যেই এ সময় আসা। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখে। সত্যিকারের চাঁপার কলির মতো আঙুলে খুন্তি ধরে নাড়ে, কি বঁটি পেতে কুটনো কোটে—মনে হয় এ এক অপার্থিব দৃশ্য ও অনুভূতি। উনুনের আঁচের আভাটা মুখে এসে পড়ে—বিশেষ একটু মেঘলা ভাব থাকলে কড়া কি চাটুর তলা দিয়ে ফালিমতো আলো এসে পড়েছে বেশ বোঝা যায়—কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে। বিনু অপলক চোখে চেয়ে আছে সেটা, কখনও

কখনও কাজের ফাঁকে লক্ষ্য ক'রে তার কপালে-কপোলে কে আবীর ছড়িয়ে দেয়, সেও এক অবর্ণনীয় অনুভূতি।

কখনও এমন মনে হয় নি এর আগে। কল্পনাও করতে পারে নি তাই। এ একেবারেই অভিনব, আশ্চর্য। এর বর্ণনা দেওয়া যায় না। নিজেই কি হিসেবে পায় এ আনন্দ-আবেগের কারণ আর পরিমাণ!

টিয়ার রান্না খুব ভাল নয়। মায়ের রান্না খাবার পর অন্য কোন রান্নাই পছন্দ হবার কথা নয়। তবু—অন্য সাধারণ রান্না থেকেও নিরেস। কিন্তু সে হিসেব কি থাকে খাওয়ার আগে কি খাওয়ার সময়!...

বিকেলে বা সন্ধ্যার সময় গেলেও কিছু না কিছু নিয়ে যায়। ভাল মিষ্টি কিছু কিম্বা কচুরি সিঙ্গাড়া। কখনও রায়মশাইয়ের দোকান থেকে চিংড়ির কি মাংসের কাটলেট। সেটা নির্ভর করে যেদিন যেমন পয়সা হাতে থাকে তার ওপর। টানাটানি থাকলে ওদেরই গলির মোড় থেকে বেগুনি কি ডালপুরী নিয়ে যায়।

যা নিয়ে যায় তাতেই কিন্তু টিয়ার আহ্লাদের সীমা থাকে না। সবেতেই আশ্চর্য লাগে তার। স্পষ্টই বলে, এসব জিনিস সে কখনও খায় নি, চোখেও দেখে নি। মৌড়ীর রাসের মেলায় গিয়ে তেলেভাজা-খাবার দু এক পয়সার খেয়েছে বটে—তবে সে এত ভাল না। তেলেভাজা গুড়ের জিলিপী খেয়েই কত ভাল লাগত, এখানকার মতো এমনভাবে জিলিপী হয় কোথাও—তা তো জানত না।

এক একদিন ললিতও যায় ওর সঙ্গে। আলাদাও যায়, একটু আগে বা পরে। সেও কিছু কিছু নিয়ে যায় মাঝেসাঝে। কিন্তু টিয়া বিনুর আনা জিনিস নিয়েই বেশী উচ্ছ্বাস করে, সে উচ্ছ্বাস এক এক সময়ে রীতিমতো অশোভন হয়ে ওঠে। অন্য দিন আড়ালে তা বোঝাবারও চেষ্টা করে—টিয়া তখনকার মতো অনুতপ্ত হয়, আবার যথাসময়ে সে কথা ভুলে যায়। ললিতও হয়ত এটা লক্ষ্য ক'রে ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু বিনু কি করবে!

প্রথমবার পুজোর সময় লেখার টাকা থেকে একটা শাড়ি কিনে দিয়েছিল টিয়াকে।

অনেক দুঃখের টাকা সেবার। গল্প থেকে—যা দু-একটা গল্প তখন ছাপা হচ্ছে ভাল কাগজে—টাকা পেতে পুজোর পর। নভেম্বর মাসে-টাসে আশা করা যায়। এক নন্দনবাজারের টাকাটাই পুজোর আগে পায়। তবে সে আর কত?

এসময় টাকা মানে প্রকাশকদের কাছ থেকেই যাকে বলে ঠেঙ্গিয়ে কিছু কিছু আদায় করা। তা ওর ভাগ্যে বড় সম্ভ্রান্ত প্রকাশক তখনও জোটে নি। সামান্য পুঁজির ব্যবসায়ী তারা, সকলকারই দেনা প্রচুর। সারা বছর ধারে কাগজ কেনে, প্রেস ধারে ছেপে দেয়, এমন কি দপ্তরী, বিজ্ঞাপন—তাও ধারে চলে।

এতটা ধার পাওয়া যায় বলেই অল্প পুঁজির লোকেরা এই ব্যবসায় আসেন। তবু ধার পাবার একটা সীমা আছে বৈকি। ঢাকে-ঢোলে মোটা পেমেণ্ট করতে

হয়—ঢাকে-ঢোলে মানে চড়কে আর পুজোয়। অর্থাৎ চৈত্রে ও আশ্বিনে। এ সময় টানাটানির শেষ থাকে না। উচিত এই দুটো সময় পুরো পাওনা চুকিয়ে দেওয়া, প্রকাশকরা বেশীর ভাগই তা পারেন না। তবু অনেকখানিই দিতে হয় যেমন ক'রে হোক, নইলে পরে আর ধার পাবার সম্ভাবনা থাকে না।

তবে পুজোর আগে না হলেও যখনই টাকা নিতে যায়—যথেষ্ট তাগাদা ও অনুনয় বিনয় করতে হয়। এর মধ্যে যিনি বেশ শাঁসালো পাইকিরি কারবার বেশি করেন বলে হাতে বেশ কিছু থাকে—তিনি দেনও, অনেক সময় আগামও দেন—তবু দিন কতক হাঁটাহাঁটি না করলে কিছু আদায় হয় না। এবং আদায়ের দিন অন্তত তিন-চার ঘণ্টা বসিয়ে রাখেন।

এ বছর পাওনাও কম। আসলে প্রত্যহ বেলেঘাটায় এতটা ক'রে সময় কাটানোর জন্যে ফসলও কম হয়েছে, হয়ত এদিকে তেমন মনই দিতে পারে নি। প্রকাশকদের কাছে ঘুরে নতুন কোন প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে অর্ডার নেওয়া বা তা লিখে দেওয়া কোনটাই হয়ে ওঠে নি। এমনি ঘোরাঘুরি করতে করতে তাঁরাও নিজে থেকে কিছু ফরমাস করেন। সে সবই নির্ভর করে তাঁদের চোখের ওপর কতটা থাকবে তুমি তার ওপর। না গেলে গরজ ক'রে বাড়িতে লোক পাঠাবেন—এমন মাতব্বর লেখক সে নয়।

টাকা বেশী পাওয়া যায় পাঠ্য বা উপপাঠ্য বই লিখলে। তবে এসব ব পুজোর অনেক আগে লিখে দিতে হয়। পাঠ্য বই মে জুন মাসে ছেপে—জুনের শেষে কি জুলাইয়ের গোড়ায় 'সাবমিট' করতে হয়, টেক্‌স্‌ট বুক কমিটির কাছে, তাঁদের অনুমোদনের জন্য।

এ বছর সে সময়ের বেশীটাই কেটেছে একটা ঘোরের মধ্যে। কোথা দিয়ে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটেছে তা বুঝতেও পারে নি। বুঝল এখন, সামনে পুজোর খরচের মুখে পড়ে। আর কোথাও কিছু পাওনাও নেই বিশেষ। বাড়ি কি জমির দালালীতেও এই একই কারণে ঢিলে পড়েছে। ইন্‌সিওরেন্সের দরুন যা কমিশন জমা হয়—এর মধ্যে অন্য উপার্জনের পথ বন্ধ থাকায় নিজে গিয়ে দু-তিন দফায় তুলে এনেছে। এখন একমাত্র ভরসা এঁরা, প্রকাশকরাই। পাঠ্যপুস্তক লিখলে মোটা টাকা পাওয়া যায়, কারণ তা অপর কোন শিক্ষক কি অধ্যাপকের নামে ছাপা হয়, রয়্যালটি বা লাভের অংশ যা হয়—তাঁরাই পান। মূল লেখকদের এককালীন ব্যবস্থা। তাই বেশী পাওয়া যায়। এবছর তাও কিছু ফরমাস পায় নি। পায়নি—ঐ একই কারণ, ঘোরাঘুরি করে নি বলে।

আগে ভেবে রেখেছিল রাখালদের নিয়ে ও আর ললিত কাশী কি রাজগীর—কোথাও বেড়াতে যাবে দিনকতক। সে জন্যে যে টাকার দরকার তাও জানত, তবু রোজগারে মন দিতে পারে নি। অগ্রিম-নেওয়া কাজও ঠেলে ঠেলে রেখেছে, কোনো সুদূর ভবিষ্যতের জন্যে।

সুতরাং বেশী কিছুই করা হয়ে উঠল না। মাকে কাপড় দিতে হবে, মাকে সে এইসময় ভাল কাপড়ই দেয়, এদিকেও টুক-টাক খরচা আছে। পুজোয় দাদাকেও

কিছু দেওয়া উচিত। এবার সব দিক দিয়েই টানাটানি। কোনমতে টাকা যোগাড় করে পঞ্চমীর দিন আট টাকা দিয়ে একখানা আশমানি রঙের ঢাকাই শাড়ি কিনে নিয়ে এল। সাধারণ শাড়ি, যাকে অনেক ভাল কাপড় দিলে তবে কিছুটা তৃপ্তি হয় তাকে এ জিনিস দিতে যেন একটা দৈহিক কষ্ট বোধ হল। কিন্তু উপায় কি।

তবু এতেই কি খুশী টিয়া।

এ শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, তার কাছে এ যেন স্বপ্নেরও অতীত। রীতিমতো ঐশ্বর্যের ব্যাপার এ জিনিস। খুব বড় লোকরা ছাড়া এমন কাপড় কে পরতে পারে!

এত ভাল কাপড় সে কখনও পরে নি, বাবা তো চিরদিন দেড় টাকা সাত সিকে জোড়া হেটো কাপড় এনে দিয়েছেন। হাওড়া হাটের নিকৃষ্ট শাড়ি যা। একবার ক'রে পরলেই তার রং উঠে যেত। তাও সবসময় হয়ে উঠত না। গুণ চটের মতো মোটা মিলের শাড়ি দশ-বারো আনা দিয়ে কিনে আনতেন—খটির বাজার থেকে। তাও পরণের কাপড়খানা একেবারে শতছিন্ন তালি দেওয়ার অবস্থা পেরিয়ে গিঁট-বাঁধা না হলে আসত না।

ভাল কাপড়ের মুখ, যা দেখেছে এই বিয়ের সময়ে। তাও রাখালদের দেওয়া গায়ে হলুদের কাপড়ই যা, বাবা একখানা দিয়েছে যেটা পরে বিয়ে হয়েছে, সে সাধারণ লালপাড় তাঁতের শাড়ি। তবে বারোমেসের থেকে একটু ভাল।

রাখালের বন্ধুরা প্রায় সবাই সিঁদুর কৌটো দিয়ে কাজ সেরেছে, একজন কে যেন একখানা শাড়ি দিয়েছে, চলনসই এই পর্যন্ত। মামীমা দিয়েছেন একখানা —ওরই মধ্যে ভাল কাপড়ই দিয়েছেন। বিনুরা কিছু দেয় নি। কারণ আসল খরচটা তাদেরই করতে হয়েছে। সে কথা শুনেছে টিয়া, রাখালই বলেছে। নিজের দারিদ্র্য গোপন করে নি।

কাপড় পেয়ে টিয়া আনন্দে কচি মেয়ের মতো এক পাক নেচেই নিল। তখনও রাখাল আপিস থেকে আসে নি, সেদিন তাদের অনেক কাজ, ষষ্ঠীর দিন দুটোয় আপিস বন্ধ হয়ে যায়—কাজেই হিসেব-নিকেশ, টাকাকড়ির লেনদেন, এদের মাইনে বকশিশ, সবই এই পঞ্চমীতে চুকিয়ে আসতে হয়। রাত দশটা সাড়ে দশটাও হতে পারে ফিরতে, রাখাল বলেই গেছে।

এ কথাটা জানত, অত খেয়াল ছিল না বিনুর। সে শাড়ি কিনবে, কিসে টিয়ার মনের মতো হবে, অথচ ওর ট্যাঁকের জোরে টান পড়বে না—এই কথাই ভেবেছে সারা দিন, তাই রাখালের কথাটা মনে ছিল না। রাখালও কাপড় কিনবে, সে বকশিশের টাকা পেয়ে ষষ্ঠীর দিন।

এটা খেয়াল থাকলে বিনু হয়ত এখন আসত না, পরের দিন ভোরে আসত। সেও অবশ্য অসুবিধে, নতুন শাড়ি নিয়ে বাড়ি গেলে অনেক প্রশ্ন, অনেক মন্তব্য ও অনুমান।

টিয়ার উচ্ছল আনন্দে যেমন তৃপ্তি ও সার্থকতা বোধ হয় তেমনি অসুবিধেও ঘটে কিছু কিছু। এ সরব উচ্ছ্বাস নিশ্চয় বাড়িওলাদের কানে যাচ্ছে। কানে

যে যাচ্ছে তার প্রমাণ তাঁরা উঠোনে নেমে এসে আপাত উদাসীনতার মধ্যে এদিকে উঁকি মারছেন। রাখাল যে নেই, বিনু একা—সে তথ্যও নিশ্চয় তাঁদের অজানা নয়।

বিনুর লজ্জা করতে লাগল খুব। কে জানে ওরা কোন খারাপ ভাবে নিচ্ছে কিনা। সেভাবে রাখালের কাছে কিছু লাগাবে কিনা।

টিয়ার এসব দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, এত কথা—সুদূর কোন বিপদের সম্ভাবনা—তার মাথাতেই ঢোকে না, বোঝাতে গেলেও বুঝবে না।

সে বলে, 'জানো আমরা একবার মৌড়ির কুণ্ডুবাড়ি রাস দেখতে গিছলুম, সেখেনে এক বড়লোকের বৌ—হ্যাঁ গো, হেসো নি, মস্ত বড়লোক, গায়ে এক গা গয়না, নিদেন আড়াইপো সোনা হবে—ঠিক এমনি একখানা শাড়ি পরে এয়েছেল। তখুনি মনে হয়েছিল আমার ভাগ্যে কখনও কি এত দামী কাপড় জুটবে! বাবার তো এই অবস্থা সে আর কি ঘরে বে দেবে বলো, আমার চিরদিন এই রঙ-চটা ফ্যাঁসা কাপড় পরেই কাটাতে হবে। সত্যি বলছি, তোমরা গায়ে হলুদে যে শাড়ি দিছলে তাই দেখেই মা হিংসেতে জ্বলে-পুড়ে গেছে। বলে, উঠন্তি-মুলো পত্তনেই চেনা যায়—তোর বরাত খুব ভাল লো।…পুরনো সুরনো হয়ে গেলে আমাকে দু দিন দিস বাপু পরতে। শোন কথা। এ কি আমি বারো মাস পরব যে, পুরনো-সুরনো হবে।'

আবার হাত তুলে একটা নমস্কার ক'রে বলে, 'তা ঠাকুর যেন স্থানে থেকে কানে শুনেছিলেন, নইলে তোমারই বা এমন বড়মানুষী শখ হবে কেন, এক রাশ টাকা গুনে দে এত ভাল দামী কাপড় কিনতে যাবে কেন। আর বেছে বেছে ঠিক সেই রঙটিই। সত্যি আমার নাচতে ইচ্ছে করছে বাপু, যাই বলো।'

অস্বস্তি আর চাপতে পারে না বিনু। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বলে, 'ললিত আসে নি? তারও তো আসার কথা।'

এ চেষ্টা আরও হিতে বিপরীত হয়, টিয়া বলে, 'না এসেছে সেই ভাল। তোমাকে তো একা পাওয়াই যায় না। এত ভাল কাপড় পেয়ে একটু আহ্লাদ করছি, কেউ এলে কি পারতুম।'

এবার বিনু উঠে দাঁড়াল একেবারে। বলে, 'আজ আসি তাহলে। রাত হয়ে যাচ্ছে। রাখালবাবু কখন ফিরবেন তার যখন ঠিক নেই, বসে আর কি করব। বরং কাল—'

'ইললো। তা আর নয়। বচ্ছরকার দিন এলে—একটু কিছু না খাইয়ে ছাড়ছি তোমায়। ওসব ভুলে যাও। আর সে এসেই বা কি বলবে, অগ্নিঅস্ত পাতালঅস্ত করবে না! বলবে তোমার আক্কেল নেই, অমনি শুধু মুখে ছেড়ে দিলে।…রোসো, একটু মোহনভোগ করে দিই—তোমার জন্যেই এক ছটাক ঘি আনিয়েছিলুম ওকে দিয়ে। তুমি মোহনভোগ ভালবাস—'

'না না আজ বরং থাক। কাল এসে রাখালবাবুর সঙ্গে খাবো—'

'দ্যাখ, অত চাল দেখিও না বলে দিচ্ছি। দোরে কুলুপ দিয়ে রেখে দোব রাত বারোটা অবদি। সে ভালো হবে?'

বলে সত্যি সত্যিই পথ আড়াল করে দাঁড়ায়।

আর ঠিক সেই সময়ে বাড়িওলার স্ত্রী এদের ব্লকে উঠে আসেন, 'কী শাড়ি আনলে গা বৌমা ও ছেলে, তুমি এত খুশী হয়েছ। একবার দেখতে পাইনে?'

'ওমা, তা আর কেন পাবেন না। ভেতরে আসুন না। খুব ভাল কাপড় এনেছে ঠাকুরপো, দামী কাপড়। এমন কাপড় যে কোন দিন অঙ্গে উঠবে তা ভাবিও নি। এই যে, দেখুন না কাকীমা, আবার বাক্স ক'রে দিয়েছে—'

কাপড়খানা নেড়েচেড়ে দেখে কাকীমা মুখ টিপে একটু হেসে বললেন, 'তা ভালই তো। বেশ কাপড়। তা তোমার জন্যে আনবে না তো কার জন্যে আনবে বলো। তোমায় পরিয়েও সুখ। রূপের জন্যেই তো কাপড় গয়না মা। তবে, এ যেন এমনি ঘরে কাচতে-টাচতে যেও না, কম-দামী ঢাকাই তো, সুতো সরে যাবে।'

এই বলে আবারও একটু হেসে বেরিয়ে গেলেন।

দাঁতে দাঁত চেপে টিয়া বললে, 'শুনলে কথা। ঠিক আমার নতুন মার মতো, হিংসেয় ফেটে পড়ছেন একেবারে। এখন ভালয় ভালয় ভোগে এলে হয়। একটা সুতোর খি ছিঁড়ে নিয়ে থুথু দিয়ে নয়ানজুলিতে ফেলে দিতে হবে। হেসোনি, এই সব লোকেদের বড্ড নজর লাগে।'

বসে যেতেই হল আর খানিক।

হালুয়া করতে ভাল পারে না টিয়া, সুজি কাঁচা থাকে। ময়দার কাই মনে হয়। ঘিটা আগে সবটা দেয় নি, নামাবার সময় দিয়েছে খানিকটা—ওর বিশ্বাস এতেই ঘি চপচপে দেখাবে—আসলে যা হয়েছে, কাঁচা ঘিয়ের গন্ধ লাগছে। বাজারের খোলা ভয়সা ঘি, এর কতটা চর্বি আর কতটা ঘি তাই বা কে জানে।

তবু খেতেও হল বসে, সুখ্যাতিও করতে হল। ছাড়া পেল যখন রাত নটা বাজে।

তাও, বেরোতে যাবে, বলে, 'ওমা দাঁড়াও দাঁড়াও, দ্যাখো একবার মনের ভুল, তোমাকে গড় করা হয়নি যে।'

'ওকি, আমাকে গড় করবে কি, নানা ওসব করো না। এই তো ঠাকুরপো বলো, বৌদিরা কি গড় করে!'

'তা হোক। বয়েসে বড় তো হাজার হোক। আজকে বছরকার দিন হাতে ক'রে একটা কাপড় এনে দিলে। এ পর্যন্ত তো কেউ দেয় নি। নিজের বাপও না।' এই বলে সত্যিই গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো জিভে ঠেকাল।

বিনুর এই মোহ, টিয়ার প্রতি এই প্রবল আকর্ষণের কথা রাখালের বুঝতে বাকী থাকে না। এ অবশ্য যে-কেউ বুঝত, যে-কোন স্বামী। বুঝে ঈর্ষিত, বিরক্ত হত। কিন্তু রাখাল তা হয় না। এইখানেই রাখালের বিশেষত্ব।

তার দৃষ্টি সাধারণ লোকের চেয়ে বেশী তীক্ষ্ন। অভিজ্ঞতা ব্যাপক। হয়ত সেই জন্যেই সহজে তার মনের প্রশান্তি নষ্ট হয় না। অনেক দেখেছে

সে—শুনেছে তার ঢের বেশী, তাই মানব-মনের এই সব দুর্বলতায় ক্ষুব্ধ কি রুষ্ট হয় না, কেমন একটা স-প্রশ্রয় বা সস্নেহ কৌতুক অনুভব করে। মানুষের দুর্বলতার বিভিন্ন বিচিত্র পরিচয় তার মনকে তিক্ত কি বিষাক্ত করে নি বরং ক্ষমাশীল ক'রে তুলেছে, সে এই সব মানসিক দৈন্যকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে, অনিবার্য ধরে নিয়ে আর উত্তপ্ত হয় না।

সে তাই বিনুর কাণ্ড-কারখানা দেখে মুখ টিপে হাসে শুধু।

টিয়াও স্বামীর কাছে কিছু গোপন করে না। বিনুর মনোযোগ, টিয়াকে খুশী করার সুখী করার চেষ্টা—প্রতিদিনের প্রতি ঘটনা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথাও রাখালের কাছে গল্প করে।

আসলে এর মধ্যে যে কিছু দোষের আছে, তাও সে মনে করে না। স্নেহ ভালবাসা পায় নি কখনও এমন, কারও কাছ থেকেই, এখানে যা পাচ্ছে। এর কাছ থেকে যা পাচ্ছে তাও শ্বশুর বাড়ি থেকে স্বামীর দৌলতেই পাচ্ছে—এটা স্বামীর কাছ থেকেই পাওয়া বলে মনে করে।

কিন্তু রাখালের অন্তঃপ্রসারী দৃষ্টি বোধহয় আরও দেখতে পায়।

টিয়াও যে একটু একটু ক'রে বিনুর প্রতি আকৃষ্ট, অনুরক্ত হয়ে পড়ছে—সেটাও তার চোখ এড়ায় না। ললিতও আসে, প্রায়ই আসে কখনও বিনুর সঙ্গে কখনও একা, সেও ভেতরে ভেতর মোহগ্রস্ত। টিয়া তার সঙ্গেও যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করে। আদর-যত্ন অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয় না, গল্প-গুজব সমানভাবেই চলে—কিন্তু এই অনুরাগটা প্রকাশ পায় না তার ক্ষেত্রে, দৃষ্টি এমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না তাকে দেখে—যেমন বিনুকে দেখলে হয়।

রাখাল এ দেখে বা বুঝেও বিচলিত হয় না।

এটা মানুষের সহজাত দুর্বলতা, স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছে সে। ওর স্বাচ্ছন্দ্য ওর সুখে ও সম্ভোগে যখন কোন বিঘ্ন ঘটছে না, তখন ওর প্রাপ্য মিটিয়ে এরা যেটুকু আনন্দরস উপভোগ করতে পারে করুক না। এই ওর মনোভাব।

বরং সেও এর কিছুটা উপভোগ করে—ওদের এই প্রচ্ছন্ন, নিজেদের কাছেও অজ্ঞাত প্রণয়লীলা।

লক্ষ্য যে করে, এতকাল ক'রে এসেছে—সে সম্বন্ধে প্রথম সচেতন হল বিনু, নিজের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধেও সেই সঙ্গে—তার ভদ্রতা বোধ বা বিবেকে একটা প্রবল আঘাতই লাগল—যখন রাখাল একদিন হাসতে হাসতে সংবাদ দিল : টিয়া অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে।

টিয়ার স্বাস্থ্য ভাল—বাপের বাড়ি পুষ্টিকর কিছু খেতে না পেয়ে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও, সে স্বাস্থ্য ভাঙ্গে নি। কোথাও কোন দিন কোন অসুখ করতে দেখে নি রাখাল সে কারণে। তাই পর পর দু মাস পিরীয়ড বন্ধ থাকায় রাখালও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এ সব কথা মা-মাসী কাকী শাশুড়ি বা বয়স্কা ননদ কি মা—এদেরই বলতে হয় সেটা রাখাল জানত। কিন্তু কাছাকাছি তেমন কেউ নেই বলেই সে পরামর্শ দিয়েছিল বাড়িওলার স্ত্রীকে একবার কথাটা বলতে।

তিনি ওর চোখের কোল, বুকের অবস্থা, লক্ষ্য করেছিলেন আগেই, কিছু

বলেন নি, এখন পেটটায় হাত বুলিয়ে বলেছেন, 'নেকু, ছেলেপুলে হবে—তাও বুঝতে পারিস নি। তোর না হয় আগে হয় নি, তোর মার তো হয়েছে—তাও দেখিস নি কখনও চোখ চেয়ে। চোখের কোলে কালি পড়েছে, তাছাড়া—।'

তাছাড়া যা যা লক্ষণ দেখে বোঝা যায়—তাও বলে দিতে বাকী রাখেন নি তিনি।

টিয়া বলেছে, 'তা মা তো পোয়াতী হলেই বমি করতে শুরু করে দেখেছি, সকাল নেই বিকেল নেই—এমন চার মাস চলে। আমার কৈ সে সব তো কিছু হয় না।'

'সে যার যেমন স্বাস্থ্য। সকলের কি সমান। যাক, সাবধানে থাকিস। রাত-বিরেতে অন্ধকারে বেরোস নি, কি ছেঁচ-তলায় বসে থাকিস নি। খোঁপায় একটা খড়কে কাঠি গুঁজে রাখিস বিকেল থেকে। শরীরের যত্ন রাখিস। ছেলেকে বলিস আর এক পো দুধের যোগান বাড়িয়ে দিতে।'

এসব কথা সালংকারে বিবৃত করে রাখাল হেসে বলেছিল, 'তাই বলে যেন আসাটা একেবারে বন্ধ করবেন না ইন্দ্রবাবু, বড় খারাপ লাগবে। এ সময়টা ওরও মন খারাপ করে থাকাটা ভাল নয়, বুঝলেন না।'

'কেন, আসাটা বন্ধ করব কেন?' বিনু ঠিক বুঝতে পারে না তখনও, 'এমন কথা আপনার মনে এলই বা কেন?'

আবারও সেই অর্থপূর্ণ সকৌতুক হাসি।

'না, মানে আর তো চার্ম রইল না,—সেই অবস্থা তো, ঐ ফুটপাথের ছেলেগুলো যা বলে।'

এবার ইঙ্গিতটা বোঝে বৈকি। একটু, বোধ হয় দু-তিন মুহূর্তের জন্যে, নীরব হয়ে যায়—মনের মধ্যেটা ভাল ক'রে তলিয়ে দেখতে।

তারপর, জোর করেই সহজ হয়। সেও হেসে বলে, 'চার্ম আছে বলেই যদি স্বীকার করেন—এ চার্ম কি অত সহজে যায়। গালে-ঠোঁটে-রঙ-করা বয়েস-লুকনো মেয়ে তো নয়। ফুলদানীর ফুল নয় রাখালবাবু, বাগান থেকে সদ্য তুলে আনা টাটকা ফুল। এর রূপ আর সৌরভ সন্ধ্যে পর্যন্ত থাকবে—মানে যৌবনের শেষ প্রান্ত পৌঁছনো পর্যন্ত। বরং চার্ম আরও বাড়বে, প্রথম মাতৃত্বের খাড়তি চার্মটা যোগ হবে।'

দু হাত দু দিকে মেলে একটা হতাশার ভঙ্গী ক'রে রাখাল বলে, 'কে জানে অত শত বুঝিনে মশাই। জ্ঞান হয়ে ইস্তক পরের ঘর পরের দোর ঝাঁট দিচ্ছি, শুধু পেটের চিন্তাতেই জীবন কেটেছে, প্রতিটি দিন বেঁচে থাকাই সমস্যা—কোনো মেয়েছেলের কথা ভাবারও সময় পাই নি, কারও দিকে এমনভাবে তাকাবারও অবসর জোটে নি—যাতে মিলিয়ে দেখে কোনটা বাসি ফুল আর কোনটা সদ্য-ফোটা—বুঝতে পারব। যা জুটেছে তাই আমার কাছে পরম পদার্থ। ওসব আপনারা বুঝবেন, ওজন করবেন। আপনার না অরুচি ধরে—তা হলেই হল। আপনিই এ বিপদে সহায়।'

'বিপদ আবার কি। এ তো সম্পদ, সৌভাগ্য।'

জোর করেই বলে বিনু, কিন্তু মনের মধ্যে একটা সঙ্কোচ, রাখালের মনের গতি সম্বন্ধে সশঙ্ক সংশয় থেকেই যায়।

ওর দুর্বলতার কথা রাখাল জানে—এটা অবশ্য ওর অজানা নয়। প্রতিদিনের প্রতিটি কথা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও খুঁটিয়ে স্বামীর কাছে গল্প করে টিয়া। একদিন সকাল ক'রে উঠতে যাবে—প্রস্তাব মাত্রেই পথ আগলে ছিল। 'ও আসুক, তবে যেতে পাবে।' এই তার কথা। বিনুরও জেদ চেপে গেল—এটা ছেলেবেলারই জেদ অবশ্য—সে ওকে সরাবার জন্যে হাত ধরে টানাটানি করতে গিয়ে টিয়া এক সময় একেবারে সম্পূর্ণ বিনুর বুকের ওপর এসে পড়েছিল। সে কথাও টিয়া বলতে বাকী রাখে নি।

বলতে যে বাকী রাখে নি তা রাখালই বলেছে ওকে। পরের দিনই বলেছে। হাসতে হাসতেই বলেছে অবশ্য। নির্মল সকৌতুক হাসি। তার মধ্যে কোন গ্লানি কি ক্লেদ নেই—সেটা স্পষ্ট। এমন এর আগেও বলেছে, পূর্ব পূর্ব দিনের ঘটনা, এমনি হাসতে হাসতেই—তার জন্যে কোন প্রচ্ছন্ন জ্বালাও দেখে নি বিনু।

ঘটনার পরের দিনই চোখ মটকে বলেছে, 'তা বুকে চেপে ধরলেই পারতেন, বেশ মজা হত। যেমন কে তেমন। আরও কিছু করলেও আমার আপত্তি নেই। ভাল জিনিস যে পেয়েছি, বিধাতা অন্তত একটা ভাল জিনিস আমার ভাগ্যে মাপিয়েছেন—সেটা সবাই জানুক, বুঝুক এই তো আমি চাই। আমার ভোগে তো আর তাতে বাধা হচ্ছে না।'

কে জানে এর কতটা সত্যি। সবটাই অন্তরের আসল সংবাদ কি না।

এতটা ঔদার্য কি রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে সম্ভব ?

তবে হ্যাঁ, চোখে না দেখলেও স্বামীদের ঔদার্যের কথা—অবিশ্বাস্য উদারতা—শুনেছে বৈকি। স্বামীদের ঈর্ষা আর স্ত্রীদের চরিত্রে সন্দেহ, এর বহু কাহিনীই সাহিত্যে—প্রবাদে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু ভালবাসা মনের মধ্যে গাঢ়-প্রবিষ্ট হলে ব্যতিক্রমও ঘটে, এই সর্বজনবিদিত সত্যের।

দোলুই গল্প করেছে একটা।

দোলু সাধারণত মিথ্যে বলে না। সোজা কথা বলে, সোজা পথে চলে, মুখের ওপর অপ্রিয় মতামত বলে দিতে দ্বিধা করে না।

বিনুকে ভালবাসে দোলু। বোধহয় সে ই সবচেয়ে বেশী ভালবাসে।

যদিচ তার কোন প্রতিদান দিতে পারে নি বিনু।

দোলু বলেছিল তার এক বন্ধুর কথা। পাড়ার বন্ধু, নয়নচাঁদ নাম। মাহিষ্য ঘরের ছেলে। বিনুও তাকে দেখেছে, পরিচয়ও হয়েছে। খুব উদ্যমী, পরিশ্রমী। শ্যামবর্ণের ওপর ভারী সুশ্রী। টানাটানা বড় চোখ, সুন্দর, সুগঠিত দেহ।

সে পাড়াতেই একটি মেয়েকে পড়াত। মেয়েটিও মোটামুটি ভাল দেখতে, বছর পনেরো বয়েস। নয়ন তখন আই. এসসি, পড়ছে। তরুণ আবেগপ্রবণ

মন, সে আবেগ প্রকাশের পথ খুঁজছে।

ছাত্রীরই প্রেমে পড়ার কথা, কিন্তু সে পড়ল তার মায়ের প্রেমে।

ব্যাপারটা ক্রমশ এমনই উদ্দাম বাধাবন্ধহীন অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনাহীন হয়ে পড়ল যে সবাইকারই দৃষ্টিকটু হয়ে উঠল। নয়ন তো বাড়িই ছেড়ে দিয়েছিল প্রায়। লোক-লজ্জা একেবারে অতিক্রম না ক'রে যতটা ওদের বাড়িতে থাকা সম্ভব ততটাই থাকত। বাকী সময়টা গভীর রাত পর্যন্ত—আনচে-কানাচে ঘুরত। তার বাপ মা সুদ্ধ বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন, বকাবকি রাগারাগিও যথেষ্ট করেছিলেন—তবু এ উন্মত্ততা বন্ধ করতে পারেন নি। মহিলার স্বামীও কি আর লক্ষ্য করেন নি? নিশ্চয় করেছিলেন, কিন্তু একটা কথাও বলেন নি।

মহিলা নিজেও এই সুন্দর তরুণটির আবেগ-উচ্ছলিত প্রেমে ভেসে যাবেন, সব বিবেচনা লজ্জা ভবিষ্যতের চিন্তা ভাসিয়ে দেবেন—এটা স্বাভাবিক।

শেষে তিনি একদিন রাত্রে বলেই ফেললেন স্বামীকে, 'ওগো শুনছ, নয়ন আজ আমার কাছে থাকবে বলছে।'

চোখে নেশার ঘোর, গলা কাঁপছে। কাঁপছে হাত দুটোও বোধ হয়।

রাত্রের আলোতেও চোখে পড়ে অবস্থাটা।

স্বামী তখন রাত্রের খাওয়া শেষ করে বাইরের বারান্দায় এসে বসেছেন। কিছুক্ষণ, কয়েক মুহূর্ত, স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'তা বেশ তো। থাক না। আমি এঘরে শুচ্ছি।'

আর, সত্যিসত্যিই নয়ন সে রাত্রে থেকে গেল ওঁর কাছে।

দোলু বলে, 'তারপর লজ্জায় কদিন নয়ন আর ওদের বাড়ি যেতে পারে নি। অসুখের ছুতো ক'রে বাড়িতেই বসে ছিল। ছাত্রীর মাও নাকি—রাত্তিরের পাগলামি তো সকালে থাকে না—অনেক দিন পর্যন্ত স্বামীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেন নি। কিন্তু ভদ্রলোক নির্বিকার।'

'তার পর?' বিনু প্রায় রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করেছিল।

'তার পর আর কি দাদা। দু দিনের লজ্জা দু দিনেই কেটে গেছে। যথারীতি আসাযাওয়াও চলছে।—এক্ষেত্রে যা হয়। মার আসনাইয়ের লোকের ওপর মেয়েরা ফলেন হয় শুনিস নি। তাও হয়েছে। ফলে একজামিনেশনে ড্যাম্বা। অমন ভাল ছেলে, ঐ একটা আধবুড়ো মাগীর জন্যে, নিজের কেরিয়ারটা নষ্ট করল ছোঁড়া।...'

এও যদি সত্যি হয়—রাখালের মনের এ প্রসারতাই বা সম্ভব হবে না কেন ঃ অবিশ্বাস্য বলেই যে অসম্ভব হবে—তার মানে কি?

॥ ৫১ ॥

না, বিনুর আসা যাওয়া বন্ধ হয় নি একেবারে।

হওয়ার কোন কারণও ছিল না। রাখাল যে আশংকা করেছিল সেটাই ভ্রান্ত, প্রমাণিত হল টিয়ার ক্ষেত্রে। ওর ভাষায় 'চার্ম'টা' আদৌ কমল না। আট মাস পর্যন্ত তার দৈহিক গঠনে এমন কোন বৈলক্ষণ্য দেখা দেয় নি, যাতে তার ঐ

অবস্থা অনুমান করা যায়।

তবে আসাযাওয়া স্বাভাবিক নিয়মেই কমেছে। সময় গেলে নতুন নেশা যদি বা না কাটে—তার প্রাথমিক প্রাবল্য বা উদ্দামতা কমতে বাধ্য। অবশ্য মাদক বা ঘোড়দৌড়ের নেশা ছাড়া। বিনুর ক্ষেত্রে আরও একটা কারণ ছিল, অপর একটা প্রবলতর নেশা। সে নেশা এসব দুর্বলতায় যদি বা সাময়িকভাবে চাপা পড়ে—কিছুদিন পরে আবার প্রবল হয়ে উঠবে—এ স্বাভাবিক এবং সত্য।

নিজের সৃষ্টিই শিল্পীর কাছে সবচেয়ে বড় নেশা। বিনু তখনও এমন কিছু প্রতিষ্ঠা পায় নি সত্যিকথা, কিন্তু সেই জন্যেই আরও সে নেশা প্রবলতর। প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতিই তার কাছে প্রিয়তর, প্রিয়তম। যে শিল্পী আর্থিক পুরস্কারের জন্যে সৃষ্টির কথা চিন্তা করে সে নিম্নস্তরের শিল্পী, কর্মী মাত্র।

টিয়ার প্রথম মেয়েই হল।

রাখাল অবশ্য তাতে খুশী। সে বলে মেয়েরা বাপকে বেশী ভালবাসে, বুড়ো বয়েসে দেখে। তাড়াতাড়ি নাতি-নাতনীও হয় মেয়ের সুবাদে।

কিন্তু টিয়ার মন খারাপ হল একটু, সে এতদিন ছেলে হবারই স্বপ্ন দেখেছিল, তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে প্রথম ছেলেই হবে তার। তাছাড়াও মন খারাপের কারণ—মেয়ে রাখালের মতোই দেখ্‌তে হয়েছে। খারাপ নয়। তবে সুন্দরও বলা যায় না, কোন মতোই।

তার মন খারাপের আসল কারণ অবশ্য অন্য। সেটা নিজেই একদিন বলে ফেলে।

বিনু প্রথম প্রথম কোলে নিত না, সদ্যোজাত শিশু কোলে নেওয়ার অভ্যেস নেই তার, ভয় হয়। কিন্তু মাস তিনেক যাবার পর যখন ভরসা ক'রে কোলে নিতে পারল, তখন আদরও করতে লাগল খুব—তাই দেখেই একদিন নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, বলে ফেলল বলাই উচিত, 'ওঃ, আমার যা ভয় হয়েছিল, কি বলব।'

'কিসের ভয়?' বিনু তার মেয়েকে নাচাতে নাচাতেই প্রশ্ন করে।

'এই—মানে মেয়েকে তুমি যদি কোলে না করো।...তুমি আদর করবে না আমার মেয়েকে, এই ভেবেই আরও মন খারাপ হয়েছিল।'

'সত্যি। তোমার কি বুদ্ধি, বাপ কাকা বুঝি শুধু সুন্দর হলেই সন্তানকে আদর করে—আর কুচ্ছিত হলে ফেলে দেয়? আমাদের মেয়ে যেমনই দেখতে হোক আমাদের প্রিয় হবে—এইতো, স্বাভাবিক।'

'সত্যি বলছ? এ যদি তোমার মেয়ে হত—একটু মন খারাপ হ'ত না তোমার?'

'কেন হবে?' একটু জোর দিয়েই বলে বিনু, 'তুমি আর কাকেও দেখো নি কুচ্ছিত ছেলেমেয়েকে আদর করতে?...আর তোমার মেয়ে খারাপ দেখতে—এই বা তোমার মাথায় ঢুকল কেন? বাপের মতো মুখ হয়েছে ওর—রাখালবাবু কি খারাপ দেখতে? তোমার মতো হলেই যে সুন্দর হত—তাই বা কে বললে। তোমার দেখছি রূপের খুব অহংকার।'

'তোমরা ভাল বলো বলেই অংকার। বিশেষ তুমি বলো বলে। আমার

চেহারার আমি কি বুঝব।'

এই বলে, একটা যেন ঝংকার দিয়ে, অনন্য ভঙ্গীতে ঘাড় ঘুরিয়ে সেখান থেকে চলে যায় সে।

এই ঘাড় ঘুরিয়ে নেওয়াটা খুব ভাল লাগে বিনুর। গ্রীবার একটা অপূর্ব ভঙ্গী, কাঁধের গলার সুগৌর বর্ণ—তার ওপর ঈষৎ নেতিয়ে পড়া একরাশ চুলের এলো খোঁপা—সবসুদ্দু মিলে যেন একটা ছবির সৃষ্টি করে, কোনো বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা।

কিছুদিন আগে একথাটা একবার বিনু ওকে বলেছিল। তারপর থেকেই বোধহয় এই ঘাড় ঘোরানোটা বেড়ে গেছে আবার। তা হোক, এছবি যতই দেখুক—আশ মেটে না, এটাও ঠিক।

সন্তান হবার পর কি টিয়ার আত্মবিশ্বাস আর অহংকার একটু বেড়ে গিয়েছিল?

সেই সঙ্গে ওর রূপের দীপ্তি—প্রবল আকর্ষণ?

কে জানে। অন্তত বিনুর তাই মনে হয়।

অনেক পরেও মনে হয়েছে।

কথাটা অনেকবার অনেক রকমভাবে ভেবে দেখেছে সে।

আজও ভাবে মধ্যে মধ্যে।

রাখালবাবুর আশঙ্কাটা মিথ্যা ক'রে দিয়ে বিনু যেন ইদানীং আরও বেশী মুগ্ধ বা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে টিয়া সম্বন্ধে। আর সে সম্বন্ধে সচেতনতা যথেষ্ট থাকলেও তার প্রতিবিধান করতে পারে না। অনুতপ্ত নেশাখোরের প্রতিজ্ঞার মতোই তা কোথায় তলিয়ে যায়।

আর, টিয়ার তো কথাই নেই।

হয়ত আগেও তার বিনু সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা ছিল। হয়ত তা ক্রমে ক্রমে একটু একটু ক'রে বেড়েছে কিন্তু সেটা আগে এতটা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় নি, প্রকাশ করতে বা পেতে সাহসে কুলোয় নি—সবটাই হয়ত সচেতন ভাবে নয়, নিজের মনের অবচেতনে শুভবুদ্ধি সংস্কার কাজ ক'রে গেছে।

কিন্তু এই মেয়েটা হবার পর সেও যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে। আর কোন সংকোচ কি আশঙ্কার কারণ নেই কোথাও, তার আচরণে এইটেই মনে হয়। সে যেন দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

বিনুর মনে হয়—এখন মনে হয়—কতকটা তার জন্যে রাখালের ঔদাসীন্য নয়, প্রশ্রয়ই দায়ী। এমন কি আগ্রহ বললেও অন্যায় হয় না।

রাখালের এ এক বিচিত্র মনোভাব।

বোধহয় সে কেবলই ভাবে সে টিয়ার যোগ্য নয়, টিয়ার প্রাপ্য সে দিতে পারে না।

টিয়ার মানসিক গড়নটা রোমান্টিক ধরনের এটা প্রথম থেকেই বুঝেছিল সে। লেখাপড়া করে নি, রোমান্স কাকে বলে তা সে জানে না—বোঝাতেও পারবে

না। এটা ওর সহজাত—মনের এই গঠনটা।

রাখাল ভাবে সে রোমান্সের খোরাক যোগাবার জন্যেই ইন্দ্রকে দরকার। ললিতবাবুতেও তার আপত্তি ছিল না, কিন্তু টিয়ার ঝোঁকটা ইন্দ্রর দিকে। সে যাকে নিয়ে ভুলে থাকে থাক, রাখাল বেঁচে যায় তাতে।

একথা রাখাল আকারে ইঙ্গিতে তো বটেই, স্পষ্টও বলেছে।

আকর্ষণ আবেগ ক্রমশই উদ্দাম হয়ে উঠবে, কামনায় পরিণত হবে এও স্বাভাবিক। সে কামনাও বাঁধন মানতে চাইবে না একদিন।

বাধা পেলে তো বটেই, বাধা না পেলেও হবে।

রাখালের সাংসারিক জ্ঞান মানব চরিত্রে অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। এটা কি সে জানত না? কে জানে, এ কথাটা সে ভেবে দেখেছিল কিনা। হয়ত যখন ভেবেছে তখন আর ফেরার উপায় নেই। বাধা দিতে গেলে হিতে বিপরীত হবে, 'বাধা দিলে বাধবে সমর' সেটাই ভেবে আরও উদাসীন ছিল।

তবু, বিনুও যে কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে ভেতরে ভেতরে—তা ঠিক বুঝতে পারে নি। ভাল লাগে এটাই ভেবেছিল। আগেও লাগত, এখন হয়ত একটু বেশী ভাল লাগে। তাতে আর এমন দোষের কি আছে।

দোষের যে কি আছে—তা একদিন বুঝতে পারল। হঠাৎই বুঝল।

সে ভাদ্র মাসের এক অপরাহ্ন বেলা। সন্ধ্যার কাছাকাছি। আকাশে একই সঙ্গে সোনালি আর কালো মেঘ ছড়ানো। ঘরের মধ্যেও ঘনিয়ে আসা অন্ধকার একটা আবছায়ার সৃষ্টি করেছে, তবু কেমন একটা সোনালি আভাও আছে তার মধ্যে।

বিনু সেদিন সকাল সকালই এসে পড়েছিল। এখন নিত্য আসে না, এলেও দেরি করে আসে—রাখালের ফেরার সময় বুঝে। কিন্তু সেদিন একটা জরুরী লেখা আছে, সেটা কাল সকালে দিতে হবে। কিছুদিন আগে হলেও অত গ্রাহ্য করত না—এখন এই জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধার ফলে কেমন যেন চারদিকেই গোলমাল, অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা। বহু প্রকাশক বই ছাপা বন্ধ করেছেন সাময়িকভাবে, ভাবগতিক লক্ষ্য করছেন বসে বসে। অনেক কাগজেরও সেই দশা প্রায়। বিশেষ, লেখা ছেপে টাকা দেবে যারা তারা কাগজের কলেবর কমিয়ে দিয়েছে। লেখকদেরই বিপদ, চারিদিক দিয়ে। সুতরাং লেখার বায়না পেলে আর ফেলে রাখা উচিত নয়। সাধারণত সন্ধ্যাবেলা সে লেখে না, তবে এখন আর ওসব বিলাসের সময় নেই। লিখতেই হবে। তাই ফিরবেও তাড়াতাড়ি।

এ প্রস্তাবে বরাবরই টিয়া প্রবল আপত্তি প্রকাশ করে। ঝগড়াঝাঁটিও হয়ে গেছে এ নিয়ে। সে চায় রাখাল না আসা পর্যন্ত বিনু থাকুক। অন্তত রাত আটটা অবধি তো অনায়াসে থাকতে পারে। এত কিসের তাড়া? এখান থেকে বেরিয়ে বাস-এ বেলেঘাটা ইস্টিশান যেতে দশ মিনিট, ট্রেনে আর পনেরো মিনিট, আধঘন্টার মধ্যে তো বাড়ি পেঁছে যাবে। আসলে তা তো নয়, এসেই পালাই পালাই করে তার মানে এখানে আর ভাল লাগে না। তা না এলেই তো হয়।

মিছিমিছি এ মন খারাপ করতে আসা কেন? ইত্যাদি।

এ অভিযোগ প্রায়ই শুনতে হয় বিনুকে। আসতে থাকতে বেশী ইচ্ছে ক'রে বলেই যে থাকতে চায় না—অন্তত রাখাল না থাকলে—সে কথাটা ওকে বলা সম্ভব নয়। এটা যে অশোভন তাও টিয়ার মাথায় ঢোকে না।

সে চুপ ক'রেই থাকে, আজও রইল।

মেয়েটা ঘ্যান ঘ্যান করছিল, সর্দি জ্বর মতো হয়েছে, বিনুর কোলেই ঘুমিয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে সাবধানে—যাতে কাঁচাঘুম না ভাঙ্গে—বিছানায় শুইয়ে দিল।

টিয়া ঘুম পাড়ানো থেকে শুইয়ে দেওয়া পর্যন্ত সবটাই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এখনও মেয়েটার দিকে চেয়ে থেকেই কেমন একটা অদ্ভুত কণ্ঠে বলল, 'মেয়েটা তোমার হওয়াই উচিত ছিল। কেমন পারো তুমি খাইয়ে পর্যন্ত দাও কত সহজে। তোমার বন্ধু তো কিছুই পারে না—একটু ঘুম পাড়াতেও জানে না।'

এই অস্বাভাবিক গলার স্বরটা ভাল লাগল না বিনুর।

এর কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে তা নয়, এমনিই মনে হ'ল—অনেকখানি আবেগ কোন মানুষের কণ্ঠরুদ্ধ ক'রে না ধরলে পরিচিত কণ্ঠ এমন ক'রে পাল্‌টে যায় না, এমন বিকৃত চাপা শব্দ বেরোয় না গলা দিয়ে।

আসলে যেন নিজের মনের অবস্থা দিয়েই ওর মনটা বুঝতে পারল সে।

বিনু একেবারেই উঠে দাঁড়াল এবার।

ওর এই কথা বলার ভঙ্গী, ঐ স্বর, তার মনেও বিপুল এক ঝড়ের সৃষ্টি করেছে। সে শব্দ বুঝি বাইরে থেকেও পাওয়া যাবে।

টিয়া আজ আর ঝগড়া বিবাদ করল না।

বকাবকি জেদ—কিছুই না।

কেমন এক রকম বিহ্বল শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে—কাছে এসে বিনুর হাতের ওপর হাত রাখল। হাতের চেটোর ওপর। বিনুই একদিন বলেছে, টিয়ার নরম হাতে অল্প অল্প ঘাম হয় অথচ জল ঘাঁটার মতো ঠাণ্ডা লাগে না, গরম থাকে—খুব ভাল লাগে তাই। টিয়া হাত বাড়ালে তাই নিজের হাতটা সোজাভাবে পেতে দেয়।

হাতটা শুধু রাখল না, চেপেই ধরল বলতে গেলে। তেমনি চাপা বিকৃত কণ্ঠে বলল, 'যাবে? আর কোন রকমেই থাকা যায় না, না?'

বিনু সে কণ্ঠস্বর আর স্বল্প-ভাষণের অর্থ বুঝল বৈকি।

ওরও মনে যে প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে তাতে আর একটুও দেরি করা উচিত নয়—এখনই চলে যাওয়া দরকার, সময় থাকতে।

কিন্তু তা পারল না।

সেই প্রায়-অন্ধকার ঘরে বাইরের কনে-দেখা-মেঘের যে সামান্য আভাস এসে পড়েছে দরজার মধ্য দিয়ে—সেই আলোতে টিয়ার দিকে চেয়ে যেন সবটাই গোলমাল হয়ে গেল। আর সামলানো যাবে না, সম্ভব নয়। সব প্রতিজ্ঞা,

সব শুভবুদ্ধি বুঝি ভেসে চলে গেল কোথায়।

টিয়ার সুগৌর কপোলে ললাটে কে যেন তখন নিবিড় ক'রে সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে। নিবিড়তর হচ্ছে সে রং, কপালে চুলের গোড়ায় গোড়ায় ঘাম ছিলই, এখন তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে—ঠোঁটের ওপরও, গলার খাঁজে ঘাড়ে ঘাম জমে উঠেছে, দেখতে দেখতে তা বাড়ছে, ওর আত্মহারা হয়ে চেয়ে থাকার কটি মুহূর্তের মধ্যেই। সবচেয়ে নিচের ঠোঁটের তলায় দুটি তিনটি বিন্দু ঘাম টলটল করে সর্বদা—আজও তা তেমনি ফুটে উঠেছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে; যা বলা যায় না, যাবে না, সেই না বলা কথার ভার যেন সহ্য করতে পারছে না আর, কাঁপছে বিনুর হাতের মধ্যে ধরা হাত দুটোও—তাতেই টের পাওয়া যাচ্ছে সমস্ত দেহটাই কাঁপছে থরথর করে—

তারপর? আর কোন জ্ঞান ছিল না বিনুর। ঝাপসা ঝাপসা যা মনে আছে—টিয়াকে সে সবলে সবেগে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ওর কম্পিত উৎসুক ঊর্ধ্বোত্থিত ঠোঁট দুটি নিজের পিপাসিত ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরেছিল। একে চুম্বন বলা যায় না, সে কাকে বলে তাও জানে না বিনু, কিন্তু দেহের নিয়ম আপনিই কাজ ক'রে গেছে। অর্ধ বিকশিত শতদল আবেগের উত্তাপে দল মেনেছে—চুম্বনেই পরিণত হয়েছে। এই চুম্বনের মধ্যে দিয়েই টিয়া যেন বিনুকে সম্পূর্ণভাবে পেতে চাইছে। তারও কোন জ্ঞান নেই তখন, বিচার-বিবেচনা লোকলজ্জা সংস্কার কিছু নয়—শুধু বহুদিনের কামনা আর তৃষ্ণা, আর কিছু নয়।

চেতনা ফিরেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই!

লজ্জায়, ভয়ে অনুশোচনায় শিউরে উঠেছে।

কিন্তু ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেকে মুক্ত করতে পারল না তখনই।

তখন আর ওর কিছু করার নেই, টিয়া দুহাতে ওর মাথা চেপে ধরেছে, ঠোঁট চেপে আছে প্রাণপণে।

অবশেষে একসময় বাইরে ওদের দরজার কাছেই কোথাও বাড়িওলা গিন্নির কি কথা কানে যেতে টিয়ারও সম্বিৎ ফিরল। সে ওকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। বালিশের খাঁজে মুখ দিয়ে ব্যর্থ কামনার বেদনায় ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। সে কান্নার শব্দ না পেলেও পিঠের ফুলে ফুলে ওঠা দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

বিনু বেরিয়ে এল আস্তে আস্তে। বাড়িওলা গিন্নী কি বলছেন, হয়ত কোন প্রশ্নই করছেন, তা কানেও গেল না, উত্তরও দিল না।

সেই শেষ।

বিনু আর যায় নি রাখালদের বাড়িতে।

রাখাল প্রথমে বিস্ময় বোধ করেছে, সে বিস্ময় অনুযোগের মধ্যে দিয়ে প্রকাশও ক'রেছে। তারপর—হয়ত ব্যাপারটা আন্দাজ করেই অনুনয়-বিনয়ের পথ ধরেছে। তার মধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছে, ঘটনা যা-ই ঘটুক তাতে রাখালের

দিক থেকে কোন অসুবিধা নেই, তার ঈর্ষা কি উষ্মার কোন কারণ ঘটে নি। বিনুর বেলায় তা ঘটতে পারে না। ঘটনা চরমে পৌঁছলেও তার কোন আপত্তি নেই, মনে কোন বিকার দেখা দেবে না।

কে জানে হয়ত টিয়াই সব বলেছে।

টিয়ার এই এক আশ্চর্য স্বভাব। সে স্বামীর কাছে কখনও মিথ্যে বলে না। পারতপক্ষে কারও কাছেই বলে না।

রাখাল অন্য পথও ধরেছে? টিয়া খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, মেয়েটাকেও তেমন যত্ন করে না, বসে বসে কাঁদে— এসব কথা সবিস্তারেই বলে।

'জানি নে মশাই, আপনাদের কি ব্যাপার। মান-অভিমান কিসের তাও বুঝিনে। 'পৃথিবীতে তো আপন বলতে এই দুটি লোক আমার, তা তারাও যদি একজন নর্থ পোল আর একজন সাউথ পোলে বসে থাকে তো আমি বাঁচি কি ক'রে। অন্যায়ই যদি কিছু ক'রে থাকে, জানেন তো মানুষটাকে, একেবারেই ছেলেমানুষ আর গেঁয়ো। আপনিই তো মানিয়ে নিতেন, এখন এমন বিরূপ হয়ে উঠলেন কেন?'

'না-না, সেসব কিছু নয়। দেখছেন দিনকাল কি পড়ল, অন্নচিন্তা চমৎকারা —সারা পৃথিবীতে একটা ওলট-পালট হ'তে চলেছে। এখন কি এসব মান-অভিমানের কথা ভাবার সময়? এতদিন তো গেছিই, কটা দিন দূরে থেকে দরটা বাড়াই না। আবার যাবো। এ নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন।'

কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে বিনু।

তবে কথা একেবারে মিথ্যাও নয়।

সারা দেশেই যেন একটা আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার ভাব নেমে এসেছে, সাধারণ স্বাভাবিক জীবনে যেন একটা অস্থিরতার ও বিপর্যয়ের কুয়াশা দেখা দিয়েছে। বিশেষ এই কলকাতা শহরে। মৃত্যুভয় ও আসন্ন সর্বনাশের কথা ছাড়া কেউ কিছু ভাবছেই না।

বোমা তো পড়বেই, এ শহরের কিছু থাকবে না কোথাও, চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না—এ বিষয়ে সবাই নিশ্চিত। সকলেই পালাচ্ছে, সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় 'অন্য কোথাও অন্য কোথাও, এ রাজ্যে আর নয়। ভাগ্যে মম স্বর্গপুরী হ'ল বিষম ভয়।'—সেই অবস্থা।

ফলে অনেকে নতুন তৈরী শখের বাড়ি জলের দামে বেচে দিচ্ছে। এক বিখ্যাত লেখক বিয়াল্লিশ হাজারের বাড়ি উনিশ হাজারে বেচে দিলেন, বিনুর এককালীন এক ছাত্রের বাবা শিয়ালদার কাছে দুখানা বাড়ি তেরো হাজারে বেচে ভাগলপুর চলে গেলেন, কিনল মোড়ের পানওলা। কাজ-কারবার অধিকাংশই বন্ধ বা বন্ধর মতো। কোন মতে শুধু কলকাতার বাইরে যেতে পারলেই হয়। তাহলেই যেন বেঁচে যাবে, এ আতঙ্ক থেকে অব্যাহতি পাবে।

শুধু কলকাতাতেই বোমা পড়বে কেন—একথা কেউ বলতে পারছে না।

যারা পয়সাওলা লোক, তারা বিহারে যুক্তপ্রদেশে চলে যাচ্ছে, মধুপুর

দেওঘর, শিমুলতলা জানাশোনা থাকলে মুঙ্গের, ভাগলপুর, দারভাঙ্গাও। কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ। এমন কি দিল্লীতেও। জাপানীদের বোমা কলকাতায় এলেও দিল্লী পৌঁছতে পারবে না, মনে মনে তারা এই আশ্বাস সৃষ্টি করছে। যাদের আত্মীয়রা চাকরি কি ব্যবসা করে তারা এই সুযোগে বোম্বে, মাদ্রাজ, নাগপুর, বাঙ্গালোর চলে যাচ্ছে—অনেকে জব্বলপুরেও চলে গেল, সেখানে মিলিটারী অস্ত্রশস্ত্রর কারখানা আছে জেনেও।

যাদের এমন কোন শাঁসালো আশ্রয় কি নিজের গাঁটের জোর নেই, তারা নবদ্বীপ কাটোয়া বর্ধমান—তাও যাদের সামর্থ্য নেই তারা কোন্নগর উত্তরপাড়াতে বাড়ি কি ঘর খুঁজতে লাগল। আত্মীয় থাকলে তো কথাই নেই।

কি খাবে কি ক'রে দিন কাটবে, এমন অবস্থা কতদিন চলতে পারে, তারপর কি হবে—এসব কথা চিন্তাও করল না কেউ। প্রশ্ন করলে উত্তর দিচ্ছে, 'আরে মশাই প্রাণ বাঁচলে অনেক উপায় হবে। ভিক্ষা করেও খেতে পারব।'

ভিক্ষেটাই বা দেবে কে ?

সে যা হয় হবে। ভগবান আছেন। যিনি জীব দিয়েছেন তিনিই আহার যোগাবেন। —নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় উত্তর দেয় দিশাহারার দল।

কেবল ভগবানের ওপর এই নির্ভরতাটা কলকাতায় কেন থাকল না,—সে উত্তরটা কেউ দিতে পারছে না। আর প্রাণটা যদি বোমার আঘাত থেকে বেঁচে যায় তো—কোনদিন কোন কারণেই আর যাবে না—এমন ধারণাই বা হল কেন—সে কথাও কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায় না। করলে সদুত্তর তো মেলেই না, প্রশ্নকর্তার ওপর রেগে ওঠে।

বিনু একটি প্রবীণ ভদ্রলোককে বলেছিল, 'বোমার হাত থেকে বাঁচলে কি চিরদিনের জন্যে বেঁচে যাবেন ? বাঁচতে পারবেন ? এই তো এইভাবে যেতে গিয়েই কত লোক মরবে। তাছাড়াও কে কখন কিসে মরবে তা কি কেউ বলতে পারে। মানুষ কি অমর ?'

তাতে তিনি মুখ খিঁচিয়ে জবাব দিয়েছিলেন, 'দেখব, দেখব। এসব ডেঁপোমি আর বড় বড় কথা কোথায় থাকে। মরবে তো একদিন সবাই—তাই বলে কে আর যেচে সেধে জেনেশুনে মরণের দিকে এগিয়ে যায় !'

রাখাল এই উপলক্ষে এদিক দিয়ে একটু গলাতে চেষ্টা করেছিল, ওর ভাষায় জাস্টু এটা একটা য়্যাপীল।

তার ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটারের আপিস, কাজ-কারবার তাদেরও বন্ধ হতে বসেছে, মাইনে এক কিস্তিতে কখনই বিশেষ দেন না, এখন তো দু টাকা পাঁচ টাকা ক'রে দিচ্ছেন, তাও নিত্য তাগাদা করে বলে। মালিকদের একজন জব্বলপুর, একজন রাজপুতনা চলে যাচ্ছেন। টাকা-কড়ি যা পেয়েছেন আদায় ক'রে নিয়ে কিছু সেখানের ব্যাঙ্কে সরিয়ে দিচ্ছেন—কিছু যা শোনা যাচ্ছে কাঁচা টাকা আর সোনাতেই রূপান্তরিত করেছেন বেশির ভাগ—সেগুলো নানা ভাবে বিচিত্র কৌশলে নিয়ে যাচ্ছেন। জার্মানরা এলে ইংরেজ সরকারের নোট অচল হয়ে

যাবে, ব্যাংকও কাজ করবে না এই ভয়টাই ধনী ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বেশী।

সুতরাং কর্মচারীদের 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা' অবস্থা। এখানে থেকেই খেতে পাবে না—কোথাও যাওয়ার প্রশ্ন তো সুদূর-পরাহত।

কনকরা আগেই কাশী চলে গেছে। রাখালের জায়গায় যে ছেলেটি কাজ করছে সুধীর বলে, বস্তুত তার ওপরই ব্যবসা ও বাড়ির ভার। তাকে বলেছে, 'যা আদায় হবে তা থেকে তোমার মাইনে নিও—দরোয়ানের মাইনে দিও।' বিনুকে ডেকে পাঠিয়ে মাসিক সাপ্তাহিক দুটো কাগজের ভার দিয়ে গেছে, বলে গেছে—যদি সম্ভব হয়, যদি প্রেস কাজ করে বা কোন এজেন্ট কি হকার নিতে প্রস্তুত থাকে তো যেন কাগজ বার ক'রে যায়। প্রেস ধারে কাজ করে, কাগজও ধারে পাওয়া যায়, সুতরাং সেজন্যে কোন চিন্তা নেই। বিনুকে গোটা পঞ্চাশ টাকা আগাম দিয়ে গেছে—অনির্দিষ্ট ও অনির্দেশ্য কালের জন্যে এককালীন পাথেয়, হাত-খরচ ইত্যাদি বাবদ। অবশ্য বলেছে যদি ফিরতে দেরি হয়—টাকা পয়সার খুব ঠেকা পড়ে সুধীরের কাছ থেকে খাতায় কোণ টুকে দু-পাঁচ টাকা নিও।'

কিন্তু আসল লোক সুধীরই বিনুকে বলেছে, 'আমিও কোথাও পালাব ভাই —যা বলুন। ত্রিশ টাকা মাইনের জন্যে এ শ্মশান আগলে বসে কি বোমা খাব। তাও ত্রিশটে টাকাও তো আর মিলবে না। বলে গেছে আদায় ক'রে নিতে। এ বাজারে কে টাকা দেবে বলুন তো। সব তো বরং যে যা পাচ্ছে হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়ছে। বিজ্ঞাপনের টাকা কে দেবে, আদায় বা কে করবে। উনি তো দশটা টাকাও দিয়ে গেলেন না। হীরেপুরে আমার এক বোন থাকে, বি এন আরের নলপুর ইস্টিশানে নেমে যেতে হয়—সেখানেই মনে করছি চলে যাবো। জ্যাঠতুতো বোন, তাও বোধহয় ফেলবে না।'

বিনু হাসে।

'ওপর থেকে এত হিসেব ক'রে ওরা বোমা ফেলবে—ম্যাপ দেখে দেখে যে কলকাতায় শুধু পড়বে, তার দশ মাইল বারো মাইল দূরে পড়বে না! তাছাড়া কাছেই সব বড় বড় কল, বাউড়িয়া, রাজগঞ্জ, আরও কত মিল আছে। না, না, যেতে হয়, দূরে কোথাও চলে যান।'

'কার কাছে যাবো বলুন।' সুধীর মুখ শুকিয়ে উত্তর দেয়, 'এখেনে সতাতো দাদার সঙ্গে একত্তরে আছি তাই চলছে, মাসে পনেরোটা ক'রে টাকা দিই—কিছু বলে না। তিনি চলে যাচ্ছেন—ডায়মণ্ডহারবারের কাছে কোথায় তাঁর শ্বশুরবাড়ি, তারা আবার ভেতরে কোথায় গ্রামে বাড়ি পেয়েছে সেখেনে। দেশ আমার মুর্শিদাবাদ জেলায় ভগীরথপুরে—সেখানে জ্যাঠাইমা তাঁর নেণ্ডি-গেণ্ডি নিয়ে থাকেন—তিনিই খেতে পান না। মা থাকেন মামার কাছে বাঁকড়ো জেলার এক গাঁয়ে—শশী বাঁড়ুজ্যেদের কালী মন্দিরে পুজুরী। কোথায় যাই বলুন। সেখেনেই যাবো? ডায়মণ্ডহারবারে দাদার শ্বশুরবাড়ি খালি পড়ে থাকবে—সেখেনে যেতে পারি, কিন্তু খাবো কি!'

'ক্ষেপেছেন! ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে কি করবেন', মজা দেখার জন্যেই বিনু

বলে। 'ঐসব স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টেই আগে পড়বে।'

'তবে আর কি করি বলুন। হীরেপুরেই যাই। জ্যাঠতুতো বোন, তবু ফেলতে পারবে না একেবারে। তাদের চাষবাসও আছে, সোম্বচ্ছরের চালটা হয় শুনেছি।'

রাখাল এসে মুখ শুকিয়ে বলে, 'আমার বাড়িওলারা তো যশোরে চলে গেল কাল। ওদের কে আছে—সয়ের-বোয়ের-বকুলফুলের-বোনপো-বোয়ের নাতজামাই—সেই সুবাদে, ঝিনাইদা না কোথায়। পাড়া তো শ্মশান। আছে যা কিছু জেবার ক্লাস আর চোর-ডাকাত। ওকে কোথায় সরাই বলুন তো। ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে, ঘর থেকে বেরিয়ে কলতলায় যেতে পারে না। এক তো আপনার অদর্শনেই আধখানা হয়ে গেছে—এখন তো খাওয়াদাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। মেয়েটা কেঁদে উঠলে, এমন পাগল, তার মুখে আঁচল পুরে চুপ করাতে চায়—পাছে ওর কান্নায় লোক আছে জেনে জোর ক'রে কেউ দোর ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে। ওধারে মেয়েটা যে দম বন্ধ হয়ে মরে যেতে পারে, সে খেয়াল নেই।···একটা কথা কদিন ভাবছি। মামার রিটায়ার করার সময় অবিশ্যি হয়ে গেছে, তবে শুনছি যুদ্ধের বাজারে এখন ছাড়াবে না—একসপিরিয়েন্সড্ হ্যাণ্ডদের একসটেনশান দেবে। সেখানেই পাঠাবো?'

'সেটাই কি খুব নিরাপদ হবে? রেলের এতবড় কারখানা—এই সবই তো বড় টার্গেট।'

'আর কোথায় পাঠাই বলুন। কোন চুলোয় কেউ নেই যে। যেমন আমার, তেমনি ওর। শ্বশুরবাড়ি এমন, সেখানে গেলে মেয়েটাকে না খাইয়ে মারবে। এখানে থাকলে ভয়ে মরবে। জামালপুরে আর যাই হোক, এমন অহরহ চোর ডাকাত লুটেরার ভয় থাকবে না তো। মরে সকলের সঙ্গে মরবে।'

'তবে তাই যান।'

একটু চুপ ক'রে থেকে আসল কথাটা পাড়ে রাখাল।

'আপনি একটু দয়া করবেন? জাস্ট দুটো দিন। একটু পেঁছে দিয়ে আসবেন কাইণ্ডলি? একটা রাতের তো ব্যাপার! আমি সুদ্ধ গেলে এখানে ঘরদোরের জানলা সুদ্ধ খুলে নিয়ে যাবে। আর সব মাল তো পাঠানোও যাবে না—ট্রেনে তো পেষাপেষি ভিড়। কিছু তো আছে, ঘর করতে গেলে এসব লাগবে।'

'দেখুন, ওসব জিনিসের মায়া করবেন না। বরং দু একটা যা ওর মধ্যে দামী জিনিস মনে হয়—আপিসে এনে রাখুন। সেখানে তো কেউই নেই। আপনিও ওদের জামালপুরে রেখে এসে ঐখানেই বাসা করুন। মালিকরা বুঝবে আপনি জান দিয়ে কোম্পানীর সম্পত্তি আগলাচ্ছেন।···একটা গুর্খা আর একটা ভোজপুরী দারোয়ান তো থাকবে বলছেন—তাদের কিছু কিছু দিয়ে মেস মতো করুন। অনেক কম খরচায় চলে যাবে। একলা রেঁধে বেড়ে খেতে গেলে যে খরচ হবে সেটা কে দেবে?'

রাখাল ওর হাত দুটো চেপে ধরল, 'আপনি যেতে পারেন না কোন মতেই? এই একবার, আর বলব না।'

সেদিন আর দ্বিধা করল না বিনু। রাখালের চোখের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে বলল, 'এমনিই অনেক দেরি হয়ে গেছে রাখালবাবু, আপনার কাছে শাক দিয়ে মাছ ঢেকে লাভ নেই, আপনি সবই বোঝেন। অনেক আগেই সরে আসা উচিত ছিল। ওর কতদূরে কি অনিষ্ট হয়েছে জানি না, আমার খুব বেশী হয়েছে। আর একটু হলে মনুষ্যত্বটা হারিয়ে বসে থাকতুম। না, আপনিই যান, আর জটিলতা বাড়াবেন না। বরং দু-চার টাকার দরকার হয় তাও যোগাড় ক'রে দিতে পারব। লেখার টাকায় ভাঁটা পড়েছে কিন্তু এই নতুন বাড়ি বিক্রীর হিড়িকে পুরনো ব্যবসাটা ঝালিয়ে তুলেছি—দু চার টাকা আসছেও। বলেন, আপনি যে দুদিন থাকবেন না, ওখানে কাউকে শোওয়ারার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারব, নইলে আমি আর ললিত গিয়ে শোব—এর বেশী আর আমাকে জড়াবেন না।'

রাখালও দৃষ্টি নামাল না, তেমনি স্থির বিচিত্র দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বলল, 'কিন্তু মালিকের যদি বিন্দুমাত্র আপত্তি না থাকে—সে সম্পত্তি ভোগ করায়, মনুষ্যত্ব যাবার প্রশ্ন ওঠে কি?'

'সেখানেই আরও বেশী ওঠে। এতখানি উদারতা, মহত্বই বলব, এতখানি বিশ্বাস আর ভালবাসার অমর্যাদা করলে নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে যেতে হয় যে। আয়নার মুখ দেখতেও লজ্জা করবে।'

রাখালের মানবচরিত্রে যতই অভিজ্ঞতা থাক—বিনুর ব্যাপারটা সে ভাল বুঝতে পারে না। এতটা আকর্ষণ, নেশাই বলতে গেলে—প্রথম দিন থেকেই লক্ষ্য করেছে, ক'রে গেছে আগাগোড়াই—সে লোক এমন এক কথায় ছেড়ে দেয় কি ক'রে! টিয়া রাখালকে সবই বলেছে, নিজের দোষও গোপন করেনি, এমন একেবারে মুখ না দেখাবার মতো কি হ'ল সেটাই ওর মাথায় ঢোকে না।

ওকে দিয়ে টিয়ার মন ভরে নি, ভরার কথাও নয়—বিনুকে পেলে আশ মিটত—রাখালের এই বিশ্বাস, আর তা হলে যেন রাখাল বেঁচে যেত, নিত্য এমন অকারণে স্ত্রীর কাছে নিনু হয়ে থাকতে হত না। টিয়া অবশ্য ওকে অনেকবার বলেছে, 'তুমি অমন কর কেন গা। অনেক ভাগ্যি আমার তাই তোমার মতো বর পেয়েছি। ঐ তো বাবার ছিরি, জন্ম কেটে যেত ঐ সংসারে পাতার জ্বালে রান্না করে আর ক্ষার ফুটিয়ে। বড় জোর কোন মাতাল বজ্জাত কিছু টাকা খাইয়ে নিয়ে গিয়ে আরও দুর্গতি করত।'

তবু কেন কে জানে কোথায় একটা কুণ্ঠা থেকেই যায়।

সে তাই চায় বিনু কাছে কাছে থাকুক টিয়ার।

ছিলও তো, হঠাৎ এ আবার কি হল।

আসলে বিনুর কথা বিনু নিজেই জানে না যে।

নিজের মনের পুরো চেহারাটা আজ পর্যন্ত দেখতে পায় নি ও, এই বুদ্ধ

বয়সেও নিজের পরিচয় নিজের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে।

ওর মধ্যে দুটো সত্তা বাস করে—পাশাপাশি শুধু নয়, হয়ত অঙ্গাঙ্গী।

বিবেক আর অন্ধ কামনা সব মানুষের মনেই আছে বৈকি, ডাঃ জেকিল আর মিঃ হাইডের গল্প তাবৎ মানুষের পক্ষেই সত্যি। একটা বিবেকবান যথার্থ মানুষ আর একটা কামনার দাস, পশু। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পশুটা প্রবল। তবু তাদের মধ্যে এই দুই সত্তা বিনুর মতো এত প্রবল নয়। তার মধ্যে কাম ও কামনা দুর্বার, অথবা সে-ই দুর্বল, সহজেই এই প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে—তেমনি আবার তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হয়, আত্মযন্ত্রণা অনুশোচনার অন্ত থাকে না। সেও ঐ পশুত্বর মতোই প্রবল। তার বুদ্ধি বিবেচনা, বিচার-বোধ কম নেই। তাদের দিকে পেছন ফিরলেই পরিতাপের শেষ থাকবে না—এ জেনেও কত সহজে দুর্বলতার কাছে হাল ছেড়ে দেয়। আবার সেই শুভবুদ্ধির জন্যেই ঐ ক্ষণিকের দুর্বলতাটুকুর মধ্যে যেটা লাভের অংশ, সামান্য সুখানুভূতি—সেটাও পায় না, কামনার খোরাক যোগায়—তবু কামনা-পরিতৃপ্তির আনন্দ ভোগ করতে পারে না। সবটা বিষাক্ত হয়ে যায়।

এই পরস্পরবিরোধী দুটি সত্তার এমন আশ্চর্য সহাবস্থানের কথা যারা জানে না—তারা ওকে পাগল বলবেই তো।

॥ ৫২ ॥

বিনু অপরকে যাই বলুক আর যতই ঠাট্টা করুক—এই পালানোর হিড়িকে তাকেও একবার বাইরে যেতে হল।

দাদা বৌদিকে আর ছেলেমেয়েদের এলাহাবাদে রেখে এসেছেন, বৌদিরই এক দিদির কাছে। শ্বশুরবাড়ির সকলে তাঁদের দেশে গেছেন—সে রীতিমতো ভীড়ের ব্যাপার। সেখানে ছেলেমেয়েদের পাঠাতে মন সরে না। মাও বারণ করলেন। এলাহাবাদে দিদিদের বড় বাড়ি, থাকার জায়গা আছে, অবস্থাও ভাল। সেখানেই সুবিধে।

এলাহাবাদ থেকে ফিরে দাদা ওঁকেই বললেন, 'মাকে তুমি কোথাও রেখে এসো। কাশী বৃন্দাবন বা হরিদ্বার যেখানে হোক। তেমন বিপদে পড়লে আমরা পায়ে হেঁটেও চলে যেতে পারব। কিন্তু মা এতই অথর্ব হয়ে পড়েছেন, গাড়ি ছাড়া একপাও যেতে পারবেন না।...আর যা করার তাড়াতাড়ি করা দরকার। অনেক ট্রেন শুনেছি ক্যানসেল করে দেবে সরকার—মিলিটারী সাপ্লাই আর আর্মি চলাচলের পথ পরিষ্কার রাখতে। এই বেলা কোথাও নিয়ে যাও। দ্যাখো, মা যেখানে যেতে চান।'

মা ছেলেদের এই বিপদে ফেলে চলে যেতে সহজে রাজী হন নি, বলেছিলেন—'তোদের যদি কিছু হয় আমার বেঁচে লাভ কি, আর বাঁচবই বা কি ক'রে? তার চেয়ে একসঙ্গেই থাকি, মরি একসঙ্গেই মরব।'

শেষপর্যন্ত দুদিন ধরে ওরা দুজন বিস্তর বক্তৃতা দেবার পর, ওরা দুজনেই প্রত্যহ চিঠি দেবে আর একটু বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই ওরাও চলে যাবে—এই

প্রতিশ্রুতি দিতে, অনেক গাঁই-গুঁই করে রাজী হলেন।

অনেক ভেবে গন্তব্য স্থানও একটা ঠিক করলেন। থাকতে গেলে বৃন্দাবনই ভাল, পাণ্ডার বাড়ি বিগ্রহ আছে, নিত্য ভোগ হয়—ভোগের প্রসাদ পেতে পারবেন। খোরাকী বলে চারটে টাকা দিলেই যথেষ্ট হবে। আর ভাড়া হিসেবে এমনি দু টাকা। এখন এই বয়সে একা কোথাও গিয়ে বাজার-হাট করে খাওয়া পোষাবে না।

বিনু অনেক বলে কয়ে ললিতকেও সঙ্গে নিল। তারও বাড়িতে লোকাভাব, বাড়ি পাহারা দেবার। তবু ইতিমধ্যে ললিতেরও বেশ একটু ভ্রমণের নেশা ধরেছে—সে দু একজনকে বিস্তর তোষামোদ ক'রে বাড়িতে থাকতে রাজী করিয়ে বিনুর সঙ্গ নিল। বোমাভীত ভদ্রলোকদের কয়েকটা বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা ক'রে দুজনেই কিছু কিছু দালালী পেয়েছিল হাতে, আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ইতিমধ্যে বিনুর একটা গল্প থেকে ফিল্ম হয়েছিল বোম্বেতে, হিন্দী ছবি—তার দরুণ কিছু টাকা পাওনা ছিল, সামান্য অবশ্য। সেটাও এই সময়ে এসে গেল। মোট পুঁজি বেশী নয়—তবে তখনও একশো টাকায় সমগ্র ভারত ভ্রমণ করা যেত।

যাওয়ার ব্যবস্থা করতে যে দু তিন দিন দেরি তার মধ্যেই একটা প্রমোদ—সফরেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। ললিতের কে এক প্রকাশকই চিঠি দিয়েছিলেন, ডিহিরির কাছে তাঁর শ্বশুরের একটা সিমেন্টের পাহাড় আছে, সেখানে সিমেন্ট তৈরীর কলও বসিয়েছেন, চমৎকার জায়গা নাকি। মালিকের নিজস্ব বাংলোও আছে, লোকজন বিছানাপত্র কিছুরই অভাব নেই, ওরা অনায়াসে দু-চার দিন থেকে আসতে পারে।

এমন সুযোগ ছাড়ার পাত্র বিনু নয়।

মাকে বৃন্দাবনে রেখে ফেরার পথে দুজনেই ডিহিরীতে নেমে পড়ল। সেখান থেকে ছোট লাইনও আছে, বাসও একখানা যায়। 'বানজারি' জায়গাটার নাম, রোহটাসগড়ের আগের স্টেশন। এ সেই রোহটাসগড়, হরিশ্চন্দ্রের ছেলে রোহিতাশ্বের নামে গড় বা দুর্গ। তিনি নাকি এখানের রাজা ছিলেন। সূর্য বংশের ছেলে কেন যে মরতে এই আদিম অরণ্যভূমে রাজত্ব করতে আসবেন অযোধ্যা ছেড়ে, তা অবশ্য কেউই বলতে পারে না।

তা হোক, ভারী সুন্দর জায়গা, পাহাড়ে জঙ্গলে নির্জনতায় অপরূপ। জনপদ হিসেবে অবশ্য খুবই নগণ্য, নিতান্তই ছোট্ট বিহারী গ্রাম একটা। বিলিতিমাটির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কিছু বাঙ্গালী ও স্থানীয় শ্রমিক, তাদের জন্যেই বিভিন্ন পাহাড়ের মালিক বা ইজারাদাররা ছোট ছোট কোয়ার্টার করে দিয়েছে, মাটি আর খাপরার ঘরই অধিকাংশ। সেই সঙ্গে কিছু নিজেদের জন্যেও ক'রে রেখেছে—বাংলোর মতো, মধ্যে মধ্যে এসে থাকেন।

বেশ আনন্দেই কাটল পাঁচটা ছটা দিন কিন্তু শেষ দিনে সেই দুর্গম পথ পার হয়ে খবর এসে পেঁছল, কলকাতায় আগের দিন রাত্রে সত্যিই বোমা পড়েছে। একাধিক স্থানে।

সঙ্গে সঙ্গেই নানা উদ্বেগ দুশ্চিন্তা, ভয়াবহ অনেক রকম ঘটনার অনুমান ও কল্পনা।

তখনই বেরিয়ে পড়ল ওরা। বিনুর বাড়িতে ওর দাদা পর্যন্ত নেই—তিনচার দিনের ছুটি নিয়ে তিনি আবারও এলাহাবাদ গেছেন। একজনের থাকার কথা দুটো দিন, সে যদি ভয় পেয়ে পালায়?

ডিহিরীতে এসে ট্রেন ধরতে হবে।

কিন্তু স্টেশনে এসে শুনল ট্রেনের কোন হিসেব নেই আর।

বসে থাকো টিকিট কেটে—যখন যে গাড়ি আসে উঠে পড়বে।

স্টেশন মাস্টার সাফ বলে দিলেন।

আসবার সময় প্রচণ্ড ভিড় পেয়েছিল, আজ নাকি আরও লোক আসছে, ট্রেনের ছাদেও বসার চেষ্টা করছে অনেকে—সেইজন্যেই ফেরার কোন ঠিকঠিকানা নেই। সব নিয়ম ব্যবস্থা নাকি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তবে হ্যাঁ, বুকিং ক্লার্ক অভয় দিলেন, গাড়ি যদি আসে আর হাওড়া পর্যন্ত যায়—মানে যেতে পারে—ভীড় পাবেন না এতটুকু, তোফা আরামে শুয়ে যাবেন।

গাড়ি অবশ্য এল সন্ধ্যার আগেই।

এটা নাকি তুফান একসপ্রেস, এই সময় এর হাওড়া পেঁছিবার কথা। এরও অনেক আগে। গাড়ি একেবারেই ফাঁকা, এত ফাঁকা যে ভয় করে। একটা বড় দরবার কামরায় (বগি জোড়া যে কামরা—তাতে লেখাই থাকত 'দরবার' আর যেগুলো মাঝারি, ছ'টা বেঞ্চিযুক্ত কামরা—তার নাম ছিল 'মজলিস') ওরা দুটি প্রাণী আর একটি পাঞ্জাবী ছোকরা। সেও ওদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাইছে, ওরা তাকে চোর বা ডাকাত ভাবছে। ফলে কারুরই ঘুম হ'ল না। নিচে দেদার—একশো দশজন বসার জায়গা পড়ে থাকতেও ওরা তিনজনেই মধ্যে যতদূর সম্ভব ব্যবধান বজায় রেখে ওপরের বাঙ্কে শুয়েছিল তবু। যেন নিচে থাকলে অপর পক্ষের আক্রমণের সুবিধা হবে বেশী।

ঘুম অবশ্য এমনিতেও হ'ত না।

কারণ ট্রেন মাঝে মাঝে অনির্দিষ্টকালের জন্যে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, লাইন জোড়া বা আগের স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম খালি নেই—সম্ভবত এই অজুহাতে। দাঁড়ালেই ভয় করে—কে কোথা দিয়ে উঠে পড়বে, বিশেষ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়ালে তো কথাই নেই।

আসানসোল আসতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা অভাবনীয় বললেও বোঝানো যায় না। এমন কখনও দেখে নি, ভাবতেও পারে নি। জনসমুদ্র বললে কবিজনোচিত উপমা হয়—কিন্তু বোঝানো যায় না কিছুই। বড় বড় মেলায় যেমন ভীড় দেখা যায়, আশু মুখুজ্জে বা দেশবন্ধুর শ্মশান-যাত্রায় যেমন ভীড় দেখেছিল—তেমনি পেষাপেষি অবস্থা। থৈ-থৈ করছে লোক? না তাতেও বোঝানো যাবে না। মালেতে মানুষে ছেলেপুলেতে জড়াজড়ি—শরৎবাবু যাকে সাড়ে বত্রিশ ভাজা বলেছেন সেই রকম—কে কার ছেলেকে নিজের মনে ক'রে টানছিল—এখন নিজের ছেলেকে খুঁজে পাচ্ছে না—এ কেউ বলছে

পারবে না। কেউ কাঁদছে সর্বস্ব ছেড়ে এসেছে অথবা স্বামী-পুত্র ছেড়ে এসেছে বলে—কেউ বা তার মধ্যেই ঝগড়া করছে। সকলের মুখেই একটা আতঙ্ক, মুখ শুকনো, বিবর্ণ। অসহায় বোধ, হতাশার চিহ্ন সব ক'জোড়া চোখেই।

যতই এগোতে থাকে ততই এই দৃশ্য বরং আরও ভয়াবহ।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে স্থানাভাব, সত্যিই বোধহয় তিল ধারণের স্থান নেই, দু'দিকের সাইডিং লাইনে ঘরকন্না পেতে অক্ষত মালপত্র নিয়ে বসে গেছে অনেক পরিবার। ফলে ট্রেন চলাচলে নিদারুণ বিঘ্ন। লাইনের পাশ দিয়ে সর্বত্রই একটা সরু পায়ে চলা পথ থাকে—সেখানেও ডেরাডাণ্ডা ফেলেছে অনেকে। বিলাপ প্রলাপ কান্না আর কলহ—সব জড়িয়ে একটা দুঃসহ কোলাহল। না, কোলাহল বললে কিছুই বোঝানো যাবে না তার—এ একটা অবর্ণনীয় শব্দ বহুদূর থেকে শোনা যাচ্ছে—যেন সুদূর অবধি আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। নিজেকে মনে মনে একটু বিচ্ছিন্ন ক'রে শুনলে কেমন একটা অজাগতিক অনুভূতি হয়—ইংরেজীতে যাকে বলে 'ঈরী সেনসেশ্যন।'

তবু এর মধ্যেই পরোপকার চেষ্টারও বিরাম নেই।

'ও মশাই, কোথায় যাচ্ছেন? কলকাতা! হায় হায়—কলকাতার চিহ্ন নেই আর, সব শেষ হয়ে গেছে।'

'যাচ্ছেন কি, ব্যাণ্ডেলের ওদিকে ট্রেন যাবে না। হাওড়া ইস্টিশানের কিছু নেই আর, সেখানে একটা বিরাট হাঁড়োল গর্ত হয়ে গেছে, গঙ্গার জল ঢুকে তাতে লেকের অবস্থা।'

অগত্যা বিনুকে বলতে হয়, 'যেতে তো হবেই। না হয় ব্যাণ্ডেলে নেমে নৈহাটি দিয়ে যাবে—'

পরোপকারী উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, 'কি দেখতে যাবেন! কলকাতার কি কিছু আছে। গেলে চিনতে পারবেন? ডালহৌসি স্কোয়ার কোথায় ছিল বুঝতে পারবেন না। হাইকোর্ট কতকগুলো ভাঙ্গা ইঁটের পাহাড় হয়ে গেছে।'

'তবু যেতে হবে।' এবার বিনু বিরক্ত হয়ে ওঠে 'আপনার লোক, আত্মীয় সকলে ওখানে। যদি না-ই থাকেন সে সব দেহের সৎকার শ্রাদ্ধ-শান্তি তো করতে হবে।'

'যান। ভূত চেপেছে যখন মাথায়। কিন্তু আপনি একা কি করবেন? লোক পাবেন? কেউ তো আর নেই। কলকাতা বলতে তো শ্মশান একটা। হাতীবাগান থেকে শ্যামবাজার মাঠ হয়ে গেছে। এখনও ধোঁয়াচ্ছে দেখবেন।'

শুনতে শুনতে ললিতের মুখ শুকিয়ে ওঠে।

'কি করবে হে? ফিরবে নাকি?'

'তুমি কি পাগল। আমার দাদা রয়েছেন, তোমার বাবা, দাদা—তাদের খোঁজ নিতে হবে না! আর ফিরেই বা কোথায় যাবে? কত টাকা নিয়ে বেরিয়েছ যে কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে খাবে?'

তারপর আশ্বাস দিয়ে বলে, 'কলকাতায় কেউ নেই, এখনও ধোঁয়াচ্ছে—এরা দেখল কি ক'রে? এরা তো তার আগেই পালিয়েছে। না হলে রাণীগঞ্জ আসানসোল পৌঁছল কি করে? কালকের বোমার কথা শুনেই এইসব

গাঁজাখুরী খবর তৈরী করছে। ওদের পালানোটা যে অযৌক্তিক নয়, এই আতঙ্কটা যে জাস্টিফায়েড—শুধু গুজবে ভয় পেয়ে পালাচ্ছে না, কাপুরুষের মতো—এটা প্রমাণ করতে হবে তো।'

বর্ধমানে আরও বিশৃঙ্খল অবস্থা।

স্টেশনের কর্তৃপক্ষ একেবারেই হাল ছেড়ে দিয়েছেন। চায়ের স্টল বন্ধ করতে হয়েছে, খাবারওয়ালারা কেউ হাঁকছে না—কারণ বিক্রী করার মতো কোন খাদ্যবস্তু আর নেই তার কাছে।

জল জল করে চেঁচাচ্ছে সবাই। এত জল কোথায়? মারোয়াড়িদের এক প্রতিষ্ঠান আর সাধুদের দুটি মিশন সে দায়িত্ব যতটা পারছেন বহন করছেন। তার মধ্যেই—ট্রেন থেকে যা দেখা গেল—ছোটরা প্রাকৃতিক কাজ সারছে, সেগুলো পরিষ্কার হবে কি ক'রে, ফেলবে কোথায় তা কেউ জানে না। ট্রেন থেকে নেমে প্লাটফর্মে পা দেবে এমন এক স্কোয়ার-ফুট স্থানও খালি নেই।

এর মধ্যে একজন পূর্ববঙ্গীয় ভদ্রলোক সবাইকে ঠেলে মাড়িয়ে পরোপকারে এগিয়ে এলেন।

'আরে আপনেরা চললেন কই, ও মশয়? আপনেরা কি পাগল। কইলকাতা আর আছে নি ভাবেন? নামেন নামেন, নাইমা পড়েন। কইলকাতা অবধি তো যাইতেই পারবেন না। মাঝের খে একারে জলে যাইয়া পড়বেন। যেমন কইরা অউক এহানেই নামেন।'

ওধারের এক বৃদ্ধ বিনুর মুখের দিকে চেয়ে কেঁদেই ফেললেন, 'ঠিক তোমার মতো আমার ছোট ছেলেটা বাবা। ছিল আমাদের সঙ্গেই, কোথায় যে ছিটকে হারিয়ে গেল! ওর গর্ভধারিণী পাগলের মতো মাথা কুটছেন। আর কি দেখা পাবো!' তারপর তিনিও কপালে চাপড় দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'ওরে বাবারে দুলু আমার রে—এই বিপদে কোথায় চলে গেলি রে!'…

ট্রেন বর্ধমানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। শোনা গেল রেলওয়ের সমস্ত বিভাগেই নাকি লোকাভাব, সবাই পালিয়েছে বিভিন্ন ছুতোয় ছুটির দরখাস্ত দিয়ে। যাঁরা আছেন স্টেশন স্টাফ—তাঁদের অনেককেই চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি দিতে হচ্ছে, ফলে তাঁদের মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে, তাঁদের কাছে কোন খবর চাইতে গেলে অপমানিত হবার সম্ভাবনা।

এদিকে মিলিটারী ট্রেনের ভীড়, তাদের মধ্যেও ব্যস্ততা বেড়ে গেছে—এগোবারও, পিছু হটবারও। আসানসোল থেকে রাঁচি পর্যন্ত নাকি এক রিট্রীট রোড তৈরী হচ্ছে, তার মালমশলাবাহী মালগাড়ী আর লরীর অগ্রাধিকার।… কেন লাইন ক্লীয়ার পাচ্ছে না তাও কেউ বলতে পারছে না, যে যার মনের মতো কারণ বানিয়ে বানিয়ে বলছে। প্ল্যাটফর্মে এমন একটু স্থান নেই যে কেউ নেমে কি এগিয়ে গিয়ে খবর নেবে একটু। যেতে গেলে মানুষ মাড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বিনু বহুক্ষণ থেকে একটি মহিলাকে লক্ষ্য করছিল।

বয়স হয়েছে মহিলার, দু-এক গাছা চুলে পাকও ধরেছে—তবু এখনও যেন প্রৌঢ়ত্বে পা দেন নি। সাধারণ বেশ, কালাপাড় সাদা শাড়ি পরণে, হাতে একগাছি ক'রে বালা—তবু তাতেই অনেক মেয়েছেলের মধ্যে তাঁর দিকেই আগে চোখ পড়ে।

মহিলাটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেমন অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন। মধ্যে মধ্যে হেঁট হয়ে কার সঙ্গে দু-একটা কথাও বলে নিচ্ছিলেন তারই মধ্যে। যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন তাঁকেও দেখল বিনু, ঘাড়টা একটু তুলে। রোগা চেহারার একটি পুরুষ, হয়ত এককালে দেখতে ভালই ছিলেন, কিন্তু এখন—সম্ভবত অসুখে ভুগেই—প্রায় বুষ-কাঠের অবস্থা হয়ে গেছে। রোগা, কোটরগত চোখ, চুল প্রায় সব শেষ হতে বসেছে, এমনি ছাড়া ছাড়া দু-চার গাছা বাকী আছে—একটা অত্যন্ত নগণ্য বিছানার ওপর পড়ে আছেন। ভাবে-ভঙ্গীতে মনে হয় দু' দিকের পা-ই পড়ে গেছে, উঠতে পারেন না।

এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎই মহিলার চোখ পড়ে গেল বিনুর দিকে।

আর সে চোখ আটকেও গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

প্রথম এমনি, তারপর ভুরু কুঁচকে কপালের ওপর হাত আড়াল ক'রে—যেন আলো আটকাবার জন্যে—যদিও প্রভাতী আলো তাঁর চোখে এসে পড়ার কথা নয়, অথচ বিজলী বাতির জোর তার জন্যেই ঝাপ্সা হয়ে এসেছে—অনেকক্ষণ ধরে দেখে বলে উঠলেন, 'কে আমাদের ছোট খোকা না? বিনু তো? দূর ছাই, চোখটাও গেছে, কাকে দেখতে কাকে দেখছি বুঝি—'

বলতে বলতে অপরের মোট-ঘাট, মানুষ, ডিঙ্গিয়ে-মাড়িয়ে এগিয়ে এলেন ভদ্রমহিলা। জানলার সামনে এসে আর একটু ভাল ক'রে দেখে বললেন, 'হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। তুমি তো বিনু আমাদের? চেহারা তোমার কিছু বদলায় নি, একটু বড় হয়েছ এই যা। আমাকে চিনতে পারছ না? অবিশ্যি চিনবেই বা কি ক'রে, যা হাল হয়েছে চেহারার।'

'সরস্বতী দিদি!' এবার আর চিনতে অসুবিধে হয় না, 'তুমি এখানে? এভাবে?'

'আর বলিস নি ভাই।' সরস্বতী এবার কেঁদে ফেলল, 'সবাই বলে পালাও, পালাও, একজনও টিকবে না, বাড়ি-ঘর কিছু থাকবে না। আমি ঐ ঘাটের মড়া বলতে গেলে—ঐ তো সেই জীবনবাবু আমাদের, ঐ যে পড়ে আছে—ওকে নে কোথায় যাই, কেমন ক'রে যাই!...যথাসব্বস্ব তো গেছে ওর ঐ রোগের পেছনে। পক্ষঘাত হল যে। যা হয় একটু কাজ-কারবার করছেল, টুকটাক সংসারটাও চালাচ্ছেল, হঠাৎ মাথার যন্তন্না। মাথা গেল মাথা গেল করতে করতে পড়ে গেল—অজ্ঞান হয়ে—তারপর বাঁ দিকটাই পড়ে গেল একেবারে।'

এই বলে ছলছল চোখে একবার জীবনবাবুর দিকে চেয়ে নিয়ে বলল, 'দাঁড়া বাপু একটু দম নিই। আজকাল বেশী কথাও বলতে পারি না, যেন বুক চেপে আসে—তা যা বলছিলুম, করাই নি হেন চিকিচ্ছে নেই। ডাক্তারী, হুমোপাথী, কবিরাজী, হেকিমী—কিছু বাদ দিই নি, যে যা বলেছে করিয়েছি। এস্তক জলপড়া, তেল পড়া, ঝাড়ফুঁক টোটকা-টুটকি—সব করিচি। শেষে

ঝামাপুকুর রাজবাড়িতে যে কবরেজরা আছে—মিনি পয়সায় দেখে, দাতব্য ওষুধ দেয়—তাদের কাছে গে এইটুকু উগগার হয়েছে, কথাটা একেবারে জড়িয়ে গেছল, এখন অনেকটা পোস্কার হয়েছে, কথা বোঝা যায়। ডান হাতে-পায়ে ভর দিয়ে নিজে নিজে পাশও ফিরতে পারে, কুনুইয়ে ভর দিয়ে সিদিকে একটু উঠতেও পারে।'

'তা এখানে এমনভাবে এই রুগী নিয়ে?'

বিনু আসল কথার খেই ধরার চেষ্টা করে।

'আর বলিস নি। কপালের ফের, গেরো। গেছে তো যথাসব্বস্ব, গয়না-গাঁটি যা ছেল। নগদ টাকা আমার ওর—সব তো কারবারে ঢেলেছে, সে কারবার বেচে দিতে হ'ল। জলের দরে কিনে নিলে একজন। কেবল থাকার মধ্যে আছে ঐ শ্যামবাজারের বাড়িটুকু—তা সে বাড়ির তো এই এত বছরেও ভাড়া খাট থেকে বেড়ে সত্তর হল না। তাই চোদ্দ মাস ভাড়া বাকী। মাঝখান থেকে—নিজেরই বাড়ি পড়ে যায় দেখে—পেরায় পৌণে দু' হাজার টাকা খরচ করে মেরামত করিয়েছি। এক, নিচে একটা দোকান ঘর ছেল, সে বেটা খোট্টা ভাড়াটা দেয় ঠিক মতো, তিরিশ টাকা ভাড়া—তাতেই এক জায়গায় একখানা ঘর ভাড়া ক'রে থাকতুম। ঐ মেরামতের সময়, একটু মিছে কথা বলেই ধরো—ঐ যে বলে না নিজের বাড়িতে নিজে চোর—একখানা একতলার ঘর দখল ক'রে নেছলুম, তাই ভাড়াটা বেঁচেছে। তা আবার কি, ভাড়াটে আমার—ভাত দেবার ভাতার নয়, নাক কাটবার গোঁসাই—বলে নালিশ দেবে। আমি বলি, দে না, তোর কত হিম্মৎ দেখি, আর জোর করতে আসিস তো এই আঁশ বটি আছে আমার, শান দেওয়া—'

'তা এখানে কেন সেটাই তো বললেন না—।'

'বলছি। সেই বিত্তান্তই বলছি। হঠাৎ এই বোমা পড়বে বোমা পড়বে হিড়িক এল, পেসান—পেসন্ন বুঝি নাম—আমার ভাড়াটে—বলে, মাসিমা দেখছ কি পালাও। আমি বলি, হ্যাঁ আমি পালাই আর এ ঘরটাও তোমরা দখল করো। তা দাঁত বার ক'রে হাসে, আমি ভাবি ইয়ার্কি করছে। ওমা, তার ভেতর একদিন দেখি—যেদিন হাতীবাগান বাজারে বোমা পড়ল আর নাকি খিদিরপুর না মেটেবুরুজ কোথায়—পরের দিনই সকালে দেখি মোটঘাট নিয়ে—ডেয়োঢাকনা সব পড়ে রইল, বাসন-কোসন জামা-কাপড় আর গয়নাগাঁটি নিয়ে এক স্ক্যাবেঞ্জারের গাড়োয়ানকে পঞ্চাশ টাকা কবুল করে ওতরপাড়া যাচ্ছে। সেখেন থেকে রেলে ক'রে বর্ধমান, বর্ধমান থেকে দামোদর পেরিয়ে কোথায় ওদের দেশ—সেখেনে যাবে।

'যাবার সময় আত্তিশো দেখিয়ে বলে গেল, "এই ঠিকানা দে যাচ্ছি, যদি পালাবার মন হয় আমাদের কাছেই যাবেন। আপনি শত্তুরতা করেছেন তাই বলে আমরা তো করতে পারিনে, আমরা যত্ন করেই রাখব।" তার পরতো এই কাণ্ড। সবাই পালাচ্ছে, পাড়া খালি—তার ওপর পরশু বোমা পড়ল চারদিকে। আমাদের জীবনবাবু বলে কি, "তুমি আর এই মড়া আগলে মরবে কেন, একটা রেস্কা ক'রে নিয়ে গে হাসপাতালের সামনে চুপচুপু রেখে, নিজে কোথাও পথ

দ্যাখো"। তাই কখনও হয়? তুই বল। সেই কাশী থেকে, মনে আছে তো তোর—বলতে গেলে পথে বসলুম হঠাৎ—তখন থেকে আগলে নিয়ে রয়েছে, বয়ে বেড়াচ্ছে। বে করলে না, থা করলে না, দেশে ফিরে গেল না—কী বয়েস ওর তখন, আমার চেয়ে ছোটই হবে এক আধ বছরের—কি এক-বয়িসী বড় জোর—কখনও একটা কানাকড়ি মারে নি, তঞ্চকতা করে নি, ভালবাসে বলেই পড়ে ছেল, তাকে যদি এই অবস্থায় ফেলে পালাই, ধম্মে সইবে? মাথায় বজরাঘাত হবে না? আর একা যাবই বা কোথায়। কার পাল্লায় পড়ব, কোথায় দাঁড়াব। শেষমেষ হাতের দুগাছা চুড়ি এক ব্যাটা ট্যাসুকিওলাকে ধরে দে ব্যাণ্ডেল পজ্জন্ত এসে তো গাড়ি ধরলুম, ভেবেছিলুম পশ্চিমপানে কোনদিকে যাবো, না হয় ভিক্ষে ক'রে কি ঝি গিরি ক'রে খাওয়াবো জীবন-বাবুকে—তা এখেনে এসে পেঁছুতেই ধড়াধড় নামিয়ে দিলে—বলে সে গাড়িতে মিলিটারি উঠবে। তারপর এই যা দেখছিস, বল মা তারা দাঁড়াই কোথায়। পেসানরা বলেছিল বটে, ডোবার অবস্থা হলে লোকে খড়কুটোও ধরে—কিন্তু কোথায় তাদের বাসা, কি ক'রেই বা যাবো—আভার ভাবছি, আর উঁকি মেরে মেরে দেখছি কোন চেনা লোককে দেখা যায় কিনা—হঠাৎ তোর দিকে চোখ পড়ল।'

'আপনিও যেমন। কলকাতায় বোমা পড়ল অমনি সব লোক ম'ল, সব বাড়ি ভেঙ্গে পড়ল। এমনভাবে পথের কুকুর বেড়ালের মতো বেঁচে থাকার চাইতে বোমায় মরা ঢের ভাল। লনডন শহরে রোজ রাতে ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন এসে বড় বড় বোমা ফেলছে—তবু সেখানে লোক বাস করছে, দোকানপাটও খুলছে। নিন, চলুন, এই গাড়িতে এসে উঠুন, কলকাতায় নিজের বাড়িতে গিয়ে থাকুন, কিছু হবে না। শ্যামবাজারের ঐ গলির মধ্যে এসে জাপানীরা বোমা ফেলবে না। এক যদি দৈবাৎ কিছু হয়—তা সে দৈবাৎ তো এই স্টেশনেও ফেলতে পারে।'

'তাই চ ভাই। ঝকমারি হয়েছেল সে বাড়ি থেকে বেরোনোই। কিন্তু আমাদের জীবনবাবুকে যে ওঠাতে হবে, ও তো উঠতে পারবে না। আমারও আর সে সাধ্যি নেই যে কোলে ক'রে এনে এতটা পথ ওঠাবো—'

'চলুন, আমরা যাচ্ছি। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, এবার হয়ত গাড়ি ছাড়বে। আর দেরি করা ঠিক না।'

বিনু আর ললিত নেমে এল। সেই পাঞ্জাবী ছোকরাটি ওপর থেকে সব শুনছিল, সে এবার—এরা চোর ডাকাত নয় জেনে—নেমে এল। বললেন, 'চলেন হামি ভি যাই, হামি একাই উঠাতে পারব।'

সে ছেলেটি সত্যিই পাঁজাকোলা ক'রে তুলে আনল জীবনবাবুকে। বিনু আর ললিত ওদের ট্রাঙ্ক (সরস্বতীর ভাষায় প্যাঁটরা—'প্রায় আমাদের সব্বস্ব'।) দুটো পুঁটুলি, বাসনের ছালা, একটা বাঁধা আর জীবনবাবুর খোলা বিছানা—কোনমতে জড়িয়ে নিয়ে গাড়িতে তুলল। ভীড় কমছে দেখে আশপাশের লোকও সানন্দে সহযোগিতা করলেন কেউ কেউ, নইলে ওঠা মুশকিল হত। একটি ছেলে এসে জীবনবাবুর বিছানাটা তাড়াতাড়ি পেতে দিয়ে গেল।

জীবনবাবু অবশ্য তখনও ক্ষীণকণ্ঠে বলছেন, 'কেন আর আমাকে এমনভাবে টানছ। মড়া বয়ে বেড়ানো মিছিমিছি। আমি বরং এখানেই পড়ে থাকি, যাদের গরজ মুখে জল দেবে, মলে মুদ্দফরাস ডাকবে।'

অনাবশ্যক বোধেই সরস্বতী এ কথায় জবাব দিল না। বোধ হয় এ আলোচনা অনেকবার হয়ে গেছে, আর নতুন ক'রে কিছু বলার নেই।

সে টানাটানি ক'রে পোঁটলাপুঁটলিগুলো গুছিয়ে রেখে একটা খালি বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে বসে শুধু 'বাপ' বলে একটা শব্দ ক'রে কতকটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ওরা যখন গাড়িতে উঠে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে, এবার বোধহয় ছাড়বেও, গার্ড সাহেব ইঞ্জিনের দিক থেকে নিজের গাড়ির দিকে যাচ্ছেন এতক্ষণ পরে—হঠাৎ সরস্বতী চেঁচিয়ে উঠল, 'ওমা, তা তো হল—সে ছুঁড়িটা কোথা? এই মরেছে। অনভ্যেসের ফোঁটা কপালে চড়চড় করে। সেটার কথা তো মনে নেই। অ বাবা ছোট খোকা, দ্যাখ না রে, দ্যাখ একটু—হেই বাবা, বেশ ঢ্যাঙ্গাপানা মেয়েটা, উজ্জ্বল রঙ, দেখতে মন্দ না—কী জ্বালা যে হল ওকে নিয়ে—'

'সে আবার কে দিদি?' বিনু অবাক হয়ে বলে।

কিন্তু উত্তর দেবে কে? সরস্বতী ততক্ষণে নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে। আগের মতোই সবাইকে ঠেলে মাড়িয়ে গুঁতিয়ে খানিকটা মাঝামাঝি জায়গায় পেঁছে, 'মায়া অ মায়া—কোথায় গেলি লো। কী আপদ হল বল দিকি পরের দায় নিয়ে। এ আমি কি বিপদে পড়লুম গা। সোমত্ত মেয়ে, কে কোথায় ভুলিয়ে নে যাবে। যত উড়ো আপদ কি আমার ঘাড়েই এসে পড়ে। অ মায়া, মায়ালতা।'

চিঁচিঁ ক'রে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন জীবনবাবু।

মায়ালতা ওঁদের ভাড়াটের ভাগ্নী, ভবানীপুরে এক জাঠতুতো দাদার কাছে থাকত। ওদের দেশ উত্তরবঙ্গের দিকে কোথায়—রঙ্গপুর না কুচবিহার—সেখানে পড়াশুনোর অসুবিধে, তাতেই এই ব্যবস্থা। আই. এসসি পড়ছে। এইটে সেকেণ্ড ইয়ার, এইবার এগজামিন দেবে। ম্যাট্রিক পাস ক'রে মোটে এই দেড় বছর হল এসেছে এখানে। বেশী বয়সেই পাস করেছে। এখন বয়েস উনিশ-কুড়ির কম না, তবু পাড়াগাঁ থেকে এসেছে তো, কলকাতায় এই নতুন একেবারে। যে দাদার কাছে থাকত, তিনি সরকারী কাজ করতেন, যুদ্ধের দৌলতে হঠাৎ বড় একটা প্রমোশন পেয়ে পাটনায় না কোথায় চলে গেছেন; বৌদি আর ছেলেমেয়েরা ছিল এখানে, ভাড়াটেরা চলে যাবার পর পরশু সন্ধ্যেবেলাই সে বৌদির ভাই ওকে এ বাড়ির দোরগোড়ায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে, মামারা আছেন কিনা সে খবর নেওয়ারও অবসর হয় নি। সে তার বোন-ভাগ্না-ভাগ্নীদের নিয়ে যাচ্ছে—নবদ্বীপে বাড়ি ভাড়া করেছে সেখানে। মায়ার দাদা সবে নতুন জায়গায় গেছেন, কোয়ার্টার পান নি এখনও, তা ছাড়া চিঠিপত্রও ঠিকমতো পেঁছচ্ছে না। ওরা নবদ্বীপ পেঁছে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে—তবে পরোক্ষে বলতে গেলে—এই একটা প্রায়-অনাত্মীয় সোমত্ত মেয়ের ভার তারা নিতে রাজী নয়।

এ অবস্থায় তাঁরা কোথায় মেয়েটাকে ফেলে আসেন? দেশেই বা পাঠান কার সঙ্গে, কী ভরসায়। অগত্যা সঙ্গে আনতে হয়েছে।

কিন্তু মেয়েটা যেন কেমন এক রকম। হয়ত এই দুর্ব্যবহারেই এমনি হয়ে গেছে। কেমন যেন চুপচাপ, একদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে কি বসে থাকে—খাওয়া-দাওয়ার কথা যেন মনেই পড়ে না, খেতে বললে নানান ওজর পাড়ে। সরস্বতী সঙ্গে যা হোক রুগীর মতো একটু একটু মিছরি, চিনি, সন্দেশ—এসব এনেছে, তাও সাধ্যসাধনা ক'রে খাওয়াতে হচ্ছে, সেও নামমাত্র। একটু জলও খেতে চায় না মুখপোড়া মেয়ে।…এই অনিশ্চিত আতান্তর অবস্থায়—নিরাশ্রয়—কোথায় যাবে, কোথায় কার কাছে দাঁড়াবে—সেসব যেন কোন চিন্তাই নেই। নির্বিকার, উদাসীন।

এর মধ্যেই সরস্বতীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'ঐ যে, মূর্তিমান।…দেখেছ একবার। সেই এক-ঠেঙ্গো মুলুকের ওধারে যেয়ে হাঁ ক'রে একদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুখপোড়া মেয়ে।…এ কী বিপদে পড়লুম গা, পরের দায়িত্ব নিয়ে। শত্তুর। কুক্ষণে ভাড়া দিয়েছিলুম বাড়ি—সেই থেকে শত্তুরতা করছে। যদি বা নিজেরা গেল—এই এক বাঁশ দে গেল। অ বিনু, দ্যাখনা বাবা। চারদিকে যা চিচ্‌কার—আমার গলা কি আর ওর কাছ পজ্জন্ত পেঁছিবে!'

ততক্ষণে ওরাও মেয়েটাকে দেখেছে।

বছর আঠারো-উনিশের একটি দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে। সুন্দরী বললে বাড়িয়ে বলা হয়—তবে বেশ সুশ্রী। উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ, চোখেমুখে বুদ্ধির দীপ্তি—সব জড়িয়ে দেখতে ভালই লাগে। ওদিকে এই বিপদের মধ্যেও দুটি পরিবারে তুলকালাম ঝগড়া বাধিয়েছে। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন দৃষ্টি মেলে সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিনু ওঠার আগেই ললিত এক লাফে প্লাটফর্মে নেমে পড়ল। সে একহারা চেহারার হালকা মানুষ, তার পক্ষে যাওয়া অনেক সহজ। তাছাড়া তরুণী-ত্রাণে তার চিরদিনই বিপুল উৎসাহ। রাখাল বলে, 'একটা ছবি এসেছিল একবার, আমাদের পাড়ার এক সিনেমায়—দেখিনি অবিশ্যি—ইংরিজি ছবি দেখেই বা কি বুঝব—তবে নামটা লাগদার বলেই মনে আছে—এ ড্যামসেল ইন ডিস্‌ট্রেস্‌। শুনেছি খুব হাসির বই। তা আমাদের ললিতবাবু সর্বদাই পথেঘাটে ঐ জিনিস খুঁজে বেড়ায়—বিপন্না নারী। বুক দিয়েও উদ্ধার ক'রে যদি একটা রোম্যান্স করা যায়।'

ললিত কোনমতে, প্রায় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে—সেই সময় একটা লোক উনুনে বসানো, পেতলের কলসী ক'রে চা বিক্রী করতে আসায়, খানিকটা সুবিধে হয়ে গেল—কাছে গিয়ে মেয়েটিকে ডাকল, 'শুনছেন, মানে শুনছ—ঐ যে উনি ডাকছেন। ঐ মাসিমা। এই ট্রেনে কলকাতাতেই ফিরবেন। মালপত্র সব উঠে গেছে—গাড়ি ছাড়বার আর দেরি নেই, শিগগির চলে এসো—'

ঘাড় ঘুরিয়ে সরস্বতীকে দেখল মায়া। সে দুহাত নেড়ে ডাকছে আর গাড়িটা দেখাচ্ছে। সত্যিই আর দেরি নেই—গার্ড সাহেব সবুজ নিশেন নিয়ে তাঁর গাড়ির কাছে পেঁছে গেছেন।

তবু সে বেশ যেন নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত ভাবেই বলল, 'আবার কলকাতা ফিরে যাবে? কেন? তাহলে এত কাণ্ড ক'রে আসারই বা দরকার কি ছিল।'

'সেটা পরে আলোচনা করো। এখন উঠে পড় গে। এসো এসো—আর মোটে সময় নেই' ললিত তাড়া লাগাল, 'ওঁদের সঙ্গে এসেছ, ওঁদের সঙ্গেই থাকতে হবে। এখানে থাকা সম্ভব নয় বলেই ওঁরা ফিরছেন। এভাবে আসাটাই অন্যায় হয়েছে। কেউ চেনা নেই, থাকার জায়গা ঠিক নেই—এভাবে কি আসতে আছে! এসো এসো, চলে এসো—'

এবার মেয়েটি নড়ল। কিন্তু খুব ধীরে। কেমন একটা স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থা ওর। খুব আঘাত পেলে যেমন অবস্থা হয় মানুষের। কিছুতেই কোন আস্থা আর ভরসা নেই—সেই ভাব ওর সমস্ত আচরণে।

অথচ তখন আর দেরি করা সম্ভব নয়। ঘণ্টা পড়ে গেছে, গার্ড ফ্ল্যাগ দেখাচ্ছেন। বিনু লাফিয়ে পড়ে সরস্বতীকে কতকটা জোর ক'রেই গাড়িতে তুলে দিয়েছে। ললিতও আর ইতস্তত করল না, মেয়েটার হাত ধরে প্রায় টেনেই নিয়ে এল। ছুটেই আসতে হল—ডিঙিয়ে মাড়িয়ে। পিছনে, চারিদিকে গালাগালি ও কটূক্তির ঝড় উঠল আবারও—'ভদ্রতা' 'আক্কেল' 'আজকালকার ছেলেদের অসভ্যতা' ইত্যাদি শব্দ ঢিলের মতো ওদের ওপর বর্ষিত হতে লাগল—তবে তখন আর তাতে কান দিতে গেলে চলে না।

তাতেই ওরা যখন কামরার কাছে এসে পেঁছিল তখন গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। কোন মতে মেয়েটাকে ঠেলে গাড়িতে তুলে দিয়ে ললিত চলন্ত গাড়িতেই উঠে পড়ল।

অসময়ের ট্রেন বলে—থামবার কথা না থাকলেও স্টেশনে স্টেশনে থামছে। আর প্রতি স্টেশনেই স্বেচ্ছাবৃত হিতাকাঙ্ক্ষীরা এসে এমন পাগলামি না করার জন্যে উপদেশ দিচ্ছেন, অনুরোধ মিনতি জানাচ্ছেন।

'যাবেন না, যাবেন না। নেমে পড়ুন। কোথায় যাচ্ছেন? হাওড়া ইস্টিশনের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। গিয়ে আতান্তরে পড়বেন। মিলিটারিতে ঘিরে রেখেছে, কোথাও যেতে দেবে না।'

ব্যাণ্ডেলেও একজন এসে বললেন, 'সব গাড়ি কোন্নগর রিষড়েয় থামিয়ে দিচ্ছে। তার চেয়ে এখানেই নেমে পড়ুন। কাছেই হুগলি। হেঁটে চলে যেতে পারবেন।...যাবেন না। মেয়েছেলে নিয়ে মহাবিপদে পড়বেন—'

বিনু হেসে বললে, 'যদি কোন্নগর পর্যন্তও যায় সে তো ভাল। ওখান থেকে হেঁটেও যাওয়া যাবে। এখানে কোথায় নামব বলুন।'

হাওড়া স্টেশনে পেঁছে অবশ্য তেমন বিপদের কিছুই দেখা গেল না। বোমা পড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ারও কোন চিহ্ন না। হাওড়া স্টেশন পুকুরে পরিণত হয়েছে শুনেছিল, সে জায়গায় একটা ছোট গর্তও চোখে পড়ল না।

ভীড় খুব, কিন্তু স্টেশনে সে আসবার, শহরে যাওয়ার কেউ নেই। কুলীরা হাতে মাথা কাটছে, এক একটা মোট দশ টাকা পনের টাকা নিচ্ছে। এদের দেখে তারা যেন একটু অবাকই হয়ে গেল। বিনুদের সঙ্গে যা মাল ছিল তা ওরা

নিজেরাই নিল, কিন্তু সরস্বতীর সঙ্গে জিনিস অনেক, ট্রাঙ্ক, থলে, বিছানা। তার ওপর জীবনবাবু। কুলিরা প্রথমেই চেয়ে বসল পঁচিশ টাকা। চেয়ার আনতে হলে আরও কুড়ি। সরস্বতী বাকবিতণ্ডার মধ্যে গেল না। একেবারেই হাত জোড় করল।

'কেন বাবা, হামলোক তো পালাতা নেহি হ্যায়, হামলোক তো মরবার জন্যেই কলকাতা আতা হ্যায়। হামারা ওপর কেঁও জুলুম করতা হ্যায় বাবা লোক। য়্যয়সা করো গে তো হামলোক হিঁয়াই বসে থাকেগা। দেখতা হ্যায় এ আদমীটা কিত্‌না জখমী হ্যায়—থোড়া দয়া নেহি আতা হ্যায়?'

বক্তৃতায় কিছু কাজ হল। শেষ পর্যন্ত মাল দশ টাকা আর জীবনবাবু দশ টাকা মোট কুড়িতে রফা হল। ঐ ভিড়ে চেয়ার আনা সম্ভব নয়, একটি জোয়ান কুলি সোজাসুজি পিঠে ক'রে নিয়ে গেল।

ট্যাকসীও পাওয়া গেল খুব সহজে। বাঙালী কি বিহারীর ট্যাকসী নেই। সর্দারজীদের আছে, তাদের খালিই ফিরতে হচ্ছে শহরে, আসবার সময় অবশ্য আট গুণ দশ গুণ কামিয়েছে—কিন্তু ফেরার সময়ও যদি কিছু জোটে—মন্দ কি? এক বৃদ্ধ সর্দারজী ফুরণ ক'রে নিলেন, এদের শ্যামবাজার নামিয়ে বিনুদের বাড়ি পেঁ৾ছে দেবেন—মাত্র কুড়ি টাকা। এ দুঃসময়ে এটা এমন কিছু বেশী নয়।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত আরও কিছু বেশীই দিতে হল।

তার কারণ, শ্যামবাজারে পেঁ৾ছে দেখা গেল, বাড়ির চাবি কেউ ভাঙ্গে নি বটে, তবে যাবার সময় সে চাবি যাঁদের কাছে রেখে যাওয়া হয়েছিল তাঁরাও তার পরেই কোথায় চলে গেছেন—অনেক খোঁজাখুঁজি করে এক বৃদ্ধ ফিরিওলার কাছ থেকে তা উদ্ধার ক'রে দিতে হল।

সে বুড়ো বলল, 'আমায় বাঁচালে মা। কথা দিয়ে ফেলে এস্তক পস্‌তাচ্ছি। ও বাড়ির চাবিও এই সঙ্গে দিয়ে দিলুম—যা করবার করো। আমার ছেলে গোবরডাঙ্গায় এক দোকানে কাজ করে; আমি সেখানেই চললুম। হাঁটা পথে যাবো, না হয় চা'রদিন লাগবে।'

তা ছাড়াও কারণ ছিল। বাড়ি ছাড়ার সময় আবার যে এত শিগগির ফিরতে হবে তা কেউ ভাবে নি। বাড়িঘর ওলটপালট হয়ে আছে। ঘরে কিছুই নেই রান্না-খাওয়ার মতো। পাড়ার দুটো বড় দোকানই বন্ধ—এই গাড়ি নিয়ে গিয়ে টালার মোড় থেকে তখনকার খাওয়ার মতো কিছু কিনে দিতে হল। ফলে প্রায় তিন কোয়ার্টার দেরি হয়ে গেল। তার গুণগার দিতে হল সর্দারজীকে আরও দু'টি টাকা।

সরস্বতী অবশ্য আসবার সময় কুড়িটা টাকা দিতে এসেছিল, বিনু নেয় নি।

কাশীর সেই দুটো দিনের ঘটনা আজও ভোলে নি সে।

॥ ৫২ ॥

এর পর পাঁচ-ছটা দিন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কাটবে, সেটা স্বাভাবিক।

দু'তিন দিন ধরে শুধুই একতরফা জনস্রোত, শিয়ালদা আর হাওড়ার দিকে। শিয়ালদা-মুখী জনপ্রবাহ অত বোঝা যায় না, শুধু স্টেশনে মাল আর মানুষের ভিড় দেখে কিছুটা অনুমান করা যায়। হাওড়ার দিকেরটাই চোখে পড়ে বেশী।

বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও উড়িষ্যার অধিবাসীদের সকলেরই হাওড়া ভরসা, সেই সঙ্গে অনেক বাঙালীরও। দুই পেভমেণ্ট ও রাস্তা জুড়ে শুধু লোক আর লোক।. মাথায় কাঁকালে মাল, তার মধ্যেই কেউ কেউ কুকুর বেড়াল এমন কি ছাগলও নিয়ে যাচ্ছে। বস্তায় বাসন—স্যুটকেসে ট্রাঙ্কে পুঁটুলিতে কাপড় জামা। হিন্দুস্তানী গোয়ালারা গরুবাছুর নিয়ে যাচ্ছে, এরা হাঁটাপথে যাবে গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড ধরে। কলকাতার সান্নিধ্য পেরোলে এইসব গোরুর অনেক দাম পাবে এই আশা ওদের। এখানে এখন বিনাপয়সায় দিলেও কেউ নেবে না।

পথে গাড়ি ঘোড়া বিরল হয়ে এসেছে, বাস ট্রামের অবস্থাও তথৈবচ।

সেদিন আসার সময় শিখ ট্যাকসিওয়ালা ডালহাউসী স্কোয়ারের অবস্থা দেখিয়ে এনেছিল—শুধু ঐটুকুই যা চোখে পড়েছে বোমা পড়ার চিহ্ন। মেটেবুরুজের দিকে কোথায় পড়েছে—আর কিছু ভাড়া পেলে সে জায়গাও দেখিয়ে আনতে পারে সে—এমন ভরসাও দিয়েছিল—কিন্তু বিনু অত ঔৎসুক্য বা উৎসাহ বোধ করে নি। তাছাড়া টাকাকড়ির খরচ সম্বন্ধেও একটু সংযত হওয়া দরকার—প্রয়োজনহীন কৌতূহল মেটাতে আর আট দশ টাকা খরচ করতে সাহসও হয় নি।

এমনিও কোথাও যাওয়াআসা করা হয়ে ওঠে নি। যানবাহনের সমস্যাই বেশী। ওরা যেদিন আসে সেদিন তো সারা দিনরাত হ্যারিসন রোডে ট্রামবাস চালানো যায় নি। প্রধানত ভিড়ের জন্যেই—তাছাড়া কর্মীরা বেশির ভাগ অনুপস্থিত, পলাতক! অত ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালানোও সম্ভব নয়। অন্য পথেও যা চলছে তাও সংখ্যায় অত্যন্ত কম। কদাচ কখনও, এক-আধখানা দেখা গেছে রাস্তায়।

রাত্রে তো আরও ভয়াবহ অবস্থা। সমস্ত শহর থমথম করছে, গাঢ় অন্ধকার। পথে লোক দেখলেই মনে হয় গুণ্ডা বদমাইশ, এখনই ছুরি বার করবে। কারণ মুখ বা বেশভূষা কারুরই দেখা যাচ্ছে না। দোকান-পাট অধিকাংশই বন্ধ, যাও দু-একটা খোলে সে দিনের বেলায়। সন্ধ্যার আগেই ঝাঁপ টেনে নিজেদের কোটরে গিয়ে ঢোকে। দোকানের আলোই পথকে বেশি আলোকিত করে, সরকারী গ্যাসের আলোয় আর কতটুকু অন্ধকার দূর হয়? তাও, সে আলোও ঠুলি পরানো, জ্বালবার লোক নেই।

বিনুর অবস্থা খুবই দুঃসহ। মা নেই, বৌদি নেই, সেইজন্যেই ভাইপো ভাইঝি নেই। দাদা ঠিক এই বোমাপড়ার আগে এলাহাবাদ গেছেন, বড়দিনের ছুটির সঙ্গে আরও দু-একদিনের ছুটি নিয়ে। ফলে বাড়িতে সে একেবারে একা। বাড়ি ফেলে কোথাও যাওয়াও নিরাপদ নয়।

তবু একদিন দুপুরবেলা হাঁটতে হাঁটতে রাখালের আপিসে চলে গেল। রাখাল ঠিক এই কাণ্ড শুরু হওয়ার আগেই এক চেনা-লোকের সঙ্গে টিয়া আর মেয়েটাকে জামালপুর পাঠিয়ে দিয়েছিল। এখন একাই আছে। বিনুর পরামর্শমতো আপিসেই দারোয়ানদের সঙ্গে খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে।

বিনু বলল, 'তা আমার ওখানে চলুন না, আমি তো রান্না করছিই, আমিই খাওয়াবো, তবু একসঙ্গে থাকা যাবে। দুজনেই মনে একটু বল পাবো।'

'না ভাই, বাড়িটাও দেখতে হবে তো। বাড়িওলারা মোটামুটি লোক ভাল। ওদেরও না জানলাদরজা খুলে নিয়ে যায় সেটা দেখা কর্তব্য। আমাদের গুর্খা দারোয়ানটার এক ভাগ্নে এসে পড়েছে ; এখানে ওকে একটা দোকানে কাজ ক'রে দেবে বলে আনিয়েছিল—সে দোকানের মালিক মালপত্র বেচে সরে পড়েছে, লাহিড়িয়া-সরাইতে গিয়ে দোকান দেবে বলে। সে ছোঁড়াটাকে এখানেই এনে রেখেছে। ওর খোরাকী বাবদ আমিও কিছু কণ্ট্রিবিউট করি। ও-ই আমার সঙ্গে বেলেঘাটায় থাকে। তবু—ছেলেমানুষই হোক আর যা-ই হোক, একটা সঙ্গী তো। ঐ গলিতে আমরা দুজন ছাড়া বোধহয় তিন-চারটি মানুষ আছে। রাত্তিরবেলা রীতিমতো গা-ছমছম করে। একটা সিগারেট কি দেশলাই পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। তবু ছেলেটা আছে—তা পনেরো ষোল বছর বয়েস হবে, কাজকর্মও করে—ঝাড়ামোছা, চা করতে শিখিয়ে দিয়েছি, তাও করে, গা-হাত-পা টেপে।' বলতে বলতে থেমে একটু চোখ মটকে বলে, 'দেখতেও ভাল। চাইকি আপনার টিয়ার সাবস্টিটিউট হিসেবেও চালানো যায়!'

বলে নিজেই খুব খানিকটা হেসে নেয়, তারপর বলে, 'তা ললিতবাবু তো আপনার ওখানে এসে থাকতে পারেন। ওঁর বাড়িরও কি সবাই গেছে?'

'সবাই গেছে। ওর দাদা নতুন চাকরি পেয়েছেন, যুদ্ধেরই চাকরি। তাকে রাঁচি চলে যেতে হয়েছে। ওর মা অন্য ভাই-বোন সকলে কেষ্টনগর চলে গেছেন, সেখানে বুঝি তাদের কে আছে। বাবা আছেন অবশ্য, সেই জন্যেই বোধহয় ললিত আর বেরোতে পারে না। দুপুরের আগে একবার ক'রে—দু পাঁচ মিনিটের জন্যে আসে বা আমিও যাই—আমি তো একা, সন্ধ্যের পর বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেশীক্ষণ থাকা যায় না। ওকেও থাকতে হয়। বাবা আপিস থেকে আসেন, তাঁর চা জলখাবার দেওয়া, রাত্রের ব্যবস্থা ওকেই করতে হয়। চাকরটাকেও ওর মা বোধহয় নিয়ে গেছেন, কিম্বা সে-ই দেশে পালিয়েছে। একটা ঠিকে লোক ছিল বাসন মাজার, সেও আসছে কিনা কে জানে।'

রাখাল বলে, 'আমার চলছে কিসে জানেন তো? লাস্ট ফার্দিং পর্যন্ত তো ওর সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি। ঐ দারোয়ানজী চালাচ্ছে। আপনি খুব গুড য়্যাডভাইস দিয়েছিলেন মাইরি, ওদের সঙ্গে মেসিং করার বন্দোবস্তে আর সারাদিন ক'রে আপিসে এসে কাটানোয়—ওরা একেবারে আপনার লোক হয়ে গেছে। দারোয়ান জানে কোথায় কি খুচখাচ টাকা থাকে, ও-ই বার ক'রে ক'রে চালাচ্ছে। বলে, "আমরা বুক দিয়ে আগলাচ্ছি সব, এই বিপদের দিনে, এ টাকা তো আমাদের পাওনাই। এর আবার হিসেব কি! বাবুরা ফিরলে মাইনের টাকা আলাদা আদায় ক'রে নেবো।"...শুধু যে খাওয়ায় তাই না, চা জলখাবার, গাড়ি ভাড়ার জন্যেও দু-পাঁচ টাকা ক্যাশ দেয় মধ্যে মধ্যে। দিল আছে লোকটার। যাই বলুন।'

সেদিন আসবার সময় সরস্বতী বলে দিয়েছিল, 'একেবারে এমন বিপদের মধ্যে ফেলে নিশ্চিন্ত থাকিসনি ভাই, এক-আধবার এসে খবর নিস। একটা অনড় রুগ্ন মানুষ আর আমরা দুই মেয়েছেলে। কি অবস্থায় থাকবো বুঝতেই

তো পারছিস !···অবিশ্যি গাড়ি ঘোড়া না চললে কি আবার বোমাফোমা পড়লে আসতে বলছি না—যদি সুবিধে হয় তো আসিস এক আধবার।'

যাবে, কথা দিয়েছিল, যাওয়ায় ইচ্ছেও ছিল—কিন্তু কদিন আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। এই চার-পাঁচটা দিন যে ভাবে কাটছে। সন্ধ্যের পর বেরোতে সাহস হয় না বাড়ি ছেড়ে। দাদা এসে গেলে হয়ত তবু সম্ভব হবে।

আজ কথাটা মনে পড়তে একটু লজ্জাই বোধ হল। যে অবস্থায় ফেলে চলে এসেছে ! একবার পরের দিনই খবর নেওয়া খুব উচিত ছিল।

সত্যিই, খেতে পাচ্ছে কিনা তাই বা কে জানে।

রাখালের আপিস ছেড়ে বেরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সাড়ে চারটে বেজে গেছে। এখনই অন্ধকার হয়ে আসবে। মনে হল, তবু আজই একবার যাওয়া উচিত।

কিভাবে যাবে তা ভেবে দেখে নি অত, হয়ত হেঁটেই যেতে হবে। কিন্তু দেখা গেল দৈব ওর প্রতি অনুকূল এবং প্রসন্ন। মৌলালির মোড়ে পেঁছিনোর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় একটা তিন নম্বর বাস এসে গেল। বাসটা মোটামুটি খালিও। শহরে লোকই নেই, দোকানপাট অর্ধেক এখনও বন্ধ, ভিড় হবেই বা কেন ?

হাঁটতে আপত্তি নেই কিন্তু দেরি হয়ে যাবে তাতে। খুব তাড়াহুড়ো ক'রে কথাবার্তা সেরে ফিরলেও সন্ধে পেরিয়ে রাত হয়ে যাবে। অবশ্য এতেও সন্ধের মধ্যে বাড়ি ফিরতে পারবে বলে মনে হয় না। তা হোক, একদিন একটু দেরি ক'রে ফিরলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। ওদের দু দিকের বাড়িতেই বাড়ির কর্তারা আছেন, তাঁরা আজকাল যে যার আপিসে নামে মাত্র হাজিরে দিয়ে দুটো আড়াইটের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসেন। একজন তো স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়েই আছেন বাড়িতে। ভদ্রলোক স্কুল মাস্টার, তাও বর্ধমানে। চাকরি নামেই, পরিবার কোথাও পাঠাবেন সে সামর্থ্য নেই। যদিও মধ্যে মধ্যে বলেন, 'আমার এক বড়লোক ছাত্র আছে, তাদের দেওঘরে মস্ত বাড়ি, সে তো সাধাসাধি করছে গিয়ে থাকার জন্যে। দেখি আর দুটো চারটে দিন। র‍্যাটাক যদি আরও বেশী হতে থাকে—যেতেই হবে।'

যাই হোক, তাঁরা কান পেতেই থাকেন, একটু খুট ক'রে শব্দ হলেও খোঁজ নেন কে এল।···

শ্যামবাজারের মোড়ে নেমে ওদের বাড়ি মিনিট পাঁচ-ছয়ের রাস্তা। একটা গলির মধ্যে বাড়ি, তবে মোড় থেকে বেশী দূরে নয়।

কড়া নাড়তে জানলা থেকে দেখে মায়ালতাই এসে দরজা খুলে দিল।

সুরস্বতী বললে, 'কী রে, তোর সময় হল আসবার। ললিতকে জিগ্যেস করি—তা সে বলে একেবারে একা তো, সেই জন্যেই আসতে পারে না। সে-ই তো তাই আমায় ঠেলে পাঠাল—বলে গিয়ে দেখে এসো কি হচ্ছে, কি ক'রে তাদের দিন চলছে, হয়ত খেতেই পাচ্ছে না—'

ললিত !

বুকে দৈহিক আঘাত লাগা একরকম, মানসিক আঘাত ঢের বেশী দুঃসহ। বইতে পড়েছে, শুনেওছে। নিজেও অনুভব করেছে এক-আধ বার। দৈহিক

আঘাতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় নি, তবে মনের আঘাত কাকে বলে কিছু জানে।

তবু এতটা জানত না, এত তীব্র তার ব্যথা।

হঠাৎ মনে হল কিছুক্ষণের জন্যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

বুকে যেন কে চেপে বসেছে, বিষম ভারী কেউ বা কিছু।

হ্যাঁ, কি যেন বললেন না সরস্বতী দিদি? ললিত ওর না আসার কৈফিয়ৎ দিয়েছে ওর হয়ে। ও-ই নাকি পাঠিয়েছে ললিতকে।

তার মানে ললিত এসেছে, হয়ত একাধিক দিনই এসেছে, হয়ত কদিন রোজই আসছে—সে কিছুই জানে না।

কিন্তু কেন, তাকে গোপন করার কি আছে।

লজ্জা?

লজ্জা মানেই তো কোথায় একটা গোপন অপরাধ-বোধ।

অতিকষ্টে কটা কথা উচ্চারণ করে—যেন খুব দূরে থেকে আর কেউ বলছে, অপরিচিত কেউ, 'হ্যাঁ, ললিত আসছে বলেই আমি আর অত গরজ করি নি। খবর তো পাচ্ছিই—'

মায়ালতা সেদিন একটা কথাও বলে নি। আজ এই প্রথম ওর সঙ্গে কথা বলল, ওর দিকে কেমন একটা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে চেয়ে—অন্তত বিনুর তাই মনে হল—'উনি তো সেদিনই বিকেলে এসেছেন, সেটা তো আর আপনি বলে দেন নি। নিজেই বিবেচনা ক'রে এসেছেন।'

অনেক পোড়-খাওয়া সরস্বতী, দুজনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কিছু বেসুর অনুমান ক'রে নিতে তার দেরি হল না।

সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হ্যাঁ, সেদিন যা উবগার করেছে আমাদের—নিজেই মন ক'রে এসে—তা আর বলার কথা নয়। এ পাড়ার তো দোকানপাট সব বন্ধ ছেল দুদিন, এই সবে দুটো একটা ক'রে খুলছে। ঘর বাড়ি পেরায় এক হাঁটু, তা একটু মানুষের মতো করে নোব, রুগীকে দেখব—না কোথায় বাজার খোলা আছে তাই দেখব। তোরা যা চিঁড়ে এনে দিয়িছিলি আর মিষ্টি, তাই ভিজিয়ে চটকে মেখে এক এক গাল খেয়ে সে বেলার মতো জীবন রক্ষে করা। কিন্তু সে তো তখনকার মতো থাতামুতো দেওয়া—তোরা চাল আলু নুন রেখে গিছলি ঠিকই—কিন্তু কয়লা ঘুঁটে কোথায়? তেল দেখি বোয়েমে এক ছিটে পড়ে আছে। অত সব কথা তখন মনেও হয় নি, তোরাও ব্যস্ত, মুখপোড়া ট্যাক্‌সিওলা বক বক করছে। বিকেলে ভাবছি এক বার নিজেই বেরিয়ে দেখি, কোথায় কি পাওয়া যায় খুঁজতে—কয়লা না হোক, কাঠও তো চাই নিদেন, তেল মশলা, না চাই কি, জীবনধারণ করতে। সবে মায়াকে বলছি তুই একটু দ্যাখ জীবনবাবুকে, আমিই একখানা গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি—তোর বন্ধু এসে হাজির। বেশ ছেলে বাপু, যাই বলিস, বড্ড ভাল আর বড্ড মায়াবী—মনটা তো টেনেছে যে এদের কি হল দেখে আসি একবার—সেই এসে পড়েছিল তাই, নিজেই টাকা আর দুখানা ঝাড়ন আর তেলের বোতল চেয়ে নে সাত রাজ্যি ঘুরে চাল ডাল ময়দা তেল নুন হলুদের গুঁড়ো পাঁচফোড়ন চা চিনি

চাট্টি আনাজ—সব গুছিয়ে নিয়ে এনেছে। সবচাইতে বাহাদুরী ওর কয়লা ঘুঁটে বার করা। এ তল্লাটে কোথাও কয়লার দোকান খোলা নেই, সব বেটারা পালিয়েছে। হ্যাঁ—তার ওপর আবার—আসবার পথে নাকি একটা খোট্টা ধরেছে, সে দেশে পালাচ্ছে, সব বেচে কিনে দে। সবই বেচেছে, কেবল সের দেড়েক পাঁপর হাতে আছে—তাই নিয়েই ইস্টিশেনের দিকে ছুটেছে। ওর হাতে বাজারের থলে দেখে বলেছে, বাবু নেবে? যা দেবে দাও। চার গণ্ডা পয়সা ফেলে দে তাও এনেছে।...মরণদশা আর কি, সব্বস্ব যেতে বসেছে, তার মধ্যেও পাঁপরগুলো বেচার কথা ভোলে নি। তা আমাদেরই লাভ, বেশ ভাল পাঁপর।...অনেক আনাজ এমনিও এনেছেল, তাই এই তো গত কদিনই চলছে, বেগুন কপি আলু—কপিগুলো শুকনো, বাসি—তা যাই হোক, কাজ তো চলছে।'

বিনু ততক্ষণে একটু সামলে নিয়েছে। বলে, 'হ্যাঁ, ও চিরদিনই বাজার করায় একসপার্ট। বাজার করতে ভালও বাসে।'

'তা বলব কেন। তা বললে একটু অবিচের হয় যে। খবর নিতেই এসেছেল। সেদিন তো মোটর বাস টেরাম কিছুই বিশেষ ছেল না, বললে, সামনে একটা টেরেন পেয়ে বসে এসেছে। শ্যালদা থেকে হেঁটে এতটা পথ আসতে হয়েছে আবার ইস্টিশেন পজ্জন্ত হেঁটে যেতে হবে। আমি কোনমতে এক গেলাস চা ক'রে দিয়েই বললুম, না বাবা, এখনও ঝিকিমিকি আলো আছে, তুমি সরে পড়ো। আমাদের জান বাঁচাতে এসে তুমি জান দেবে—এমন না হয়। মায়ের ছেলে, ভালয় ভালয় সরে পড়ো।'

'হ্যাঁ, ঐ তো আমার ভয়' যেন একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়ে তাড়াতাড়ি চেপে ধরে বিনুর, 'সন্ধ্যে বেলা পথেঘাটে বেরুনো আজকাল খুব মুশকিল। আলো নেই, দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায়—এমনিতেই তো বারো আনা দোকান আপিস বন্ধ—পথে যত কেবল চোর ডাকাতের রাজত্ব। চলি আজ আমি, এই তো তাই ঘোর ঘোর হয়ে এল।'

'তাই আয় বাবা—ও মা, বাবা বলছি কি ভাই তো, ঐ দ্যাখ ভাবনায় চিন্তেয় আমার ভীমরতি ধরেছে—দুগ্‌গা দুগ্‌গা। একটু বেলা থাকতে আসিস না, তোর তো আর পরের চাকরি নয়—সকাল সকাল এলে একটু বসে তবু দুদণ্ড থির হয়ে বসে গল্প করা যায়। তোমার বন্ধু আজকাল বেশ সময়ে আসে, দুটো আড়াইটেয় আসে, সাড়ে চারটেয় চলে যায়। আজ যা কেবল সকালেই এসে পড়েছিল—সাড়ে দশটায় বারোটায় চলে গেলে। বলি খেয়ে যাও যা হয়েছে তাই দে দুমুঠো—তোমরা তো আজকাল জাত ফাত মান না, খেতে দোষ কি? তা কিছুতে রাজী হল না। কোন মতে জোর ক'রে দুখানা পরোটা খাইয়ে দিলুম। ঘি ও-ই এনেছে, কে পাড়ার দোকানদার চলে গেছে, যাবার সময় আধা কড়িতে বেচে গেছে সব, তারই এক সের ঘি আমাদের জন্যে এনেছে।'

আর শুনল না বিনু, শুনতে পারল না।

উঠোন পেরিয়ে দোরের দিকে আসবে, মনে হচ্ছে পা আর চলবে না, চলছে না। হাঁটু দুটোই ভেঙে আসছে।

একটা কি বিপুল হতাশা বোধ করছে ?

কিন্তু কেন, আশা যেখানে ছিল না, সেখানে হতাশার প্রশ্নই বা উঠেছে কেন ?

সদরের মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল মায়ালতাই।

কিন্তু ঠিক দরজার সমনে পেঁছে—যেন মনে হল ইচ্ছে করেই—দরজাটা আড়াল করে দাঁড়াল একটু। আস্তে আস্তে বলল, 'উনি যে এখানে আসছেন, আপনার বন্ধু ললিতবাবু, আপনাকে বলেন নি, না ?'

একটু আশ্চর্য হয়েই ওর দিকে তাকাল বিনু।

এই প্রথম মনে হল—মায়ালতা সুন্দরী না হলেও তার মধ্যে একটা কি আছে, যা ভাল লাগে। আরও দেখল, দেখে একটু অবাকই হল—ওর চোখে যেন একটা বেদনাপূর্ণ সহানুভূতির দৃষ্টি।

ও কি ক'রে বুঝল বিনুর অবস্থাটা ? এতখানি অনুভব বা অনুমান শক্তি কোথায় পেল মেয়েটা ?

আমতা আমতা ক'রে বলল, 'না, মানে ঠিক দেখাও হচ্ছে না তো ? তাই হয়ত—'

'আপনি বন্ধুকে খুব ভালবাসেন, না ? বোধহয় সকলের চেয়ে বেশী ?'—প্রশ্ন করল, কিন্তু উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না। এক পাশে সরে ওর বেরিয়ে যাওয়ার পথ ক'রে দিল।

বাইরে যখন বেরিয়ে এসে দাঁড়াল তখনও যেন হাঁটার শক্তি আসে নি। বোধহয় ঠিক তখনই চলার ইচ্ছাও ছিল না।

হতাশা, নিজের আঘাতের যন্ত্রণা সব ছাপিয়ে বিস্ময়টাই বড় হয়ে উঠেছে।

এ কি আশ্চর্য মেয়ে।

অনেকদিন আগে একটা বইতে পড়েছিল,—কারও কারও মনের বীণার তার এমনভাবেই বাঁধা থাকে—সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মতো—অপর ব্যক্তি কাছে এলেই তার মনের ব্যথা এর বীণায় ধরা পড়ে, সেই সুরে রণিত হতে থাকে। 'পাওয়ার অফ পারফেক্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং' বোধ হয় একেই বলে।

ললিতও সেদিনই সন্ধ্যার পর ওর বাড়ি এল, কদিন পরে। আগেই প্রশ্ন করল, 'তুমি আজ কোথাও বেরিয়েছিলে নাকি ?'

'হ্যাঁ, রাখালের আপিসে গিছলুম।'

'শ্যামবাজারের দিকে যাবার আর সময় পাও নি বোধহয় ?'

'হ্যাঁ, তাও গিছলুম।' সংক্ষেপে উত্তর দিল বিনু।

ললিতের সুগৌর ললাটে কি ঈষৎ রক্তাভা দেখা দেয়, লজ্জা, বা অপরাধ-বোধের ?

মুখটা না ফেরালেও চোখের দৃষ্টিটা কি ওর মুখ থেকে সরে পিছনের ক্যালেণ্ডারে পড়ে ? ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে ঠিকই, তবু ভাল বোঝা যায় না।

হয়ত সবটাই বিনুর কল্পনা।

একটু, মিনিটখানেক থেমে ললিত বলল,—'আমিও গিছলুম। সেদিন আমি গিয়ে না পড়লে ওরা খুব অসুবিধেয় পড়ত। রান্না খাওয়াই হ'ত না। দিদির

তো বাজারে যাওয়ার অভ্যেস নেই, মায়াও ও পাড়ায় নতুন।...ওরা বলে নি তোমাকে ?'

'কেন বলবে না। এতখানি উপকারের কথা বলবে না—সরস্বতী দিদি এত অমানুষ নয়। তুমি খুবই করেছ—ঐ মেয়েটা—মায়া না কি নাম ওর, সেও বললে।'

'সেও বললে ? কী বললে ?'

কি বলছে তা হুঁশ হবার আগেই প্রশ্ন দুটো বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে।

বলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে বোধহয়—এতটা আগ্রহ প্রকাশের অন্য অর্থ হতে পারে বন্ধুর মনে। সে সঙ্গে সঙ্গে অন্য কথা পাড়ে।—'মেয়েটা না, কী রকম। ও যে কথাবার্তা বলতে পারে যেন বিশ্বাসই হয় না। বোধ হয় আত্মীয়দের ব্যবহারেই শক পেয়ে থাকবে।'

'না, ও এক-একজনের স্বভাবই থাকে চাপা।' বিনু অন্যদিনের মতোই সহজ স্বর আনার চেষ্টা করে গলায়,—'এদেরই ইনট্রোভার্ট বলে। কেবলই মনের মধ্যে সব জিনিসটা তলিয়ে ভাবতে থাকে, কেবলই বিচার ক'রে দেখে—বাইরের জগৎও, নিজের মনও। বাংলায় যাদের ভেতর-বুঁদে বলে তারা নিজেদের মনের কথা ভেতরে চেপে রাখে, অভিযোগ বা অনুযোগ, সবই। এরা অল্পেই আহত হয়, ভেতরে ভেতরে বক্তব্যটা পাকায়, অবিচার-বোধটা লালন করে। ইনট্রোভার্টরা ভেতর-বুঁদে তো বটেই—আর একটু বেশী।'

জোর ক'রেই এত কথা বলল, 'বন্ধুর অপ্রতিভ ভাব ঢাকতে।

মুখের ভাব চোখের দৃষ্টি অত দেখতে না পেলেও এই শীতের সন্ধ্যাতেও যে কপালটা ঘামে চিকচিক করছে সেটা দেখতে না পারার কোন কারণ নেই।

ললিত সত্যিই বিনুর কথা বলার এই সহজ ভঙ্গীতে আশ্বস্ত হল বুঝি অনেকটা। সোৎসাহে বলল,—'তাই হবে। কোন কথা কইতে গেলে বা ওর সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞেস করলে—উত্তর দেয় না, এক রকম স্থির চোখে চেয়ে থাকে। মুখে একটা হাসি-ভাব ভাব, মনে হয় যেন বিদ্রূপ করতে চায়, মনে মনে করছেও। অন্য কারও কথা কি সংসারের কথা জিজ্ঞেস করলে তবু হাঁ-হুঁ যা-হোক জবাব দেয়—তুমি এখন কি করবে, দাদার কাছেই যাবে কিনা—এসব কথা বললেই ঐ এক অদ্ভুত হাসি। যেন আমি কোন মতলব নিয়ে কথাগুলো পাড়ছি—ও সে চালাকিটা ধরে ফেলেছে।'

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ায় কিন্তু।

'আচ্ছা, আসি আজ তাহ'লে। বাবা হয়ত—'

কথাটা শেষও হয় না। তার আগেই চলে যায়।

এটাও নতুন। তবে কারণটা তো জানাই। বিনু চুপ ক'রে বসে বসে যেন নিজেই ওর হয়ে কৈফিয়ৎ রচনা করে মনে মনে।...

পরের দিন অবশ্য বিনু নিজেই ওপর-পড়া হয়ে ললিতের বাড়ি গিয়ে হাওয়াটা হাল্‌কা ক'রে আনল খানিকটা।

ললিতও—সে যে প্রত্যহই গেছে এ ক'দিন এবং যাবেও—সে কথাটা পরিষ্কার হয়ে যেতে গোপন রাখার কি মিথ্যা অজুহাত দেবার কোন দরকার

রইল না—এতে অনেকখানিই সহজ হ'য়ে এল। কিছুটা নিশ্চিন্তও। সেদিনও, যে সে যাবে সে কথাটা জানিয়ে দিল কথায় কথায়।

সরস্বতী দিদি যে কী মায়ায় ফেলেছেন ওকে! আর যেন কেমন অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছেন একেবারে! মুশকিল!

রাগ, দুঃখ, অভিমান, হতাশা?

কী যে, তিন চারটে দিন যে কিসের ঘোরে কাটাল বিনু—কেমন এক রকম আচ্ছন্নের মতো—তা সে নিজেই বোঝে নি। আজও, এত দিন পরেও, সে দিনের অবস্থাটা ভাববার চেষ্টা করে যখন—তখনও বুঝতে পারে না।

কিসের জন্যে অভিমান, কেনই বা হতাশা। আশা যেখানে নেই, কোনদিনই ছিল না—সেখানে এদুটোর তো প্রশ্নই ওঠে না। আর হতাশার কারণ না থাকলে রাগ, দুঃখই বা থাকবে কেন?

তবু একটা ভেতরে ভেতরে ভেঙ্গে পড়ার ছাপ বাইরেও ফুটে ওঠে বৈকি।

তবে সে সম্বন্ধে সচেতনতাটা ছিল না।

ওর দাদা ফিরে এসে যখন বলেন, 'বাবা, তুই যে একেবারে শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছিস। এত ভয়—তা এলি কেন!'—তখন যেন কেমন একটা চমকে নিজের অবস্থাটা দেখতে পায়—অনুভব করতে পারে।

সচেতনই হয়ে ওঠে—ঠিক বলতে গেলে। সচেতন তবু ঠিক স্বাভাবিক নয়। শুধু সেই আচ্ছন্ন ভাবটা বিহ্বলতাটা কাটে, চিন্তার জড়তা দূর হয়—কিন্তু সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না।

এবার জ্বালাটাই উগ্র হয়ে ওঠে। উগ্র আর স্পষ্ট।

কেন, কেন সে বার বার ভাগ্যের হাতে মার খাবে এমন? কেন তার সামান্য আশা আর ঈপ্সাটাও অপূর্ণ থাকবে।

এই জ্বালা থেকেই বোধহয় একটা ভূতে পেয়ে বসে ওকে।

এতদিন যারা এসেছে ললিতের জীবনে, তারা বিনুর থেকে অনেক দূরের মানুষ তাদের সঙ্গে পরিচয় বা অন্তরঙ্গতার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এক্ষেত্রে কিন্তু ওরই কাছের লোক—অন্তত বর্তমানে—ওরই পরিচিত লোকের সঙ্গে আছে। বিনুরই বহুদিনের পরিচয় সরস্বতীর সঙ্গে, ওকে বিচ্ছিন্ন রাখার সুবিধা ললিতের নেই। সেও এবার নিয়মিত যাতায়াত শুরু ক'রে দেয়।

সে যায় সন্ধ্যা ঘেঁষে। ললিতের চলে আসার পর। দাদা এসেছেন, তিনি সকাল সকাল বাড়ি ফিরে আসেন। খাবার করাই থাকে সকালে, কাজেই সন্ধ্যাবেলা সে অনেকটা মুক্ত। একটু একটু ক'রে শহরের জীবন-যাত্রাও সহজ হয়ে আসছে, বাস ট্রাম চলতে শুরু করেছে। এমন কি দু'একখানা ক'রে রিক্সাও বেরোচ্ছে আবার রাস্তায়।

অজুহাতও একটা এসে গেল—নিত্য যাবার।

জীবনবাবু একটু বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দীর্ঘদিন শয্যাগত থাকার ফলে ভেতরে ভেতরে বেশ খানিকটা জীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন, তার ওপর এই টানা-হেঁচড়া, আতঙ্ক উদ্বেগ দুশ্চিন্তা ও অনিয়মে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগল মনে

—মনের জন্যে দেহেও।

প্রথম প্রথম কটা দিন তত বোঝা যায় নি, শুধু আহারে অনিচ্ছা, বদহজম—এই ধরণের উপসর্গ চলছিল। কদিন পরে হঠাৎ পেটের অসুখ করল, তার সঙ্গে দেখা দিল প্রবল জ্বর। সে জ্বরও গোড়ার দিকে একটু ঘুষঘুষে মতো ছিল—ক্রমশ সেটার মাত্রাও বাড়তে লাগল।

বিপদ তো বটেই, এঁরা আরও ভয় পেয়ে গেলেন। কাছাকাছি ডাকবার মতো ডাক্তার নেই বলে। এ পাড়ায় যিনি ওদের দেখতেন তিনি বোমার হিড়িকে সাতনায় গিয়ে বসে আছেন, সেখানেই তাঁর শ্বশুর-পুত্ররা থাকেন। ভাল ডাক্তার বড় ডাক্তার বলতে এ পাড়াতেই কেউ নেই। এক ভদ্রলোক বই দেখে কি হোমিওপ্যাথী ওষুধ দেন—বাধ্য হয়ে তাঁর চিকিৎসাই চালানো হচ্ছিল, তিনি সুযোগ বুঝে এক পয়সা পুরীয়া এক আনা ক'রে দিয়েছিলেন—কিন্তু সে মহার্ঘ্য ওষুধেও কোন ফল হল না! জ্বর আর আমাশা বেড়েই যেতে লাগল দিন দিন।

ললিত অবশ্যই অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু তেমন কোন ডাক্তারের সন্ধান দিতে পারে নি। ওদের পাড়াতেও কোন ভাল ডাক্তার নেই তখন। যাঁরা আছেন তাঁদের ওপর এত ভরসা নেই যে বিস্তর টাকা খরচ ক'রে ডেকে আনা যায়। সে অন্য দিক দিয়ে যেটুকু পারে সাহায্য করছিল—বাজার দোকান কয়লা কেরোসিন তেল প্রভৃতি যোগাড় ক'রে। সেটাও কম উপকার নয়। কাপড চোপড় দুষ্প্রাপ্য বললে কম বলা হয়, অপ্রাপ্যই হয়ে উঠেছে। ললিত ওর বাবার এক আপিসের বন্ধুকে ধরে দুজোড়া মিলের কাপড় আর খানিকটা মার্কিন যোগাড় ক'রে দিয়েছে এর মধ্যে।

সরস্বতীর মনের জোর অসাধারণ, তেমনি জীবনবাবু সম্বন্ধে ভালবাসাও।

অবশ্য ভালবাসা বললে সে হয়ত চমকে উঠবে। সে বলবে এটা কৃতজ্ঞতা। কিন্তু বিনু জানে যে এটা ভালবাসাই। নিখাদ ভালবাসা। অপর দিক থেকে কিছু পাবার আশা নেই জেনেও যে নিজেকে উজাড় ক'রে দেয় সে-ই তো প্রকৃত ভালবাসে। নইলে কেউ এভাবে এতদিন ধরে ভূতের বোঝা টানতে পারে না।

এখন এই অসুখে মুহুর্মুহু কাঁথা কাপড় বদলাতে হচ্ছে। প্রথম প্রথম প্রতিবারেই চান করছিল, তাতেও কোন বিরক্তি প্রকাশ করে নি—মায়ালতার বকুনিতে সেটা বন্ধ করেছে। মায়া বলে, 'আপনার ঐ এক ঢাল চুল—একবার নাইলে যে চুলের গোড়ায় জল বসে আপনার সুদ্ধ নিমোনিয়া ধরে যাবে। আর বিপদের সময় এত বাছবিচার কেউ করে না। খাবার সময় না হয় কাপড়টা বদলে মুখে জল দেবেন। তাছাড়া এত বিচারের আছেই বা কি, এসব ছুঁচিবাই বুড়িরা করবে। তারা যমের অরুচি, তাদের অসুখ করবে না। ওটাও তো পাগলামি এক রকমের—পাগলদের ঠাণ্ডা লাগে না।'

সরস্বতীও কথাটা বুঝেছে। এখন একেবারে দুপুরে একরাশ সেই সব কাঁথাকানি কেচে চান ক'রে আসে।

জীবনবাবু চিঁ চিঁ ক'রে বললেন, 'আমার সঙ্গে তোমার কী ক্ষণে দেখা হয়েছিল, সত্যি! জীবনভর জ্বলে পুড়ে মলে। একটু জোর থাকলেও হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ট্রাম গাড়ির তলায় মাথা দিতুম।'

সরস্বতী ঝংকার দিয়ে ওঠে, 'হ্যাঁ, তা আর নয়! ঐ সুখটুকুই বাকী আছে। অনেক করলে, এখন মরে আমার হাতে দড়ি পরানোটা বা বাদ যায় কেন! এই নিয়ে ছমাস ত্যাখন থানা-পুলিশ করি আর কি!'

কখনও বলে, 'তোমায় ব্যাগত্তা করি একটু চুপ করো দিকিনি! সেই যে বলে না।—"জ্বালার ওপর জ্বালা দেয় সে চিকন কালা"—তা এ হয়েছে তাই। এ আমার পাপের প্রাচিত্তির—তুমি কি করবে! বরং আমার অদেষ্টের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তোমার না হক দুঃখু ভোগ করা। বিন অপরাধে। তবে হ্যাঁ, এইটে শুধু বলি ভগবানের কাছে—আমার গতর থাকতে থাকতে যেন তুমি চলে যাও। সেই আমার এক ভাবনা—আমি গেলে তোমাকে কে দেখবে!'

একে যদি সতীত্ব না বলা যায়—সতীত্ব শব্দের কোন অর্থই নেই বিনুর কাছে।

সে যাই হোক—এই বিপদটা বিনুর অনেকখানি সুবিধে ক'রে দিলে।

ওর দাদার এক বন্ধুর মামা, ডাঃ সান্যাল বড় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। য়্যালোপ্যাথী পাস ক'রে কিছু দিন প্র্যাকটিস ক'রেও ছিলেন, কিন্তু ভাল লাগেনি। ওঁর মনে হয়েছিল য়্যালোপ্যাথীতে সত্যিকারের কোন চিকিৎসা নেই। তিনি বিখ্যাত ইউনান সাহেবের সঙ্গে থেকে ও ঘুরে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা শেখেন। সেই মতেই পরে চিকিৎসা শুরু করেন। অনেকবার অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছে বিনু—তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা। যেন সত্যিই সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। যত বড় কঠিন অসুখই হোক, একবার দেখাই যথেষ্ট—এক ডোজ বড় জোর দু ডোজ, তার বেশী ওষুধ লাগে না। তবে ভদ্রলোক কম রুগী দেখেন, বেশী রুগী দেখলে নাকি ঠিক-মতো চিকিৎসা করা যায় না। ডাক্তার মাছ মাংস খান না, নিরামিষ খাওয়া তাও এক বেলা খান। বলেন, যারা মাটি কোপায় না—তার মানে কঠিন কায়িক পরিশ্রম করে না তাদের দুবেলা খাওয়ার কোন দরকার নেই, বিশেষ বয়স চল্লিশ পার হয়ে এলে।

লোকটির সবই সৃষ্টিছাড়া বলতে গেলে—সুতরাং তিনি যে বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে যাবেন, তা মনে হয় না। এই অনুমানের ওপর ভরসা করে'ই বিনু একদিন দুপুরে তাঁর বাড়ি গেল। প্রথমটা তিনি অতদূরে যেতে রাজী হন নি, বলেছিলেন, 'আমার ভোজপুরী ড্রাইভার সে বোমাপড়ার আগেই পালিয়েছে। গেলে ট্যাক্সী ক'রে যেতে হবে। তোমার রুগী বইতে পারবে অত খরচ?'

বিনু বলেছিল, 'অত টাকা কেন, আপনার বত্রিশ টাকা ফীও দিতে কষ্ট হবে। অথচ আনাও যাবে না।'

ডাক্তারবাবু একটু অবাক হয়ে চেয়ে আছেন দেখে সে রোগীর অবস্থা, সরস্বতীর আশ্চর্য আত্মত্যাগের কথা—সবই শুনে বলল। মায় সরস্বতীর ইতিহাস, জীবনবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক—কিছুই গোপন করল না।

বোধহয় সত্য কথা বলার ফলেই কাজ হ'ল। ডাঃ সান্যাল ওর মুখের দিকে চেয়ে কী দেখলেন বা বুঝলেন কে জানে—তিনি যেতে রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, 'ঠিক আছে। আমি চেম্বার সেরে ছটা নাগাদ যেতে পারব। ট্যাক্সী

ক'রেই যাবো—কিন্তু সে খরচা তাদের দিতে হবে না, বলে দিও। তবে তুমি এসে নিয়ে যেও। সন্ধ্যের পর এই ঘুপসি অন্ধকারে বাড়ি 'খ‍ুঁজতে পারব না।'

ট্যাক্সী ক'রেই গেলেন ডাক্তারবাবু, যাতায়াত ভাড়া ক'রে। টালিগঞ্জের মোড় থেকে শ্যামবাজার—দীর্ঘ পথ, ভাড়াও কম লাগল না। তবু তিনি এক পয়সাও নিলেন না, ফীও না। দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। রোগীকে দেখলেন—মানে প্রধানত তার চেহারাটাই, তার মুখেই রোগের বিবরণ সব শুনলেন। 'কী কষ্ট হয়' বলে একটি মাত্র প্রশ্ন করে স্থির হয়ে বসে শুনলেন। শুধু এই স্ট্রোক্‌টা করে কিভাবে হয়েছিল সেইটুকুই জানতে চাইলেন—আর দুটি তিনটি—ওদের হিসেবে অবান্তর—খুচরো প্রশ্ন, কী খেতে ভালবাসে, টক না ঝাল না মিষ্টি ঠাণ্ডা জলে চান করতে ভাল লাগে বা জল ঢাললে গায়ে কাঁটা দেয় কিনা, কাছে বসে কেউ বেশী কথা কইলে বিরক্ত হয় কিনা—এই সব।

তারপর একটা কাগজে দুটি ওষুধের নাম লিখে দিয়ে বললেন, 'এক নম্বরটা এনে কাল সকালেই একবার খাইয়ে দিও। মহেশ বাবুদের দোকান থেকে কিনলেই হবে—বেশী দাম দিয়ে কিনতে হবে না। রোগ সারলে ঐ পাঁচ পয়সা শিশির ওষুধেই সারবে। দু-একদিনেই জ্বর পায়খানা বন্ধ হবে, তবে যদি দৈবাৎ না হয়, সাত দিন পরে আর একবার দিও।'

তারপর একটু থেমে বললেন, ওঁর এই পা পড়ে যাওয়া—আগে আমার কাছে নিয়ে এলে একেবারে সারিয়ে দিতে পারতুম, তবে এখনও সময় আছে, যদি আমার কথা মতো একটু কষ্ট করে—মাস দুইয়ের মধ্যে কাউকে ধরে উঠে দাঁড়াতে পারবে, ধরে ধরে চলতেও পারবে একটু। তারপর ভগবানের হাত।'

কী কষ্ট করতে হবে তাও বলে দিলেন। ওষুধটা—ঐ দুনম্বরের—পনেরো দিন অন্তর খেতে হবে, তবে তাতে পুরো সারবে না। এক মাস কোন রান্না করা খাবার কি নুন মিষ্টি খাওয়া চলবে না। শুধু ফল খেয়ে থাকতে হবে। না না, কোন দামী ফল খাওয়ার দরকার নেই, শসা কলা পেয়ারা খেলেই চলবে। পেট ভরেই খাবে, দিনে চার বারও খেতে পারে—তবে ঐ ফলই। ওষুধেও সারত তবে এতদিনের পুরনো ব্যামো বলেই বাড়তি কষ্ট টুকু করতে হবে।'

জ্বর আর আমাশা ঠিক দুদিনেই সেরে গেল।

তাই দেখেই জীবনবাবু পরের ওষুধ আর পথ্যে রাজী হ'ল।

আর তাতেই, ফল খেয়ে থেকেই মাস দেড়েক পরে ধরে ধরে উঠে দাঁড়াতে পেরেছিল জীবনবাবু। চলতেও না কি পেরেছিল শেষ পর্যন্ত, লাঠি ধরে ধরে—অল্প স্বল্প—কিন্তু সে খবর আর পুরো নেওয়া হয় নি। বিনু ও বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল তার অনেক আগেই।

এই ব্যাপারে দুজনে কিছুটা কাছাকাছি আসতে বাধ্য।

সরস্বতী রুগীকে নিয়ে একেবারেই শয্যাবন্ধ। বারে বারে কাপড় ছাড়া বন্ধ করেছে, নইলে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়বে—তা ছাড়াও, উঠে আসারও তো জো নেই। রুগীর ন্যাকড়া-কানি বদলাতে হচ্ছে বার বার। অন্য প্রাকৃতিক কাজটাও করিয়ে দিতে হচ্ছে।

এক আধবার যদি বা বেরিয়ে আসে, সে অল্পক্ষণের জন্যে, সংসারের কাজ করতে পারে না। রান্নাঘরে তো ঢুকবেই না। সংসারের অন্য কাজ—শুকনো কাপড় তোলা, তা আলনায় গোছ ক'রে রাখা ; ঘর-দোরের পাট ; সন্ধ্যা দেওয়া ; এমন কি বাসন মাজাও—সবই মায়াকে করতে হয়। মলমূত্র পরিষ্কার করে—তা হোক না কেন রুগীর, আর যতই কেন না শাস্ত্রে বলুক "আতুরে নিয়মো নাস্তি" —বিনা স্নানে সংসারের কাজ করা বা রান্না ঘরে ঢোকা হিন্দু মেয়েদের প্রাচীন সংস্কারে বাধে—বিশেষ সরস্বতী যে সমাজের লোক সে সমাজে—অন্তত তখন বাধত।

ছোট বেলাতেই বিনু দেখেছে, সেই বয়সেই লক্ষ্য করেছে—সরস্বতীর মাকে —হাতে পায়ে জল দিয়ে কুলকুচি ক'রে (অর্থাৎ সমস্ত রকম মালিন্য মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও) এসেও সম্পূর্ণ বিবস্ত্র না হয়ে আচারের হাঁড়িতে হাত দিতেন না। মাকে বলতেন, 'এখেনে উপায় নেই তাই, নাপাযিমানে এই ব্যবস্থা। নইলে আমাদের আচারের ঘর আলাদা থাকে সব বাড়িতেই, বরাবর এই চলে আসছে। সেখেনে চান ক'রে সোঁ কাপড়ে সোঁ চুলে ঢুকতে হয়—কিম্বা কাপড় শেমিজ সব ছেড়ে। শুধু কাপড়েও ঢোকার রেওয়াজ নেই আমাদের ঘরে। যদি তাতে কোথাও অজান্তে কোন সুতোর খি লেগে থাকে! এই যে আচার-বিচের কথাটাই ধরো না—ও তো শুনিচি এই আচার থেকেই এসেচে।'

কাজেই মায়ার ওপরই সবটা এসে পড়েছে। আর কে করবে! এখনও বাসন-মাজার ঠিকে ঝিটা পর্যন্ত আসে নি। মনে হয় সরস্বতীর এই বিপদ আসবে জেনেই বিধাতা এ যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন।

কে জানে মেয়েটারও এদের ওপর মায়া পড়ে গেছে কিনা! ওর দাদা নাকি খোঁজ খবর ক'রে ঠিকানা জেনে চিঠি লিখেছিল, গিয়ে মায়াকে নিয়ে এসে নিজের শ্বশুর বাড়িতেই তুলবে এই প্রস্তাব দিয়ে। মায়া অস্বীকার করেছে। লিখেছে 'অজানা অচেনা লোক, যারা আমাকে প্রায় পথে বসিয়ে চলে গেছে—তাদের কাছে গিয়ে কি করব। গেলে এক দেশে চলে যেতে হয়। নইলে এ বেশ আছি। আর যাই হোক এরা যেখানে সেখানে যেমন করে হোক ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলার চেষ্টা করে নি। খেতেও দিচ্ছে। এর মধ্যে এক জোড়া আটপৌরে কাপড়ও আনিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং অতিথিদের—অতিথি বলতে অবশ্য তা ললিত আর বিনু—যত্ন আত্তি যা কিছু করা মায়াকেই করতে হয়। চা-জলখাবার সেই দেয়। বিনুর চা খাবার অব্যেস এখনও তেমন হয় নি—এখন মায়ার হাতে খাবে বলেই, প্রত্যহ খায়। খাবে আর প্রশংসা করবে—এ তো ওর পরিকল্পনারই অংশ।

অবশ্য এটাও বিনু স্বীকার করতে বাধ্য যে—মায়া চা ভালই করে। অন্তত ওর ভাল লাগে। রান্নার হাতও বেশ ভাল। এবং যত্নেও কোন ত্রুটি নেই। বরং এক একসময় মনে হয় সজাগ সতর্ক থেকে কাজটা নিখুঁৎ করার চেষ্টা করে। এটা আরও প্রশংসার এই জন্যে যে, এটা একরকম অশিক্ষিত-পটুত্ব ওর। এতকাল এমন ভাবে সংসারের কাজ কখনও করে নি। করতে হয়নি—তবু এত সাগ্রহে আর সযত্নে করে তার মানে ওর মনটাই সংসারী—সংসার করতে মানুষকে সেবা

যত্ন করতেই চায়, তবে ইচ্ছাতেও এতটা পটুত্ব আসে না। সে সঙ্গে মন আর বুদ্ধি যুক্ত না হ'লে।

যত্ন করে, মনে হয় বেশ আগ্রহের সঙ্গেই করে কিন্তু মাঝে মাঝে—সেই প্রথম দিনের মতোই—কেমন একটা গভীর রহস্যভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—সেইটেরই কোন অর্থ খুঁজে পায় না বিনু। মনে হয় যেন তার মধ্যে কী একটা বিদ্রুপের ভঙ্গী আছে, সেই সঙ্গে একটা চ্যালেঞ্জেরও—চাপা কৌতুকের হাসি একটু। যেন ওর মনের গোপনতম কোণে পেঁাছে গেছে সে দৃষ্টি, সম্পূর্ণ ধরা পড়ে গেছে ও।

বোঝে না বলেই অনেক কিছু মনে হয়—আর সেই জন্যেই একটা অস্বস্তি বোধ করে। একটু ভয় ভয়ও করে মধ্যে মধ্যে, ওর সেই অতলান্ত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে।

আর এই রহস্য-আবরণের জন্যেই ওর পরিকল্পনা বা প্রতিশোধের আয়োজন কতদূর এগোয় তাও ঠিক বুঝতে পারে না। ওর নিজের মধ্যেই একটা স্বাভাবিক সংকোচ আছে এ বিষয়ে, একটা অদৃশ্য ব্যবধান বা প্রাচীর। মেয়েদের সঙ্গে সহজেই মিশতে পারে কিন্তু প্রণয়ের ব্যাপারটা আজও ওর ঠিক বোধগম্য হয় নি। হয়নি তেমন কোন আকর্ষণ অনুভব করে নি বলেই। প্রথম আকর্ষণ যার সম্বন্ধে বোধ করেছে—সে টিয়া। সেটাও যে আকর্ষণ তাও তো বহুদিন পর্যন্ত বুঝতে পারেনি, সেইটেই প্রেম কিনা তাও না। যেটুকু আগুন বা আলো তার প্রাণে জেগেছে—যেটুকু নেশা—সে সম্ভব হয়েছে টিয়ার ঐ বন্যার মতো দুকুল-প্লাবিত করা, সব চিন্তা-বিবেচনা-ভাসিয়ে-দেওয়া প্রাণশক্তি আর আবেগের জন্যেই অতদূর যেতে পেরেছে।

আসলে এটা জানে—নিজের মনে তেমন আকর্ষণ জাগলে এত দ্বিধা সংকোচ সংশয় থাকে না। মনটা তখন ভাল করে না বুঝলেও চলে। এই সঙ্কোচ আর দ্বিধার জন্যেই বোঝে যে তেমন আকর্ষণ ওর মনে নেই।

অথচ থাকাই উচিত, মায়াও সাধারণ মেয়ে নয়। নিজের জীবন সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে আশ্চর্য ঔদাসীন্য ওর মধ্যে দেখেছে বিনু সেই বর্ধমান স্টেশনে, তারপর এখানে এসেও যে বিস্ময়কর নিস্পৃহতা, জীবন সম্বন্ধে অবজ্ঞা—আবার এখন যে আর এক মূর্তি দেখছে, কল্যাণী সেবাময়ী রূপ—এতে তো যে কোন তরুণ ছেলেরই আকর্ষণ বোধ করার কথা। এক অসাধারণ মেয়ে তাতে তো সন্দেহ নেই। যারা তরুণী মেয়ে দেখলেই প্রেমে পড়তে চায় বা প্রেম করতে চায় —তাদের কাছে এ ধরনের স্বতন্ত্রতা বা বৈশিষ্ট্যের কোন মূল্য নেই হয়ত—যারা একটু ভাবে, ভাবতে চায়, লক্ষ্য করে—তাদের কাছে আছে। বিনুর এটা চোখে পড়ার কথা। পড়েওছে।

তবে প্রেমের চিন্তাই যে তার নেই। যে ফাঁদে ফেলতেই এসেছে, সে ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সতর্ক ও সজাগ থাকবে বৈকি। আর এই সচেতনতাই তো আকর্ষণ ও আবেগ জাগ্রত হওয়ার পক্ষে প্রবল বাধা।

॥ ৫৩ ॥

তবু ফাঁদে না পড়ুক এ মেয়ের কাছে হার মানতে হল একদিন, ধরা পড়তে হল।

হয়ত পরিকল্পিত চেষ্টা বলেই ধরা পড়ে গেল সেদিন।

ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার দুদিন পরে।

চা জলখাবার খেয়ে উঠে অন্যদিনের মতোই অন্ধকার উঠোনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে—ফালি মতো সরু রকটায়। এইখানে দাঁড়িয়েই হাত ধোয় সে। এইখানেই লোহার থামটার পাশে বালতিতে জল থাকে।

বাইরে আলো নেই। জ্বালা হয় না। সরস্বতীর ভাষায় এখনও 'ঠুলি' পরাবার ব্যবস্থা করা যায় নি, খোলা আলো জ্বালালে পাড়ার ত্রিশ টাকা মাইনে পাওয়া ছেলেগুলো মার মার-ক'রে তেড়ে আসে। আলো যা জ্বলে সরস্বতীর ঘরেই, জানলা বন্ধ থাকে বলে বাইরে থেকে দেখা যায় না। দরজার মাথায় আলো বলে আলো ঠিক আসে না, একটু আভাস এসে পড়ে সামনের অংশটুকুতে। তার ফলে বাকী রক আর উঠোনটাতে অন্ধকার যেন আরও গাঢ় ঘন মনে হয়।

অন্ধকারেই চলাফেরা কাজকর্ম করতে হয় বলে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তবে ঘরের ভেতর থেকে বাইরে চাইলে অন্ধকার ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না।

অর্থাৎ পরীক্ষা করার পক্ষে পরিবেশ সম্পূর্ণই অনুকূল।

এমন আগেও এসেছে। এ পরিবেশ প্রত্যহই আসে এ সময়টায়। রান্নাঘরে বসে চা জলখাবার খেয়ে এইখানে এসেই হাত ধোয়। বিনুই ইতস্তত করেছে, সংকোচ ও ভদ্রতাকে জয় করতে পারে নি বলে সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারে নি। কিন্তু আর দ্বিধার সময় নেই। কে জানে এমন অবসর হয়ত আর বেশীদিন পাবে না। সে-ই বড় ডাক্তার এনেছে, অসুখ ভাল হবে শিগগিরই, সরস্বতী তখন আর ঘরের মধ্যে বসে থাকবে না। যা করতে হবে—যদি করতে হয়—আজই করা উচিত।

হাতে জল দেবার পর প্রতিদিনের মতোই মায়া আঁচলটা বাড়িয়ে দিয়েছে হাত মোছার জন্যে। এও এক আশ্চর্য অভ্যেস ওর কিছুতেই গামছা বা তোয়ালে দেবে না, নিজের আঁচলই দেবে। সকলের সামনে দেয় বলে এর কোন বিশেষ ব্যাখ্যাও করা যায় না।

এইটেরই প্রতীক্ষা করছিল বিনু, প্রায় মরীয়া হয়েই আঁচলের সঙ্গে ওর হাতটা ধরে ফেলল।

এ অবস্থায়ও মায়া অসাধারণ।

সত্যিই বাহবা না দিয়ে পারল না বিনু।

মনে হল মায়া বিন্দুমাত্র বিস্মিত হল না। যেন সে আশাই করছিল, অপেক্ষা করছিল এই মুহূর্তটির। ব্যস্তও হ'ল না, হাত টেনে নেবারও চেষ্টা করল না। বরং হাতটা আলগা ক'রে সম্পূর্ণ ওর মুঠির মধ্যে এলিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, যেন হাতটা ওকে ভাল ক'রে ধরবার অবসর দিতেই—কাছে, একেবারে বলতে গেলে ওর বুকের ওপর সরে এল। চোখটা ওর চোখের দিকেই

নিবন্ধ ছিল, তাই মুখটাও সেইভাবে—কবির ভাষায় যাকে বলে 'উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত' তাই ছিল, বিনুর মুখের কাছাকাছি এসে পড়ল। খুব কাছে। গরম নিঃশ্বাসটা ওর গালে মুখে গলায় এসে লাগছে। চোখে চোখও পড়ল—সে আবছা আলোতেও দেখার অসুবিধে নেই। দৃষ্টি অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, বেশ পরিষ্কারই দেখা গেল। মনে হল যেন মেয়েটি চুম্বনেরই প্রত্যাশা করছে এবার, সেইভাবেই ঠোঁট দুটি খুলে গেছে একটু—পিপাসিত ভঙ্গীতে—সুন্দর দাঁতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

অবস্থা প্রণয়েরই অনুকূল। কোথাও কোন বাধা নেই, কোন অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তিও নেই কাছে। ইচ্ছা থাক বা না থাক, সে মুহূর্তে এই অবস্থায় হয়ত প্রকৃতিই তার কাজ ক'রে যেত—যদি সেই উন্মুখ উৎসুক মুখখানিতে আর একটু আবেশ তার স্বপ্ন সঞ্চার করত, ঈষৎ-উদ্ভিন্ন অধরে যে আমন্ত্রণ তার সঙ্গে সমতা রেখে চোখ দুটিও ঈষৎ নিমীলিত হয়ে আসত। ওর সেই পূর্ণ-উন্মীলিত চোখ রোমান্সের আবহাওয়া গড়ে উঠতে দিল না।

সে অবসরও পাওয়া গেল না অবশ্য।

সেই প্রথম দিনের মতোই খুব মৃদু অথচ স্পষ্টস্বরে বলল মায়া, 'কী চান আপনি বলুন তো? আমাকে চান, না বন্ধুকে সরিয়ে নিতে চান আপনার আওতায়।'

এ মেয়ের কাছে মধুর কোন মিথ্যার জাল বুনতে যাওয়া মূর্খতা। এ ওর মনের চেহারা ওর এতকালের বন্ধুর চেয়েও পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে। প্রথম থেকেই ওকে বুঝেছে, সেইখানেই ওর এত শক্তি, সেই জন্যেই ওষ্ঠের ভঙ্গীতে এমন কৌতুক আর বিদ্রূপের বক্রতা।

নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় লাগল।

তবে নিলও খুব তাড়াতাড়ি! বেশ শান্তভাবেই বলল, 'যদি বলি দুই-ই?'

'তাহলে মিথ্যা বলবেন। আমাকে আপনি চান না। আপনি কাউকেই চান না, কোন মেয়েকেই। চাইলে আপনার পক্ষে পাওয়া একটুও শক্ত হ'ত না। অনেক পেতেন। এখনও চাইলেই পাবেন। না চাইলেও—কোন আশা নেই জেনেও—অনেকে প্রার্থনা করবে আপনাকে। আমিই প্রস্তুত আছি নিজেকে নিঃশর্তে আপনার ইচ্ছায় বিলিয়ে দিতে। কিন্তু আমি জানি আপনি আমার প্রেমে পড়েন নি, প্রেমের অভিনয় করে ওঁকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চান। ওঁকে একটা বড় আঘাত দিয়ে নিজের কাছে টানতে চান—কিম্বা শুধুই প্রতিশোধ নিতে চান। তাই না?'

'কিন্তু তুমি কি ওর প্রেমে পড়ো নি? সে অন্তত তোমাকে ভালবেসেছে এটা তো ঠিক?'

'না। ওঁর মতো মানুষ সহজেই প্রেমে পড়বেন। পড়েনও নিশ্চয়। ওকে প্রেম বলে না। আমিও প্রেমে পড়ি নি। আপনার প্রেমেও না। বেহিসেবী ভালবাসার পরিণাম আমি জানি। বইতে পড়েছি। চোখেও দেখেছি কিছু কিছু। যাদের বুদ্ধি আছে তারা দেখেই শেখে। তবে মেয়েরা শিখতে চায় না, বেশির ভাগ মেয়েরাই শামাপোকার মতো আগুনে ঝাঁপ দেয় পুড়ে মরবে

জেনেও। আমি তা নই। ভবিষ্যতের কথাটা ভাবি। তবে এও ঠিক—আপনাদের কাউকেই ভালবাসা কঠিন হবে না বিয়ের পর। আমার বেছে নেবার প্রশ্ন উঠলে আমি হয়ত আপনাকেই বেছে নেব, দুর্বলতাটা এদিকেই বেশী—তবে সে কিছু না। এই বয়সেই অনিশ্চিত জীবনের যে স্বাদ পেয়েছি—তাতেই আমার শিক্ষা হয়ে গেছে। আপনার বন্ধু আমাকে বিয়ে করবেন বলছেন, আপনি পারবেন তেমন কোন কথা দিতে? ভেবে দেখুন।'

এই অনাবরিত হিসাববুদ্ধি আর কঠিন কণ্ঠস্বরে রোমান্সের স্বপ্নের সামান্য কোমলতাটুকুও কোথায়—মনের কোন্ দূরদিগন্তে মিলিয়ে গেছে। কথা নয়—মনে হল দৈহিক আঘাতই করছে মেয়েটা। সে আঘাত মধ্যযুগের কোড়ার মতো চর্ম ভেদ ক'রে যেন মাংসে—বুঝিবা মর্মে পৌঁচচ্ছে।

আঘাতের সঙ্গে অপমান। নির্বোধ প্রতিপন্ন হয়ে যাওয়ার অপমান। বুদ্ধির খেলা খেলতে এসে এভাবে ধরা পড়ার অর্থই বুদ্ধিহীনতা প্রমাণিত হওয়া।

বিনু অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে থেকে কেমন এক রকম অসহায়ভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল, 'কিন্তু তা কেমন ক'রে হবে? ওর দাদারই তো এখনও বিয়ে হয় নি। আর এমন কীই বা আয় ওর যে বাড়ির অমতে বিয়ে ক'রে তোমাকে নিয়ে আলাদা বাস করতে পারবে।'

'দাদার বিয়ে না হলেও বিয়ে আটকায় না। আজকাল আটকাচ্ছে না। আমারই এক পিসতুতো মেজ বোনের বিয়ে হয়ে গেল—বড় বোন পাছে দুঃখ পায় বলে তাকে এলাহাবাদ না লক্ষ্মৌ কোথায় পাঠিয়ে দিয়ে। সে না হয় ততদিন অপেক্ষাই করব। আর আয়? স্বামীর ঘর করতে পেলে সব কষ্টই সহ্য করতে রাজী আছি, যত কম আয়ই হোক আমি চালিয়ে নিতে পারব। তেমন দরকার হয় আমিও চাকরি করব। এই তো যুদ্ধের বাজারে চাকরি লোকের পিছনে ঘুরছে শুনছি। আমি শুধু স্বামীর ঘরটাই চাই—নিজস্ব আশ্রয় একটা। বিনাদামে নিজেকে বিলিয়ে দিতে রাজী নই।'

তারপর একটু থেমে বলে, 'তিনি হয়ত বেহিসেবী কথাই দিয়েছেন, আপনি কি তাও দিতে পারবেন? আপনি বহু দূরের কোন তারিখ দিয়ে বলতে পারবেন—অমুখ তারিখের পর তোমাকে বিয়ে করব? আমি না হয় সেই দীর্ঘকালই অপেক্ষা করব, অনিশ্চিত জেনেও।'

আবারও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকতে হয়।

জল ঘুলিয়ে গেলে ভেতরের কোন জিনিস চোখে পড়ে না। মানসিক এই প্রচণ্ড আলোড়নে মনের অন্তস্তল পর্যন্ত এমনি ঘুলিয়ে গেছে—নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা, তৃষ্ণা বা বিতৃষ্ণা কিছুই চোখে পড়ে না।

তবু একবার হিসেবটা তলিয়ে বোঝার চেষ্টা ক'রে বলল, 'না। তা পারব না। মনের তেমন কোন প্রস্তুতি চোখে পড়ছে না এখনও। সেক্ষেত্রে কথা দেওয়া উচিত নয়।'

'তা জানি। তা হলে মিছিমিছি আমার সর্বনাশ করতে চাইছেন কেন? ওঁর এ মনোভাব হয়ত এমনিই বেশী দিন থাকবে না, হয়ত আর কেউ এসে যাবে জীবনে—কিন্তু যেটুকু পেয়েছি—প্রায়-ডুবন্ত মানুষের খড়কুটোও অবলম্বন

বলে মনে হয় জানেন তো—সেটুকুই বা ছাড়ব কেন? আর কেউ যে এই কালো মেয়েকে বিয়ে করবে—বিনা পয়সায়—তা তো মনে হয় না। তদ্বির ক'রে বিয়ে দেবে, কাউকে কৌশল ক'রে এনে মনে ধরাবে—এমনও কেউ নেই। এই প্রথম একটু ডাঙ্গার সন্ধান পেয়েছি, সেটুকু আশ্রয় নষ্ট ক'রে আপনার কি লাভ?'

আর একটু থেমে বলে—কিছু পূর্বের সে কঠোরতা চলে গিয়ে যেন আবেগেই কাঁপছে গলাটা, বহু বিপরীতমুখী সংঘাতে—এই লোকটির সঙ্গে এই প্রসঙ্গ নিয়ে এমন কদর্য কথা-কাটাকাটি করতে হচ্ছে সে লজ্জাতেও যেন ভেঙ্গে আসছে—'আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলেই কি বন্ধুকে ধরে রাখতে পারবেন? পেরেছেন কি এর আগে? মনে তো হয় না। আমিই প্রথম নই ওঁর জীবনে, ওঁকে দেখেই সেটা বোঝা যায়। পরেও পারবেন না ধরতে। কোনদিনই পারেন নি। আপনার চোখে জীবনকে জগৎকে দেখার মানুষ বেশী পাবেন না। শোধ নেবার জন্যে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন—আপনাকেই বেশী বাজবে। ভেবে দেখুন তো। সে জ্বালার সঙ্গে একটা গভীর অনুতাপেরও যোগ হবে, একটা প্রায়-অনাথা মেয়ের সামান্য সৌভাগ্যের আশাটুকুও নষ্ট ক'রে দেবার জন্যে। কেন, কেন এ কাজ করতে চাইছেন? আপনার মনের মতো বন্ধু আপনি জীবনেও পাবেন না। আপনিই যে সৃষ্টিছাড়া মানুষ, সেটা বোঝেন না কেন? আকাশের দিকে চেয়ে মাটির পথে হাঁটলে বারবারই খানায় পড়তে হয়, পা ভাঙ্গে। এ তো ছোটবেলাতেই পড়েছেন নিশ্চয়, তার মানেটা বোঝেন নি? এসব গল্পই শিশুদের পড়ানো হয় জীবনের পথে ভুল যাতে না করে—এই জন্যে। তাই না?'

আবার সেই অস্বস্তিকর মনে তুফান তোলা নীরবতা।

উত্তর দেবার সামর্থ্য নেই। বক্তব্য খুঁজে পাওয়া, বলার মতো ক'রে গুছিয়ে নেওয়া মনে মনে—সে শক্তি বুঝি আজ একেবারেই চলে গেছে।

ভেতরে সরস্বতী জীবনবাবুকে কি বলছে। বোধহয় এরা কোথায় গেল, বিনু না বলেই চলে গেল কিনা—এই ধরনের আলোচনা।

অনেকক্ষণ পরে বিনু কথা কইল। কইতে পারল।

সাধারণত সর্বনাশ কথাটা যেভাবে ব্যবহার করা হয়—তেমন নয়, জীবনের সবচেয়ে প্রিয় কোন বস্তু হারালে সবচেয়ে বড় আশা ভেঙে গেলে গলা দিয়ে যেমন স্বর বেরোয়—কান্নায় ভেঙে পড়া ফিসফিসে গলা—প্রায় তেমনিভাবে চুপি-চুপি বলল, 'না, আমিও পড়েছি কিন্তু, মানে বুঝি নি; হয়ত এর পরেও এ শিক্ষা কাজে লাগবে না। যে সাধ ক'রে পথ ভোলে তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যাকে মরণ দশায় ধরে সে যে শতবার করে মরে" আমারও এ সেই মরণদশা। তবে এ চেষ্টা আর করব না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। ললিত তোমাকে বিয়ে করবে কিনা তা জানি না—কিন্তু আমার তরফ থেকে আর কোন বাধা আসবে না, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি। তবে একটা কথা তুমি ভেবে দ্যাখো নি, অথচ তোমার জানার কথা—তোমার-মতো সহজবুদ্ধির মেয়ে—এই বয়সেই সংসারকে যে এমন চিনেছে, সে সংসার-সুখ বড় একটা পায় না। আর পেলেও—জীবনে বেহিসেবী ভালবাসারও একটা পরম স্বাদ আছে, সেটা

তুমি কোনদিনই পাবে না।...তা হোক তোমার ওপর আজ সত্যিই শ্রদ্ধা হ'ল। বাঙালীর ঘরে এত পরিষ্কার বুদ্ধি আর পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি দেখা যায় না। কে জানে, মনের গড়নটা অস্বাভাবিক না হলে ভালও বাসতে পারতুম হয়ত।...আচ্ছা, আসি—। তুমি সুখী হও, নিশ্চিন্ত হও, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই জানাচ্ছি।'

বলতে বলতেই সে সদর দোরের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে।

মায়া প্রায় ছুটে এসেই পথ আগলে দাঁড়াল। বলল, 'না, না, ছি! মাসীমাদের একবার বলে যাও। তুমি তো আর আসবে না কোন দিনই, সে তো বুঝতেই পারছি—আমি চলে না যাওয়া পর্যন্ত। যা হোক একটা কিছু মিথ্যে ক'রেই বলে যাও—বিদেশে যেতে হচ্ছে হঠাৎ, বা এমনি কিছু। আর—'

আরটা কি বলা হল না।

অকস্মাৎ সে গলায় আঁচল দিয়ে সেই অন্ধকার চলনের ওপরই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। প্রণাম করাটাও যেন তার নিজস্ব নিয়মমাফিক। হাতে ক'রে পায়ের ধুলো নিল না, সে জুতো সুদ্ধ পায়ের খাঁজে মাথা ও মুখ চেপে ধরল। —বিনুকে কিছু বলার বা বাধা দেবার অবকাশ মাত্র না দিয়ে।

॥ ৫৪ ॥

একটু একটু ক'রে খ্যাতি বাড়ছে, সেই সঙ্গে আয়ও। যুদ্ধের প্রথম দিকে মনে হয়েছিল বুঝি বই বিক্রীই বন্ধ হয়ে যাবে, পরে এমন অবস্থা দাঁড়াল—কোনমতে বই ছাপাতে পারলেই বিক্রী হয়ে যায়। যে লেখকদের আগেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, বা যারা এখন সামনে আসছেন একটু একটু ক'রে—তাদের বইয়ের চাহিদা সমস্ত কল্পনাকে অতিক্রম করছে। অন্তত বাংলা বইয়ের ইতিহাসে এমন আর কখনও দেখা যায় নি।

বিনুর এখন আর বাড়ি-জমির দালালী বা ঐ শ্রেণীর উঞ্ছবৃত্তির দরকার হয় না। লিখেই যথেষ্ট টাকা পায়। পাঠ্য-পুস্তক (বেনামেই বেশী) লেখার কাজটা ছাড়ে নি—তার কারণ আজকাল ও কাজের পারিশ্রমিক বেড়ে গেছে অনেক—বিস্ময়কর বলা চলে,—এতাবৎ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। যেটুকু প্রতিষ্ঠা একবছরে হয়েছে—মনে হয় অন্নচিন্তায় আর খুব বিব্রত হতে হবে না, যদি না শরীর কোন কারণে ভেঙে যায়। এখনই লোকে তাকে অভিনন্দন জানায়, নবীন লেখকরা ঈর্ষা করে।

তবে এ সাফল্য একান্তই বহিরঙ্গ। যশ খ্যাতি অর্থ যত বাড়ছে মনের শূন্যতা যেন পাল্লা দিয়েই তত বেড়ে যাচ্ছে; কিছুই ভাল লাগে না, একটি অন্তরঙ্গ মনের মানুষ কই—যার সঙ্গে এ সাফল্যের কথা আলোচনা করা যায়? —যে এর মর্ম বুঝবে, আনন্দিত হবে!

সব চেয়ে ক্ষতি হয়েছে ওর মায়ালতার কথাগুলোতেই। বন্ধু পায় নি সেটা বড় কথা নয়—আগের মতো একান্ত আপন একাত্ম, একটি বন্ধুর স্বপ্নও দেখতে পারে না সে আর। মনে মনে যে আশা ও কল্পনার প্রাসাদ গড়ে সেখানেই আশ্রয় নিত—সে প্রাসাদ আর গড়া যায় না, চিন্তামাত্রেই কে যেন তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ

ক'রে ওঠে। সে কল্পনা ও স্বপ্নের মুলসুদ্ধ নষ্ট ক'রে দিয়েছে মায়া গুটিকতক নির্ঘাৎ সত্য ভাষণে।

তার মনের মতো বন্ধু আর পাবে না সে। এ পৃথিবীতে এ সংসারে পাওয়া সম্ভব নয়।

মিথ্যা কোন সান্ত্বনাতেও মনের আকৃতিকে কল্পনায় রূপ দেওয়া চলবে না।

এতকালের অবলম্বন ভেঙে চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—আশ্রয় বলতে আর কোথাও কিছু নেই।

জনাকীর্ণ এই বিজন অরণ্যে সে একা। সম্পূর্ণ একা।

মায়া সত্যিই ললিতকে আয়ত্ত করেছে। কথা দেবার সময় হয়ত এ পরিণতি ভাবে নি ললিত—কিন্তু সেই কথাই তাকে রাখতে হয়েছে। কী ক'রে কি করল তা জানে না বিনু—তবে এটা একদিনেই বুঝেছে, এ মেয়ের প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির কাছে কোন কিছুই অসাধ্য নয়। সত্যি সত্যিই দাদার বিয়ের আগে ললিত বিয়ে করেছে। দাদা প্রসন্ন মনেই ভাদ্রবৌকে গ্রহণ করেছে, মায়ার ভরসাতেই ওরা দু ভাই একটা আলাদা ছোট বাড়িও ভাড়া করেছে। বাবা বৈমাত্র ভাই-বোনরা আসা-যাওয়া করে, অর্থাৎ অসম্ভাব কিছু নেই। স্থানাভাবের অজুহাতেই ওরা পৃথক হয়েছে।

ললিতের দাদা মায়ার আদর-যত্নে মুগ্ধ। ললিতের অপ্রতুল আয়ের কথা ভেবেই নিশ্চয় মায়া এই ব্যবস্থা করিয়েছে। নিজের ইচ্ছায় অপরকে তার অজ্ঞাতসারে চালিত করার শক্তি মেয়েদের অসাধারণ, সে স্বভাবজ অস্ত্র দিয়েই বিধাতা ওদের পাঠিয়েছেন। কেউ কেউ সে অস্ত্র ব্যবহারের পদ্ধতিটা তত জানে না—কেউ বা সে অস্ত্রে একটু বেশী অভ্যস্ত। তবে এখন একটা বাঁধা, আয়ত্ত হয়েছে ললিতের, একটা সাপ্তাহিক কাগজে সহ-সম্পাদকের চাকরি। বিকেল চারটে থেকে রাত নটা পর্যন্ত সে কাজ। নিজের লেখার বা ডিজাইন আঁকার যথেষ্ট সময় হাতে থাকে। এ কাগজেও সে কিছু রচনা চিত্রিত বা বিজ্ঞাপনের নকসা আঁকে—তার জন্যে আলাদা টাকা পায়।

কে জানে এর মধ্যেও মায়ার কোন হাত আছে কিনা।

রাখালের কাছে যায় মধ্যে মধ্যে। সেও ওকে নিজের বাসায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তার একটি ছেলে হয়েছে এর মধ্যে। 'তাকে অন্তত একবার দেখবেন না।' রাখাল অনুযোগ করে। কিন্তু বিনু আর যায় নি ওদের বাড়ি। নবজাতকের 'পয়ে' অথবা বোমার সময় প্রাণ দিয়ে আপিস আগলাবার পুরস্কার হিসেবে—তার মাইনে অনেক বেড়েছে এখন। ঠিক বড়বাবু না হলেও অনায়াসে ওকে মেজবাবু বা হবু বড়বাবু বলা চলে।

রাখাল বেশ ঘটা ক'রেই ছেলের ভাত দিয়েছিল। তাতেও বিনু যায় নি। সেজন্যেও রাখাল অনেক দুঃখ করেছে, বাড়িতে এসে বিস্তর মিষ্টি পেঁছে দিয়ে গেছে। বলেছে, 'আপনি যান নি বলে সেদিন আপনার টিয়া মুখে একটু জল পর্যন্ত দেয় নি।'

মন খারাপ এমনিতেই, এ উৎসবে যেতে পারল না, ছেলেটাকে কোলে করতে পারল না বলে—এমন মাঝে মাঝেই হয়—তবু গলার জোর দিয়েই বলেছিল,

'আমার টিয়া বলেই আর যাবো না রাখালবাবু, নইলে যেতুম। হয়ত আরও বুড়ো হলে একদিন যাবোও।'

অর্থাৎ কেউ কোথাও নেই ওর আজ।

অথচ অনেকেই আছে চারিদিকে। বৃত্তি-ব্যবসায়-সংক্রান্ত লোক। বন্ধুরও অভাব নেই। বলতে গেলে দিন-রাতই লোকের মধ্যে থাকে। লোকের মধ্যে আর কথার মধ্যে। কিন্তু এ সব কথাই ভীষ্মের বর্মে প্রতিহত শিখণ্ডীর শরের মতো, অর্জুনের বাণের মতো মর্মে পৌঁছয় না। তীব্র আঘাতে বিচলিত হওয়াও মনে হয় প্রাণের লক্ষণ। সে আঘাত করারও কেউ নেই। ঐ কথাটাই আজকাল বেশী মনে হয়, এর চেয়ে মর্মান্তিক আঘাত পাওয়াও ভাল। অন্তরঙ্গ কোন লোক ছাড়া তার আচরণ তীব্র আঘাত দিতে পারে না।

একদিন এক প্রকাশক, সূর্যবাবু, বলেছিলেন, 'যাই বলুন মশাই, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মাঝে মাঝে ঝগড়া না হলে আর দাম্পত্যজীবন কি! ঝগড়া হয়ে কদিন কথাবার্তা বন্ধ থাকবে, বৌ উপোস করে থাকবে দু দিন—তবেই তো নতুন ক'রে পাবার আনন্দ, পুনর্মিলনে নবমিলনের সুখ অনুভব করব।'

কথাটা বোধহয় একেবারে মিথ্যে নয়।

বন্ধু-বান্ধব বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সম্পাদক, প্রকাশক সকলেরই এক কথা, 'এইবার একটা বিয়ে করুন। আর কি মশাই, ঢের তো বয়েস হয়ে গেল। এরপর যে গায়ে গন্ধ ছেড়ে যাবে।'

মা তো বলেনই। তিনি অনেক বলে, ফল না হওয়াতে রাগ ক'রে তীর্থবাস ধরেছেন একাই। বৃন্দাবনে না হয় পুরীতে আজকাল বেশির ভাগ সময় থাকেন। দাদা বৌদির সংসার, ওর অনিয়মিত আসা-যাওয়ায় তাঁদের অসুবিধে হয়। তাছাড়া কতকাল আর একটা লোকের দায়িত্ব বহন করবেন বৌদি। তিনি বিরক্ত হন, সে বিরক্তি খুব একটা গোপন করারও চেষ্টা করেন না। ওর জন্যে বাপের বাড়ি গিয়ে দু-এক মাস জিরোবেন সে উপায় নেই, দাদা স্বচ্ছন্দে দুপুরে আপিসে রাত্রে শ্বশুরবাড়ি খেয়ে নিতে পারেন, ওকে নিয়েই হয়েছে বিপদ। একদিনের জন্যেও কোথাও যেতে হলে ওর একটা ব্যবস্থা ক'রে যেতে হয়।

তাঁরা আর এখানে থাকতেও চান না। কলকাতায় আপিসের কাছাকাছি একটা বাড়ি কি একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতে চান। সে কথা ব্যর্থহীন ভাষায় তাকে বলেও দিয়েছেন তাঁরা। বিনু বলেছে, 'বেশ তো তোমরা যাও না। আমি পারি একটা কম্‌বাইন্ড হ্যান্ড রেখে চালাব না হয় কোন মেসটেস খুঁজে নেব। অমন অনেক লেখকই মেসে থাকেন। শ্যামাশংকরবাবু থাকতেন শিবসত্যবাবু এখনও থাকেন।'

সেটাও ঠিক দাদার পছন্দ হয় না। ভাইকে একেবারে ভাসিয়ে যেতে মন চায় না। তিনিও তাই বিয়ের জন্যেই পেড়াপীড়ি করেন, 'দেরিই বা করছ কেন? আর এখন বিয়েতে ভয়টা কি? বিয়ে তো সবাই করে। তোমার এখন যা আয় দেখছি তাতে কি আর সংসার চলাতে পারবে না? যদি কখনও কোন প্রয়োজন হয়—আমি তো আছি। সংসার-ধর্ম কথায় বলে। বয়স হলে

একটা সঙ্গিনী মানুষের দরকারও। আমি তো বিয়ে করেছি। বিয়ে করতে ভয়টা কিসের?'

ভয়টা যে কিসের সেটাই ঠিক বোঝাতে পারে না।

হয়ত নিজেও বোঝে না।

একটা আকারহীন অকারণ ভয়।

মায়ালতার কথাগুলোই মনে পড়ে। 'আপনিই যে সৃষ্টিছাড়া মানুষ সেটা বোঝেন না কেন? আপনার মনের মতো বন্ধু জীবনেও পাবেন না।'

আরও বলেছিল, আকাশের দিকে চেয়ে মাটিতে হাঁটবার কথা। মাটির মানুষ মাটির দিকে তাকিয়েই জীবনের পথে চলা উচিত, অসম্ভব কিছু পাবার জন্যে আকাশের দিকে চোখ মেলে থেকে লাভ নেই। যা হয় না, যা সম্ভব নয় —তাকে ধরতে চাইলে পদে পদেই ঘা খেতে হবে।

সে যে সৃষ্টিছাড়া—সেই কথাটাই ঘুরে ফিরে মনে পড়ে। বন্ধু পাবে না। মাটির বন্ধু মাটিরই লোক হবে। স্বর্গের বস্তু হতে পারে না। বন্ধু যদি না পায়—সঙ্গীই কি পাবে। বন্ধুই যথার্থ সঙ্গী মানুষের স্ত্রীও তো সেই সঙ্গিনীই জীবনসঙ্গিনী। তবু বন্ধুর কাছ থেকে সরে আসা যায়, যে জীবন-সঙ্গিনী সে আমরণ সাথী। তাকে যদি সুখী করতে না পারে—নিজেও যদি না হয়?

সংসারী মন আলাদা জিনিস। সে মন অল্পে তুষ্ট হয়, সে মন ছেলেমেয়ে স্ত্রীর জন্যে কষ্ট করেই খুশী, ঘরকন্না, জীবনের ছোটছোট সুখ-দুঃখ —এই নিয়েই তাদের জীবন। সে মন কি ওর হবে কোন দিন? না হলে নিজে দুঃখ পাবে বড় কথা নয়—আর একটা মানুষের জীবন হয়ত নষ্ট হয়ে যাবে।

আরও একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে যায়। মীরাটে তার সঙ্গে আলাপ। কয়েকবার যেতে যেতে বেশ একটু আত্মীয়তার মতোও হয়ে যায় সে পরিবারের সঙ্গে। সে বলেছিল, 'আপনাকে শ্রদ্ধা করা যায়, স্নেহও করা যায়—কিন্তু ভালবাসা যায় না। কোথায় একটা কাঠিন্য আছে আপনার মধ্যে যা ভালবাসতে দেয় না।'

অথচ সংসার না ক'রে তার মধ্যে সংসারী মন আছে কিনা কেমন ক'রে বুঝবেই বা। সবাই তো করে। প্রায় সব বড় বড় শিল্পী লেখকই তো একাজ করেছেন। অবশ্য কেউই প্রায় তাঁদের মধ্যে স্ত্রীকে দিয়ে শান্তি পাননি, কিন্তু তেমন তো সাধারণ—ঘোরতর সংসারী—লোকের মধ্যেও অনেকে দেখেছে। ঘর করছে, ছেলেপুলেও হচ্ছে কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর প্রেমের সম্পর্ক-মাত্র নেই।

মনের মতো? সে তো স্ত্রী কেমন হবে ভাবে নি কোন দিন, সে জন্যে মাথাও ঘামায় নি। যা পাবে তাতেই সন্তুষ্ট হতে পারবে না কেন? নিত্যকারের জীবনে অত ভাবাবেগের স্থান নেই, অত উঁচু আশা রাখাও ঠিক নয়। হয়ত—যেমন মা দাদা বৌদির সঙ্গে ঘর করছে—তেমনিভাবেই মানিয়ে নিতে পারবে। কবির ভাষায় 'সে হবে আমার ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন

তুলব প্রতিদিন ব্যবহার করব।'

করবে নাকি বিয়ে ?

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন ?...লটপট করে জটা-জাল,...বৃষ রহি রহি গরজে—'

শিবও তো বিয়ে করেছিলেন। শ্মশানবাসী অহিমাল্য-শোভিত ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিত ভিখারী শিব, চির সন্ন্যাসী, অধিকাংশ সময়ই যিনি ধ্যান-মগ্ন আত্মসমাহিত, তিনি বিয়ে করেছেন রাজ-রাজেশ্বরী মহামায়াকে। সে স্ত্রীও তো ঐ ভাঙড়-ভোলাকে পেয়েই সুখী সৌভাগ্যবতী।

হয়ত বিনু না পারলেও সে পারবে—সেই নতুন মেয়েটি তাকে মানিয়ে নিতে। সে ক্ষমতা ওদের আছে।

এই সব কথা যখন ভাবে তখন উৎসাহিত উজ্জীবিত হয়ে ওঠে বৈকি। ভাবে দাদাকে বলবে মেয়ে দেখতে।

আবার কিছু পরেই মন সেই পুরাতন প্রশ্নেই ফিরে যায়।

বিয়ে করলেই কি সে সুখী হতে পারবে ?

এতদিনের শুষ্ক তৃষার্ত মরুভূমি কি তৃপ্ত, শান্ত, সঞ্জীবিত হবে ?

'শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে / অশান্তি যে আঘাত করে, তাই তো বীণা বাজে।'

এর চেয়ে সত্য বুঝি শিল্পীদের জীবনে কিছু নেই।

প্রেম ভালবাসা পূর্ণতার আস্বাদ পেল না বলেই বুঝি প্রেমের-গল্প-লেখক বলে তার খ্যাতি। আসলে যে ভালবাসা সে জীবনে পেল না, ঐকান্তিক ভালবাসা—লেখাতে তাই ফোটাতে চেষ্টা করে, প্রেমের চেহারাটা দেখার চেষ্টা করে, কল্পনার পাত্র-পাত্রীকে দিয়ে সাধ মেটায়।

অশান্ত অতৃপ্ত মন সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে পূর্ণতা লাভ করতে চায়।

কে জানে তার মধ্যেই বুঝি সুখী হবার মতো মানসিক গঠনের ন্যূনতা আছে। তার নিজের মধ্যেই আছে ব্যর্থতা শূন্যতা নিঃসঙ্গতা।

'আকুল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম/কস্তুরীমৃগ সম।...
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না...'

এ যেন তাকে দেখেই লিখেছেন কবি।

সুখী হতে চাইলেই সে ভুল করবে হয়ত।

অনেক দিন আগে সে কোথায় যেন পড়েছিল, এযুগের এক মহামনীষীর—আচার্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের একটা লেখা—

'No great literature can be produced unless men have the courage to be lonely in their minds, to be free in their thoughts and express whatever occurs to them !'

কে জানে তাকে দিয়ে মহৎ কোন সৃষ্টি করাবেন বলেই বিধাতা তাকে এমন নিঃসঙ্গ করেছেন কিনা, এমন সৃষ্টিছাড়া। বীণা বাজাবেন বলেই জীবনের সব

থেকে বড় অথচ সমান্য, একটি কামনা—যা পূর্ণ হলে পৃথিবীতে কারও কোন ক্ষতি হত না—তা থেকেও তাকে বঞ্চিত ক'রে আঘাত দিয়েছেন।

আবার যখন মনে হয়—এই ভাবেই কি জীবন কাটাবে? সৃষ্টি আছে ঠিকই, কিন্তু মানুষের জীবনও তো আছে।—তখন একটি কল্যাণী বধূমূর্তি পরিপূর্ণ সুধাপাত্র নিয়ে তার কাছে আসছে—সমস্ত রিক্ততা পূর্ণ করতে—সেই চিত্রটাই মনের সামনে ভেসে ওঠে, ওর মনই সেই ছবি এঁকে যায়।

আবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন শিউরে ওঠে, ও যদি না পারে তাকে তৃপ্ত করতে, পূর্ণ করতে—তাকে মানসিক সাহচর্য দিতে?…

কিছুই হয় না, মন স্থির করা হয়ে ওঠে না।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস কেটে যায়।

'লোনলি ইন হিজ মাইন্ড'—মনে মনে একান্ত নিঃসঙ্গ মানুষটি শুধু লিখেই যায়।

দেশে মানুষ বাড়ছে, দেশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল। আরও যাবে। চারিদিকে লোভ, অভাববোধ, অসূয়া, কলহ, বিবাদ, সীমাহীন অশান্তি। তারই মধ্যে সংখ্যাহীন মানুষের অজস্র সুখ-দুঃখের চিত্র রচনা ক'রে যায় সঙ্গীহীন মানস-বিজন-অরণ্যবাসী একটি শিল্পী—মহামনীষীর বাণীকে অবলম্বন ক'রে। সামান্য মানুষের অসামান্য জীবন-কথা, তাদের সুখ-দুঃখ আর অন্তহীন পিপাসার কাহিনী।

কে জানে সেসব রচনার কি পরিণতি বা পরিণাম। নিরবধি কালের কোন এক অনাগত দিনে সমানধর্মা কোন পাঠক তার মনের বেদনা, তার পূর্ণ হবার প্রচেষ্টা—ব্যর্থতা বা সার্থকতার রূপটা দেখতে পাবে কিনা।

— গ্রন্থ সমাপ্ত —

দহন ও দীপ্তি

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

করকমলেষু—

মন্তানীর পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিকের নানা মত। এক্ষেত্রে আমি আমার সুবিধাজনক অর্থাৎ রাও বাহাদুর পারসনিসের মতটিই গ্রহণ করেছি। রাও বাহাদুর বিখ্যাত ঐতিহাসিক, তাঁর মত কিছু অপ্রামাণ্যও নয়। ঐতিহাসিক ও ভারতীয় সিভিলিয়ান কিনকেডও এইটিকে সমধিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মেনে নিয়েছেন।

—লেখক

ভগবানও ভুল করেন বৈ কি? সাধারণ মানুষের ভুল একদিন শুধ্রে নেওয়া যায়, বড় জোর তা অল্প দু-চারজনের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তাদের সে ব্যাথা-বেদনা আঘাত সংঘাতের ইতিহাস হারিয়ে যায় তাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু ভগবানের ভুল এক একটা দেশ এক একটা জাতির জীবনে তার সাক্ষ্য রেখে যায়, সুদূর ও অনাগত ভবিষ্যৎ সে ভুলের পরিণাম বহন করে; মানুষের ইতিহাস থেকে মোছে না তার চিহ্ন।

বিশিষ্ট মানুষ যখন মর্ত্যভুমে আসে তখন সে সৃষ্টিকর্তার বিশেষ সনদ নিয়ে আসে। যে জননায়ক হবে, যে জাতির নেতা হবে, দেশের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজন করবে, ঘুরিয়ে দেবে জাতীয় জীবনের মোড়, তাকে তার কর্ম ও কীর্তির উপযুক্ত হাতিয়ার দিয়েই পাঠাতে হয়; তার চরিত্র, তার মেধা, তার বুদ্ধি, তার বীর্য ও শৌর্যই তার সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া বিশেষ সনদ, শানিত হাতিয়ার। আর এমন মানুষ যখন সৃষ্টি করেন বিধাতা তখন তার উপযুক্ত সঙ্গিনীও সৃষ্টি করেন। কিন্তু কখনও কখনও দৈবের যোগাযোগে সে সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলন ঘটে না, বিশ্ববিধাতার সামান্য অনবধানতায় যাদের মিলিত হবার কথা তারা পরস্পরের থেকে ছিট্‌কে চলে যায় কোথায় কোন্ দূরে, হয়ত এ জীবনে কোনদিন আর মিলতে পারে না, মিললেও সঙ্গিনী হিসেবে কাজে লাগে না, জীবনের জ্বালা আর ক্ষুধা আর হাহাকার বাড়িয়েই যায় শুধু। জীবনের সমস্যা জটিল থেকে জটিলতরই ক'রে তোলে সে মিলন। শুধু ঐ দুটি জীবনেই নয়—বহু লোকের জীবনে, জাতির ও জনতার জীবনে সে জটিলতার প্রতিঘাত জাগে।

ভগবানের এমনি ভুলেই মস্তিবাঈ ব্রাহ্মণের ঘরে না জন্মে জন্মাল ক্ষত্রিয় রাজা ছত্রশালের মুসলমানী উপপত্নীর ঘরে—পেশোয়া বাজীরাওয়ের ধর্মপত্নী না হয়ে হ'ল তাঁর উপপত্নী, রক্ষিতা। সহর্মমির্নী হয়েও সহধর্মিনী হ'তে পারল না, পুরুষসিংহের যোগ্যা জীবনসঙ্গিনী হয়েও অর্ধাঙ্গিনী হ'তে পারল না, আর তার ফলে বিপুল সম্ভাবনাময় এক জীবন অকালে নষ্ট হয়ে গেল, অসাধারণ এক নারী ধিক্কার ও কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে স্বেচ্ছায় নিজের ভবিষ্যতে যবনিকা টেনে দিল।

তা না হলে—কে জানে আজ ভারতের ইতিহাস কী ভাবে লিখিত হ'ত। কে জানে, 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' হয়ত দিবাস্বপ্নে পরিণত হ'ত না। কিন্তু তা হ'ল না। হ'ল যা তা শুধু অনেকগুলি জীবন নিয়ে এক বিপুল ট্র্যাজেডি; অনেকগুলি ব্যর্থতার এক অসার্থক ইতিহাস রচিত হ'ল শুধু।

কারণ, বিধাতার সামান্য একটু ভুল।

॥ ২ ॥

অপমানে চোখ-মুখ রাঙা হয়ে উঠল রাজা ছত্রসালের ; দুদিকে দাঁড়ানো তাঁর দুই ছেলের হাত, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই খুব সম্ভব, একবার নিজেদের কটিদেশে কোষবদ্ধ তরবারি পর্যন্ত পেঁছে ফিরে এলো—শক্তিহীন কাপুরুষতায় নয়, উপায়হীন অসহায়তায় ; সেনা-নায়ক অভয় সিং রাজসভার আদবকায়দা ভুলে গিয়ে অসহিষ্ণুভাবে একবার পা ঠুকলেন এবং প্রবীণ অমাত্য মাথা হেঁট ক'রে বোধ করি বা এতদিন পরে নিজের দুটি পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিরীক্ষণেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এঁদের মধ্যে সব চেয়ে সংকটজনক অবস্থা দুই রাজকুমারেরই। তাঁরা বীর যোদ্ধা, বীরের বংশধর। তাঁদের ধমনীর রক্ত তাঁদের অপমান-অসহিষ্ণু হ'তেই শিক্ষা দিয়েছে চিরকাল—শিক্ষা দিয়েছে নিজের প্রাণ দিয়েও অপমানের বিশেষত পিতৃ-অপমানের শোধ নিতে। কিন্তু প্রাণের চেয়েও বড় কোন কোন জিনিস আছে এ সংসারে। তার মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হ'ল মান। এই লোকটি—যে এইমাত্র এতগুলি লোকের সামনে তাঁদের পিতাকে অপমান করল—সে তাঁদের, তাঁদের পিতার, তাঁদের বংশের মান রক্ষা করেছে। প্রবলের অকারণ অত্যাচারের হাত থেকে তাঁদের সকলকে উদ্ধার করেছে। যে রাজ্যখণ্ডের এক তৃতীয়াংশ তাঁদের পিতা এই ব্যক্তিকে দান করেছেন বলে তাঁদের মনের মধ্যে একটা গোপন ও প্রতিকারহীন ক্ষোভ জন্মেছে—সে রাজ্যখণ্ড বস্তুত ইনি স্বীয় শৌর্যে জয় ক'রে নিয়ে তাঁদের দানই করেছেন।

আর শুধুই কি মান, প্রাণও তো দিয়েছেন—তাঁদের, তাঁদের পিতার, এমন কি তাঁদের সন্তানদেরও—সে কথাই বা অস্বীকার করা যায় কী করে? মহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশ—স্বেচ্ছাদত্ত উপাধি যার গজনফর জঙ্গ—তার হাতে তাঁরা তো বন্দীই হয়েছিলেন সকলে। তখনই নিহত হবার কথা, শুধু গজনফর জঙ্গের অতিরিক্ত লোভই তাঁদের বন্দীদশা বিলম্বিত করেছিল। কী মূল্যে এতগুলি প্রাণ বেচতে পারেন সেইটেই যাচাই ক'রে দেখছিলেন গজনফর জঙ্গ। বাদশা মহম্মদ শা যদি একটু ত্বরা করতেন তাহলে পেশোয়া বাজীরাও-এরও সাধ্যের অতীত হয়ে পড়ত তাঁদের বাঁচানো। সে সুযোগই পেতেন না তিনি।

সে হয়ত ভাগ্যেরই ফল—তবু পেশোয়া বাজীরাও যে সেই ভাগ্যেরই দূত হিসাবে এসেছিলেন সে কথা ভুললে তাদের ধমনীর রাজপুত রক্ত, ক্ষত্র রক্তকেই অস্বীকার করা হবে যে! চারিদিকে অন্ধকার দেখে রাজা ছত্রসাল বুন্দেলা গোপনে স্বীয় বন্দীদশা থেকে তাঁকে যে দুই ছত্র চিঠি পাঠান সে চিঠিও দেখেছেন রাজকুমাররা। একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গিয়েছিল হয়ত—সেটা আজ মনে হচ্ছে কিন্তু সেদিন মনে হয় নি। বিপুল বিস্তীর্ণ ভু-সম্পত্তি, সিংহাসন, রাজ-ঐশ্বর্য সবই যেতে বসেছিল সেদিন—গিয়েই তো ছিল কার্যত—তার সঙ্গে এতগুলি প্রাণ ; স্বর্গত রাজা চম্পৎ রায় বুন্দেলার বংশই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত—

যদি বাজীরাও না এগিয়ে আসতেন। চিঠি যখন পাঠানো হয় তখন ও'দের চরম আপৎকাল—তখন তো কিছুই বাড়াবাড়ি বলে মনে হবার কথা নয়—তারপরেও হয় নি। প্রাণ মান সিংহাসন—এতগুলি যিনি তাঁদের দান করেছেন, যে রাজ্যখণ্ড অনায়াসে নিজেই রেখে দিতে পারতেন, অন্তত আশ্রিত বা করদ-রাজ্য হিসাবে স্বীকার করিয়ে নিতে পারতেন—সেই রাজ্য বিনাশর্তেই যে বিজয়ী দিয়ে দেয়—বর্তমান কালের লোভ-লোলুপতা-উদগ্রলালসার দিনে সে লোক নারায়ণ ছাড়া কি?

হ্যাঁ—নারায়ণই বলেছিলেন বাজীরাওকে রাজা ছত্রসাল বুন্দেলা। পুরা-কালে যেমন অভিশপ্ত গজেন্দ্রকে উদ্ধার করবার জন্য* নারায়ণ আবির্ভূত হয়ে-ছিলেন সেই ভাবেই বাজীরাওকে এই সংকটকালে আবির্ভূত হবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন রাজা ছত্রসাল। লিখে পাঠিয়েছিলেন:

"যো গত গ্রহ গজেন্দ্র কী, সো গত ভাই হে আজ।
বাজী যাত্ বুন্দেলাংকী রাখো বাজী লাজ॥"

অর্থাৎ "পুরাকালে গজেন্দ্রর যে অবস্থা হয়েছিল—আজ আমারও সেই অবস্থা। বুন্দেলার বিজয় গৌরব আজ যেতে বসেছে, হে বাজীরাও, তুমি তার লজ্জা নিবারণ করো।"

তা নারায়ণের সঙ্গে উপমা করা কিছু অন্যায়ও হয় নি ছত্রসালের। ঐ দুটি ছত্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদিন ত্রাণ-কর্তা বিষ্ণুর মতোই এসে পড়েছিলেন তরুণ পেশোয়া। বহু কষ্ট স্বীকার ক'রে বহু বিপদ তুচ্ছ ক'রে উদ্ধার করে-ছিলেন ওদের প্রাণ, ওদের সিংহাসন—ওদের ইজ্জৎ। এবং বিনা শর্তেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই রাজ্যাধিকার, যার সবটাই তিনি রাখতে পারতেন—অন্তত তার ওপর খানিকটা অধিকার কায়েম করতে পারতেন।

সেদিন সে জয়লাভ খুব সহজসাধ্য ছিল না। বাজীরাও অনেকখানিই ঝুঁকি নিয়েছিলেন। মহম্মদ খাঁ এমনভাবে নিজের শক্তি সুদৃঢ় করেছিলেন, ওদের কারাজাত ক'রে এমন ভাবেই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে আত্মরক্ষার জন্য প্রথমটা তেমন কোন চেষ্টাও করেন নি। মহম্মদ শাহু বাদশাও সময় থাকতে কোন সাহায্য পাঠানো উচিত বিবেচনা করেন নি। তিনি যেন এটাকে স্বাভাবিক, তাঁর প্রাপ্য বিজয় বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত মহম্মদ খাঁর স্ত্রী ও পুত্রের প্রাণপণ চেষ্টায় মহম্মদ খাঁর প্রাণটা যখন রক্ষা হ'ল, বাদশা তখন বিরক্ত হয়ে ও'কে বরখাস্তই ক'রে দিলেন, কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখালেন না।

সুতরাং খুব সহজ ছিল না, খুব সহজ হয় নি বাজীরাও-এর—তাঁদের উদ্ধার করা।

অবশ্য এতটার জন্য যেমন প্রস্তুত ছিলেন না ছত্রসাল—এতখানি উদারতা ও মহানুভবতার জন্য—তেমনি তিনিও কিছুমাত্র পিছিয়ে আসেন নি তার মূল্য

---

* দাক্ষিণাত্যে ও মধ্যভারতে এই বিচিত্র পৌরাণিক কাহিনীটির প্রভাব খুব বেশী। যেখানেই নারায়ণ বা বিষ্ণুমূর্তি আছে সেখানেই একদিন তাঁর গজোদ্ধার বেশের ব্যবস্থা করা হয়। মাঘী পূর্ণিমার দিন পুরীতে জগন্নাথদেবের ঐ বেশ হয়।

দিতে, নিজের ঋণ স্বীকার করতে। তরুণ বাজীরাওকে পুত্র বলে, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পুত্র বলে বুকে টেনে নিয়েছিলেন, সর্বসমক্ষে তাঁর দুই প্রিয় পুত্র হৃদয় শা ও জগৎরাজের সঙ্গে সমান ভাগ ক'রে এক তৃতীয়াংশ রাজ্য দান করেছিলেন। সে বড় কমও নয়—সাগর, কালপী, ঝাঁসী, সিরোঞ্জ, হারাদ বা হৃদয়নগর—ভাল ভাল জায়গাগুলি দিয়েছিলেন বাজীরাওকে।

সে দান মাথা পেতেই নিয়েছেন বাজীরাও। পিতা বলে সম্বোধনও করেছেন রাজা ছত্রসালকে। সবিনয়ে, রাজার পিছনে পিছনে তাঁর অন্য পুত্রদের সঙ্গে বিজয় শোভাযাত্রার অংশ হিসেবেই সসৈন্যে ও সপার্ষদ আজ রাজধানী পান্নায় প্রবেশ করেছেন,—দরবার কক্ষে তিনিই প্রথম রাজাকে প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কৈ, কোথাও তো তার মধ্যে এতটুকু বেসুর বাজে নি।

তবে ? তবে এমন কেন হ'ল ?

এতদিন ও এতক্ষণ ধরে সর্বদিক বজায় রাখার পর এ কী ক'রে বসলেন বাজীরাও ! হঠাৎ এমন সাংঘাতিক অপমান করে বসলেন রাজাকে ! আর ঠিক সেই মুহূর্তে—যখন তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দেখাতে উদ্যত হয়েছেন প্রবীণ রাজা ছত্রসাল বুন্দেলা !

প্রথম দরবার ভঙ্গ হবার পর বাজীরাওকে সসম্মানে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে অন্তঃপুরে নিয়ে এসেছেন ছত্রসাল। মধ্যাহ্ন ভোজনের আমন্ত্রণ। পান্নার রাজপ্রাসাদকে লোকে এমনিই ইন্দ্রভুবনের সঙ্গে তুলনা দেয়। সেই রাজপ্রাসাদেরও বিস্ময় এই দরবারী ভোজন-মহল। তার মধ্যে দুটি সুবর্ণমণ্ডিত আসনের সামনে সোনার চৌকিতে পাশাপাশি দুটি লোকের আহার্য সাজানো। উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃতে প্রস্তুত রাজভোগ। রাজার নিজস্ব সুপকার কর্তৃক প্রস্তুত। দুটি মাত্র লোকেরই ব্যবস্থা। বাকী যাঁরা, তাঁরা এই জায়গার এক ধাপ নিচে বসবেন। তাঁদেরও অন্নব্যঞ্জন সাজানো হয়েছে। এঁরা বসলে তাঁরা গিয়ে নিজেদের আসন পরিগ্রহণ করবেন। এখানে তাঁদের বসবার অধিকার নেই। কোন দিনই এখানে আর কেউ বসে না, শুধু আজই দুজনের মতো ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পান্নার রাজপ্রাসাদের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। রাজা এখানে একক, স্বতন্ত্র। ঈশ্বরের মতোই একক। ঈশ্বরের মতোই সর্ব ঊর্ধ্বে। কখনও কোনদিনই কেউ তাঁর পাশে বসে খায় না। যত সম্মানিত অতিথিই হোক না কেন একটু ব্যবধান থাকেই। রাণীদের তো এখানে প্রবেশাধিকারই নেই। এ দরবারী ভোজকক্ষ বিশেষ বিশেষ দিনে ব্যবহার করা হয় শুধু। রাজা যেদিন অন্তঃপুরে নিভৃতে আহার করেন—সেদিন রানীরা সামনে উপস্থিত থাকতে পারেন, মাত্র ব্যজনকারিণী বা তদ্বিরকারিণী হিসাবে—রাজার সঙ্গে বসে খাওয়ার কথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না।

কিন্তু এতদিনের ঐতিহ্য ভাঙ্গা হ'ল যাঁর জন্য—তিনি এ সম্মানের অভাবনীয়তায় অভিভূত হওয়া তো দূরের কথা, সে সম্মান রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। একবার এক নজর মাত্র চারদিক দেখে নিয়েই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে

গেছেন, তারপর মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে ধীরে ধীরে অথচ বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন, 'ক্ষমা করবেন মহারাজ, আপনার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে আমি খেতে পারব না। শুনেছি আপনার মুসলমানী উপপত্নী আছে, কখনও কখনও আপনি তার মহলে বসে পান-ভোজনও করেন। আমি ব্রাহ্মণ, ভগবান গণপতির সেবক—রণে বনে দুর্গমে কখনও ত্রিসন্ধ্যা পালনে ত্রুটি করি নি, আমি আপনার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে ঐ আহার্য আমার ইষ্টকে নিবেদন করলে ভগবান গণপতি রুষ্ট হবেন—সমাজে আমার দুর্নাম হবে। আমি রাজার অমাত্য, দেশের শাসক—দেশবাসীরা আমাকে জাতীয় নেতা বলে মনে করেন। আমি স্বধর্ম ও আচার-বিচ্যুত হ'লে তাঁরা আমাকে হীন-চক্ষে দেখবেন। আপনি বসুন, আপনার সম্মানরক্ষার্থ আমিও আপনার পাশে বসছি, কিন্তু দয়া ক'রে ও অন্ন আমাকে গ্রহণ করতে বলবেন না।'

অনেকক্ষণ দেরি লাগল এই আঘাত সামলে উঠতে। অশীতিপর রাজা ছত্রসালের আরক্ত মুখে দেখতে দেখতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম জমে উঠল, রাজকুমাররা অধীরভাবে নিজেদের ঠোঁট নিজেরা কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুললেন, উপস্থিত কোন ব্যক্তিই এ রূঢ় অসৌজন্য বরদাস্ত করতে পারলেন বলে মনে হ'ল না। চারদিকেই আরক্ত মুখ, উত্তেজিত দৃষ্টি। একে অতিথি তায় মহা-উপকারী ত্রাণকর্তা, নইলে পেশোয়া বাজীরাও যতই শক্তিশালী হোন না কেন আজ অক্ষত-দেহে এখান থেকে ফেরা সম্ভব হ'ত না।

কিন্তু দেখা গেল রাজা ছত্রসাল বুন্দেলা বৃথাই এই দীর্ঘকাল রাজনীতি নিয়ে চর্চা করেন নি বা বৃথাই বাদশা আলমগীরের সঙ্গে দেশে দেশে লড়াই ক'রে বেড়ান নি। তাঁর নিজের স্নায়ুর ওপর দখল অপরিসীম, আত্মদমনের ক্ষমতা অত্যাশ্চর্য। উপস্থিত সকলে তার ওপর যে এই অপমানের প্রতিক্রিয়া আশঙ্কা করেছিল তার কিছুই হ'ল না। তিনি অসহ্য ক্রোধে ফেটে পড়লেন না, বা একটি কঠিন বাক্যও উচ্চারণ করলেন না; এই অকারণ অপমানের উত্তরে অতিথিকে অধিকতর অপমানিত করবারও চেষ্টা করলেন না। তাঁর গৌরবর্ণ মুখে সে রক্তোচ্ছ্বাস যেমন এসেছিল তেমনিই মিলিয়ে গেল। সে জায়গায় ফুটে উঠল অতি মধুর একটি রহস্যময় হাসি।

হেসেই বললেন রাজা ছত্রসাল বুন্দেলা, 'আমারই অন্যায় হয়েছিল বৎস, তোমাকে আগে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল আমার। কিন্তু এই মধ্যাহ্নে অভুক্ত ফিরে যাবে—। তা আমার তো এখানে দেববিগ্রহ আছেন, তার নিত্য সেবা ভোগ হয়। সেখানে যদি তোমাকে প্রসাদ দেবার ব্যবস্থা হয়—আপত্তি আছে কি?'

রাজার ধৈর্য ও সহ্যগুণে উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হলেন। এতটা তাঁরা সুদূর কল্পনাতেও আশা করেন নি। বিস্মিত হলেন পেশোয়া বাজীরাও নিজেও। তিনি এতগুলি আরক্ত উত্তেজিত ও বিদ্বিষ্ট দৃষ্টির সামনে উদ্ধত শির সোজা ক'রেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই সুমিষ্ট হাসির সামনে মাথা নামাতে

বাধ্য হলেন। একটু লজ্জিতও হলেন বোধ হয়। ঘাড় হেঁট ক'রে বললেন, 'সেখানে যাবার দরকার হবে না—যদি প্রসাদ দেন, এইখানেই আমি একটু দূরে বসছি। এক পংক্তি না হ'লেই হ'ল।'

'বেশ তো। সে তো আরও আনন্দের কথা।' প্রশান্ত মুখে রাজা উত্তর দিলেন।

সেই মতোই ব্যবস্থা করা হল।

রাজার ইঙ্গিতে আগেকার সাজানো খাদ্যসামগ্রী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। একটু দূরে—রাজা ও রাজপুত্রদের মাঝামাঝি নতুন ক'রে আসন পাতা হ'ল একটি। তারপর পূজারী ব্রাহ্মণ এসে পলাশ পাতায় সাজিয়ে দিয়ে গেল নানা রকমের পাকা প্রসাদ। বাজীরাও ওদিক থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে সে আসনে বসলেন।

এতক্ষণ সকলেই অন্নব্যঞ্জন সামনে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। অতিথি আসন পরিগ্রহ করতে তাঁরাও যে যার আসনে বসলেন। শুধু দেখা গেল যে ইতিমধ্যে এঁদের সকলকারই যেন আহারে রুচি চলে গিয়েছে। আহার্য নিয়ে নাড়াচাড়াই করলেন সকলে। শুধু ধীরে সুস্থে আহার করলেন পেশোয়া বাজীরাও এবং বর্ষীয়ান রাজা ছত্রসাল। এঁদের কোন রকম ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না।

আহারান্তে বিদায় নেবার সময় আর একবার মিষ্ট-মধুর হাসলেন ছত্রসাল। বললেন, 'বৎস তুমি তো ভক্ত মানুষ, আজ একবার সন্ধ্যার পর আমাদের মন্দিরে এসো না। আজ অনন্তচতুর্দশী—সন্ধ্যারতির পর ভজন গান হবে, কিছ কিছু নৃত্যাদির ব্যবস্থাও আছে। এলে খুশীই হবো।'

অতিথি ও উপকারীর প্রতি অসৌজন্য প্রকাশে বিরত থাকা এক জিনিস, আর অপমানকারীর প্রতি অকারণ সৌজন্য প্রকাশ করা অন্য জিনিস। এ আমন্ত্রণের কোনই হেতু ছিল না। রাজকুমার-সেনাপতি-অমাত্যের দল বিস্মিত হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, অদম্য উষ্মায় হৃদয় শার রগের শিরা দুটো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। জগৎরাজ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন।

কিন্তু বাজীরাও এসব কিছুই লক্ষ্য করলেন না। করবার কথাও নয়। হয়ত বা তখন তিনি নিজের রূঢ় আচরণের জন্য কিছুটা অনুতপ্তও হয়েছেন। তাই যে কোন রকমে হোক, তখন ছত্রসালের সামান্য একটু আনুগত্য দেখাতে পারলে বা প্রিয় আচরণ করতে পারলেও বেঁচে যান যেন। তিনি সাগ্রহে সম্মতি জানালেন, 'নিশ্চয় আসব। এ তো আনন্দের কথা।'

'বেশ, তবে তুমি এখন বিশ্রাম করগে যাও। যথাসময়ে আমার লোক গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসবে।'

তারপর—পাছে অন্য কোন কুটিল সংশয়ের বীজ কোথাও অঙ্কুর তোলে তাঁর পুত্রসম অতিথির মনের মধ্যে—বর্তমান কালের রাজনীতিতে এ ধরনের

বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস বিরলও নয়—তাড়াতাড়ি যোগ করলেন, 'তুমি একাই বা কেন, তোমার সঙ্গী সহচর বয়স্য বা সহকর্মীদেরও—যাদের আনতে চাও অনায়াসে আনতে পারো। আমার অমাত্য গিয়ে তাঁদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসবেন।'

'যে আজ্ঞে।' বলে মাথা নত ক'রে রাজাকে অভিনন্দন জানিয়ে চলে গেলেন তরুণ মারাঠী নেতা—পেশোয়া বাজীরাও।

॥ ৩ ॥

বিরাট মন্দির—সবটা জড়িয়ে। প্রকাণ্ড গর্ভদেউল বা মণিকোঠা ; তার সামনে প্রশস্ত ও বিস্তৃত বারান্দা। সেইটেই নাটমন্দিরের কাজ করে। কিন্তু সেখানে নিম্ন বর্ণের বা অহিন্দু দর্শকের ওঠা নিষিদ্ধ। তাই তার খানিকটা নিচে, কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে বিস্তৃততর ও প্রশস্ততর প্রাঙ্গণ। এইখানে দাঁড়িয়েই জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রজারা বিগ্রহ দর্শন করেন। আরতি বা শৃঙ্গার দেখার ঔৎসুক্য অহিন্দু প্রজাদেরও কম নয়।

আজ কিন্তু এখানে ঠিক আপামর সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। আজ ওপরের বারান্দা বা নাটমন্দিরে হয়েছে বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথিদের বসবার বন্দোবস্ত। গোটা নাটমন্দির জোড়া দুগ্ধ-শুভ্র ফরাসের ওপর ভেলভেটের কার্পেট বিছিয়ে তিনটি পৃথক শয্যা বা আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার একটিতে বসবেন মারাঠী অভ্যাগতরা, একটিতে বসবেন সপার্ষদ রাজা ছত্রসাল এবং মধ্যেরটিতে বসবেন বিখ্যাত ভজনগায়ক রামদাস ও তাঁর সঙ্গতীরা।

আর নিচের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ জুড়ে আর একটি বড় আসর পড়েছে। সে আসর দেখলেই বোঝা যায় যে শুধুই গীত নয়—কিছু কিছু নৃত্যেরও ব্যবস্থা আছে আজ। মাঝের প্রশস্ত শয্যাটির যত্নকৃত মসৃণতার দিকে চাইলে সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। তাছাড়া নাচের আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্রও সাজানো রয়েছে সে শয্যার এক কোণে। সেই বিশেষ শয্যার চারিপাশ ঘিরে আমন্ত্রিত বা রবাহুত বিশিষ্ট নাগরিকদের বসবার স্থান করা হয়েছে।

সন্ধ্যারতির পর আরম্ভ হ'ল ভজন। সুললিত কণ্ঠের ভক্তিতদ্গত নামগানে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হলেন। বাজীরাও যদিচ একাধারে কূট-রাজনীতিক এবং বীর যোদ্ধা—বয়সের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিমান ও বুদ্ধিমান—তবু তিনিও মনে-প্রাণে ভক্ত মানুষ। ভজন শুনতে শুনতে তাঁরও নিমীলিত নেত্র জলে ভরে আসতে লাগল বার বার।

তন্ময় হয়েই শুনছিলেন তাই লক্ষ্য করেন নি কখন নিচের আসরে শিল্পীরা এসে আসন পরিগ্রহণ করেছেন—শুরু হয়েছে নাচের আয়োজন। অকস্মাৎ একটি ভজনের সঙ্গে তালে তালে নূপুর বেজে উঠতেই চমক ভাঙ্গল তাঁর। অবাক হয়ে চোখ মেলে চেয়ে দেখলেন কখন ইতিমধ্যে একটি কিশোরী মেয়ে নাচতে শুরু করেছে।

বিস্মিত হয়েই চেয়ে দেখেছিলেন কিন্তু সে বিস্ময় কিছুই নয়। দেখার পর আরও অনেক বেশী বিস্মিত হলেন। চমকে উঠলেন একেবারে। আর সেই চমকের ঘোর তাঁর বিস্ফারিত দুই চোখ থেকে কাটতে চাইল না অনেকক্ষণ। ঐতিহাসিকরা বলেন সে বিস্ময় ইহজীবনেই কাটে নি আর।

যুবতী নর্তকী নয়, সাধারণ বাইজী বা বাজারের নাচওয়ালী তো নয়ই। এ নিতান্তই একটি কিশোরী মেয়ে। ফুলের মতো কোমল, পুষ্পদণ্ডের মতোই ভঙ্গুর। কোথাও কৃশতা বা অপূর্ণতা নেই দেহে—তবু কেমন যেন তন্বঙ্গী বলেই মনে হয়। ছিপছিপে নমনীয় দেহ, নৃত্যের যে কোন ভঙ্গিমায় সমস্ত দেহ ইচ্ছামতো বেঁকে চুরে যাচ্ছে—অস্থির কাঠিন্য বা মেদের বাহুল্য বাধা দিচ্ছে না কোন অবস্থাতেই।

মেয়েটিকে দেখে উষার কথাই মনে পড়ল পেশোয়া বাজীরাও-এর। লজ্জারুণারক্ত স্বর্ণজ্যোতিঃ উষা ছাড়া অন্য কোন উপমা মনে আসে না একে দেখে। তেমনিই এক সুবিপুল সম্ভাবনা এর মধ্যে নিষুপ্ত আছে যেন, তেমনিই দীপ্তি ও দহনের সম্ভাবনা। তেমনি একটি পবিত্র ভাবও মনে জাগে একে দেখে। এর ভজনতন্ময় ভক্তিতদ্গত মুখের দিকে চাইলে মনে হয় সাক্ষাৎ কিশোরী রাধাই নেমে এসেছেন, নৃত্যের ছলে তাঁর অন্তরের প্রেমার্ঘ্য নিবেদন করতে।

মুগ্ধ হয়ে গেলেন বাজীরাও। মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রইলেন ওর দিকে। চেয়েই রইলেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপলক চোখে।

মেয়েটি আপনমনেই নাচছিল, বিগ্রহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে। প্রণামের ভঙ্গীগুলির সময় চোখ দুটি অর্ধ-নিমীলিত হয়ে পড়ছিল শুধু। তারই মধ্যে হঠাৎ একসময়, যেন অদৃশ্য কোন অমোঘ আকর্ষণে চেয়ে দেখল বিশিষ্ট দর্শকদের দিকে, আর তারই মধ্যে রূপবান তরুণ পেশোয়ার চোখে চোখ পড়ে গেল।

বিধাতারই যোগাযোগ! অন্তত তাই বলতে হবে।

দুটি জোড়া চোখ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল যেন। কয়েকটি লহমার জন্য কোন চোখেই পলক পড়ল না। নৃত্যের তাল ভঙ্গ হ'ল, নর্তকী ভুলে গেল যতি সমের সূক্ষ্ম হিসাব, ভুলে গেল সামনের দেববিগ্রহ এবং পূজ্য নরপতিকে—এই বিরাট আসরের বিপুল জনতার কারুর কথাই মনে রইল না আর। স্থান কাল পাত্র সব ভুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে।

এই বে-আদপিতে বিস্মিত হয়ে থেমে গেল ক্রুদ্ধ সারেঙ্গী ও বিরক্ত তবলচী। বিস্মিত হয়ে গান থামালেন গায়ক রামদাস। সমস্ত দর্শকদের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন জাগল। শুধু সব চেয়ে যাঁর বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হবার কথা সেই রাজা ছত্রসাল বুন্দেলা স্মিত প্রসন্নমুখে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন অল্পবয়সী এই দুটি ছেলেমেয়ের কীর্তি।

একটু পরেই চমক ভাঙ্গল নাচিয়ে মেয়েটির। অস্ফুট একটা সলজ্জ উক্তি

ক'রে সামান্য জিভ কেটে নিজের দুই কানে হাত দিয়ে বোধ করি বা অপরাধ স্বীকার করল উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের কাছে। তারপরই আবার শুরু করল তার নাচ। আবার সারেঙ্গী তাঁর যন্ত্র তুলে নিলেন, আবার তবলচী তবলায় হাত দিলেন। রামদাসও তানপুরায় আঘাত করলেন আবার।

কিন্তু বাজীরাও-এর আর কোন বাহ্যজ্ঞান রইল না। তিনি সমস্ত আদবকায়দা, সমস্ত লোকলজ্জা, নিজের মর্যাদা সব ভুলে এক দৃষ্টে চেয়েই রইলেন মেয়েটির দিকে। চোখে যেন পলক পড়ে না, একটি নিমেষও হারায় না সে দৃষ্টি।...

এমনই আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন যে কখন গান থেমেছে, নর্তকী প্রণাম করে বসে পড়েছে—কিছুই খেয়াল করেন নি। একেবারে রাজা স্বয়ং সামনে এসে দাঁড়াতে, তাঁর অনুচর ও সঙ্গীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে পড়তে, খেয়াল হল তাঁর।

যেন অনিচ্ছাতেই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন পেশোয়া বাজীরাও। তারপর রীতিমাফিক সৌজন্য বিনিময়ের পর পেশোয়া তাঁর একান্ত-সচিবকে বিগ্রহের প্রণামী ও গায়ক বাদকদের উপযুক্ত পুরস্কার দেবার ইঙ্গিত ক'রে এগিয়ে নেমে গেলেন দু ধাপ, মেয়েটির দিকে। পরক্ষণেই বুঝি হুঁশ হ'ল তাঁর, রাজদরবারের ভব্যতার কথা মনে পড়ল। রাজার দিকে ফিরে বললেন, 'যদি অনুমতি করেন মহারাজ, নর্তকীকে আমি নিজের হাতে বকশিশ দিতে চাই। তাতে কোন দোষ হবে না তো?'

ততক্ষণে অনামিকা থেকে সুবৃহৎ হীরকাঙ্গুরীয়টি খুলে নিয়েছেন বাজীরাও।

অপাঙ্গে একবার সেদিকে চেয়ে নিয়ে মধুর আশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন রাজা, 'না না, দোষ হবে কেন? সাধারণ নর্তকী হ'লেও না হয় দোষ হ'ত—ও তো আমার কন্যা।'

'আপনার কন্যা!'

বিস্মিত বাজীরাও বিহ্বলকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ—ও যে মস্তানী, আমার মুসলমান উপপত্নীর গর্ভজাত কন্যা। কিন্তু হিন্দুদের দেবদেবীর কাহিনী, পুরাণাদি খুব ভাল ক'রে পড়েছে ও—এসব নাচে তাই ওর তুলনা নেই। কোন ভুলও হয় না।...মস্তানী, একটু এগিয়ে এসো মা, বৎস বাজীরাও তোমাকে পুরস্কার দিতে চাইছেন!'

বিহ্বল, যন্ত্রচালিতের মতোই হাতটা বাড়িয়ে আংটিটা ফেলে দিলেন বাজীরাও—স্থলকমলের মতো রক্তাভ সেই দুটি কোমল করপুটে।

চেয়ে দেখতেও পারলেন না, সুখে আনন্দে লজ্জায় মস্তানীর মুখে কী অপরূপ রক্তিমাভা ফুটে উঠল। কোন দিকেই যেন চাইতে পারছেন না আর তিনি। এক বিপুল লজ্জা যেন তাঁর মাথা তুলে চাইবার ক্ষমতাকে চিরকালের মতো গ্রাস করেছে।

অবশেষে একদা বাজীরাও-এর যাত্রার দিন ঘনিয়ে এল। স্বয়ং রাজা

ছত্রসাল তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে অতিথি মহলে এসে উপস্থিত হলেন।

অশ্রু-ছলছল চোখে গম্ভীর মুখে বাজীরাওয়ের কাঁধে দুটি হাত দিয়ে গাঢ় কণ্ঠে রাজা বললেন, 'পুত্র, তুমি আমার যা করেছ, সে তুলনায় কোন প্রতিদানই দেবার শক্তি আমার নেই। যদি বয়স থাকত, আরও অনেকদিন বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা থাকত তাহ'লে হয়ত চেষ্টা করতাম যে প্রাণ তুমি রক্ষা করেছ সেই প্রাণ দিয়েও তোমার কোন প্রত্যুপকার করার। যে রাজ্যখণ্ড তোমাকে দিয়েছি সে তো তোমারই কাছ থেকে পাওয়া। সুতরাং এই বিরাট কৃতজ্ঞতার ঋণ নিয়েই বোধ করি আমাকে যেতে হবে। শোধ করার কোন সুযোগই পাব না। তবু··· তোমাকে অনুরোধ, যদি এই শেষ মুহূর্তে কিছু চাইবার থাকে তোমার নিঃসংকোচে চাইতে পারো। যা চাইবে, তা যদি আমার দেওয়ার শক্তি থাকে নিশ্চয়ই দেব। সেও আমার ঋণ স্বীকার করা হবে মাত্র, ঋণ শোধ হবে না।'

কিসের একটা সংকোচ ও সংশয়ে গত কয়েকদিন যেন ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হচ্ছিলেন বাজীরাও। মুখ-চোখের চেহারা গিয়েছিল বদলে। শুষ্ক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। রাজা ছত্রসালের কথা শুনে নিমেষ-মধ্যে যেন আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর মুখ-চোখ।

'দেবেন মহারাজা, যা চাইব তাই দেবেন?'

'হ্যাঁ—দেব। যদি আমার সাধ্যে কুলোয়।'

তবু শেষ মুহূর্তে কথাটা যেন ঠোঁটের মধ্যে আটকে যায়। বিশ্বের সংকোচ এসে কণ্ঠ-রোধ ক'রে ধরে।

কোনমতে ঘাড় হেঁট ক'রে জানান তাঁর প্রার্থনাটা—'আমি আপনার কাছে মস্তানীকে ভিক্ষা চাইছি।'

কথাটা বলে, বলে ফেলতে পেরে, যেন বেঁচে যান বাজীরাও। যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন। দ্বিধা ও অস্থির-চিত্ততার যে গুরুভার পাষাণের মতো বুকে চেপে ছিল, সেটার হাত থেকে অন্তত অব্যাহতি পেলেন তিনি, 'হ্যাঁ কি না' দুটোর একটা উত্তর পেলেই সুখে না হোক নিশ্চিন্ত হয়ে যাত্রা করতে পারেন।

রাজা ছত্রসাল মুহূর্ত দুই নীরব হয়ে রইলেন,—বাজীরাও-এর মনে হ'ল দুই দীর্ঘ যুগ—তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'মস্তানী আমার প্রিয় কন্যা, রাজপুত্রীর মতো তাকে মানুষ করেছিলুম। অন্য যে কেউ এ প্রার্থনা করলে বিবাহের প্রশ্ন তুলতুম। কিন্তু তুমি স্বতন্ত্র, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই—আমি নিঃশঙ্কেই তাকে দান করলুম তোমার হাতে।'

তারপর একটু থেমে, যেন বাজীরাও-এর অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরেই মৃদু হেসে বললেন, 'এ আমি জানতুম পুত্র। কতকটা অনুমানই করেছিলুম। তাই মস্তানীকে প্রস্তুতই রেখেছি। তুমি যাত্রা করলেই তার শিবিকাও তার মহল থেকে বেরোবে। তুমি চিন্তা কিছু ক'রো না।'

'কী বললে ? দ্বটো ঘোড়া !···দ্বটো ঘোড়া তৈরী ক'রে এনেছ ?' বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে পেশোয়ার, 'দ্বটো ঘোড়ার কথা আবার কে বললে তোমাদের ? আমি তো শ্বধ্ব আমার ঘোড়াই সাজাতে বলেছি !'

বলতে বলতেই তাঁর কণ্ঠস্বর যেন আরও কঠিন হয়ে ওঠে, নিরুদ্ধ রোষের চিহ্নস্বরূপ দুই রগের দুটো শিরা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্রমশ, 'তুমি কতদিন এখানে কাজ করছ ? তুমি শোন নি কারুর কাছে যে আমার হুকুম তামিলে কোনরকম গাফিলতি আমি সহ্য করি না ? আমি তো তোমাকেই বলেছিলাম আমার ঘোড়ার কথা ?'

খুব বেশী দিন পেশোয়ার খাস এলাকায় আসে নি নাগোজী পন্থ এটা ঠিক —তবু সে এই সরকারে কাজ করছে সাত-আট বছর, পেশোয়ার মেজাজের খবর সে রাখে। আর যত সামান্য দিনই সে 'শানোয়ার ওয়াড়া'য় আসুক—ও'র এই কণ্ঠস্বর ও রগের শিরা ফুলে ওঠার অর্থ ও পরিণাম সে জানে ; সুতরাং সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগল, এই অভিযোগের জবাবে একটা কথাও বলতে পারল না। বলতে পারল না যে, সে হুকুম মতোই কাজ করেছে এবং হুকুম শুনতেও তার কিছুমাত্র ভুল হয় নি। পেশোয়ার হুকুমের চেয়েও বড় হুকুম আছে এখানে আর সেই হুকুমই সে তামিল করেছে মাত্র।

সহজ সত্য কথাটাও বলবার সাহস হ'ল না এই কারণে যে, সে শুনেছে, সত্য হোক মিথ্যা হোক পেশোয়া কোনরকম প্রতিবাদ বা মুখের ওপর জবাব সহ্য করতে পারেন না। মিথ্যা বা না-করা অপরাধের জন্য যত শাস্তিই ভোগ করতে হোক, একেবারে অসহ্য কিছু হবে না। কিন্তু জবাব দিতে গেলে এখনই সদ্য পদাঘাত এবং পরে কঠিনতর দণ্ড অবধারিত।

অবশ্য চুপ ক'রে থেকেও হয়ত সহজে অব্যাহতি পেত না নাগোজী পন্থ—কারণ পেশোয়ার রগের শিরা দুটো ইতিমধ্যে আরও উঁচু হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ ক্রোধের মাত্রা বাড়ছেই তাঁর। ব্যাপারটা তুচ্ছ, একটা ঘোড়ার জায়গায় দুটো ঘোড়া তৈরী হয়েছে, কাজে না লাগে দ্বিতীয় ঘোড়ার সাজ খুলে ফেলতে অর্ধদণ্ডও সময় লাগবে না কিন্তু পেশোয়া বাজীরাওয়ের কাছে এটুকু তথ্যই সব নয়। তিনি নিজে অসাধারণ কর্মদক্ষ মানুষ, অপরের কাজে বা আচরণে কোনরকম ত্রুটি বা শৈথিল্য সহ্য করতে পারেন না। কুলিশ-কঠিন নিয়মানুবর্তিতার পক্ষপাতী তিনি—তা না হ'লে এই অল্পবয়সেই সারা ভারতে এতখানি প্রতিপত্তি লাভ করতে পারতেন না—একাধারে রণনিপুণ বীর সেনাপতি ও সুদক্ষ শাসনকর্তা হিসাবে বিখ্যাত হয়ে উঠতেন না। তিনি জানেন, কোথাও বিন্দুমাত্র শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিলে ভবিষ্যতে বিপুল বিশৃঙ্খলা সহ্য করতে হবে—সামান্য গাফিলতি অসামান্য অপটুতা হয়ে উঠবে। মানুষ তার কর্তব্য সুনিপুণ দক্ষতার সংগে পালন করবে—এইটেই স্বাভাবিক তাঁর কাছে ; সেই জন্য বাজীরাও কারও কর্মনিপুণতার প্রশংসা করেন না—ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য কঠিন ভর্ৎসনা করেন।

এ ক্ষেত্রেও তিনি কঠিনতর ভৎ'সনার বাক্যই উচ্চারণ করতে যাচ্ছিলেন—হয়ত সেই সঙ্গে কিছু শাস্তির নির্দেশও—কিন্তু সে সুযোগ মিলল না, তার আগেই সে ঘরে একটি অভিনব আবির্ভাব ঘটল; এ রাজ্যে, পেশোয়ার অনুচরদের কাছে পেশোয়ার আদেশের চেয়েও যাঁর নির্দেশ বড়, সেই অপরূপা নারী ও-পাশের পর্দা সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর আবির্ভাব সব অবস্থাতেই অভিনব কিন্তু আজ আর একটু বিশেষত্ব ছিল, যে বেশে তিনি পেশোয়ার সঙ্গে রণাঙ্গনে যান সাধারণত—সেই বেশে, অশ্বারোহণের উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত হয়েই এসেছেন, রেশমের শৌখীন চাবুকটি নিতেও ভুল হয় নি তাঁর।

তাঁকে দেখেই পেশোয়ার উগ্র পরুষদৃষ্টি কোমল হয়ে এল। সর্বদা সকল অবস্থাতেই তাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয়ে উঠে—এই মেয়েটিকে দেখলে। সেই প্রথম দিন থেকেই এক আশ্চর্য প্রসন্নতা অনুভব করছেন তিনি - সেই যেদিন পান্নার রাজপ্রাসাদে রাজা ছত্রসাল বুন্দেলার এই জারজ-কন্যাটিকে প্রথম দেখেছিলেন বাজীরাও। নিষ্ঠাবান আচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ পেশোয়া একদা প্রবীণ রাজা ছত্রসালের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে আহার করতে রাজী হন নি—বসতে গিয়েও উঠে চলে এসেছিলেন—রাজার মুসলমানী রক্ষিতা ছিল বলে। সে অপমানেরই শোধ নিয়েছিলেন রাজা ছত্রসাল—দেবমন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখাবার নাম ক'রে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলেন তাঁর সেই মুসলমানী উপপত্নীর কন্যা নৃত্যপরা মস্তানীকে।

সেই যে কী শুভ বা অশুভ লগ্নে দেখা হয়েছিল তাদের—তখনও তরুণ বাজীরাও-এর সঙ্গে কিশোরী মস্তানীর—সেই থেকেই তাঁদের দু'জনের জীবনে গ্রন্থি পড়ে গেছে। পেশোয়া মনে করেন সে ক্ষণটি তাঁর জীবনে শুভ—কারণ ঐ কিশোরীই তাঁর ভবিষ্যাতের সমস্ত কীর্তির প্রেরণা,—আর তাঁর আত্মীয়-পরিজনরা মনে করেন যে এক সর্বনাশা ক্ষণেই মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছিল পেশোয়ার সামনে—সেই থেকে তাঁর সমস্ত কীর্তির পথ রোধ ক'রেই দাঁড়িয়ে আছে সে আজও পর্যন্ত, অত বড় বীর যোদ্ধা ও তীক্ষ্নধী রাজনীতিকের সকল শৌর্য সকল প্রচেষ্টা স্তম্ভিত হয়ে আছে ওর ঐ দু'টি রক্তাভ নৃত্য-চটুল চরণে। ওকে লঙ্ঘন ক'রে অগ্রসর হওয়ার সাধ্য আর তাঁর নেই।

এ অভিযোগের মূলে কোন সত্য থাক বা না থাক—এটা ঠিক যে, সেদিন বাজীরাওয়ের দৃষ্টিতে সেই অসামান্য রূপ আর অলোকসাধারণ লাবণ্য যে মোহের ঘোর লাগিয়ে ছিল—সে ঘোর আর কোনদিনই কাটে নি; সেই মুহূর্ত থেকে আজও, ভারতত্রাস পেশোয়া সেই রূপসী কন্যার মুগ্ধ ক্রীতদাস হয়ে আছেন। সেই যে চোখে চোখ পড়েছিল, সে চোখ আর ফেরাতে পারেন নি অন্য কোনও দিকে, অন্য কারও মুখে।

এখনও কয়েক মুহূর্ত শুধু মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়েই রইলেন পেশোয়া বাজীরাও। তারপর বোধ হয় এই সাজসজ্জার সম্যক অর্থটা মাথায় গেল তাঁর। তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ কি? তুমি কোথায় যাবে?'

'আপনার সঙ্গে।' শান্ত ভাবে জবাব দিল মস্তানী, পেশোয়ার খুশির

সমুদ্র থেকে ওঠা হৃদয়লক্ষ্মী। পেশোয়া আদর করে ওর নামের মহারাষ্ট্রীকরণ করেছেন—খুশিবাঈ, কখনও ডাকেন মস্তিবাঈ বলেও।

'সে কি? আমার সঙ্গে কোথায় যাবে! আমি তো যাচ্ছি সাতারা দুর্গে, ছত্রপতি রাজা শাহুর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে তুমি কোথায় যাবে'—বলতে বলতেই রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে, 'ও, তুমিই বুঝি দু'টো ঘোড়া আনতে বলেছিলে?'

'বলেছিলুম বৈ কি! নইলে আমি যাব কিসে? আপনি বুঝি সেজন্যে বকছিলেন বেচারী নাগোজীকে? বা রে, ওর কি দোষ!'

'হুঁ, সেটা এখন বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তুমি যাও নাগোজী—বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো গে। আমরা যাচ্ছি এখনই।'

তারপর নাগোজী পষ্ট পুনর্জন্ম লাভের সুদুর্লভ অভিজ্ঞতা অনুভব করতে করতে চোখের বাইরে চলে গেলে পেশোয়া পুনশ্চ বললেন, 'না না লক্ষ্মীটি—এসব মতলব ছাড়, আজ আর যেতে চেয়ো না আমার সঙ্গে—'

'কেন পেশোয়া, দোষ কি? আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যদি যেতে পেরে থাকি, রাজসভায় যেতে পারব না? শত্রুর কামানের চেয়েও কি ছত্রপতির দৃষ্টি বেশী ভয়ঙ্কর? আরও যদি তাই হয়—না হয় তাঁর দৃষ্টির অনলে ভস্মীভূতই হব। তার চেয়ে বেশী কিছু তো সম্ভব নয়!'

'তার চেয়ে বেশীও হ'তে পারে মস্তিবাঈ, শুধু তুমি নয়, সে অনলে আমিও ভস্মীভূত হ'তে পারি শেষ পর্যন্ত!'

'ইস! ছত্রপতির উষ্মার আগুনে ভস্মীভূত হবেন পেশোয়া বাজীরাও!... ছত্রপতির মাথার ওপরে রাজছত্র যে আজও শোভা পাচ্ছে—সে কার দৌলতে তা কি তিনি জানেন না? এত নির্বোধ নন তিনি নিশ্চয়ই। যে সিংহাসন আজ ইচ্ছা করলে অনায়াসে আপনিই নিয়ে নিতে পারতেন, সেটা তো নিতান্ত স্নেহবশতই তাঁকে দিয়ে রেখেছেন—তাই নয় কি?'

'চুপ!' ঈষৎ একটু ধমক দিয়েই ওঠেন পেশোয়া, অবশ্য তাঁর খুশিবাঈকে যতটা ধমক দেওয়া সম্ভব। তারপর দু' কানে আঙুল দিয়ে বলেন, 'এ কথা আর কখনও, কোনদিনও ব'লো না, এ আমাদের শুনতে নেই। তাঁর সিংহাসন তিনিই রক্ষা করছেন, যদি কিছু আমি করতে পেরে থাকি—সে তাঁরই আশীর্বাদে আর প্রেরণায়। তা ছাড়া তুমি জান না মস্তি, সমস্ত মারাঠা জাতির হৃদয়ের মণি রাজা শাহু বীর্যে শৌর্যে রাজনীতিতে কারও চেয়ে কম নন। আমি আছি বলেই তিনি হয়ত নিশ্চিন্ত আছেন—কিন্তু প্রয়োজন হ'লে এ ভার তিনি অনায়াসে বহন করতে পারবেন।...না, তাঁকে অপ্রসন্ন করা চলবে না। এ খেয়াল তুমি ছাড়। জিনিসটা—জিনিসটা বড়ই অশোভন হয়ে দাঁড়াবে!'

'বা-রে!' অভিমানক্ষুব্ধ সোহাগে মস্তির ঠোঁট দু'টি বিচিত্র ভঙ্গী ধারণ করল, 'আমি বলে সেজেগুজে তৈরী হয়ে আছি কখন থেকে রাজসভায় যাব বলে—! তা আমি না হয় খুবই অপবিত্র জীব—কিন্তু তাই বলে কি রাজ-দর্শনেরও অধিকার নেই আমার? রাজসভাতে যে সব সাধারণ প্রজা নিত্য যায়

—তারা কি সকলেই নিষ্পাপ মহাপুরুষ? ছত্রপতির নিজেরও তো নর্তকী আছে শুনেছি, তারা কখনও কখনও নিশ্চয় দরবারেও নাচে—? আপনি না হয় আমাকে আপনার নর্তকী বলেই পরিচয় দেবেন। তাতেও তিনি রুষ্ট হন্—শাস্তি দিতে চান—সে শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব।'

'হ্যাঁ—তা না হয় নেবে বুঝলাম কিন্তু এমনও হ'তে পারে, রাজরোষটা তোমার কাছ পর্যন্ত আদৌ এসে পেঁছিল না—নামল সোজা আমারই মাথায়! ···তুমি—তোমাদের ভগবান এমনই কতকগুলি স্বাভাবিক বর্ম দিয়েছেন যাতে কোন পুরুষের—তা সে রাজাই হোক আর ঋষি বা দেবতাই হোক্—কারুর রোষই হয়ত বেঁধে না, সেটা প্রতিহত হয়ে আমাদের মতো অভাগাদের ওপরই এসে পড়ে!'

'কেন, আমার ওপরের রাগটা আপনার ওপর এসে পেঁছিবে কেন?'

এ কেন তোমাকে বোঝাতে পারব না। লক্ষ্মীটি, তুমি জেদ করো না—আমাকে একাই যেতে দাও—'

'বেশ, আপনি একাই যান—আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই না। আমি আলাদাই যাব। আপনার পরিচয় না দিলেই হ'ল তো। সাধারণ প্রজা—যে-ই যাক্ শুনেছি তিনি তার আর্জি শোনেন। সেইভাবেই যাব তাঁর কাছে। না হয় বারাঙ্গনার পরিচয়েই যাব—তারাও তো ওঁর প্রজা! লোকে যে বলে শাহু ছত্রপতির দরবারে সকলের অবারিত দ্বার—সে কি মিথ্যা তাহ'লে?'

চুপ ক'রে রইলেন বাজীরাও। তাঁর সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত ললাটে দুশ্চিন্তার ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল। এর ফলাফল তিনি জানেন, এতকাল বৃথাই রাজকার্যে দিন কাটান নি—অথচ এই অবিমৃষ্যকারিতায় বাধা দেবারও শক্তি নেই বুঝি তাঁর।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেশ, চলো তাহ'লে—কিন্তু এখনও বলছি, একটু ভেবে দেখলে ভাল করতে!'

'আপনি যান পেশোয়া, আমি পরে যাব। কোন একজন ভৃত্য সঙ্গে ক'রে যাব—আপনি চলে যান।'

'না, তা হয় না।' দৃঢ়কণ্ঠে বলেন পেশোয়া, 'সে সম্ভব নয়। গেলে আমার সঙ্গেই যাবে।' তারপর একটু ম্লান হেসে ব্যাপারটা পরিহাস-তরল করার চেষ্টা করে বলেন, 'আমি ছাড়া অন্য কোন ভৃত্যের সঙ্গে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না।···তারাও তো মানুষ।'

তবুও অভিমান যেতে চায় না মস্তিবাঈয়ের। আরও কি বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু এবার—বাজীরাওয়ের কণ্ঠে পেশোয়ার আদেশই ধ্বনিত হয়, 'না, আর কথা নয়। দরবারের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি চলো!'

মস্তানী এ কণ্ঠস্বর চেনে। সে বিনা প্রতিবাদে তাঁর পিছু পিছু বেরিয়ে এসে ঘোড়াতে চড়ল।

ছত্রপতি শাহু প্রথমটা বুঝতে পারেন নি। কারণ অদ্যাপি তিনি তাঁর পেশোয়ার এই প্রিয়তমাকে চোখে দেখেন নি। যে-সব বর্ণনা শুনেছেন তাতে একে চেনার কথা নয়—সে-সব বর্ণনার সঙ্গে কিছুই মেলে না এর। এ অনেক, অনেক বেশী সুন্দর। তার চেয়েও বড় কথা এ মেয়ে সাহসিনী, বুদ্ধিমতী—এর হৃদয় আছে। এক কথায় এ অসাধারণ। বহুদর্শী ও তীক্ষ্ণদর্শী শাহু এক নজরে মেয়েটিকে বুঝে নিলেন—এবং সেই কারণেই চমকে উঠলেন। শাহুর স্বভাব অলস কিন্তু—বাজীরাও যা প্রায়ই বলেন—তাঁর সাহস, শৌর্য বা বুদ্ধির অভাব নেই।

তা না হলে, তাঁর প্রথম পেশোয়ার মৃত্যুর পর, প্রবল আপত্তি এবং আপাত-যোগ্যতর প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও কুড়ি-একুশ বছরের তরুণের হাতে শাহু এই বিশাল রাজ্য তথা বিশালতর সমস্যার বোঝা তুলে দিতেন না।

সাধারণ কোন মেয়ে নয় তা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই, বাজীরাও-এর সঙ্গে প্রবেশ করার তথ্যটা মিলিয়ে—দুই আর দুইয়ে যোগ করার মতো—মেয়েটির আসল পরিচয় বুঝতেও বিলম্ব হ'ল না। চারিদিকে সভাসদ্‌দের চোখে যে উষ্মা, লজ্জা, ধিক্কার এবং ঈর্ষা প্রকট হয়ে উঠল,—তা থেকে নিজের ধারণার সমর্থনই পেলেন। এই নিশ্চয়ই সেই মস্তানী বা মস্তিবাঈ—পেশোয়া বাজীরাও-এর মুসলমানী রক্ষিতা!…

চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই শাহুর স্বভাব-প্রসন্ন মুখ কঠিন ও ভ্রূকুটি-কঠোর হয়ে উঠল। তিনি সরাসরি বাজীরাওয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রতিনিধিকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'শ্রীপৎ রাও, আমাদের মহামান্য পেশোয়া ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ করতে করতে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বোধ হয়—নইলে যে শিষ্টাচার, শালীনতাবোধ এবং রাজকীয় মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতনতার জন্য উনি বিখ্যাত, তাতেই এত বড় ত্রুটি ঘটতে পারত না। তুমি আজ আমার নাম ক'রে রাজবৈদ্যকে বলো পেশোয়াকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে এবং পেশোয়াকেও বলো কিছুদিন বিশ্রাম করতে।'

শুধু বিমুখ হয়েই নিরস্ত হলেন না ছত্রপতি, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দরবার ত্যাগ করার জন্যও প্রস্তুত হলেন। তাঁর পক্ষে তাঁর পেশোয়ার ওপর বিরক্ত হওয়া বা পেশোয়াকে তিরস্কার করা একটা অঘটন। দরবারের মধ্যে এ আচরণ পেশোয়ার পক্ষেও দারুণ অপমানকর। আর এর ফলাফলও সুদূরপ্রসারী। হঠাৎই ক'রে ফেলেছেন শাহু এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনুতপ্ত হয়েছেন। কোন কারণে অনুতাপ করার প্রয়োজন হলে তাঁর বড় অস্বস্তি বোধ হয়। আরও সেই কারণেই—আত্মধিক্কারের গ্লানিতে বিরক্ত, এবং আজ প্রভাতটা নষ্ট হয়ে গেল ভেবে ক্ষুব্ধ হয়েই তিনি সভা থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন।

কিন্তু সেদিন সে দরবারের ভাগ্যে আরও অঘটন অপেক্ষা করছিল।

বোধ করি বিনা মেঘে শুধু নয়, বিনা আয়োজনে ও বিনা প্রস্তুতিতেও—সেই সভাকক্ষের মধ্যে বজ্রপাত হ'ল।

কেউ কিছু বোঝবার কি রক্ষীরা কোন বাধা দেবার আগেই, পেশোয়ার অনুগামিনী সেই নারী—বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে ছত্রপতি পথরোধ করল, নতজানু হয়ে সামনে বসে পড়ে নতমুখেই বলল, 'দাঁড়ান ছত্রপতি, আপনি রাজা, আপনি মহান শিবাজীর আসনে বসেছেন তাঁর আদর্শ রক্ষার প্রতিজ্ঞা ক'রে। আপনার রাজ্যের কীটপতঙ্গও আপনার কাছ থেকে সুবিচার আশা করে। আমি যতই অধম যতই ঘৃণ্য হই, আমিও আপনার প্রজা। আমি এই প্রকাশ্য দরবারে আপনার কাছে প্রশ্রয় ও সুবিচার প্রার্থনা করছি।'

কথাগুলো নত মুখেই বলল মস্তানী, ভাষাতেও কোথাও রাজসম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হ'ল না কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, একে সামান্যা বারনারী বোধে অবজ্ঞা করা চলবে না, এ মেয়ে তার প্রাপ্য আদায় করতে, নিজের সম্মান রক্ষা করতে জানে।

পারিষদরা সন্ত্রস্ত, বিভ্রান্ত। তাঁরা সকলেই, এমন কি স্বয়ং প্রতিনিধিসুদ্ধ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। সব চেয়ে বিপন্ন অবস্থা রক্ষীদের। এক্ষেত্রে রাজ-অভিপ্রায়ে এই অশোভন বাধাদানকারিণীকে এখনই বলপ্রয়োগে অপসারিত করাই বিধি, কিন্তু যে কারণে দরবারে প্রবেশ করার সময়ও তারা অনুমতি-পত্র বা নিদর্শন চাইতে পারে নি, সেই কারণেই ঐ নারীর দেহে হস্তক্ষেপ করতে পারল না তারা। তারা জানে মহামান্য পেশোয়া সম্মানে রাজার থেকে কিছু ছোট কিন্তু শক্তিতে ছোট নয়। পেশোয়ার ক্রোধ জাগ্রত হ'লে কতদূর কি হ'তে পারে তাও তাদের জানা আছে। তারা শুধু দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল, আর কিছুই করতে পারল না।

ছত্রপতি শাহুরও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এই কুসুমাদপি সুকোমল নারীদেহে একটা বজ্রাদপি কাঠিন্য আছে—তা তিনি কল্পনা করেন নি। মনে মনে তাঁকে মানতেই হ'ল যে এ নারী সিংহের উপযুক্ত সিংহিনী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ বিধাতার মিলিয়ে দেওয়া মানিকজোড়।

ক্ষণকালের জন্য যেন আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন রাজা—তাই উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব হ'ল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে ছত্রপতি উত্তর দিলেন, 'বেশ, বলো তোমার কি বক্তব্য। কোন্ সুবিচার তুমি আশা করো—তাও জানাও।'

'মহান্ ছত্রপতি, আমি জানি এইমাত্র আপনি আপনার প্রিয় ও বিশ্বস্ত সেবককে যে অপমান করলেন তার জন্য আমিই দায়ী। এটা তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে চান নি। আমিই জোর ক'রে এসেছি। আমি জানতাম ছত্রপতি শাহু সুবিচারক ও সুবিবেচক, সেই জোরেই পেশোয়ার সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করি নি। কিন্তু আমি কি তা'হলে ভুল বুঝেছি?'

'এ তো তোমার বিচার প্রার্থনা হ'ল না বৎসে, এ তো অনুযোগ মাত্র!... তোমার সুস্পষ্ট অভিযোগ কি?'

'আমি অভিযোগ করছি আপনারই বিরুদ্ধে রাজাধিরাজ। আপনার কাছেই

আমি আপনাকে অভিযুক্ত করছি। কেন, কী কারণে আপনি পেশোয়ার প্রতি বিমুখ হবেন—কোন্ অধিকারে ?'

এবার প্রতিনিধি শ্রীপৎ রাও যেন বিচলিত হয়ে উঠলেন। তাঁর এক্ষেত্রে কিছু করণীয় আছে—সেটা মনে পড়ল তাঁর। তিনি ঈষৎ রুষ্টস্বরে বললেন, 'প্রজার অধিকারে বিচার প্রার্থনা করা যায় কিন্তু ধৃষ্টতা প্রকাশ করা যায় না। রাজ-সম্মুখে ধৃষ্টতা প্রকাশের শাস্তি কঠিন।'

'তা জানি মহামান্য প্রতিনিধি। কিন্তু আমি নারী হয়ে, ছত্রপতির অগণ্য প্রজার মধ্যে নগণ্যতমা হিসাবে শুধু বিচার নয়—কিঞ্চিৎ প্রশ্রয়ও প্রার্থনা করেছি। এ প্রশ্ন আমার সেই প্রশ্রয়ের জোরেই করেছি—উত্তর দেওয়া না দেওয়া ছত্রপতির ইচ্ছা। তবে এ-ও বলে রাখছি, আপনি আমাকে ভাল রকমই জানেন, আপনার সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয় নয়—ছত্রপতি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বা বিচার না ক'রে চলে যেতে চান তো আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে চলে যেতে হবে। রক্ষী প্রহরীরা আমাকে সরাতে পারবে না—আপনারাও নন। আমি সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হয়েই সভাতে এসেছি—কোন নীচ হস্ত আমার অঙ্গ স্পর্শ করার আগেই আমি এ দেহ ত্যাগ করব।'

বলতে বলতেই মস্তানী তার সুরনারী ঈর্ষিত বক্ষের মধ্যে থেকে একটি হস্তিদন্তমণ্ডিত তীক্ষ্ণধার ছোরা বার করল। ছোরাটি ছোট—কিন্তু তার তীক্ষ্ণতা কম নয়, একটি নারীর আত্মহত্যার পক্ষে যথেষ্ট।

ছত্রপতি যত দেখছেন এ নারীকে, তত মুগ্ধ হচ্ছেন। যেন মনের কোন্ গোপন-প্রান্তে ঈর্ষাও বোধ করছেন কিছু। তাঁরও রক্ষিতা আছে—একাধিক—তাদের কারও কারও সম্বন্ধে দুর্বলতাও তাঁর যথেষ্ট, কিন্তু তারা কেউই এর পায়ের কাছেও দাঁড়াবার যোগ্য নয়।

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসে পড়লেন আবার সিংহাসনে। তারপর সকলকে বিস্ময়ের ওপর বিস্মিত ক'রে তিনি আশ্চর্য কোমলকণ্ঠে বললেন, 'তুমি উত্তেজিত হয়ো না বৎসে, রাজা ছত্রপতি কোন আশ্রয়-প্রার্থিনীকে বিমুখ করেছেন, একথা তাঁর অতিবড় শত্রুও বলবে না। কিন্তু তোমার ও প্রশ্নের উত্তর তুমি আমার মহামাত্যের কাছেই পেতে পারতে—রাজদরবারে গণিকা কি বারাঙ্গনা নিয়ে রাজ্যের কোন প্রধান পুরুষেরই আসতে নেই, তাতে প্রজাদের মনে মন্দ প্রতিক্রিয়া হয়। এ রাজ্যের যিনি প্রধান অমাত্য তিনি যদি এ আচরণ করেন—অপরে কি শিখবে, কার আদর্শ অনুসরণ করবে তারা ?'

'রাজাধিরাজ, প্রজারা আদর্শের জন্য সর্বপ্রথম রাজার দিকেই তাকায়, আগে রাজা তারপর রাজপুরুষ। আগে রাজ্যপ্রধান পরে অমাত্যেরা। আমি যতদূর শুনেছি আপনার প্রাসাদেও আপনার প্রসাদপুষ্ট গণিকা আছেন কেউ কেউ, আপনার প্রিয় রক্ষিতা হিসাবে। এ কি ভুল শুনেছি আমি ?

প্রশ্নটা শুনে অথবা শুনতে শুনতেই রাজা শাহুর মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করল। সভাসদরা সকলে চঞ্চল হয়ে উঠলেন,—অস্বাভাবিক একটা নিস্তব্ধতা নেমে

এসেছিল সভাতে—তার মধ্যে দু-একটি অস্ত্রের ঝনৎকারও শোনা গেল। এমন কি স্বয়ং পেশোয়াও যৎপরোনাস্তি বিচলিত বোধ করলেন।

এ কী অসহনীয় স্পর্ধা সামান্য এক পণ্যা নারীর! এ ধৃষ্টতা কতক্ষণ সহ্য করবেন তাঁরা? রাজা শাহুই বা এতখানি সহ্য করছেন কি ক'রে? মহামাত্যকে কি তাঁর এতই ভয়?

কিন্তু শাহু যতই রুষ্ট হোন—রোষ দমন করারও আশ্চর্য শিক্ষা তাঁর—তিনি সেই উদ্যত বিপুল রোষ দমনই করলেন, কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব শান্ত ও অবিচলিত রেখে উত্তর দিলেন, 'বৎসে, সাহস ভাল কিন্তু দুঃসাহস ভাল নয়। তুমি যে-কথা তুলেছ, তার উত্তর না দিলেও অন্যায় হ'ত না। রাজার ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গ তোমার মতো লোকের আলোচনার যোগ্য নয়। এ প্রশ্ন তোমার পক্ষে ধৃষ্টতা বলেই মনে করি। তবু শোন, উত্তরই দিচ্ছি আমি। আমার রক্ষিতা আছে, তা গোপনও করতে চাই না আমি, কিন্তু তারা আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে কোথাও যাবার কি প্রকাশ্য দরবারে বসবার স্পর্ধা রাখে না। এমন কি তাদের আমি বন্ধুবান্ধবদের মজলিশেও বার করি না, অথবা তাদের মনোরঞ্জন করাই না। কিন্তু আমার মহামাত্য ক'রে থাকেন শুনেছি। শুনেছি তিনি তোমার সংস্পর্শে এসে এতদূর কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়েছেন যে ভগবান গণপতির পুজার দিন বহু লোকের সম্মুখে তোমাকে দিয়ে সেই পুজামণ্ডপে নৃত্য করান। এতকাল সেটা বিশ্বাস করি নি, কিন্তু আজ করছি। অর্থাৎ আমার মহামাত্য শুধু তাঁর রাজার সম্মানহানি করারই স্পর্ধা রাখেন না—ভগবানকেও অবজ্ঞা করার সাহস রাখেন!'

কথা বলতে বলতেই ছত্রপতি শাহুর কণ্ঠস্বর শাণিত ও শীতল হয়ে উঠল, অর্থাৎ অন্তরের উষ্মা কোনমতেই ঢাকা রইল না। কথা শেষ ক'রে তিনি কঠিন দৃষ্টিতে মস্তানী ও বাজীরাও-এর দিকে তাকালেন। উপস্থিত সকলেই বুঝল—এবাত্রা এ মেয়েটিকে ত্যাগ না করলে বাজীরাওয়ের নিষ্কৃতি নেই।

যাকে উপলক্ষ করে এই রোষ—সে স্ত্রীলোকটি কিন্তু শান্তভাবেই সব শুনল। রাজার বক্তব্য শেষ হ'তে আবার আভুমি নত হয়ে অভিবাদন ক'রে বলল, 'রাজাধিরাজ আপনার কাছে আমাদের অপরাধ অনেক—তা বুঝলাম। আপনার মহামাত্য তাঁর সম্বন্ধে অভিযোগের জবাব দেবেন, আপনার অনুমতি নিয়ে আমার কথা আমিই বলতে চাই। ছত্রপতি, আমি সামান্যা গণিকা বা বারনারী নই। মহারাজ ছত্রসাল আমার পিতা। সে কথা তিনি প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন। চিরদিন তিনি আমায় কন্যা বলেই পরিচয় দিতেন। দেবতার সামনে নৃত্য করার নির্দেশও তিনি দিয়েছেন, আবাল্য সেই নৃত্যের শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা তাঁরই। মহারাজ, শাস্ত্রে আছে শুনেছি বাল্যে স্ত্রীলোকরা পিতার অধীন থাকবে—যৌবনে স্বামীর। পিতার আদেশে আমি দেবতার সামনে নৃত্য করেছি, পিতার আদেশেই আমি আপনার মহামাত্যর সঙ্গে পিতৃগৃহ ত্যাগ করেছি। তিনি হাতে ক'রে আমাকে দান করেছেন—কন্যা হিসাবে। মহামান্য পেশোয়া ছাড়া আমি কোন দ্বিতীয় পুরুষের দিকে লুব্ধ কটাক্ষপাত

করেছি এ অপবাদ আমার শত্রুরাও দিতে পারবে না।...শাস্ত্রমতে আমাদের বিবাহ হয় নি একথা সত্য—কিন্তু যে মুহূর্তে পেশোয়াকে আমি দেখেছি সেই মুহূর্তে, দেবতার সামনে, আমি তাঁকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি। সেটা গোধূলি বেলা, বিবাহের সুপ্রশস্ত লগ্ন—তার উপর সামনে দেবতা, মাথার উপর স্বয়ং ভগবান সাক্ষী। পিতা নিজে আমাকে তাঁর হাতে সম্প্রদান করেছেন। সুতরাং আমি ন্যায়ত ধর্মত পেশোয়ার বিবাহিতা পত্নী। আমাকে বারাঙ্গনা হিসাবে গণ্য ক'রে রাজাধিরাজ আমাকে এবং মহামাত্যকে অসম্মান করেছেন—আমি সেই অকারণ অবিচারেরই বিচার চাইছি আপনার কাছে।'

মস্তানী নীরব হ'তে বহুক্ষণ সেই বিশাল দরবার-গৃহও নীরব হয়ে রইল। সে সময় একটি সামান্য ছুঁচ পড়লেও সে আওয়াজ সারা দরবার-গৃহে প্রতিধ্বনিত হ'ত বোধ হয়—এমনিই সে নিস্তব্ধতা।

তারপর ছত্রপতি কথা কইবার আগেই প্রতিনিধি শ্রীপৎ রাও ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠলেন, 'অন্যায় ন্যায়ের কথা আলাদা কিন্তু ধর্মত কোন মুসলমানী হিন্দু ব্রাহ্মণের বিবাহিতা পত্নী হ'তে পারে—এ সংবাদ আমাদের কাছে নূতন, এ কথা আমরা কখনও শুনি নি!'

ঠিক সমান ব্যঙ্গের সুরে উত্তর দিল মস্তানী, 'প্রতিনিধি দিবা-রাত্র রাজকার্যে ব্যস্ত থাকেন, পড়াশুনো করবার সময় হয় না তাঁর। নইলে যদি সামান্যও ইতিহাস পড়া থাকত তাহ'লে জানতে পারতেন যে এ ধরনের ঘটনা এ দেশে নতুনও নয়, প্রথমও নয়। আকবর বাদশার প্রধানা মহিষী নিত্য যমুনায় স্নান করে হিন্দু দেবতাদের আরাধনা করতেন, হিন্দু ব্রত-নিয়ম পালন করতেন—এ কথা মহামাত্য ছাড়া বহু লোকই জানেন। একটু খোঁজ করলে তিনিও জানতে পারবেন!'

ক্রুদ্ধ প্রতিনিধি আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, রাজা শাহু ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন তাঁকে। বললেন, 'বৎসে, তোমার কথায় কিছু যুক্তি আছে আমি মানছি। তবে একটা কথা—তুমি যেমন নিঃসন্দেহে মহামাত্যকে পতিরূপে বরণ করেছ তিনি কি তোমাকে বিবাহিতা পত্নী বলে গ্রহণ করতে পেরেছেন? বোধ হয় না। তা হলে এভাবে প্রকাশ্যে তোমাকে নিয়ে রাজসভায় আসতেন না। কোনও সভাসদ বা রাজপুরুষ কখনও আসেন না—তা বোধ হয় লক্ষ্য ক'রে থাকবে।'

হ্যাঁ মহারাজ, তা লক্ষ্য করেছি বৈ কি! মহামাত্যও আপনার মতোই ক্ষুদ্র সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন, তাই তিনি কিছুতেই আমাকে নিয়ে আসতে চান নি। আমিই জোর ক'রে এসেছি। রাজাধিরাজ, আমার হিন্দু পিতা শুধু দেবতার মনোরঞ্জন করারই শিক্ষা দেন নি, উপদেশছলে, স্নেহবশে বহু পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়েছেন, বহু গ্রন্থও পাঠ করিয়েছেন। আপনাদের শাস্ত্র পুরাণাদি যদি আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পেরে থাকি তো—তারা এই শিক্ষাই কি দেয় না যে স্ত্রীর উচিত সর্বদা ছায়ার মতো স্বামীর অনুগমন করা? নইলে সীতা কেন বনে যাবেন, দময়ন্তী কেন স্বামীর অনুগামিনী হবেন, সাবিত্রী কেন

যমালয় পর্যন্ত সঙ্গে যাবেন সত্যবানের। আমি অজ্ঞান মূর্খ স্ত্রীলোক, হয়ত আমি ভুলই বুঝেছি—রাজা ছত্রপতি যদি এ বিষয়ে একটু শিক্ষা দেন তো অনুগৃহীতই হবো।'

রাজা শাহুর মুখ থেকে পূর্বের মেঘ অনেকখানিই কেটে গিয়েছিল, এবার সেখানে প্রসন্ন সূর্যকিরণ ঝলমল ক'রে উঠল। তিনি বললেন, 'বৎসে, তোমার যুক্তি অকাট্য। তুমি আমাদের পুরাণাদির শিক্ষা ঠিকই গ্রহণ করতে পেরেছ, কোথাও কোন ভুল হয় নি। আমি তোমার এই দরবারে আসার যোগ্যতা স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। কিন্তু তুমি রাজা হিসাবে যেমন আমার কাছে প্রশ্রয় ও সুবিচার দাবী করেছ, আমিও তেমনি রাজা হিসাবেই কিছুটা অধিকার দাবী করছি। তোমার কাছে আমার আদেশ নয়—অনুরোধ, তুমি আর ভবিষ্যতে এভাবে দরবারে এসে আমার মহামাত্যকে বিব্রত ক'রো না।

প্রসন্ন মস্তানী রাজা শাহুর পায়ের ওপর নত হয়ে প্রণাম ক'রে বলল, 'মহারাজ, আপনার অনুরোধ আমার কাছে পিতার আদেশের মতোই অলঙ্ঘ্য। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আর কখনও আপনাকে এ মুখ দেখিয়ে আপনার অপ্রীতির কারণ ঘটাবো না। যেটুকু অনুগ্রহ আজ পেলাম, তাইতেই আমি কৃতার্থ। কিন্তু আপনার আদেশ মাথা পেতে নিয়েও আমি একটি অনুরোধ ক'রে যাচ্ছি—না, ভিক্ষা চাইছি আপনার কাছে। গণপতি পুজার দিন দেবতার সামনে নৃত্য করি আপনি তা শুনেছেন—আমার প্রার্থনা একদিন আপনি সে আসর আপনার উপস্থিতিতে পবিত্র ক'রে তুলুন। আপনি তা দেখার পর যদি আদেশ করেন, আমি তাও ছেড়ে দেব।'

রাজা শাহু এ কথার প্রত্যক্ষ উত্তর এড়িয়ে গেলেন, তার পরিবর্তে ইঙ্গিতে তাঁর কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন, 'রাজা ছত্রসালের এই দুহিতা আমার পুত্রবধূর তুল্য। আজ প্রথম এঁকে আমি দেখলাম। তুমি যৌতুক-স্বরূপ একটি মুক্তার মালা অবশ্য অবশ্য আমার হয়ে এঁকে পেঁছে দেবে।'

মস্তানী আর একবার তাঁকে প্রণাম ক'রে সভাগৃহ ত্যাগ করল।

বলা বাহুল্য, এর পর সেদিন আর দরবার বেশীক্ষণ জমল না। সামান্য কিছু জরুরী কাজ সেরেই ছত্রপতি দরবার ভঙ্গের আদেশ দিলেন। যে অপ্রীতিকর নাটকের অভিনয় এইমাত্র হয়ে গেল—সে সম্বন্ধে রাজা কোন ইঙ্গিতমাত্র করলেন না আর। পেশোয়ার সঙ্গে জরুরী কথাবার্তা কইলেন খুব সহজভাবেই। পেশোয়াও অনর্থক আর সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না। তাঁদের দু'জনের ভাব দেখে মনে হ'ল আদৌ এরকম কোন ঘটনা ঘটে নি।

দরবারের পর বাজীরাও দ্রুতপদে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন, মস্তানী তখনও ঘোড়ার পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর অপেক্ষা করছে।

বাজীরাও কাছে এসে অপেক্ষমান সহিসের হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম নিয়ে বললেন, 'চলো, আর দেরি কি?'

'একটু দাঁড়ান পেশোয়া—আপনার এক মাননীয় বন্ধু আসছেন।'

'আমার মাননীয় বন্ধু! সে আবার কে?'

বিস্মিত হয়ে মস্তানীর মুখের দিকে চাইলেন পেশোয়া, আর সঙ্গে-সঙ্গেই, তার দৃষ্টি অনুসরণ করতে তাঁর নজরে পড়ল সত্য সত্যই স্বয়ং প্রতিনিধি— শিবিকায় না চড়ে পদব্রজে তাঁদের দিকেই আসছেন।

প্রতিনিধি কাছে এসে একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে বললেন, 'মস্তানী— তুমি, তুমি কি আমার ওপর রাগ করলে?'

খিল-খিল ক'রে হেসে উঠল মস্তানী। যেন হেসে লুটিয়ে পড়ল সে, বলল, 'ভয় নেই মহামান্য প্রতিনিধি, আমি রাগই করি আর গোসাই করি—পেশোয়া আপনার যথার্থ অনুরাগী বন্ধু, আমার নাচের আসরে আপনার নিমন্ত্রণ কখনও বন্ধ হবে না!'

সে প্রতিনিধিকে অভিবাদন ক'রে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বসল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রতিনিধি বললেন, 'পেশোয়া ভাগ্যবান!'

ঘোড়ায় চড়তে চড়তে বাজীরাও জবাব দিলেন, 'নিঃসন্দেহে।'···

প্রাসাদসীমার বাইরে এসে নির্জন পাহাড়ী পথে নামতে নামতে মস্তানী প্রশ্ন করল, 'পেশোয়া কি আমার ওপর রাগ করলেন?'

'রাগ!···তুমি যে আমার খুশিবাঈ, তোমাকে ঘিরেই আমার দিবারাত্রির —আমার জীবন-মরণের যা কিছু খুশি, তোমার ওপর আমার কিছুতেই কখনই রাগ হয় না মস্তানী!'

তারপর, কেমন এক রকমের গাঢ় গদ্‌গদকণ্ঠে বললেন বাজীরাও, 'ভগবানের আশীর্বাদে আমার এই স্বল্পদিনের জীবনে বহু সৌভাগ্যই লাভ করেছি, কিন্তু তুমিই আমার জীবনে সর্বাধিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যরূপে এসেছ। তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য, কৃতার্থ!'

খুশিবাঈ সত্যকারের খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল।

॥ ৬ ॥

কথাটা বিশ্বাস করা তো কঠিন বটেই, বুঝতেও বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল ছত্রপতি শাহুর। তিনি একটু অবাক হয়েই চেয়ে রইলেন সংবাদদাতার মুখের দিকে, হঠাৎ তখনই কোন কথা কইতে পারলেন না। আর তাতে সংবাদদাতাও একটু হতভম্ব হয়ে পড়ল, কারণ এটাও অস্বাভাবিক। ছত্রপতি শাহু শুধু বীরই নন—পুরোপুরি রাজা। ঈশ্বর তাঁকে রাজোচিত মহিমার কোন লক্ষণই দিতে ভোলেন নি। কোন সংবাদেই তিনি বিচলিত হন না বা বিস্মিত হন না। হ'লেও—অন্তত তা প্রকাশ করেন না। তাঁর পক্ষে এতখানি অবাক হওয়া অঘটন বৈকি।

অবশ্য বিস্ময়ের প্রথম আকস্মিকতাটা কেটে যেতেই সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর আচরণ একটু বিসদৃশ হয়ে পড়ছে বুঝতে পারলেন।

প্রাণপণ চেষ্টায় সামলেও নিলেন নিজেকে। কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক করার চেষ্টা ক'রে প্রশ্ন করলেন, 'রাধাবাঈ? রাধাবাঈ আমার সঙ্গে দেখা করতে চান? মানে স্বর্গত পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ রাওয়ের বিধবা?'

কণ্ঠস্বর যতই সহজ করার চেষ্টা করুন অবিশ্বাস চাপা থাকে না কণ্ঠে। বিস্ময় আর অবিশ্বাস। সেটা তাঁর নিজের কানেও ঠেকে, একটু বিসদৃশ ঠেকে তাঁর নিজেরই। আর সেটা ঢাকতেই বোধ করি, শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ান তিনি। কতকটা অর্ধ-স্বগতোক্তির মতই বলে ওঠেন, 'তা তাঁর এত কষ্ট করে আসবার প্রয়োজন কি ছিল! আমাকে জানালে তো আমিই—'

হ্যাঁ—তিনিই যেতে পারতেন। তাতে এমন কিছু বিস্ময়েরও কারণ ঘটত না। তাঁর প্রাক্তন অমাত্যের স্ত্রী এবং বর্তমান অমাত্যের মা-ই শুধু নন, রাধাবাঈ তাঁর নিজের পরিচয়েও অনন্যা। মহীয়সী মহিলা তিনি; বুদ্ধিতে, বিবেচনায়, ঔদার্যে, ধর্মপরায়ণতায়, সভ্যতাসহবতে, চরিত্রতেজে তিনি পুণার নারী-সমাজে অগ্রগণ্যা। তাঁর খ্যাতি দেশে-বিদেশে বিস্তৃত। তাঁর পিতৃপরিচয়ও সামান্য নয়। সবাই বলে উপযুক্ত সিংহের উপযুক্ত সিংহিনী তিনি, এবং সিংহশিশুর উপযুক্ত স্তন্যদায়িনী।

এ হেন রাধাবাঈ ছত্রপতির দর্শন চান, নিভৃতে নিবেদন করতে চান তাঁর বক্তব্য—এ রীতিমত অঘটন বৈকি!

বিত্তের অভাব নেই তাঁর। তাঁর নিজের সম্পত্তিই আছে যথেষ্ট, পিতৃদত্ত স্বামীদত্ত স্ত্রীধনের পরিমাণ নগণ্য নয় আদৌ। ছেলে বাজীরাও প্রচুর অর্থ দু হাতে ছড়িয়ে কিছু ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন বটে, তবু তাঁর এমন দুরবস্থা নিশ্চয় হয় নি যে মা-র প্রাপ্য মাসোহারা বন্ধ করবেন। নিজের মতোই তিনি মার মর্যাদা বিচার করেন, আর সে মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি রীতিমতোই সচেতন।

যে ব্রাহ্মণ-বংশের বিধবা নারীর অমন দিক্‌পালের মতো পুত্র—এক নয়, একাধিক এবং তারা সকলেই কৃতী, যশস্বী—যাঁর ঐহিক কোন অভাব নেই, যিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়া ও প্রণম্যা—যাঁর সঙ্গে বিবাদ করতে বা যাঁর অশান্তির কারণ হ'তে সাহস করে এমন একজনও নেই এ রাজ্যে—তাঁর কী এমন কারণ ঘটল একা এভাবে এসে রাজার দর্শনার্থিনী হবার? কী এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে তাঁর জীবনে, কী এমন দুঃখ?…

কিন্তু বিস্ময়ের কারণ কৌতুহলের কারণ যতই থাক, দেরি করার সময় নেই একেবারেই। রাজারও অধিকার নেই এ ক্ষেত্রে দর্শনাভিলাষিণীকে বসিয়ে রাখার। রাজমহিষীরা ছাড়া রাজ্যের সমস্ত মহিলার মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠা ও পদবীতে জ্যেষ্ঠা। অকারণে তাঁকে অপেক্ষা করানো, এমন কি রাজার পক্ষেও অশোভন ও অন্যায়।

রাজা ছত্রপতি উঠে দাঁড়িয়ে পাদুকা খুঁজছেন—এটাও বিস্ময়কর ঘটনা, কারণ তিনি শৌর্যে বীর্যে সাহসে কারও চেয়ে কম না হ'লেও শুধু শুধু বেশী ওঠা-হাঁটা বা চলাফেরা পছন্দ করেন না; বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে দৈনন্দিন

জীবনযাত্রার নিয়মকে লঙ্ঘন করতে চান না কোনমতেই : ধীরস্থির শান্ত মানুষ —অনুত্তেজনা জীবনের সাধনা ক'রে তুলেছেন বলতে গেলে ; সুতরাং তিনি দর্শনার্থিনীকে এখানে আনতে আদেশ না ক'রে নিজেই উঠে যেতে উদ্যত হবেন—এটা অবিশ্বাস্য বৈকি !

সংবাদদাতা প্রতিহারীও সেজন্য প্রভুত ব্যস্ত হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি হাতজোড় ক'রে বলল, 'আজ্ঞে, তাঁকে না হয় এইখানেই—মানে, কেউ তো এখন নেই—এখানেই তো তিনি আসতে পারেন।'

'ছিঃ ! তাঁর মর্যাদা ভুলে যেও না, তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা আর তাঁর পদবী। তিনি এক মহামাত্যের স্ত্রী—এক মহামাত্যের মা। তিনি আমারও গুরুজন-স্থানীয়া। তিনি এই প্রমোদ-কক্ষে আসবেন কি ! তাঁকে সসম্মানে আমার পুজোর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও, বলো যে আমি এখনই আসছি তাঁর আদেশ শোনবার জন্য। আর বলো যে তিনি অকারণে এই কষ্ট স্বীকার করায় ছত্রপতি যার-পর-নাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। যে-কোন সিপাহী বা ভৃত্যের মুখে সংবাদ পাঠালেও আমি নিজে যেতুম।'

নিজেও সেই কথাই বললেন ছত্রপতি শাহু।

প্রাক্তন মহামাত্যের নতমুখী বিধবা মহিষীর সামনে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে রাজা শাহু বললেন, 'এ আপনি কেন করলেন মা ! আমাকে ডেকে পাঠালে আমিই যেতুম। তাতে আমার কিছুমাত্র গৌরব হানি হ'ত না।'

বিনয়ে রাধাবাঈও কম যান না। আশৈশব রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেই তাঁর জীবন কেটেছে বলতে গেলে। সুতরাং কথার পৃষ্ঠে কথা তিনি ভালই জানেন। তিনি জিভ কেটে বললেন, 'আপনি আমার মালিকের মালিক, স্বামীর মনিব, আপনি আজও আমার বংশের অন্নদাতা। দেশের রাজা আপনি, ঈশ্বরের প্রতিনিধি।···আপনাকে ডেকে পাঠাবার মতো ধৃষ্টতা যেদিন প্রকাশ করব, সেদিন বুঝতে হবে যে আমার চিকিৎসা প্রয়োজন হয়েছে।···এমনিতেই, তুচ্ছ ব্যক্তিগত কারণে আপনাকে বিরক্ত করতে হ'ল বলেই লজ্জায় মরে যাচ্ছি।'

'কিন্তু আমি জানি যে স্বর্গগত মহামাত্য বালাজী বিশ্বনাথ রাও-এর সহধর্মিণী নিতান্ত তুচ্ছ কারণে আমাকে বিরক্ত করতে আসেন নি। আমি তাই সাগ্রহেই আপনার আদেশের অপেক্ষা করছি। তবে তার আগে আপনি আসন পরিগ্রহ করুন। অন্য কোন আতিথেয়তা—যদি ইচ্ছা করেন তো দেবী ভবানীর প্রসাদী শরবৎ একটু দিতে বলি পুজারীকে—'

'দেবী ভবানীর প্রসাদ সর্বদাই শিরোধার্য কিন্তু প্রয়োজন কিছু নেই। আর আসন—রাজাধিরাজ আসন গ্রহণ না করলে তাঁর সামনে আর কারও যে বসবার অধিকার নেই—তা তো আপনি জানেনই।'

'তা বটে।' ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবেই তাড়াতাড়ি বসে পড়লেন শাহু ছত্রপতি তাঁর আসনে। তারপর ইঙ্গিতে সামনের আসনটি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এবার বলুন, আপনার কোন্ প্রিয়সাধন করতে পারি।'

রাধাবাঈ দেবতার মূর্তিকে প্রণাম জানিয়ে, আর একবার ছত্রপতিকে নমস্কার

ক'রে নিজের নির্দিষ্ট আসনে বসলেন, কিন্তু তখনই কোন কথা বলতে পারলেন না। বরং, মুখ আনত থাকা সত্ত্বেও, মনে হ'ল তাঁর চোখে জল এসে গেছে।

ছত্রপতিও তখনই কিছু পীড়াপীড়ি করলেন না। বুঝলেন যে, স্বয়ং রাধাবাঈকে কষ্ট ক'রে আবেগ সংবরণ করতে হয় যে প্রসঙ্গে, সেটা খুব সামান্য কোন কথা নয়। এ ক্ষেত্রে আবেগ নিজে থেকে সামলাবার জন্য সময় দেওয়াই উচিত।

অবশ্য রাধাবাঈ বেশী সময় নিলেন না। একটু পরেই কথা বলার মতো নিজেকে সামলে নিলেন খানিকটা, যদিও তাঁর কণ্ঠ থেকে সে আবেগের চিহ্নটাকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করা গেল না কিছুতেই।

তিনি সেই প্রায়-রুদ্ধস্বরে বললেন, 'রাজাধিরাজ, আমার স্বামী তাঁর যথাসাধ্য আপনার সেবা ক'রে গেছেন তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত। আপনি সেই জন্যই, স্নেহবশত তাঁর তরুণ পুত্রের কাঁধেই একদা এই বিপুল রাজ্য—সাম্রাজ্য বলাই উচিত—পরিচালনার ভার তুলে দিয়েছেন—অনেক আপত্তি, অনেক বাধা অগ্রাহ্য ক'রেও। আমার পুত্রও আপনার সে বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে—তার প্রাণপণ ক'রে। অযথা বিনয় করার প্রয়োজন নেই—সেজন্য সে আপনার প্রীতি ও আস্থা-ভাজন। আপনি তাকে সন্তানেরই মতো স্নেহের চোখে দেখেন—তা আমি জানি। মহারাজ, আমি আজ আপনার কাছে আমার সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্যই ছুটে এসেছি। আপনি আপনার মহামাত্য, আপনার স্নেহভাজন সন্তান, আপনার সেবককে রক্ষা করুন, বাঁচান তাকে, বাঁচতে দিন। মহাসর্বনাশের হাত থেকে প্রাক্তন পেশোয়ার বংশ ও আপনার সিংহাসনকে উদ্ধার করুন।'

বলতে বলতেই রাধাবাঈ আসনের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করলেন।

এবার আর একবার বিস্মিত হবার পালা ছত্রপতি শাহুর। কথাটা ঠিক তিনি বুঝতে পারলেন না। যতদূর তিনি খবর পেয়েছেন—রাজকার্যে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ পায় নি মহামান্য পেশোয়ার। কোথাও তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন নি। তাঁর দ্বারা মহারাষ্ট্রের গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়েছে—এমন খবরও তিনি পান নি। তবে রাধাবাঈয়ের এ কথাগুলোর অর্থ কি?

ছত্রপতি শাহু তাঁর মনোভাব দমন করার জন্যই বিখ্যাত। ঈশ্বর তাঁকে রাজোচিত সমস্ত মর্যাদা ও গুণের অধিকারী ক'রে পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে, কিছুতেই কোন অবস্থাতে বিচলিত না হবার শক্তি তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এই তৃতীয়-ব্যক্তি-হীন কক্ষে তাঁর বিস্ময়-বিহ্বলতা গোপন করার চেষ্টা মাত্র করলেন না শাহু; খানিকক্ষণ রাধাবাঈয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'বিপদ! পেশোয়া বাজীরাও-এর সর্বনাশ আসন্ন···সে কি? কই, আমি তো তেমন কোন কথা শুনি নি। কী হয়েছে তাঁর? কোন কঠিন অসুখ হয়েছে কি?···কিন্তু তাহলে আমি অন্তত খবর পেতাম। আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না মা! যদি একটু খুলে বলেন যে বাজীরাও-এর কি হয়েছে এবং আমার কি করণীয় আছে সে ক্ষেত্রে—তো আমি আমার কর্তব্য স্থির করতে

পারি।'

'মহারাজচক্রবর্তী', এতক্ষণে রাধাবাঈয়ের কণ্ঠ অনেকটা পরিষ্কার এবং দৃঢ় হয়ে উঠেছে, 'মায়ের কণ্ঠে পুত্রের যশোগাথা যত সহজে প্রকাশ পায় তত সহজে অপযশ বা অগৌরবের কথা পায় না। পাওয়া উচিতও নয়। তাই আপনাকে সব কথা খুলে বলতে পারি নি। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি তার মা—এবং এই রাজ্যের প্রাক্তন মহামাত্যের স্ত্রী। সব কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। ...তাছাড়া ভেবেছিলাম, বিচক্ষণ ও সর্বজ্ঞ ছত্রপতি সবই জানেন, ইঙ্গিতে বুঝে নেবেন কথাটা।'

এই পর্যন্ত বলে আরও একবার থামলেন রাধাবাঈ। বোধ করি শেষ মুহূর্তের সংকোচটুকু কিছুতেই যেতে চাইছিল না তাঁর। কিন্তু শাহুকে তখনও নীরব থাকতে দেখে শেষ অবধি বলতেই হ'ল আবার, 'ছত্রপতি, আপনার অনুমান মিথ্যা নয়—সত্যই সে অসুস্থ। আর সেই জন্যই আজ এমন ভাবে, ব্যাকুল হয়ে, সমস্ত লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে এসেছি আপনার কাছে। কিন্তু সে ব্যাধি সাধারণ নয়, অথবা ব্যাধির মূলটা সাধারণ নয়। মানব জীবনের আদিমতম—বোধ করি সর্বপ্রধান রিপুর কাছে আমার বীর পুত্র সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ক'রে বসে আছে। আর সমস্ত শত্রুই তার পদানত—কিন্তু এই শত্রুর পদানত সে নিজে। মহারাজ, আমার ছেলের যশোরশ্মি চন্দ্রকিরণের মতই উজ্জ্বল—তাই বুঝি চন্দ্রের কলংকের মতোই তাঁর চরিত্রও আজ কালিমালিপ্ত। কিন্তু সে যদি শুধুই অপযশের প্রশ্ন হ'ত অগৌরবের প্রশ্ন হ ত তাহলে আমি এমন ক'রে ছুটে আসতুম না রাজাধিরাজ। সে কলংক পুরাণোক্ত মহাব্যাধির মতোই আমার পুত্রের জীবন এবং যৌবনকে ক্ষয় ক'রে ফেলছে দিনে দিনে, পরমায়ু নষ্ট করছে তিলে তিলে। তাই আমার এ উদ্বেগ, এ উৎকণ্ঠা। মহারাজ, আপনার সেবককে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করুন।'

তবুও বিহ্বলতা কাটে না শাহু ছত্রপতির দৃষ্টি থেকে। ঠিক-মত আন্দাজ করতে পারেন না রাধাবাঈয়ের বক্তব্যের পূর্ণ অর্থটা। শুধু এবার যেন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট একটা আভাস পান মাত্র।

তখনও মহারাজচক্রবর্তী শাহু তাঁর মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন দেখে রাধাবাঈ মাথা হেঁট করলেন, মাটির দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বললেন, 'ছত্রপতি, এ রাজ্যের কোন রহস্যই আপনার অজ্ঞাত নেই শুনেছি, আপনি কি পেশোয়া বাজীরাও-এর মুসলমানী রক্ষিতার কথা শোনেন নি?'

ও হো হো—ঠিক বটে, ঠিক!

এবার বুঝতে পারেন শাহু। সবটা পরিষ্কার হয়ে যায় তাঁর কাছে। রাধাবাঈয়ের এতক্ষণকার সব কথার সব হেঁয়ালিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'ও, আপনি মস্তিবাঈয়ের কথা বলছেন? হ্যাঁ, শুনেছি বৈকি! দেখেওছি তাকে একবার।'

'হ্যাঁ, তা জানি রাজাধিরাজ। সে লজ্জার কথা, পুত্রের সে কাণ্ডজ্ঞানহীন

উন্মত্ততার কথা আমরাও শুনেছি। কামে উন্মাদ হয়ে—নিজের ও আপনার, রাজ্যের ও রাজ্যের মালিকের সমস্ত মর্যাদা ভুলে গিয়ে সে সেই বাঁদীটাকে নিয়ে নাকি প্রকাশ্য দরবারেও গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন কেন সে তার ধৃষ্টতার শাস্তি দেন নি মহারাজ, কেন সে কুলটার নাক-কান কেটে মাথা মুড়িয়ে শহরের বার ক'রে দেন নি!...কী ক'রে সেই অসহ স্পর্ধা সহ্য করলেন আপনি?

শাহু বোধ করি এতটা প্রচণ্ড উষ্মার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কেমন একটু মনের মধ্যেই থতিয়ে গেলেন যেন। সেদিনের ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে এ রকম মনোভাবের কারণ হ'তে পারে—তা তিনি ভাবেন নি।

না, সত্যিই খুব অসহ্য লাগে নি শাহু ছত্রপতির। সামান্য কুলটার মতো আচরণ করতেও পারেন নি তার সঙ্গে। বরং—বরং তার সঙ্গে কথা কয়ে, তার বুদ্ধিতে, সাহসে, বাক্‌পটুতায় মুগ্ধই হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন। তাকে বাঁদী বা রক্ষিতা, বা গণিকা কোনটাই মনে হয় নি তাঁর। বরং বিপরীত মনোভাবই জেগেছিল। কে জানে সে কথাটা শুনেছেন কিনা রাধাবাঈ, শুনলে খুশি হবেন না নিশ্চয়ই—সেদিন সেই প্রকাশ্য সভায় তাকে পুত্রবধূ বলেই স্বীকার করেছিলেন এ রাজ্যের ন্যায়-নীতির রক্ষাকর্তা দণ্ডমুণ্ডের মালিক। সেই হিসাবে খেলাতেরও ব্যবস্থা করেছিলেন কিছু, পুত্রবধূর মুখ দেখানি হিসেবে।

নিজের কার্য বা আচরণের জন্য লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই রাজার, সে-রকম অভ্যস্তও নন তিনি—তবু রাধাবাঈয়ের এই প্রবল ধিক্কারের সামনে তিনি যেন একটা কুণ্ঠাই বোধ করতে লাগলেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'কিন্তু সে তো বলল, সে রাজা ছত্রসাল বুন্দেলার কন্যা, রাজা তাকে ধর্মসাক্ষী রেখে বাজীরাও-এর হাতে সম্প্রদান করেছেন—'

'কন্যা! কন্যা কাকে বলেন মহারাজ! ছত্রসাল বুন্দেলার মুসলমানী দাসীর গর্ভে জাত জারজ সন্তান। বারাঙ্গনার মেয়ে বারাঙ্গনা। আর সম্প্রদানের কথা বলছেন রাজাধিরাজ! চিৎপবন ব্রাহ্মণের হাতে বারাঙ্গনার গর্ভজাত অবৈধ সন্তান সম্প্রদান করবেন—এত ধৃষ্টতা রাজা ছত্রশালেরও ছিল না নিশ্চয়। খুশি হয়ে তিনি উপকারীকে নাচওয়ালী ক্রীতদাসী দান করেছেন—বকশিশ!...পথের কুকুরকে যদি কেউ মাথার ওপর তোলে সে তো তারই মাথার দোষ, তাতে কুকুরীর কুকুরত্ব ঘোচে না।'

ছত্রপতি নীরব রইলেন। বাদানুবাদে অভ্যস্ত নন তিনি। পুরুষ হ'লে তাঁর প্রশান্ত ললাটের পরিবর্তন—সামান্য ভ্রূকুটিটুকুর আভাস পেয়েই চুপ ক'রে যেত। আরও বেশী দুর্বিনীত বা ধৃষ্ট কেউ হ'লে তাকে চুপ করিয়ে দিতে পারতেন। শাসকদের সহজাত শিক্ষা এটা। কিন্তু তাঁর সামনে উপবিষ্টা এই মহিলা একে স্ত্রীলোক তায় মাননীয়া—ও'কে তিনি মাতৃ-সম্বোধন করেছেন—এক্ষেত্রে কিছুই করবার নেই তাই—ধৈর্য ধরে ও'র বক্তব্য শোনা ছাড়া।

রাধাবাঈও সম্ভবত ও-পক্ষ থেকে কোন উৎসাহ-বাক্য বা প্রশ্নের আশায় চুপ ক'রে রইলেন কিছুক্ষণ। বোধ করি প্রভুর সামনে এতটা উত্তেজনা প্রকাশের অশোভনতা বুঝে ঈষৎ অপ্রতিভও হয়ে পড়েছিলেন। ফলে এবার যখন কথা

কইলেন তখন কণ্ঠস্বর অনেক শান্ত হয়ে এসেছে, অনেক অনুত্তেজিত।

মাথা আবার নত ক'রে ধীর কণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ, আমাকে সামান্য পল্লীরমণীর মত ঈর্ষাতুর বা কলহপরায়ণা ভাববেন না। আমাদের ঘরে সপত্নী বা স্বামীর উপপত্নী নতুনও নয়—আশ্চর্যও নয়। তাতে আমরা অভ্যস্ত। শুধু যদি আমার ছেলের চরিত্রের প্রশ্ন হ'ত তো আমি এত বিচলিত হতাম না। আমি জানি তার চরিত্রে এত গুণ আছে যে ওটুকু যে-কেউ অনায়াসে ক্ষমা করতে পারবে। তার কর্মচারী, প্রজা, এমন কি তার মালিক পর্যন্ত ক্ষমা করেওছেন। কিন্তু এ তার জীবন-মরণের প্রশ্ন, সেই জন্যেই এত বিচলিত হয়েছি। আর বিচলিত হয়েছি বলেই হয়ত অভব্যতা বা ধৃষ্টতা প্রকাশ ক'রে থাকব—মহারাজ নিজ গুণে সেটা ক্ষমা করবেন।…মহারাজ, সাধক কবি নারীর সম্বন্ধে বলেছেন, তারা দিনে মোহিনী রাতে বাঘিনী—দুনিয়ার পুরুষ পাগল হয়ে শখ ক'রে সেই বাঘিনী পোষে, বুকের রক্ত দিয়ে সেই বাঘিনীকে খাওয়ায়। কথাটা এতদিন অতিরঞ্জন বলেই জানতাম। কিন্তু এখন ছেলের দিকে চেয়ে বুঝতে পারছি—সবাই না হোক, এমন বাঘিনীকে দু-চারজন শখ ক'রে পোষে ঠিকই—আর আমার বুদ্ধিমান রাজনীতি-বিশারদ রণকুশল পুত্র, আমার গর্ভের গৌরব, আমার বংশের গৌরব সেই নির্বুদ্ধিতাই করেছে।…ছত্রপতি মহারাজ, ইদানীং কিছুকালের মধ্যে আপনার মহামাত্যকে দেখেছেন?'

ছত্রপতি ঠিক তখনই কোন জবাব দিতে পারলেন না। মনে মনে হিসাব করতে হ'ল তাঁকে। না, বেশ-কয়মাস তিনি দেখেন নি বাজীরাওকে। বোধ হয় সেই যে সভাতে এসেছিল—সেই মস্তানীকে নিয়ে—তার পর থেকেই দেখেন নি আর।

সেই কথাই বললেন তিনি। স্বীকার করলেন অন্তত ছ-সাতমাস দেখা হয় নি তাঁর মহামাত্যের সঙ্গে। তবে সে যে খুব অসুস্থ এমন কথাও তো শোনেন নি কারও কাছে!

'কার কাছে শুনবেন রাজাধিরাজ? সকলেই তার ভয়ে ভীত। তার আর তার ঐ বাঁদীটার ভয়ে। কে বলবে সাহস ক'রে—বলে অপ্রীতিভাজন হবে রাক্ষসীর। তার ক্রোধ দেখেন নি আপনি—একেবারে পিশাচী হয়ে ওঠে সে। কিন্তু তার কথা যাক, তার কথা বলাও আমার পক্ষে পাপ। আমি আমার পুত্রের কথা বলতে এসেছি। মহারাজ তাকে একবার ডেকে পাঠান দয়া করে, তার দিকে চান। তাকে দেখলে চিনতে পারবেন না আপনি। মাত্র ছ'মাস আগেও যা দেখেছেন তার তিন-পঞ্চমাংশ রক্তমাংসও নেই তার দেহে। কঙ্কালসার হয়ে গেছে সে, চক্ষু কোটরগত, চামড়া ফ্যাকাশে হয়ে গেছে রক্তহীনতায়। আমার সেই বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান পুত্র, যাকে দেখবার জন্য, হিন্দুস্থানের সর্বত্র, সম্ভ্রান্ত পুরললনারা পর্যন্ত পাগল হয়ে বেরিয়ে আসতেন অলিন্দে বা ঝরোকার ধারে, শিল্পী পাঠিয়ে যার চিত্র আঁকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বাদশা মহম্মদ শাহ, ছবিতে দেখেও ভয় পেয়ে শিউরে উঠেছিলেন, নিজাম-উল-মুলুককে আদেশ করেছিলেন যে-কোন শর্তে সন্ধি ক'রে কলহ মিটিয়ে নিতে—সেই অমিতবীর্য

সিংহসদৃশ ছেলে আমার এক অকালবৃদ্ধ যক্ষ্মারোগীতে পরিণত হয়েছে। মহারাজচক্রবর্তী, আপনি অনেক করুণ দৃশ্য নিশ্চয় দেখেছেন জীবনে—কিন্তু আমার ছেলেকে দেখলে আজ আর অশ্রুসংবরণ করতে পারবেন না। এমন কৃশ, এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে সে।'

বলতে বলতেই দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন রাধাবাঈ—উত্তেজনাতে নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হ'তেই বোধ করি খানিকটা থামতে হ'ল তাঁকে। তবে সে মুহূর্ত দুইয়ের বেশী নয়, সামান্য একটু দম নিয়েই আরম্ভ করলেন, 'ঐ পিশাচী ওকে শুষে খাচ্ছে ছত্রপতি। প্রতিদিন, অহর্নিশ শুষছে। একদিন এক মুহূর্তের জন্যও রেহাই দেয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যন্ত সঙ্গে যায়। পুরুষের বেশে অশ্বারোহণে পাশে পাশে থাকে সে। এ কী শুধুই সাহস ছত্রপতি? এ লোভ, দুর্জয় দুর্বার লোভ। লোভ আর আশঙ্কা। এক মুহূর্তও চোখের বার করতে সাহস হয় না, পাছে জাদুর মায়া কেটে যায়। রণক্ষেত্রে অসংখ্য মৃতদেহের মধ্যেও ওদের জন্য তাঁবু পড়ে—নয়ত নির্লজ্জা, অপরাধ ক্ষমা করবেন রাজাধিরাজ, নির্লজ্জা উন্মুক্ত প্রান্তরেই রাত্রিবাস করে। দিবা-রাত্র ঐ সর্পিনীর নিঃশ্বাস সহ্য ক'রে ক'রে জর্জরিত হয়ে পড়েছে ছেলে আমার, তার দেহে এতটুকু রক্ত কি এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট নেই আর। ধনে-প্রাণে মারছে ডাকিনী—। শানওয়ার ওয়াড়ার মস্তানী-মহল তৈরি করতে সতেরো লাখ টাকা খরচ হয়েছে, আজ পর্যন্ত বোধ হয় ছত্রপতি তাঁর কোন মহিষীর মহল বানাতে এত টাকা খরচ করেন নি।…বিপুল ঋণ তার মাথায়, লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ, সম্ভবত কোটি টাকারও ওপর। এত ঋণ আমার ছেলে কোনদিন শোধ করতে পারবে না—তা সে-ও জানে। সে চিন্তাতেও সে জীর্ণ হয়ে পড়ছে অন্তরে অন্তরে—অথচ কোন প্রতিকার করতে পারছে না। প্রতিকারের সাধ্য নেই তার—ও মায়াবিনী সামনে থাকতে কোন কিছুরই প্রতিকার করতে পারবে না—এইভাবে সর্বনাশের পথে নেবে যাবে। সর্বনাশ আর অকালমৃত্যু—এ আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। মা হয়ে সন্তান সম্বন্ধে এ ধরনের অশুভ কথা মুখে উচ্চারণ করতে নেই—কিন্তু বাধ্য হয়েই করতে হচ্ছে আমাকে। সে যে কতদূর অধঃপাতে গেছে, কতদূর আত্মবিস্মৃত হয়েছে তা একটা কথাতেই বুঝতে পারবেন—রক্ষিতা বারনারীর প্রাসাদ সাজাতে ফিরিঙ্গী আয়না আর আসবাব কিনেছে পটবর্ধন সাহেবের কাছ থেকে শতকরা ত্রিশ টাকা সুদে তিন লাখ টাকা ধার ক'রে। সে সুদও নাকি চক্রবৃদ্ধিহারে চলবে। মহারাজ, কত টাকা তনখা পায় আপনার মহামাত্য? এ বিপুল ঋণ কি তার জীবনে সে শোধ করতে পারবে? এ তো মাত্র একটা। শুনেছি সন্ন্যাসী মোহান্ত ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীর কাছে পর্যন্ত দু লাখ আড়াই লাখ টাকা দেনা হয়ে গেছে ওর।'

এক নিঃশ্বাসে একটানা এতগুলো কথা বলতে ও'র দম শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবার বাধ্য হয়েই থামতে হল রাধাবাঈকে। শুধু থেমেই নিঃশ্বাস নিতে পারলেন না, দু' হাতে বুক চেপে ধরে নিঃশেষিতশক্তি ফুসফুসে শূন্যতার যন্ত্রণা নিবারণ করতে লাগলেন।

কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি ছিল না ছত্রপতি শাহুর। এবার তিনিও চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। এত কথার কিছুই জানতেন না তিনি, কোন খবরই রাখেন নি এসব ব্যাপারের। যদি এসব কথার অর্ধেকও সত্য হয়, তাহলে রাজ্য ও রাজ্যেশ্বর—উভয়ের পক্ষেই চিন্তার কথা। যার হাতে রাজ্যের সমগ্র রশ্মি—যার ইঙ্গিতে এই বিপুল সাম্রাজ্য চালিত পরিচালিত হচ্ছে, তার যদি দৈহিক, আর্থিক এবং মানসিক অবস্থা এই হয় তো এ সাম্রাজ্য দাঁড়াবে কিসের ওপর, কার ওপর ?

গম্ভীর মুখে সামান্য ভ্রূকুটি—রাধাবাঈয়ের চোখ এড়ায় নি। তিনি শান্ত ও আশ্বস্ত হলেন। বড় ভয় ছিল তাঁর, নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন ছত্রপতিকে সহজে তাঁর মহামাত্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন করা যাবে না—এটাই ধরে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাতৃহৃদয়ে আরও একটা দুশ্চিন্তা দেখা দিল। সাধারণ স্ত্রীলোক হ'লে কিছুই ভাবতেন না। আবাল্য রাজনীতি ও কুটনীতির মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছেন বলেই এ সংশয়। তিনি সন্তানের একদিক দিয়ে উপকার করতে গিয়ে আর একদিক দিয়ে অপকার ক'রে বসলেন না তো ? পেশোয়ার অমাত্য-পদ নিয়ে টানাটানি পড়বে না তো ? শত্রু চারিদিকে। রঘুজী ভোঁসলে প্রবল শত্রু। সে আবার ছত্রপতির বিশেষ প্রিয়পাত্র। তার লোলুপ দৃষ্টি এই পেশোয়া পদের দিকে আছে বহুদিন থেকেই। এই সুযোগে সে এসে জেঁকে বসবে না তো তাঁর স্বামী-পুত্রের গৌরবজ্জ্বল আসনে ? ইতিমধ্যেই রঘুজী বাজীরাওকে পিছন থেকে ছোরা মেরেছে বলতে গেলে—অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার নিজস্ব এলাকায় লুঠ-তরাজ চালিয়েছে।

তিনি ঈষৎ উৎকণ্ঠিত মুখেই আবার বললেন, 'তার একটা অসুস্থতার আরও কারণ—দেবী ভবানী ও ভগবান গণপতির দয়ায় আপনার রাজ্যের সীমা ও শক্তি-বৃদ্ধি। প্রবলের শত্রু চারিদিকে, চারিদিকেই তাই অষ্টপ্রহর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। বাজীরাও যখন দেশের শাসনভার নিয়েছিলেন তখনকার থেকে এখন কাজ অনেক বেড়েছে। সে কাজে যদি কিছু অবহেলা করত, যদি কাজ ফেলে ব্যসন নিয়ে থাকত, তাহলে শরীরটা অন্তত এত ভাঙত না। কঠোর পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা ও ঐ ডাকিনীর সংস্পর্শ—তিনে মিলে বাছাকে আমার শেষ ক'রে এনেছে। এই অল্প বয়সে—এখনও যে ওর চল্লিশ বছর বয়স হয় নি—এই বয়সেই সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। ঐ রাক্ষসী, ঐ রাহুর কবল থেকে ওকে মুক্ত করুন—ও আবার স্বাভাবিক শক্তি ও স্বাস্থ্য ফিরে পাবে, এ আমি জোর ক'রে বলছি।'

একটু শিথিল শোনাল বৈকি। একটু জোড়াতালি দেওয়া মনে হ'ল কথাগুলো। উৎকণ্ঠাটাও চাপতে পারলেন না ভাল ক'রে—তাঁর মনের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল গলার আওয়াজে, চোখের দৃষ্টিতে। আর রাধাবাঈও তা বুঝলেন।

তবে সৌভাগ্যক্রমে সেদিকে বা তাঁর দিকে মন ছিল না ছত্রপতির। তিনি ভাবছিলেন বাজীরাও-এর কথা। নিজের চোখে সবটা দেখা দরকার। অবস্থাটা

কতদূর গিয়েছে এবং কোথায় দাঁড়িয়েছে, নিজের জানা দরকার। দেখা দরকার বাজীরাওকে আর তার ঐ পত্নী বা উপপত্নীকে। ডাকিয়ে এনে নয়—তাদের ঘরে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে। সেদিনের কথাটা মনে পড়ছে। মস্তানীর কথাটা। তার চেহারাটা, তার কথাগুলো, তার সেই বিনত অথচ তেজোদৃপ্ত ভঙ্গী। রাজকন্যা, রাজবংশের কন্যা, তাতে কোন সন্দেহ নেই ছত্রপতি শাহুর। না হলে ও তেজ, ও কথার বাঁধুনি সম্ভব নয়। সেদিনের সব কথা—আদ্যোপান্তই—মনে পড়ছে ছত্রপতির। সেই প্রথম সভায় প্রবেশ করা থেকে শেষ পর্যন্ত। ঐ মেয়ে ডাকিনী, মায়াবিনী, জাদুকরী? বিশ্বাস হয় না। পুত্রের স্ত্রী বা তার প্রণয়িনী সম্বন্ধে জননীদের একটা স্বাভাবিক বিরূপতা থাকে—এও কি সেই রকম কিছু? এই অভিযোগ অনুযোগ?

আবার ভাবেন, রাধাবাঈ তো সাধারণ ঘরের সাধারণ জননী নন। তিনি যখন এতটা বলছেন, তখন তার মধ্যে খানিকটা সত্য আছে নিশ্চয়। বাজীরাও-এর অসুস্থতাটাই হয়তো সত্য কারণটা নয়।

একটা কথা মনে পড়েছে তাঁর। ত্র্যম্বকজী পিঙ্গলের কথাটা। কামরূপের কাহিনী শুনেছিলেন ছেলেবেলা থেকেই। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা নাকি ভয়ংকর, মনের মতো পুরুষ পেলেই তারা ভেড়া ক'রে দেয়, আর পোষা ভেড়া হিসাবে বেঁধে রাখে। সুদর্শন বা বীর কোন পুরুষ গেলেই তারা আটকে ফেলে—তাকে আর বেঁচে ফিরে আসতে হয় না। এ কিম্বদন্তী বহুকালের। বহুলোকের মুখে বহুবার শুনেছিলেন শাহু ছত্রপতি। তাই ত্র্যম্বকজী পিঙ্গলকে কামাখ্যা দর্শন ক'রে ফিরতে দেখে বিস্ময়ের সীমা ছিল না তাঁর। ত্র্যম্বকজী বহুকালের লোক, তাঁর চেয়ে বয়সে বড়—কিন্তু যখনকার ঘটনা তখনও ত্র্যম্বকজীর যৌবনের বীর্য বা কান্তি একেবারে লোপ পায় নি। এমন লোক সেই কুহকের দেশ ডাকিনীর দেশ থেকে ফিরে এল কী ক'রে?

প্রশ্ন করেছিলেন তিনি ত্র্যম্বকজীকে—সোজাসুজি, সরল প্রশ্ন: 'আপনি যে ফিরে এলেন বড়? আপনাকে তারা সহজে ছেড়ে দিল, ভেড়া ক'রে রাখল না? তবে যে শুনেছি—সবাই বলে—'

প্রশ্নটা শুনে খুব খানিকটা হেসেছিলেন ত্র্যম্বকজী। বলেছিলেন, 'তবে যে কী শুনেছেন ছত্রপতি, কামরূপ-বাসিনীরা পুরুষমাত্রকেই ভেড়া বানিয়ে দেয়—জাদুমন্ত্রে?' হা হা ক'রে হেসেছিলেন তিনি আবারও। তারপর ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সেবা ও যত্ন ছাড়া অন্য কোন জাদু নেই তাদের। ওখানকার মেয়েরা যে নিটোল সেবা ও যত্ন ক'রে অতিথি মাত্রকেই, মন বুঝে ও সময় বুঝে—ঠিক প্রয়োজনমত জিনিসটি যুগিয়ে দেয় হাতের কাছে—তাতে পুরুষমাত্রই অভিভূত হতে বাধ্য। ওখানকার গৃহস্থ-বধূরা বৃথা লজ্জার ধার ধারে না, অকারণ পর্দাও নেই—অথচ তারা বেহায়া বা ব্যাপিকা নয়, দারুণ পরিশ্রমী ও সেবাপরায়ণা। তার ওপর স্বভাবটিও মধুর, অক্লান্ত পরিশ্রম করে হাসিমুখে। তারা জানে পুরুষকে সেবা করা, তাকে সুখী করাই মেয়েদের প্রধান ধর্ম। সে ক্ষেত্রে কোন্ পুরুষ না ভেড়া বনে থাকতে

চাইবে, কোন্ পুরুষ না অভিভূত মুগ্ধ হবে?···আজ এতকাল পরে সেই কথাটাই মনে পড়ে গেল ছত্রপতির।

তিনিও মুগ্ধ হয়েছিলেন ঐ মেয়েটিকে দেখে, সমস্ত বিরূপতা, সমস্ত সংস্কার মুছে গিয়েছিল তার কথা শুনে। কন্যা সম্বোধন করেছিলেন তিনি স্বেচ্ছায়। ও মেয়ে যদি বাজীরাওকে মোহগ্রস্ত ক'রে রাখে, বাজীরাও যদি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য হয়ে তাকে ভালবেসে থাকেন তো তার মধ্যে ডাকিনীর মায়া অনুমান করার কোন কারণ নেই।

তবু, অভিযোগও বড় গুরুতর। যাঁর মুখ থেকে বেরোচ্ছে তাঁর কথা বা মতামতও উড়িয়ে দেবার মত নয়।

ভয়ও হচ্ছে বৈকি। বড় বেশী নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন তিনি। এতটা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা কোন নৃপতিরই উচিত নয়।

নিজের চোখেই দেখা দরকার।

কিন্তু কী উপলক্ষে যাবেন তাদের ওখানে? নৃপতির যেমন সর্ববিষয়ে সর্বোচ্চ অধিকার, যেমন সকলের ওপর আধিপত্য—তেমনি তাঁর দায়িত্ব ও সম্মানও বড় কম নয়। কোন প্রজা বা রাজকর্মচারীর ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে গিয়ে পড়া, তার সম্বন্ধে এতটা কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করা বড় মর্যাদাহানিকর। বিশেষ বিনা আমন্ত্রণে কোন কর্মচারীর বাড়ি গিয়ে পড়া—হোক না সে আত্মীয়ের মতো বা আত্মীয়াধিক।

বিপন্ন ও বিব্রত হয়ে যখন উপায় চিন্তা করছেন ছত্রপতি, অজুহাত খুঁজছেন ওদের বাড়ি গিয়ে পড়বার, তখন অকস্মাৎ, অজুহাতের সন্ধান রাধাবাঈই দিয়ে দিলেন। এতক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ ক'রে আবার বললেন, 'সে গণিকা যে শুধু রাজাকে মানে না তাই নয়, তার অসহনীয় স্পর্ধায় সে দেবতাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে। ছত্রপতি নিশ্চয়ই শুনেছেন, তাঁকে নতুন ক'রে শোনাতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা মাত্র—সে বিধর্মী হয়ে কুলটা হয়ে স্বচ্ছন্দে আমাদের কুল-দেবতা গণপতির মন্দিরে গিয়ে তাঁর সামনে নৃত্য করে—যে নৃত্যের অধিকার আমাদের দেশে আছে একমাত্র দেবতার পায়ে উৎসর্গীকৃতা দেবদাসীদেরই। এ স্পর্ধাও কি বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতে হবে রাজাধিরাজ?'

ঠিক তো। এই কথাটাই তো মনে পড়ছিল না এতক্ষণ।

হঠাৎ যেন আঁধারে আলোর দিশা পেলেন ছত্রপতি, বিজন জটিল অরণ্যে পেলেন পথের সন্ধান। মনে পড়ে গেল—মস্তানী তাঁকে বার বার বিনয়-বচনে নিমন্ত্রণ করেছিল, গণপতির পুজা-বাসরে একবার যাবার জন্য, তার নাচ দেখবার জন্য। সে আমন্ত্রণ তিনি রাখেন নি, রাখবার কথা ভাবেনও নি কখনো, সম্ভবত যে নিমন্ত্রণ করেছিল সে-ও সে রকম আশা বা ভরসা করে নি। কিন্তু তা না করুক—অজুহাত হিসেবে এইটিই উত্তম।

আগামী কালই চতুর্থী তিথি, গণপতির বিশেষ পুজার দিন। নিশ্চয় শানওয়ার ওয়াড়াতেও সে আয়োজন হচ্ছে—বা হবে। এই উপলক্ষেই যাবেন

তিনি, সাত মাস পূর্বের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

প্রসন্ন হয়ে উঠল ছত্রপতির মুখ। স্বভাবপ্রশান্ত ললাটের কুঞ্চন মিলিয়ে গিয়ে তা আবার পূর্বের উদার বিস্তৃতি ফিরে পেল। নিশ্চিন্ত হলেন শান্তিপ্রিয় ছত্রপতি। রাধাবাঈকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে যান মা, আমি শীঘ্রই নিজে এ বিষয়ে তদন্ত করব, নিজে চোখে দেখব সমস্ত অবস্থাটা। তারপর আপনাকে জানাব আমার মতামত।'

যথোচিত আশীর্বাদ ও মঙ্গল কামনা ক'রে কৃতজ্ঞ রাধাবাঈ সেদিনের মতো বিদায় নিলেন।

ছত্রপতি নিজে সঙ্গে সঙ্গে সে মহলের দ্বার পর্যন্ত এসে তাঁকে তাঁর শিবিকায় তুলে দিয়ে গেলেন। তাঁর প্রাক্তন পেশোয়ার সহধর্মিনী ও বর্তমান পেশোয়ার গর্ভধারিনীকে এটুকু সৌজন্য প্রদর্শন কোন নরপতির পক্ষেই আতিশয্য নয়।

॥ ৭ ॥

শান্ত তড়াগ মধ্যে সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপের মতোই সেদিনকার সংবাদটা পেশোয়া প্রথম বাজীরাও-এর নবনির্মিত শানওয়ার ওয়াড়া প্রাসাদে বিপুল চাঞ্চল্য ও অসংখ্য তরঙ্গাভিঘাতের সৃষ্টি করল।

খবর পেঁছিল সকাল বেলা—দিনের প্রথম প্রহর প্রায় শেষ ক'রে। আকারে ও শব্দগত অর্থে খবরটি খুবই ছোট এবং অকিঞ্চিৎকর। স্বয়ং ছত্রপতির শুভাগমন হবে আজ, তাঁর প্রধান মন্ত্রীর প্রাসাদে। আজকের বিনায়ক পূজা উপলক্ষে আয়োজিত প্রমোদানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন তিনি। আরতির সময় আসবেন—নৃত্যগীতাদি শেষ হ'লেই চলে যাবেন। পেশোয়া যেন ব্যস্ত না হন বা কোন আড়ম্বরের ব্যবস্থা না করেন। বিরাট কোন দলবল নিয়ে আসবেন না তিনি—প্রতিনিধি এবং আর তিন-চারজন মাত্র বন্ধু সঙ্গে থাকবেন।

শাহু যা-ই বলুন, রাজ-অতিথির আগমন হচ্ছে শুনলে যে-কোন লোকেরই ব্যস্ত হয়ে পড়বার কথা ; পেশোয়াও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। হুলস্থুল পড়ে গেল চারদিকে, সাজ সাজ রব উঠল। শানওয়ার ওয়াড়ার প্রাসাদ এমনিতেই নয়নাভিরাম, নব নির্মিত প্রাসাদের পূর্ণ ঔজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান, তবু তাকেই সুন্দরতর ও উজ্জ্বলতর করে তোলবার আয়োজন চলতে লাগল, আলোক-সজ্জার ব্যবস্থা করতে তখন থেকেই ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল মশালচীরা, ফটকের সামনে অভ্যর্থনা-মণ্ডপ নির্মাণ শুরু হয়ে গেল—এবং যদি ছত্রপতি দয়া ক'রে গণপতির প্রসাদ গ্রহণ করতে সম্মত হন, এই সুদূর সম্ভাবনার কথা চিন্তা ক'রে পাকশালাতেও দুশ্চিন্তার অন্ত রইল না।

প্রায় তিন-চার দণ্ড ধরে এই সব আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত ও তথ্যানুগ আদেশ-নির্দেশ দিয়ে যখন পেশোয়া অবশেষে ক্লান্ত ভাবে আসন গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর ললাটে বহু চিন্তা, বহু আশংকা ও বহু অনুমানের জটিল জাল অসংখ্য কুঞ্চিত রেখার আকারে ফুটে উঠেছে। রাজনীতির কিছুই সরল ভাবে

সহজ অর্থে গ্রহণ করতে নেই, কোন ঘটনাকেই তার বহিরঙ্গ দেখে বিচার করা উচিত নয়, কোন বাক্যকেই তার শব্দগত অর্থে নয়—এইটেই হ'ল রাজনীতিকের প্রধান শিক্ষা।

কেন আসছেন ছত্রপতি ?

কী তাঁর উদ্দেশ্য ? এমন একটা কাণ্ড ক'রে বসতে গেলেন কেন তিনি ? যাঁকে সহজে নিজের প্রাসাদ থেকে নড়ানো যায় না—তিনি অকস্মাৎ আজ এতটা উদ্যমী হয়ে উঠলেন কেন ? এখানে আসার কী এমন কারণ ঘটল ? মহামাত্যের বাড়িতে আসায় রাজার দোষ নেই সত্য কথা—তবু যাকে অনায়াসে ডেকে পাঠানো চলে, তার বাড়িতে যেচে দেখা করতে আসার প্রয়োজন কি হ'ল ? মহামাত্যই হোন আর যাই হোন—রাজাধিরাজের কর্মচারী ছাড়া কিছু নন পেশোয়া। কর্মচারীর বাড়িতে উপযাচক হয়ে আসা মনিবের পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় কি ?

নিশ্চয়ই কেউ কিছু লাগিয়েছে তাঁর নামে। হয়ত বা রাজস্ব অপহরণ ক'রে বিপুল ঐশ্বর্য-সঞ্চয়ের মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে। অথবা তাঁর ভোগবিলাস আড়ম্বরের কল্পিত চিত্র এ'কে দেখিয়েছে ছত্রপতিকে। তেমন বন্ধুর অভাব নেই পেশোয়ার। কিন্তু তবু, এর আগে ছত্রপতির প্রিয় অনুচর রঘুজী ভোঁসলে ও শ্রীপৎরাও তো বহুবার চেষ্টা করেছে বাজীরাও-এর নামে 'চুকলি খাবার'—কৈ, একবারও তো শাহু তা বিশ্বাস করেন নি বা বিচলিত হন নি। তাঁর স্বভাব-ওদার্যে কথাটা এড়িয়ে চলে গেছেন, প্রিয় পারিষদদেরও যেমন কিছু বলেন নি—তেমনি বাজীরাওকেও না।

তবে, আজ এমন কে কী বলল ? কে কী বলতে পারে ?

নিজের মনের দিকে, জীবনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, ভাল ক'রেই তাকিয়ে দেখেছেন পেশোয়া, আজও দেখছেন, ন্যস্ত বিশ্বাসের এতটুকু অমর্যাদা তিনি করেন নি। নিজে আকণ্ঠ ঋণে ডুবে গেছেন সত্য কথা, কিন্তু রাজকীয় তহবিল তছরুপ করেন নি এক কপর্দকও।

না, কিছুই ভেবে কুল-কিনারা পান না যেন—কোন পথই দেখতে পান না। শুধু ক্লান্ত শরীর যেন আরও অবসন্ন হয়ে আসে। অবশেষে একসময় মনে পড়ে সেই মানুষটির কথা—যে সর্বদা সকল অবস্থাতে তাঁর চিত্তকে প্রসন্ন ক'রে তুলতে পারে, যার অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ও বুদ্ধির দীপ্তি যে-কোন অন্ধকার দূর ক'রে আশা ও আশ্বাসে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে পারে চারিদিক। সেই মস্তানী-মহলেই লোক পাঠান তিনি—অসামান্য অনন্যসাধারণ সেই মানুষটির খোঁজে।

খবরটা মস্তানীও শুনেছিল। তার মহল থেকে এই তোড়জোড় ও কর্ম-ব্যস্ততাও দেখেছিল। হেসেছিল সে আপন মনেই—আর অপেক্ষা করছিল তার প্রিয়তমের ডাকটির। সে জানত যে তাকে নইলে পেশোয়ার চলবে না এ সময়ে, এই আপাত-সংকটকালে বিশেষ মন্ত্রীটিকে কাছে চাইই তাঁর।

আজও, এই দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার মধ্যেও, মস্তানীকে দেখে নিমেষে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পেশোয়ার মুখ। অন্তহীন সমস্যার জটিল রেখাগুলো দেখতে দেখতে

মিলিয়ে গেল কোথায়। প্রসন্ন ও শান্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

'এই যে, এসেছ। বুদ্ধি দাও দিকি! মহা সমস্যায় পড়েছি।'

'কিসের সমস্যা?—ছত্রপতি হঠাৎ কেন আসছেন—সেই সমস্যা?'

'ঠিক তাই।' হাসি মুখেই বলেন পেশোয়া। এই জন্যই এই মেয়েটিকে এত তারিফ করেন তিনি। এক মুহূর্তও বৃথা সময় নষ্ট করে না সে—এর সঙ্গে কাজের কথা কয়ে তাই এত সুখ। বৃথা বা কপট বিনয়ও নেই।

'আমার নাচ দেখতে। তাঁকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলুম, মনে নেই?'

'সেটা তো গৌণ, বা প্রকাশ্য। মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি?'

'আপনাকে দেখতে আসছেন তিনি।'

'আমাকে? কেন হঠাৎ আমাকে দেখতে আসার কী এমন জরুরী দরকার পড়ল তাঁর। আর তাও, আমাকে ডেকে পাঠালেই তো সে কাজটা হ'তে পারত।'

'ওগো, শুধু তো আপনি নন। আমাকেও যে দেখতে হবে তার। দুজনকে মিলিয়ে—একসঙ্গে।'

'তার মানে?'

এবার খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে মস্তানী, রজতঝরা কণ্ঠে। তারপর অকস্মাৎ পেশোয়ার কোলে বসে পড়ে দুহাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'মহামান্য পেশোয়া দিল্লী থেকে মহীশূর, গুজরাট থেকে বাংলার প্রতিটি লোকের প্রত্যেকটি ঘটনার হিসেব আর খবর রাখেন, কিন্তু তাঁর ঘরে তাঁরই ছত্রছায়ায় যারা বাস করছে তাদের খবর রাখেন না একটুও! প্রদীপের নিচেই যে ছায়া—তা আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়।'

প্রেয়সী নারী কোলে বসেছে, গালের ওপর রেখেছে গাল—সুখে ও আরামে শরীর এলিয়ে আসছে পেশোয়ার। তবু তিনি বলেন, 'তার মানে?'

'জননী রাধাবাঈ যে কাল নিশীথরাত্রে শিবিকারোহণে প্রাসাদের বাইরে গিয়েছিলেন, সে খবর কি আপনি রাখেন?'

'রাখি।' অপ্রত্যাশিত উত্তর দেন বাজীরাও, 'রাত্রে প্রাসাদ থেকে যে কেউ বাইরে যাক—সে খবর আমার কানে ঠিক পৌঁছয়।'

'কোথায় গিয়েছিলেন সেটা জানেন কি?'

'না, তা জানি না। মা কোথাও বিনা কারণে বা অন্যায় কাজে যাবেন না—এটা জানি বলেই খবর নিই নি আর।'

'খবর আমিও নিই নি। তবে অনুমান করতে পারি। দুইয়ের সঙ্গে কোন একটি সংখ্যা মিলে যখন দেখি চার হচ্ছে তখন সেই অজ্ঞাত সংখ্যাটিও যে দুই তা অনুমান করতে দেরি হয় কি? দেবী রাধাবাঈ নিশ্চয়ই ছত্রপতির কাছে গিয়েছিলেন।'

'যাঃ! কী বলছ তুমি? তা কি সম্ভব?'

'ঠিকই বলছি মহান পেশোয়া। যা অপর কোন রমণীর পক্ষে কল্পনাতীত তা রাধাবাঈ বার্ভের পক্ষে নিতান্তই তুচ্ছ—সহজ ব্যাপার। ভুলে যাবেন না পেশোয়া, আপনার জননী শিক্ষিতা, সামান্য সংস্কার কোন দিন তাঁর চিন্তা বা

কর্মপ্রণালীকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি! সে সব গল্প তো কতবার আপনার মুখেই শুনেছি।···আপনার শরীর ভেঙ্গে আসছে, আপনি ঋণে ডুবে যাচ্ছেন এ দেখেও কি কোন জননীর পক্ষে চুপ ক'রে থাকা সম্ভব? বিশেষ আপনার মা-র মতো তেজস্বিনী মহিলার? আমার প্রভাব কাটাতে একমাত্র রাজার দ্বারাই হয়ত আপনাকে প্রভাবিত করা সম্ভব—এই ভেবেই নিশ্চয় ছত্রপতির কাছে গিয়েছিলেন তিনি,—আর তাই এতকাল পরে ছত্রপতির মনে পড়েছে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা।'

চুপ ক'রে থাকেন পেশোয়া। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না ঠিক, তবু কথাটা যে একেবারে অবিশ্বাস্য নয় তাও বুঝতে পারেন। রাধাবাঈয়ের পক্ষে সবই সম্ভব। সামান্য কোন মৌখিক সংকোচে নিজের সংকল্প থেকে বিচ্যুত হবেন—এমন স্ত্রীলোক নন তিনি। বরং—জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পুত্রের কল্যানের জন্য এ ধরণের কাণ্ড ক'রে বসা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সাহসের অভাব নেই তাঁর—এ কথাটা ঠিক। প্রচলিত সংস্কার ত্যাগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে অসীম সাহসের কথা; সে সাহসও তাঁর আছে।···মনে পড়ে তাঁর বাল্যের একটি ঘটনার কথা। এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ সামন্ত মাহার জাতীয়া একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাস করেছেন এই নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়ার পর যখন অন্য সমস্ত ব্রাহ্মণ সামন্তরা ক্ষুব্ধ এবং সেই লোকটিকে জাতিচ্যুত করতে উদ্যত, তখন এই রাধাবাঈই আশ্চর্য ঔদার্য দেখিয়ে স্বামী বিশ্বনাথ রাওকে ধরে মাত্র পাঁচ টাকা জরিমানায় অব্যাহতি দিইয়েছিলেন। কারণ দেখিয়েছিলেন—অবশ্য আড়ালে —ওরা সত্যিই ভালবাসে পরস্পরকে। সেই রাধাবাঈ নিজের পুত্রের সত্যকার প্রণয়ে বিচলিত হয়ে এতখানি কাণ্ড ক'রে বসবেন,—এইটেই বুঝি প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

বাজীরাও হাসেন মনে মনে।···

তিনিও চুপ ক'রে থাকেন, মস্তানীও। একজনের বুকে আর একজন বুক পেতে শোনে পরস্পরের বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠবার শব্দ। কপালে কপাল রেখে অনুভব করে সীমাহীন স্নেহ ও পরিমাপহীন প্রেম। এমনি আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আছে বুঝি ওদের দুজনের হৃদয়ও। চিন্তা কল্পনা অনুভূতি স্বপ্ন সবই বুঝি ওদের এমনি জড়াজড়ি একাকার হয়ে গেছে কবে।

শেষে মস্তানীই একসময় চুপি চুপি ডাকে 'পেশোয়া!'

'উঁঃ—?' কোন্ তন্দ্রার তলিয়ে যেতে যেতে যেন সাড়া দেন বাজীরাও।

'সত্যই বড় কৃশ হয়ে গেছেন আপনি। বড় দুর্বল আর ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এই বিপুল দায়িত্ব, বিরামহীন চিন্তা আর বিরতিহীন কঠোর পরিশ্রম—এতে লোহার শরীরও ভেঙ্গে পড়ে পেশোয়া। আপনার শরীর লোহার চেয়েও সুদৃঢ় তাই এখনও টিকে আছেন। কিন্তু সব সহ্যেরই সীমা আছে একটা। এর ওপর রমণী-সম্ভোগ কিছুতে আর সইছে না আপনার। অন্তত কিছুদিনের জন্য আমাকে দূরে কোথাও সরিয়ে দিন, খুব দূরে কোথাও, আপনার রাজ্যের প্রত্যন্তসীমায়—যেখানে আমি আপনার নাগাল পাব না, শুধু আপনার শক্তির ছায়াটা পাব। আমার জন্য ভাববেন না পেশোয়া, আমার

ছেলে থাকবে সঙ্গে, মায়ে-পোয়ে বেশ কাটিয়ে দেব। আপনার শরীর একটু সারুক—আবার যেদিন ডাকবেন সেইদিনই চলে আসব আপনার পায়ের কাছে। এক বছর না হয়—ছ'টা মাসের জন্যেও আমাকে কোথাও নির্বাসন দিন, দোহাই আপনার।'

'আবার ঐ পুরনো কথা মস্তিবাঈ? কতদিন কতবার তোমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দেব? ক্লান্ত আমি ঠিকই—ক্লান্ত আর অবসন্ন, কিন্তু সে তোমার জন্যে নয় মস্তি, সে ছত্রপতির আর মারাঠাজাতির সেবার পরিশ্রমেই। বরং তুমি আমার আত্মার আনন্দ, চিত্তের বিশ্রাম। ক্লান্তিতে তেজস্কর সুরার কাজ করে তোমার সঙ্গ। তোমার বুদ্ধি আমার অবসন্ন মস্তিষ্ককে নব-সঞ্জীবনী শক্তি যোগায়, তোমার মধ্যে আমি প্রাণ পাই, নিজের সেই পুরাতন বলিষ্ঠ সত্তাকে খুঁজে পাই। তুমি আছ বলেই আজও আমি আছি, আজও আমি ভারতত্রাস পেশোয়া বাজীরাও—নইলে এ জীর্ণ খাঁচাটা কবে ভেঙে-চুরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেত, মুটা নদীর তীরে একমুষ্টি ছাই হয়ে যেত তোমার প্রিয় এই দেহখানা।'

'শুধু আমার নয় পেশোয়া, আপনার এ দেহ হিন্দুস্থানের বহু রমণীরই প্রিয়। শুনেছি মুঘল হারেমের নারীরাও আপনার তসবীর দেখে উন্মত্ত। হয়তো সেই বহু রমণীর ঈর্ষার বাষ্পেই আমার ভাগ্যের আকাশে মেঘ জমেছে আজ।'

তারপর ঈষৎ তিক্তকণ্ঠে বলল, 'অথচ কীই বা পেলুম—আপনার ভালবাসা ছাড়া। সব মেয়েই নিজের ছেলের কথা ভাবে—আপনি কথা দিয়েছিলেন আমার গর্ভজাত ছেলে যাতে সগর্বে তার পিতৃপরিচয় দিতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তবু কি তাকে জেনেউ দিতে পারলেন, পারলেন তাকে হিন্দু নামে পরিচিত করতে? আমি জোর করতে পারতুম, আপনাকে বিব্রত করা হবে বলে সে জিদ আমি করি নি—তবুও এই দুর্নামে আকাশ-বাতাস ছেয়ে গেল যে, আমি নিজের স্বার্থের জন্যে আপনাকে ভুলিয়ে আপনার সর্বনাশ করছি, আপনার মৃত্যুর কারণ হচ্ছি। আপনার প্রিয়তমা মহিষী কাশীবাঈ আর আপনার জননী রাধাবাঈ সে কথা যখন-তখন কারণে-অকারণে বলে বেড়াচ্ছেন চারদিকে। নির্বোধ মূর্খের দল তা বিশ্বাসও করছে। একবারও ভাবে না যে আপনার মৃত্যু মানে আমারও মৃত্যু। ঈশ্বর করুন সে দুর্দিন যেন শতবর্ষেও না আসে, কিন্তু যদি তেমন দুর্ভাগ্য আমার কোনদিন হয়—ওরা কি মনে করে ভাগ্যের কাছে মাথা লুটিয়ে তার পরও আমি বেঁচে থাকব।'

'থাক থাক মস্তি, এমন মধুর প্রভাতটা তুমি নষ্ট করো না। এখানে থাকতে সকালে বা দিনে তো তোমার সঙ্গে দেখাই হয় না, সেইজন্যেই তো যুদ্ধযাত্রায় যেতে আমার এত উৎসাহ—এমন দুর্লভ সুযোগ যদি বা মিলেছে ছত্রপতির কৃপায়, না-ই বা সেটাকে তিক্ত ক'রে তুললে। আমরা আমাদের ভালবাসি, এসো না সেই বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরতার স্বর্গে দু দণ্ড বিশ্রাম করি এখন।'

'আপনি যে শুধু শৌর্যে ও বুদ্ধিতেই অপরাজেয় নন, বাকপটুতাতেও

অতুলনীয়—তা আমি আগেও মেনে নিয়েছি পেশোয়া, আজও নিচ্ছি। চিরদিনই আপনি চুম্বনে ও প্রেমগুঞ্জনে আমার রসনা স্তব্ধ ক'রে দিয়েছেন, আজও দেবেন—এ আর আশ্চর্য কি?'

মস্তি আরও নিবিড় আলিঙ্গনে চেপে ধরে বাজীরাওকে—যেন সেই ক্ষীণ দেহসত্তায় নিজের যৌবন স্বাস্থ্য ও উৎসাহ সঞ্চারিত ক'রে দিতে, উজ্জীবিত ক'রে তুলতে তাঁকে নূতন উদ্যম ও কর্মপ্রেরণায়।

॥ ৮ ॥

ছত্রপতি সেদিন শিবিকায় না চেপে কেন অকস্মাৎ অশ্বারোহণে তাঁর মহামাত্যের বাড়ি এসেছিলেন তা কেউ জানে না। তবে সংবাদটা অশ্বারোহী সংবাদ-সংগ্রাহকদের ডাক-মারফৎ অনেক আগেই পেঁছে গিয়েছিল শানুওয়ার ওয়াড়ায়। সুতরাং রীতিঅনুযায়ী বাজীরাওই এসে ঘোড়ার লাগাম ধরলেন ছত্রপতির, হাত ধরে নামালেন তাঁকে।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করলেন—কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠল ছত্রপতির শান্ত ও সদাপ্রফুল্ল মুখ। কারণটাও বুঝতে দেরি হ'ল না। প্রথমটা চিনতে পারেন নি ছত্রপতি তাঁকে—শেষ তাঁদের দেখার পর এই ক'মাসে এতই পরিবর্তন হয়েছে। সেই বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় দুঃসাহসী যোদ্ধা বাজীরাওকে আজকের এই শীর্ণ অকালবৃদ্ধ প্রায়-কুব্জ—সামনের-দিকে-ঝুঁকে-পড়া মানুষটাকে চেনা সত্যিই কঠিন। চিনতে পারেন নি বলেই—সাধারণ কোন কর্মচারী ভেবে প্রথমটা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এই সৌজন্যটুকু রাজচক্রবর্তীর প্রাপ্য। তিনি যদি দয়া ক'রে কারও গৃহে অতিথি হয়ে যান তো—বাইরে এসে শিবিকা কি বাহন থেকে নামাবার দায়িত্ব গৃহস্বামীর। এই জেনেই ঘোড়ায় চেপে এসেছেন ছত্রপতি। শিবিকা এলে মহলের মধ্যে বিনায়ক মন্দিরের দ্বার পর্যন্ত যাবে, সেখানে আলো-আঁধারিতে ভাল ক'রে দেখা মুশকিল। ঘোড়া থেকে নামাতে হ'লে বাইরে আসতে হবে, সেখানে অগণিত মশালের আলোতে ভাল ক'রে দেখা যেতে পারবে।

দেখা গেলও অবশ্য। চিনতেও পারলেন একটু পরেই। কিন্তু তাতেও ছত্রপতির মুখ প্রসন্ন হ'ল না। প্রসন্ন হবার কোন কারণও নেই। এ পেশোয়াকে দেখবেন তিনি—তা আশঙ্কা করেন নি একবারও। এ কে? এ তো তাঁর সে দুর্ধর্ষ অপরাজেয় অমিতশক্তিধর মহামাত্যের প্রেতাত্মা! এর ওপর ভরসা ক'রে তিনি বসে আছেন! এ আর ক'দিন! যদি বা বেঁচে থাকে কোনমতে আরও কয়েকটা মাস—এর কাছ থেকে কী কাজ পাবেন! কতটুকু করতে পারবে এ!

অবশ্য ঠিক নিজের স্বার্থের জন্যই এতটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন শাহু এটা বললে তাঁর ওপর অবিচার করা হবে। বাজীরাও তাঁর বন্ধু-পুত্র, প্রাক্তন পেশোয়ার সঙ্গে তাঁর একটা সখ্য ও পারস্পরিক নির্ভরতার ভাব গড়ে উঠেছিল

—তা তিনি ভোলেন নি। সেই মনে ক'রেই আরও তিনি প্রায়-কিশোর বাজীরাওকে এনে এই উচ্চপদে বসিয়েছিলেন একদিন—বহু বন্ধু ও আত্মীয়ের সতর্কবাণী নিষেধ উপেক্ষা ক'রে। সেজন্য পরে অনুতপ্ত হ'তে হয় নি কোনদিন—এও এই অপত্যাধিক স্নেহ গড়ে ওঠার আর এক কারণ।

সেই স্নেহই আজ এতটা বিচলিত ক'রে তুলেছে তাঁকে। সেই সংগে কঠিন ক'রে তুলেছে তাঁকে মস্তানী সম্বন্ধে। দেখা যাচ্ছে তাহলে রাধাবাঈয়ের কথাই ঠিক। হাজার হোক তিনি শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী মহিলা—আজীবন রাজ্যশাসন-আবহাওয়ার মধ্যে প্রতিপালিতা। বিশ্বনাথ রাও-এর সহধর্মিণী, কর্মসংগিনী—তিনি মানুষ না চিনলে কে চিনবে ?

না, এর একটা কিছু প্রতিবিধান করতেই হবে তাঁকে।

কিন্তু মনে মনে যত কিছুই প্রতিজ্ঞা ক'রে থাকুন—ভগবান বিনায়কের সন্ধ্যারতি ও বন্দনা-গান শেষ হবার পর যখন তন্বী লাবণ্যবতী তরুণী মস্তানী স্বচ্ছ রেশমের অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে আসরে এসে প্রথমে দেবতাকে পরে ছত্রপতিকে প্রণাম করল, তখন তার সুকুমার মুখের শান্ত সমাহিত ভাবে, বিনম্র ভংগিতে ও দেহের অপরূপ গতিছন্দে মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না শাহু। প্রণামের প্রায় সংগে সংগেই হাত তুলে বরাভয় মুদ্রায় আশীর্বাদ জানালেন।

বিরূপতা তখনই কাটতে শুরু করেছিল—ক্রমশ সেটা নিঃশেষ হয়ে গিয়ে কখন যে আন্তরিক প্রীতিতে পরিণত হল সেটা বুঝতেও পারলেন না ছত্রপতি শাহু। নাচ তিনি অনেকদিন অনেক রকম দেখেছেন, তাঁর প্রাসাদে বেতনভুক নর্তকী ছাড়াও দেশ-বিদেশের অনেক নর্তকী এসে নাচ দেখিয়ে গেছে তাঁকে। তাঁর সামন্ত বা আশ্রিত ভূস্বামীদের গৃহেও অনেক নর্তকী দেখেছেন, প্রতিনিধি বা পেশোয়ার ঘরে আমন্ত্রিত হয়ে এসে নাচ দেখাও এই প্রথম নয়, কিন্তু ঠিক এরকমটি যে ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখেন নি—তা মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন ছত্রপতি শাহু। এ তো ঠিক নাচও নয়—সাধারণ অর্থে নাচ বলতে যা বোঝায়—তার কিছুই তো নেই এর এই লঘু পদ ও লঘুদেহের সঙ্গীত-ভংগিমায়। নর্তকীও তো নয় এই মেয়েটি—এর মধ্যে সে লাস্য, সে ভাববিলাস সে রিরংসাউদ্দীপনকারী ভংগী কোথায় ? কোথায় এর দৃষ্টিতে সে কুসুমশয্যার ইংগিত, অক্ষিপল্লবে চিরকালীন নারীর সে আমন্ত্রণ ? এ তো পূজাই। ঐ যে পুরোহিত কিছু পূর্বে সন্ধ্যারতি সেরে গেলেন—তার চেয়ে অনেক সার্থক বন্দনা এর, অনেক সত্য এর অর্চনা। এর প্রতিটি ভংগিমাই তো আরতি, এর প্রতিটি নমস্কারই তো পূজা।

অভিনয় ?

না, কোন্‌টা অভিনয় আর কোন্‌টা অভিনয় নয়—তা বোঝবার ক্ষমতা বহুদর্শী ছত্রপতির আছে। এ বয়সে খাঁটি আর মেকীর বিচার বহুবারই করতে হয়েছে তাঁকে—এবং অদ্যাপি কোন ক্ষেত্রে ঠকেন নি। অতি প্রিয় বন্ধুদের উপেক্ষা ক'রে রাষ্ট্রের এই দ্বিতীয় সর্বোচ্চপদে যখন একুশ বছর বয়সের

বাজীরাওকে অধিষ্ঠিত করেন, তখনই তাঁর এই বিচারবুদ্ধির চরম বিচার হয়ে গেছে।

এই মেয়েটির এই ভক্তিতদ্‌গত ভাব, একান্ত আত্মসমর্পণের এই পবিত্র ভঙ্গী —এ যদি সত্য না হয়, এর মধ্য দিয়ে যদি শ্রদ্ধা ও সতীরমণীর দীপ্তি না প্রকাশিত হয়ে থাকে তো—এ পর্যন্ত যা কিছু তিনি সত্য ও শ্রেয় বলে জেনে এসেছেন তা সবই মিথ্যা, সবই অকিঞ্চিৎকর।

না, এ মেয়ে খাঁটি সোনা, অথবা তার চেয়েও বেশী—অন্তত তাঁদের, যুদ্ধ-ব্যবসায়ীদের কাছে—খাঁটি ইস্পাত ; এর মধ্যে কোথাও কোন ভেজাল নেই, খাদ নেই।···

একমনে নেচে চলেছে মস্তানী, তন্ময় হয়ে, তদ্‌গত হয়ে। তার একদিকে ভগবান, আর একদিকে রাজেশ্বর ও হৃদয়েশ্বর ; এর মধ্যে সে যে কাকে এ নাচ দেখাচ্ছে ; উজাড় ক'রে দিচ্ছে তার শিক্ষা-দীক্ষা—ভক্তি-ভালবাসা, তার সমস্ত সত্তা, সমস্ত অস্তিত্ব—তা সেই জানে। কিন্তু থামছে না সে, তার যেন ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। তার এ পূজা বুঝি অনন্তকালের, তার এ আত্মনিবেদনও বুঝি অনন্তেরই পায়ে।

অবশেষে এক সময়ে প্রায় অর্ধপ্রহর-কাল একটানা নেচে—যখন সুদ্ধমাত্র সঙ্গতকারীদের অবশ-হয়ে-আসা হাতের দিকে ও তাদের চোখের করুণ মিনতির দিকে চেয়েই শেষ পর্যন্ত থামতে হয় তাকে—তখন মুগ্ধ অভিভূত ছত্রপতির মন থেকে সমস্ত বিদ্বেষ ও বিরূপতা মুছে গেছে, সে জায়গায় ফুটে উঠেছে এক অপরিসীম বিস্ময়। তিনি স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে স্বয়ং আসন থেকে উঠে এগিয়ে গেলেন তাকে পুরস্কৃত করতে, হাতের কাছে কিছু না পেয়ে নিজের উষ্ণীষ থেকেই মুক্তার মালা খুলে তাকে উপহার দিতে উদ্যত হলেন।

মস্তানীর চোখ থেকে তখনও ভক্তি-বিহ্বলতা কাটে নি, কণ্ঠ ও ললাটের স্বেদ-কণিকার সঙ্গে কপোলের অশ্রুবিন্দুগুলো মিশে কী যেন অনির্বচনীয় মোহের সৃষ্টি করেছে সে-মুখে। ছত্রপতি বুঝলেন বাজীরা-এর অবস্থা। যুগ যুগ ধরে এই সব মেয়েদের দ্বারে পুরুষরা চিরভিখারী। উমার কাছে শঙ্কর, লক্ষ্মীর কাছে নারায়ণ, ইন্দ্রাণীর কাছে মহেন্দ্র। দেবতারাই যদি না এ মোহ সংবরণ করতে পেরে থাকেন—মানুষ বাজীরাওকে কী দোষ দেবেন তিনি।

তিনি স্মিত প্রসন্ন মুখে সপ্রশংস চিত্তে উপহার-সুদ্ধ দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করলেন নর্তকীর দিকে। কিন্তু ততক্ষণে কিছুটা সংবিৎ ফিরে পেয়েছে মস্তানী, সে সে-উপহার তখনই গ্রহণ করল না, তাই বলে প্রত্যাখানও করল না—সসম্মানে রাজেশ্বরের ঈপ্সিত বরাভয় হস্ত মাথায় ঠেকিয়ে হেঁট হয়ে তাঁকে প্রণাম করল, তারপর মুক্তাহারটি হাতে নিয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বিনম্রকণ্ঠে বলল, 'শুধু উপহার নয় মহারাজ চক্রবর্তী', আপনার এ কন্যার লোভ কিছু বেশী। আরও কিছু ভিক্ষা আছে তার। যদি সত্যিই প্রসন্ন হয়ে থাকেন এ অধীনের ওপর, যদি সত্যিই কিছু তৃপ্তি বা আনন্দ দিতে পেরে থাকি তো, দয়া

ক'রে একটি বরও দিন আমাকে।'

'বেশ তো, নির্ভয়ে বলো কী চাও। যদি সাধ্যে কুলোয় তো অবশ্যই দেব।'

'ছত্রপতি মহারাজ—আমি আপনার কাছ থেকে বর-রূপে একটি দণ্ডই প্রার্থনা করছি। হয় আমাকে আপনার রাজ্যসীমা থেকে নির্বাসন দিন, নয়তো এমন কোন দুর্গে বন্দী ক'রে রাখুন যেখানে আমার পুত্র ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির যাবার অধিকার না থাকে।'

ছত্রপতি নির্বাক। সমস্ত সভাও তাই।

বোধ করি একটি পালক উড়ে এসে পড়লেও তার শব্দ শোনা যেত—এমনই সুগভীর স্তব্ধতা নেমে এল চারিদিকে কিছুক্ষণের জন্যে।

কী বলছে এ মেয়েটা!

এর মাথা ঠিক আছে তো?

অতিরিক্ত পরিশ্রমে সব গোলমাল হয়ে যায় নি তো?

ছত্রপতি প্রথম দর্শনেই বিস্মিত হয়েছিলেন এই মেয়েটি সম্বন্ধে, বিস্মিত আজ কিছু পূর্বেও বড় কম হন নি, কিন্তু সে বিস্ময়ের জাত আলাদা। আজকের এই মুহূর্তের বিস্ময় শুধু তাঁকে হতবাক্ নয়—হতবুদ্ধিও ক'রে দিল খানিকটা। বহুক্ষণ শুধু বিহ্বল হয়ে চেয়েই রইলেন তিনি।

আর বাজীরাও! তিনি সেই নৃত্যের শুরু থেকেই নিস্পন্দ নির্বাক হয়ে বসে ছিলেন, একটি কথাও কন নি বা আর কোন দিকে ফিরে চান নি। তাঁর সেই দৃষ্টি যে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্থিরনিবদ্ধ হয়ে ছিল মস্তানীর ওপর, সে দৃষ্টি আর সরিয়ে নিতে পারেন নি একবারও। শুধু, তাঁর প্রিয়তমার গতির সঙ্গে সঙ্গে দুই চোখের মণিই ঘুরেছে ফিরেছে—মুখ বা চোখ নড়ে নি কোথাও। বুঝি পলকই পড়ছিল না, এমন নিশ্চল হয়ে চেয়ে ছিলেন তিনি।

কিন্তু এবার তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন। যে বিস্ময়ের আঘাত ছত্রপতিকে স্তম্ভিত ক'রে দিল, সেই আঘাতেই বাজীরাও সক্রিয় ও অস্থির হয়ে উঠলেন। বিষম উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে এলেন তাঁর দয়িতা মস্তিবাঈয়ের দিকে।

'এ—এসব কী বলছ মস্তি, কী বলছ তুমি ছত্রপতিকে! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

'না পেশোয়া, আমি যা বলছি ঠিকই বলছি, ভেবে-চিন্তেই বলছি। দুঃসহ ক্লান্তিতে যদি আপনার মস্তিষ্ক পর্যন্ত অবসন্ন হয়ে না পড়ত, তাহলে এ কথা আপনিই বলতেন, এ প্রার্থনা আপনিই জানাতেন।'

অনুচ্চস্বরে হলেও বেশ স্পষ্টভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বলে মস্তানী। তারপর আবারও সেই বিকশিত কমলদলের মতো দুটি শুভ্র কোমল হাত একত্র ক'রে বলে, 'মহারাজচক্রবর্তী, আপনার দীনা কন্যার এই ভিক্ষা, এ প্রার্থনায় কোন ছলনা বা কপটতা নেই—সত্যিই এখন এ আমার আন্তরিক প্রার্থনা।··· ছত্রপতি মহারাজ, আপনি আপনার প্রিয় সেবক এই মহান পেশোয়ার দিকে চেয়ে দেখুন। গুরুতর রাজকার্যে, নিরন্তর বহু সমস্যার চাপে ও অবিরাম যুদ্ধে ইনি ক্লান্ত। তার ওপর আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে ঘরেও এঁর একবিন্দু শান্তি

নেই। আরও সেই কারণেই অহরহ কর্মব্যস্ত থাকেন উনি, এতটুকু বিশ্রাম নেবার মতো স্থান বা অবসর ও'র নেই। আমি দূরে সরে না গেলে মনের শান্তি বা দেহের বিশ্রাম কোনটাই উনি পাবেন না। এ দাসী বহুদিন সেবা করেছে ও'র, আর কেন? আমারও কিছু ছুটি পাওনা হয়েছে এবার। সেটাই আমি দূর নির্বাসনে কিংবা নির্জন কারাবাসে ভোগ করতে চাই। মহামান্যা মহিষী কাশীবাঈ আমার জন্যেই স্বামীর সেবা থেকে বঞ্চিত, আমার ওপর অভিমান ক'রে তাঁর এবং আমাদের প্রভুর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রচনা করেছেন অপ্রীতি আর অশান্তি দিয়ে। আমি সরে গেলেই তিনি কাছে আসবেন—তাঁর সেবায় উনি শুধু দৈহিক আরাম নয়, মানসিক শান্তিও ফিরে পাবেন। ফিরে পাবেন মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রীতি, পুত্রের ভক্তি। আমার জন্যেই উনি সংসারে যা কিছু ঈপ্সার বস্তু তা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। আমার নির্লজ্জতা ক্ষমা করবেন—আমার সেবায় যে শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে ও'র মহিষী কাশীবাঈয়ের সেবায় তা নেই, ছ'মাস বৎসরকাল সে সেবা পেলে শরীর ও'র সুস্থ সবল হয়ে উঠবে, গ্লানিমুক্ত হবেন সব দিক দিয়েই।···আমার জন্য না হোক, আপনার প্রিয় পেশোয়ার দিকে চেয়েই অধিনীর ভিক্ষা মঞ্জুর করুন রাজাধিরাজ।'

অভিভূত হয়ে শুনছিলেন ছত্রপতি। বিস্মিত হবার শক্তিও যেন শেষ হয়ে এসেছে তাঁর। কী বলছে মেয়েটা, কী বলতে চায়? নিজে নিজের সর্বনাশ করতে চায় এমন মেয়ে তো তিনি দেখেন নি এর আগে।···যে অপ্রীতিকর কর্তব্যের, যে শাস্তিদানের সংকল্প নিয়ে উনি এসেছিলেন—অপরাধিনী সেই শাস্তি পুরস্কার হিসেবে চেয়ে বসল! এমন প্রার্থনার জন্য কোন মানসিক প্রস্তুতিই ছিল না যে তাঁর! কর্তব্যের পথ এমন অভাবনীয় ভাবে সুগম হয়ে গেল—তবু অস্বস্তি কমল না তো!

বড়ই বিব্রত বোধ করলেন শাহু। একটু কেমন দ্বিধাভরে চাইলেন পেশোয়ার দিকে। এ মেয়েটি যা বলছে, কাল রাধাবাঈও তাই বলেছিল; এবং তা কিছু-মাত্র অসত্য বা অতিরঞ্জিত নয়। তবু বিনা দোষে বিনা অপরাধে এমন শাস্তিই বা দেওয়া যায় কি ক'রে—বিশেষ যে মেয়েটি তার কাজে কথাবার্তায় সত্য-সত্যই স্নেহের পাত্রী হয়ে উঠছে ও'র।···

সেই অস্বস্তিকর নীরবতা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা থেকে বাজীরাওই রক্ষা করলেন ছত্রপতিকে। তিনিও এবার সামলে নিয়েছেন নিজেকে, প্রস্তুত হয়েছেন এই নাটকের অভিনয়ে যথাযথ অংশগ্রহণ করতে। বৃথা সঙ্কোচ তিনি করবেন না—মিথ্যা চক্ষুলজ্জার অবসর আর নাই। তিনিও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন ক'রে করজোড়েই নিবেদন করলেন তাঁর বক্তব্য। শান্ত অথচ বেশ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'মহারাজচক্রবর্তী, আপনি অন্নদাতা, প্রতিপালক, দেশের রাজা—সব দিক দিয়েই পিতৃতুল্য। আপনি শুধু আমার নন—পিতারও অন্নদাতা, পৃষ্ঠপোষক বন্ধু। আপনার সামনে মিথ্যা বলছি না। আমি সত্যই ক্লান্ত, অসুস্থ; দেহ ও মন দুই-ই আমার অবসন্ন। আপনার বিপুল সাম্রাজ্যের দায়িত্ব আমার ওপরে, ঈশ্বর জানেন সে দায়িত্ব আমি বুকের রক্ত দিয়ে বহন

করেছি। তাও হয়ত পারতুম না—যদি না আমার এই স্ত্রী মস্তানী আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত ছায়ার মতো। ছত্রপতি মহারাজ, আমি জেনে-শুনেই ওকে আমার স্ত্রী বলছি। এক পবিত্র গোধূলিলগ্নে ওর পিতৃপুরুষের দেবতাকে সাক্ষী রেখে আমাদের শুভদৃষ্টি ঘটেছিল, ওর পিতা আমার হাতেই ওকে সম্প্রদান করেছেন, মেয়েটিও সেই থেকে অনন্যমনা হয়ে আমাকে ভজনা করেছে—এ যদি বিবাহ না হয় মহারাজ তো বিবাহের কী অর্থ আমি বুঝি না। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এখন এই দুর্বল শরীরে ও-ই আমার অবলম্বন, ও যদি পাশে না থাকে প্রয়োজনের সময়, তাহলে এ শরীর যে আর একদিনও এ অবহনীয় কর্মভার বইতে পারবে, তা মনে হয় না। আমার মা, আমার স্ত্রী বা ভ্রাতারা এটা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না—তাঁরা অকারণ অশান্তি সৃষ্টি করছেন, সেই অশান্তি থেকে আমাকে বাঁচাতেই নিজে থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন-দণ্ড নিতে চাইছে বেচারী—কিন্তু আমি আপনাকে এবং আমাদের কুলদেবতাকে সামনে রেখে বলছি—তাতে অশান্তি আমার কমবে না একটুও, শরীরও রক্ষা হবে না।'

এক নিশ্বাসে নিজের বক্তব্য নিবেদন ক'রে থামলেন বাজীরাও। কিন্তু এইটুকু পরিশ্রমে আর উত্তেজনাতেই তাঁর শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, ফলে যা একেবারেই রীতিবিরুদ্ধ, যা একান্ত অশোভন তাই ক'রে বসলেন, অথবা করতে বাধ্য হলেন। ছত্রপতি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই অবসন্নভাবে, যেন টলতে টলতে একটা আসনে বসে পড়লেন।

আর চোখের পলক না ফেলতে ফেলতেই, বোধ করি বাজীরাওর মুখ দেখেই অনুমান করতে পেরেছিল, মস্তানী ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে তাঁর আঙরাখার মধ্যে দিয়ে হাত চালিয়ে বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তার উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল চোখ দুটি নির্নিমেষে তখন বাজীরাও-এর মুখের উপরই স্থাপিত, রাজা, প্রতিনিধি, রাজ-পারিষদ, পেশোয়ার বন্ধু, পুরোহিতের দল—এমন কি মন্দিরের দেবতাও তার চোখ থেকে তার মন থেকে তখন অবলুপ্ত।

ছত্রপতি কিছুকাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এই মধুর জগৎসংসার-বিস্মৃত প্রণয়-দৃশ্যটি উপভোগ করলেন। তাঁর দৃষ্টি থেকে আন্তরিক প্রীতি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হ'তে লাগল এই দুটি অল্পবয়সী নরনারীর ওপর। তারপর কে জানে কেন ঈষৎ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুমি তোমার অসুস্থ প্রভুরই সেবা করো বসে, এখন তোমার দূরে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। আর পেশোয়া, আমি কালই আমার নিজস্ব বৈদ্যকে পাঠাব, তাকে দেখিয়ে তুমি নিয়মিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে, সম্ভব হয় তো কিছুদিন নির্জনে কোথাও বিশ্রাম নাও। তোমার ভাই চিমনজী যেমন বীর তেমনি সুবিবেচক, তোমার সাময়িক অনুপস্থিতিতে সে-ই তোমার কাজ বেশ চালাতে পারবে। তুমি অবশ্যই ছুটি নিও, অন্তত তিন-চার মাসের জন্য।'

বাজীরাও-এর তখন কথা কইবার অবস্থা নয়। বুকে কী একটা ব্যথা উঠছে আজকাল—একটু উত্তেজনাতেই টের পান এটা—সেই সঙ্গে একটা শুকনো

কাশির ধমক—কথা বলার চেষ্টাও তখন সাধ্যাতীত। তাই ছত্রপতিকে তার প্রস্তাবের অবাস্তবতাটা বুঝিয়ে দেওয়া গেল না; বলা গেল না যে, এ সময়ে রাজ্যের ঘরে বাইরে প্রবল শত্রু, উদ্যত-বজ্রের মতো মহম্ভয় পেশোয়া এতটুকু সরে গেলেই সেই সমস্ত শত্রু মাথা তুলবে। ভাই চিমনজী আপ্পাও বহুদূরে সুরাটে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত, তার পক্ষে এখানে এসে পেশোয়ার গুরু কর্তব্যভার গ্রহণ সম্ভব নয়—এসব কোন কথাই বুঝিয়ে বলা গেল না। শুধু নীরবে দুটি হাত তুলে প্রণাম জানিয়ে মনিবের প্রীতি ও শুভেচ্ছা মাথা পেতে নিলেন পেশোয়া বাজীরাও।

তাঁদের উঠতে বা ব্যস্ত হ'তে বা কোন প্রকার প্রত্যানুগমনের চেষ্টা করতে নিষেধ ক'রে কর্তব্য-সম্পাদন-তৃপ্ত ছত্রপতি শাহু সেদিনের মতো বিদায় নিলেন।

॥ ৯ ॥

এ সংবাদ যথাসময়েই রাধাবাঈয়ের কাছে পৌঁছল। তাঁর এ শোচনীয় ব্যর্থতার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই শুনলেন তিনি। একটি কথাও বাদ গেল না —একটি তথ্যও না। সমস্ত নাটকটাই যেন তাঁর চোখের সামনে অভিনীত হ'তে দেখলেন, প্রধান পাত্র-পাত্রীদের অবস্থান মুখভাব সুদ্ধ।

সংবাদদাতা একাধিক। মন্দিরের পূজারীর দল থেকে শুরু ক'রে দ্বার-রক্ষকরা পর্যন্ত। সকলের বক্তব্যই শুনলেন তিনি, কিন্তু উত্তরে কথা বললেন না একটিও। শুধু একটির পর একটি তাঁর পরাজয়ের ইতিবৃত্ত শুনতে শুনতে তাঁর দৃষ্টি কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠল এবং উদ্গত ভয়ংকর রোষ দমন করতে নিজের ওষ্ঠাধর নিজের দাঁতে চেপে শোনিতাক্ত ক'রে তুললেন।

বোধ করি রক্তের সেই লবণস্বাদেই প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন রাধাবাঈ। রুধির-পিপাসা? হ্যাঁ—মহাকালীর মতোই আজ তিনি, তাঁর দেহ রুধির-পিপাসু হয়ে উঠেছে। ঐ মেয়েটার মুণ্ড নিজে হাতে ছিঁড়ে তা থেকে সদ্যনির্গত রক্ত খর্পর ভরে পান করতে পারলে কথঞ্চিৎ শান্ত হয় তাঁর এই দিক্‌দাহকারী রোষ। কিন্তু তবু এ অপমান এবং এই প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি এদের সামনে না প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ছি! সে বড় দৈন্য, সে বড় লজ্জার কথা। পেশোয়া বিশ্বনাথ রাও-এর স্ত্রী তিনি, বাজীরাও-এর জননী—তাঁর মর্যাদা তাঁর প্রাণের চেয়েও বড়। যে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁকে দেবীর মতো মান্য করে, তাদের চোখে ছোট হওয়া চলবে না কিছুতেই।

তিনি কোনমতে নিজেকে সামলে—অসাধারণ ইচ্ছাশক্তির জোরে কণ্ঠস্বরকে সহজ ও স্বাভাবিক ক'রে তুলে ওদের বিদায় ক'রে দিলেন। সংগৃহীত সংবাদের মূল্য হিসাবে কিছু পুরস্কার দিতেও ভুল হ'ল না তাঁর।

কিন্তু সংবাদদাতার দল নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতেই, আবার চোখে আগুন জ্বলল রাধাবাঈয়ের। সে আগুন এমনই তীব্র, এমনই দাহিকা-শক্তিসম্পন্ন যে মনে হ'ল সেই আগুনই বহু প্রাচীর-দেওয়াল এবং উদ্যানের ব্যবধান পার হয়ে এই

মুহূর্তে মস্তানীমহলে পেঁছে সে মহলের অধীশ্বরীকে দগ্ধ করবে। ক্রোধে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি বহু গালাগালি দিলেন, একা-একাই বসে। অথবা একা একা বলেই দিতে পারলেন। অন্য কোন লোক—এমন কি সমব্যথী বধু কাশীবাঈয়ের সামনেও তিনি এ ইতরতা প্রকাশ করতে পারতেন না। …সম্ভ্রমবোধ, আত্মমর্যাদা-জ্ঞান এবং নিজের পদবীর মূল্য কোন অবস্থাতেই তাঁদের ভুলতে নেই, এই শিক্ষাই—বলতে গেলে আজন্ম—তাঁর পিতা ও স্বামীর কাছে পেয়েছেন।

বহুক্ষণ ধরে সেই দ্বিতীয়-প্রাণীশূন্য ঘরে বসে ইতর স্ত্রীলোকদের মতো গালিগালাজ ও অভিসম্পাত বর্ষণ ক'রে কিছুটা সুস্থ হলেন রাধাবাঈ। সম্ভ্রম-বোধ ও পদমর্যাদা সম্বন্ধে তিনি খুব সচেতন—তবু মনের গোপন-নির্জনে এটা তিনি স্বীকার করেন যে, দ্বেষ-ঈর্ষা-ক্রোধের মুহূর্তে সাধারণ সামান্য রমণীদের মত কলহ-কোঁজিয়া বা গালিগালাজ করতে পারলে মনটা অনেক সুস্থ ও সহজ হয়, মনের ভার নেমে যায় অনেকটা। আজ আরও একবার, মনে মনে, সেই পরীক্ষিত সত্যটাই মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

মনের অবস্থা অনেকটা শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে এলেও সে-রাত্রে তাঁর আহার হ'ল না। দেবী ভবানীর প্রসাদী মিষ্টান্ন শ্রীখণ্ড ও মালপোয়া নিত্য আসে তাঁর সেবার জন্য, আজও এসেছে, কিন্তু আহারে রুচি বা ইচ্ছা নেই তাঁর এক-বিন্দুও। উপায়ও নেই। সন্ধ্যায় বারকয়েক ইষ্টমন্ত্র জপ ছাড়া সান্ধ্য সাধনার অন্য কোন কৃত্য তাঁর হয়ে ওঠে নি। তিনি একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ, অন্য লোক, বিশেষত স্ত্রীলোকের মতো পরচর্চা পরনিন্দা করতে করতে—কিংবা বিষয়-চিন্তা করতে করতে ভগবদারাধনা করতে পারেন না। মন শান্ত ও একাগ্র না হলে পূজা-পাঠের মূল্য কি? আজ সন্ধ্যা থেকেই মন পড়ে আছে তাঁর বিনায়ক-মন্দিরের আসন্ন নাটকের দিকে, কী হয় কী হয় এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত—কিছুটা অধীরও—সে সময় ইষ্ট-আরাধনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

অবশ্য তাতেও ঠিক আহার আটকাত না। গুরুদেবের স্পষ্ট নির্দেশ আছে এ বিষয়ে, 'আত্মাকে কষ্ট দিয়ে পূজা-পাঠ-আরাধনা করতে যেও না। মন পড়ে থাকবে কখন এসব পালা চুকিয়ে একটু জল খেতে পাবো সেই দিকে—সে অবস্থায় কোন পূজা-পাঠ হয় না।' নিত্য-পূজা অসমাপ্ত রেখে এ রকম আহার দু-একবার করেওছেন। কিন্তু আজ আর তার প্রয়োজন নেই। রুচিই নেই আহারে। কিছুতেই রুচি নেই তাঁর। তাঁকে, তাঁর স্বামীর জীবদ্দশায় সকলে বলত সিংহের উপযুক্ত সিংহিনী—কথাটা আংশিক সত্য তো বটেই। শুধু আহার কেন—নিদ্রাও অসম্ভব আজ তাঁর পক্ষে। এ অনাচারের কোন প্রতিবিধান করতে না পারলে, আজকের এ অপমানের কোন প্রতিশোধ-উপায় ভেবে বার করতে না পারলে, কিছুই হয়ে উঠবে না তাঁর। আহার নিদ্রা পূজা—কিছুই না। কুহকিনী ডাকিনী তার জাদুর শক্তির অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে অবশেষে সিংহিনীর ঘুম ভাঙিয়েছে তার গুহায় এসে, নৃত্যরতার লঘু পদক্ষেপ পদাঘাত

হয়ে বেজেছে সিংহিনীর গায়ে—এর শোধ না তোলা পর্যন্ত সে সিংহিনী শান্ত হ'তে পারবে না।

বহুরাত্রি পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন রাধাবাঈ তাঁর ঘরে। দাসীদের আগেই ছুটি দিয়ে দিয়েছেন, নইলে তারা তাঁর শয়নের অপেক্ষায় বাইরে বসে বসে ঢুলত আর মধ্যে মধ্যে রাত্রির গভীরতা স্মরণ করিয়ে দিতে অকারণে ঘরে ঢুকে তাঁকে বিরক্ত করত। কেউ নেই, কোন অবাঞ্ছিত উপস্থিতি তাঁর চিন্তার সূত্র ছিন্ন করবে না—এমনি স্তব্ধ নির্জনতাই তখন তাঁর প্রয়োজন।

নিজের আসনেই স্থির হয়ে একভাবে বসে রইলেন রাধাবাঈ। শয্যা অস্পর্শিত রইল; অদূরে রূপোর ঢাকায় চাপা ভবানীর প্রসাদও। অন্য দিন—না খেলেও একবার মাথায় ঠেকিয়ে প্রসাদের মর্যাদা রক্ষা করেন—আজ সে কথাও মনে রইল না। অবশেষে, প্রাসাদের ঘড়িতে যখন ঢং ঢং ক'রে তিনটে বেজে আসন্ন রাত্রিশেষের বার্তা ঘোষণা করল তখন তিনি অকস্মাৎ নড়ে-চড়ে বসলেন। মুখে-হাতে জল দিয়ে শয্যার শিয়রের দিকে একটি কাঠের বাক্সে রাখা কাগজ, লেখনী, বালুর পাত্র ও মস্যাধার বার ক'রে সেই রাত্রেই প্রদীপের আলোতে চিঠি লিখতে বসলেন।

পর পর দুখানি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন তিনি। একটি তাঁর পুত্র আস্তাজী বা চিমনজীকে, আর একটি পৌত্র বালাজীকে। দুজনকেই সংক্ষেপে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বিশাজী বা বাজীরাও-এর স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা, তার প্রধান কারণ এবং কোন একটা উপায় উদ্ভাবনের জরুরী প্রয়োজন লিখে জানালেন। প্রতিকারের উপায়ও কিছু চিন্তা করেছেন তিনি, কিন্তু পুত্র বা পৌত্র কেউ হাতের কাছে না থাকলে সে চিন্তা কার্যকরী ক'রে তোলা সম্ভব নয়। একা অসহায় স্ত্রীলোক রাজশক্তির বিরুদ্ধে কী এবং কতটুকুই বা করতে পারেন? সুতরাং ওরা যেন পত্রপাঠ কোন ছুতোয় এখানে চলে আসে একবার—কোনমতেই না এর অন্যথা হয়।··

চিঠি শেষ ক'রে নিজের হাতে শীলমোহর ক'রে যখন বধূ কাশীবাঈয়ের মহলের দিকে রওনা হলেন তখন পূর্বাকাশ রঞ্জিত ক'রে উষা নয়—সূর্যই দেখা দিয়েছেন। অন্য দিন এসময় স্নান সেরে পূজাতে বসে যান তিনি। তা হোক, এটুকু পুষিয়ে নিতে পারবেন তিনি, মধ্যাহ্নের পূর্বে জলগ্রহণ না হয়ে ওঠে একটু চরণামৃত পান ক'রে সন্তানদের কল্যাণ করবেন। কিন্তু এ চিঠি দুটো আজই যাওয়া চাই। আর সেজন্য কাশীবাঈয়ের সাহায্য প্রয়োজন। এখন আর তিনি এ গৃহের কর্ত্রী নন, পেশোয়ার মহিষীও নন। দূরে ঘোড়সওয়ার পাঠাতে গেলে পেশোয়ার অনুমতি প্রয়োজন, একমাত্র তাঁর মহিষীই পারেন সে অনুমতি না নিয়ে কাউকে পাঠাতে। বাজীরাও-এর কানে গেলেও কোন তিরস্কার করতে বা বরখাস্ত করতে পারবেন না সে ঘোড়সওয়ারকে।···

কাশীবাঈকে বলে ঘোড়সওয়ার তৈরি করিয়ে একেবারে রওনা ক'রে দিয়ে তিনি যখন নিজের মহলে ফিরলেন তখন প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। দাসীরা, পূজারী ব্রাহ্মণরা সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে। তা হোক, তাঁর

নিজের মন অনেকটা শান্ত হয়েছে এবার—নিশ্চিন্ত মনেই উপাসনাতে বসতে পারবেন।

সংবাদটা সেই দিনই বাজীরাও-এর কানে পৌঁছেছিল কিন্তু অতটা গ্রাহ্য করেন নি। স্ত্রীলোকদের ঈর্ষা-বিদ্বেষ কলহ-কচকচি তো আছেই—তাতে আর কোন্ পুরুষ কবে কান দিয়ে নিজেদের কাজ নষ্ট করে? অন্তত যারা পুরুষ বলে পরিচিত হ'তে চায়, যাদের কিছুমাত্র গর্ব আছে পৌরুষের—তারা করে না; বাজীরাও এই বিশ্বাসই ধরে ছিলেন।

কিন্তু সে বিশ্বাসে প্রথম আঘাত লাগল যখন ভাদ্রের মাঝামাঝি ভাই চিমনজী আপ্পা পর্তুগীজ-দমনের কাজ অসমাপ্ত রেখে অকস্মাৎ পুনায় ফিরে এলেন। বিস্মিত হলেন বাজীরাও, বিরক্তও হলেন। পর্তুগীজরা পরাজিত হয়েছে ঠিকই এবং চিমনজী সে যুদ্ধে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা তাঁদের বংশেরই উপযুক্ত তাতেও সন্দেহ নেই—তবু কাজ যে ওখানে অনেক বাকী। শত্রুর শক্তি নির্মূল ক'রে মারাঠা-শক্তির মূল বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করে আসা উচিত ছিল তার, আর এ কাজে ভাই যে দাদার থেকে বেশী উপযুক্ত—বাজীরাও মনে-প্রাণে তা বিশ্বাস করেন। আন্তাজী মিষ্টভাষী মধুর স্বভাবের লোক, অথচ দৃঢ়চেতা এবং সুশাসক। আরও অন্তত মাসছয়েক তার ওখানে থাকা উচিত ছিল। তার এই হঠকারিতার ফলে ঐ ছমাসের কাজ হয়তো বারো বছর পিছিয়ে যাবে।

চিমনজীকে তিনি মৃদু তিরস্কারও করলেন এজন্যে। এত ব্যস্ত হয়ে ফিরে আসবার কী দরকার ছিল? তেমন বুঝলে সে লিখল না কেন, অনায়াসেই তিনি বধূমাতাকে ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারতেন, যথেষ্ট লোকলশকর সঙ্গে দিয়ে। আরও কঠিন তিরস্কারের জন্যই তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন মনে মনে কিন্তু চিমনজীকে দেখে আর রূঢ় কথা বলতে পারলেন না। চিমনজী কখনই তাঁর মতো স্বাস্থ্যবান বা কান্তিমান ছিল না, কিন্তু এত কৃশ ও এত দুর্বলও ছিল না সে। বড়ই রুগ্ণ দেখাচ্ছে; আর ঐ কাশিটা, অহরহ একটা খুকখুকে কাশি—ওটাও ভাল নয়। দীর্ঘদিনের যুদ্ধে—অনিয়মিত আহার, অপর্যাপ্ত নিদ্রা ও অবিরাম উদ্বেগ দুশ্চিন্তা ও মস্তিষ্ক-চালনার ফলেই এটা হয়েছে। ভালই হয়েছে এখানে এসে, যদি কিছুকাল বিশ্রাম নিয়ে একটু সুস্থ হয়ে উঠতে পারে তো সব দিক দিয়েই মঙ্গল। এইসব দ্রুত চিন্তা ও আত্মবিচারের ফলেই নির্গমোদ্যত কঠোর তিরস্কার কতকটা মৃদু অনুযোগের আকারেই বেরিয়ে এল। এ অবস্থায় একটু বলাও উচিত ছিল না হয়ত—কিন্তু বহুক্ষণের প্রস্তুতি একেবারে সামলে নিতেও পারলেন না বাজীরাও। হয়ত এটা তাঁরও রুগ্ণ অশক্ত শারীরিক অবস্থার ফল।

কিন্তু এই অনুযোগের যে উত্তর পেলেন তাতে আরও একটা শক্ত আঘাত লাগল তাঁর। চিমনজী মাথা নত ক'রে অথচ সুস্পষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আমার শরীর জন্যই আমি ছুটে চলে এসেছি—আপনার এ ধারণা কেন আর

কেমন ক'রে হ'ল তা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার এতকালের জীবনযাত্রা দেখে যদি আপনি আমার সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়ে থাকেন তো খুবই দুঃখের কথা। কিন্তু কৈ, আমি তো এমন আচরণ কখনও করেছি বলে মনে পড়ে না—যাতে আপনার এ ধারণা হ'তে পারে। এক স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর একবার বিবাহ করেছি সত্য—কিন্তু ব্রাহ্মণের সংসার-ধর্মপালনে স্ত্রী অপরিহার্য বলেই তা করতে হয়েছে। তাও, আমার যে বয়সে স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে সে বয়সে কোন কোন দেশে পুরুষের প্রথম বারই বিবাহ হয় না। আর ব্রাহ্মণের বহু স্ত্রী গ্রহণেও বাধা নেই, আমি তো একটি গত হ'লে আর একটি গ্রহণ করেছি। সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমি উপপত্নী বা গণিকা গ্রহণ করি নি কখনও, বারনারীকে নিয়ে এসে অন্তঃপুরেও স্থান দিই নি। একথা, এত জোর গলায় আমার গুরুজনরা সকলে বলতে পারবেন কিনা সন্দেহ।'

কথাগুলো যেন চাবুকের মতো এসে পড়ল বাজীরাও-এর মুখের ওপর। মুখ-চোখ অরুণবর্ণ হয়ে উঠল তাঁর দুঃসহ ক্রোধে। তবু শেষ পর্যন্ত আপ্তাজীর চোখের ওপর থেকে চোখ নামিয়েই নিতে হ'ল তাঁকে। এর কোন উত্তরও দিতে পারলেন না। কারণ, উত্তর দিতে গেলে আবার প্রত্যুত্তরে কি শুনবেন কে জানে। তাঁর প্রিয়তমা সম্বন্ধে অসম্মান-সূচক কোন কথা শুনলে হয়ত শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারবেন না নিজেকে। ভাইয়ের সঙ্গে, বিশেষত যে ভাই সম্বন্ধে তাঁর স্নেহ ও গর্বের শেষ নেই সে ভাইয়ের সঙ্গে ইতরদের মতো কলহ-কেজিয়া করতে পারবেন না তিনি ; স্ত্রীলোকের কথা নিয়ে তো নয়-ই।

একটুখানি চুপ ক'রে রইলেন পেশোয়া বাজীরাও। তার মধ্যেই, শুধু যে এই অসহ্য ক্রোধই সংবরণ করলেন তাই নয়, নিজের বুদ্ধি-বৃত্তিকেও অনেকটা গুছিয়ে সামলে সংযত ক'রে নিলেন। চিন্তার কাজ অত্যন্ত দ্রুত চলতে লাগল ভিতরে ভিতরে। কেন এসেছে তা তাঁর অজানা নেই—এখন সে উদ্দেশ্যটা কী করে ব্যর্থ করা যায় এই চিন্তাই তাঁর সর্বাগ্রগণ্য। যেন সেই চিন্তার অবসর খুঁজতেই কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, 'তা এসেছ ভালই হয়েছে, তোমার শরীর এত খারাপ হয়েছে আমি বুঝতে পারি নি। আরও আগেই আসা উচিত ছিল হয়ত। অন্তত আমাকে একটা খবর পাঠালেও তো পারতে। আমি অন্য লোক পাঠিয়ে তোমাকে সরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করতুম, প্রয়োজন হয় তো নিজেই যেতুম তোমার পরিবর্তে।'

এত কঠিন ও মর্মঘাতী অপমানের পরিবর্তে দাদার মতো ক্রোধী লোকের কাছ থেকে এই কোমল কণ্ঠস্বর ও আন্তরিক স্নেহ আশা করেন নি চিমনজী। তিনি যেন ঈষৎ অপ্রতিভই হয়ে পড়লেন সে জন্যে। সে লজ্জা ঢাকতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমি কিন্তু শারীরিক ক্লান্তির জন্যও ফিরে আসি নি পেশোয়া, আমি এসেছি আপনার অসুস্থতার সংবাদ পেয়েই। মা-র পত্রে জানলুম যে, আপনার শরীরের অবস্থা দেখে শুধু মা বা এ প্রাসাদের অন্তঃপুরিকা কি আপনার আত্মীয়-বান্ধবরাই নন—স্বয়ং ছত্রপতি পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। এ সংবাদের পর আর স্থির থাকতে পারি নি—তাতে যদি কোন

অপরাধ হয়ে থাকে তো তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

'না না, এ আর অপরাধ কি! এ উৎকণ্ঠা তো স্বাভাবিকই। তোমার মতো স্নেহপরায়ণ ভাইয়েরই উপযুক্ত। আচ্ছা, ওখানকার বন্দোবস্ত আমি একটা ক'রে ফেলব এখনই, সে জন্য তোমার কুণ্ঠিত হবার প্রয়োজন নেই।' ততক্ষণে তিনি পথ খুঁজে পেয়েছেন, আত্মরক্ষার পথ; যতই ক্লান্ত আর ক্লিষ্ট হয়ে পড়ুন—তীক্ষ্ণধী ভারতত্রাস বাজীরাও-এর পক্ষে এই সময়টুকুই যথেষ্ট, একটা উপায় খুঁজে বার করার; তিনি আরও কোমলকণ্ঠে বললেন, 'ভালই হয়েছে তুমি এসেছ। তোমার প্রয়োজন ছিল কায়িক বিশ্রামের, আমার প্রয়োজন কিছুদিন চিন্তা থেকে বিরত থাকার—তুমি যদি এখানে থেকে কয়েকমাস আমার কাজ কিছু কিছু দেখতে পারো তাহলে সত্যিই ভাল হয়। তুমিও বাঁচ—আমিও বেঁচে যাই। বড়ই ক্লান্ত আমি, এতবড় রাজ্যের চিন্তা যেন আর আমার মাথায় ঢুকছে না। অন্তত কিছু কিছু কাজ তুমি অনায়াসে দেখতে পারবে। একমাত্র তোমার ওপরই আমার বিশ্বাস আর ভরসা আছে।'

চিমনজী আপ্পাও বুদ্ধিমান, কিন্তু ভাইয়ের বুদ্ধির নাগাল তিনি পান না প্রায়ই, আজও পেলেন না। তবে এমন নির্বাক হয়ে আর কখনও যেতে হয় নি তাঁকে। জীবনে বোধ করি এই প্রথম তিনি উত্তর দেবার মতো কোন কথা খুঁজে পেলেন না। মা-র পত্রে এবং বিভিন্ন গুপ্তচরদের মুখে যা সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে পেশোয়ার তরফ থেকে একটা তীব্র প্রতিবাদ ও প্রবল বিরোধেরই আশঙ্কা করছিলেন, সেই ভাবেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন মনে মনে—এমন ভাবে এত সহজে আত্মসমর্পণের কথা ভাবেন নি।

কে জানে কী ভাবছেন দাদা, কী ওঁর মতলব। কোন্ জালে ওঁকে জড়াতে চান তিনি, আর কোন্ পথে নিজের মুক্তির উপায় ভাবছেন। অনেক ভেবেও কোন হদিস পেলেন না আপ্পাজী, আর তা পেলেন না বলেই তখন কোন উত্তরও দিতে পারলেন না। 'যে আজ্ঞে' বলে সম্মতি জানিয়ে অনেকটা নিরীহ মেষশাবকের মতো চলে আসতে হ'ল পেশোয়ার সামনে থেকে।

॥ ১০ ॥

মতলবটা অবশ্য বুঝতে খুব দেরিও হ'ল না। তবু যেটুকু সংশয় থাকতে পারত—দুটো-তিনটে দিন যেতে আরও পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। জরুরী রাজকার্য যা রাজধানীতে বা প্রাসাদে বসে করা যায় তার তাবৎই চিমনজী আপ্পার ওপর চাপিয়ে পাকাপাকি ভাবে মস্তানী-মহলে বাসা বাঁধলেন বাজীরাও। একেবারেই নড়েন না সেখানে থেকে, কারও সঙ্গে দেখাও করেন না। কেউ এলে দ্বাররক্ষকরাই ফিরিয়ে দেয় বাইরে থেকে—পেশোয়ার শরীর অসুস্থ এখন দেখা হবে না, কাজের কথা যা কিছু চিমনজীর সঙ্গে কইতে হবে। নইলে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে—পেশোয়া কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত।

আরও একবার নীরবে অধর দংশন করলেন রাধাবাঈ। বুদ্ধিমান চিমনজী আপার মাথা হেঁট হ'ল। তাঁদের মাতাপুত্রের পরিকল্পনা ছিল কোনমতে পেশোয়ার অনুপস্থিতিতে—তা নিতান্ত সাময়িক অনুপস্থিতি হলেও চলবে—তাঁরা মস্তানীকে বন্দী করবেন এবং নীশিথ রাত্রের অন্ধকারে এমন কোন জায়গায় গোপনে পাঠিয়ে দেবেন—এমন কোন কিল্লায়, যেখানকার সংবাদ বাজীরাও না পান। চীমনজীর নিজস্ব পাহাড়ী কিল্লা আছে গুটি তিন-চার, সেখানে আটকাতে পারলে নিশ্চিন্ত। আর যাই হোক, পেশোয়া নিজের ভাইয়ের তালুকে গিয়ে হামলা করতে পারবেন না, লোকলজ্জায় বাধবে।

কিন্তু এ কী হ'ল ?

পেশোয়ার অনুপস্থিতিতে যা করা যায়, পেশোয়ার সামনা-সামনি তা করা সম্ভব নয় কিছুতেই। এমন কারও সাহস নেই এ প্রাসাদে যে, সেই সিংহের সামনে থেকে তার সহচরী বা সঙ্গিনীকে কেড়ে আনবে। তা হোক না সে সিংহ রুগ্ণ আর দুর্বল।

দুজনেই ছটফট করতে লাগলেন। অবশ্য দুজন অর্থে চিমনজী আর তাঁর মা নন। এ ব্যাপারে চিমনজীর সহানুভূতি যতটা—সক্রিয় সহযোগিতার ইচ্ছা ততটা নয়। যতই হোক, বড় ভাই—এবং ছত্রপতির পরেই এ রাজ্যের প্রধান, সর্বময় কর্তা। তাঁর বিরাগভাজন শুধু নয়, রোষ-ভাজন হওয়া খুব প্রীতিকর হবে না। চিমনজী মনে মনে এখনও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন তাঁর দাদাকে—দাদার বুদ্ধি, শৌর্য, দূরদৃষ্টি এবং প্রশাসন-ক্ষমতার জন্য। চিরকালের মতো সেই লোকের বিষ-দৃষ্টিতে পড়তে খুব ইচ্ছা নেই তাঁর।

ছটফট করছেন দুটি স্ত্রীলোকই—শাশুড়ী আর তাঁর পুত্রবধূ। রাধাবাঈ আর কাশীবাঈ। কাশীবাঈয়ের সপত্নী যন্ত্রণা, রাধাবাঈয়ের প্রতিপত্তি-নাশের জ্বালা। কাশীবাঈ সহধর্মিনী কিন্তু স্বামীর ওপর স্বামীত্ব স্থাপন করতে কোনদিনই পারেন নি। সেজন্য কাশীবাঈকে একটু করুণা-মিশ্রিত স্নেহের চোখেই দেখতেন রাধাবাঈ। তার সম্বন্ধে কোনও বিদ্বেষ কখনও অনুভব করেন নি। দুর্জয় দুঃসাহসী বীর যশস্বী পুত্রের ওপর তাঁর নিঃসপত্ন কর্তৃত্ব বা প্রতিপত্তি—এ একটা আশ্চর্য সান্ত্বনা ও তৃপ্তির উৎস ছিল বিধবা রাধাবাঈয়ের। সেই প্রতিপত্তি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে—সেই মাতৃভক্ত ছেলের আর এখন নাগাল পান না রাধাবাঈ—এ অপমানের দাহ নিত্য দগ্ধ করে তাঁকে। ঐ গণিকা, ঐ রক্ষিতাটা ছেলের হৃদয়েশ্বরী শুধু নয়, তার প্রাসাদকর্ত্রী হয়ে বসেছে—এ কিছুতেই ভুলতে পারেন না তিনি। এর প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই তাঁর। ছেলে অসুস্থ—সেটা উদ্বেগের কারণ বটে, কিন্তু এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার মতো পর্যাপ্ত কিনা সন্দেহ। চিমনজীর মনে হয় পুত্রের কল্যাণের থেকে প্রতিশোধটাই বড় প্রশ্ন বালাজী বিশ্বনাথ রাও-এর মহিষী—চিমনজীর জননীর কাছে।

বিদ্বেষ যতই প্রবল হোক, ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সুতরাং অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসহায় প্রতিকারহীন ক্ষোভের মধ্য দিয়ে এক-একটি রাত্রির

সঙ্গে এক-একটি দিন গ্রথিত হয় শুধু। কিছুই করা যায় না, কিছুই করার উপায় থাকে না।

আস্তাজীর সঙ্গেই পৌত্র বালাজীকেও চিঠি দিয়েছিলেন রাধাবাঈ। কিন্তু বালাজী সে-সময় আসতে পারে নি। দীর্ঘকাল পরে ছত্রপতি শাহু তাঁর আলস্যের অপবাদ কাটাতে মাত্র কয়েক মাস আগেই মিরাজে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন, বালাজী তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল। যুদ্ধ বিশেষ হয় নি, ছত্রপতির পেঁছতেই যা দেরি—মিরাজ দখল হয়েছিল অল্প সময়ের মধ্যেই, ছত্রপতিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু একটা শহর কি দুর্গ দখল করলেই অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না—মিরাজে মারাঠা শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার দুরূহ কাজে শাহু যাদের রেখে এসেছিলেন, বালাজী তাদের অন্যতম। সেই কারণেই বালাজী আসতে পারে নি। কারণ এটা রাজ্য-চালনার একটা বড় রকম শিক্ষা। যার ওপর অচির ভবিষ্যতে যে-কোনদিন এই বিপুল রাজ্যখণ্ড শাসনের ভার এসে পড়তে পারে—তার পক্ষে এ শিক্ষা অত্যাবশ্যক। পিতামহীর জরুরী চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও বালাজী তাই মিরাজ ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে নি। প্রয়োজন ছাড়াও একটা কথা ছিল। ছত্রপতি তাকে অপত্যাধিক স্নেহ করেন—তিনি স্বয়ং যে কাজের ভার দিয়ে এসেছেন, সে কাজ অন্তত খানিকটা না গুছিয়ে আসা উচিত নয়।

সুতরাং খানিকটা কাজ মিটিয়ে বালাজীর ফিরতে ফিরতে প্রায় কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেল। আস্তাজী আসার ঠিক দু মাস পরে এসে পেঁছল সে। এই দুই মাস ধরে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে সহ্যশক্তির শেষ সীমায় এসে পেঁছেছেন রাধাবাঈ ও কাশীবাঈ। সাধারণত রাধাবাঈয়ের চোখে জল পড়ে না—দুঃখে আগুনই জ্বলে তাতে—কিন্তু তিনিও দুঃসহ যন্ত্রণায় ভেতরে ভেতরে ভেঙে এসেছিলেন। পৌত্র এসে দাঁড়াতেই কথা বলার আগে কেঁদে ফেললেন তিনি। বালাজী চমকে চেয়ে দেখল কাশীবাঈয়ের চোখে তার বহু আগে থেকেই—সম্ভবত তার আসবার খবর পেয়েই—জলের ধারা নেমেছে। কাশীবাঈয়ের মুখের সেই চিরকালের শান্ত মহিমা কোথায় চলে গেছে, তাঁর দৃষ্টি করুণ, দাঁড়াবার ভঙ্গীটাও যৎপরোনাস্তি দীন।

একই সঙ্গে মা ও ঠাকুমার চোখে জল দেখে উনিশ বছরের তরুণ রণনায়ক বালাজীর চোখে আগুন জ্বলল। তাঁদের এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও হতাশা—এই নীরব ভাষাহীন অনুনয় তাকে কঠিন ও কঠোর ক'রে তুলল। সে তার কাকাকে দুটি একটি মাত্র প্রশ্ন ক'রে বুঝে নিল অবস্থাটা। তারপর ঠাকুরমার দিকে চেয়ে বলল, 'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—আগামী কাল সূর্যাস্তের আগেই আমার পিতা মহান পেশোয়াকে শানুওয়ার ওয়াড়া থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব—যেখানে হোক, যে-কোন উপায়ে হোক। কিন্তু তার পরের দায়িত্ব আপনাদের। এখানে যা করবার আপনারা করবেন, আমার ওপর নির্ভর করবেন না।'

'তা করব না, কিন্তু তুমি কি পারবে ভাই?' সংশয়ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করেন

রাধাবাঈ, 'পেশোয়া বাজীরাও শুধু শক্তিমান নন, বুদ্ধিমানও। আর—আর সেই স্ত্রীলোকটা—সেটা নিশ্চিত জাদু জানে। বড় ভয়ংকর মেয়েছেলে সে। সাবধানে এগিও দাদু, আমি তোমাকে মিনতি করছি।'

বালাজী রাধাবাঈকে ও কাশীবাঈকে প্রণাম ক'রে বলল, 'আপনাদের আশীর্বাদ পেলে আমি স্বয়ং দেবেন্দ্রের দ্বারে গিয়েও হানা দিতে পারি। আর বাজীরাও যত শক্তিমান আর বুদ্ধিমানই হোন—তিনি আমারই পিতা। আমাতে কি আর তাঁর কোন গুণ অর্শায় নি?'

'কিন্তু সেই—সেই মায়াবিনী স্ত্রীলোকটা?' ভীত কণ্ঠে সংশয়ের সুর বেজে ওঠে আবারও।

বালাজী হাসে,'সে যে-ই হোক, আমার পিতা তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছেন। সে মর্যাদা মিথ্যা হ'লেও আমার পিতার ধারণা তো মিথ্যা নয়! সেক্ষেত্রে সে আমার জননীতুল্যা। আমি তার পা ছাড়া মুখের দিকে চাইব—এমন ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনি বৃথা ব্যস্ত হবেন না ঠাকুমা, তার চোখে না পড়লে জাদু বিস্তার করতে তো সে পারবে না।'

মস্তানী-মহলের দ্বারে পুত্র বালাজী।

বাজীরাও বহুক্ষণ যেন তাঁর কানকে বিশ্বাসই করতে পারলেন না। কিন্তু পর পর দুজন দ্বারী এসে যখন সেই একই সংবাদ দিল তখন আর অবিশ্বাস করারও কোন কারণ রইল না। বীর বিজয়ী পুত্র তাঁর—মধ্যম পুত্র রাঘোবার মতো নীচ বা ধূর্ত নয়—সব দিক দিয়েই তাঁর উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র। বাজীরাও সমস্ত সতর্কতা ভুলে শশব্যস্তে মহলের দ্বার পর্যন্ত ছুটে এসে প্রণত পুত্রকে তুলে ধরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তার মধ্যেই বালাজী লক্ষ্য করল বাজীরাও-এর ভয়াবহ কৃশতা ও অস্বাভাবিক বিবর্ণতা। সে বুঝল তার মা আর ঠাকুরমার এতটা বিচলিত হওয়ার কারণ। সে আরও কঠিন, আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল।

বাজীরাও অত লক্ষ্য করেন নি। অত লক্ষ্য করার অবস্থা ছিল না তাঁর। গত দুমাস তিনি আরামে ও আলস্যে ডুবে ছিলেন বটে কিন্তু সেটা ওঁর মত মানুষের পক্ষে শ্রেয় বা সুখকর নয়।

নিষ্ক্রিয়তার মাঝে ডুবে থাকা মানে তো জীবন্মৃত হয়ে থাকা, সমাধির মধ্যে ডুবে থাকা। বীরের পক্ষে, শাসকের পক্ষে, রাজনীতিকের পক্ষে নৈষ্কর্ম মানেই তো মৃত্যু। আজ অকস্মাৎ ছেলেকে দেখে তাই তাঁর এত আনন্দ। পুত্র তাঁর বিজয়ের বার্তা, যুদ্ধের বার্তা, রাজ্যের বার্তা বয়ে এনেছে, বাইরের বিপুল বিশ্বের হাওয়া এসে পেঁছেছে তার সঙ্গে। যেখানে তাঁর পৌরুষ, তাঁর শক্তি, তাঁর সাম্রাজ্য-বিস্তারের স্বপ্ন-কল্পনা তার যথার্থ মূল্য পাবে, সেই জগতের আলো আর হাওয়া আর খবর নিয়ে এসেছে সে। সেইখানেই তো তাঁর যথার্থ স্থান, সেইখানেই তো তাঁর জীবন।

তিনি একবার ছেড়ে দিয়ে সস্নেহে যৌবন-সুগঠিত-দেহ তরুণ পুত্রের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ ক'রে আবারও বুকে চেপে ধরলেন তাকে। গদ্‌গদ্‌

কণ্ঠে বললেন, 'এসো এসো, বাবা এসো। চল বসবে চল। তোমার মুখে থেকে সব খবর শুনব—'

বলতে বলতেই বুঝি মনে পড়ল কথাটা ; এ মহলে তাঁর ভাই, তাঁর পুত্ররা কেউ কখনও আসে নি, আত্মীয়দের কাছে এ মহল নরকের মতোই পরিত্যাজ্য। তিনি একটু কুণ্ঠিত ভাবেই থেমে গেলেন যেন, কিন্তু সে মুহূর্তকালের জন্য। তারপরই স্থিরদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'এখানে, মানে ভেতরে আসতে কোন বাধা নেই তো তোমার ?'

'আমার পূজনীয় পিতৃদেব বা অপর কোন গুরুজন যেখানে যেতে বা থাকতে পারেন আমার সেখানে যাওয়ার কী আপত্তি থাকতে পারে ? আপনি যেখানে যেতে আদেশ করবেন সেখানেই যাব।'

'না না—আদেশের কথা নয় বালাজী, তুমি বড় হয়েছ, কে জানে দুদিন পরেই হয়ত এই সমস্ত রাজ্য, এই প্রাসাদ সব কিছুর ভারই তোমার হাতে এসে পড়বে। তোমাকে আদেশ ক'রে জোর ক'রে কোন কিছুই করাতে চাই না। আমাকে ভালবেসে আমার সঙ্গে আসতে চাও তো এসো।'

তিনি ভেতরে এসে একটি গদী-আঁটা বড় দিওয়ানে বসলেন, বালাজীও পিছনে পিছনে এসে তাঁর সামনের একটি চৌকিতে আসন নিল। বাজীরাও ছেলের আচরণে খুশি হলেন। সে খুশি চাপতেও চেষ্টা করলেন না, তাঁর সমস্ত মুখ সে আনন্দে উদ্ভাসিত, দুই চোখের দৃষ্টিতে সে আনন্দ ও খুশির ঝরনাধারা। তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে ছেলের দুই কাঁধে দুটি হাত রেখে বললেন, 'তারপর ? বলো কী খবর ?'

কাঠিন্যের সঙ্গে বিরূপতার সঙ্গে লড়াই করবে বলে যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে, সে হঠাৎ কোমলতা ও সহৃদয়তা দেখলে বিব্রত বোধ করে। বালাজীও সেই রকম একটু অসুবিধা বোধ করল। সোজাসুজি পেশোয়ার সেই স্নেহ-ঝরে-পড়া চোখের ওপর চোখ রাখতে পারল না, মাটির দিকে চেয়ে বলল, 'আপনার বোধ করি অবিলম্বে একবার পাটাসের ছাউনিতে যাওয়া দরকার।'

তখনও ঠিক বুঝতে পারেন নি পেশোয়া। পাটাসে তাঁর ব্যক্তিগত সৈন্যদের ছাউনি, তাঁর বাছাই করা পুরাতন বিশ্বস্ত সেনাদের বাসস্থান সেখানে। তিনি বিস্মিত, কিছুটা বা উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কেন বলো তো ? কী হয়েছে সেখানে ?'

তেমনি ভাবে অন্যদিকে চেয়ে বলল বালাজী, 'তারা দীর্ঘকাল আপনাকে দেখে নি, তার উপর নানারকম জনশ্রুতি তাদের কানে আসছে—আপনার অসুস্থতার উদ্বেগজনক সত্য-মিথ্যা মেশানো নানা সংবাদ—তাতে তারা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।'

'ও, এই।' ছেলের দুই কাঁধ ছেড়ে দিয়ে পিছনের তাকিয়াটায় আধশোয়া ভাবে এলিয়ে পড়লেন বাজীরাও, 'তা সে তো তুমি গিয়েই তাদের অবস্থাটা বুঝিয়ে দিতে পারো যে, তাদের পেশোয়া এখনও মরে নি—বেঁচেই আছে।'

'না বাবা, তারা আপনাকেই দেখতে চায়।'

এইবার যেন কোথায় একটা খট্‌কা লাগল পেশোয়ার। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে—সে যে তাঁর চোখের দিকে চাইতে পারছে না, সেটা লক্ষ্য করলেন। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি সেখানে কোন বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান আশংকা করছ?'

সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব এড়িয়ে গিয়ে বালাজী বলল, 'আমার জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা অল্প, হয়তো যা বুঝেছি তা ভুল, তবু আমার অনুরোধ আপনি অবিলম্বে ওখানে একবার চলুন। তাছাড়া দীর্ঘদিনের অভ্যাস আপনার উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে দিনযাপন করা—প্রাসাদের এই সংকীর্ণ দেওয়ালবন্ধ জীবনে আপনার লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হচ্ছে। আপনি এই ক'মাসেই বড় পাণ্ডুর হয়ে গেছেন পেশোয়া।'

পেশোয়া এই সমস্ত সময়টাই পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। তিনি এবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন। গম্ভীর কণ্ঠে—যে কণ্ঠস্বরে বড় বড় সেনাপতিরাও কেঁপে ওঠেন—ডাকলেন, 'বালাজী!'

'বলুন পিতাজী।'

'মুখ তোল, আমার মুখের দিকে চাও। উঁহু, সোজা আমার চোখের দিকে।'

অসুবিধা হয় ঠিকই, তবু বাজীরাও-এর চোখের ওপর চোখ রাখে বালাজী।

'মিথ্যা কথা, মিথ্যাচরণ এবং বিকৃত বা আচ্ছাদিত সত্যকে আমি ঘৃণা করি। পুরুষমাত্রেরই ঘৃণা করা উচিত। যে পুরুষ বলে পরিচয় দিতে চায়, তাকে সর্বদা নির্ভয়ে সত্য কথা বলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

বালাজী ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'কিন্তু রাজনীতিকদের জীবনেও কি তাই? আপনি কি সব সময়ে সত্যাচরণ করেন পিতা? আমাদের যিনি আদর্শ, সেই সুমহান নেতা ছত্রপতি শিবাজীও তো অত নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন বলে জানি না।'

এক মুহূর্ত থামতে হ'ল বৈকি বাজীরাওকে—উত্তর দেবার আগে। তারপর বললেন, 'রাজনীতিকদের জীবন আর ব্যক্তিগত জীবন এক নয়। রাজনীতিতে মিথ্যা বলতে হয়। তবু বাজীরাও যে তার রাজনীতিক জীবনেও খুব একটা মিথ্যাচরণ করেছে, এমন কথা বিশেষ কেউ বলতে পারবে না।'

'আমিও ঠিক মিথ্যাচরণ করতে চাই নি পিতাজী, অপ্রিয় সত্যকে একটা আবরণ দিতে চেয়েছিলাম মাত্র। হয়ত সেটা অন্যায় হয়েছে। এবার থেকে আর হবে না, আপনাকে কথা দিচ্ছি।'

'বেশ, তাহলে আমি সত্য উত্তরই চাইছি, তুমি কি আমাকে এখান থেকে অন্যত্র সরাতে চাইছ?'

সূর্যরশ্মির মতো তীক্ষ্ণ চোখ বাজীরাও-এর—তেমনি অন্তর্ভেদী, তেমনি প্রজ্বলন্ত। প্রতিকৃতিতে এই দৃষ্টি দেখেই হিন্দুস্থানের বাদশা মহম্মদ শা ভীত বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বালাজী রাও সেই দৃষ্টিতেই দৃষ্টিনিবদ্ধ ক'রে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, পিতাজী।'

'তোমার স্পর্ধাও তো কম নয়!···না, এখনও দেখছি তুমি বালকই রয়ে গেছ। তুমি কি মনে করো, পেশোয়া বাজীরাও এক বালকের ইচ্ছায় চালিত হবে?'

'সাধারণ বালকের ইচ্ছায় না হ'তে পারেন—কিন্তু আমি আপনারই পুত্র।'

'এত কোমলতা এত বাৎসল্য আমার মধ্যে থাকলে আজ মারাঠাশক্তিকে বিশ্বত্রাস ক'রে তুলতে পারতাম না।'

'আমিও আপনার সে কাঠিন্য হয়ত পেয়েছি পিতাজী—উত্তরাধিকার সূত্রে।'

উত্তেজিত ও বিস্মিত পেশোয়া এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সেই সঙ্গে বালাজীও। মুখোমুখি দাঁড়াল সে। দুজনের উচ্চতা একই রকম, দুই জোড়া চোখ সমান স্তরে স্থির হ'ল এসে।

'অর্থাৎ— ? তুমি আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যাবে—এখান থেকে?'

'প্রয়োজন হয় তো কুণ্ঠিত হব না অন্তত।'

'সেটা কি খুব সহজ মনে করো? মনে রেখো, এখানকার দ্বারী, শাস্ত্রী, সৈনিকরা আজও আমারই বেতনভুক্, অনুগত।'

'সহজ কাজ সাধারণ লোকই করতে পারে—যা দুঃসাধ্য, যা অপরের কাছে অসাধ্য, তাই আমাদের জন্যে। এই শিক্ষাই তো চিরকাল পেয়েছি আপনার কাছে।'

'কিন্তু কেন, কিসের জন্যে তোমার এই দুর্বুদ্ধি, এই আত্মনাশা সংকল্প? তুমি পুরুষ, অন্তঃপুরিকাদের নির্বোধ ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়া তোমার শোভা পায় না।'

'আপনি যে অন্তঃপুরিকাদের কথা ইঙ্গিত করছেন পিতাজী, তাদের একজন আমার জননী আর একজন আপনার। সর্বদা তাঁদের মান্য করতেই অভ্যস্ত আমরা। আর শোভনতার কথা বলছেন পিতাজী, আপনিও তো পুরুষ, দেশ-শাসক, রাজা—সামান্য একজন অন্তঃপুরিকার জন্য, স্ত্রীলোক শব্দ না-ই উচ্চারণ করলাম—অন্দর-মহলে বন্ধ হয়ে থাকা কি আপনারই শোভা পায়?'

'বাঃ, বেশ চমৎকার শিক্ষা তোমার। এত সহবৎ শিখেছ, গুরুজনদের মান্য করতে শিখেছ—শুধু পিতাও যে তোমার গুরুজন সেটা কেউ শেখায় নি তোমাকে? যে পিতার জননী বলে পিতামহী তোমার কাছে এত মাননীয়া সে পিতাকে অনায়াসে বিচার করার অধিকার তোমার আছে—এমন ধারণা তোমার কী ক'রে হ'ল! এ ধৃষ্টতা-প্রকাশের অধিকারই বা কে দিল তোমাকে?

'আপনাকে বিচার করতে চাই নি পেশোয়া, শুধু আপনার যুক্তি দিয়েই আপনার যুক্তিকে খণ্ডন করতে চেয়েছিলাম।'

'বেশ করেছ, তোমার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয়ে আমি তুষ্ট হয়েছি—এখন বিশ্রাম করো গে।'

পেশোয়া পিছনে ফিরে যেন এ প্রসঙ্গের এইখানেই ইতি টানতে চেষ্টা করেন।

'আমি একেবারে আপনাকে নিয়ে যাব বলে এসেছি।'

'তার মানে!' যেন ক্রুদ্ধ সিংহের মতো গর্জন ক'রে উঠলেন পেশোয়া বাজীরাও, 'প্রশ্রয় ও ক্ষমারও একটা সীমা আছে, তুমি সমস্ত সীমা লঙ্ঘন ক'রে যাচ্ছ।'

'আমি মা ও ঠাকুমার কাছে প্রতিশ্রুত। সুতরাং নিরুপায়।'

'প্রতিশ্রুতি দেবার আগে নিজের শক্তি যাচাই করতে হয়। বিচার-বিবেচনা শৌর্যেরই অংশ, প্রধান অংশ বলা যায়।'

'কিন্তু হাতের পাশা আর মুখের কথা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, তাও তো জানেন।'

'বেশ, তাহলে সে মুখের কথা রাখার জন্যে যা করা প্রয়োজন করো। আমি তোমার ইচ্ছায় চালিত হবো—এ ভুল ধারণা ত্যাগ করো। আমাকে বলপূর্বক নিয়ে যাওয়ার দুঃসাহস যদি থাকে, চেষ্টা ক'রে দেখতে পারো।'

'আপনি অনুমতি দিচ্ছেন?'

বিদ্যুৎগতিতে পাশের দেওয়াল থেকে একখানা তরবারি টেনে নেন বাজীরাও, এত দ্রুত যে বালাজী রাও বুঝতেই পারে না ঘটনাটা কখন ঘটল। মনে হ'ল সত্যিই বুঝি কোন জাদুতে তরবারি হাতে এসে গেল ও'র।...কুসংস্কার এমনিই জিনিস যে, ডাইনী কুহকিনী অপবাদটা মিথ্যা জেনেও তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

'নিজের আত্মজনকে বন্দী করা কি বধ করার জন্য কোন বেতনভুক্ ভৃত্যকে ডাকব না—একটুকু সম্মান মাত্র তোমাকে দেখাতে পারি। তার বেশী কোন প্রশ্রয় কি দুর্বলতা আশা করো না আমার কাছে।'

'এটুকুও আশা করি নি পিতাজী, কোন অশো নিয়েই আসি নি। শুধু যা কর্তব্য বলে মনে করেছি তাই পালন করতে এসেছি। তাতে যদি মৃত্যু ঘটে তো দুঃখিত হবো না—সেটুকু শিক্ষা আপনার শ্রীচরণপ্রান্তে বসে পেয়েছি। আর আপনার মতো বীরের হাতে মৃত্যু—এর চেয়ে শ্লাঘণীয় সমাপ্তি সৈনিকের জীবনে আর কি ঘটতে পারে? আপনি স্বচ্ছন্দে ঐ তরবারি আমার বুকে বসিয়ে দিন, বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না। এ সমস্যার আর কোন সমাধানও বুঝি নেই।'

তরুণের মন মহত্ত্বের নেশায় মেতে উঠেছে—বালাজী সত্যসত্যই বুক পেতে দাঁড়াল পেশোয়ার সামনে। তাতেই হয়ত উদ্যত তরবারি নামাতে হ'ত তাঁকে—কিন্তু তার আগেই আর এক অঘটন ঘটল। যাকে নিয়ে পেশোয়ার জীবনে বার বার অঘটন ঘটেছে—এবারেও ঘটাল সে-ই। কখন মস্তানী এসে নীরবে ঘরে ঢুকেছে তা এ'রা কেউই টের পান নি, একেবারে চমকে উঠলেন দুজনেই, যখন সুনিপুণ ক্ষিপ্র হস্তে মস্তানী এসে পেশোয়ার বদ্ধ মুষ্টি খুলে তরবারিটি সরিয়ে নিল।

'ছি পেশোয়া, ছি! আপনিও কি ছেলেমানুষ হলেন!'

'কিন্তু তুমি ওর প্রতিজ্ঞাটার কথা শোন নি মস্তু, ও আমাকে এখান থেকে জোর ক'রে সরিয়ে নেবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে।'

'জোরই বা করতে হবে কেন পেশোয়া, আপনার বীর বিজয়ী পুত্রের সম্মান

রক্ষা করা তো আপনারই কর্তব্য। শুনেছি, পুত্র আর শিষ্যের কাছে হার মানাই অধিক গৌরবের।'

'কিন্তু আমার এখান থেকে সরে যাওয়ার অর্থ জানো?'

'জানি মালিক। সেই সঙ্গে এও জানি যে আমাকে আপনার কাছ থেকে বেশীদিন দূরে সরিয়ে রাখবে এমন মানুষ এখনও জন্মায় নি।'

'তুমি অহংকারে বিভ্রান্ত হয়েছ মস্তিবাঈ।'

'অহংকার ঠিকই—কিন্তু সে নিজের নয় প্রভু। আমার যদি কোন কৃতিত্ব অহংকার করার মতো কিছু যোগ্যতা থাকে তো সে আপনারই দান। কিন্তু আমি মিথ্যা অহংকার করছি না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বালাজী রাও-এর সঙ্গে চলে যান পেশোয়া। আপনিও শান্তি লাভ করুন, এঁরাও শান্ত হোন।'

'আর তুমি? তোমার কি হবে ভেবে দেখেছ?'

'দেখেছি বৈকি প্রভু! আমার যা সত্যকার অনিষ্ট তা কেউ করতে পারবে না কোন দিন, আপনার শ্রীচরণ থেকে বেশীদিন দূরে সরিয়েও রাখতে পারবে না। ইহকালে পরকালে যুগে-যুগান্তরে আমি আপনার দাসী। এঁরা যাই করুন—আমি অচিরকালমধ্যে আপনার সঙ্গে মিলিত হবো—কথা দিচ্ছি। আপনি তো জানেন, আপনার মস্তি আপনার কাছে কখনও মিছে কথা বলে না।'

তারপর সেই আশ্চর্য সুন্দরী নারী তার আশ্চর্যতর সুন্দর চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বালাজী রাও-এর দিকে। অকুণ্ঠিত শান্তস্বরে বলল, 'পুত্র, তোমাকে আমি পুত্র সম্বোধন করছি বলে বিরক্ত হয়ো না—লোকে যা-ই বলুক, তোমার পিতাজী—মহান পেশোয়াকে ধর্মত আমার স্বামী বলেই জানি, সেদিক দিয়ে আমিও তোমার একজন মা। আর তা না হ'লেও, তুমি হিন্দু, ব্রাহ্মণ—স্ত্রী বাদে জগতের সমস্ত নারীই তো তোমাদের মাতৃস্থানীয়া, সুতরাং পুত্র সম্বোধনে আশা করি কোন দোষ হয় নি। পুত্র, তুমি প্রস্তুত হও, মহান পেশোয়া আর চারদণ্ডের মধ্যেই পাটাসের দিকে রওনা হবেন।'···

কুহকিনী, ডাকিনী, জাদুকরী। তাতে সন্দেহ নেই একটুও। বালাজীর কপালে অজস্র ঘাম দেখা দিল। এ কী সাংঘাতিক মোহ! সে-ও যে মুগ্ধই হয়ে পড়েছে একটু একটু ক'রে তাতে তো সন্দেহ নেই। তার সমস্ত সতর্কতা সত্বেও যে তার শ্রদ্ধা কেড়ে নিচ্ছে এ মায়াবিনী, একে মাতৃ-সম্বোধন করতে, কৃতজ্ঞতা জানাতে আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠছে তার মন। এ তার কী হল!

এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম নিজের কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিল তরুণ সেনানায়কের মনে। সে ভুলই ক'রে বসল না তো শেষ পর্যন্ত?

॥ ১১ ॥

আক্রমণটা অবিলম্বেই আশা করেছিল মস্তানী, বাজীরাও পিছন ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু কে জানে কেন, সে রাত্রে কেউই তার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাল না। হয়ত পেশোয়া শহরের বাইরে বহুদূরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ভরসা পাচ্ছিল

না কেউ মস্তানী-মহলে হানা দিতে। সংশয় তো একটা ছিলই সকলের মনে—পারবেন কি পেশোয়া সত্যিসত্যিই তাঁর প্রিয়তমাকে ছেড়ে দূরে যেতে? এই স্ত্রীলোকটি যে নেশার মতো পেয়ে বসেছে তাঁকে, তাঁর সমস্ত অস্তিত্বে জড়িয়ে গেছে, সে কথাটা এ রাজ্যের বোধ করি সাধারণ নগণ্য কোন নাগরিকেরও জানতে বাকী নেই। আর সেই সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড উষ্মার কথাও জানে সকলে। যদি সত্যিই তিনি ফিরে আসেন এবং এসে তাঁর মস্তিবাঈকে না দেখতে পান তাহলে হয়ত স্বর্গ মর্ত্য রসাতল একাকার করবেন একেবারে। যারা এ কাজের জন্য দায়ী তাদের কারও নিস্তার থাকবে না, পনেরো-বিশজনের প্রাণ নেওয়াও আশ্চর্য নয়। কোথাও লুকিয়ে রাখলে হয়ত গোটা প্রাসাদটাই ভেঙে ফেলার আদেশ দেবেন তাকে খুঁজে বার করতে।

সুতরাং সে রাত্রিটা ধৈর্য ধরেই অপেক্ষা করতে হল রাধাবাঈকে। তাঁর সাহস ও ইচ্ছার কোন অভাব নেই, কিন্তু যাদের সাহায্য নিতে হবে তাঁকে—তাদের আছে। ধড়ের ওপরে কাঁচা মাথাটার মায়া আছে তাদের। অতএব অধীর ও প্রায়-অন্তহীন প্রতীক্ষা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

কিন্তু মস্তানীর যেন কোন উদ্বেগই ছিল না। তার প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার কোন ব্যাঘাত ঘটে নি। যথাসময়ে স্নান করেছে, প্রসাধন করেছে পরিপাটি ক'রে—তারপর আহার শেষ ক রে শুতেও গেছে স্বাভাবিক নিয়মে। শুধু যাওয়ার আগে নিজের বিশ্বস্ত দাসী মরিয়মকে বলে গেছে মহলের দ্বারে বসে পাহারা দিতে, ওদিক থেকে আক্রমণের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত পেলেই যেন তাকে জাগিয়ে দেয়।

অবশ্য জাগিয়ে দিতে হয় নি। প্রত্যুষেই উঠেছে সে। ছেলে সামসের বাহাদুর এখানে নেই, থাকলে অসুবিধা হ'ত, অল্পবয়সী ছেলে সে, মাথাগরম তার, নিশ্চয়ই মাকে রক্ষা করতে গিয়ে বিপদ টেনে আনত। ভালই হয়েছে সে পাটাসের ছাউনিতে আছে। মস্তানী নিশ্চিন্ত হয়ে স্নান-প্রসাধন সেরে প্রস্তুত হয়ে বসল।

ও'রা এলেনও সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই।

যথেষ্ট লোক-লস্কর নিয়েই এলেন। চিমনজী আপ্পা তাদের অধিনায়ক। আর—কখনও যা হয় না, তাদের সঙ্গে এলেন স্বয়ং রাধাবাঈ, এ পরিবারের সর্বজনশ্রদ্ধেয়া মাতৃশ্রী। সাধারণ সৈনিক বা রক্ষীদের সঙ্গে পদব্রজে আসবেন পেশোয়া বিশ্বনাথ রাওয়ের সহধর্মিণী, এ লোকে চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারে না। অথচ আজ তাই ঘটল।

মস্তানী-মহলের ফটক সুন্দর কিন্তু ভঙ্গুর নয়। উড়িষ্যা থেকে কারিগর আনিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন বাজীরাও। মজবুত আবলুস কাঠের পাল্লা, ইস্পাতের গুল বসানো। সহজে ভাঙা যাবে না জেনেই রাধাবাঈ বড় কাঠের গুঁড়ি আর বলিষ্ঠ কুস্তিগীর কয়েকজনকে সঙ্গে এনেছিলেন। ভেঙে ঢুকতে হবে—এইটেই মনে ছিল তাঁর। কিন্তু সামনে এসে দেখলেন মহলের সে ফটক খোলা, শুধু তাই নয়—তাদের যে শিকার, সেই কুহকিনী মেয়েছেলেটা সামনেই

দাঁড়িয়ে। সহাস্য মুখে যেন ও'দের অভ্যর্থনার জন্যই দাঁড়িয়ে আছে সে।

'বন্দী করো, বন্দী করো এখনই ঐ কসবীটাকে।'

সমস্ত সম্ভ্রমবোধ এবং নিজের পদ-মর্যাদা ভুলে চেঁচিয়ে উঠলেন রাধাবাঈ!

কিন্তু রাধাবাঈ গুরুজন হ'তে পারেন, তাঁর চেয়েও গুরুতর জন আছেন; পেশোয়া বাজীরাও তাদের মালিক আর সে মালিকের মালিক এই স্ত্রীলোকটি বা রাধাবাঈয়ের ভাষায় কসবীটি। স্পষ্ট আদেশ সত্ত্বেও তাই তারা একটু ইতস্ততই করতে লাগল।

এইবার এগিয়ে এলেন চিমনজী; অভ্যাসমতো মাথাটা ঈষৎ অভিবাদনের ভঙ্গীতে নত হচ্ছিল, হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে সামলে নিলেন নিজেকে। মাথা উঁচু ক'রেই মস্তানীর মুখের পাশ দিয়ে পিছনের একটা আসবাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, 'আমরা আপনাকে বন্দী করতে এসেছি মস্তানী বিবি।'

অনুত্তেজিত এবং বেশ প্রফুল্লকণ্ঠেই উত্তর এল, 'কী অপরাধে জানতে পারি কি?'

'আপনি আমাদের মহান পেশোয়ার শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকে দিয়েই ক্ষতির কারণ হচ্ছেন—এই অপরাধে।'

'কিন্তু সেটা বিচার করল কে? কোনও ন্যায়াধীশের বিচারালয়ে তো কৈ আমার ডাক পড়ে নি!'

'এ পারিবারিক ব্যাপার। পেশোয়ার ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রশ্ন। এর সঙ্গে সরকারী বিচারশালার কোন সম্পর্ক নেই। আমরা—তাঁর ভাই, মা, স্ত্রী ও পুত্র—এই ক'জনই এ বিচার করার পক্ষে যথেষ্ট; আর তা-ই করেছি আমরা।'

'কিন্তু আপনারা যে মহান পেশোয়ার দোহাই দিয়ে একটি অসহায়া রমণীর ওপর দলবদ্ধ হয়ে হামলা করতে এসেছেন—সে পেশোয়া আজও জীবিত। এ প্রাসাদের তিনিই মালিক, উত্তরাধিকারসূত্রে নয়—এ প্রসাদ তাঁর স্বীয় উপার্জনে ও কৃতিত্বে প্রস্তুত। এখানে তাঁর জীবদ্দশায় হুকুম চালাবার আপনারা কে—এবং তাঁর আশ্রিতাকে বন্দী করারই বা কি অধিকার আপনাদের? কৈ, পেশোয়ার হুকুম-নামা কৈ? পেশোয়ার প্রাসাদে তিনি ছাড়াও অবশ্য আর একজন হুকুম দিতে পারেন তিনি রাজাধিরাজ ছত্রপতি, তাঁর কোন আদেশনামা এনেছেন কি?'

'আপ্তাজী', ওদিক থেকে কর্কশ কঠিন কণ্ঠ বেজে উঠল রাধাবাঈ-এর, 'তুমি বৃথা ঐ গণিকাটার সঙ্গে তকরার করছ কেন? উত্তর প্রত্যুত্তর হয় সমানে সমানে—ও কি তোমার সমান? ওর সঙ্গে কথা কইতে ঘৃণাবোধ হওয়া উচিত। ·· মহাদেও, সখারাম—তোমরা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ কী জন্যে, বন্দী করো ঐ স্ত্রীলোকটাকে।'

তবু হয়তো ইতস্ততঃ করত ওরা, কিন্তু আপ্তাজীও সেই রকমই ইঙ্গিত করলেন। তখন ভরসা পেয়ে দুজন সৈনিক এগিয়ে গেল মস্তানীর দিকে।

'খবরদার!' এইবার সিংহী যেন তার প্রকৃত স্বরূপে গর্জন ক'রে উঠল।

গ্রীবা হেলিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, 'খবরদার! মনে রেখো পেশোয়া বাজীরাও আজও মারা যান নি। এ মহালে তিনিই আমাকে বসিয়ে গেছেন— তাও তোমরা জানো। আমাকে এখান থেকে যারা জোর ক'রে নিয়ে যাবে তাদের পরিণাম কী হবে তা ভেবে এ কাজে এগিও। শিগগিরই হয়তো তিনি ফিরে আসবেন, এ সংবাদ পেলে তো আসবেনই—তারপর তোমাদের কে রক্ষা করবে? ঐ চিমনজী? নাকি তোমরা মহিষী কাশীবাঈয়ের আঁচলের তলায় লুকিয়ে বাঁচবে ভেবেছ?'

তারপর পিছন দিকে কী একটা ইঙ্গিত করল মস্তানী, বোধ হয় পূর্বেই বলা ছিল, মরিয়ম এসে একটা তলোয়ার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল। সেই খোলা তলোয়ার নিয়ে এবার মস্তানীই এগিয়ে এল দু'পা। বলল, 'পেশোয়া বিদেশে কিন্তু তাঁর শক্তি ও দৃষ্টি সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত। এ তরবারি তোমরা চেনো—এও পেশোয়ার। যদি স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিতে তোমাদের লজ্জা না থাকে, আশা করি তার সঙ্গে লড়াই করতেও লজ্জা পাবে না। এসো, দেখি কার কতদূর সাধ্য জোর ক'রে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যায়।'

এর পরও এগিয়ে আসবে এমন সাহস উপস্থিত সেই রক্ষী-দলের মধ্যে একজনেরও ছিল না। চিমনজীরও না। সেটা রাধাবাঈয়েরও বুঝতে এতটুকু বিলম্ব হ'ল না। একবার মাত্র উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চেয়েই, আবারও নিজের পরাজয়ের সংবাদটা যেন পড়তে পারলেন তাদের মুখে-চোখে। এই-ই শেষ। এবার হার-মানার অর্থ চিরকালের মতো হার মানা। আর কখনও তিনি একে দমন করার চেষ্টা করতে পারবেন না, আর কখনও তিনি এ প্রাসাদের কারও মুখের দিকে মাথা উঁচু ক'রে চাইতে পারবেন না। কোন পরিজন বা কর্মচারী আর কোনদিন মানবে না তাঁকে। এই গণিকাটাই এখানকার মালেকা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

কথাগুলো মাথায় খেলে যেতে এক লহমার বেশী বিলম্ব হ'ল না। দীর্ঘদিন নিজের সংসারে—এত বড় সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর প্রাসাদে কর্তৃত্ব করেছেন তিনি। কর্তৃত্ব হারানোর প্রশ্ন তাঁর কাছে জীবন-মরণের প্রশ্নেরও অধিক। আর সে কর্তৃত্ব রক্ষা করার রীতি-পদ্ধতি কলাকৌশলও তিনি অবগত আছেন। চোখের পলকও বোধ করি ভাল ক'রে পড়ার আগে—সখারাম নামে তরুণ রক্ষীটির হাত থেকে তলোয়ারখানা প্রায় ছিনিয়ে কেড়ে নিলেন রাধাবাঈ, তারপর এগিয়ে গেলেন মস্তানীর দিকে, 'এসো, এদের মধ্যে যদি একজনও মায়ের দুধ না খেয়ে থাকে, একজনও যদি পুরুষবাচ্ছা না থাকে—আমার সম্মান আমিই রক্ষা করব। আমিই তোমাকে বন্দী করব।...অশুচি দেহ স্পর্শ করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—সেইটেই এড়াতে চাইছিলুম—কিন্তু উপায় কি? কতকগুলো ক্লীবের মধ্যে বাস করলে এ অপমান সইতেই হবে।'

যতটুকু সময় লেগেছিল রাধাবাঈয়ের তরবারিখানা টেনে নিতে সখারামের কাছ থেকে—ঠিক ততটুকুই সময় লাগল মস্তানীর অবস্থাটা বুঝতে। আরও অল্প কয়েক মুহূর্ত সে এক রকমের কৌতুক-অনুকম্পা-উপেক্ষা মিশ্রিত দৃষ্টিতে

চেয়ে রইল রাধাবাঈয়ের দিকে, তারপর সেই পরিপূর্ণ রক্তিম ওষ্ঠাধরের দুর্জ্ঞের একটা ভঙ্গী ক'রে—নিজের তরবারিখানা তুলে একবার নিজের মাথায় ঠেকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমার হাতে তরবারি থাকতে আমাকে বন্দী করার ক্ষমতা এক পেশোয়া বা ছত্রপতি ছাড়া এ রাজ্যে আরও কারও নেই, একজন দৈহিক শক্তিতে আর একজন মাত্র পদমর্যাদায় আমাকে পরাজিত করতে পারেন। সুতরাং ভয়ে নয়—স্বেচ্ছাতেই আমি অস্ত্র ত্যাগ করলুম। আপনি আমাকে যা-ই ভাবুন আমি জানি আমি পেশোয়ার স্ত্রী, আপনার পুত্রবধূ। আপনি মা—মার দেহে এমন কি মার দিকেও অস্ত্র তোলা সম্ভব নয়। আমি পরাজয় স্বীকার করলুম, আপনি বন্দী করুন। তবে আমার গায়ে যেন কেউ হাত না দেয়, তার কোন দরকারও নেই—কোথায় যেতে হবে বলুন, আমি নিজেই যাচ্ছি। কোন বাধা দেব না কি পথ থেকে পালাবার চেষ্টা করব না—স্বয়ং পেশোয়ার নামে আমি কথা দিচ্ছি।'

অনিচ্ছাতেও কি আম্বাজীর চোখে মুগ্ধ বিস্ময়ের দৃষ্টি ফুটে ওঠে? কে জানে!

সেদিকে তখন আর তাকাবার সময় ছিল না রাধাবাঈয়ের, তিনি ইঙ্গিতে প্রহরীদের পিছন দিক রক্ষা করতে বলে আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন এই স্বেচ্ছাবন্দিনীকে।

॥ ১২ ॥

এক-একসময়, যখন যুদ্ধ-জয়ের পর বিজয়ী মারাঠাবাহিনী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, তখন লুঠের মাল বা টাকা রাখার জন্য, তোশাখানা ছাড়াও বাড়তি ঘর দরকার হয়ে পড়ে। প্রতি দুর্গেই এ রকম ঘর আছে। পেশোয়া বাজীরাও তাঁর এই নবনির্মিত শানওয়ার ওয়াড়া প্রাসাদেও সে রকম ঘর দু-একটি করিয়ে রেখেছেন—যদিও তাঁর বিপুল ব্যয় চিরকাল ঋণের অঙ্কই বাড়িয়ে গেছে এযাবৎ, তোশাখানাতে রাখার মত বিত্তও জমতে পারে নি কখনও। এই সব অতিরিক্ত ভাণ্ডার প্রয়োজনে লাগার তো কথাই ওঠে না।

তবু এ-রকম ঘর ছিল। বিশেষভাবে তৈরি এগুলো। সাধারণত দায়িত্ব-সম্পন্ন দুই প্রধান ব্যক্তির বাসগৃহের মধ্যে মধ্যে এই ঘরগুলো তৈরি হয়। এর তিন দিকে থাকে নিরেট নিরন্ধ্র পাথরের দেওয়াল, একদিকে লোহার পাতমোড়া গুলবসানো ভারী মহাশালের কপাটওয়ালা দরজা ও অতি ক্ষুদ্র গো-অক্ষির মতোই ছোট একটি গবাক্ষ। তাতেও ঘন ঘন লোহার গরাদ দেওয়া।

এমনিই একটি ঘরে নিয়ে আসা হ'ল মস্তানীকে। এ ধরনের ঘরের মধ্যেও এটি আবার একটু বেশী সুরক্ষিত। তিন-কামরাযুক্ত চিমনজী আপ্পার বাসগৃহ—তার একদিকে একটি ছোট মন্দির এবং তাঁর দপ্তরখানার একটি নিরিবিলি ঘর। তার মধ্যে—তেকোণা কচ জমিটিকে এই ঘরের কাজে লাগানো হয়েছে। বালাজী রাও আর চিমনজীর মহলের মধ্যের এই সংকীর্ণ প্রবেশ-পথটিও এখানেই শেষ হয়েছে। দুই মহলের মুখেই সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা আছে,কোন সময়ে প্রহরী না

থাকলেও সদাসর্বদা হুকুম তামিল করার জন্য দ্বারী একজন থাকেই। এখান থেকে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বার হবার কোন পথ নেই, একজনের মহল থেকে আর একজনের মহলে যাবারও না।

অনেক ভেবে-চিন্তে এই ঘরটিই বন্দিনীর জন্য বেছে নিয়েছিলেন রাধাবাঈ। পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত ক'রে রেখেছিলেন। প্রাসাদের একটি সাধারণ বন্দীশালা আছে; কিন্তু সেখানে এ ধরনের স্ত্রীলোক রাখা আদৌ নিরাপদ নয়। সে একেবারে হাট, সবই সাধারণ ব্যবস্থা সেখানে। এঁদের আয়ত্তের বাইরেও বটে কতকটা। তাই নিজে তদারক ক'রে ঘরটিকে বসবাসযোগ্য করিয়ে নিয়েছিলেন পেশোয়া-জননী। এই তেকোণা ঘরটির সর্বশেষ প্রান্ত ঘিরে দিয়েছিলেন শৌচাদির জন্য। একটি শয্যাহীন চারপাইয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল—বন্দিনীর শয়নের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট, অপরাধিনীর জন্য আবার শয্যা কি? আর রাখা ছিল একপ্রস্থ মাত্র পোশাক, একটি জলের সুরাই ও একটি লোটা। এই পর্যন্তই আসবাব বা আবশ্যকীয় জিনিস বলতে।

এর মধ্যেই এনে রাখা হ'ল মস্তানীকে। ঘরে প্রবেশ করা মাত্র ভারী কপাটটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল তার মুখের ওপর—তিনটি ভারী ভারী তালা পড়ল তাতে। সে চাবির গোছাও নিজের হাতে নিলেন রাধাবাঈ। বেশ স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিলেন,দিনে রাতে একবার মাত্র খোলা হবে এ ঘর, সকালে যখন মেথর আসবে ঘর সাফ করতে, সেই সময়ই দুবেলার আহার্য এবং সারাদিনের মতো জল দেওয়া হবে ঘরে। অন্তত চারজন সশস্ত্র প্রহরী উপস্থিত থাকবে সে সময়, রাধাবাঈ স্বয়ং থাকবেন তাদের সঙ্গে। কাজ শেষ হলে আবার চাবি ফিরে যাবে তাঁর সঙ্গে। প্রহরী যারা থাকবে, তারা যে-কোন ঘটনার জন্যই প্রস্তুত থাকবে, প্রয়োজন হয় তো বন্দিনীর প্রাণ-বধের জন্যও। এতে কোন গাফিলি হ'লে সেই অপরাধীকে বা অপরাধীদের নিজে হাতে কেটে ফেলবেন, রাধাবাঈ, অন্য কোন বিচার-ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা করবেন না। ঘরে কোন আলোও থাকবে না, জানলার বাইরেই একটি ঝোলানো আলো আছে—তা-ই যথেষ্ট।

তিনটে তালা লাগিয়েও নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না রাধাবাঈ। দিনরাত পাহারা দেওয়াবারও ব্যবস্থা করলেন। সে প্রহরীও নির্বাচন করলেন নিজে। তাঁর স্বামীর আমলের দেহরক্ষী সখারাম আপ্তে আর তার ভাই-পো রঘুজী—এই দুজনকেই মাত্র তাঁর বিশ্বাস। এই দুজনের ওপরই ভার দিলেন পাহারার। স্থির হ'ল দুজনের মধ্যে পালা ক'রে পাহারার ব্যবস্থা ক'রে নেবে ওরা—নিজের সুবিধামতো। দিনের বেশির ভাগ থাকবে সখারাম, রাতে রঘুজী; কারণ সখারাম বুড়ো মানুষ, সারারাত জাগার কষ্ট তার সইবে না। তবে উভয়েরই প্রাতঃকৃত্য বা স্নানাহারের সময়—একে অপরকে অবসর দেবে।

সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ ক'রে নির্বাক চিমনজীকে নীরব ধিক্কার দিয়ে নিজের মহলে চলে গেলেন রাধাবাঈ। সকাল থেকে স্নান-পুজো কিছুই হয় নি তাঁর—এখন গিয়ে সেটা সারতে হয়ত সন্ধ্যাই হয়ে যাবে। বাড়তি লক্ষ নামজপ মানসিক আছে, তাতেও আরও খানিকটা সময় লাগবে তাঁর—এ বেলা হয়ত খাওয়াই হবে

না কিছু। তা না হোক, তাঁর উদ্দেশ্য—উদ্দেশ্য কেন, তাঁর ব্রত সফল হয়েছে এইতেই তিনি তৃপ্ত। আজকের এ প্রভাত তাঁর অবশিষ্ট জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে—একটা রাজ্য-জয়েরও বেশী গৌরব ও সার্থকতা অনুভব করছেন তিনি।

রাধাবাঈয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকলেই চলে গেল একে একে। শুধু বন্দুক হাতে গম্ভীর ও বিষণ্ণ মুখে বসে রইল সখারাম—একটা কাঠের ছোট্ট চৌকিতে। খুব সম্ভব জননী রাধাবাঈ তাকে বন্দিনী মায়াবিনীর কুহক-বিদ্যার শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্ক ক'রে দিয়েছেন—একবারও তাই সে জানলাটার দিকে মুখ তুলে চাইল না, স্থিরদৃষ্টি রুদ্ধ কপাটটায় নিবদ্ধ ক'রে বসে রইল—কাঠের মতো কঠিন হয়ে।

মস্তানী এ-সব কিছু লক্ষ্য করে নি অবশ্য। অন্তত তার ব্যবহার বা মুখ দেখে বোঝা যায় নি যে সে রাধাবাঈয়ের নির্দেশ কিছু শুনেছে বা কারুর দিকে চেয়ে দেখেছে। সোজা সামনের দিকে চেয়ে ধীর শান্তপদে ঘরে ঢুকেছিল—কোন দিকে না তাকিয়ে—কপাটটা বন্ধ হ'তে খুব সহজ ভাবেই সে চারপাই-টাতে বসে পড়েছিল।

ঘরে দ্বিতীয় কোন আসন নেই, আসবাব বলতেও একটি ছোট জলচৌকি। সেটিতে ইতিমধ্যেই একটা থালায় তার খাবার রেখে গেছে পাচক। খানিকটা ডেলা-পাকানো ভাত, একটা কি ব্যঞ্জন, একটা মাটির পাত্রে দই আর কয়েকখানা রুটি। এ-ই তার দু-বেলার খাদ্য। কোন রকম ঢাকা দেবার ব্যবস্থা নেই, খোলাই পড়ে আছে, আর ঐ অবস্থাতেই পড়ে থাকবে সারাদিন। শুকিয়ে অখাদ্য হয়ে উঠবে একটু পরেই, রাতের খাওয়া তো পরের কথা, দিনেই খেতে পারবে না তা মস্তানী। রাজার মেয়ে সে—রাজার চেয়ে শক্তিশালী ও সম্পদ-শালী ব্যক্তির ঘরণী। তার জন্য এ খাদ্য বরাদ্দ করতে বোধ করি সাধারণ কারারক্ষকেরও লজ্জা হ'ত, কিন্তু এখানে সে বিবেচনা আশা করা মূর্খতা।

মস্তানী তা করেও নি অবশ্য। এটুকুও ক'রে নি। এই চারপাইটাও আশা ক'রে নি সে। কঠিন ভূমি-শয্যার ব্যবস্থা হ'লেও সে বিস্মিত হ'ত না। কোন রকম খাদ্য দেখতে না পেলেও না। এঁদের বিদ্বেষের পরিমাণ সে জানে। একান্ত মনে তার মৃত্যুকামনাই করছেন এঁরা। সেখানে শোভন ভদ্র-ব্যবহার বা মানসিক বিবেচনা আশাই বা করবে কেন ?···

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল মস্তানী। একবার মাত্র উঠে জানলা দিয়ে সখারামকে দেখে নিয়েছিল। আর ওঠে নি। সখারামকে দেখে ভারী হাসি পেয়েছিল তার। মুখে ওড়না গুঁজে সে-হাসি সামলে ছিল সে। পেঁচার মতো গম্ভীর হয়ে ভ্রূকুটি ক'রে বসে আছে সখারাম, প্রাণপণে জানলাটাকে বাঁচিয়ে। কিছুতে না এদিকে চোখ পড়ে এই যেন তার সাধনা। তার দিকে চাইলে হাসি সামলানো কঠিন বৈকি।

মস্তানী কিছুই খেল না সারাদিন। জলও না। উপবাস করা তার অভ্যাস আছে। হিন্দুর পূজা-পার্বণেও যেমন উপবাস করে তেমনি মুসলমান পর্বেও।

ঈশ্বরদত্ত স্বাস্থ্যও তার এমন যে দু'তিন দিন উপবাসেও কিছুমাত্র ক্লান্তি আসে না হাত-পায়ে।

চুপ ক'রে বসেই রইল। ঘুমোবার কি শোবার চেষ্টা করল না। বরং সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ ও সতর্ক ক'রে কান পেতে রইল বাইরের দিকে। তার আক্রমণের পদ্ধতি সে ইতিমধ্যেই ভেবে ঠিক করে নিয়েছে, এখন শুধু সুযোগের প্রতীক্ষা। এ বৃদ্ধকে সে কাবু করতে পারে সহজেই, যে যত সতর্ক তাকে তত সহজে আয়ত্ত করা যায় কিন্তু শুধু নিজের স্বার্থটা দেখে একটা নিরপরাধ লোককে বিপদে ফেলতে চায় না সে। এ লোক রাধাবাঈয়ের রোষাগ্নি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না, এতদিনের বিশ্বস্ততার কথা স্মরণ ক'রে ক্ষমা করবেন—পেশোয়া-জননীর ততটা মানসিক স্থৈর্য আর এখন নেই।

সুতরাং তরুণ প্রহরীটিকেই তার প্রয়োজন। খুবই তরুণ অবশ্য। বোধ হয় কুড়ি-বাইশের বেশী বয়স হবে না। ওকেও বিপদে ফেলতে মায়া হয়, কিন্তু উপায় কি? মস্তানী তার মালিককে কথা দিয়েছে যে। সে কথা তাকে রাখতেই হবে।...

সারা দুপুর সখারাম একাই পাহারা দিল। হয়ত সকালেই খেয়ে নিয়েছিল সে, কিংবা দুপুরে খেতে যাবে না এই রকম কোন বন্দোবস্ত ছিল। একেবারে তৃতীয় প্রহর পার ক'রে রঘুজী এল সখারামকে ছুটি দিতে। হয়ত এটা সাময়িক বিশ্রামের অবসর কিংবা এইটেই ওদের আহারের সময়, কে জানে। তবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভাইপোকে যেভাবে নানারকম নির্দেশ দিয়ে গেল সখারাম, তাতে মনে হ'ল খুব তাড়াতাড়ি—অন্তত এক-আধ দণ্ডের মধ্যে ফিরবে না সে।

এইবার প্রস্তুত হ'ল মস্তানী।

গবাক্ষ ছোট, এক বর্গহাত পরিমাণ বড় জোর—তবু তা-ই যথেষ্ট। বাইরেটা অনেকখানি পর্যন্ত দেখা যায়।

সামনের প্রহরীকে তো বটেই। একেবারেই সামনে বসে আছে সে, কাকার পরিত্যক্ত সেই বাচ্ছা চৌকিটার ওপর। আর কাকার মতোই প্রাণপণে চেষ্টা করছে জানলাটাকে বাঁচিয়ে চলতে, কোনমতে ওদিকে না চোখটা পড়ে। অথচ অল্প বয়সের কৌতূহল অপ্রতিহত দুর্বার গতিতে আকর্ষণ করছে তার মন এবং দৃষ্টি—ফলে সে বেচারা বার বার শুষ্ক মুখে অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, তালা-গুলো দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে—কপাটের ওপর ও দুপাশের দেয়ালগুলোয় চোখ বোলাচ্ছে ঘন ঘন—ওদিকে চিমনজীর প্রবেশপথটা চেয়ে চেয়ে দেখছে। অর্থাৎ সব দিকেই চাইছে কেবল জানলাটার দিক ছাড়া। অথচ ঐদিকেই আকর্ষণ সব চেয়ে বেশী তার, সে অনুভব করতে পারছে যে বন্দিনী এইমাত্র চার-পাঁচ হাত দূরে ঐ জানলাটার ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে কারণ কঙ্কণের কিঙ্কিণী ও চারপাই থেকে ওঠবার শব্দ সবই পেয়েছে সে যথাসময়ে—ও-পক্ষের গতিবিধি অনুমান করতে কোন অসুবিধা হবার কথাও নয়; প্রবল লোভ হচ্ছে একবার চেয়ে দেখতে।—প্রবল প্রতাপ পেশোয়াকে যে জাদু করেছে, না জানি সেই কুহকিনী কেমন দেখতে; শুনেছে দুর্লভ সুন্দরী, সে সম্বন্ধেও তরুণ যুবকের

স্বাভাবিক আকর্ষণ তো একটা আছেই—কিন্তু লোভ যতই দুর্নিবার হোক, বাধাও বড় কম নয়, ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই মাতুশ্রী রাধাবাঈজী আর কাকাসাহেবের কঠোর হুঁশিয়ারী মনে পড়ে যাচ্ছে। সুদৃঢ় মজবুত দেওয়ালের নিরাপদ ব্যবধান সত্ত্বেও চোখের ওপর চোখ রাখতে ভরসায় কুলোচ্ছে না কোনমতেই।

বেশ কয়েক মুহূর্ত ধরে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মস্তানী, অবস্থাটা অনুমান করতেও দেরি হ'ল না তার। এবার আর হাসি চাপবারও চেষ্টা করল না, খিলখিল ক'রে হেসে উঠল সে।

আর যেন এইটুকুরই অপেক্ষা ছিল, যেন এইটুকুর জন্যই আটকাচ্ছিল কোথায় —সেই মধুক্ষরা রজতঝরা হাসি কানে যেতে তরুণ রঘুজী স্থানকালপাত্র সব ভুলে বিস্ময়ে কৌতূহলে চোখ তুলে তাকাল সেই হাসির অধিকারিণী—কল্পনা ও জনশ্রুতিতে গড়া—অপূর্ব নারীরত্নের দিকে।

দেখল বলা হয়ত ভুল, চোখ তুলে চাইল। সে চোখ আর ফিরল না, ফেরাতে পারল না কোনমতেই। কারণ এ হাসি শুধু তো শ্রুতিমধুরই নয়—দৃষ্টি-মধুরও যে। যে মুখের এ হাসি সে মুখও যে এই রকম হাসিরই যোগ্য। এমন ভুবনভোলানো হাসি আর এমন অপার্থিব সুন্দর মুখ এর আগে আর কখনও দেখে নি রঘুজী, কখনও ভাবতেও পারে নি যে এমন যোগাযোগ এ পৃথিবীতে সম্ভব।

অনেকক্ষণ মুগ্ধ বিহ্বল অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে। তারপর, যেন প্রাণপণ চেষ্টায় চোখটাকে কোনমতে টেনে সরিয়ে নিল সেখান থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি জাদুর সুতোটাও গেল ছিঁড়ে—আবার স্থানকালপাত্র সম্বন্ধে অবহিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল কাকার উপদেশ, বাঈজী-সাহেবার সতর্কবাণী। এই তো, এই কুহকের কথাই তো তাঁরা বলেছিলেন, কিছু মিথ্যে তো নয় তাঁদের কথা। নির্বোধ সে, সব শুনে বুঝেও এখনই মরতে বসেছিল। নিজের নির্বুদ্ধিতার কথাটা ভেবে প্রচণ্ড রাগ হ'ল তার, সে রাগটা যে কার ওপর তাও বুঝতে পারল না। তার ফলে আরও একটা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে বসে রইল। এই উষ্মার মূল কারণটা ভুলে, ও'দের নির্দেশ ভুলে—যেদিকে পিছন ফিরে থাকার কথা, সেই দিকেই বরং দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে গেল, উত্তেজিত রুদ্ধস্বরে বলল, 'এই, অত হাসছ কেন? আমি সঙ্ না উল্লু যে হাসছ অমন ক'রে আমাকে দেখে?'

'তুমি উল্লু হবে কেন, বালাই ষাট! তুমি মাত্র একটি বুদ্ধু!'

'তার মানে?'

'বুদ্ধু শব্দের মানে বোঝ না?'

'খুব বুঝি। কিন্তু বুদ্ধুপনাটা কোথায় দেখলে আমার শুনি?'

'বুদ্ধু না হ'লে—যেদিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে, তাকাতে হবেই বুঝতে পারছ–সেদিকে না তাকিয়ে এদিক ওদিক চারদিক তাকিয়ে নিজেকে বোকা বোঝাচ্ছ কেন?...আর দোষটাই বা কি? আমার মুখের দিকে একবার চাইলেই অমনি আমি জাদু ক'রে ফেলব কিংবা ভেড়া বানিয়ে দেব, না? ওরা বুড়ো

মানুষ, মা-দিদিমার আজগবি গল্পের বেশী কিছু জানে না, ওরা যা বলে বলুক তুমি অল্পবয়সী আজকালকার ছেলে হয়ে এমন কুসংস্কারে বিশ্বাস করলে কী ক'রে ?'

'কে বললে আমি বিশ্বাস করেছি তা ?'

'আমি বলছি। সাধ্য থাকে অস্বীকার করো ! পারবে না। কারণ তাহ'লে ডাহা নির্জলা মিথ্যা বলতে হবে, আর মিথ্যা কথা তুমি বলতে পারবে না, হাজার চেষ্টা করলেও।'

'সত্যিই তা পারি না আমি, মুখে আটকায়। কিন্তু, আশ্চর্য তো, তুমি—আপনি তা জানলেন কী ক'রে ?'

'উঁহু, উঁহু—আপনি নয়, তুমিই বলো। আমার একটি ছোট ভাই আছে, বহুকাল তাকে ছেড়ে এসেছি, তুমি তার বয়িসীই হবে।···অনেক দিন দেখি নি তবু তোমায় দেখে পর্যন্ত তার কথাই মনে হচ্ছে। কোথায় যেন একটা আদল আছে, মনে হয় এতদিনে সে এমনিই দেখতে হয়েছে—তোমার মতোই সুন্দর।'

সুখে আনন্দে গর্বে লজ্জায় রঘুজীর মুখ অরুণবর্ণ ধারণ করল, কপালে সেই চুলের গোড়াগুলো সুদ্ধ যেন লাল হয়ে উঠল, দুই কানের যেটুকু পাগড়ি থেকে বেরিয়ে আছে তাতে যেন কে আলতার পোঁচ লাগিয়ে দিল।

নেহাতই ছেলেমানুষ, কাঁচা একেবারে। রাধাবাঈ, তুমি এত বুদ্ধি ধরো অথচ এত বড় ভুল ক'রে বসে রইলে ! এই কচি ছেলেটাকে পাঠালে বাঘিনীর খর্পরে !—মনে মনে বলে মস্তানী।

লাজুক ভঙ্গীতে মাথা নামিয়ে রঘুজী বলল, 'আমি আবার ছাই সুন্দর ! আমাকে কেউ তো কই সুন্দর বলে নি কখনও। আপনার ভাই, সে যদি আপনার মতো দেখতে হয়—অনেক বেশী সুন্দর দেখতে হবে।'

'তা হয়তো হতে পারে', অকপটে বিনা বিনয়ে স্বীকার করে মস্তানী, 'অনেকদিন দেখি নি তো—। তবে তোমাকে দেখেই কে জানে কেন—তার কথা মনে পড়ছে কেবল, তাইতেই বোধ হচ্ছে যে তোমার সঙ্গে তার আদল আছে কিছুটা। নইলে, যাকে একেবারেই ভুলে ছিলাম এতকাল—তার কথা এমন ভাবে মনে পড়বে কেন ?···তবে, তোমাকে কেউ সুন্দর বলে নি কখনও—এটা ঠিক কথা হ'ল না, এ তোমার মিথ্যে বিনয়। এতদিন এ প্রাসাদে এত ছেলে দেখছি, তোমার মতো কান্তি কৈ তো বিশেষ চোখে পড়ে নি আমার।'

'বলেন কি ?' রঘুজী এবার হাসি-হাসি চোখে তাকাল, 'আপনি আমার অহংকার বাড়িয়ে দিচ্ছেন।'

'পুরুষমানুষের আবার রূপের অহংকার কি ভাই—ওটা মেয়েদেরই একচেটে। পুরুষের অহংকার তার পৌরুষে, তার শৌর্যে, তার মনুষ্যত্বে।'

'তা ঠিক। ঠিক কথাই বলেছেন আপনি। তবে কদাচিৎ কখনও দুটোর মিলন ঘটে। মহামান্য পেশোয়াই তার প্রমাণ।'

'ছিলেন।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিষাদখিন্ন স্বরে বলে মস্তানী,

'এককালে সত্যিই তাঁর শৌর্যের খ্যাতির সঙ্গে তাঁর রূপের খ্যাতিও হিন্দুস্থানে আলোচনার বস্তু ছিল। মুঘল হারেমের জেনানারা পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠতেন তাঁকে দেখার জন্যে। তাঁদেরই আগ্রহে বাদশা পটুয়া পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে, ছবি এঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু এখন আর তার কিছুই নেই। এর মধ্যে চেয়ে দেখেছ তাঁর দিকে? কী কৃশ, কী শীর্ণ হয়ে গেছেন আমার মালিক, আর কী পরিমাণ দুর্বল! সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আজকাল তাঁর দীর্ঘ দেহ চলতে গেলে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে কি বসতে পারেন না।'

'দেখেছি বৈকি!' রঘুজীর চোখে বুঝি আবার ঘৃণা ও বিদ্বেষের দৃষ্টি ফুটে ওঠে, তিক্তকণ্ঠে বলে, 'দেখেছি বৈকি! সেই জন্যেই তো আমাদের সকলের চেষ্টা, যাতে মহান পেশোয়া আবার আগের স্বাস্থ্য ও কান্তি ফিরে পান!'

আবারও হেসে উঠল মস্তানী। তেমনিই খিলখিল ক'রে। তেমনিই রজতঝরা হাসি, তবু কোথায় যেন তার মধ্যে একটু করুণ সুরেরও স্পর্শ আছে। রঘুজী বিভ্রান্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠল সে হাসির ধ্বনিতে। একবার মনে হ'ল ছুটে পালিয়ে যায় সে এখান থেকে, গিয়ে কাকাকে ডেকে নিয়ে আসে।

কিন্তু সে অবসর আর মিলল না। মধুক্ষরা কণ্ঠে করুণ সংবেদন ঝরে পড়ল, 'দ্যাখো ভাই,—আমার দিকে চাও মুখ তুলে, ভয় নেই, এই দু-হাত পুরু পাথরের দেওয়াল আর কাঁশজসমান লোহার গরাদ ভেদ ক'রে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার লোহু চুষে খাব না—বলছি যে তুমি তো বুদ্ধিমান—না না, মিথ্যে বিনয় করো না, ঈশ্বর যাকে এমন অপরূপ কান্তি দিয়েছেন, এই বয়সেই এমন শৌর্য দিয়েছেন, তাকে বুদ্ধি দেন নি এ আমি বিশ্বাস করি না, আর এ এমন কিছু জটিল সমস্যার কথাও নয়, নিতান্তই সাধারণ বুদ্ধির কথা—আমাকে যদি তোমরা খুব স্বার্থপর বা ডাকিনীই মনে ক'রো, তাহলে আমার স্বার্থের কথাটাই আগে ভেবে দ্যাখো। আমার স্বার্থটা কিসে বেশী বজায় থাকে—পেশোয়া বেঁচে থাকলে, না মরে গেলে? এ প্রাসাদে কেন, এ রাজ্যেই আমার কেউ হিতাকাঙ্ক্ষী নেই, সকলেই ঈর্ষিত, বিদ্বিষ্ট,—সে যেমন তোমরাও জানো তেমনি আমিও জানি। জানা উচিত, নয় কি, নইলে আমার কিসের এত শয়তানী বুদ্ধি! তাহলে আমি জেনে-শুনে তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছি, এটা তোমরা বিশ্বাস করলে কী ক'রে?'

কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে রঘুজী। যুক্তি অকাট্য বলেই মনে হয় তার। সত্যিই তো, সেই পেশোয়াই তো এর একমাত্র আশ্রয়, তিনি না থাকলে তো দলে পিষে মারবে সকলে। অপর কোন পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে পেশোয়ার কবল থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে—এমন ধরনের কথাও তো কখনও শোনে নি। এই স্ত্রীলোকটার নামে বহু দুর্নাম উঠেছে—কেবল এইটে ছাড়া। সে অপর কোন পুরুষে আসক্ত, এমন অপবাদ কেউ দেয় নি। তবে?

তার চোখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারে মস্তানী নিজের কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া। সে আরও আস্তে, আরও বিশ্বাসজনক ভাবে বলে, 'তা নয় ভাই। বরং উল্টোটাই। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অতিরিক্ত চিন্তাতেই পেশোয়ার এই অবস্থা।

এ বংশে এ'দের কার্‌রই শরীর ভাল না। ক্ষয়রোগ আছে এ'দের সকলকারই। চিমনজী আপ্পার চেহারা দেখেছ? নিত্য জ্বর হয় ও'র, বৈদ্যর মুখেই শুনেছি। শুধু মনের জোরে চলেন এ'রা। মনের জোরে অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে যান। কিন্তু বেশী দিন তা চলে না, মনকে হার মানতে হয় দেহের নিয়মের কাছে। পেশোয়াও এবার তাই মানতে বাধ্য হচ্ছেন।...সেটা এ'রা কেউ ভাবেন না—কিসে তাঁর বিশ্রামের সামান্য অবসরটুকু মধুর হ'তে পারে, কেমন ক'রে তাঁকে একটু পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো যায়—সে চেষ্টা কারও নেই। এ'রা শুধু জানেন ঈর্ষা আর বিদ্বেষ। মহিষী কাশীবাঈয়ের প্রাসাদের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়—তাঁর সম্ভ্রমে বাধে। এই দাসী মস্তিবাঈয়ের সে মিথ্যা সম্ভ্রমবোধ নেই, সে চেষ্টা করে পথে বা অরণ্যে—রণক্ষেত্রে বা বিলাস-কক্ষে সর্বদা কাছে কাছে থেকে তাঁর একটু স্বাচ্ছন্দ্য, একটু সেবার ব্যবস্থা করার, প্রয়োজনমতো জিনিসগুলো হাতে হাতে যোগানোর, অবসর মুহূর্তগুলিকে নৃত্যে-গীতে মধুর ও আরামদায়ক ক'রে তোলার—দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে কিছুকালের জন্যে মন আর মাথাকে শান্ত মাধুর্যে ডুবিয়ে রাখার। এটা কি আমার খুব অন্যায়?'

'না না—কিছুতে নয়। এই তো আসল সহধর্মিণীর কাজ।' উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে রঘুজী। আরও একটু কাছে এগিয়ে আসে সে। এবার জানলার মধ্য দিয়ে নজরে পড়ে অস্পর্শিত খাদ্যের থালাটা।

'এ কি, আপনি কিছু খান নি?' ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করে সে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলে, 'খাবেনই বা কি ক'রে—এ খাবার আপনার গলা দিয়ে নামা সম্ভব নয়। সাধারণ কয়েদীর খাদ্য এ। ইস্...এতটুকু বিবেচনাও নেই বাঈজী-সাহেবার।'

'না না—তার জন্যে নয়।' যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ে মস্তানী, ম্লান হেসে বলে, 'খেতে পারব না বলে খাই নি—তা নয়। ও-সবে আমার কিছু এসে যায় না। খাবো এক সময়ে ঠিকই। আর খেতেই তো হবে। সত্যিই কিছু দীর্ঘকাল উপবাস ক'রে থাকতে পারব না। তবে এখন এই মুহূর্তে কিছুতে যেন মুখে উঠছে না কিছু।' আবারও করুণ হয়ে ওঠে তার কণ্ঠ, 'যখনই মনে হচ্ছে যে সেখানে, সেই ছাউনিতে তাঁর খাওয়া-শোওয়া বা পরিচর্যার কথা চিন্তা করে এমন একজনও নেই—আমার সেবায় অভ্যস্ত মালিকের হয়ত সময়ে স্নানাহার পর্যন্ত হচ্ছে না—তখন আর যেন নিজের খাওয়ার কথা ভাবতেই পারছি না। পেশোয়া এ-সব বিষয়ে এখনও শিশুর মতো, তাঁর নিজের কখন কি প্রয়োজন তা তিনি নিজেই বুঝতে পারেন না। খাবারের থালা সামনে নিয়ে খেতে ভুলে যান। কেউ খাবার নিয়ে এলে হয়ত তাকে তিরস্কার করবেন—বলবেন, এই তো একটু আগেই খেলাম। আসলে খাওয়া হয়েছে কিনা তা-ই বুঝতে পারেন না, মনেও থাকে না কিছু।'

বলতে বলতেই সেই আয়ত সুন্দর চোখের কোলে কোলে মুক্তাবিন্দুর মতো অশ্রু টলটলিয়ে ওঠে। অথচ তখনও মুখের সেই ঈষৎ-করুণ হাসিটা মিলিয়ে

যায় না একেবারে। এই হাসিতে-কান্নায় মেশা সেই আশ্চর্য সুন্দর মুখ যে কোন পুরুষের চিত্তে বিভ্রান্তি জাগাবে—এই তো স্বাভাবিক।…

চোখ ছলছলিয়ে এসেছিল রঘুজীরও। পেশোয়ার নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখ আর এই নারীর আকুতি—দুই-ই অভিভূত ক'রে তুলেছে তাকে। মুগ্ধও হয়ে গেছে সে, বহুশ্রুত এই মায়াবিনী যে এমন মহীয়সী, এমন হৃদয়বতী, এমন সাধ্বী, তা সে কখনও কল্পনাও করে নি। ভুলে গেল সে বাঈজী-সাহেবার ও নিজের কাকার সতর্কবাণী। ও'দের সংকীর্ণচিত্ততায় বরং কেমন ঘৃণাবোধ হ'তে লাগল তার, আর সেই সঙ্গে ঈষৎ অনুতাপও। একে চিনতে পারে নি ওরা কেউ, সবাই অবিচার করেছে। এর একটি কথাও মিথ্যা নয়, কোন যুক্তিই অগ্রাহ্য করা যায় না। সত্য কথাই বলছে এ, আগাগোড়া সত্য কথা বলেছে। মহারাষ্ট্র-গৌরব পেশোয়া বাজীরাও-এর একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষিনী নারীকে কারারুদ্ধ ক'রে রেখে শুধু অন্যায় নয়—এক বিরাট পাপই করছে তারা।

সে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমি—আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করছি—আপনার মুক্তির জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব, কিন্তু আপনাকেও একটি মিনতি রাখতে হবে আমার। আমি সামান্য একটু মিঠাই এনে দিচ্ছি, দোহাই আপনার—আপনি যা হয় কিছু মুখে দিন। এমন ক'রে মিছিমিছি উপবাস ক'রে থাকবেন না।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন ফিরছিল সে, কিন্তু মস্তানী তাকে সুযোগ দিল না। দূরে যাবার আগেই জানলার গরাদ দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার কাঁধটা চেপে ধরল, তারপর সেই ভাবেই তাকে আর একটু কাছে টেনে এনে নিজের ওড়নার প্রান্ত দিয়ে তার কপালের ও চোখের কোলের ঘাম আর চোখের জল মুছিয়ে দু হাতে তার দুই গাল ধরে মুখখানা নিজের চোখের দিকে ফিরিয়ে বলল, 'লক্ষ্মী ভাইটি আমার—এমন চট্ ক'রে বিপদ ডেকে এনো না।…তুমি ছেলেমানুষ, একেবারেই কাঁচা, তুমি জানো না—জীবনের সব চেয়ে বড় শিক্ষাই হ'ল বিনা বিচারে কারও কথা বিশ্বাস না করা। আমাকে চেনো না—জানো না—কতটুকুই বা পরিচয়, এত সহজে আমার কথা বিশ্বাস ক'রে বসলে? এমন ছেলেমানুষ হ'লে জীবনের পদে পদে ঘা খেতে হবে। তোমাদের মাতুশ্রী-সাহেবা—তাঁকে দীর্ঘকাল, হয়ত বা আজন্ম দেখছ। তাঁর কথা যে ঠিক নয়, তাই বা ভাবলে কেমন ক'রে? হয়ত আমি তোমার সংগে অভিনয় করছি আগাগোড়াই, হয়ত সব কথাই আমার মিথ্যা—হয়ত সত্য-সত্যই কুহকিনী জাদুকরী—কে বলতে পারে সে কথা? আমার দুটো মিষ্টি কথায় তোমার গুরুজনদের উপদেশ-নির্দেশ ভোলা কি তোমার উচিত?'

সেই স্পর্শে, সেই সস্নেহ বাক্যে—যেটুকু সংশয় থাকতে পারত রঘুজীর মনে, সেটুকুও আর রইল না। সে আস্তে আস্তে নিজের গাল দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে দু-হাতে মস্তানীর দুটো হাত চেপে ধরল। তেমনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'সে যাই হোক, ঠিক-জিত—আমার কথার নড়চড় হবে না বাঈ-সাহেবা। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়েছি, সে শপথ আমি পালন করবই।'

'কিন্তু ভাইটি আমার, কথা দিয়ে যাও যে সাবধানে চলবে, অকারণ নিজের ওপর কোন বিপদের ঝুঁকি আনবে না ?···তোমাকে ভাই বলেছি, তোমাকে দেখে আমার আপন ভাইয়ের স্মৃতি জেগেছে—কেবল তার কথাই মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে সেই ভাই-ই আমার অন্য নামে এসেছে—আমার জন্যে যদি কোন বিপদ হয় তো সে আমি সইতে পারব না।'

ততক্ষণে রঘুজীর শান্ত গাম্ভীর্য ফিরে এসেছে। সে সংক্ষেপে ধীর ভাবে বলল, 'আমি কথা দিচ্ছি দিদি, সাবধানেই চলব, অকারণে কোন ঝুঁকি নেব না। নেব না তার কারণ, তাতে আপনার মুক্তিই বিলম্বিত হতে পারে।'

॥ ১৩ ॥

আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না রঘুজী, কারণ ওদিক থেকে সখারামের পায়ের শব্দ শোনা গেল। সে আবার এল সন্ধ্যারও বেশ কিছুটা পরে—প্রহর খানেক উত্তীর্ণ হয়ে গেলে।

তার এই বিলম্বের জন্য সখারাম কিছু তিরস্কারই করল। এত রাত্রে গিয়ে সে স্নান-সান্ধ্যপূজা সেরে কখনই বা খাবে, আর কতটুকুই বা বিশ্রাম করবে। আবার তো সেই ভোর হতে না হতে তাকে এসে এই পাপের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিতে হবে।

অপরাধীর মত মাথা চুলকে রঘুজী বলল, 'আমাকেও তো খাওয়া-দাওয়া সেরে আসতে হ'ল, লঙ্গরখানায় আজ রসুই পাকাতে দেরি হয়ে গিয়েছে।·· আপনি না হয় কাল দেরি ক'রেই আসবেন একটু—স্নান-পূজা সেরে। আমি—আমার এখানে দেরি হ'লেও কোন ক্ষতি হবে না।'

ঈষৎ যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বন্ধ দোরটার দিকে তাকিয়ে সখারাম (জানলার দিকে তাকাবে না—জাদুর ভয়) অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলল, 'না না, তোমাকে আর বেশী বাহাদুরি করতে হবে না। তোমারও তো মুখ-হাত ধোওয়া আছে, তাছাড়া আমাকে লোক-লস্কর এনে চাবি খুলে দাঁড়াতে হবে, জমাদার আসবে সাফাই করতে, খাবার জল দিয়ে যাবে—সে-সব কাজ তো তোমাকে দিয়ে চলবে না। বাঈআম্মাসাহেবার কড়া হুকুম, আমি ছাড়া আর কাউকে চাবি দেবেন না তিনি, আর কাউকে বিশ্বাস নেই।'

ঈষৎ গর্বের সঙ্গেই মোচে তা দিতে দিতে সখারাম চলে গেল।

তার পদশব্দ দূরে অলিন্দে মিলিয়ে যাবারও অনেক পরে, প্রাসাদের এ অংশ নির্জন ও নিস্তব্ধ হয়ে এলে রঘুজী জানলার কাছে এসে দাঁড়াল, 'দিদি!'

'এই যে ভাই, আমি এখানে দাঁড়িয়েই আছি।'

নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে এত কাছে থেকে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে উত্তরটা আসাতে একটু যেন চমকেই উঠল রঘুজী, ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল বুকের মধ্যেটা। সত্যিই কোন অনৈসর্গিক ক্ষমতা আছে কিনা এই মহিলার—সে সম্বন্ধেও একটা সংশয় জাগল মুহূর্তের জন্য। কিন্তু শরতের লঘুপক্ষ একটুকুরো মেঘের

ছায়ার মতোই নিমেষে সরে গেল তা। বন্দিনী মুক্তির আশা পেয়েছে, সে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এই তো স্বাভাবিক। তাছাড়া এখনও যথেষ্ট গরম রয়েছে, ঐ চারিদিক রুদ্ধ নিরেট পাষাণ-কারার মধ্যে রাজকন্যা রাজরাণীর দম বন্ধ হয়ে এসেছে হয়ত, তাই একটুখানি শীতল নির্মল বাতাসের জন্য এই সামান্য উন্মুক্ত স্থানটুকুকে আঁকড়ে ধরেছে প্রাণপণে।

নিজের সংশয়ের জন্য লজ্জিত বোধ করল রঘুজী, আস্তে আস্তে কতকটা অনুনয়ের সুরে বলল, 'এই—একটু মিঠাই এনেছি দিদি, আগে খেয়ে নিন, তারপর অন্য কথা বলছি—'

সে জানলার গরাদের মধ্য দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা একটা করে পাঁচ-ছটা মিঠাই মস্তানীর বদ্ধকরপুটে তুলে দিল। মৃদুকণ্ঠে অনুযোগ করল মস্তানী, 'কেন আবার এসব আনতে গেলে ভাই, এক-আধ দিনের উপবাসে আমার কিছুই হয় না, কিছু হ'ত না আজকে না খেলে।'

'তা হোক, এ তো সামান্যই, উপবাসের পক্ষে কতটুকুই বা, এটুকু অন্তত না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বেন যে। আমাদের যা উদ্দেশ্য তা সাধন করতে গেলে অনেক কষ্ট করতে হবে, হয়ত অনেক দৈহিক ক্লেশও স্বীকার করতে হবে। তার জন্য দেহটা ঠিক থাকা দরকার।'

আর কিছু বলল না মস্তানী। সত্যিই তার তখন কষ্ট হচ্ছিল। তখনও পূর্ণ যুবতী সে, স্বাস্থ্যবতী। তাছাড়া নৃত্যে অশ্বারোহণে নিয়মিত ব্যায়াম চলে তার সুতরাং ক্ষুধা স্বভাবতই বেশী, হজম করার শক্তিও। সারাদিনের উপবাসে মাথা ঝিমঝিম করছে তার। সে সব ক টা মিঠাই-ই খেয়ে ফেলল, খেয়ে সুরাই থেকে কয়েক চুমুক জল খেয়ে আবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াল।

'তারপর ?'

'একটু দুঃসংবাদ আছে দিদি, আজই কিছু করা যাবে না। বাঈ-আম্মাসাহেবা এই তিনটি তালার চাবি সর্বদা নিজের কাছে রাখছেন। স্নান করছেন, পুজো করছেন, আহার করছেন—ঐ চাবি আঁচলে বেঁধে। হয়ত ঘুমোচ্ছেনও ঐ চাবি কোমরে গুঁজেই। একমাত্র আমার কাকাকে বিশ্বাস করেন তিনি—তাও যে একা ছেড়ে দেবেন তা মনে হয় না। সম্ভবত সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়াবেন। এই খোঁজ পেয়ে আমি গিয়েছিলাম বাগানের মধ্যে আমাদের লোহারের কাছে। পেশোয়ার নিজস্ব লোহার তালা তৈরি করালে তার কাছ থেকেই করিয়েছেন নিশ্চয় বাঈ-আম্মাসাহেবা। তাছাড়া তার তালা তৈরিতে নাম-যশও আছে। সে ঘুঘু লোক, কিছুতেই স্বীকার করবে না—শেষে, শেষে তাকে আমার স্ত্রীর কণ্ঠহার পুরস্কার দেব এই অঙ্গীকার ক'রে কথা বার করেছি, সে স্বীকার করেছে যে এ তালা তারই তৈরি আর চাবির গঠন তার মনে আছে। সে আর একপ্রস্থ ক'রেও দেবে—তবে দিনে তার কারিগরদের সামনে পারবে না, কারণ একজনও যদি জানতে পারে—কথা ছড়িয়ে পড়ার ভয় আছে, আর তাহলে তার শির থাকবে না। বাঈ-আম্মা যদি ক্রুদ্ধ হন—স্বয়ং পেশোয়াও তাকে রক্ষা করতে পারবেন না, অন্তত অত হাঙ্গামা তিনি করবেন না।

কাজেই রাতে রাতে তাকে তৈরি করতে হবে, একা। দেরি হবে। হয়তো আরও দ্‌টো দিন অপেক্ষা করতে হবে—'

'আরও দ্‌দিন!' মস্তানীর কণ্ঠে হতাশা চাপা থাকে না। হতাশা আর ক্ষোভ, অসহায় ক্ষোভ—পরাজয়ের গ্লানি মেশানো. 'আরও দ্‌দিন এইভাবে কাটাতে হবে?'

'কোনও উপায় নেই দিদি, বিশ্বাস কর্‌ন।' রঘ্‌জী যেন কর্‌ণ মিনতি করে, 'আমার প্রাণপণ করেছি আমি। এই জন্যই এত দেরি হ'ল আসতে, সব কারিগর বেরিয়ে না গেলে কথা পাড়তেই পারি নি। যদি, যদি কাজ উদ্ধার হবার আগে এ ষড়যন্ত্রের বিন্দ্‌মাত্র খবর বাইরে ছড়ায় তো সে বেচারাও যাবে আমিও যাব, সপরিবারে। তব্‌ তার জন্য ভাবি না, আপনাকে নিরাপদে এখান থেকে ম্‌ক্ত ক'রে দিতে পারলে আমার সব দ্‌ঃখ সার্থক হবে।'

ততক্ষণে মস্তানী সামলে নিয়েছে নিজেকে। সহজ ব্‌দ্ধির জয় হয়েছে তার। সেও যেন আকুল হয়ে উঠল, বলল, 'কিন্তু তুমি আমার ভাবীর গলার হার, হয়ত বা তার বিয়ের হার দিয়ে বসে রইলে তাই বলে! ছি ছি, কী করলে বলো তো? আমি যে লজ্জায় মরে যাচ্ছি। তুমি আমার হার চেয়ে নিয়ে গেলে না কেন!'

'আপনার অলঙ্কার বড় বেশী পরিচিত দিদি, সে গহনা বেচতে গেলে যে সে বেচারী মারা পড়ত। আর তখন সময়ও তো ছিল না। এবার—এবার বাড়ি থেকে আসার সময় খ্‌লে দিয়েছিল আমাকে, কোঁড়া কেটে গিয়েছিল—সেটা সারিয়ে নিতে। সেই থেকে আমার জেব-এই ছিল। কোন অস্‌বিধা হয় নি দিদি—বিশ্বাস কর্‌ন। আপনার সংকোচের কোন কারণ নেই। আমার যথাসর্বস্বও যদি আপনার কাজে উৎসর্গ করতে পারি, তাহলে সব চেয়ে স্‌খী হবো। তার চেয়ে সার্থকতা আর আমার জীবন বা ধনসম্পদের কী হ'তে পারে?'

খ্‌ব কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল রঘ্‌জী, ওর জানলার গরাদের ওপর একটা হাত রেখে। মস্তানী দ্‌-হাতে ওর সেই হাতটা চেপে ধরল, ঠেকাল নিজের কপালে, তারপর গাঢ়স্বরে বলল, 'তোমার কাছে যা পেলাম ভাই, হয়তো তুমি আমার নিজের ভাই হ'লেও তা পেতুম না। তোমার এ আত্মত্যাগের ঋণ কোন পার্থিব ম্‌ল্যে শোধ হয় না, তব্‌ বলছি, যদি আমি ম্‌ক্তি পাই—আর একদিনের জন্য, এক প্রহরের জন্যও আমার মালিকের সঙ্গে মিলিত হতে পারি তো তোমার জীবন বা তোমার ধনসম্পদ কোনটারই কোন ক্ষতি হবে না। তবে আবারও বলছি, ঐ সাতপ্‌রা পর্বতশ্রেণীর ওজনে সোনা দিলেও তোমার এ স্নেহের শোধ হয় না ভাই। আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমার এই স্নেহময় বালক ভাইটির কথা মনে থাকবে।'...

হয়ত এ অভিনয় নয়—সত্যিই আন্তরিক। খেলা হয়ত আর খেলা নেই, মহান সত্যের সামনে এসে দাঁড়িয়ে, তার অম্‌তস্পর্শে মিথ্যাও সত্যে পরিণত হয়েছে কখন। সে যাই হোক, রঘ্‌জী যেন শিউরে কেঁপে উঠল, বিশেষ ক'রে

কৃতজ্ঞতার নিদর্শন ঐ ললাটের স্পর্শে ; বিহ্বল হয়ে গেল। নিজের ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমেছিল আগে থেকেই, এখন তা সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়ল। জলধারার মতো গড়িয়ে পড়তে লাগল কণ্ঠ কপোল বেয়ে, মস্তানীর হাতের মধ্যে ধরা হাতখানা কাঁপতে লাগল থর থর ক'রে। সামনের দেওয়ালে ওপরের ঝুলনো শামাদানের আলো এসে পড়ে প্রতিফলিত হয়েছে এ দেওয়ালেও, তারই একটা আভা পড়েছে উপবাসক্লিষ্ট ঈষৎ শুষ্ক অপরূপ সুন্দর একটি মুখে। সম্পর্ক যা-ই হোক, এই মুখ যার তার সুখের জন্য শান্তির জন্য চরম আত্মত্যাগ না করা পর্যন্ত সেই তরুণ যুবক স্থির হবে কেমন ক'রে!

বেশ কিছুক্ষণ কাটল সেই বিহ্বলতায়, সেই অদ্ভুত অনুভূতিতে। তারপরই যেন চমকে উঠল রঘুজী। প্রাণপণ চেষ্টায় সম্বিৎ ফিরিয়ে আনল আবার। সহজ ভাবে বলবার চেষ্টা করল, 'দুটো কি তিনটে দিন একটু ধৈর্য ধরে থাকুন। চাবি ছাড়াও কিছু আয়োজন আছে। ঘোড়া চাই একটা। সে ঘোড়া প্রস্তুত ক'রে বাইরে রাখতে হবে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রাসাদের ফটক বন্ধ থাকে, তার ভেতর বিনা অনুমতিপত্রে একটা মাছিরও যাওয়া-আসা নিষেধ। সে অনুমতিপত্র দেওয়ার মালিক এখন চিমনজী আপ্পা। সেও নিতে যাওয়া চলবে না। যখন ফটক খুলবে তখনই—একটু আবছা আঁধার থাকতে বেরিয়ে যেতে হবে। পুরুষের পোশাকে যেতে হবে—সিপাহীর পোশাক হ'লে আরও ভাল হয়। এমন কত লোকই তো কত কাজে যায়—কেউ সন্দেহ করবে না। আমিও আপনার সঙ্গে যাব, ঘোড়া যেখানে থাকবে সেখান পর্যন্ত, এখান থেকে আলাদা বেরোব—দূরে দূরে, বাইরে গিয়ে একত্র হাঁটলেও ক্ষতি নেই। আপনাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে দিলে নিশ্চিন্ত, তারপর আশা করি পাটাস পর্যন্ত যেতে আপনার কোন অসুবিধা হবে না।'

'তা হবে না। কিন্তু ঘোড়া একটা নয়, দুটো চাই ভাই। দরকার হ'লে আমার খৎ নিয়ে যদি শহরে যাও, বহুলোক তোমাকে টাকা ধার দেবে। কিন্তু তাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে, বিশেষত তোমার। কোনমতে এখন যদি চালিয়ে নিতে পারো, এর পর কড়াক্রান্তিতে শোধ দিতে পারব।'

'কিন্তু দুটো ঘোড়া কি হবে দিদি?'

'সে পরে বলব। আর একটি অনুরোধ—যদি সম্ভব হয়, না সম্ভব নয়—আনতেই হবে, কোনমতে এক তা কাগজ আর একটু দোয়াত কলম এনে দিও। একটা খৎ লিখতে হবে।'

'দেব।' বলে কপালের ঘাম মোছে রঘুজী। দ্বিতীয় প্রহরের সান্ত্রী বদল হবে, চৌকিদাররা ঘুরে দেখে যাবে সব ঠিক আছে কিনা। এবার একটু সতর্ক হওয়া দরকার। রঘুজী একটু সরে গিয়ে কাকার সেই ছোট চৌকিটার ওপর বসে পড়ল। বসার প্রয়োজনও ছিল, পা-দুটো কাঁপছে তখন থেকে, ভেঙে আসছে যেন। বিভিন্ন অনুভূতির সংঘাত দৈহিক আঘাতের চেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে তার।

পরের দিন সত্যিই রাধাবাঈ নিজে এসে দাঁড়ালেন দরজা খোলার সময়। পাখী এখনও খাঁচায় আছে দেখে আশ্বস্তও হলেন যেমন, একটু বিজয়গর্ব'ও বোধ করলেন। বিশেষ ক'রে অভুক্ত খাদ্যের থালা এবং বন্দিনীর নিরতিশয় শুষ্ক মুখ দেখে তাঁর পৈশাচিক আনন্দ বোধ হ'ল।

'দেখা যাক ক'দিন না খেয়ে থাক তুমি,-ঐ ভাতই খেতে হবে। ভেবো না যে মেজাজ দেখালেই আমি পাল্‌টে রাজভোগের ব্যবস্থা করব।' মনে মনে বললেন রাধাবাঈ।

সেদিনও অবশ্য খেল না মস্তানী, খাওয়ার প্রয়োজনও হ'ল না। সেদিন দুপুরেই একসময়—সখারামকে স্নানাহারের অবসর দেওয়ার ছুতোয়—রঘুজী এসে কয়েকটা ক্ষীরের লাড্ডু দিয়ে গেল। আবার রাত্রে নিয়ে এল গরম মালপুয়া দুখানা, বিনায়কের প্রসাদ। জানালো যে ঘোড়া দুটোরই ব্যবস্থা করেছে সে তার জন্য তাকে বন্ধুমহলে বহু টাকা ঋণ করতে হয়েছে, এতদিনের সঞ্চিত টাকা—যা সে দেশে একটা ঘর তুলবে বলে জমিয়ে রেখেছিল প্রাণপণে, বলতে গেলে না খেয়ে, তাও বেরিয়ে গেছে।···এ কথা অবশ্য সহজে বলে নি, প্রাণপণে চেপে রাখারই চেষ্টা করেছিল, মস্তানী তার সহানুভূতি দিয়ে স্নেহ দিয়ে অভিভূত ক'রে বার ক'রে নিল কথাটা। আপসোসের সীমা রইল না তার, আসার সময়ে নগদ টাকা কিছু না আনার জন্য। হৃদয়াবেগ চালিত বোকার মতো ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছে সে—নিজের বুদ্ধির ওপর ভরসা ক'রে।

পরের দিন কিন্তু রাধাবাঈ নিজেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন, ভাতের থালার একটি ভাতও স্পর্শ করা হয় নি দেখে। ছেলেকে চেনেন তিনি, ভয়ংকর ক্রোধ তার—লঘু-গুরু জ্ঞান থাকে না রাগলে। মস্তানী অনাহারে ছিল এ কথা কানে গেলে মাকে অপমান করাও আশ্চর্য নয় তার পক্ষে।···

সেদিন তিনি কিছু উৎকৃষ্ট অন্নেরই ব্যবস্থা ক'রে দিলেন—অন্নব্যঞ্জন, শ্রীখণ্ড এবং পায়স। আজ মনে মনে হাসবার পালা মস্তানীর। সে কিন্তু আর এ খাদ্য উপেক্ষাও করল না। শুধু মিঠাই খেয়ে জীবন-ধারণ হয়ত করা যায়, স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রাখা যায় না তাতে।···

অবশেষে এল সেই মুক্তির দিনটি। দু-দিনেও চাবি শেষ করতে পারে নি লোহার। বেশীই লেগে গেল সময়। তা হোক, এমন কিছু বেশী দিন নয়। আর, প্রথম দু-তিন দিনের সতর্কতা ইতিমধ্যেই শিথিল হয়ে এসেছে কিছু, ওদের পক্ষে সে-ই সুবিধা। জাদুকরী তেমন কোন ভেল্‌কি দেখালে প্রথম দিনেই দেখাতে পারত, রাধাবাঈ বুঝেছেন ওর ঝুলিতে বেশী কিছু নেই। অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন তিনি।

শেষ রাত্রে চুপিচুপি তালা খুলে দিল রঘুজী। তখন অবশ্য প্রাসাদ থেকে বেরনো যাবে না, সে-সময়ের একটু আগেই বেরোল ওরা। এটা লোহাররাই শিখিয়ে দিয়েছিল ওদের। রাত আড়াইটে থেকে তিনটে—এই নাকি সব চেয়ে গাঢ় ঘুমের সময়, এই সময়ই চোরেরা সিঁধ কাটে। লোহাররাই সিঁধ-কাঠি

পড়ে, তাদের সঙ্গে চোরদের যোগাযোগ আছে। অতএব তাদের মত অভ্রান্ত।

জানলার পাল্লাটা ক'দিন মধ্যে মধ্যে ভেজিয়ে রাখছিল মস্তানী ইচ্ছা ক'রেই, এই পলায়নের প্রস্তুতি হিসেবে। আজ ভাল ক'রে বন্ধ করল ভিতর থেকে। তারপর নিজের পোশাক ছেড়ে, পুরুষ মজুরের পোশাক পরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আবার যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে তালা তিনটে বন্ধ করল রঘুজী। তারপর জুতো খুলে খালি পায়ে দুজনেই নেমে এসে বাগানে পড়ল।···প্রাসাদের বড় ফটকের দিকে গেল না ওরা, ওখানে পাহারার কড়াকড়ি বেশী, ভিড়ও বেশী ঢের। রঘুজীর চেনা লোক বেরিয়ে যাবে হয়ত। তখন নানান জবাবদিহি, কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ, সঙ্গে এ ছোকরা কে—ইত্যাদি। দিনের আলোয়—তা সে যত ভোরেরই হোক—ছদ্মবেশ বজায় রাখা শক্ত, বিশেষ মস্তানীর মতো রূপসীর।···

গেল ওরা উত্তর দুয়ারে। এই দিকটার ফটক এখনও পুরো তৈরি হয় নি। ছত্রপতি নিষেধ করেছিলেন। পেশোয়া বাজীরাও-এর পুণার এই প্রাসাদ ছত্রপতির তো বটেই, স্বয়ং নিজামের প্রাসাদকেও ছাড়িয়ে গেছে—আকৃতিতে ও আড়ম্বরে—এই কথা কানে আসতেই ছত্রপতি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন বোধ হয়। বলে পাঠিয়েছিলেন যে, উত্তর অর্থাৎ দিল্লির দিকের দরওয়াজাটা অসমাপ্তই থাক, নইলে দিল্লির বাদশার প্রতি অসম্মান দেখানো হবে। সেই দরওয়াজা সেই থেকে সেই অবস্থাতেই পড়ে আছে, অসমাপ্ত খিলেন, কপাট বসে নি এখনও, ইঁট আর পাথর সাজিয়ে ভরাট করে রাখা হয়েছে শূন্যতাটা, তার পাশ দিয়ে লোক-চলাচলের একটা সংকীর্ণ পথ ক'রে নিয়েছে লোকে—প্রয়োজনের তাগিদে। সে জন্যে এ ফটকে বিশেষ সান্ত্রীপাহারারও ব্যবস্থা নেই।

প্রথমটা, দূর থেকে পথ সত্যিই জনহীন বলে মনেও হয়েছিল। তবু, আইনত কারুর না কারুর এদিকে থাকা উচিত, এমনি প্রাসদের বাগানেও তো সারারাত পাহারার ব্যবস্থা আছে নিশ্চয়—এই সব ভেবেই একটু সন্তর্পণে, হুঁশিয়ার হয়েই এগোল ওরা।

আর দেখা গেল ওদের আশংকা বা অনুমান একেবারে অমূলকও নয়। মহামান্য পেশোয়ার যে শক্তি তাদের মাথার উপর মহৎ ভয়ের মতো বিরাজ করছে, তার দৃষ্টি ও শ্রুতি সদা জাগ্রত, সদা সতর্ক। সেই আপাতজনহীন ফটকের পাশের রাস্তাটা পেরিয়ে যাচ্ছে এমন সময় পিছনের পথে কার পদশব্দ উঠল, কণ্ঠস্বরও বেজে উঠল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—সম্ভবত কোন সান্ত্রীরই—'কে যায় এত ভোরে?'

রঘুজীর বুকের মধ্যে কামানের গোলা পড়ার শব্দে আছড়ে পড়ল যেন সেই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটা, মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে উঠল ওর মুখ; বোধ করি দ্রুত হেঁটে কিংবা ছুটেই পালিয়ে যেত সে কিন্তু বুদ্ধিমতী মস্তানী নিমেষে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নিয়ে পা দিয়ে সজোরে রঘুজীর পায়ে একটা চাপ দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

তার সুফলও ফলল। যে সান্ত্রীটি আসছিল তার বিশেষ কোন সংশয়ের

হেতু ছিল না, এমনি অলস কৌতূহলেই করেছিল প্রশ্নটা—নেহাৎই নিয়ম মোতাবেক। এখন এদের সহজভাবে দাঁড়িয়ে যেতে দেখে আরও নিশ্চিন্ত হ'ল সে, যেটুকু বা সন্দেহ হ'তে পারত সেটুকুও হবার কারণ রইল না। সে বেশ ধীরে সুস্থে কাছে এসে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ ভাই—এত ভোরে? এখানকার লোক, না মজুরী খাটতে এসেছিলে বাইরে থেকে?' তারপর সেই আবছা আলোতে রঘুজীর মুখখানা ভাল ক'রে ঠাউরে দেখে বলল, 'তোমার মুখটা তো চেনাচেনা মনে হচ্ছে জোয়ান ভাই, তুমি নিশ্চয় এখানকার লোক?'

এতক্ষণে রঘুজীও সামলে নিয়েছে নিজেকে, কী বিষম ভুল করতে যাচ্ছিল একটা তাও বুঝতে পেরেছে, আর সেজন্যে আরও এক দফা মস্তানী সম্বন্ধে সবিস্ময় শ্রদ্ধা অনুভব করছে মনে মনে—সে এবার বেশ দরাজকণ্ঠে হেসে উঠে বলল, 'বিলক্ষণ! সেই ছেলেবেলা থেকে বাঈআম্মাসাহেবার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি—এই পরিবারের সেবায় জীবন কাটল—এ মুখ যদি চেনা মনে না হয় তাহলে বুঝতে হবে তুমিই নতুন এসেছ এখানে!'

সাস্ত্রী একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'না না—চিনতে পারব না কেন! চিনতে পেরেছি ঠিকই—তেমন আলো হয় নি এখনও বলেই ঠাওর হচ্ছিল না। তা এ ছোকরাকে নিয়ে যাচ্ছ কোথায় হন্তদন্ত হয়ে এই সাত সকালে?'

'আর বলো কেন, পেশোয়া না থাকলেই আমাদের এখানকার বাবুদের আরাম করার ধুম পড়ে যায়—বছর পোরে তখন আঠারো মাসে। বুড়ো গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর—বুঝলে না! এই ছোকরা কাল মজুরী খাটতে এসেছিল, সন্ধ্যাবেলা পয়সা নিয়ে নিজের ঘরে যাবে তা খাজাঞ্চীখানাতে পুরো একটি প্রহর বসে থাকবার পর যখন পয়সা হাতে পেয়েছে তখন আর প্রাসাদ থেকে বেরোবে কেমন ক'রে? অন্তত তার একটি ঘণ্টা আগে ফটক বন্ধ হয়ে গেছে এখানের। না খেয়ে বসে বসে কাঁদছিল, দেখে আমার ঘরে বসিয়ে রেখেছিলম, খেতেও দিয়েছি কিছু, তা সারারাত ঘুমোয় নি, ভয়ে কাঁটা। ভোরে বললুম চলে যা—বলে আমার ডর লাগছে, যখন এতই দয়া করলে আমাকে ফটকটা পার করে দাও।'

'নাও ঠেলা! এমন করলে কে আর এখানে কাজ করতে আসবে বলো দিকি! এই তো হয়েছে এখন এখানকার হালচাল। আমরাই সময়মতো মাইনে পাই না—তা এরা।…তা ও ফটকে না গিয়ে এদিকে এলো কেন?'

'আমিই নিয়ে এলুম, এই দিকে বিঠ্ঠল পুরে বাড়ি ওর—এই ফটক দিয়ে বেরিয়ে একটু উত্তরে গিয়ে সোজা পুবদিকের রাস্তা ধরলে আধ ঘণ্টার পথও নয়। তাই দেখিয়ে দিচ্ছি।…আর জানো তো বড় ফটকের বড় পাহারাদারদের কাণ্ড, কোন এক ছুতোয় বেচারাকে আটকে রেখে হয়ত যা পেয়েছে সব কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেবে!'

'তা যা বলেছ! সব পিশাচ এক-একটি। আচ্ছা যাও, তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাও। তুমি দেখছি বেশ সাচ্চা লোক, তোমার উন্নতি হবে, ভগবান বিনায়ক কখনও তোমার অমঙ্গল করবেন না।'

এই বলে, পিঠ চাপড়ে শুভেচ্ছা জানায় সে রঘুজীকে।

বলা বাহুল্য রঘুজীও আর দ্বিরুক্তি করে না, বরং যেন সাস্ত্রীর উপদেশ মতোই হন হন ক'রে এগিয়ে গিয়ে রাস্তায় পড়ে। ঠাণ্ডা ভোরাই হাওয়াতেও ঘেমে নেয়ে উঠেছিল ভেতরে ভেতরে, এখন বাইরে বেরিয়ে এসে জামার হাতায় কপালের ঘাম মুছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

এবার বড় রাস্তায় পড়ে কিছুটা দূরে একটা বাগানে গিয়ে ঢুকল দুজনে। একটা মঠের পিছন দিকের বাগান। মঠটায় সাধু-সাধকের সংখ্যা কম, সেবকেরও —সেই অনুপাতে। বাগানটা জনহীনই পড়ে থাকে। এইখানেই দুটি ঘোড়া বাঁধা ছিল ওদের। সময় অল্প, ক্রমশ বেশ ফরসা হ'য়ে উঠছে চারদিক, রঘুজী আর কালক্ষেপ করল না। ঘোড়া দুটো খুলে তাদের বাইরে নিয়ে এল, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে নিজের কাঁধ পেতে দিয়ে বলল, 'উঠুন দিদি।'

তা অবশ্য উঠল না মস্তানী বরং সস্নেহে হাত ধরে ওকে তুলে, ওর কাঁধে একটা হাত রেখে পুরুষের মতোই সহজে ঘোড়ায় চেপে বসল।...

আঃ মুক্তি, মুক্তি! আর কারও পরোয়া করে না সে, আর কারও সাধ্য নেই যে তাকে ধরে। এক পেশোয়া ছাড়া অশ্বারোহণে তাকে খাটো করতে পারে এমন কেউ নেই। এ বিষয়ে সে পেশোয়ার যোগ্য শিষ্যা।...

পাটাসে যাবার অপেক্ষাকৃত জনহীন রাজপথে পড়ে থমকে দাঁড়াল দুজনে। 'এবার তাহলে যাই দিদি?' ঈষৎ করুণ, বিষণ্ণ শোনাল রঘুজীর কণ্ঠস্বর।

'যাবে, কিন্তু শান্‌ওয়ার ওয়াড়ায় নয়। সোজা যেতে হবে এখন তোমাকে সাতারায়। মহামান্য ছত্রপতির কাছে।'

'সাতারায়! সে কি!...এখানে—?'

'এখানে যাওয়া মানে নিশ্চিত কারাবাস, মৃত্যু? এই তো? এখানে যাওয়ার এত তাড়া কি? ছত্রপতির নামে একটা খৎ আছে, খুব জরুরী খৎ—এটা পৌঁছে দিতেই হবে আজ, অন্তত কাল সকালে নিশ্চিত। এ কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না, কাউকে দিয়ে বিশ্বাস হবে না। এর ওপর রাজ্যের মঙ্গল নির্ভর করছে। যাও ভাই লক্ষ্মীটি—'

'তারপর?'

'তারপর কী করতে হবে ছত্রপতিই সে নির্দেশ দেবেন। তুমি রাজকার্যে ব্যস্ত থাকবে যতক্ষণ, বাঈ-আম্মাসাহেবার ক্রোধ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

'কিন্তু আমার পরিবারের বাকী সকলকে পায়ে মাড়িয়ে শেষ করতে তাঁর এক দণ্ডের বেশী লাগবে না।'

'তাঁদের কি তুমিই বাঁচাতে পারবে? সে ভার বরং আমার ওপর ছেড়ে দাও, পেশোয়ার কাছে পৌঁছতে যেটুকু দেরি—তারপর আর কোন অসুবিধা হবে না।'

মস্তানী তার বুকের মধ্য থেকে বক্ষচ্ছেদে ঈষৎ আর্দ্র সেই খৎখানা বার ক'রে রঘুজীর হাতে দিল—রঘুজীরই সংগ্রহ করা সেই কাগজ—আর দিল হাত থেকে খুলে পেশোয়ার শীল-করা আংটি। বলল, 'এই আংটি তোমার কাছে রাখ,

যদি পথে কোন বাধা আসে কি কেউ আটকাতে চায় তো এই আংটি দেখিও, ব'লো পেশোয়ার কাছ থেকে জরুরী কাজে যাচ্ছ ছত্রপতির কাছে—সবাই ছেড়ে দেবে। সাতারার দুর্গ-ফটকেও এই আংটি দেখিও, যখনই যাও না কেন—সোজা ছত্রপতির কাছে নিয়ে যাবে তোমাকে।' এই বলে—দুহাতে রঘুজীর দুই গাল ধরে মুখখানা কাছে এনে অভিভূত আচ্ছন্ন সেই তরুণের ললাটে সস্নেহে একটি চুম্বন ক'রে পাটাসের পথ ধরল মস্তানী। শিক্ষিত আরোহীর পায়ের চাপ বুঝতে ঘোড়ার বিলম্ব হয় না। দেখতে দেখতে সে ঘোড়া দূর পার্বত্য-পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ সময় লাগল রঘুজীর হারানো চৈতন্য গুছিয়ে ফিরিয়ে আনতে, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে-ও সাতারার পথ ধরল।

*

* *

মস্তানী কখনও কথার খেলাপ করে না, অসম্ভব বলেও কোন কথা নেই তার অভিধানে। তার পক্ষে সবই সম্ভব। এই আশ্বাসেই বুক বেঁধে ছিলেন বাজীরাও, একটি একটি ক'রে প্রহর দণ্ড মুহূর্ত গুণছিলেন। কিন্তু বেশ কয়েকদিন কেটে যাবার পরও যখন সে এল না, এমন কি কোন খবরও পেলেন না, তখন হঠাৎ যেন বড় অসহায়, বড় দুর্বল বোধ করলেন নিজেকে। তবে সে বেশীক্ষণের জন্য নয়, বীর্যবান পুরুষ, দিগ্বিজয়ী বীরের হতাশা বা ক্ষোভ ক্রোধে পরিণত হ'তে দেরি হয় না। পেশোয়াও অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বালাজী রাও ফিরে গেছেন, তাঁকে সামলাবারও কেউ নেই আর, দেখতে দেখতে সে ক্রোধ প্রচণ্ড দিক্‌দাহকারীরূপে জ্বলে উঠল। তিনি সসৈন্যে ফিরবেন পুনাতে, নিজের প্রাসাদ তাঁর, সৈন্য-সামন্ত সবই তাঁর বেতনভুক্। কিসের সংকোচ তাঁর, কিসের ভয়? তাও যদি তারা কাশীবাঈ কি চিমনজীর কথায় বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়—তাঁর বাহুবল এখনও এত স্তিমিত হয় নি যে তাতেই বাধা পাবেন তিনি? প্রয়োজন হয় তো ঐ প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে তাঁর প্রিয়তমাকে বার ক'রে আনবেন। কামানের মুখে উড়িয়ে দেবেন শান্‌ওয়ার-ওয়াড়ার ঐ উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা মালিকদের।

সেই মতোই আদেশ দিয়েছেন সৈন্যসজ্জার, নিজের তাঁবুতে এসে নিজেও প্রস্তুত হচ্ছেন আর আপনমনে অস্ফুট কণ্ঠে স্মরণ করছেন প্রিয়াকে—'মস্তি, মস্তি, মস্তিবাঈ—কেন এলে না, কেন এলে না তুমি! আমি যে আর পারছি না!'

ঠিক সেই সময়েই এসে ঢুকল মস্তানী, 'এই যে এসেছি আমি, মালিক, আপনার দাসী আপনার সেবায় উপস্থিত।'

বাজীরাও অন্ধের মতো, উন্মত্তের মতো বুকে চেপে ধরলেন তাঁর এই যথার্থ অর্ধাঙ্গিনীকে।

খবরটা রাধাবাঈয়ের কাছে পেঁছতে একটু বিলম্বই হয়েছিল। সখারাম স্নান পুজো ও প্রাতরাশ সেরে এসে রঘুজীকে দেখতে না পেয়ে একটু বিস্মিত হয়েছিল কিন্তু উদ্বিগ্ন বোধ করে নি। জানলা ভেজানো—তা ও তো আজকাল হামেশাই থাকে। তালা ঠিক আছে যখন তখন আর ভয় কি। তালাগুলো একবার ক'রে টেনে দেখেছিল তবু, সন্দেহ জাগবার মতো কিছু চোখে পড়ে নি।

জমাদার ঝাড়ুদার ও পাচকের দল নিয়ে খোদ রাধাবাঈ-এর এসে পেঁছতেও একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল সেদিন। ক'দিন কোন গোলমাল না হওয়ায় ওঁর আস্থার ভাবটা একটু বেড়েছিল। তিনি একেবারে তাঁর প্রাতঃকৃত্য সেরে, প্রাথমিক উপাসনার পালা চুকিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং পাখী খাঁচা-ছাড়া হবার তথ্যটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করলেন যখন, তখন বেলা প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

মাথায় আগুন জ্বলে উঠল রাধাবাঈ-এর। এমন উষ্মা—এমন ভয়ঙ্কর ক্রোধ ও জিঘাংসা জীবনে কোনদিন অনুভব করেন নি তিনি। এমন অপমানও না। মনে হ'ল এখনই, এই মুহূর্তে সমস্ত প্রাসাদটায় আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মারেন সবাইকে, সেই সঙ্গে নিজেও মরেন। ছেলের সাধের প্রাসাদ নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলে এ জ্বালার কতকটা শান্তি হয় বটে।

রাধাবাঈ যখন নিশ্চিত ক'রে জানলেন—তখন প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তারপর আস্তাজীকে ডেকে সব জানিয়ে লোকজন পরিজনকে অনুসন্ধানের কাজে লাগাতে আরও এক ঘণ্টা সময় কেটে গেল। কারণ তারা, সাধারণ রক্ষী ও সৈনিকেরা, ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তিন-তিনটে মজবুত তালা বন্ধ, তার চাবি এক মুহূর্তের জন্যও রাধাবাঈয়ের কাছ-ছাড়া হয় নি—এর মধ্য থেকে যে উড়ে যেতে পারে, সে একটু 'অন্য জগতে'র মানুষ নিশ্চয়ই। মায়াবিনী জাদুকরীরও বেশী। তার বিরুদ্ধে 'অন্য দেবতা'র রোষ উদ্রিক্ত করা কি ঠিক?

সুতরাং বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল, ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে উত্তেজিত ও সক্রিয় ক'রে তুলতে। এর সঙ্গে রঘুজীর যোগাযোগ আছে সেটাও ঠিক ধরতে পারেন নি ওঁরা প্রথমটায়। সখারাম অতটা বলে নি, কারণ তার মাথাতেও যায় নি কথাটা। জেরা করে যখন জানলেন আস্তাজী যে সখারাম সকালে এসে রঘুজীকে দেখতে পায় নি—তখন আগে তার খোঁজ করলেন। সারা প্রাসাদে খুঁজে দেখতে আরও তিন-চার দণ্ড সময় লাগল। অর্থাৎ এর মধ্যে রঘুজীর হাত আছে বুঝতে বুঝতে দ্বিতীয় প্রহরও কেটে গেল।

রাধাবাঈ-এর চোখ-মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল, এখন ভয়ঙ্করতর হয়ে উঠল। একুশ বছরের ঐ একফোঁটা ছেলেটা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা আনুগত্য সব ভুলে ঐ কসবীটার মোহে এমন কাণ্ড ক'রে বসল? তাঁর প্রতিপত্তি এত পল্কা? ছেলেটা দশ বছর বয়স থেকে তাঁর কাছে আছে যে! আগে ফাই-ফরমাশ খাটত,

তিনিই যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে রক্ষীর কাজ দিয়েছেন। এত স্নেহের একবিন্দু মূল্য দিল না? ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়ে তিনি তখনই সখারামকে কয়েদ করার হুকুম দিলেন। সে বেচারী লজ্জাতেই আধমরা হয়ে ছিল—যেতে পারলে তখন বেঁচে যায় যেন। কিন্তু যে কিছুই জানে না তাকে নির্যাতন ক'রে বধ করা যায়, খবরটা বেরোবে কী ক'রে?

খবরটা পাওয়া গেল লোহারের কাছ থেকে। সপরিবারে তাকে বন্দী করার আদেশ দিলেন রাধাবাঈ। খবর না দেওয়া পর্যন্ত লোহা পুড়িয়ে হাত-পায়ে ছ্যাঁকা দেবার আদেশ দিলেন। 'অন্য দেবতা'র ভয়ে ভোলবার মানুষ তিনি নন। এ তালা না ভেঙে খুলতে হ'লে নকল চাবি চাই। আর সে চাবি তৈরি করতে পারে এত নিখুঁত ভাবে (তালার ওপর একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি) যে তালা তৈরি করেছে সে-ই। এসব বিষয়ে কোন সংশয় বা কুসংস্কার ছিল না রাধাবাঈ-এর, পালানোর ব্যাপারের সঙ্গে রঘুজীর যোগাযোগ আছে নিশ্চিত-ভাবে জানার সঙ্গে সঙ্গে লোহারের যোগাযোগ অনুমান করতে এতটুকু বিলম্ব হয় নি আর।

লোহার প্রথমটা কিছু বলে নি। স্বীকার করে নি আদপেই। কিন্তু দুই পা-ই পুড়তে সব বলে ফেলল। অর্থাৎ যতটা জানত ততটা। রঘুজী তাকে একটা সোনার হার দিয়ে এই চাবি করিয়ে নিয়েছে। তার বেশী সে কিছু জানে না, তাকে মেরে ফেললেও কিছু বলতে পারবে না আর।

রঘুজী অপরাধী চিহ্নিত হ'তে সংবাদ পাওয়াটা সহজ হয়ে এল। রঘুজীকে চেনে অনেকে। প্রিয়দর্শন, সচ্চরিত্র ও নম্রস্বভাব বলে অনেকেরই প্রিয় সে। সংবাদ পাওয়াও গেল। সন্ধ্যা নাগাদ রক্ষীরা এক ঘেসেড়াকে ধরে নিয়ে এল, সে পথের ধারে নাবাল জমিতে বসে ঘাস সংগ্রহের চেষ্টা করছিল বলে তাকে কেউ দেখে নি কিন্তু সে দেখেছে। রঘুজী আর একটি বালক ঘোড়ায় চেপে সেই পর্যন্ত এসে দু'দিকে ভাগ হয়ে গেল সেইখান থেকেই। বালকটি কী একটা চিঠি দিল বার ক'রে রঘুজীর হাতে, আদরও করল খানিকটা—সেটা দেখে একটু বিস্মিতই হয়েছিল ঘেসেড়া তাই মনে আছে—সে রকম আদর বয়স্করাই বয়োকনিষ্ঠদের ক'রে থাকেন—তারপর দু'জনে দু'দিকের রাস্তা ধরল। রঘুজী সাতারার দিকে লক্ষ্য ক'রে ঘোড়া ছোটাল—তা ঘেসেড়া স্পষ্ট দেখেছে।

সঙ্গের বালকটি কে, তা বুঝতে কারুরই বাকী রইল না। আদর করার কথাটা শুনে মুখ অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠল আন্তাজীর—মা সামনে আছেন বলে। একই কারণে রাধাবাঈ এই প্রথম উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন কিছুটা। মস্তানী যে আসলে গণিকা, এবং রূপ-যৌবনের জাদুতেই ঐ সরল ছেলেটাকে ভুলিয়েছে, সেই তথ্যটা নিঃসংশয় ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল বলে। অন্তত তাঁর বিশ্বাস, এ কথাটা সন্দেহের অতীতরূপে প্রমাণিত হয়ে গেল।

আরও একটি দোকানদারকে পাওয়া গেল রাত আটটা নাগাদ। সাতারার পথে তার দোকান, সেখান থেকে কিছু খাবার খেয়েছিল রঘুজী, ঘোড়াকেও জল খাইয়ে নিয়েছিল। অর্থাৎ তার লক্ষ্যস্থল যে সাতারা, সেখানে ছত্রপতির কাছে

আশ্রয় নিতে গিয়েছে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। এ পরামর্শও যে কার, তাও বুঝতে পারলেন রাধাবাঈ সঙ্গে সঙ্গেই।

তিনি এক মুহূর্তও দ্বিধা করলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে চিমনজীকে বললেন, 'আপ্পা, তোমাকে এখনই সাতারা রওনা হ'তে হবে। ভয় নেই, তোমাকে অপ্রিয় কিছু বলতে হবে না, আমি চিঠি দিচ্ছি, সেই চিঠিতেই সব লেখা থাকবে। ঐ বেইমান ছেলেটার মৃত্যুদণ্ড চোখের সামনে না দেখা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। ওর রক্তপাত না হ'লে আমার মাথার এ আগুন নিভবে না।'

আপ্পাজী বিস্মিত হয়ে তাকালেন মা-র দিকে। ঈষৎ বিব্রতই হয়ে পড়লেন। বুঝিয়ে বলতে গেলেন, 'কিন্তু আসল আসামীর দিকে মন দেওয়াই আগে দরকার ছিল না কি? ওটা তো একটা সামান্য কীট, পদদলিত করার ওয়াস্তা মাত্র।'

'আসল আসামীও রইল, আমিও রইলুম। এর হেস্তনেস্ত একটা হবেই। সে তো মাথাব্যথা, ভেতরের জিনিস। কিন্তু পায়ের কীট যখন মাথায় উঠে কামড়ায় সে বড় অসহ্য, তাকে পায়ে না দলা পর্যন্ত আমি সুস্থির হ'তে পারছি না। তুমি এখনই আয়োজন করো, যাতে শেষ রাত্রে রওনা হ'তে পারো। তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি অন্ন গ্রহণ করব না—এই জেনে যা ভাল বিবেচনা করো তাই করবে।'

এই বলে, বাদানুবাদের আর কোন অবসর না দিয়ে পূজার ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন রাধাবাঈ।

এ কী হল আজ, কেউই তাঁর আনুগত্য মানতে চায় না! এক স্বামী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সব শক্তি চলে গেল? স্নেহ, বাৎসল্য—কোন কিছুরই দাম নেই এ পৃথিবীতে?

॥ ১৫ ॥

ছত্রপতি চিমনজীর সঙ্গে দেখা করলেন না। বলে পাঠালেন যে তাঁর শরীর ভাল নেই, এখন আরও কিছুক্ষণ একটু আরাম করবেন। চিমনজী তাঁর পুত্রের সমান, আশা করি এতে কোন অমর্যাদা হ'ল ভাববে না সে। তার যা বক্তব্য, তাঁর একান্তসচিব গণেশজী পন্থকে বলতে পারে, অথবা কোন খৎ থাকলে পাঠিয়ে দিতে পারে।

অগত্যা রাধাবাঈ-এর চিঠিটা পাঠিয়ে দিতে হ'ল। তার উত্তর এল ছত্রপতির নিজের স্বাক্ষরিত আদেশপত্রের আকারে। তাতে লেখা ছিল, 'এ রাজ্যে পেশোয়া বা প্রতিনিধি বা সেনাপতি যাঁরা আছেন—তাঁদের অধীনস্থ সমস্ত সৈনিক, রক্ষী, ভৃত্য বা কর্মচারী—প্রত্যেকেই আসলে ছত্রপতির সেবক। রঘুজীকেও তিনি তাই মনে করেন। তিনিই তাকে এখানে এনেছেন এবং জরুরী কাজের ভার দিয়ে অন্যত্র পাঠিয়েছেন। সুতরাং তাকে যে এখন পাওয়া যাবে না শুধু তাই নয়, তার কোন শত্রুতাসাধন বা তার কাজে বাধা দেওয়া

রাজদ্রোহ বলে গণ্য হবে। আর এই সঙ্গে আরও একটি আদেশ দিচ্ছেন ছত্রপতি, শান্‌ওয়ার ওয়াড়ার যে আপ্পাজী লোহার আছে, তাকে ছত্রপতির বিশেষ প্রয়োজন, অবিলম্বে যেন উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা ক'রে সপরিবারে তাকে এখানে পাঠানো হয় এবং তাদের রক্ষী হিসাবে রঘুজীর পিতৃব্য সখারামকেও। এর বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ছত্রপতি বরদাস্ত করবেন না। ভগবান বিনায়ক যেন চিমনজী আপ্পা, তাঁর পরিবার ও পেশোয়ার বংশের অপরাপর সকলকে রক্ষা করেন। তাদের ওপর ছত্রপতির আশীর্বাদ তো নিত্য-নিয়তই বর্ষিত হচ্ছে।' ইত্যাদি—

অগত্যা চিমনজীকে কালোমুখ করে ফিরতে হ'ল। মা-র মাথায় ঠিক কী আগুন জ্বলেছিল, তা এখন বুঝতে পারলেন তিনি। পায়ের কীট মাথায় উঠে দংশন করলে কি হয় তাও টের পেলেন। তবে তাঁর ক্রোধের প্রধান অংশ গিয়ে পড়ল অগ্রজের সেই চারুহাসিনী, নৃত্যগীত-পটীয়সী মোহিনী প্রিয়ার ওপরই। চিমনজীর দুই রগ দপদপ করতে লাগল অসহ ক্রোধে। দেহে জ্বর ছিলই—আজকাল নিত্যই থাকে—সে জ্বালা ছাপিয়েও আর একটা কী জ্বালা তাঁকে উন্মত্ত ক'রে তুলল প্রায়। মা যাই বলুন—সর্বাগ্রে তিনি পাটাসের দিকেই যাত্রা করবেন।

জবাব নিয়ে চিমনজী চলে গেলেন—কোনরূপ আতিথ্য স্বীকার না ক'রেই —এ সংবাদও যথাসময়ে এসে পেঁছিল ছত্রপতির কানে। তিনি হাসলেন একটু।

গণেশজীর কাছে আজ সকাল থেকেই ছত্রপতির আচরণ দুর্বোধ্য ঠেকছিল। এখন এ হাসির অর্থও ঠিক বুঝতে পারলেন না তিনি। কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠছে ক্রমশই। অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ ক'রে তিনি একসময় প্রায় মরীয়া হয়েই বলে ফেললেন, 'কিন্তু কাজটা কি ঠিক হ'ল রাজাধিরাজ?'

'না, তা হ'ল না। কিন্তু আমারও উপায় ছিল না গণেশজী। বাধ্য হয়েই অশোভন আচরণ করতে হল। অন্যত্র বাগ্‌দত্ত ছিলুম আমি, প্রতিশ্রুতিতে বাঁধা। আর সে প্রতিশ্রুতি পালন খুব অরুচিকর বলেও মনে হয় নি আমার। সেই হয়েছে আরও মুশকিল।'

কী সে প্রতিশ্রুতি, কার কাছে—তা জিজ্ঞাসা করতে সাহসে কুলোল না গণেশজীর। হয়ত অনুমান করতে পারলেন, হয়ত পারলেন না। ছত্রপতিও কিছু বললেন না। অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। চিমনজী তাঁর স্নেহের পাত্র, তার কাছে তিনি উপকৃতও। রাধাবাঈ-এর এ চিঠি যদি আগে এসে পেঁছিত তো কি করতেন বলা যায় না। সম্ভবত ভাল ক'রে চিঠি না পড়েই রাধাবাঈ-এর অনুরোধ রক্ষা করতেন, রাধাবাঈ-এর ভাষায় 'ঘৃণিত অপরাধে অপরাধী' রঘুজীকে তখনই চিমনজীর হাতে দিতেন—কিন্তু তার আগে আর একটি চিঠি এসেই সব গোলমাল ক'রে দিয়েছে যে।

সে চিঠি এখনও তাঁর উপাধানের নিচে রয়েছে।

অতি সংক্ষিপ্ত চিঠি :

'পিতা,

আপনি আমাকে কন্যা সম্বোধন করেছেন—সেই আশ্বাসেই আপনাকে পিতৃ সম্বোধন করলুম, অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন। রঘুজীকে পাঠালুম আপনার আশ্রয়ে—সে আমার জন্য তার জীবন, তার ভবিষ্যৎ, তার পরিবারের নিরাপত্তা সব বিপন্ন করেছে, তাকে রক্ষা করলে আমাকেই রক্ষা করা হবে—এই ভেবে তাঁকে বাঁচাবেন। আপনি আমাকে যে ভরসা দিয়েছিলেন সেই ভরসার জোরেই এত দুঃসাহস আমার, জানি আমাকে দেওয়া ভিক্ষা ফিরিয়ে নেবেন না কিছুতেই। রঘুজীর মুখে সব বিবরণ শুনবেন। আমি আপনার অসুস্থ ভগ্নহৃদয় সেবক পেশোয়ার কাছে যাচ্ছি, যদি তাঁকে সুস্থ ক'রে তুলতে পারি তো সে আপনারই সেবা হবে। প্রণাম নেবেন। ইতি আপনার অভাগিনী কন্যা—

মস্তানী।'

চিঠি পড়ে রঘুজীকে জেরা ক'রে সব জেনেছিলেন। তখনই একশো জন সৈনিক সঙ্গে দিয়ে, রঘুজীকে বিশেষ আদেশবলে সেনানীর পদ দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কোলাপুর।

শুধু তাই নয়, এরা দুজনেই যার পরিণাম ভেবে দেখে নি, তাঁর বিচক্ষণ রাজনীতিক ও শাসকের বুদ্ধি সেই লোহারের অবস্থাটাও কল্পনা করতে পেরেছিল, আর রঘুজীর পিতৃব্য সখারামের বিপদটাও। সেই জন্যই লোহারকে সপরিবারে পাঠাবার আদেশ দিলেন সাতারায়। এ আদেশ পেঁছিবার পর আর তাদের কোন অনিষ্ট করতে কেউ সাহস করবে না। তখনও যদি বেঁচে থাকে সে বেচারী তো এ যাত্রা বেঁচেই যাবে।

তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী নবলব্ধা কন্যা মস্তিবাঈ-এর কানে যখন এ সংবাদটা পেঁছিবে, তখন ছত্রপতির বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির প্রশংসায় কী পরিমাণ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সেই আশ্চর্য সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো—কল্পনা-নেত্রে প্রত্যক্ষ ক'রে ভারী খুশী হয়ে উঠলেন ছত্রপতি।

॥ ১৬ ॥

মহারাষ্ট্রের গৌরবময় যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ও সর্বপ্রধান রাজনীতিক পেশোয়া প্রথম বাজীরাও কল্পনাপ্রবণ ছিলেন কিনা সেটা বিচার-সাপেক্ষ কিন্তু ভাবপ্রবণ বা আবেগপ্রবণ ছিলেন এমন অপবাদ বোধ করি অতি বড় শত্রুও দিতে পারত না। তাঁর যে সব চেয়ে কাছের মানুষ, সে তো নয়ই। কিন্তু আজ, এই প্রথম, তাঁর প্রিয়তমা মস্তিবাঈ-এর কিছু সন্দেহ দেখা দিল মনে, মনে হ'ল কথাটা অত নিঃসংশয়ে আর বলা যায় না।

সে যখন ব্যাকুল হয়ে এসে পেশোয়ার এই স্কন্ধাবার কক্ষে প্রবেশ করেছিল, তখন ভেবেছিল আর কিছু না হোক—বিমর্ষ না হোক, পেশোয়াকে কিছুটা চিন্তিত দেখবে। কারণ, আজকের এই উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয়। এমন অঘটন লোকের সুদূর কল্পনারও অতীত। যিনি

যত বড় ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাই হোন—এমন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকা কঠিন। উত্তেজিত বা বিচলিত না করুক—দোলা দেবে যে-কোনো লোককেই। পেশোয়াও নিশ্চয় প্রবল একটা নাড়া খেয়েছেন মনে মনে। শুধু শৌর্য-বীর্যের জোরে এ রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া যায় না—সাধারণ মানুষের সামান্য বুদ্ধির জোরেও না। অসাধারণ মানুষেরও অসামান্য প্রতিভার প্রয়োজন হয় এমন বিপদকে লংঘন করতে। কারণ যে বিপদ শুধুমাত্র ভয়ের কারণ নয়—লজ্জারও কারণ, যে বিপদ বাইরের থেকে মনে বেশী—সে বিপদ বড় কঠিন। পেশোয়া যা আর যত বড়ই হোন না কেন, তিনিও মানুষ, তাই আর কিছু না হোক, তিনি স্তব্ধ চিন্তাকুল হয়ে বসে থাকবেন অন্তত—মস্তিবাঈ মনে করেছিল, ঠিক এমন একটা কাব্যময় অবস্থায় দেখবে ভাবে নি।

সে ছুটে এসে ঘরে ঢুকেছিল, এখন পেশোয়াকে ঐ অবস্থায় দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল। বাজীরাও তখন নিবিষ্ট মনে একটি খাঁচায় আবদ্ধ পাখীর সঙ্গে খেলা করছেন। ছোট্ট পাখীটি কিন্তু বড় সুন্দর দেখতে। ঐটুক দেহেই মহত্তম শিল্পস্রষ্টা জগদীশ্বর তাঁর বিচিত্র বর্ণের খেলা দেখিয়েছেন, বোধ করি এক যুগ ধরে এঁকেছেন ঐ একরত্তি পাখীকে। মাথায় গলায় ঝুঁটিতে পালকে বুকে সর্বত্র—বহুবর্ণের সমাবেশ। এ পাখীটি পেশোয়ার প্রিয় তা মস্তানী জানত, তার সঙ্গে খেলা করেন তিনি মধ্যে মধ্যে—তাও কিছু অজানা নয়, কিন্তু এই কি সে খেলার সময়? অথচ পেশোয়া তো তা-ই করছেন। এক হাতে তিনি খাঁচার সামনে ধরেছেন একটি অর্ধ-প্রস্ফুটিত লাল গোলাপ আর এক হাতে একটি সুপক্ক পেয়ারা। পাখীটির লক্ষ্য পেয়ারার দিকে। পেয়ারাটা একটু একটু ক'রে যেমন কাছে নিয়ে যাচ্ছেন পেশোয়া, পাখীটিও উৎসুক হয়ে ঠোকর মারছে আর সেই অত্যল্প সময়েই তিনি পেয়ারাটা সরিয়ে নিয়ে সামনে ধরছেন গোলাপটা, তার ফলে ক্ষোভে হতাশায় অস্থির হয়ে পাখীটা খাঁচার লোহাগুলোয় ঠোকর মারছে আর রাগে কী এক ধরনের অব্যক্ত আওয়াজ করছে।

এদিকে ফেরেন নি পেশোয়া কিন্তু তাঁর প্রিয়তমার আগমন টের পেয়েছেন। তিনি বলে উঠলেন, 'দেখেছ খুশি, দেখতে অত সুন্দর হ'লে কি হবে—পাখীটার রুচি-বোধ কিছুমাত্র নেই। অমন সুন্দর গোলাপটাতে ভ্রূক্ষেপ নেই—ওর যত ঝোঁক ঐ পাকা পেয়ারাটাতে—তবে আর তির্যগ-যোনি বলেছে কেন! ওদের নজরটাই বাঁকা আর ছোট!'

তারপর ফুল আর পেয়ারা দুটোই তাঁবুর বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মস্তানীর দিকে ফিরে বসলেন, 'কিন্তু আমার কাছে মস্তি, রুচি আর সৌন্দর্যবোধ দুই-ই আছে, আমি বসে বসে তোমার কথাই চিন্তা করছিলুম।···ভাবছিলুম কি যেন সেই যে তুমি পুরুষবেশে এসে ঘরে ঢুকলে আমার—অত সুন্দর আর কোনদিন লাগে নি তোমাকে। যেন কিশোর কন্দর্প। মনে হচ্ছিল যেন, সাক্ষাৎ গৌরী কিছুতেই শিবের ধ্যান ভাঙ্গাতে না পেরে অবশেষে এই কিশোর বালকের বেশে অবতীর্ণ হয়েছেন। যেন কন্দর্প আর উমার মহামিলন হয়েছিল সেদিন তোমার মধ্যে।'

'ছি ছি, কী বলছেন পেশোয়া! এমন উপমা কৌতুকচ্ছলে দেওয়াও মহাপাপ!...আর আমি নিজের রূপের ব্যাখ্যানা শুনতেও ছুটে আসি নি আপনার কাছে। না না—এমন বিপদের দিনে এমন হাসবেন না, সবটা তামাশা ক'রে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না। আমি যে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না—এই উদ্বেগ আপনি এত সহজে বইছেন কি ক'রে মালিক!'

'উদ্বেগের কারণ তো এই প্রথম ঘটল মস্তি', বাজীরাও এবার ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলেন, 'তুমি বিচলিত হয়েছ, তুমি তোমার স্বভাবজ কৌতুকবোধ ও স্থৈর্য হারিয়েছ—একমাত্র সেইটেই আমার কাছে দুশ্চিন্তার কারণ বোধ হচ্ছে এই মুহূর্তে। আজ তোমার হ'ল কি, তুমি কি অসুস্থ হয়েছ?'

'তার আগে বলুন, যুদ্ধ-সজ্জা হচ্ছে, সেনানিবাসে সাজ সাজ রব উঠেছে কেন, কী এমন বিপদাশঙ্কা করছেন?'

'শত্রু যখন সসৈন্যে সুসজ্জিত অবস্থায় সামনে আক্রমোনদ্যত হয়ে এসে দাঁড়ায়—তখন নিশ্চিন্ত হয়ে কালহরণ করে মূর্খ বা হতভাগ্য। এর কোনটাই বলতে আমি প্রস্তুত নই মস্তি!'

বেশ ধীর শান্তস্বরেই বলেন পেশোয়া।

'শত্রু! কী বলছেন প্রভু, সত্যিই কি আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল? আপনার মা, স্ত্রী—আপনার পুত্র, আপনার ভাই—এদের বিরুদ্ধে আপনি যুদ্ধযাত্রা করবেন? এদের আপনি আক্রমণ করবেন?'

'কে বলেছে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করব, কে বলেছে ওদের আক্রমণ করব! ওরা যদি যুদ্ধ করে তো তার প্রত্যুত্তর দেব, যদি আক্রমণ করে তো আত্মরক্ষা করব। প্রস্তুত থাকা আর যুদ্ধ করা এক জিনিস নয়!'

'কিন্তু আপনার মায়ের বিরুদ্ধে, আপনার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে আপনার সৈন্যরা?'

'প্রয়োজন হয় তো করতে হবে বৈকি। তাঁরা যদি গুলি ছোঁড়েন তো সেগুলো ঠিক স্নেহের পুষ্পবৃষ্টি বলে মনে করার কোন কারণ নেই—তাতেও আমার লোক মরবে, আর তা যদি মরে তো ওরা সে মৃত্যুর জবাব দেবে না—এটাই বা কি ক'রে সম্ভব?'

'ছি ছি, এসব কী বলছেন পেশোয়া, আমার জন্যে—তুচ্ছ একটা বিধর্মী মেয়ের জন্যে মার সঙ্গে লড়াই করবেন! লোকে বলবে কি, আমি মুখ দেখাব কি ক'রে এর পর জনসমাজে?'

'তুচ্ছ বিধর্মী মেয়ে, কী বলছ মস্তি! তোমার ধর্ম আগে যাই থাক, তোমার বাবা আমার হাতে তোমাকে সম্প্রদান করেছেন, দেবতা সাক্ষী রেখে এক পবিত্র গোধূলি লগ্নে আমাদের শুভ-দৃষ্টি হয়েছে, তোমাকে আমি সেইদিন থেকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছি। তুমিও তো বলো যে আমাকে স্বামীরূপেই দ্যাখো তুমি। তা যদি হয় তো তুমি আমার অর্ধাঙ্গিনী, তোমার ধর্ম আর আমার ধর্ম পৃথক হ'তে পারে না।'

'কিন্তু লোকচক্ষে আমি কি ভেবে দেখুন!'

'লোক-লজ্জার ভয় করলে, অপরের বিবেচনার কথা বিবেচনা করলে, আজ তোমার মরদ বাজীরাও পেশোয়া বাজীরাও হ'তে পারত না। আমি যা ঠিক বলে মনে করি তা অপরের কথাতে বেঠিক ভাবি না কথনও—সে তো তুমি জানোই মস্তিবাঈ।'

তারপরই—ওকে আর কোন প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়ে—সহসা হাত বাড়িয়ে মস্তানীর একটা হাত ধরে সবলে নিজের দিকে আকর্ষণ ক'রে টেনে আনলেন তাকে, সেই হাতেই তার কোমর জড়িয়ে তার বুকে মাথা রেখে ঊর্ধ্ব-মুখে প্রিয়ার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'ওসব কথা এখন থাক মস্তি, তুমি সেই পুরুষের পোশাকটা একবার পরবে?···তোমার সেই চেহারাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না!'

একটা হিম-হতাশা বোধ করে মস্তানী।

অতঃপর কী হবে তা সে জানে। সমস্ত প্রতিজ্ঞা, সমস্ত শুভ সংকল্প ভেসে যাবে তার। তাকেও এই উম্মত্ত প্রণয়লীলায় মেতে উঠতে হবে, এই দুর্দান্ত মানুষটার মর্জি ও খেয়ালের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হবে। প্রতিকার বা প্রতিবিধান কিছুই হয়ে উঠবে না। এই বিরাট পুরুষের ভীমগতিকে প্রতিরোধ করতে পারবে না কিছুতেই—মহা সর্বনাশের পথেও বাধা দিতে পারবে না।

দুর্ধর্ষ বীর প্রচণ্ড ক্রোধী এই রাষ্ট্রাধিনায়ক রণে ও প্রেমে সমান অপরাজেয়। তাঁর প্রেমাবেগও অন্য সমস্ত চিত্তবৃত্তির মতোই প্রবল ও সর্বপ্লাবী। সব কিছুই বড় ওজনের তাঁর। যখন যুদ্ধ করেন তখনও যেমন কোন প্রতিপক্ষ দাঁড়াতে পারে না—যখন ভালবাসেন তখনও তাই—সব বাধা সব বিপদ সব বিবেচনা ভাসিয়ে নিয়ে যায় সে ভালবাসা।

সব কিছুই বড় মাপের বলে—তাঁর ভালবাসা ধরে রাখতে পারেন না সাধ্বী মহিষী কাশীবাঈ। চিত্তের এত বড় আধার নেই তাঁর। সাধারণ মাপের সাধারণ পতিপরায়ণা সতী মেয়ে তিনি, স্বামী-পুত্র, তাদের পদমর্যাদা, তাঁর নিজের নিত্যকরণীয়—এই সব সহস্র বিচার-বিবেচনা রীতি-পদ্ধতিতে তাঁর জীবন বাঁধা। এমন মেয়েকে নিয়ে পেশোয়ার মতো মানুষ ঘর করতে পারেন মাত্র, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। সে তাঁর জীবন-সঙ্গিনী, প্রণয়-সহচরী হ'তে পারে না। হয়ও নি। যতদিন না মস্তানীর সঙ্গে দেখা হয়েছে ততদিন শুধু সহ্য ক'রে গেছেন তাকে।·· তারপর এসেছে সেই পরম লগ্ন ওদের জীবনে। দুটি মানুষ তাদের জীবনের যথার্থ সঙ্গী খুঁজে পেয়েছে।

সেই কী এক শুভ বা মহাঅশুভ ক্ষণে দেখা হয়েছিল ওদের, চার চোখে মিলেছিল। বাজীরাও ওকে দেখেই বুঝেছিলেন যে, এ-ই তাঁর সেই সঙ্গিনী, যার জন্য হৃদয় তৃষ্ণার্ত হয়েছিল এতকাল। তাঁর সে প্রত্যাশা ও অনুমান ব্যর্থ হ'তে দেয় নি মস্তানী। তাদের আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয় নি—কিন্তু মস্তানী সেই দিন থেকে স্বামী বলে, মালিক বলেই জেনেছে বাজীরাওকে। সিংহের উপযুক্ত সিংহী হয়ে উঠেছে সে, রণে বনে দুর্গমে—সর্বত্র ও সর্বদা সে ছায়ার

মতো অনুসরণ করেছে, সাহস দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে পরামর্শ দিয়ে সেবা দিয়ে জীবনকে পূর্ণ ক'রে তুলেছে পেশোয়ার। তার চেয়েও বেশী দিয়েছে হয়ত। নৃত্যে-গীতে, হাসিতে-কৌতুকে, লাস্যে-বিলাসচর্যায় সে তাঁর অবসরের শুষ্ক শূন্য কোষগুলি ভরে দিয়েছে অমৃতে। একাধারে স্ত্রী, মন্ত্রী, বন্ধু ও উপপত্নী গণিকার কাজ করেছে সে।

না, সে দিয়েছে অনেক—বরং পেশোয়াই দিতে পারেন নি। তিনিই কথা রাখতে পারেন নি। মস্তানী বরাবরই বুদ্ধিমতী মেয়ে, কিশোর বয়সেও আবেগের চেয়ে বিবেচনাই বড় ছিল তার কাছে। সম্পূর্ণ ধরা দেবার আগে সে পেশোয়াকে প্রতিশ্রুতি ক'রে নিয়েছিল যে, তাদের মিলনে যে সন্তান হবে, যদি সন্তান হয় কিছু, সে সন্তান তাঁর অন্যান্য সন্তানের সমান মর্যাদার অধিকারী হবে।

এক দুর্বল বিচার-বিবেচনাহীন আবেগসর্বস্ব-মুহূর্তে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পেশোয়া। চেষ্টাও করেছিলেন। মস্তানীর পুত্রসন্তান হ'তে তাকে ব্রাহ্মণ সন্তানের পরিচয়ে হিন্দুর মতো মানুষ করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন যজ্ঞোপবীত তুলে দিতে তার গলায়। এর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন তিনি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ঘুষ দিয়ে এই বিধান বার করে নিতে। কিন্তু পণ্ডিত কয়েকজন ছাড়াও হিন্দুদের যে বিশাল বিপুল একটি সমাজ আছে—সেই অদৃশ্য বিধানদাতা রাজী হয় নি কিছুতেই এ অনাচারে। তা ছাড়া সব ব্রাহ্মণ বা সব পণ্ডিতকে কিছু টাকায় কেনা যায় না—শীর্ষস্থানীয় যাঁরা তাঁদের অনেককেই পারেন নি রাজী করাতে। সুতরাং যার সূর্য রাও হবার কথা সে সামসের বাহাদুর নামেই বড় হয়ে উঠল—মার ধর্ম তথা গণিকা-পরিচয়কে চিরস্থায়ী ক'রে। বীরপুত্র সামশের বাহাদুর বাপের নাম রাখতে পারত, বংশের মুখ উজ্জ্বল করত। সে এই বালক বয়সেই রণনিপুণ যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। চিৎ-পবন ব্রাহ্মণদেরই দুর্ভাগ্য যে অমন একজনকে তাদের বলে পরিচয় দিতে পারল না।···মস্তানী দুঃখ বোধ করেছে কিন্তু পেশোয়ার এই অসহায় ব্যর্থতা নিয়ে ধিক্কার দেয় নি কখনও। এটা সে বুঝেছিল যে, তাকে অদেয় বাজীরাও-এর কিছুই নেই, সাধ্য থাকলে অবশ্যই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেন তিনি।···

ওদের সেই প্রথম দেখা হওয়ার দিনটি থেকে কেটে গেছে বহুকাল। তবু আজও মস্তানীর প্রেমে অরুচি বোধ হয় নি পেশোয়ার, তার সাহচর্যে আসে নি ক্লান্তি। বরং প্রণয়ের নেশা ঘনীভূতই হয়েছে যেন, কামনার অগ্নি হয়েছে উগ্রতর, প্রচণ্ডতর। তৃষা বেড়েই গেছে। তার কারণ মস্তানীর নিত্য নূতন রূপ—বাইরের তত নয়, যত অন্তরের। সে চির-নূতন, সে চির-চমকপ্রদ। সে ফি-রোজা, আসমানের মতোই নিয়ত পরিবর্তনশীল রূপ তার। তাই সে আজও এই ভারতত্রাশ মহাবীরের হৃদয়েশ্বরী, পেশোয়া বাজীরাও-এর চিত্তজগতে একেশ্বরী।

ঈর্ষা, অসূয়া! বিদ্বেষ?

হ্যাঁ, আঘাত করেছে বৈকি! নানা লোকে নানা সুযোগ খুঁজেছে এই একাধিপত্য ভাঙতে, এই প্রতিপত্তি নষ্ট করতে। নানা দুর্নাম তুলেছে তার,

সত্য-মিথ্যা নানা অপবাদে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত ক'রে তুলেছে বিপুল মহারাষ্ট্র রাজ্যের। সে অপপ্রচার সে কুৎসা স্বয়ং ছত্রপতির কানেও পেঁাছেছে, তুলে দিয়েছে লোকে। বিষাক্ত করতে চেয়েছে পেশোয়ার মন। উত্তেজিত করতে চেয়েছে প্রজাসাধারণের ধারণাকে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। পেশোয়া বাজীরাও-এর গভীর প্রেম গভীরতর হয়েছে শুধু এই মেয়েটিকে ঘিরে। ছত্রপতি তাঁকে কন্যা সম্বোধন করেছেন। সমস্ত বিদ্বেষ ও বিরোধিতাকে উপেক্ষা ক'রে সংসার সরোবরের কালোজল কাটিয়ে লঘুপক্ষ মরালীর মতোই অনায়াসে বিহার ক'রে বেড়িয়েছে সে, এই পঙ্ক বা মালিন্য তাকে স্পর্শমাত্র করতে পারে নি।

কিন্তু এবার বিপদ এসেছে অন্য রকম।

বাজীরাও-এর লৌহকঠিন শরীর ভেঙ্গেছে এবার, বীর তরুণ তেজোদৃপ্ত রূপবান পেশোয়া শীর্ণ কঙ্কালসার হয়ে উঠেছেন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। মধ্যে মধ্যে জ্বরও হচ্ছে। প্রস্তর-কঠিন শক্তিতেও ক্ষয় ধরেছে, যে ক্লান্তি শব্দটাই ছিল অপরিচিত তাঁর কাছে, সেই ক্লান্তিতেই যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছেন।

ভেবে দেখলে—এটা দুঃখের হ'তে পারে, কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এদের বংশেই নাকি ক্ষয়রোগ আছে। চিমনজী আপ্পা এই বয়সেই ক্ষয়কাশে আক্রান্ত হয়েছেন। স্বয়ং বালাজী বিশ্বনাথ রাও-এর অকালমৃত্যুর কারণও নাকি এই ক্ষয় রোগ। এ রোগ এদের বংশগত—এদের ভেতরে ভেতরে কুরে খায়, হঠাৎ অকালে বৃদ্ধ ক'রে দেয়। তা ছাড়া বাজীরাও-এর ওপর দিয়ে কম ঝড়ঝঞ্ঝা যায় নি। কুড়ি-একুশ বছরের ছেলে তিনি, যখন এত বড় রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে পড়ে। সেদিন তাঁকে সকলের মতের বিরুদ্ধে এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন ক'রে ছত্রপতি শাহু খুব বিবেচনা বা দূর-দৃষ্টির পরিচয় দেন নি, এই কথাই বলেছিল সকলে। কিন্তু তাদের আশঙ্কা ব্যর্থ ও ছত্রপতির আশাকে সার্থক ক'রে বাজীরাও এই উনিশ বছরকাল মধ্যে অসাধ্য-সাধনই করেছেন। উনি যখন গদীতে বসেন তখনও মারাঠা শক্তির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তার আসন তখনও বালুভিত্তিক। সেই শক্তিকে তিনি সুদূর-বিস্তারী এবং দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করেছেন, রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেছেন। দমন করেছেন তিনি মুঘল শক্তিকে, দমন করেছেন নিজামকে। বুন্দেলা রোহিলা জাঠ সবাই ত্রস্ত তাঁর ভয়ে। ইংরেজ পর্তুগীজ শক্তি থরথর কম্পমান। যেখানে তিনি যান নি, সেখানকার লোকও মারাঠা শক্তি সম্বন্ধে আজ সচেতন ও অবহিত। যে তাঁকে দেখে নি, সেও তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান। নাদির শা যে দিল্লীর দক্ষিণে পা দেন নি—পেশোয়া বাজীরাও-এর বীরখ্যাতি তার অন্যতম কারণ। একটা মানুষের পক্ষে—সহায়-সম্বলহীন অভিজ্ঞতাহীন এক তরুণের পক্ষে—এই কীর্তিই যথেষ্ট। একটা মানুষের শরীর ভাঙবার পক্ষেও, লোহার শরীর হ'লে বোধ হয় আগেই ভাঙত। মানুষের শরীরে সামর্থ্যের চেয়ে ইচ্ছাটা বড় কথা বলেই আজও দাঁড়িয়ে আছেন এই ব্রাহ্মণ। খেটেছেন যত খেয়েছেন

সেই পরিমাণে কম। যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণ সৈনিকের খাদ্য তাদের সঙ্গে ভাগ ক'রে খেয়েছেন বরাবর। বিশ্রাম তো নেন নি বললেই হয়। যে কটি মুহূর্ত তাঁর মস্তানীর সাহচর্যে কাটে সেইটিই তাঁর বিশ্রাম, সেই আনন্দ থেকে সঞ্জীবনীরস গ্রহণ করে তাঁর প্রাণ-মক্ষিকা।

কিন্তু এইটেই বিশ্বাস করতে চাইছে না অনেকে। বিশেষ ক'রে পেশোয়ার বাড়ির লোক—তাঁর নিকট আত্মীয়রা তো নয়ই। তাঁর মা, তাঁর স্ত্রী, তাঁর উপযুক্ত বীর যশস্বী ভাই আপ্পাজী বা চিমনজী—তাঁর কিশোর পুত্র বালাজী-রাও, সকলে একদিকে এককাট্টা হয়েছে। তাদের বিশ্বাস মস্তানীই তাঁর প্রাণরস শুষে খাচ্ছে, ডাকিনী কুহকিনীর মতো। আসলে সে সেই রূপকথার রাক্ষসী, দিনে মোহিনী সেজে ভুলিয়ে রাখে—রাত্রে নিদ্রিত বীরের বক্ষরক্ত পান করে। তা যদি নাও হয়—ওর বলিষ্ঠ যৌবনের কামনা-হুতাশনে অবিরাম ইন্ধন যোগানোর ফলেই বীর পেশোয়ার প্রাণশক্তি নিঃশেষিত। অর্থাৎ তথ্যে কিছু কিছু গোলমাল থাকলেও সত্যটা এক। এ ভগ্ন স্বাস্থ্যের, এ অকাল-বার্ধক্যের কারণ যে ঐ রমণী তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওকে না সরাতে পারলে—পেশোয়ার চোখের আড়াল করতে না পারলে—ও'র জীবনের আর আশা নেই।

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাস করতেই তো চায় সকলে। সুতরাং বিশ্বাসও করল সবাই। ফলে যে বিরোধী শক্তিকে এককালে হাস্যে পরিহাসে ধিক্কারে উড়িয়ে দিয়েছিল দুজনে, সেই শক্তিই তার বিকট চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। ছেলে এসে একরকম বন্দীই করল তার পিতাকে, বীর বিজয়ী পুত্রকে শাস্তি দিতে হাত উঠল না দিগ্বিজয়ী বীর পিতার। বালাজী সরিয়ে নিয়ে এল পেশোয়াকে—তাঁর শানওয়ার ওয়াড়া প্রাসাদ থেকে, সেই অবসরে বিধবা মহিষী রাধাবাঈ, স্বর্গত পেশোয়ার স্ত্রী ও বর্তমান পেশোয়ার মা—নিজে হাতে বন্দী করলেন মস্তানীকে, দুর্ভেদ্য পাষাণ কারায় পুরে নিজে হাতে তালা দিয়ে চাবি রেখে দিলেন নিজের কাছে। ভরসা ক'রে আর কারও ওপর সে ভার ছাড়তে পারেন নি তিনি।

তবু, তাতেও কি আটকাতে পারলেন রাধাবাঈ? মায়াবিনী যেন ভেলকি দেখিয়ে দিল সবাইকে। সেই নিরেট নিশ্ছিদ্র কঠিন লৌহদ্বার যেমন বন্ধ তেমনিই রইল, তার সুকঠিন প্রস্তর প্রাচীরের কোথাও কণামাত্র খসল না—শুধু মস্তানী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তার মধ্য থেকে—যেন কর্পূরের মতো উবে গেল।

না গিয়ে উপায়ও ছিল না অবশ্য তার। বাপ ছেলের ওপর সংহারমূর্তিতে খড়্গ উদ্যত করেছে দেখে সে-ই বাধা দিয়েছিল। অনুরোধ করেছিল ছেলের কাছে হার মানতে, তার ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছা বিলিয়ে দিতে। ছেলে নিয়ে আসতে চেয়েছিল এই পাটাসের সৈন্য-শিবিরে, বিনা প্রতিবাদে তাই আসতে বলেছিল তাঁকে। আর সেই সময়েই অভয় দিয়েছিল সে বাজীরাওকে যে, যেমন ক'রে হোক, অচিরকালমধ্যে সে এসে মিলিত হবে তার মালিক, তার রাজার সঙ্গে। কোন রাজ্যের কোন কারাগার তাকে ধরে রাখতে পারবে না, বাধা দিতে পারবে না কারও কোন অসূয়া।

এবং পারেও নি। যখন, মাত্র তিন-চারদিনের অদর্শনেই উন্মত্ত অধীর হয়ে উঠেছিলেন বাজীরাও—ত্রিভুবনের সমস্ত বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে বিরোধ ক'রে প্রিয়তমাকে মুক্ত ক'রে আনবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন—ঠিক সেই চরম মুহূর্তে এসে হাজির হয়েছিল মস্তানী। কিন্তু সে আসাতে তত বিস্মিত হন নি, কারণ, এই মেয়েটি সম্বন্ধে বরাবরই তাঁর অসীম আশা অগাধ ভরসা ছিল। তিনি জানতেন যে সব কিছুই করতে পারে তাঁর মস্তী। অসম্ভব বলে কোন শব্দ নেই তার অভিধানে। তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন অন্য কারণে। বিস্মিত আর মুগ্ধ। বহুদিন ধরে এই বিলাসিনী নারীর বহু রূপসজ্জা তিনি দেখে আসছেন! কিন্তু এমন বেশে যে তাকে এত সুন্দর দেখায় তা কোনদিন ধারণা করতে পারেন নি! সাধারণ শ্রমজীবী মারাঠী বালকের পোশাক, অতি সামান্য পাগড়ি—তবু তাতেই কী অসামান্য সুন্দর দেখিয়েছিল, বাজীরাও-এর মনে হয়েছিল ওকে এই প্রথম দেখলেন!·· সেদিন সেই আবেগ-উন্মত্ত মুহূর্তে বাহু-বন্ধ বক্ষলগ্ন প্রিয়তমার কানে কানে গদ্‌গদ কণ্ঠে এই কথাই বলেছিলেন তাই, 'মস্তি, তুমি আমার নব-জীবনদায়িনী, তুমি আমার জীবনকাঠি, তোমাতেই আমার প্রাণ। তুমি কাছে না থাকলে আমার আর কোন অস্তিত্ব থাকে না, তখন দেহটাই শুধু থাকে, আত্মা মৃত জড় হয়ে যায়। তুমি যাই কেন না করো খুশিবাঈ এই কথাটা শুধু মনে রেখো, যদি বীরের মতো, শাসকের মতো না বাঁচতে পারি তো আমার কাছে বাঁচার কোন অর্থই নেই। আর তেমনভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারো তোমার এ সেবককে একমাত্র তুমিই। তুমি শুধু আমরণ আমার পাশে থেকো, তাহলেই আমার বাহুতে বল, হৃদয়ে শক্তি অটুট থাকবে। তুমি যেন আর কোনদিন, কোন কারণে আমাকে ছেড়ে যেও না, তাহ'লে আর আমি বাঁচব না।···বলো, যাবে না?'

সেদিন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মস্তানীকে সায় দিতে হয়েছিল, একরকম প্রতিজ্ঞাই করেছিল সে। তার এ তুচ্ছ প্রাণ বা দেহের মূল্যই বা কি—যদি মালিকের কাজে না আসে!······সে সেই কথাই সেদিন জানিয়েছিল তাঁকে। তার নিজের রক্ত দিয়ে—সে রক্ত ওঁর ধমনীতে সঞ্চালিত ক'রে দিয়েও যদি পূর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিতে পারে বাজীরাও-এর তো, সে এখনই শেষ বিন্দু পর্যন্ত হাসিমুখে উৎসর্গ করতে রাজী আছে। শুধু উনি বাঁচুন, উনি সুস্থ হোন, ওঁর বাহিনীর পদভরে সুদূর হিমাচল ও গান্ধার দেশ পর্যন্ত প্রকম্পিত হোক। মস্তানীর আর কোন কাম্য নেই, জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।···

॥ ১৭ ॥

কিন্তু হঠাৎ যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। এ সব প্রতিজ্ঞা, সব শুভ সংকল্পই বুঝি অঘটনের বন্যায় ভেসে তলিয়ে যেতে বসল। এমন একটা অকল্পিতপূর্ব পরিস্থিতি এগিয়ে এল সামনে যার জন্য স্বপ্নেও কোন প্রস্তুতি ছিল না তার। ভাগ্যের সে আঘাত মস্তানীর প্রখর বুদ্ধি ও অবিচল আত্ম-বিশ্বাসকে পর্যন্ত

টলিয়ে দিল। এই প্রথম নিজেকে অসহায় ও বিপন্ন বোধ করল সে।

রাধাবাঈ তাঁর এই উপ-পুত্রবধূটির কাছে সমস্ত লড়াইতে হেরে শেষ অবলম্বন হিসেবে আশ্রয় নিতে গিয়েছিলেন ছত্রপতির কাছে। সেখানেই চরম মার খেয়েছেন আবার। শুধু যে মস্তানীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সহায়তা করেন নি তিনি তাই নয়—প্রকাশ্যেই প্রশ্রয় দিয়েছেন তাকে। যে তরুণ যুবকটি তার পলায়নে সাহায্য করেছিল বা পলায়ন আদৌ সম্ভব করেছিল—সে যুবকটিকে স্বয়ং ছত্রপতি তাঁর ছত্রছায়ায় গ্রহণ করেছেন, শুধু তাকে নয়—তার সমস্ত পরিবার, সাহায্যকারী এবং বান্ধবদেরও। মাতুশ্রী রাধাবাঈ ও পেশোয়ার বীরকেশরী ভ্রাতার রুদ্ররোষ সেই সুকঠিন রাজপ্রশ্রয়ের প্রাচীরে প্রহত হয়ে ফিরে এসে আঘাত করেছে ওঁদেরই—ক্ষতির চেয়ে অপমান বেশী বেজেছে তাঁদের।

আর তাইতেই যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন তাঁরা। এমন কাজই করেছেন, যা এই হিন্দুস্থানে তো নয়ই—সারা দুনিয়ায় কেউ কখনও শুনেছে কিনা সন্দেহ। জননী রাধাবাঈ, মহিষী কাশীবাঈ, এবং চিমনজী আপ্পা—তাঁদের যেসব ব্যক্তিগত রক্ষী, প্রহরী ও দেহরক্ষী ছিল—যেসব অনুগতজনকে বুঝিয়ে ভরসা দিয়ে আনতে পেরেছেন—তাদের এক বড় একটি বাহিনী নিয়ে এসে হানা দিয়েছেন পাটাসের উপকণ্ঠে—এখান থেকে অদূরে ছাউনি বা থানা ফেলেছেন। পুত্র বালাজী প্রকাশ্যে এসে এ বিদ্রোহে যোগ দেন নি—কিন্তু প্রায় দুশো আড়াইশো লোক পাঠিয়েছেন তিনিও।

অবশ্য এদের সমস্ত মিলিত শক্তিও বাজীরাও-এর শক্তির কাছে নগণ্য, তুচ্ছ। এখানে আপাতত তাঁর যা সেনা আছে শুধুমাত্র তাঁদের মিলিত নিঃশ্বাসেই উড়ে যাবার কথা ওদের। কিন্তু শক্তি নর, সামর্থ্য নয়—এখানে প্রশ্ন অন্যত্র। এ অসমযুদ্ধের ফলাফল যাই হোক, বাজীরাও-এর পরাজয় অনিবার্য। মা, স্ত্রী ও ভাই—এদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা মানেই তো ঘোরতর লজ্জা, বিপুল অবমাননা। আর তাই কি পারবেন তিনি, তাদের ওপর কামানবন্দুক চালাবার হুকুম দিতে, দিলেও সৈনিকেরা কি সে হুকুম তামিল করবে? যদিই করে—অপর পক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর তারা এবং তাদের প্রভু মুখ দেখাবে কি ক'রে জনসমাজ-সংসারে?

না, না—তা হয় না, হতে পারে না। ছি!

অথচ কী যে হয়, তাই তো বুঝতে পারছে না মস্তানী কোনমতে। এই প্রথম তার উপস্থিত-বুদ্ধি এবং সকল-অবস্থাতেই-অবিচল তীক্ষ্ন সহজ কৌতুক-বোধ যেন ত্যাগ করেছে তাকে। এই প্রথম আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ঘটেছে তার, সে বিচলিত ও বিহ্বল হয়ে উঠেছে।

তাই মালিকের ঈপ্সিত বাহুবন্ধনে থেকেও স্বস্তি পেল না সে, তাঁর প্রজ্বলন্ত প্রণয়-চুম্বনেও আবেশ আর সুখের সেই অভ্যস্ত মধুর ঘোরটি নামল না চোখে। কী একটা অস্বস্তিতে যেন ছটফট ক'রে উঠল সে, আস্তে আস্তে, ঈষৎ শ্রান্তির সুযোগে সে বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিল, তারপর যেন কোমল লতার মতো, সর্পিল সরীসৃপের মতোই পিছলে নেমে বাজীরাও-এর পায়ের

কাছে বসে পড়ল। বাজীরাও বাধা দিলেন না, কোন অনুযোগও করলেন না, বিগত-আবেগ পরিশ্রান্তির তৃপ্তিতে চোখ বুজে এলিয়ে বসে রইলেন নিজের দিওয়ানে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে একটা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন, তা তাঁর সেই নিমীলিত-নেত্র মুখের ওপরের সামান্য একটু স্নায়ু-কুঞ্চনেই টের পেল মস্তানী। সে এবার নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল তাঁর দুটি পা, ভারী জুতো-সুদ্ধ শীর্ণ অথচ লোহ-কঠিন সেই চরণযুগল নিজের নবনীত-কোমল বক্ষে চেপে ধরে খুব মৃদু অথচ গাঢ় স্বরে ডাকল, 'মালিক!'

'বলো মস্তি।'

'মালিক, অনেকদিন সেবা করলুম, কখনও কিছু চাই নি। যা দিয়েছেন তা নিজেই দিয়েছেন—হয়ত আশার অতিরিক্তই দিয়েছেন, নিজে চেয়ে নিলে অত চাইতে পারতুম কিনা সন্দেহ—তবু কিছু চেয়ে নিতে সাধ যায় বৈকি।...আজ, আজ একটা ভিক্ষা চাইব ভাবছি, দেবেন!'

'মস্তি, যে দুটো জিনিস মানুষের সব চেয়ে প্রিয়, যা দেবার আগে বহু বিবেচনা করে সে, যার জন্য হুঁশিয়ারির অন্ত নেই তার—সেই প্রাণ আর ভবিষ্যৎ—তোমাকে নিঃশেষে দিয়ে বসে আছি। বাকী আর কী আছে যা নেবে তুমি!'

'যদি সব চেয়ে প্রয়োজনীয় আর সযত্নে রক্ষণীয় বস্তু দুটিই খরচ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো আর এত হুঁশিয়ারির কিছু নেই। আমাকে কথা দিন তাহলে যে, আমি যা চাইব তা-ই দেবেন?'

'যে দুটি জিনিসের নাম করলুম, সে ছাড়া এমন দু-একটা জিনিস আছে মস্তিবাঈ যা মানুষ দিতে পারে না। অন্তত পুরুষ পারে না। সে হচ্ছে তার পৌরুষ, মনুষ্যত্ব, ধর্ম, আর আত্মমর্যাদা-বোধ। এ তার জীবনের সাথী, এ-জন্মের এই তার যথার্থ উত্তরাধিকার। অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা এগুলো তার ভাগ্য আর ভবিষ্যতের সঙ্গে। এ দেওয়া যায় না রানী আমার।'

'কাউকেই না, আমাকেও না?'

'না কাউকেই নয়, তোমাকেও না।'

'বেশ, আপনি বহুদিনের অঙ্গীকার-ঋণে বদ্ধ আছেন, সে ঋণ শোধ করুন এবার। আমার আজকের যাচ্‌না পূরণ করলেই আপনার সে ঋণ শোধ হবে। দাসীর কাছে ঋণ থাকা বড় লজ্জার কথা প্রভু। আশা করছি সে ঋণের কথা ভোলেন নি আপনি!'

'না ভুলি নি। সামশের বাহাদুরকে আমি বালাজীর সঙ্গে সমান মর্যাদা দিতে পারি নি। কিন্তু সে আর ঋণ নেই, সে এখন অপরাধে পরিণত হয়েছে। প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অপরাধ। সে প্রতিশ্রুতি পালনের কাল চলে গেছে চিরদিনের মতো।...কিন্তু আমাকে এখনই বাইরে যেতে হবে মস্তি, তোমার প্রার্থনাটা জানালে না তো! অসম্ভব না হ'লে তোমার কোন প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না—সেটা তুমি বিশ্বাস করো।'

'আমাকে ত্যাগ করুন প্রভু—বহুদিন তো সেবা করেছি, আমাকে ছুটি দিন। সামশেরকে যে জায়গীর, আর দুর্গ দুটো দিয়েছেন—তাতেই আমাদের

মায়ে-বেটার বেশ কুলিয়ে যাবে, আমরা খুব সুখে আর শান্তিতে থাকব—ঈশ্বরের কাছে নিত্য দোয়া মাগব। যদি চিরদিনের মতো নাও ছাড়তে পারেন—অন্তত এক বছরের জন্য ছুটি দিন।'

'না, তা হয় না। তোমাকে ছাড়া মানে আমার শক্তি, আমার বীর্য ত্যাগ করা। তুমি না থাকলে, আর আমার দ্বারা কোন কাজই সম্ভব নয়।'

'বেশ,—' পা-দুটো আরও জোরে—সেই বুঝি দেবতারও আকাঙ্ক্ষিত বক্ষে, চেপে ধরে বলল মস্তানী, 'বেশ, তবে চলুন এসব ছেড়ে দূর কোন দেশে—কোন অখ্যাত পল্লীতে কি কোন তীর্থস্থানে চলে যাই, যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না, সাধারণ দুটি নর-নারীর মতো সাধারণ জীবন যাপন করব। আপনি পাবেন বিশ্রাম আর শান্তি—যে দুটোর একান্ত অভাব এখানে। কোন উদ্বেগ কোন চিন্তা রাখবেন না—আমিই যেমন ক'রে পারি—অন্তত ভিক্ষা ক'রে খাওয়াব আপনাকে। চলুন।'

'না, তাও হয় না।' শান্ত অথচ অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দেন বাজীরাও, 'ধর্ম আর পৌরুষের মতো কীর্তি ও কর্মও পুরুষের কাছে অত্যাজ্য মস্তি। আমার এই কর্মক্ষেত্র এবং নব-নব কীর্তিস্থাপনের আশা যদি আমাকে ত্যাগ করতে হয় তাহলে সেই মুহূর্তেই আমার মৃত্যু ঘটবে। বরং তোমাকে ত্যাগ করলেও হয়ত কিছুদিন বাঁচব—কিন্তু এই কাজ এই রাজগী ছাড়লে বোধ হয় এক দণ্ডও বাঁচব না।'

মস্তানী যেন অকস্মাৎ আশ্চর্যরকম শান্ত হয়ে গেল, আস্তে আস্তে পা দুটো ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঈষৎ হাসি-হাসি মুখেই বলল, 'আমার উত্তর আমি পেয়ে গেছি মহান পেশোয়া—আমার থেকেও প্রিয় কোন মানুষ কিংবা বস্তু আছে কিনা সেইটেই জানতে চাইছিলুম।'

পেশোয়াও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন প্রায় সংগে সংগেই, উত্তেজিতভাবে ওর হাত দুটো চেপে ধরে বললেন, 'পাগলামি ক'রো না মস্তি—আর ওরকম কিছু করার চেষ্টাও ক'রো না। তোমাকে আমি ছাড়ব না, ছাড়তে পারব না। তার জন্যে যদি মা ভাই স্ত্রী পুত্র—এমন কি জগৎ-সংসার বাদী হয়—তা হ'লে বরং জগৎ-সংসারের সংগেই বাদ করব—সেও আমার সইবে।…মা এসেছেন সসৈন্যে ছেলের সংগে যুদ্ধ করতে—স্ত্রী এসেছে স্বামীকে পরাজিত করতে—এতে কেন ভয় পাচ্ছ মস্তি, এত বিচলিতই বা হচ্ছ কেন? যুদ্ধক্ষেত্রে যে আক্রমণ করে সে শত্রু, তার আর কোন পরিচয় নেই। আরও একটা কথা কী জান, মার কাছে এখন সন্তানের কল্যাণ-কামনার চেয়েও নিজের জিদ এবং ব্যক্তিগত অপমানের কথাটাই বড় হয়ে উঠেছে। আর তাই যদি উঠে থাকে তো আমারই বা কি এত মাথাব্যথা তাঁর মর্জির কাছে নিজের সমস্ত আশা ভরসা ভবিষ্যৎ বিলিয়ে বসে থাকবার। তুমি আর ওকথা নিয়ে মাথা ঘামিও না মস্তি—আমি নিষেধ করছি।'

পেশোয়া যত সহজে নিশ্চিন্ত হ'লেন মস্তানী তত সহজে পারল না। সে যতই নিজের শিবিরে বন্ধ থাকে, তার প্রখর বুদ্ধি, আর পরিবেশ-সচেতনতা তাকে বার বার সতর্ক ক'রে দিচ্ছে সে-সব ঠিক ঠিক, ঠিকমতো চলছে না। কোথায় কী একটা বড় রকম গোলমাল থেকে যাচ্ছে। সে একটু বাইরেও বেরিয়েছিল, আড়াল থেকেও দেখেছে—ঝি-চাকরের মুখেও শুনেছে অনেক কথা। সেনামহলে খুব আলোড়ন ও আলোচনা শুরু হয়েছে—ফিসফিসিনির অন্ত নেই সেখানে। তারাও একটা অস্বস্তি ও অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, একদিকে পেশোয়া বাজীরাও-এর দুর্লঙ্ঘ্য আদেশ আর অনমনীয় দৃঢ়তা—অপর দিকে তাদের পেশোয়ারই সহধর্মিনী, ধর্মপত্নী এবং দেবতার মতো পেশোয়া স্বর্গত বালাজী বিশ্বনাথ রাও-এর বিধবা। শেষে কি তারা স্ত্রী-হত্যার দায়ে দায়ী হবে? আর সে স্ত্রীলোক ব্রাহ্মণ-কন্যা, তাদের মনিবের স্ত্রী, জননী—নিজেদেরও মাতৃস্বরূপা ···একসঙ্গে ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা মাতৃহত্যার পাপ!

অথচ, আদেশ লঙ্ঘন করার কথাও কল্পনাতীত। বাজীরাও-এর ভয়ংকর ক্রোধ এবং সে ক্রোধের পরিণাম—ওদের জানা আছে। তার সামনে দাঁড়াবার মতো সাহস কারও নেই। দুই বিপদের এই দোটানায় পড়ে তাদের রাত্রের ঘুম ও দিনের আহার চলে গেছে, আর—আর তার জন্যে ওরা দায়ী করছে এই মস্তানীকেই. এই মেয়েটা তাদের এবং তাদের রাষ্ট্রনায়কের জীবনে যেন মূর্তিমতী অভিশাপ, শুধু অশান্তির বিষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। যদি স্ত্রী-হত্যা করতেই হয়—ঐ আপদটাকেই তো সরিয়ে দেওয়া ভাল—সব গণ্ডগোলের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ওদের মনোভাব অনুমান করতে পারে বৈ কি মস্তানী, ওদের কাছে না গিয়েও পারে। কী বলছে তাও তার অজানা নেই। তবু কাছে গিয়েও শুনল। নিজের কানেই শুনল। যে পুরুষ বেশটি তার প্রিয়তমের অত নয়নাভিরাম মনে হয়েছিল, সেই পুরুষ বেশেই বেরিয়ে পড়ল সে—সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে। নিজেদের ছাউনি ঘরের আশেপাশে, হেমন্তের ঈষৎ-শিশিরার্দ্র সন্ধ্যায় কেউ কেউ বা শুকনো পাতার আগুন ক'রে গোল হয়ে বসেছে, কোথাও বা কোন একটা গাছতলায় জড়ো হয়েছে কয়েকজনে। কিন্তু কোনটাই খোসগল্পের আসর নয়, তা বুঝতে দেরি হ'ল না একটুও। সর্বত্রই একটা চাপা উত্তেজনা, সর্বত্রই একটা আবছা অস্পষ্ট উদ্বেগের উপস্থিতি। পিছন থেকে কিছু কিছু ওদের কথাবার্তা শুনল মস্তানী নিজের কানেই। শুনল যে একেবারে এ অভিযানের নায়িকা স্বয়ং কাশীবাঈ। গতবারের পরাজয়ের পর এবারে রাধাবাঈ যেন নেতৃত্বটা পুত্রবধূর ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। কাশীবাঈ নাকি কাল প্রত্যুষেই স্বামীর শিবির আক্রমণ করবেন বলে কৃতসংকল্প। সেই জন্য নাকি আজ থেকে উপবাস ক'রে ভগবান বিনায়ক ও দেবাদিদেব বিশ্বনাথের পূজা করছেন। উপবাসী অবস্থাতেই কাল নাকি যুদ্ধে নামবেন তিনি। মস্তানীকে বন্দী করতে

না পারলে আর মুখে জলবিন্দু দেবেন না—এই প্রতিজ্ঞা করেছেন। সারারাত পুজো আর হোম করবেন আজ। সেই আসন থেকে উঠে এসে অশ্বপৃষ্ঠে চাপবেন। সেই রকমই আয়োজন হচ্ছে। স্বয়ং মহিষী কাশীবাঈ ও মাতৃশ্রী রাধাবাঈ বাহিনীর পুরোভাগে থেকে বাহিনী চালনা করবেন। আর থাকবেন ভাই আম্তাজী। যাতে আগে তাঁদের আঘাত না ক'রে ও বাহিনীর ওপর অস্ত্র-বর্ষণ করা না যায়।

আরও শুনল মস্তানী যে, এরা কেউ ও'দের দিকে একটি গুলি কি একটি বর্শা কিংবা একটি তীরও নিক্ষেপ করবে না। সেটা এদের পঞ্চায়েতে স্থির হয়ে গেছে। বরং মরবে সবাই ঃ ও'দের অস্ত্রে কিংবা বাজীরাও এর ক্রোধে—তবু মহিষী কাশীবাঈ বা জননী রাধাবাঈ-এর দিকে লক্ষ্য ক'রে কোন অস্ত্র ত্যাগ করতে পারবে না।···দু-এক জায়গায় এ-ও শুনল যে, তাঁরা যা করছেন পেশোয়া তথা সমগ্র মহারাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যই করছেন—তাতে ওদের সহযোগিতা করাই উচিত। যদি প্রয়োজন হয় তো কিছু আত্মত্যাগও। পেশোয়া বাজীরাও ওদের গৌরব—দেশের গৌরব। তাঁকে রাহুমুক্ত ক'রে পূর্ণ গৌরবে প্রদীপ্ত ক'রে তোলবার ব্যবস্থা যাঁরা করছেন, তাঁরা ওদের কৃতজ্ঞতার পাত্রই।

আর শুনল না মস্তানী, শুনতে পারল না। আস্তে আস্তে নিজের তথা পেশোয়ার আবাসের দিকে ফিরল। পুরনো কোন্ নবাবের ইমারৎ এটা, বাগানবাড়ি—এইটেই এখানকার আবাস ক'রে নিয়েছেন পেশোয়া, এই বাড়ি ঘিরেই সমগ্র ছাউনি। এখানে—এখানে কেন, পুরা বা সাতারা ভিন্ন সর্বত্রই —পেশোয়া আজকাল একত্র বাস করেন মস্তানীর সঙ্গে। তবু নিজস্ব একটা ঘর থাকে তার সব জায়গাতেই। যখন তাঁবুতে থাকতে হয়—তখনও ওরই মধ্যে একটু ব্যবধান রচনা ক'রে পৃথক কক্ষ নির্দিষ্ট হয়। রাত্রে শয়নের সময় শুধু পেশোয়া সে ঘরে যান, বাকী দিনরাতের অন্য সময়—মস্তানী যায় ও'র ঘরে, প্রয়োজনমতো, তেমন কেউ বাইরের লোক এলে বেরিয়ে আসে।

মস্তানী নিজের ঘরে এসে আয়নাটার সামনে দাঁড়াল। সুরাট থেকে এসেছে আয়নাখানা, সাদা-চামড়া ফিরিঙ্গীদের তৈরী। গোটা চেহারাটা দেখা যায়—এত বড়। মাথার ওপরে বিপুল ঝাড়, সেও ফিরিঙ্গী দেশ থেকে আমদানি—তার আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর সেই পূর্ণ প্রতিবিম্ব।

অনেকক্ষণ বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। নিজের বিচিত্র সুন্দর একজোড়া চোখের দিকে। সে দৃষ্টিতে কী? বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ, উপেক্ষা—গোটা জগৎ-সংসারটাকে—নাকি শুধুই এক ধরনের দুর্জ্ঞেয় আত্মানুভূতি?

কী সে? জাদুকরী? কুহকিনী? সর্বনাশিনী?

সর্পিনী সে—যা তার শাশুড়ী বলে থাকেন?

নাকি, যথার্থ কল্যাণাকাঙ্ক্ষিনী, অর্ধাঙ্গিনী?

সে তো জানে তার জীবন-মরণ, তার ভাগ্য-ভবিষ্যৎ, তার ইহকাল পরকাল সব জড়িয়ে গেছে ঐ মানুষটির সঙ্গে চিরদিনের মতো। ও'র কল্যাণেই তার

কল্যাণ। সে ও'র স্ত্রী, ন্যায়ত ধর্মত। ঈশ্বরের চোখে অন্তত। যে গোধূলি লগ্নে ওদের মিলন ঘটেছিল সে লগ্ন অনন্ত গোধূলিতে বিস্তারিত হয়ে গেছে ওর জীবনে—ওদের জীবনে। এর ব্যতিক্রম নেই, ব্যত্যয় নেই। সে স্ত্রী। স্ত্রী কি কখনো স্বামীর সর্বনাশ করতে পারে? সে তো নিজেরও সর্বনাশ।

না, তা সে পারবে না।

কল্যাণই করবে সে। যদিও জানে যে তাতে ও'র আখেরী কল্যাণ কিছু হবে না। সে পাশে না থাকলে একদিনেই ভেঙ্গে পড়বে মানুষটা। কিন্তু তবু সে একরকম ভাল, ইহকালে না হয় পরকালে মিলিত হ'তে পারবে তারা, রোজ-কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তো বটেই—আত্মা থাকবে আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে, সেখানে কারও সাধ্য নেই তাদের বিচ্ছিন্ন করে।

আর সে তো পাশে থেকেও বাঁচাতে পারবে না। পুরুষের পৌরুষ সব চেয়ে বড়, সর্বাপেক্ষা রক্ষণীয়। যে কর্তা যে নায়ক তার কর্তৃত্ব তার জীবনের চেয়েও বড়। কাল প্রভাতে যদি সত্যিই বাজীরাও-এর সেনারা বাজীরাও-এর আদেশ পালন না করে, যারা চিরদিন অলংঘ্য বাধা অতিক্রম করে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখেও তাঁর আদেশে এগিয়ে গেছে, নির্বিচারে বিনা প্রতিবাদে—সে রকম কল্পনাতীত অঘটন যদি ঘটে সত্যিই—তখন যে ঐ মানী মানুষটার আত্ম-হত্যা করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকবে না। সে অপমান উনি কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না, তা মস্তানী ভাল রকমই জানে।...

সে দুর্গতি কিছুতেই হ'তে দেবে না সে—তার রাজা তার মালিক তার প্রিয়তমের। তাতে ওর এবং ও'র অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক।

বহুক্ষণ সেইভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে পেশোয়ার বসবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল মস্তানী সেই বেশেই। কোন প্রসাধন করল না কিম্বা পোশাকটাও বদলাবার চেষ্টা করল না। পেশোয়া বহু রাত্রি পর্যন্ত জেগে কাজ করেছেন। করবেন তাও বলেছিলেন। বিভিন্ন সেনাধ্যক্ষদের বৈঠক বসেছিল ও'র ঘরে। তারা বিদায় নিতে নিজের গদিআঁটা কুর্সিতেই একটু এলিয়ে পড়েছিলেন পেশোয়া—একান্ত ক্লান্তিতে চোখ দুটো বুজে এসেছিল মাত্র। ঘুমিয়ে পড়েন নি, চোখের পাতা ভারী হয়ে এলেও ঘুম আসা তখন সম্ভব নয়। তাই পুরু কার্পেটে লঘু পদশব্দও কানে গেল তাঁর। চমকে চোখ খুললেন, এবং সোজা হয়ে বসলেন।

'পরে এসেছ পিয়ারী সেই পোশাকটা? বাঃ, বলিহারী। সত্যিই, কে জানত যে সামান্য এই গাঁওয়ার চাষার পোশাকে তোমাকে এত সুন্দর দেখায়—নইলে এতদিনে শ'খানেক এমনি পোশাক করিয়ে দিতুম।'

উচ্ছ্বাসে যেন ছেলেমানুষ হয়ে ওঠেন পেশোয়া।

মস্তানী কিন্তু এ প্রশংসায় অন্যদিনের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল না, শুধু আর একটু কাছে সরে এসে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'শুতে যাবেন না?'

'না। আজ আর তোমার ঘরে নয়, এইখানেই এই বড় কুর্সিটাতে পড়ে ঘণ্টা

দুই গড়িয়ে নেব। কাল শেষ রাত্রে উঠতে হবে একটু। দত্তাজি সিংলে আর লখোজী আংড়েকে তৈরী থাকতে বলেছি, শেষ রাত্রেই একটু কাজে বেরোব ওদের নিয়ে।'

তখনও এক বিচিত্র দৃষ্টিতে বাজীরাও-এর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল মস্তানী, তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ বলেই সেটা অত লক্ষ্য করেন নি বাজীরাও—সে এবার শান্ত কণ্ঠে শুধু প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাবেন পেশোয়া ওদের নিয়ে? শুধুই কি ওরা—না ওদের ফৌজও থাকবে?'

একটু ইতস্তত করলেন পেশোয়া, কথাটা বলতে চাইছেন না ঠিক, অথচ মিথ্যা বলতেও অভ্যস্ত নন—দ্বিধাটা সেইখানেই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বলেই ফেললেন, 'ফৌজও থাকবে। মা আর ভাই ঠিক করেছে কাল ভোরবেলা অনুরাধা নক্ষত্র উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও'রা আমাদের এই বাড়ি আক্রমণ করবেন। সামনে থাকবেন মা আর কাশীবাঈ। ও'দের দেখলে আমার সেনারা সহজে অস্ত্র ছুঁড়তে চাইবে না। তাই আমি ঠিক করেছি—শেষরাত্রে—ও'রা প্রস্তুত হবার আগে আমি পিছন দিক থেকে ঘুরে গিয়ে আক্রমণ করব। যাদের ও'রা সংগে এনেছেন তারা কেউ কোনদিন লড়াই করে নি, দত্তাজি সিংলের মাওয়ালী সৈন্যদের সামনে দু মুহূর্তও টিকবে না। ও'দের তেজ শেষ ক'রে দিয়ে আসব —মা বা কাশীবাঈ-এর কেশাগ্রও স্পর্শ করব না যেমন—কোন সহায়সম্বলও রাখব না ও'দের।

শিউরে উঠল মস্তানী, বলল, 'তবু সেও মা আর স্ত্রীর সংগেই লড়াই পেশোয়া, পরাজয় তাঁদেরই হোক আর আপনারই হোক, সমান অপমানের। আর অপমান ছাড়াও, ব্যথাই কি কম বাজবে!'

'তুমি শুতে যাও মস্তানী, ওসব কাব্য-কথা শোনবার আমার সময় নেই। হাতে পায়ে চোট লাগলে মানুষের ব্যথা কম বাজে না, তবু সময়-বিশেষে, দূষিত ক্ষত দেখা দিলে সেই হাত-পাই কেটে বাদ দিতে হয়, ইচ্ছে ক'রে। আর তাঁরাও—জেনে শুনেই আগুনে হাত দিতে এসেছেন, হাত পুড়লে আগুনের দোষ দেবেন না আশা করি। তুমি যাও, শুয়ে পড়ো গে।'

কণ্ঠের এ কঠিন স্বর মস্তানীর পরিচিত। এখন আর কারও কোন কথাই শুনবেন না। সে-চেষ্টাও সে করল না। একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে আরও কাছে এসে দাঁড়াল। মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে নিয়ে পাশের একটা মেজ্-এ রেখে, মাথায় কপালে অভ্যস্ত লঘু মিষ্ট স্পর্শে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আপনি একটুও শোবেন না পেশোয়া?'

'না মস্তি, তাহলে জোর ঘুমিয়ে পড়ব, ঠিক সময়ে আর ওঠা হয়ে উঠবে না। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই কুর্সিতে বসেই চোখ বুজব একটু।'

আর কথা কইল না মস্তি, বোধ করি চোখের জল ধরা পড়বার ভয়েই। সে আস্তে আস্তে লাঠির ডগায় বসানো পিতলের ঠুলি দিয়ে ঝাড়ের অধিকাংশ বাতি নিভিয়ে ঘর অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ক'রে তেমনি নিঃশব্দেই বেরিয়ে গেল।

সত্যিই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন বাজীরাও। নইলে এ আচরণ তাঁর কাছে

অস্বাভাবিক বলেই তো ঠেকবার কথা। কাছে থাকার জন্য জিদ করল না, শয়নগৃহে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করল না—যাওয়ার সময় কোনরকম সম্ভাষণ জানিয়ে গেল না, এমন কি অভ্যস্ত চুম্বনটার কথাও মনে রইল না তার।…

আর, সেটুকু লক্ষ্য করলেন না বলেই তাঁর ক্লান্তি ও অসুস্থতার পরিমাণটা যেন বেশী ক'রে দেখতে পেল মস্তানী। সংগে সংগেই মন থেকে সমস্ত দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা জোর ক'রে ঠেলে সরিয়ে দিল। বাইরে এসে ওড়নায় চোখ মুছে, বার বার ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে সদ্যোদ্গত অশ্রুর সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত করল। তারপর সোজা আস্তাবলে গিয়ে নিজের ঘোড়া বার ক'রে যতদূর সম্ভব সন্তর্পণে এ বাড়ি থেকে, শিবির থেকে বেরিয়ে গেল। সেদিনকার রাত্রের 'ছাড় শব্দ' ওর নিজেরই তৈরী, সুতরাং বাধা পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ওর গলার আওয়াজও সান্ত্রীদের পরিচিত, বিনা প্রতিবাদেই পথ ছেড়ে দিল তারা।

সোজা গিয়ে থামল মস্তানী রাধাবাঈদের ছাউনিতে। বিস্মিত হতচকিত প্রহরীকে বলল যে, মাতৃশ্রী দেবী রাধাবাঈকে বলো মস্তানী এসেছে তাঁকে প্রণাম জানাতে। কোন ভয় নেই, একা নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই এসেছে সে।'

বিস্মিত রাধাবাঈও বড় কম হলেন না, তাঁরও মুখে কথা সরল না বেশ কিছুক্ষণ। তাঁকে কথা বলার সুযোগও দিল না মস্তানী; বলল, 'আমি স্বেচ্ছায় বন্দী হতে এসেছি মা, আর আমি স্বয়ং পেশোয়া কি আমার ছেলের নামে শপথ করছি—আমি পালাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করব না। শুধু একটা অনুরোধ, এখনই—রাত্রি শেষ হওয়ার অনেক আগে আমাকে নিয়ে আপনারাও এখান থেকে সরে যান, নইলে, নইলে এক প্রলয়কাণ্ড ঘটে যাবে। আপনারাও বাঁচবেন না—যাঁকে বাঁচাবার জন্য আপনাদের এত কাণ্ড তাঁকেও বাঁচাতে পারবেন না।'

পেশোয়া বাজীরাও-এর জননীও সেটুকু বোঝেন বৈকি। বোধ করি এই প্রথম তাঁর পুত্রের উপপত্নীর সংগে একমত হলেন তিনি। তখনই সেই হুকুম ছড়িয়ে গেল শিবিরের সর্বত্র—দ্রুত ও নিঃশব্দ গতিতে। ঠিক এক প্রহর কালের মধ্যে অন্ধকারেই সকলে রওনা হয়ে গেলেন। শুধু সাদা তাঁবুগুলো পড়ে রইল—এই অবিশ্বাস্য অভিযানের সাক্ষ্য স্বরূপ।

সংবাদটা এরা পায় নি অনেকক্ষণ পর্যন্ত। একটু-আধটু যা শব্দ, অন্ধকারে ঘোরাফেরা করা কি ঘোড়া তৈরী করার আওয়াজ, সেটাকে শেষ রাত্রের সম্ভাব্য আক্রমণের উদ্যোগপর্বই মনে করেছিল। তাই পেশোয়া বা তাঁর সচিব—কাউকেই সে সম্বন্ধে সতর্ক করার প্রয়োজন বোঝে নি। তাছাড়া এ শিবিরেও কিছু উদ্যোগপর্ব ছিল, সেজন্যও অন্যমনস্ক ছিল সকলে।

পেশোয়াই বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা—বাইরে বেরিয়ে একবার মাত্র চেয়ে দেখে। তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি যেন অন্ধকারের পর্দা ভেদ করে ভিতরের শূন্যতা দেখতে পেল। তখনই চার-পাঁচজন লোক পাঠালেন খবর নিতে। তারা দুই

দণ্ডকালের মধ্যেই ফিরে এল, খবর দিল—শূন্য খাঁচা সব কটাই পড়ে আছে, কিছু কিছু আসবাব বা তৈজসও আছে—কিন্তু পাখী একটিও নেই।

বাজীরাও তার আগেই আশঙ্কা করেছেন ব্যাপারটা। তবুও স্খলিত মন্থর গতিতে মস্তানীর—তাঁদের শয়নকক্ষে গেলেন একবার। আস্তাবলে লোক পাঠালেন। অবশেষে প্রহরারত সান্ত্রীর মুখে নিশ্চিত খবরটা পাওয়া গেল। তারা রানীসাহেবার গলার আওয়াজ পেয়েছে, ঘোড়াটাও চিনতে পেরেছে অন্ধকারেই। হ্যাঁ, তিনি ঐ দিকেই গিয়েছেন বটে। সন্দেহ বা সংশয়ের কোন অবকাশ নেই কোথাও।

সচিবের ইঙ্গিতে সকলেই নীরবে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তিনি নিজেও। বিশাল বিস্তৃত বহু মধুস্মৃতিভরা সেই শয়নকক্ষে একা বসে রইলেন বাজীরাও। তাঁদের বহু প্রণয় রজনীর সাক্ষী এই শূন্য ঘর। বহু রভসের সঙ্গী এ। ঐ তো চারিদিকেই তার স্পর্শ লাগা কত অসংখ্য জিনিস। তার বিপুল কৃষ্ণ কেশ-বন্ধনীর চুলে বোনা দড়ি ও সোনার কাঁটা এক গাদা। কত রকমের আতরের শিশি। রেশমের আর সুতীর অসংখ্য পোশাক। তারই লোভনীয় পরিপূর্ণ অধরের স্পর্শশিক্ত আলবোলার নল—। সবই ঠিক আছে, শুধু সে-ই নেই।

বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন বাজীরাও। পাথরের মতো স্থির হয়ে। বোধ করি পলকও পড়ছিল না তাঁর। অস্বাভাবিক বিবর্ণ তাঁর সে সময়কার মুখের দিকে চাইলে আত্মীয় বন্ধু ও সেবকরা ভয় পেয়ে যেত।

অবশেষে পূর্ব গগন উদ্ভাসিত ক রে নতুন আশার বাণী নিয়ে ঊষা দেখা দিলেন, ক্রমশ তাঁর আবির্ভাবের দীপ্তি এই অন্ধকার শয়নকক্ষেও প্রবেশ করল এসে। কিন্তু বাজীরাও-এর সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। তিনি তাকিয়েছিলেন ঊর্ধ্বমুখে। ঝাড়ের বাতিগুলো নিভছে একে একে। তেল ফুরিয়ে গেছে, ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসছে তাই, একেবার শেষ মুহূর্তে একবার একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেই নিভে যাচ্ছে সম্পূর্ণ।

এ যেন একটা খেলা পেয়ে গেছেন বাজীরাও। উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছেন আলোগুলোর দিকে। শেষ বাতিটিও নিভে যেতে চোখটা নামিয়ে আবার ঘরের দিকে চাইলেন একবার। দিনের আলোয় সেই চিরপরিচিত জিনিসগুলো আরও স্পষ্ট, আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি জিনিস তার ব্যবহৃত, কোন-কোনটা সদ্য ব্যবহার করা—তার স্পর্শ তার ঘ্রাণ লেগে থাকা প্রতিটি বস্তুও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই সঙ্গে।

সেগুলো সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও রূঢ়, আরও তীব্র আঘাত পেলেন বাজীরাও। যন্ত্রণায় বুকের মধ্যেটা যেন কুঁকড়ে উঠল অকস্মাৎ। চোখ বুজে দুহাতে বুক চেপে ধরে প্রাণপণে সামলাতে হ'ল সে আঘাত। বুকের এ যন্ত্রণাটা আরও দু-একবার টের পেয়েছেন ইদানীং—কিন্তু এমন তীব্র আর কখনও হয় নি। বেদনায় কপালে বড় বড় স্বেতবিন্দু ফুটে উঠেছে—সামনের বড় আয়নাটায় দেখতে পেলেন পেশোয়া। এই আয়নায় গালে গাল রাখা অবস্থায় দুজনের মুখ কতবার দেখেছেন দুজনে। মস্তি বলত,

'ঘামলে আপনাকে বড় সুন্দর দেখায় মালিক।' সে থাকলে এতক্ষণে নিজের বুক দিয়ে মুছে নিত সে ঘাম।'

আঃ, আবার! তড়িৎস্পৃষ্টের মতোই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। থাক্ ওর কথা। সে জেনে শুনেই তো তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে গেছে। তার কথা কেন ভাবছেন মিছিমিছি?

তখনই ডেকে পাঠালেন সচিবকে, ডেকে পাঠালেন সেনানায়কদের। বড় ভুল হয়ে গেছে তাঁর। মুঙ্গী সেবগাঁওয়ের সন্ধি-শর্ত অনুযায়ী হাণ্ডিয়া আর খারগন জেলা তাঁকে ব্যক্তিগত জায়গীর হিসেবে দেবার কথা ছিল নিজামের। নানা টালবাহানা ক'রে আজও সে তা দেয় নি। পেশোয়া এবার গায়ের জোরে আদায় করবেন নিজের প্রাপ্য। সেনা যা তৈরী আছে তা নিয়ে এখনই তিনি রওনা হবেন, বাকী সবাই যেন পিছনে পিছনে রওনা হয়।

'আজই?' সেখানে উপস্থিত সকলের বিস্ময় প্রতিধ্বনিত ক'রে প্রশ্ন করলেন মুখ্য সচিব, 'এই অবস্থায়? কিন্তু আপনি যে এখনও রীতিমতো অসুস্থ পেশোয়া!'

'যোদ্ধার স্বাস্থ্য বিবেচনা ক'রে যুদ্ধ করতে গেলে আর যাই হোক, লড়াই হয় না। ওকথা এখন থাক। যদি আমি মরি—আপ্পাজী আছে, বালাজী আছে, লড়াই বন্ধ হবে না। আপনি যান, যা বললুম সেই মতো করুন গে। ...আমি পুজো সেরে দুই দণ্ডের মধ্যেই ঘোড়ায় সওয়ার হবো, দেরি না হয়।'

সবাই চলে গেলে পেশোয়া আবারও আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ব্যাকুল চোখ বোধ করি বারেক নিজের মুখের পাশের শূন্য স্থানে আর একখানা প্রিয় পরিচিত অভ্যস্ত মুখের প্রতিচ্ছবি অন্বেষণ করল, তারপর সেই শূন্যতাটার দিকে চেয়েই অর্ধস্ফুট স্বরে বললেন, 'তাই হোক, তাই হোক পিয়ারী। ...তোমার অভাব বরং সইবে, যুদ্ধক্ষেত্রে নূতন কীর্তির আস্বাদে সে আঘাতও সহ্য হবে বলেছিলাম—সেই অভিমানে আমাকে জেনে শুনে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে! কিন্তু আমার কথাই সত্য করব, আমি বাঁচব, নূতন বিজয় গৌরবের মধ্যে বাঁচব। আর তার মধ্যেই কান পেতে থাকব তোমার আশাভঙ্গের দীর্ঘনিঃশ্বাসটুকু শোনবার জন্যে!'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই শিউরে উঠলেন বাজীরাও, 'না না, না, তুমি আমার কল্যাণের জন্যই গিয়েছ পিয়ারী তা আমি জানি। তোমাকে একটুও ভুল বুঝি নি, বিশ্বাস করো। তাই আমি বাঁচতেই চেষ্টা করব, প্রাণপণে চেষ্টা করব তোমার এ আত্মত্যাগ সার্থক ক'রে তুলতে।'

ভাগ্যে তখন আর কেউ সে ঘরে ছিল না, নইলে লৌহ-মানব মহাক্রোধী মহান্ পেশোয়া বাজীরাও এর বজ্রাধারসদৃশ চোখের কোল থেকে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়তে দেখে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকত না তাদের।

ছত্রপতি খবরই পেয়েছিলেন একটু দেরিতে। নইলে তাঁর স্বভাবজ কর্মবিমুখতায় কালহরণ ঘটে নি আদৌ, অন্তত এ ব্যাপারে নয়। রাজ্যের সব সংবাদই তাঁর খাস দপ্তরে যায়, বেছে নিয়ে প্রধান প্রধানগুলো জানানো হয় তাঁকে। এই নির্বাচন ব্যাপারে কিছুটা দেরি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তাও হয় নি বিশেষ। সংবাদটা প্রতিনিধির কাছে পেঁছিনো মাত্র তিনি বুঝেছিলেন যে এটা ছত্রপতিকে অবিলম্বে জানানো দরকার। তাঁর অত স্নেহের পেশোয়ার কাণ্ডটা দেখুন তিনি।

আসলে রাধাবাঈ-এর এই অস্বাভাবিক অভিযানের সমস্ত আয়োজনটাই হয়েছিল অতি দ্রুত এবং অতিশয় নিঃশব্দে। দলবল বেরিয়ে পাটাসের দিকে রওনা হবার আগে কেউ জানতে পারে নি। বাইরের লোককে জানানোর মতো নয় বলেই সংবাদটা তাঁরা চেপে রেখেছিলেন শেষ পর্যন্ত। ঈর্ষা ও বিদ্বেষ যদি হিতাহিত বিবেচনার বাধা ছাপিয়ে না উঠত মনের পাত্রে, মানসিক স্থৈর্যের মর্মমূল পর্যন্ত যদি বিচলিত হয়ে না উঠত, তাহলে এ কাজ তাঁরা করতেই পারতেন না। এর লজ্জা এবং গ্লানি সম্বন্ধে তাঁরা অচেতন ছিলেন না কিছুমাত্র। তাই সে বোধ তাঁদের এ কাজে বাধা দিতে না পারুক কিছুটা সংহত রেখেছিল।

খবর ছত্রপতির কাছে যাওয়া মাত্র, যাবতীয় ঝঞ্ঝাট ও সক্রিয়তা সম্বন্ধে অনিচ্ছা তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন একমুহূর্তে। এ অভিযানের পরিণাম সম্বন্ধে ধারণায় কিছুমাত্র অস্পষ্টতা ছিল না। বিশ্রী একটা ব্যাপার ঘটবে, বাজীরাও-এর অনুচর ও সৈন্যরা বিশ্বনাথরাও-এর বিধবাকে, বা বাজীরাও-এর মহিষীকে আক্রমণ করতে রাজী হবে না নিশ্চিত, হয় অস্ত্র ত্যাগ করবে নয় তো দাঁড়িয়ে মার খাবে। সে ধরনের 'আদেশ পালনে পরাঙ্মুখতা'য় অভ্যস্ত নন বাজীরাও—সে অপমান সহ্য করতে পারবেন না তিনি। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে হয় নিজের সৈন্যকে নিজে আক্রমণ করবেন, নয় তো একাই ঝাঁপিয়ে পড়বেন বিপক্ষপক্ষের সামনে—তাঁকে মারবে না কেউ—কিন্তু মাতৃশ্রীর হাতে একান্ত অনভিপ্রেত বন্দীদশা ঘটবে। অথবা—ক্রোধে ক্ষোভে বিচলিত হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করাও অস্বাভাবিক নয় বাজীরাও-এর পক্ষে।

আরও যেটা ঘটতে পারে—তাও ভেবে দেখেছেন ছত্রপতি, প্রিয়তমকে এই অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে রক্ষা করতে নিজে এসে ধরা দেবে হয়ত মস্তানী—কিম্বা আত্মহত্যার চেষ্টা করবে। সেটাও পেশোয়ার কাছে মৃত্যুতুল্য হবে।

অথচ তাঁরই বা কি করার আছে। নিতান্তই পারিবারিক ব্যাপার এটা, একটি পরিবারের একান্ত ব্যক্তিগত আভ্যন্তরীণ কলহ। তার মধ্যে ছত্রপতির হস্তক্ষেপ তাঁর পক্ষে রীতিমতো মর্যাদাহানিকর। সে পরিবারও সামান্য তুচ্ছ কোন প্রজার নয়—সেখানেও মর্যাদার প্রশ্ন আছে। সম্ভ্রমে তাঁরা ছত্রপতির সমকক্ষ না হ'লেও খুব অনেকখানি নিচেও নন। ছত্রপতির হুকুমে যদি বিশ্বনাথরাও-এর মহিষী এবং বাজীরাও এর জননীকে বন্দী করা হয় তাহলে রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত সামন্ত পরিবারে বিক্ষোভ ও আলোড়ন দেখা দেবে।

নাঃ, এসব কিছুই করা যাবে না। যা করা যাবে তাই করলেন তিনি। প্রথমেই প্রয়োজন একটি বিশ্বস্ত লোক—যে এ কাজ করবে কেবলমাত্র আদেশ-পালন হিসেবে নয়, কিছুটা প্রাণের গরজেও। কারণ তিনি যে কাজ করতে যাচ্ছেন তার মধ্যে তার হাত আছে এ কথা অপর কারুর জানাটা আদৌ অভিপ্রেত নয়। রাজকার্যে রাজ-আদেশে যাচ্ছে তাঁর বিশ্বস্ত কাজের ভার পেয়ে, অথচ সে তথ্যটা সগর্বে কাউকে জানাবে না, সাধারণ সেবকের মধ্যে এ লোক পাওয়া কঠিন—তা ছত্রপতি ভাল ক'রেই জানেন। আর অসাধারণ বা বিশিষ্ট সেবকদের আদৌ জানাতে চান না তিনি। সুতরাং যে ব্যক্তি নেহাৎই নগণ্য হবে, অথচ নিজের গরজে কাজ করবে এমন কাউকে প্রয়োজন। এবং সে লোক খোঁজ করতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ল তাঁর রঘুজীর কথা।

হ্যাঁ—রঘুজীই তো আছে। ঐ লোকটিই ঠিক এ কাজের উপযুক্ত। পেশোয়ার নিমক খেয়েছে, রাধাবাঈয়ের কাছে সপরিবারে ঋণী, মস্তিকে ভালবাসে এবং সম্প্রতি ছত্রপতির কাছে বিশেষ উপকৃত। তার সমগ্র পরিবারের প্রাণ রক্ষা করেছেন তিনি। সে উপকার এত শীঘ্র ভুলবে—ঠিক সে ধরনের মানুষ নয় রঘুজী, সেটুকু ওর মুখ দেখেই শাহু বুঝতে পেরেছেন : বহুদর্শী লোক তিনি, মানুষের মুখ দেখে তার চরিত্র অনেকখানি বুঝতে পারেন। আবেগ মুছে যাবার বয়সও হয়নি রঘুজীর—আর আবেগ থাকলে কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্গুণ-গুলোও থাকবে বৈকি খানিকটা। সৌভাগ্যক্রমে রঘুজী কোথায় আছে তা তিনি জানতেন। সাতারার কাছেই একটি দুর্গে আছে সে। সেখানে খবর দিতে বা সেখান থেকে আসতে কয়েক দণ্ডের বেশী সময় লাগবে না।

রঘুজীকে ডেকে আনতে ঘোড়সওয়ার রওনা করিয়ে দিয়ে একান্তসচিব ও কলমচী গনেশজী পন্থকেও ডেকে পাঠালেন ছত্রপতি। নিজের জবানীতে দুখানি চিঠি লেখালেন তাকে দিয়ে। একটি মস্তানীকে ও একটি পেশোয়া বাজীরাওকে।

মস্তানীকে লিখলেন :

'কন্যা, তুমি এই পত্র পাঠ মাত্র, এই পত্রকে আদেশনামা জেনে রঘুজীর সঙ্গে সাতারায় চলে আসবে এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। এ পত্রের কথা কেউ না জানতে পারে। সেজন্য বেশী লোকলস্কর নিয়ে বা শিবিকায় না আসাই শ্রেয়। অল্প দু-চারজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষী নিয়ে যতদূর সম্ভব গোপনে শিবির ত্যাগ করবে এবং অশ্বারোহণে আসবে। খুব জরুরী প্রয়োজন বুঝে সত্বর রওনা হবে। ইতি, আশীর্বাদক শাহু ছত্রপতি।'

আর বাজীরাওকে লিখলেন,

'বৎস, বিশেষ প্রয়োজনে মস্তানীকে আমি সাতারায় আসতে বলেছি। আমার ইচ্ছা ও আদেশ যে সে আমার আশ্রয়ে মাসখানেক বা মাস দুই থাকুক। তার যত্নের কোন ত্রুটি হবে না, আমি তাকে কন্যা সম্বোধন করেছি, সে কন্যার মতোই থাকবে এখানে। এই কাল উত্তীর্ণ হ'লে আমি তোমার নির্দেশমতো স্থানে রক্ষী সমেত নিরাপদে পেঁছে দেব। যদি সম্ভব হয় তো তুমিও এসে এই

সময়টা আমার এখানে বিশ্রাম করে যাও, তাতে তোমার দেহ ও মন দুইই বিশ্রাম পাবে। ইতি, নিয়ত আশীর্বাদক শাহু ছত্রপতি।'

লেখা শেষ হ'লে স্বাক্ষর ও মোহর পর্ব সমাপ্ত ক'রে চিঠি দুটি নিজের কাছে রেখে গনেশজীকে বললেন, 'তুমি এবার যেতে পারো।'

হতবাক গণেশজী বহু কষ্টে কণ্ঠস্বর সংগ্রহ ক'রে বললেন, কিন্তু এ চিঠি —পাঠাতে হবে না?'

'সে ব্যবস্থা আমি করেছি। তুমি যাও, বিশ্রাম করো গে।'

অগত্যা গণেশজীকে চলে আসতে হ'ল। ব্যাপারটার আগা ও গোড়া, পূর্ব এবং পর—কিছুই বুঝতে পারলেন না গণেশজী। ইদানীং ছত্রপতির কী একটা হয়েছে, ক্রমশ যেন তাঁর আচরণ ও কার্যকলাপ কতকটা দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠছে। বিশেষত এই বিজাতীয়া স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে কী যে দুর্বলতা একটা দেখা দিয়েছে। বয়স এবং সম্পর্ক বিরোধী না হ'লে এ দুর্বলতার কদর্থই করতেন গণেশজী, অন্তত করলে কেউ তাঁকে দোষ দিত না। তিনি মনে মনে বেশ একটু অসন্তুষ্ট হয়েই চলে গেলেন রাজসন্নিধান থেকে। এইভাবে কিছু না বুঝতে দিয়ে বা বুঝিয়ে না বলে হঠাৎ ডেকে আনা এবং হঠাৎই সরিয়ে দেওয়াটা তাঁর প্রতি রীতিমতো অবিচার বলে মনে করলেন গণেশজী পন্থ। অভিমানও বোধ করলেন সেই পরিমাণে—তাঁর এতদিনের বিশ্বস্ত সেবার যদি এই পুরস্কার হয়, পথ-থেকে-ডেকে-আনা দিনমজুরের প্রতি যেমন আচরণ—তেমনি করার উপযুক্তই যদি মনে ক'রে থাকেন ছত্রপতি তো আর কিছু বলবার নেই তাঁর। উনি মালিক, যা খুশি করতে পারেন বৈকি!

রঘুজী আদেশ পেয়ে প্রায় উর্ধ্বশ্বাসেই ছুটে এসেছিল। শাহু তাকে তলব করেছেন, কোন রকম শাস্তি দিতে নিশ্চয়ই নয়—কারণ তেমন কোন গর্হিত কাজ সে করে নি, সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্তই আছে—ডেকে পাঠিয়েছেন কোন জরুরী কাজ আছে বলেই। আর গুরুতর রাজকার্যের জন্য তাকে নির্বাচন করায় তাঁর বিশ্বাস ও আস্থাই প্রকাশ পেয়েছে—সে জন্য তার গর্বেরও সীমা ছিল না। কিন্তু এখানে এসে ছত্রপতির আদেশ শুনে তার সমস্ত আনন্দ মিলিয়ে গেল, দুশ্চিন্তায় মুখ শুকিয়ে ললাটের কোণে কোণে ঘাম দেখা দিল।

দুশ্চিন্তা নিজের জন্য নয়, কাজের গুরুত্ব বিবেচনা ক'রেও নয়। তার যা বয়স তাতে কাজ যত কঠিন হয় সম্পন্ন করায় তত আনন্দ, ভার যত গুরু হয় বহন করায় তত সুখ। না—নিজের জন্য নয়, প্রাণ দিয়েও সে প্রভুকার্য সমাধা করবে, আর সেই মহিমময়ী নারীর জন্য প্রাণ দেওয়া তো আনন্দের—সেই তো যথার্থ বাঁচার মূল্য পাওয়া এ জীবনে। না, তার দুশ্চিন্তা মস্তানীর বিপদের কথা শুনে। এসব কিছুই জানত না সে। এত কাণ্ড হয়ে গেছে সে কোন খবরই পায় নি। ঠিক সময়ে পেঁছিতে পারবে তো সে? সে-ই শুধু ভাবনা, এর মধ্যে কিছু ঘটে যাবে না তো?

তার কাজ এবং গোপনীয়তার কারণ বুঝিয়ে দিয়ে ছত্রপতি প্রশ্ন করলেন, 'ভেবে দেখ, পারবে তো?'

হেঁট হয়ে তাঁর পদধূলি নিয়ে রঘুজী উত্তর দিল, 'আমার নিজের শক্তি সামান্য, আপনার আশীর্বাদেই পারব। আপনার আদেশ ব্যর্থ হবে না।... আমাকে অনুমতি দিন, এখনই রওনা হই।'

স্মিত প্রসন্ন হাস্যে স্নেহও বুঝি প্রকাশ পায় ছত্রপতির, এই সুদর্শন তরুণটিকে যত দেখছেন তত খুশী হচ্ছেন। বললেন, 'এখনই রওনা হবে? সামান্য একটু বিশ্রাম করবে না? কিছু খেয়ে নেবে তো অন্তত?'

'এখন যত শীঘ্র যেতে পারব ততই শান্তি, আর মনে শান্তি না থাকলে বিশ্রামের মূল্য কি? আমার কথা ভাববেন না একটুও, দু-চার দিন না খেলে কি না ঘুমোলে কোন অসুবিধা হবে না আমার। শুধু যদি ঘোড়ার ডাক বদল করার ফরমান্ দেন একটা তো সময় আরও সংক্ষেপ করা যায়, ঘোড়ার বিশ্রাম করানোর জন্য সময় নষ্ট করতে হয় না।'

তৎক্ষণাৎ আবার গণেশজীকে ডেকে সেই মতো হুকুমনামা দিতে বলে ও কিঞ্চিৎ অর্থ দেবার আদেশ দিয়ে ওকে বিদায় দিলেন ছত্রপতি। আর একদণ্ড কালের মধ্যেই—ওপরে পূজার ঘরে যেতে যেতে একটা গবাক্ষকোণ থেকে দেখতে পেলেন—তাঁর দুর্গের প্রবেশপথ ধরে তীর বেগে ছুটে চলেছে এক অশ্বারোহী—চিনতেও বিলম্ব হ'ল না, রঘুজী।

সত্যিই পথে কোথাও বিশ্রাম করে নি রঘুজী। ঘোড়া বদলাতে মধ্যে দুবার যা থামতে হয়েছিল, তাতেও সাকুল্যে একদণ্ডের বেশী দেরি হয় নি। সেই সময়ই জল খেয়ে নিয়েছে নিজে একটু একটু—আর পোড়ানো ভুট্টা সংগ্রহ ক'রে ঘোড়ার পিঠে বসেই খেতে খেতে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের কিছু পরে, পাটাসের কাছাকাছি পেঁছে অকস্মাৎ একটা পাথরে হোঁচট লেগে ঘোড়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। অন্ধকারে নক্ষত্রের ঝাপসা আলোতে যতটা দেখা গেল বিরাট একটা পাথর কে যেন ইচ্ছা ক'রে পথে রেখে দিয়েছে, আশেপাশে আর কোথাও সে ধরনের পাথর নেই। তখনই যেন কেমন একটা হতাশা বোধ করল রঘুজী—কে যেন মনের মধ্যে বলল, এ নিতান্তই ভাগ্যের খেলা, অদৃশ্য অদৃষ্ট-দেবতাই এ পাথর ফেলে রেখেছেন পথের মধ্যে!

কিন্তু হতাশা বোধ করারও সময় নেই তখন। ঘোড়াটাকে নেড়ে-চেড়ে দেখল তার আঘাত গুরুতর, সম্ভবত একটা পা ভেঙ্গে ফেলেছে বেচারী! তাকে সুস্থ ক'রে তুলে যাওয়া যাবে না, সারারাত অপেক্ষা করলেও না। সে-চেষ্টাও সে আর করল না, সোজাসুজি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে শুরু করল নিজের পায়ের ওপর ভরসা ক'রেই।

তবু, মানুষের সাধ্যে আর ঘোড়ার সাধ্যে অনেক তফাৎ। ঘোড়ার দমের থেকে দমও কত তার। যে পথটা ঘোড়াতে চেপে গেলে এক প্রহরে চলে যাওয়া যেত সেই পথ যেতেই রাত দ্বিতীয় প্রহরও পার হয়ে গেল। আরও বাধা পেল

শিবিরের কাছাকাছি পেঁাছে। অকস্মাৎ অন্ধকার পথে বহু অশ্বপদশব্দ শোনা গেল। সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ, দুদিকে কোথাও সরে পড়ার জায়গা নেই। কারা আসছে তা যখন জানা নেই, তখন আত্মগোপন করাই ভাল। আর কোন উপায় না দেখে তাড়াতাড়ি একটা গাছের ওপর উঠে পড়ল রঘুজী। দেখল বিপুল এক বাহিনীই চলেছে, ঘোড়ার ওপরই বেশীর ভাগ—তিন-চারখানা শিবিকাও আছে। সশস্ত্র লোক সব, বেশ একটি সৈন্যদলের মতো এদের ভাবভঙ্গী, অথচ সঙ্গে আলো নেই, একটা মশাল পর্যন্ত কেউ আনে নি। কথাও কইছে খুব কম, সামান্য যা দু-একটা বলছে চাপা গলাতে। তবু তার মধ্যেই অকস্মাৎ একটা চেনা গলা কানে এল রঘুজীর। সঙ্গে সঙ্গেই বুকের মধ্যে একটা হিম হতাশা বোধ করল সে—এ দল মাতুশ্রী রাধাবাঈ-এর। নিশ্চয় তাঁরই বাহিনী ফিরছে পুনার দিকে।

কিন্তু এমন নিঃশব্দ গোপনে, এমন অন্ধকারে কেন ?

তবে কি তাঁরা আক্রমণ ক'রে হেরে গেছেন—সেই পরাজয়ের লজ্জা ঢাকতেই এমন চুপিচাপি এমন অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন ?···নাকি—

'নাকি'টা যে কী হ'তে পারে তা আর ভাবতে পারল না রঘুজী। ভাবতে চাইল না। যেন কী এক ভয়ংকর শত্রুর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে এই ভেবেই সে চিন্তাটাকে দূরে ঠেলে দিয়ে আবার পাটাসের পথ ধরল। খুব জোরে দৌড়নোর ফলে মনটাকে যদি এক ঐ ভয়ংকর সম্ভাবনার চিন্তা থেকে দূর করানো যায়। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও আর দৌড়তে পারল না, কে যেন তার বুকের দম ও পায়ের বল দুই-ই হরণ ক'রে নিয়েছে।

বোধ করি সেই ভাগ্য-দেবতাই, যে পথের মধ্যে পাথরটা ফেলে রেখেছিল।

তার পর, পাটাসের শিবিরে পেঁাছে আর কোন প্রশ্নই করতে হ'ল না কাউকে। যা জানবার তা জানা হয়ে গেল আশপাশের লোকদের উত্তেজিত আলোচনা থেকেই। দেখল খুশিই হয়েছে এরা, যেন এদেরই ব্যক্তিগত বিজয় লাভ হয়েছে একটা।···আর বেশী দূর চলতে পারল না সে, এই গত দুদিনের সমস্ত ক্লান্তি পাহাড়ের মতো চেপে বসেছে তার ওপর - অবসন্নের মতো একটা গাছে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল পথের পাশেই।

বহু—বহুক্ষণ তেমনি বসে থাকবার পর মনে হ'ল পেশোয়াকে একবার দেখা দরকার। ছত্রপতির চিঠিটা আছে, তা থাক, সে চিঠি আর না দিলেও চলবে —কিন্তু আজ তাঁর এই অসহায় অবস্থার মধ্যে, একান্ত নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব জীবনে সেবক একজন কাছে থাকা যে নিতান্ত দরকার। এ শিবিরে ওঁর জন্যই সকলে চিন্তিত, ওঁর কল্যাণ হবে মনে করেই তারা এত উৎফুল্ল, তবু এখানে ওঁর যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সমব্যথী একজনও নেই তা বুঝেছে রঘুজী। না জানি কি অপরিসীম দুঃখ একাই সইতে হচ্ছে তাঁকে, কী দুঃসহ বেদনা বহন করতে হচ্ছে।

স্খলিত মন্থর পা দুটোকে টেনে নিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল রঘুজী। তখন

ভোর হয়ে গেছে, ঘর-বাড়ি চিনে বুঝে যাওয়া যায়। পেশোয়া কোথায় এ প্রশ্ন সে করল না কাউকে, এদের সঙ্গে কথা কইতে ঘৃণা বোধ হ'ল তার। আন্দাজে আন্দাজে ও*দের মহল খুঁজে নিল, আন্দাজে আন্দাজেই পেশোয়ার ঘর দেখে একসময় তাঁর প্রিয়তমার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই পেশোয়া বেরিয়ে আসছেন সে ঘর থেকে। ততক্ষণে বেশ আলো হয়ে গেছে চারদিকে, দেখার কোন অসুবিধা হ'ল না, ভাল ক'রেই সে চেয়ে দেখল পেশোয়ার দিকে। দেখে চমকে উঠল রঘুজী। অনেক কিছুই দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিল সে—কিন্তু ঠিক এ দৃশ্য নয়। মানুষের মুখে এক রাত্রে এত পরিবর্তন হ'তে পারে জানা ছিল না তার। বহুদিন থেকেই শীর্ণ ও রুগ্ন দেখছে সে পেশোয়াকে, রক্তহীন ও বিবর্ণ হয়েছে তাঁর মুখ, বেশ কিছু-দিন আগে থেকেই—কিন্তু এমন বিবর্ণতা, এমন শ্রীহীনতা যে চিন্তারও বাইরে। সর্বস্বহারার হতাশা ও দৈন্য কী নিষ্ঠুর ছাপই না এঁকে দিয়েছে সামান্য একটি প্রহরে।

পেশোয়ার দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ছিল, তিনি ওকে দেখতে পেলেন না, কিন্তু পাশ দিয়েই চলে গেলেন বলে রঘুজী ও*র আর্দ্র পল্লব লক্ষ্য করল। কিন্তু বিস্মিত হ'ল না সে। নিজের হতাশা দিয়ে ও'র হতাশার পরিমাণ করতে পারছে সে। যে নারী ও*র এতকালের নিত্য সঙ্গিনী ও সেবিকা ছিল তাকে সে দেখেছে। সে মেয়েকে যে এমন আপন ক'রে পেয়েছে সে এমনি আঘাতই পাবে বৈকি তাকে হারিয়ে। এ তো ক্ষণেকের বিরহ নয়—হয়ত বা চিরকালের মতোই হারানো।

ঠিক সেই তখনই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের কোন চেষ্টা করল না রঘুজী। অকারণে লজ্জা পাবেন হয়ত। একটু সামলে নেবার সময় দিল সে। বাইরের সূর্যালোকে এসে পেশোয়া নিজেই সম্বিৎ ফিরে পেলেন, তাড়াতাড়ি চোখ মুছে মুখের প্রশান্তি ফিরিয়ে আনবারও চেষ্টা করলেন খানিকটা। সেই অবসরে রঘুজী তাঁর সামনে গিয়ে প্রণাম ক'রে দাঁড়াল।

'কে? কী চাও?' রূঢ়, বিরক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন পেশোয়া।

'আমি রঘুজী, ছোট রানীসাহেবার সেবক।'

রঘুজী! নামটা খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে না? ও হ্যাঁ হ্যাঁ—মস্তানীর মুখেই তো শুনেছেন···ছোটরানীসাহেবা—মানে মস্তানী!

চকিতে মনে পড়ে গেল কথাটা। দৃষ্টি কোমল ও প্রসন্ন হয়ে উঠল। ছোট রানীসাহেবা বলাতে যেন একটু কৃতজ্ঞও বোধ করলেন ওর কাছে। বললেন, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মস্তিকে তুমি ভালোবাসো, তাকে তুমি দিদি বলেছ। কিন্তু—কিন্তু বড় অসময়ে এলে যে ভাই। সে তো আর নেই।'

'ছত্রপতি পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে—দিদিকে আর আপনাকে সাতারায় তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। সেইমতো আদেশনামা নিজে হাতে লিখে দিয়ে-ছিলেন। সে চিঠি আমার কাছেই আছে এখনও—দেখবেন আপনি?'

কেমন যেন খাপছাড়া খাপছাড়া ভাবে বলে রঘুজী।

'তাঁর পত্র সকল অবস্থাতেই আমার শিরোধার্য—কিন্তু আর কি হবে এখন সে চিঠি!' হৃদয়াবেগ সংযত ও মনোভাব গোপন রাখার দীর্ঘকালের অভ্যাস সত্ত্বেও, একটা দীর্ঘশ্বাস কিছুতেই চাপতে পারেন না, সেটা ঢাকতেই বুঝি হাত বাড়িয়ে দেন, 'কৈ দেখি সে চিঠি!'

চিঠি পড়তে পড়তে আবারও সেই শুষ্ক কঠিন চোখ বুঝি সজল হয়ে আসে পেশোয়ার. ঝাপ্সা হয়ে আসে দৃষ্টি। চিঠি দুটো মাথায় ঠেকিয়ে বলেন, 'তিনি আমার পিতৃবন্ধু, ওর পিতা। তাঁর উপযুক্ত কাজই করেছেন। তবু এ ঋণ কখনও ভুলব না। হয়ত এজন্মে আর এ ঋণ শোধের অবসর বিশেষ থাকবে না, তাঁকে ব'লো যে এ কৃতজ্ঞতা আর ঋণ সগৌরবে সানন্দে পরজন্ম পর্যন্ত বহন করবে তাঁর সেবক সন্তান বাজীরাও।'

যেন চলে যাবার জন্যই ঘুরে দাঁড়ান—তার পরই মনে পড়ে যায় কথাটা, বলেন, 'দাঁড়াও—তোমার কিছু পুরস্কার প্রাপ্য। আর একটু বিশ্রামের ব্যবস্থাও—'

যেন চমকে শিউরে ওঠে রঘুজী, 'না না না, কোন পুরস্কার আমার প্রাপ্য নেই। হতভাগ্য আমি—একপ্রহর আগে এসে পেঁছিুতে পারলুম না। আমারই দোষ, ঘোড়াটা শেষ মুহূর্তে পাথরে চোট লেগে পা ভেঙ্গে পড়ে গেল, প্রাণপণে দৌড়েও ঠিক সময়ে আসতে পারলুম না।'

হাহাকারের মতো করুণ শোনায় তার কণ্ঠ।

পেশোয়া একটু এগিয়ে এসে—যা কখনও করেন না সামান্য পরিজনদের বেলায়—সস্নেহে ওর কাঁধে একটা হাত রাখেন, বলেন, দোষ আমার ভাগ্যের ভাই, তোমার কোন দোষ নেই। তুমি অনেক কষ্ট করেছ, অনেক চেষ্টা করেছ, পুরস্কার ঠিকই প্রাপ্য হয়েছে তোমার।'

তিনি একটু ইতস্তত ক'রে—আঙরাখার জেবে হাত ঢুকিয়েও টেনে নেন, হাত বাড়ান নিজের গলার প্রবালের মালাটার দিকে।

রঘুজী বোধ করি দুঃখে ক্ষোভে দিশেহারা হয়েই সাহস সঞ্চয় করে শেষ মুহূর্তে। দুহাত জোড় ক'রে বলে, 'প্রভু, মালিক, যদি পুরস্কার দেনই তো, ওসব কোন সম্পদ নয়, আমাকে আমার প্রার্থিত পুরস্কার দিন।'

বিস্মিত হন বাজীরাও। ভ্রূও কুঞ্চিত হয় বোধ করি ঈষৎ। এ ধরনের বাধা পাওয়ায়, উত্তর-প্রত্যুত্তরে ঠিক অভ্যস্ত নন তিনি। তবু কোনপ্রকার বিরক্তি প্রকাশ না ক'রেই বলেন, 'বলো, তোমার কি প্রার্থনা—?'

'আমাকে আজ থেকে আপনার সেবার অধিকার দিন, কাছে কাছে থাকতে দিন আমাকে। শুধু এইটুকু—আর কিছু নয়।'

ছলাৎ ক'রে যেন গরম জল খানিকটা উপ্চে উঠতে চায় কোটরগত চোখের কোলে কোলে। পেশোয়া কি এর সামনেই এই সামান্য মানবজনোচিত দুর্বলতা প্রকাশ ক'রে ফেলবেন শেষ পর্যন্ত! হে ভগবান গণপতি, সে দীনতা থেকে রক্ষা করো অন্তত।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে সামলে নেন নিজেকে। তারপর গাঢ় কণ্ঠে

বলেন, 'কিন্তু ছত্রপতি! তাঁর কাছে ফিরে যাবে না?'

'তাঁর শতসহস্র সেবক আছে; আমার জন্য কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না তাঁর! তাঁর অসীম করুণা, আমার প্রাণরক্ষার জন্যই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁর কোন প্রয়োজনে নয়। আর আপনার সেবা তো তাঁরও সেবা, আপনার কাছে আছি জানলে তিনি খুশিই হবেন।'

আবারও একটা নিঃশ্বাস ফেলেন বাজীরাও, কিন্তু এ নিঃশ্বাস দুঃখের নয়। অস্ফুট কণ্ঠে প্রায় মনে মনে বলেন, 'বুঝেছি মস্তি, তুমি আমাকে ত্যাগ করো নি। তোমারই উদ্বেগ তোমারই দুশ্চিন্তা এর উৎকণ্ঠা আর আগ্রহের রূপ ধরে এসেছে।'

তারপরই এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ক'রে বসেন তিনি। রঘুজীকে দুহাতে টেনে একেবারে নিজের রোগ ও চিন্তা-শীর্ণ বুকে চেপে ধরে বলেন, 'সেবক নয় ভাই, আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু, আমার যথার্থ ছোট ভাই। কিন্তু তবুও বলছি, তুমি সাতারাতেই ফিরে যাও। আমার জন্মলগ্নের বিধি-নির্দেশ, আমার ওপর অভিশাপ,—শেষ সময়ে আমার কাছে আমার কোন আপনজন থাকবে না। আজ আর কেউ আমার আপন নেই দেখছ না! একমাত্র যে ছিল তাকেও হারাতে হ'ল। তুমি থাকলে তোমার হয়ত আবার কোন অনিষ্ট হবে, সে আমি সইতে পারব না। মস্তি তোমাকে যথার্থ ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করে। তুমি ছত্রপতির কাছে থাকো—কে জানে, সেখানে থাকলে হয়ত এখনও তোমার দিদির কোন উপকার হ'তে পারে, তার কোন কাজে লাগতে পারো তুমি। আমার কাছে থাকলে তো তা হবে না।'

তবু রঘুজী ব্যাকুল কণ্ঠে কি বলতে যায়, বাধা দিয়ে ম্লান একটু হেসে বলেন, 'মনে করো এইটেই আমার সেবা। আর যদি তোমার দিদির কোন উপকারে লাগতে পারো—তার চেয়ে আমার প্রিয়সাধন আর কি আছে!'

আর কোন কথারও অবসর থাকে না। একজন রক্ষী ঘোড়া নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ইতিমধ্যে, রঘুজীকে আর কোন উত্তরের অবকাশ না দিয়ে পেশোয়া ঘোড়ায় চেপে বসেন একেবারে।

দেখতে দেখতে তাঁর ঘোড়া অন্য সমস্ত অনুসঙ্গীকে পিছনে ফেলে বহু দূরে এগিয়ে যায়।

॥ ২০ ॥

'জনার্দন!' 'জনার্দন!' চাপা আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেন বাজীরাও।

বালক জনার্দন পথ নিদ্রালু চোখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে—ওঘর থেকে ছুটে আসেন কাশীবাঈ।

'এই যে, এই যে বাপুজী, এই তো আমি।'

'আলো, আলো—আরও আলো জ্বালাও জনার্দন, দিনের আলো ক'রে দাও ঘরে। নইলে—নইলে আর যে আমি পারছি না!'

বিকৃত ভগ্নকণ্ঠে বলেন বাজীরাও। প্রবলপ্রতাপ পেশোয়া প্রথম বাজীরাও। যিনি জলদমন্দ্র কণ্ঠের জন্য বিখ্যাত—তাঁর গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না, কেমন যেন অদ্ভুত রকম ভেঙে গেছে। চেঁচাবার শক্তি নেই—তবু চেঁচাবারই চেষ্টা করছেন প্রাণপণে। ফলে অদ্ভুত শোনাচ্ছে গলাটা নিজের কাছেই, নিজেই ভয় পেয়ে যাচ্ছেন নিজের ক্ষীণ কণ্ঠে।

এইবার নিয়ে তিনবার হ'ল আজ রাত্রে। ক'রাত্রিই হচ্ছে এই রকম। বোধ হয় চারদিন হ'ল পর পর। দিনে রাতে ঘুমোতে পারছেন না একবারও। কী যেন সব বিভীষিকা দেখছেন, দিনের বেলা বলেন ঘরের দরজা জানলা সব খুলে দিতে, রাত্রে বলেন কেবল আলো জ্বালাতে। আরও আলো। সন্ধ্যায় কিছু হয় নি, রাত গভীর হ'তেই শুরু হয়েছে পাগলামি। এইটুকু ঘর—ঘরই তো পাবার কথা নয়, তাঁবুর ছাউনি ফেলে ফেলেই তো বেড়াচ্ছেন। এই কঠিন অসুখটা হবার খবর পেয়ে যখন কাশীবাঈ এলেন, তিনি খোঁজখবর ক'রে এক ব্রাহ্মণের এই বাড়িটা খালি করিয়ে নিলেন তাকে টাকাকড়ি দিয়ে। দুটি মাত্র ঘর এ বাড়িতে, নিতান্তই সাধারণ বাড়ি, ঘরও সাধারণ মাপেরই—দুটি শয্যা পড়ে আর খুবই সামান্য জায়গা খালি পড়ে আছে। পাশের ঘরে কাশীবাঈ আর তাঁর দাসী থাকেন—এছাড়া আর একটুও কোথাও জায়গা খালি পড়ে নেই। নিতান্ত এই বাড়িকে কেন্দ্র ক'রে অসংখ্য স্কন্ধাবার পড়েছে চারিদিকে—শিবিরের নগরী তৈরী হয়ে গেছে তাই রক্ষে, লোকজন, সেবক অনুচর সকলকেই হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে। নইলে এমন বাড়িতে তো একটা দিনও থাকতে পারতেন না মহিষী কাশীবাঈ।

তাও, এই ঘরেও বড় বড় ঝাড়ে বোধ হয় দু'শো বাতি জ্বালানো হয়েছে, অসহ্য তাপে ঘরে থাকাই দায় হয়ে পড়েছে এদের। বালক জনার্দন ঠিক স্নান করার মতো ঘেমেছে; কাশীবাঈয়ের জামাকাপড় ভিজে সপসপ করছে। তবু তিনি তো এ ঘরে থাকছেন না বেশীক্ষণ। তাঁর উপস্থিতিটা যে স্বামীর বিশেষ প্রীতিকর বা সুখকর নয়—তা তিনি জানেন। তিনি তাই পাশের ঘরেই থাকছেন সাধ্যমতো। তবু যা দু'একবার আসতে হচ্ছে তাতেই অসহ অবস্থা। দোর-জানলা সব খোলা আছে, বাজীরাও-এর চোখের সামনের দরজাটা দিয়ে সোজা নর্মদা পর্যন্ত অবারিত খোলা সমস্তটা, তিনি নদীর দিকে চেয়ে থাকতে চান এবং একটু ঠাণ্ডা হওয়া দরকার বলেই ওই দরজার সামনে কোন তাঁবু ফেলতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু তাতেও ঘর কিছুমাত্র ঠাণ্ডা হচ্ছে না। প্রথম বৈশাখের অগ্নিঝরা দিবসের শেষ উষ্ণ নিঃশ্বাসটুকুর মতো মধ্যে মধ্যে এক-আধ ঝলক যা বাতাস আসছে তাও গরম। নইলে প্রকৃতি একেবারে যেন স্থির হয়ে আছে, যাকে বলে নিবাত নিষ্কম্প। এর মধ্যে আবার কোথায় আলো জ্বালা হবে!

কাশীবাঈ কাছে এসে মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'দুশো মোমবাতি জ্বলছে মালিক, এর পর আবার আলো জ্বাললে তো আপনি গরমেই ঘুমোতে পারবেন না! আপনি বরং চোখ বুজুন, আমি বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিই—'

'না থাক। তুমি শোওগে।' কেমন যেন অভিমানহত স্বরে বলেন পেশোয়া, কতকটা বায়নাদার ছেলেমানুষের মতোই, 'আমার এখন ঘুম হবে না, চেষ্টা করলেও। আমি জেগেই থাকব। জনার্দন, ওদের বলো তো এই দরজা থেকে ঐ নর্মদা পর্যন্ত সার সার মশাল জেবলে দিক্—আমি একটু চেয়ে থাকি। অন্ধকার আমার মোটেই ভাল লাগছে না।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কাশীবাঈ এ ঘরে চলে এলেন। আর দেরি নেই, মোটেই দেরি নেই। সকাল থেকেই এই গলাটা ভেঙ্গেছে। বুকে সর্দি বসেছে চেপে—সাঁই সাঁই শব্দ উঠছে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে। এসব লক্ষণ তিনি জানেন। তাঁর পিতামহ যখন মারা যান তখন তিনি খুব ছোট। তবু সব মনে আছে তাঁর। এই সব লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর বেলাতেও। তিনি কালই লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন বিশেষ ফর্মান দিয়ে, ঘোড়ার আর ঘোড়সওয়ারের ডাক বদলে বদলে যাবে, সংবাদ থামবে না কোথাও। খবর পাঠিয়েছেন তিনি দেবর আপ্পাজীর কাছে আর বড় ছেলে বালাজীর কাছে কোলাবায়। এসে পড়ুক তারা, এসে পড়া দরকার—দু'একদিনের মধ্যেই অন্তত। যেন ঠিক সময়ে এসে পেঁছতে পারে—মনে মনে বোধ করি এই সহস্রবারের মতো প্রার্থনা জানালেন ভগবান বিনায়কের কাছে।··

স্বামীর একেবারে এই অন্তিম সময়ে পাশে থাকাই উচিত, সকলেই তাই বলবে। কাশীবাঈও তা জানেন। কিন্তু দুটি প্রবল কারণে থাকতে পারছেন না। প্রথমত তাঁর উপস্থিতি প্রেয় নয় স্বামীর কাছে। স্বামীর এই দশার প্রত্যক্ষ কারণ যা-ই থাক, তার পরোক্ষ অথচ মুখ্য কারণ যারা—তাদের মধ্যে কাশীবাঈও একজন। তাঁর প্রিয়তমা, পুরুষসিংহের উপযুক্ত সিংহিনী, ভারত-ত্রাস পেশোয়া বাজীরাও-এর যোগ্য সঙ্গিনী মস্তানীকে তাঁরা জোর ক'রে সরিয়ে দিয়েছেন পেশোয়ার কাছ থেকে। অজুহাত স্বাস্থ্যের—কিন্তু সে স্বাস্থ্য কি রক্ষা করা গেল আদৌ? বরং বাঁচাতে গিয়ে তো আরও জোর ক'রে ঠেলে দিলেন তাঁরা মৃত্যুর মুখেই। কাশীবাঈ ক'দিন আগে এসে পর্যন্তই—নিজেকে নিজেই স্বামীহন্ত্রী বলে ধিক্কার দিচ্ছেন মনে মনে। যা করবার তা তো করেইছেন, শেষ ক'রেই তো এনেছেন অমিতবীর্য মানুষটাকে—এর পর শেষ সময়টাতে আর অপ্রীতির কারণ ঘটিয়ে লাভ কি?

আরও একটি কারণ আছে ও ঘরে না যাবার।

স্বামীর দিকে চাইতে পারছেন না তিনি।

ঐ যে সূক্ষ্ম চামড়ায় ঢাকা কঙ্কালটা পড়ে আছে—ঐ কি তাঁর সেই ভুবন-মোহন সুন্দর স্বামী? সেই পেশোয়া বাজীরাও, যাঁর রূপের খ্যাতি সারা ভারতে—এই মাত্র বৎসরকতক আগেও আলোচনার বস্তু ছিল। যাঁকে দেখার জন্য মুঘল অন্তঃপুর থেকে শুরু ক'রে নিজামের হারেম পর্যন্ত সমস্ত পুরনারী আকুল হয়ে উঠেছিলেন! যার জন্য অন্তঃপুরিকাদের ঐকান্তিক অনুরোধে স্বয়ং দিল্লীশ্বর বাদশা মুহম্মদ শাহকে সুদূর দাক্ষিণাত্যে শিল্পী পাঠাতে

হয়েছিল এঁর ছবি এঁকে নিয়ে যাবার জন্য। এই সেই দুর্ধর্ষ বীর, দীর্ঘদেহ বিশ্বখ্যাত কান্তিমান্ পেশোয়া বাজীরাও ?

এ যে দেখেও বিশ্বাস হয় না!

চাইতে পারেন না, চাইতে পারছেন না কাশীবাঈ খাটটারদিকে—দিনে রাতে কখনও ভাল ক'রে চেয়ে দেখতে পারেন না। দেখতে গেলেই চোখ জ্বালা করে, দু'চোখে জল ভরে আসে, ঝাপ্সা হয়ে যায় দৃষ্টি।

এ কী হাল হ'ল পেশোয়া বাজীরাও-এর ?

এ কী করলেন তিনি! কী করলেন তাঁরা!

তাঁরা কি প্রকাণ্ড একটা ভুলই ক'রে বসলেন না শেষ পর্যন্ত—তিনি আর শ্বশ্রূমাতা রাধাবাঈ ?

চিরকালের মতো একটা অনুশোচনারই কারণ হয়ে রইল না কি তাঁদের এই কাজ ?

ভাবেন আর নিঃশব্দে ললাটে করাঘাত করেন কাশীবাঈ।

'জনার্দন!' স্খলিত ভগ্ন কণ্ঠ আরও যেন চেপে আসছে ক্রমে ক্রমে। পাশে বসেই শোনা কষ্টকর। গলা কেমন জড়িয়েও যাচ্ছে কথা কইতে গেলে। আরও ক্ষীণ আরও করুণ শোনাচ্ছে কথাগুলো।

তবু জনার্দন শুনতে পায়। সে পাশেই বসে ছিল তার বাপুর, একটা হাত নিজের দু'হাতে ধরে। সে মুখ নামিয়ে পেশোয়ার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'কি বলছেন বাপুজী ?'

'এখন ক'টা বাজল বলতে পারো ?'

'এই মাত্র রাত চারটের ঘণ্টা পড়ল কোথায় বাপুজী, ভোর হবার আর দেরি নেই। পূর্বাকাশ ফরসাও হয়ে এসেছে।'

'এসেছে ? আঃ, বাঁচা গেল! নর্মদার জল দেখতে পাচ্ছ জনার্দন ?'

'পাচ্ছি বাপুজী। মশালগুলো এবার সরিয়ে নিতে বলব ?'

'আর একটু, আর একটু পরে।'

ক্লান্তিতে কিংবা স্বস্তিতে—কিংবা দুই কারণেই—চোখ বুজলেন বাজীরাও।

জ্বরটা কমে আসছে, সর্বাঙ্গে ঘাম দেখা দিয়েছে। আঠার মত চট্‌চটে ঘাম। পা দুটো যেন হিম হয়ে আসছে ক্রমশ। এ সব লক্ষণ জানেন বাজীরাও। টের পাচ্ছেন নিজেই। একটু একটু ক'রে এগিয়ে আসছে মৃত্যু, এগিয়ে আসছে মুক্তি। আর দেরি নেই, এবার সব জ্বালার অবসান আসন্ন! শুধু যদি এই শেষ মুহূর্তে একবার মস্তিকে দেখতে পেতেন—

আঃ! আবার ঐ কথা! তার কথা আর ভাববেন না বলে তিনি যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এ তো শুধু মুক্তির দিনই নয় তার সঙ্গে মিলনেরও দিনও যে। সে বলেছে এজন্মে বা জন্মান্তরে সে ওঁরই, জীবনে মরণে ওঁর সেবিকা। কারও নাকি সাধ্য নেই তাকে ওঁর কাছ থেকে চিরদিনের মতো দূরে সরিয়ে রাখতে পারে—। তবে, তবে তার কথা ভাববেন কেন তিনি ?

অতি কষ্টে আস্তে আস্তে বাজীরাও পাশ ফিরলেন। অথবা বলা উচিত—

এতক্ষণ বাইরের দিকে, নদীর দিকেই পাশ ফিরে শুয়েছিলেন—এবার সোজা হয়ে, চিৎ হয়ে শুলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই ছাদটা নজরে পড়ল। কুৎসিত শ্রীহীন ছাদ। প্রকাণ্ড কাঠের কড়ি দুখানা—কালো রং মাখানো। কড়ি বা দেওয়ালের মধ্যে বড় বড় পাথর বসানো ছাদ। একদা তাতে চুনকাম করা হয়েছিল—কিন্তু এখন কালি ও ঝুলে সে চুনের শ্বেতগরিমা বিলুপ্ত হতে বসেছে। এত কালি ছিল না অবশ্য—এই গত চারদিনেই পড়েছে এটা। এইটুকু ঘরে এত আলো ও মশাল, কালি তো পড়বেই। যারা আসে তাদেরই চোখ জ্বালা করে ধোঁয়ায়—এত ধোঁয়া! সবই জানেন পেশোয়া, তবু আরো আলো জ্বালাতে বলেন। আরো আলো। কেবলই মনে হয়, অন্ধকার হ'লেই সে আসবে, সেই বালক শ্রীপৎ। একটুও অন্ধকার করা চলবে না তাই, কোথাও এতটুকু অন্ধকার রাখা চলবে না।

তবু, তাকে কি আটকাতে পারবেন? সে আসবেই। সে যা যা বলেছিল সবই তো ফলে গেল।

সে বলেছিল, 'এত কাণ্ড ক'রে যে প্রাসাদ তৈরী করছ সে প্রাসাদে শান্তিতে বাস করতে পারবে না কোনদিন। মৃত্যুকালে শেষ নিঃশ্বাসটুকুও ফেলতে পারবে না এখানে। দূর প্রবাসে পরের ঘরে নির্বান্ধব অবস্থায় মরতে হবে। অন্তিমকালে, যারা প্রাণাধিক প্রিয়, তাদের কারও দেখা পাবে না।'

আর বলেছিল, 'আমি যেখানেই থাকি, যে জন্মই নিই আবার, মৃত্যুকালে আমাকে ভুলতে পারবে না। আজ লুকিয়ে রইলে, কিন্তু শেষ সময়ের সেই শান্তি ও সুপ্তি বিঘ্নিত করতে ঠিক এসে হাজির হবো আমি। একটুও শান্তি পাবে না, অব্যাহতি পাবে না অনুতাপের জ্বালা থেকে।'

সেদিন শক্তিমদে মত্ত হয়ে মনে হয়েছিল পেশোয়ার যে কথাগুলো কথার কথা শুধু। মনে হয়েছিল বালকের ব্যর্থ আস্ফালন। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আরও অতটা গ্রাহ্য করেন নি, কারণ তিনি ঠিক দায়ীও তো ছিলেন না ঘটনাটার জন্য। মনে হয়েছিল ঈশ্বর অন্তর্যামী—তিনি সত্যটা উপলব্ধি করবেন। পেশোয়ার মনের কথাটা বুঝবেন অন্তত।

আজ বুঝছেন ঈশ্বর সত্যিই অন্তর্যামী, সত্যটা ঠিকই উপলব্ধি করেছেন। বাজীরাও ঠিক দায়ী ছিলেন না—কিন্তু কাজটা বন্ধ করতে পারতেন। বাধা দিতে পারতেন সেই শেষ সময়েও। না হয় বিলম্বিত হ'ত প্রাসাদের ভিত্তি-স্থাপন। না হয় হ'তই না। কিন্তু একটা নিষ্পাপ নিরপরাধ প্রাণ রক্ষা হ'ত। পেশোয়াকে অমন করে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে মাথা হেঁট করতে হ'ত না।

আজও মনে আছে শ্রীপৎরাও-এর সে দৃষ্টি। একই সঙ্গে কি পরিমাণ বিস্ময় ও বেদনা ফুটে উঠেছিল সরল ডাগর তার দুটি চোখে—যেন বিশ্বাস হ'তে চাইছিল না কথাটা। আর যখন বিশ্বাস হ'ল কী পরিমাণ ধিক্কার ভরে এল সেই দৃষ্টিতেই। নীরব ও নিঃশব্দ ধিক্কার।

সেই প্রথম আর সেই বোধ হয় শেষ, লজ্জাতে মাথা হেঁট করতে হয়েছিল পেশোয়া প্রথম বাজীরাওকে।

আজ সমস্ত স্মৃতি মুছে গিয়ে সেই কটা দিনের কথাই বা এমন ক'রে মনে পড়ছে কেন? এই বিশ বৎসরের বহু বিজয়, বহু গৌরবের অসংখ্য ঘটনা সব যেন লুপ্ত হয়ে গেছে মন থেকে—শুধু সেই দিনটার কথাই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে আরও—

সে কী এই সামান্য গৃহে, পরাশ্রয়ে, এই কণ্টকর শয্যায় শুয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হচ্ছে বলে? তাঁর অত সাধের এবং সকলের ঈর্ষার বস্তু শানওয়ার-ওয়াড়া থেকে এতদূরে এমন দীন-দরিদ্রের মতো এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে বলে?

শানওয়ার-ওয়াড়া—শনিবারের প্রাসাদ। যার খ্যাতি তাঁর মনিব স্বয়ং ছত্রপতি শাহুকে পর্যন্ত বিচলিত করেছিল। তিনি আর কোন যুক্তি না পেয়ে বাদশার দোহাই দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, উত্তর দিক বা দিল্লীর দিকের ফটকটা বাকী থাক, নইলে বাদশা কি ভাববেন! বাদশার গৌরব ম্লান হয়ে যাচ্ছে যে! সেই কারণেই উত্তর দরওয়াজা অসম্পূর্ণ রাখতে হয়েছিল—আজও তেমনি পড়ে আছে সেটা। কিন্তু তা হোক, তবু এমন প্রাসাদ বোধ করি সারা দক্ষিণ ভারতে আর নেই। এ প্রাসাদ শেষ করতে বিপুল ঋণ করতে হয়েছে তাঁকে—কিন্তু তার জন্য অনুতপ্ত নন তিনি। শুধু যদি সেই প্রাসাদে এই শেষ নিঃশ্বাসটা ফেলতে পারতেন।

অবশ্য পারলেন না যে—সেও তো এই প্রাসাদের কারণেই। ঐ প্রাসাদকে সুদৃঢ় করতে, তাঁর বংশের প্রভাবকে চিরস্থায়ী করতেই তো—

আজও মনে আছে কথাটা।

ইচ্ছাটা জেগেছিল বহুদিনই। সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। মনের মতো জায়গাও খুঁজছিলেন। পুণাটাই পছন্দ ছিল মনে মনে—প্রথমত দুটো নদী দু'দিকে, দ্বিতীয়ত কাছেই দুটো বড় বড় দুর্গ—সিংহগড় আর পুরন্দর।

যেদিন দিনটা স্থির করেন, সেদিনটাও শনিবার, বেশ মনে আছে তাঁর। ঘোড়ায় চেপে ঐ দিকটা দিয়ে যাচ্ছিলেন, মুটানদীর ধারে ধারে। একটা পাঠান আমলের ভাঙ্গা প্রাসাদ-দুর্গ ছিল। বহুদিনের দুর্গ—বনজঙ্গল এবং বন্য জন্তুর বাসগৃহে পরিণত হয়েছিল। এ দুর্গ আগেও বহুবার দেখেছেন যাতায়াতের পথে, সেদিন কী হ'ল—সেই দিকেই ঘোড়া চালালেন। প্রাসাদ-দুর্গের ভাঙ্গা ফটক পেরিয়ে ভেতরের প্রাঙ্গণে পড়তেই অকস্মাৎ তাঁর ঘোড়া—এতদিনের শিক্ষিত ও সতর্ক ঘোড়া, এর আগে ও পরে বহু যুদ্ধজয়ের সাক্ষী সে—সম্পূর্ণ অকারণেই পা দুমড়ে পড়ল এবং তিনিও ছিটকে পড়লেন মাটিতে। সৌভাগ্যক্রমে খুব লাগে নি কারুরই। বিরক্ত ও বিস্মিত হ'য়ে হাতে ভর দিয়ে উঠতে যাবেন বিচিত্র এক দৃশ্য চোখে পড়ল তাঁর। না, স্বপ্ন নয়, মায়াও নয়—মতিভ্রম তো নয়ই, সোজা চোখ চেয়েই দেখেছিলেন তিনি—এখানকার বাসিন্দা একটা খরগোশ একটা প্রকাণ্ড কুকুরকে তাড়া করেছে আর সে কুকুর প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছে!

দুটো ঘটনাই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হ'ল তাঁর, মনে হ'ল ভগবান গণপতিরই প্রত্যক্ষ নির্দেশ। অকারণে এইখানকার মাঠে এসে পড়লেন, মানে এই মাটিই তাঁর ভাগ্যদেবতা চিহ্নিত ক'রে রেখেছেন তাঁর জন্য। আর ঐ যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন তার অর্থ এই মাটিতে যে বাস করে বা করবে সে অপরাজেয়। সে সামান্য প্রাণী হ'লেও বৃহত্তর প্রাণীরা তাকে ভয় ক'রে চলবে।

সেই মুহূর্তেই মন স্থির ক'রে ফেললেন।

সেই প্রাচীন দুর্গ আর দু'পাশের দুটি ছোট গ্রাম চেয়ে নিলেন ছত্রপতির কাছ থেকে, তারপর সেই বিপুল জায়গা জুড়ে এই বর্তমান প্রাসাদ উঠল।* বিচিত্র ব্যাপার এই যে—প্রাসাদের স্থান নির্বাচন, বাস্তু যজ্ঞ, গৃহনির্মাণ শুরু এবং শেষ যেদিন হ'ল—প্রত্যেকটাই শনিবার। এ সবই দৈবের যোগাযোগ, পরিকল্পিত কিছু নয়। আরও সেই জন্যই কতকটা তিনি ঐ নাম রেখেছিলেন প্রাসাদের, শনিবারের প্রাসাদ—এবং বোধ করি সেই জন্যেই, গোড়া থেকে শনির দৃষ্টি এসে পড়ল—একদিনের জন্যও সুখ কি শান্তি পেলেন না ঐ বাড়ি হওয়ার পর থেকে।

কিন্তু সেই শনির দৃষ্টি কি তিনিই টেনে আনলেন না বলতে গেলে!

কী কুক্ষণে যে পুরোহিত বিধান দিয়েছিল নরবলি বা জীবন্ত নরসমাধি দেবার, বলেছিল ধরিত্রীদেবতাকে তৃপ্ত করতে হ'লে একটি ব্রাহ্মণ বালকের প্রাণ নিবেদন করতে হবে। বুঝিয়েছিল যে তাকে জীবন্ত সমাধি দিয়ে যক্ষ ক'রে রাখলে সে-ই চিরদিন এই প্রাসাদ পাহারা দেবে, কোন শত্রু কোনদিন ঘেঁষতে পারবে না এদিকে।

সে না হয় মূর্খ, কিন্তু বাজীরাও তো মূর্খ নন! তিনি রাজী হলেন কী ক'রে? এ কী দুর্বুদ্ধিতে পেয়ে বসেছিল তাঁকে? ছি-ছি-ছি, আজও কথাটা মনে হ'লে লজ্জায় মাথা কাটা যায় তাঁর নিজের কাছেই। চিরদিনের মতো রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয় তাঁর। মনে হয় এ গুরুভার বহনের তিনি অনুপযুক্ত, এ আসন তিনি কলঙ্কিত করেছেন।

নিয়তি! নইলে এত ব্রাহ্মণ বালক থাকতে শ্রীপৎকেই বা ওরা ধরে আনবে কেন?

শ্রীপৎও অকস্মাৎই আবির্ভূত হয়েছিল ও'র জীবনে।

সেই ভাঙ্গা দুর্গে—সেই প্রথম দিনটিতেই, মাটিতে পড়বার সময়।

অবাক হয়ে বসে বসে শশক আর কুকুরের বিচিত্র অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখছেন—কে যেন খিলখিল ক'রে হেসে উঠল কোথা থেকে।

কেউ ছিল না এ দুর্গের ধারে কাছে, যখন ফটক পেরিয়ে ভেতরে পা দেন বাজীরাও। তবে এ হাসি কে হাসল? দুর্ধর্ষ বীর বাজীরাও-এরও সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তারপরই চোখে পড়েছিল অবশ্য।

---

* ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রাসাদটি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

একটি দশ-বারো বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে হাসছে। দীন মলিন বেশ, কতকটা চাষীর ঘরের ছেলের মতোই—কিন্তু কানে কুণ্ডল, কপালে চন্দনতিলক এবং খাটো পিরানের মধ্য থেকে যজ্ঞোপবীতটাও দেখা যাচ্ছে।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ।

আরও দেখলেন, ওদিকের পোড়ো ভিটেগুলোর গা ঘেঁষে গোটা দুই-তিন গোরুও চরছে—শীতের তৃণ-শূন্য প্রান্তরে খাদ্যের আশা নেই দেখে গোরুগুলোকে নিয়ে এখানে ঢুকেছে, পোড়ো ভাঙ্গা দেওয়ালগুলোর খাঁজে খাঁজে যে আগাছার জঙ্গল গজিয়েছে, যদি সেখান থেকে খাওয়ার মতো কিছু পায় এই আশায়। গরুগুলো শীর্ণ কঙ্কালসার। ছেলেটাও প্রায় তাই। কোন হতদরিদ্র ঘরের ব্রাহ্মণসন্তান, প্রাণের দায়ে রাখালের বৃত্তি গ্রহণ করেছে।

কিন্তু ওর ঐ বেশভুষা, চেহারা এবং গোরুগুলোর সঙ্গে বর্তমান হাসিটা একেবারেই বেমানান। এ হাসি স্পর্ধিতের হাসি.—সমানে সমানে যেমন হাসি চলে তেমনি। ও ছোকরা কি তাঁকেও ওর সমগোত্রীয় ভাবল নাকি! খুব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন পেশোয়া। কাছে এসে ভ্রূকুটি ক'রে বললেন, 'এই, অত হাসছিস কেন?'

সে-ভ্রূভঙ্গী ও সে-কণ্ঠস্বরে বোধ করি খোদ নিজাম-উল-মুলুকের প্রাণও কেঁপে উঠত, কিন্তু ছেলেটি নির্বিকার। আরও খানিকটা হেসে নিল সে। বলল, 'হাসব না, বা রে! কী রকম বোকার মতো পড়লে তুমি—কোন কারণ নেই, পাথরে ঠোকরও খায় নি তোমার ঘোড়া, স্রেফ বেকুবের মতোই পড়াটা হ'ল তোমার, আর পড়লে তো পড়লে, অত বড় সাজোয়ান লোকটা তাড়াতাড়ি কোথায় উঠে পড়বে, না বেড়ালের মতো দুটো থাবা সামনে পেতে জুলজুল ক'রে চেয়ে বুদ্ধুর মতো বসে বসে খরগোশের খেলা দেখছ! এতে কার না হাসি পায় বলো?'

রাগ হওয়া উচিত ছিল না—কিন্তু বাজীরাও-এর রাগটা বেশী বলেই তিনি যেন অকস্মাৎ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। কোমরবন্ধ থেকে তলোয়ারটা খুলে নিয়ে ভয়ংকর কণ্ঠে বললেন, 'বটে, আমার সঙ্গে দিল্লাগী! আমি বোকা, আমি বুদ্ধু—! জানিস আমি কে?'

ছেলেটা কিন্তু খোলা তলোয়ারেও ভয় পেল না, বলল, 'না—তা কি ক'রে জানব বলো? তবে বিক্রম দেখাবার লোক না পেয়ে, যে বীরপুরুষ একফোটা ছেলের ওপর তলোয়ার ঘোরায় সে আবার বুদ্ধু নয় তো কি! আলবাৎ বুদ্ধু, একশোবার বুদ্ধু! ঘোড়ায় চড়তে জানে না তো প্রথম কথা। নইলে অমন ভাবে পড়তে না। দ্বিতীয়ত তলোয়ার ধরতেও জানে না। যে ধরার মতো ধরতে জানে, সে সমান যোদ্ধা দেখে খাপ থেকে তলোয়ার খোলে—মেয়েছেলে কি ছেলেমানুষ দেখে বীরত্ব ফলায় না।'

যেমন হঠাৎ রক্ত চড়েছিল বাজীরাও-এর মাথাতে, তেমনি হঠাৎই নেমে এল। খুশি হয়ে উঠলেন তিনি ছেলেটার নির্ভয় এবং সত্যভাষণ দেখে। যুক্তি অকাট্য

—তা তাঁকেও মানতে হ'ল মনে মনে। তবু তিনি পূর্ববৎ উগ্রস্বরেই বলতে চেষ্টা করলেন, 'আমি তোমাদের পেশোয়া—এ রাজ্যের শাসক!'

'ও!' ছেলেটা একটা কৃত্রিম সমীহের ভাব আনল মুখে, 'তুমিই পেশোয়া বাজীরাও!...আমি ভেবেছিলুম পেশোয়া বুঝি খুব বীর—এখন তো দেখছি খেলাঘরের সেপাই তুমি!'

'খুব যে লম্বা লম্বা কথা শিখেছিস দেখতে পাই! বামুনের ঘরের ছেলে, লেখাপড়া নেই—চাষার ছেলের মতো গরু চরিয়ে বেড়াচ্ছিস, বড় বড় কথা বলতে লজ্জা করে না! বামুনের ঘরের মান ডোবালি তোরা!'

'ওঃ!' ছেলেটাও সমান তেজে জবাব দেয়, 'তুমি যদি সত্যিই পেশোয়া হও, তুমিও তো ব্রাহ্মণ, তা তুমি ব্রাহ্মণের কোন্ কাজটি করো শুনি? লড়াই ক'রে মানুষ মেরে বেড়ানোই বুঝি বামুনের কাজ, না? আমার ঠাকুর্দা বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর মুখে আমি অনেক শাস্ত্রকথা শুনেছি—যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, দান আর প্রতিগ্রহ, ব্রাহ্মণের এই ছ'দফা কাজ। কোন্‌টা করো তুমি? আর তোমার রাজত্বে ব্রাহ্মণের ছেলে খেয়ে পরে পড়াশুনো নিয়ে থাকতে পারে না, গোরু চরিয়ে খেতে হয়—এ তো তোমারই লজ্জার কথা।'

জীবনে এই প্রথম হতবাক্ হয়ে গেলেন পেশোয়া। অপ্রতিভ তো হলেনই —বিস্মিতও। এ কি কোন দশ-বারো বছরের ছেলের কথা! এ মানুষই তো,—না কোন দেবতা তাঁকে ছলনা করতে এসেছে? তাঁর মুখের রেখাগুলো দেখেই যেন মনের ভাবটা অনুমান ক'রে নিল ছেলেটি। হেসেই বলল, 'আমার অমনি পাকা-পাকা কথা ছেলেবেলা থেকেই। বাড়ীতে আমার বয়সী ছেলে কেউ নেই, আমার দাদারা কাকারা সবাই বড় বড়—তাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে এমনি হয়ে গেছে। তাছাড়া বয়সও যা ভাবছ তা নয়, আমার এখন ষোল বছর বয়স চলছে। আমি বাবার মুখে শুনেছি, তুমি এই বয়সেই লড়াই করতে শিখে গিয়েছিলে। ছত্রপতি শিবাজী এই বয়সে রাজগী শুরু করেছিলেন। আমাকে তো প্রায়ই বকাবকি করেন তাই—বলেন এবার তোর রোজগারপাতি শুরু করা উচিত!'

বাজীরাও প্রসন্ন হয়ে উঠলেন, ছেলেটিকে ভারী ভাল লাগল তাঁর। আরও কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নাম কি ভাই?'

'শ্রীপৎরাও।'

'বাঃ—আমি বাজীরাও, তুমি শ্রীপৎরাও। আমরা দুজনে মিতে, কেমন?'

'দূর, বড়লোকে গরীবে কখনও মিতে হয়! আমার বাবা বলেন, ও তেলে জলে মিশ খায় না। যাই হোক রাগ করো নি আমার ওপর এই ঢের। আমার মুখটা বড় খারাপ, কিছুতেই সামলাতে পারি নে—যেখানে সেখানে যা খুশী বলে ফেলি। বাবা বলেন, এই রোগেই মরবি তুই। তা নেহাৎ মিথ্যেও নয়—এই তো তুমি তলোয়ার উঁচিয়ে কাটতে এসেছিলে আমায়। নেহাৎ লোকটা খুব খারাপ নও বলেই শেষ অবধি ক্ষমা ক'রে নিলে—নইলে কি আর প্রাণটা বাঁচত!'

বাজীরাও এ খোঁচারও কোন জবাব না দিয়ে বললেন, 'তুমি আমার কাছে

কাজ করবে? ফৌজে ঢুকবে?'

'না। ফৌজে ঢুকে লড়াই করার মতো চেহারা নয়, দেখছই তো এই বাঁটকুল—বামন আমি। তা ছাড়া ও ভালও লাগে না। এই বেশ আছি, একা একা বনেজঙ্গলে গরু চরিয়ে বেড়াতে আমার বেশ লাগে।'

'এইভাবেই জীবন কাটাবে?'

'না—এর সঙ্গে একটু পড়াশুনো করতে মন্দ লাগত না, যদি সে সুযোগ পেতুম। এখন এই বয়সে আর পাঠশালে যেতে ইচ্ছে করে না।'

'তুমি কি কিছুই লেখাপড়া জানো না?'

এই প্রথম একটু লজ্জিত হ'ল শ্রীপৎরাও। মাথা নামিয়ে বললে, 'না জানার মতোই। বাবার কাছে শিখতে পারতুম কিন্তু মনও ছিল না খুব। পাঠশালায় দেবেন এমন অবস্থা ছিল না বাবার। এখন দাদা ছত্রপতির দপ্তরে তশীলদারী কাজ পেয়েছেন, তা তাঁরও খুব বড় সংসার, তবু একসঙ্গে আছি বলে চলে যায়। কিন্তু এখন আবার নতুন করে পুঁথি খুলে পড়তে বসতে লজ্জা করে।'

'তা ফৌজে না হয় না কাজ নিলে, আমার কাছে অন্য চাকরি করবে? সংগে সংগে থাকবে, ফায়-ফরমাশ খাটবে?'

একটু যেন কি ভেবে নিয়ে বলল শ্রীপৎরাও, 'ফায়-ফরমাশ খাটা মানে চাকরের কাজ!···অবশ্য তুমি ব্রাহ্মণ তায় রাজা—তাতে দোষ ছিল না খুব, কিন্তু কী জানো, আমার ইচ্ছে করে না ঠিক। যতই তোমার সংগে থাকি, দাঙ্গা-লড়াইয়ের মধ্যে যেতে হবে তো—চারিদিকে মানুষ মরবে, জখম হয়ে কাতরাবে—এসবও সহ্য করতে হবে। নাই-বা গেলুম।'

বাজীরাও আবারও বিস্মিত হলেন। বললেন, 'তা তুমি এই ভাংগা কেল্লার জংগলে গোরু চরাতে আসো, তোমার ভয় করে না? আর কিছু না হোক বাঘ-ভাল্লুক তো আছে!'

'তা আছে। তবে কৈ, আমাকে তো কেউ কিছু বলে নি এতকাল। একবার একটা ভাল্লুক তেড়ে এসেছিল, আমি তরতরিয়ে গাছে উঠে গিয়ে ইয়া বড় একটা পাথর ছুঁড়ে মারতেই ঘায়েল হয়ে গিয়েছিল। বাঘ আছে শুনেছি, দেখি নি কখনও।'

'ভূতের ভয় করে না?'

'ও মা, আমি না ব্রাহ্মণ! গলায় না আমার পৈতে আছে! ভূতকে আমার কী ভয়?'

'তা বটে। ভূত মানুষ কাউকেই তোমার ভয় নেই। তুমি নিজেই অদ্ভুত! না, তোমার সুখ-শান্তিকে বিঘ্নিত করতে চাই নে। আমার কাছে চাকরি নিলে তুমি সুখী হবে না—বেশ বুঝতে পারছি। তা তোমার দেখা পাব তো মধ্যে মধ্যে—এখানে এলে?'

'নিশ্চয়ই পাবে। আমি তো প্রায়ই এখানে আসি গোরু নিয়ে। বেশ হবে কিন্তু দেখা হ'লে—তুমিও বেশ লোক, তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'···

দেখা হয়েও ছিল কয়েকবার।

বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল এই দুই অসমবয়সী মানুষের।

পুরাতন দুর্গ ভাঙ্গা, গ্রাম দুটো নিশ্চিহ্ন করা—এসব কাজে কম সময় লাগে নি। বার বারই যেতে হয়েছে বাজীরাওকে। আর যখনই গেছেন খোঁজ ক'রে শ্রীপৎকে ডাকিয়ে এনেছেন। গল্প-গুজব করেছেন. নানা প্রসঙ্গ আলোচনাও করেছেন। ছেলেটির কথা শুনলে মনে হ'ত ও'র, কোন বালকের দেহে পাকা মাথা বসানো হয়েছে। অনেক সময় খুব ভাল পরামর্শও পেয়েছেন তার কাছ থেকে। এই বয়সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা ছেলেটির। দেখেছে অনেক। বুঝেছে আরও বেশী।

শ্রীপৎরাও অবশ্য এই দুর্গ ভাঙ্গা এবং গ্রামবাসীদের উৎখাত করায় খুশী হয় নি। যদিও বাজীরাও সমস্ত গ্রামবাসীকেই আগের অনুপাতে বেশী বেশী জমি দিয়ে বসত করিয়েছিলেন গ্রামান্তরে, শ্রীপতের বাবাকে বহু জমি ব্রহ্মোত্তর হিসেবে দান করেছিলেন—তাঁর প্রাপ্য ছাড়াও। তবু শ্রীপৎ খুশী হয় নি, কারণ এই নির্জন ভাঙ্গা দুর্গে তার যেন কোথায় একটা আশ্রয় ছিল, সেটাই নষ্ট হয়ে গেল। সে বলত, 'তোমার উৎপাতে জঙ্গলই তো রইল না, গোরু ছাগল চরবে কোথায়? খাবে কি ওরা?'

'কেন, একটু কষ্ট ক'রে শহরের বাইরে গেলেই তো দেদার জঙ্গল! তোমরা আসলে কুঁড়ে. নড়তে চাও না তাই।

'ওগো মশাই, তা নয়। এই ভাঙ্গা কেল্লায় আগাছা জন্মাত সেগুলো থাকে অনেক দিন—তোমাদের এই পাথুরে দেশে, মাঠে ক'দিন বা ঘাস থাকে। বৈশাখ মাসে গোয়ুগুলো টাঙিয়ে থাকে একেবারে!'

বাজীরাও হেসে বলতেন, 'বা রে, তা হ'লে বলো তোমার গোরু চরাবার জন্যে বড় বড় কেল্লা কতকগুলো গড়ে আবার ভেঙ্গে দেওয়া যাক। তবে আগাছা জন্মাবে, তবে গোরু খাবে···। কেন, নদীর পাড়ে তো আগাছা থাকে ঢের—সেখানে যেতে পারো না?'

'তাই যেতে হবে এবার থেকে। তবে দ্যাখো, কেল্লা কাউকে কষ্ট ক'রে ভাঙ্গতে হয় না—ভগবানই ভেঙ্গে দেন। যে যখন খুব মাথা তোলে সে তখন বড় বড় বাড়ি করে—কেল্লা বানায়। তারপর? সে বংশের পতন হয়—সে বাড়িরও জেল্লা থাকে না, পরে যারা থাকে তাদের বাড়ি সারাবার পয়সা জোটে না।···তোমার এই নতুন প্রাসাদই বা কতকাল থাকবে? বড় জোর তিন পুরুষ কি চার পুরুষ—এই তো?

আবার বলেছিল, 'দ্যাখো, এই ভাঙ্গা কেল্লাটায় গোরু চরাতে চরাতে আমার কেবল মনে হ'ত—এখানেই আমি একদিন মরব। মাকে বলেছিলুম—তা মা বলেছিল সেই অপঘাতে মৃত্যুই তোর অদৃষ্টে আছে। সাপের কামড়ে কি বাঘের মুখেই যাবি তুই। তা তুমি আমার মৃত্যুর জায়গাটাই ঘুচিয়ে দিলে!'

'ভালই তো হ'ল—অমর হয়ে থাকবে তুমি।' রসিকতা ক'রে বলেছিলেন বাজীরাও।

তারপর অবশ্য দেখাও হয় নি বহুকাল। এ গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার পর যোগাযোগ করাও মুশকিল হয়ে পড়েছিল। তাদেরও নতুন জায়গায় বাড়ি তোলা, নতুন জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা—কাজ বেড়ে গিয়েছিল অনেক। শ্রীপৎরাওকে ব্যস্ত থাকতে হত।

এদিকে পুরনো কেল্লা নিশ্চিহ্ন হয়ে নক্সা-জরীপ মাটি খোঁড়া পর্যন্ত হ'য়ে গেল। ভিত্তিস্থাপনের দিন এল। ধরিত্রী মাতার পুজো ক'রে গাঁথুনি শুরু হবে। এমন সময় ও'দের পুরোহিত এই প্রস্তাবটি করলেন। ধরিত্রী মাতাকে খুশী করতে একটি জীবিত প্রাণী নিবেদন করতে হবে—বলি দিতে হবে। আর তা যখন হবেই, যদি একটি তরুণ ব্রাহ্মণকুমারকে নিবেদন করা যায় তো তার আত্মা চিরদিন যক্ষ হয়ে ঐ পুরী পাহারা দেবে—কোনদিন কোন শত্রু এতে প্রবেশ করতে কি মহামান্য পেশোয়ার বংশকে উচ্ছেদ করতে পারবে না।

বলা বাহুল্য, পেশোয়া প্রথমটা কিছুতেই রাজী হন নি। শিউরে উঠে-ছিলেন প্রস্তাবটা শুনে। মানুষের প্রাণ তাঁর কাছে কিছু নয়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে মারা কিংবা অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া এক জিনিস আর নিজের স্বার্থের জন্য একটা নিরপরাধ লোকের প্রাণ নেওয়া অন্য জিনিস। না, সে তিনি পারবেন না। কিছুতেই না।

অনেক বোঝালেন তাঁকে বংশের তান্ত্রিক সাধক-পুরোহিত। বোঝালেন রাধাবাঈকেও। তাঁকে দিয়েও বলালেন। এ সব ক্রিয়া চলেই আসছে। এতে নাকি দোষ নেই তত। তাঁদের বংশে নাকি এ প্রথমও নয়।

পেশোয়া তবুও ঠিক পূর্ণ সম্মতি দিতে পারেন নি, নিষেধই করেছিলেন। কিন্তু, আজ স্বীকার করছেন—মনের অগোচর পাপ নেই, শেষ পর্যন্ত ঠিক অতটা জোর আর ছিল না সে নিষেধে।

পুরোহিত আর তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসাও করেন নি। গোপনে ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছিলেন। লোক পাঠিয়ে একটি ব্রাহ্মণ বালক ধরিয়ে আনালেন, তারপর যথারীতি ভিত্তিপুজোর আগের দিন রাত্রে নানা অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াদি ক'রে সেই হাত-পা-মুখ বাঁধা কিশোর ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ বালককে ধরিত্রীদেবতার কাজে নিবেদন ক'রে জীবন্ত সমাধি দেবার ব্যবস্থা করলেন।

বাজীরাও খবর পেয়েছিলেন একবারে শেষ মুহূর্তে, শ্রীপৎরাওকে চিনতেও পেরেছিলেন—কিন্তু সে হত্যাকাণ্ডে বাধা দিতে পারেন নি। চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পুরোহিত এবং অন্যান্য হিতাকাঙ্ক্ষীরা ভয় দেখালেন—দেবতাকে উৎসর্গ করা জিনিস ফিরিয়ে নিলে বংশের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অসহায় নিরুপায় বাজীরাও ছুটে চলে গিয়েছিলেন সেখান থেকে। দেখতেও পারেন নি, বাধা দিতেও না।···

শ্রীপতের বাবা খবর পেয়েছিল অনেক পরে।

অন্তত পাঁচ-ছ'দিন কেটে যাবার পর।

যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বুক-ফাটা হাহাকার আজও মনে পড়লে বাজীরাও অস্থির হয়ে ওঠেন। সে কলঙ্ক এবং সে লজ্জা কখনও ভুলবেন না তিনি।

'পেশোয়া মহারাজ! এ কী করলেন, এ কী করলেন আপনি! সে যে আপনাকে কত ভালবাসত, সাক্ষাৎ বিনায়কের অবতার বলে ভাবত, আপনি এই কাজ করলেন!'

লজ্জিত পেশোয়া শ্রীপৎরাও-এর বাবাকে আরও জমি এবং আরও অর্থ দিতে চেয়েছিলেন, সে নেয় নি। এর আগে বরং যা নিয়েছিল তাও ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিল—করতও, যদি না পেশোয়া তার দুটি হাতে ধরে ক্ষমা চাইতেন। অনুতপ্ত পেশোয়ার সজল চোখের দিকে চেয়ে কোমল হয়ে এসেছিল তার মন—ক্ষমা করেছিল সে। কিন্তু তবু সন্তানের জীবনের মূল্য অর্থে বা জমিতে উশুল দিতে রাজী হয় নি কোনমতে।

আরও অনেক কিছু করেছিলেন পেশোয়া। নিজে অশৌচ গ্রহণ ক'রে নদীতীরে বসে শ্রীপৎরাও-এর শ্রাদ্ধ করেছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রচুর স্বর্ণ, ধেনু, তিল ও কাঞ্চন দান করেছিলেন ব্রাহ্মণদের। শাস্ত্রে যা যা বিধান পেয়েছিলেন প্রায়শ্চিত্তের, সবগুলোই পালন করেছিলেন। এতেই তাঁর অপরাধ ধুয়ে মুছে গেল।

কিন্তু আজ বুঝছেন যে তা যায় নি।

আজ বুঝছেন যে কোন কোন প্রাণের মূল্য অনেক। অনেক কিছু দিয়ে সে মূল্য শোধ করতে হয়।

শ্রীপৎরাও-এর এ অভিশাপের কথা শুনেছিলেন তিনি বেশ কিছু দিন পরে। ভয়ে তাঁকে বলে নি কেউ। মুখ এবং হাত-পা বাঁধা ছিল বলে আগে সেও কিছু বলতে পারে নি। নদীর ধারে সন্ধ্যার সময় পর্যন্ত সে গোরু চরায়—দেখে রেখেছিল পেশোয়ার লোক। ব্রাহ্মণকুমার, ব্রহ্মচারী, ষোল বছর বয়স—ঠিক ঠিক মিলে গিয়েছিল। ধরাও সহজ—নির্জন নদীতীর থেকে। এই ভেবে ওর সন্ধানেই ছিল তারা। জানত না পেশোয়ার সঙ্গে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালকের যোগাযোগের কথাটা। নদীতীর থেকে সেই দিনই বেঁধে এনেছিল তারা, সন্ধ্যার অন্ধকারে অতর্কিতে ধরে এনেছিল, একটা শব্দ করার পর্যন্ত সুযোগ পায় নি। কিন্তু উৎসর্গ করার আগে দেবীর প্রসাদ ও নির্মাল্য মুখে দিতে হবে বলে, একবার মুখটা খুলতে হয়েছিল ; সেই সময়ই চিৎকার ক'রে উঠেছিল সে, বলেছিল, 'সে বিশ্বাসঘাতক, সেই বেইমানটা কোথায় গেল ? সেই মিথ্যুক ব্রাহ্মণটা! এই মনে ছিল বলে বুঝি আমার সঙ্গে অত ভাব জমিয়েছিল। সেই জন্যে বুঝি অত জমি আর টাকা দিয়েছিল বাবাকে ? কিন্তু রাজা সে, ব্রাহ্মণ—মিথ্যা কথা বলল কেন ? তার দরকার আমাকে বললে আমি তো স্বেচ্ছায় এসে প্রাণ দিতে পারতুম। তাকে যে আমি ভালবেসেছিলুম। সে এত ছোট হয়ে গেল কেন!'

তারপর, মুখে প্রসাদ গুঁজে দেবার ফাঁকে ফাঁকে ঐ কঠোর অভিশাপগুলো দিয়েছিল। আরও বলেছিল সে, 'চক্ষুলজ্জায় পালিয়ে বেড়ালেই বুঝি এর দায়

এড়িয়ে যাবে মনে করেছে সে ? হায় রে বুদ্ধি ! এ দায়ে অব্যাহতি নেই তার —তাকে বলে দিও। মিত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোনক্রমেই ক্ষমা করবেন না ঈশ্বর। পার পাবে না কোনমতেই। এর দাম তাকে কড়ায়-ক্রান্তিতে শোধ করতে হবে !'…

অপরাজেয় ভারত-ত্রাস পেশোয়া বাজীরাও যেন হাঁফিয়ে ছটফট ক'রে উঠলেন একবার, 'শ্রীপৎরাও, শ্রীপৎরাও, বন্ধু আমার—অনেক দাম তো দিলুম জীবন-ভোর, এখনও কি প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না ? এখনও পারলে না আমাকে ক্ষমা করতে ?'

তিনি যথাসাধ্য চেঁচিয়েই বললেন হয়ত—কিন্তু কেউই কিছু বুঝল না, শুধু অস্থিরতাটা লক্ষ্য করল। জনার্দন আবারও কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'কিছু বলছেন বাপুজী, কিছু বলতে চান কাউকে ? যাকে ডেকে দেব ?'

'না, না। আর কাউকে দরকার নেই। এবার ছুটি পেয়ে গেছি আমি। শ্রীপৎরাও ক্ষমা করেছে আমাকে। অভিসম্পাৎ ফলে গেছে তার অক্ষরে অক্ষরে, আর তো তার কোন অভিযোগ থাকতে পারে না। খুশী হয়েছে সে, তৃপ্ত হয়েছে। হেসে ভগবানের নাম শুনিয়ে চলে গেল এইমাত্র। আর না। এবার আমি ঘুমোব। আলোগুলো নিভিয়ে দাও জনার্দন, দেখছ না সব অন্ধকার কেটে গেছে। প্রভাতের আলো ফুটে উঠেছে চারিদিকি। হে বিনায়ক ভগবান !'

সত্যিসত্যিই যেন আরাম ক'রে পাশ ফিরে শুলেন বাজীরাও, আর মনে হ'ল আস্তে আস্তে ঘুমিয়েই পড়লেন এবার।

॥ ২১ ॥

রাজপুরোহিত একটু কাশলেন একবার, কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নেবার চেষ্টা করলেন ; বার-দুই পর পর উত্তরীয় প্রান্তে ললাটের স্বেদস্রোত মুছলেন—সম্পূর্ণ বৃথা প্রয়াস জেনেও, কারণ যে স্রোত উপস্থিত সকলের ললাটেই অবিরল ধারে প্রবহমান, রাজপুরোহিতের তো আরও—বার বার মুছেও বিন্দুমাত্র বিরতি মিলছে না, উত্তরীয়টাই ভিজে উঠছে শুধু ; তবু খানিকটা অবসর—কিছুটা বা সাহস সঞ্চয়ের জন্যই যেন সেটা প্রয়োজন ; এর মধ্যেই কয়েকবার ক্রমান্বয়ে ডান থেকে বাঁ এবং বাঁ থেকে ডান পা বদল ক'রে নিচের উত্তপ্ত উপল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছেন, পা জ্বলে যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরেই—নর্মদার সেই উপলাস্তীর্ণ তীরভূমিতে এমন এতটুকু শষ্পাশ্রয় নেই যার উপর দাঁড়িয়ে পায়ের জ্বালা নিবারণ করতে পারেন—কিন্তু এ সবই করছিলেন অন্যমনস্কভাবে, হাত-পাগুলো আপনাআপনিই কাজ ক'রে যাচ্ছে যেন—তার সঙ্গে তাঁর মনের কোন যোগ নেই। মন তখন দ্রুত চিন্তা ক'রে যাচ্ছে, অপ্রিয় কর্তব্য থেকে অব্যাহতি লাভের চিন্তা, অধিকতর অস্বস্তি থেকে মুক্ত হবার চিন্তা—এ সব সামান্য দৈহিক ক্লেশ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় সেটা নয়, সে অবসর আর নেই। যাহোক কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে, অবিলম্বে—সত্বর। এদিকে যত দেরি হবে ওদিকে

তত এই ক্লেশ এই দাহ বিলম্বিত হবে।

সুতরাং—যা করতে হবে, এখনই।

রাজপুরোহিত আবারও একবার কাশলেন, মাথা চুলকোলেন, তারপর ডাকলেন, 'মা!'

কিন্তু কাশীবাঈ নির্বাক। তিনি একদৃষ্টে একদিক পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—স্থির নিস্তব্ধ হয়ে।

না, স্বামীর চিতার দিকে নয়, তাঁর দৃষ্টি সে চিতা পেরিয়ে নর্মদার উপলাহত স্রোতোরেখার ওপর নিবদ্ধ। নিদাঘের উপবাস-শীর্ণা নর্মদা যেখানে ছোট ছোট পাথরে ঘা খেয়ে ছোট ছোট অসংখ্য ঢেউয়ে ভেঙ্গে পড়ছে, সহস্র সহস্র হীরক-খণ্ডের মতোই প্রতিবিম্বিত সূর্যরশ্মি সহস্রদিকে বিচ্ছুরিত ক'রে চোখ ধাঁধিয়ে। সে আলো নিশ্চয় মহিষীর চোখেও তীক্ষ্ন সূচাগ্রভাগের মতো এসে বিঁধছিল, কিন্তু তা বিঁধলেও সে অনুভূতির কোন বাহ্য চিহ্ন কোথাও প্রকাশ পাচ্ছিল না, তাঁর মুখে বা চোখে। পাথরের মতোই ভাবলেশহীন তাঁর মুখ, নিষ্পলকশূন্য তাঁর দৃষ্টি।

সত্যিই কি পাথর হ'য়ে গেছেন কাশীবাঈ?

নইলে কিছুই আজ তাঁকে বিচলিত করতে পারছে না কেন? বৈশাখ-মধ্যাহ্নের নিষ্করুণ সূর্য প্রখর রৌদ্রে অগ্নি-বৃষ্টি করছেন চারদিকে, সে অগ্নি মাথায় পড়ে যেমন প্রদাহের সৃষ্টি করছে, তেমনি পায়ের নীচের পাথরগুলোকেও তাতিয়ে তপ্ত কটাহের মতো অসহ ক'রে তুলেছে। সত্য বটে এ তাপ উপেক্ষা ক'রেই আজ এই নিভৃত নদীতীরে সকাল থেকে সহস্র সহস্র লোক এসে সমবেত হয়েছে, তাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য—এবং তারা এখনও পর্যন্ত দাঁড়িয়েই আছে দুঃখে, শোকে ও এই ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত স্তব্ধ হয়ে, কেউই ফিরে যায় নি তাদের শান্ত ছায়াচ্ছন্ন গৃহকোণে—কিন্তু তারা তো সকলেই দুঃখ-কষ্টে অভ্যস্ত, নিদাঘের খররৌদ্রও তো তাদের কাছে অপরিচিত নয়, তারা বেশির ভাগই দরিদ্র কৃষিজীবী, নয়তো যুদ্ধজীবী,—শ্রমজীবী সকলেই। মহিষী কাশীবাঈয়ের মতো ভোগে ও বিলাসে, সুখে ও প্রাচুর্যে অভ্যস্ত রাজান্তঃপুরবাসিনী কেউই নয় তারা। তবু তো তারাও এই রাজ পুরোহিতের মতো ক্ষণে ক্ষণে পা বদলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে অপর পা-কে মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি দেবার চেষ্টা করছে, মুহুর্মুহু উত্তরীয়ে স্বেদমোচন করছে—কেউ বা সেইগুলো ঘুরিয়েই একটু হাওয়া খাচ্ছে। অর্থাৎ তাদের যে কষ্ট হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে—? রানী কেমন ক'রে সহ্য করছেন এই কষ্ট, তাঁর কি অনুভূতি বলে আর কিছু নেই?…

রাজপুরোহিত আবারও কেশে, গলা সাফ ক'রে ডাকলেন, 'মা!'

এবার গলার স্বর একটু উচ্চগ্রামে তুলেছেন তিনি—সব সঙ্কোচ দূর ক'রেই।

আর বোধহয় সেই জন্যই, সে স্বর পৌঁছেও গেল রাজমহিষীর কানে, তাঁর মস্তিষ্কে। এবার তিনি মুখ ফেরালেন, চোখ দুটি দূর নর্মদা স্রোত থেকে তুলে এনে নিবদ্ধ করলেন রাজপুরোহিতের মুখের ওপর।

'কিছু বলছেন ত্র্যম্বকজী ?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কাশীবাঈ।

'হ্যাঁ মা। বলছিলাম,—মানে, দেরি হয়ে যাচ্ছে তো, বালাজীও ছেলেমানুষ, তার দৈহিক ও মানসিক অবসাদ বোধহয় সহ্য শক্তির শেষ সীমায় এসে পেঁছেছে, আর বোধ হয় দেরি করা সঙ্গত নয়—এবার—'

একটু—সামান্য একটু অসহিষ্ণুভাবেই বললেন কাশীবাঈ, 'কিন্তু দেরিই বা আপনারা করছেন কেন—কার জন্য, কী জন্য!'

ঠিক যত সহজে তিনি প্রশ্ন করলেন, তত সহজে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় ত্র্যম্বকজীর। তিনি বিষম বিব্রত বোধ করলেন, তাঁর মুণ্ডিত মস্তক ও ললাটের স্বেদধারা বেড়ে গেল আরও।

অথচ দেরি করারও আর সময় নেই। মহিষী প্রশ্ন করেছেন—মহামান্য পেশোয়ার পট্টমহিষী, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি। মুহূর্তকয়েকের বেশী বিলম্ব করাটা অশোভন শুধু নয়, অপরাধ।

'মা—আপনি তো সবই জানেন—আপনাকে স্মরণ করাতে যাওয়াই আমাদের ধৃষ্টতা।···আমাদের যা প্রথা—কোনটা তো আপনার অবিদিতও নেই—।···মানে—মহামান্য পেশোয়ার শেষকৃত্য সম্বন্ধে আপনার কোন আর নির্দেশ নেই তো ?'

প্রশ্ন ক'রে মাথা হেঁট করলেন ত্র্যম্বকজী, উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলেন। মহিষীর কাছেই উত্তর চান তিনি—কিন্তু তবু তাঁর চোখের দিকে চাইবার যেন সাহস নেই।

'নির্দেশ ?' বিহ্বলভাবে পাল্টা প্রশ্ন করেন কাশীবাঈ। তাঁর কিছু পূর্বের স্তম্ভিত বিহ্বলতাই আসলে হয়ত কাটে নি তখনও পর্যন্ত—কোন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত তাঁর মাথায় ঢুকছে না।

'কী বিষয়ে আমার নির্দেশ আপনি আশা করেন ত্র্যম্বকজী ?' একটু থেমে আবারও জিজ্ঞাসা করেন কাশীবাঈ।

আর না বললে নয়। তবু শেষ মুহূর্তেও যেন একটু ইতস্ততঃ করলেন ত্র্যম্বকজী, যদি শোকাচ্ছন্নতার কুয়াশা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক স্থির-বুদ্ধি ফিরে পান মহিষী—সেই আশায়।

কিন্তু কিছুই হ'ল না। বরং অসহিষ্ণুতার চিহ্নস্বরূপ ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল কাশীবাঈ-এর ললাটে। তখন প্রায় মরীয়া হয়েই বলে ফেললেন ত্র্যম্বকজী, 'বলছিলাম কি মা, মহামান্য পেশোয়ার চিতাতে তাহলে এইভাবেই—যেমন সাজানো আছে তেমনি অগ্নিসংযোগ করা হবে তো—? মানে আর কোন রদ-বদলের সম্ভাবনা নেই—?'

'রদ-বদল ? আর কি রদ-বদল হতে পারে ?···আপনার বক্তব্যটা একটু খোলসা ক'রে বলুন ত্র্যম্বকজী, আজ আর ঠিক আপনার রাজনীতিক ভাষার প্যাঁচগুলো মাথাতে ঢুকছে না!'

কাশীবাঈ-এর কণ্ঠে বিরক্তি আর চাপা থাকে না।···

ত্র্যম্বকজী প্রমাদ গণেন। এ বিরক্তি এ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে।

এ বড় কঠিন ঠাঁই। এ কণ্ঠস্বরের সামনে অত বড় বীর রাজনীতিক বাজীরাও পেশোয়াও সংকুচিত হয়ে পড়তেন, তা বহুবার ত্র্যম্বকজী নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন। এই কিছুদিন আগেও তো—। হয়ত এতটা সমীহ না করলে স্ত্রীকে —আজ এই চিতাশয্যা রচনারই প্রয়োজন হ'ত না। আরও ঢের দিন বাঁচতে পারতেন বাজীরাও।

তিনি তাড়াতাড়ি আরও কুণ্ঠিতভাবে হ'লেও আরও স্পষ্টভাবে বললেন, 'মহামান্য পেশোয়া তা হ'লে একাই পরপারের উদ্দেশে যাত্রা করবেন তো—মানে আর কেউ—'

বলতে বলতে থেমে যান আবার। কেমন যেন একটু উৎকণ্ঠিতভাবেই প্রতীক্ষা করেন ওপক্ষের উত্তর বা প্রতিক্রিয়ার।

'একা যাত্রা করবেন—তা-তার মানে ?'

প্রশ্ন করেন একটু অবাক হয়েই, কিন্তু কথাগুলো বলতে বলতেই যে উত্তরটা তাঁর কাছেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে সেটা বোঝা যায় শেষের দিকে কথাগুলো গলাতে জড়িতে গিয়ে থেমে আসায়।

'ও, আপনি সহমরণের কথা বলছেন ?'

ত্র্যম্বকজী আর উত্তর করেন না। আর কিছু বলবার নেই তাঁর। এটুকুও বলার প্রয়োজন ছিল না। কথাটা এঁদেরই ভাবার কথা, বলার কথা, আলোচনা করার কথা। তাঁকে যে বলতে হ'ল সেটা এঁদের পক্ষেই ত্রুটি বলে গণ্য হওয়া উচিত। যাই হোক—আর যখন কোন অস্পষ্টতা নেই ওঁদের মনে, তখন আবার কেন কথা কইতে যাবেন ?

কিন্তু কাশীবাঈও তখনই কোন উত্তর দিতে পারেন না। আবারও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কঠিন দৃষ্টিতে একটা বিহ্বলতা ফুটে ওঠে। বিহ্বলতা—সেই সঙ্গে একটা অসহায় ভাবও। চারিদিক থেকে শিকারীর দল ঘিরলে হরিণীর চোখে যে অসহায়তা ফুটে ওঠে—হয়ত তেমনিই।

ঠিক এই প্রশ্নটাই এতক্ষণ ধরে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন তিনি প্রাণ-পণে। নিজের মনের কাছ থেকে, বিবেকের কাছ থেকে সরে সরে যাবার চেষ্টা করছিলেন।

ভাবছেন তিনি এই দুদিন ধরেই। সংবাদটা শোনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নটা জেগেছে তাঁর মনে—সেই থেকে একবারও সম্পূর্ণভাবে তাঁর মনের বাইরে যায় নি। এ প্রশ্ন উঠবেই—তা তিনি জানেন। অবশ্য তাঁর শাশুড়ীও সহমরণে যান নি, দিদিশাশুড়ীও না। উত্তম নজীর আছে এ বংশে—তিনি না গেলে কেউই কিছু বলতে পারবে না।

তবু—

প্রশ্নটা থেকেই যায়। ঐ যে অগণিত লোক নিস্তব্ধ হয়ে চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রিয় পেশোয়ার চিতাশয্যার দিকে চেয়ে—তাদের মনেও হয়ত এই প্রশ্নটাই তখন অগ্রগণ্য। মহামান্য পেশোয়া বাজীরাও-এর মতো বীর, তাঁর মতো অরাতিদমন শিষ্টপালক জননেতা প্রায় সারাজীবনব্যাপী কঠোর শ্রমের পর

এই অল্প বয়সে পরলোক-যাত্রা করবেন একা—সেখানে তাঁর পরিচর্যা করার জন্য, সেবা করার জন্য কেউ যাবে না ? এ যে রীতিমতো অকৃতজ্ঞতা, পরলোক-গত বীরের প্রতি অবিচার !……

প্রাণের মায়া ? না, মোটেই না। নিজের মনকেই জোর ক'রে ধমক দেন কাশীবাঈ। প্রাণের মায়া তাঁর এত নয়। স্বামীর প্রতি অভিমানেও এই অবশ্য-কর্তব্য থেকে বিরত হচ্ছেন না তিনি। অভিমান করলে তিনি করতে পারতেন, কেউ দোষ দিতে পারত না তাঁকে। তাঁর স্বামী—উদার, বীর, বিবেচক, ন্যায়পরায়ণ, রাজ্যেশ্বর স্বামী—অপর সমস্ত মানুষের পাত্রে বিবেক-বিবেচনা, ন্যায়পরায়ণতা নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছিলেন, একটি মানুষের কথা খালি তাঁর মনে ছিল না। নিজের বিবাহিতা ধর্মপত্নীর কথাই ভুলে গিয়েছিলেন শুধু। যে স্ত্রী জীবনে কখনও তাঁকে প্রতারণা করে নি, কখনও তাঁর প্রতিকূলতা করে নি —চিরকাল যোগ্য সহধর্মিণীর কাজ ক'রে গেছে যথাসাধ্য, সেই স্ত্রীকেই তিনি ঠকিয়েছেন সব চেয়ে বেশী। কোথা থেকে ঐ মুসলমানী মেয়েটাকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে তাঁর—তাঁদের মাথার ওপর বসিয়ে দিয়েছিলেন। তাকে নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, কাণ্ডাকাণ্ড ধর্মাধর্ম জ্ঞান বিসর্জন দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, একেবারেই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। নইলে তাঁর মতো স্থিরবুদ্ধি স্থিতপ্রজ্ঞ লোকের ঐ বিজাতীয়া কুলটা নারীকে সঙ্গে নিয়ে রাজসভায় রাজার সামনে যাবার দুর্বুদ্ধি হবে কেন ? গণেশ চতুর্থীর দিন, ইষ্টদেবতা কুলদেবতা গণপতি পুজার সময় ব্রাহ্মণ সজ্জন রাজপুরুষদের নিমন্ত্রণ ক'রে এনে ভগবানের সামনে ঐ বেশ্যা নর্তকীটার নাচের ব্যবস্থা করবেন কেন ?

ছি ছি ! সে কথা মনে হলে আজও তাঁর যেন লজ্জায় মাথা কাটা যায়, আজও মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে ইচ্ছা করে তাঁর।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি যে অবিচার করেছেন স্বামী, তা বোধ হয় অতটা অসহ্য হয় নি তাঁর—যত এই আচরণগুলো হয়েছে। কারণ এটা তাঁর স্বামীর মানসিক অধঃপতনের প্রমাণ, বুদ্ধিভ্রংশের প্রমাণ। এটা জানাজানি হয়েছে প্রজাসাধারণের মধ্যে, তাঁর অমন স্বামী লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছেন—ইতর লোকেরা এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছে, হাসাহাসি করেছে, টিটকারী দিয়েছে তাঁর স্বামীকে। সে কথা শোনবার আগে, সে দৃশ্য দেখবার আগে মরে যাওয়াও ঢের বেশী শ্রেয় ছিল, সেদিন মরবার কোন সুযোগ পেলে তিনি মুহূর্তকালও দ্বিধা করতেন না। নেহাত আত্মহত্যা মহাপাপ, শুধু তাই নয় —তিনি আত্মহত্যা করলে সে পাপ সে কলঙ্ক তাঁর বালক ও শিশু পুত্রদের ভবিষ্যতে ছায়াপাত করবে বলেই নিজে থেকে মরতে পারেন নি তিনি।

তবু আজ সে রাগ দুঃখ অভিমানই শুধু এসে স্বামীর প্রতি শেষ কর্তব্য পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

স্বামীর সে অপরাধ তিনি ক্ষমা করেছেন বহুদিন।

তিনি জানেন কি মর্মান্তিক অন্তর্দাহ তিনি ভোগ ক'রে গেছেন জীবনের এই শেষ ক'টা দিন। তাইতেই প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে তাঁর। আজ স্বামীর চিতা-

শয্যার সামনে দাঁড়িয়ে সেই সুপুরুষ বীর্যবান মানুষটার এই কঙ্কালসার শবদেহটার দিকে চেয়ে সেইটেই অনুভব করছেন তিনি। মনে হচ্ছে বরং—এতটা হয়ত না করলেও চলত। হয়ত পাপের চেয়ে প্রায়শ্চিত্ত কিছু বেশীই হয়ে পড়ল—

তিনিই দায়ী—এটা ঠিক। সে কথা তিনি অকপটেই স্বীকার করছেন।

স্বামীকে সেই নিরতিশয় গ্লানি থেকে, সে নিদারুণ লোকলজ্জা থেকে—সে একান্ত হীন উন্মত্ততা থেকে তিনিই টেনে তুলে সে অপরাধের মূলোচ্ছেদ ক'রে দিয়েছেন। কুৎসিত প্রবৃত্তির কাছে একান্ত আত্মসমর্পণের হীনতা থেকে তিনিই রক্ষা করেছেন বিধাতাপুরুষের কাছে রাজ-সনদ পাওয়া তাঁর রাজ্যেশ্বর স্বামীকে।

সুতরাং সেদিক দিয়ে আর কোন ক্ষোভ কোন অন্তর-বেদনা তাঁর নেই।

হ্যাঁ, তাঁর শাশুড়ী রাধাবাঈ, স্বয়ং দেবর চিমনজীও তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন—এটা ঠিক। রাধাবাঈ বালাজী বিশ্বনাথরাও-এর যোগ্য সহধর্মিণীর মতোই বলেছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে—ছেলে আমার যত বড় বীর, যত বড় শাসক, যত দিগ্বিজয়ীই হোক—এই কলঙ্ক থেকে এই পাপ থেকে মুক্ত হ'তে না পারলে আমি ভগবান গণপতির কাছে তার মৃত্যু-কামনাই করব। তোমাকে আমি আদেশ করছি যেমন ক'রে হোক এই অপযশ থেকে তাকে রক্ষা করো। তার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তো তাকেই বন্দী করো— বিন্দুমাত্র দ্বিধা ক'রো না।···রাজা কি বলবেন ? সে দায়িত্ব আমার, শাহু ছত্রপতির কাছে আমি নিজে গিয়ে সে কৈফিয়ত দেব—আমি, তাঁর প্রাক্তন মহামাত্যের স্ত্রী।

মার কাছ থেকে অমন নিঃসংশ নির্দেশ না পেলে চিমনজী কাশীবাঈয়ের পাশে এসে দাঁড়াতে পারতেন কিনা সন্দেহ। চিমনজী আপ্পা বীর, চিমনজী আপ্পা বুদ্ধিমান—কিন্তু তবু, তিনি জ্যেষ্ঠের একান্ত অনুগতও। তা ছাড়া বাজীরাও-এর দুর্মর দুঃসাহস নেই চিমনজীর মধ্যে, দ্রুত মনস্থির করার শক্তিও না।

চিমনজী আপ্পা এবং রাধাবাঈয়ের উৎসাহ ও অভয় না পেলে তাঁর ছেলে বালাজীও সাহস পেত কিনা সন্দেহ—ঐ স্ত্রীলোকটাকে বন্দী করতে।

আর কাজটা খুব সহজও ছিল না তো।

শুধু রূপসীই নয়, শুধু নৃত্য-গীত-ছলাকলা পটিয়সী মোহিনীই নয়—বিধর্মী কুলটা স্ত্রীলোকটা অসাধারণ চতুরা এবং দুর্জয় দুঃসাহসিকাও বটে। সেটা তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য। জনকয়েক মাত্র শস্ত্রধারী সান্ত্রী পাঠিয়ে বন্দী করার মতো সাধারণ ছিঁচকাদুনে মেয়েছেলে নয় সে। তার পিছনে বাজীরাও-এর রক্ষাকবচ ছিল সত্য কথা—বিপুল একটা রাজশক্তি ছিল বলতে গেলে—কিন্তু তা না থাকলেও সে একাই একশ—অথবা শতাধিক।

বালাজীর কুটকৌশল, চিমনজীর বুদ্ধি এবং কাশীবাঈ-এর জিদ ও প্রচণ্ড উষ্মা মিলিত হয়েই সম্ভব হয়েছিল তাকে বন্দী করা। পেশোয়ার দেহরক্ষীরা বালাজী ও চিমনজীর আদেশেও বিচলিত হয় নি—তাঁদের প্রতি যোগ্য সম্মান

দেখিয়েও অনায়াসে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে পেশোয়ার আদেশ নির্দেশ তাঁদের আধিপত্যের থেকেও বড়। সে আদেশ পালনের জন্য প্রয়োজন হ'লে তারা তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতেও কুণ্ঠিত হবে না···অস্ত্রধারণ করেও ছিল তারা—এবং তার ফলাফল কি হ'ত তা আজ কারুর পক্ষেই বলা সম্ভব নয় —শুধু শেষ মুহূর্তে স্বয়ং রাধাবাঈ গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই সে উদ্যত অস্ত্র সম্ভ্রমে সংকোচে নেমে এসেছিল। প্রাক্তন ও বর্তমান পেশোয়ার সহধর্মিণী পট্ট মহাদেবীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে, ও'দের কাজে বাধা দিতে সাহসে কুলোয় নি তাদের।

তাই কি ওকে বন্দী ক'রেই নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই শুনে আসছেন তিনি—কুলটা স্ত্রীলোকদের অসাধ্য কিছু নেই—কথাটার সত্যতা প্রত্যক্ষ বুঝে পেলেন তিনি। সেই শৃগালীর মতো ধূর্তা স্ত্রীলোকটা সহস্র সতর্ক চক্ষুকে প্রতারিত করে—অনায়াসেই বেরিয়ে এসেছিল আবার, পাটাসের ছাউনিতে গিয়ে মিলিত হয়েছিল তার প্রেমিক ও কামার্ত ক্রীতদাসের সঙ্গে—কাশীবাঈ-এর পূজনীয় স্বামী এবং বিস্তৃত মারাঠা সাম্রাজ্যের মহান অধিনায়কের সঙ্গে।

ধিক! ধিক!

মনে হ'লেও যেন সর্বাঙ্গ একটা নাম-না-জানা গ্লানিতে শিরশিরিয়ে ওঠে—কি যেন একটা ক্লেদাক্ত স্পর্শানুভূতি বোধ করেন কাশীবাঈ। সেই পুনর্মিলনের দিনে নাকি বাজীরাও সহস্রাধিক মুদ্রার মিষ্টান্ন বিতরণ করেছিলেন তাঁর সৈন্য এবং স্থানীয় প্রজাদের মধ্যে। ঘোড়ার ডাক বসিয়ে নাকি পুণার বিখ্যাত গোয়ালা বাড়ি থেকে 'শ্রীখণ্ড' আনিয়েছিলেন।

কিন্তু কাশীবাঈও অত সহজে হার মানবার পাত্রী নন। সিংহেরই যোগ্য সিংহিনী তিনি। সেদিন দেবর ও পুত্রকে নিয়ে তিনি নিজে সেই পাটাসের ছাউনিতে গিয়েছিলেন শানওয়ার ওয়াড়ার বন্দিনীকে দাবী করতে, কেড়ে আনতে। অন্য কেউ গেলে সম্ভব হ'ত না সেদিন, শুধু এই দুটি স্ত্রীলোকের জন্যই সমস্ত গোলমাল হয়ে গিয়েছিল।

পেশোয়াকে চরম অপমান থেকে রক্ষা করতে নিজে এসে ধরা দিতে হয়েছিল সেই শৃগালীটাকে। তারপরই এই ব্যবস্থা হয়েছিল, যে শানওয়ার ওয়াড়া প্রাসাদে একদা সর্বাধিক লক্ষ্যণীয় ছিল মস্তানী-মহল ও মস্তানী-দরওয়াজা—মূল প্রাসাদ থেকে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন, উদ্যানের সুসজ্জিততম প্রান্তে অবস্থিত মস্তানী-মহলে যাওয়ার ফটকটাই বহু মুদ্রা ব্যয়ে তৈরী করেছিলেন পেশোয়া—সেই প্রাসাদেরই ক্ষুদ্রতম প্রকোষ্ঠে, তিন হাত চওড়া ও পাঁচ হাত লম্বা—একটি খাটিয়ার মতো ঘরে, মস্তানী-মহলের অধিষ্ঠাত্রী বাজীরাও-এর হৃদয়েশ্বরীকে পাঁচটি তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। আগে চাবি রেখেছিলেন রাধাবাঈ, এবার একটি চাবি অন্তত সর্বদা মহিষী বা বালাজীর কাছে থাকবে—অর্থাৎ তাঁদের না জানিয়ে কোন কারণেই সে কারা-প্রকোষ্ঠের লৌহ-কপাট উন্মোচিত হবে না—এই আদেশই দিয়েছিলেন কাশীবাঈ। ধূর্ত পশুকে খাঁচাতে চাবি

দিয়ে রাখাই রীতি—এই সহজ নিয়মটায় আর ভুল করেন নি পেশোয়ামহিষী।

কিন্তু সত্যিই কি ভুল করেন নি কিছু?

আজ এই প্রথম—এই সাক্ষাৎ অনলবর্ষী উন্মুক্ত নীল আকাশের নিচে, তীর্থময়ী নর্মদার তীরে দাঁড়িয়ে তাঁর সমস্ত জীবন সমস্ত ইহকাল পরকাল সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্যের মালিক তাঁর স্বামীর চিতাশয্যার দিকে চেয়ে এই কথাটাই মনে হচ্ছে বার বার যে—হয়ত কোথায় একটা মস্ত বড় ভুলই হয়ে গিয়েছে তাঁর।

বহুদিন—মস্তানীকে দ্বিতীয়বার বন্দী করার আগে থেকেই আর দেখা হয় নি স্বামীর সঙ্গে। তারপর বলতে গেলে এই প্রথম দেখলেন কাশীবাঈ স্বামীকে।

অত সাধের নবনির্মিত শানওয়ার ওয়াড়া প্রাসাদ—দিল্লীশ্বরের ঈর্ষা উৎপাদনের ভয়ে যে প্রাসাদ নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে নিষেধ করেছিলেন ছত্রপতি শাহু—সেই ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদেও আর ফেরেন নি পেশোয়া বাজীরাও। জীবনের প্রচণ্ডতম ও উগ্রতম বাসনায় ব্যর্থ হয়ে, নিকটতম আপনজনদের দ্বারা প্রিয়তম ব্যক্তিটির সাহচর্যে বঞ্চিত হয়ে সে প্রাসাদে আর ফিরতে ইচ্ছা হয় নি তাঁর। ফিরলে অত সাধের প্রাসাদ তাঁর সাধকেই ব্যঙ্গ করত হয়ত। হয়ত লজ্জাটাই বড় হয়েছিল। এত বড় দুর্ধর্ষ মানুষটা দুটি স্ত্রীলোক, একটি বালক এবং একটি রুগ্ন তরুণ অনুজের কাছে পরাজিত ও অপমানিত হলেন—যে প্রাসাদে মহিষীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন নিজের প্রিয়তমাকে, সেই প্রাসাদেই আজ সে সাধারণ অপরাধিনীর জীবনযাপন করছে, খাঁচার মতো একটি ঘরে আজ সে বন্দিনী—তাঁর নিজেরই প্রাসাদে— ; একটি মাত্র আদেশে সে বন্দীদশা নিমেষে ঘুচে যাবার কথা ; অথচ তিনি এমন অসহায় যে সেই আদেশটাই দিতে পারছেন না—এই অবিশ্বাস্য রকমের হাস্যকর অবস্থার মধ্যে তাঁর পুরাতন দাস-দাসী-অনুচরদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকার মতো লজ্জা আর কি আছে। তাদের কাছে মুখ তুলে কোন আদেশই আর কোনদিন দিতে পারতেন না যে তিনি। প্রতি মুহূর্তেই মনে হ'ত যে ওরা সবাই বিদ্রুপের চোখে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে—চোখের আড়ালে গেলেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে। …না, স্বামীর এ মনোভাব অনুমান করার মতো এটুকু বুদ্ধি কাশীবাঈ-এর আছে। তাই তিনি অনুরোধ ক'রেও পাঠান নি যুদ্ধক্ষেত্রের কঠোর জীবন থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে দুদিন বিশ্রাম ক'রে যাবার।

কিন্তু এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে, এই সামান্য ক'টা মাসে একটা মানুষের এত পরিবর্তন হ'তে পারে! সেইটেই যে কিছুতে বুঝতে পারছেন না তিনি। আজ সেই থেকে বর্তমানের আর সমস্ত প্রশ্ন ডুবে গেছে তাঁর মনে—সেই প্রথম এসে স্বামীর রুগ্নদেহের দিকে চাইবার সময়টি থেকে। এই কি তার সেই সুন্দর স্বাস্থ্যবান স্বামী পেশোয়া বাজীরাও? না-না—নিশ্চয় এ আর কারও অর্ধ-মৃতদেহ ভুল ক'রে নিয়ে এসেছে ওরা। এ পেশোয়া নয়।…প্রথম দেখায় সেই প্রতিক্রিয়াই হয়েছিল তাঁর মনে। কিন্তু পরে, অনেক অভিজ্ঞান মিলিয়ে দেখে তবে বুঝতে পেরেছেন যে ভুল ওরা করে নি—তিনিই করেছিলেন।

কিন্তু এ কি দেখলেন তিনি! এই চামড়ায় ঢাকা কংকালটা, এই তাঁর মালিক—তাঁর স্বামী! সেই পেশোয়া বাজীরাও, যাঁর রূপ এবং কান্তির খ্যাতি শুধু এদেশে নয়—এদেশে তা পেশোয়া কোন পথ দিয়ে যাবেন শুনলে সে পথের দুপাশে পুরললনারা সমস্ত কাজ ফেলে এসে সকাল থেকে ঝরোকা বা গবাক্ষের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে—সুদূর হায়দ্রাবাদে নিজাম-উল-মুলুকের অন্তঃপুরেও পেঁাছেছিল। নিজাম তাঁর সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব আলোচনা করবেন শুনে বেগমরা সকলে ধরে পড়েছিলেন নিজামকে—অন্তরাল থেকে সেই বিখ্যাত রূপবান ব্রাহ্মণ মুখ্যমন্ত্রীকে দেখবেন বলে অনুমতি প্রার্থনা ক'রে। তাঁর রূপের খ্যাতি আরও দূর দিল্লীতেও গিয়েছিল নাকি—বাদশা সভাশিল্পীকে পাঠিয়েছিলেন দূর থেকে বাজীরাও-এর চিত্র লিখে নিয়ে যেতে। তা নাকি নিয়েও গিয়েছিলেন সে শিল্পী। যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রার একটি ছবি—তেজী ঘোড়ার সওয়ার বাজীরাও, কিন্তু অশ্ববল্গা তাঁর হাতে নয়—ঘোড়ার পিঠেই পড়ে আছে, মাত্র পায়ের ইঙ্গিতে তাকে পরিচালনা করছেন তিনি, ভারী বর্শাখানা এমনভাবে কাঁধে ফেলা যে সম্পূর্ণ খোলা বর্শাও স্কন্ধচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে না—সেই অবস্থায় অনায়াসে ও অবলীলাক্রমে দুহাতে ধরে ভুট্টা ছাড়িয়ে খেতে খেতে যাচ্ছেন বাজীরাও, অথচ দৃষ্টি তাঁর অগ্রে ও পশ্চাতে সেনাবাহিনীর দিকে সজাগ ও সতর্ক। সেই ছবি দেখেই নাকি বাদশা চিৎকার করে উঠেছিলেন—'এ যে সাক্ষাৎ শয়তান!...উজীর আপনি এখনই নিজামকে চিঠি লিখে দিন যে কোন শর্তে এর সঙ্গে সন্ধি ক'রে ফেলতে। এমন লোকের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কখনও জিততে পারব না আমরা!'

সেই কান্তির এই পরিণতি। সেই বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ এই কংকালে পরিণত হয়েছে এই ক'মাসে।

না, চোখের জল ফেললে চলবে না। এতগুলো লোকের কাছে এমনভাবে হার মানা চলবে না তাঁর।

তিনি অনুতপ্ত হ'লে, তাঁর চোখের জল পড়লে, তাঁর দেবর ও পুত্র আর কোনদিন মাথা তুলে কারও দিকে তাকাতে পারবে না।

চোখের জল শাসন করেন কাশীবাঈ কিন্তু মনকে শাসন করতে পারেন না যেন কিছুতেই। এ কি হ'ল! এ তাঁরা কি করলেন! মন হাহাকার করতে করতে এই প্রশ্নই করে যায় শুধু।

এত যন্ত্রণা পেয়েছে লোকটা, এত আঘাত পেয়েছে—তা তাঁরা একবারও অনুমান করতে পারেন নি কেন, কেন খোঁজ করেন নি ভাল ক'রে। কেন নিজে এসে জোর ক'রে প্রাসাদে নিয়ে যান নি, অথবা কেন কাছে থেকে এই বেদনার কিছুটাও অন্তত সেবার দ্বারা, মিষ্ট বাক্যের দ্বারা মুছে নেবার চেষ্টা করেন নি! এ কি দুর্বুদ্ধিতে পেয়ে বসেছিল তাঁকে! শেষে কি ভাবীকালের কাছে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বামীর হত্যাকারিণী বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন তিনি?

'মা!'

আবারও ডাকেন ত্র্যম্বকজী। এবার আস্তে, মৃদুকণ্ঠে। দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর নিবদ্ধ থাকলেও কাশীবাঈ যে বহু দূর চলে গিয়েছিলেন মনে মনে—সেটুকু বুঝতে পারেন ত্র্যম্বকজী। অথচ দিবাস্বপ্নের সময় সেটা নয়, আত্ম-বিশ্লেষণেরও নয়। অসহ্য হয়ে উঠেছে সকলকারই এই শারীরিক কষ্ট, মহামান্য পেশোয়ার মৃতদেহও পচে উঠতে শুরু করেছে, এই প্রখর রৌদ্রে চন্দন তৈলের অনুলেপনও কোন কাজ করছে না আর। অগুরু চন্দনের গন্ধ ছাপিয়ে একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে।

'মা!'

ত্র্যম্বকজীর ডাকে সম্বিৎ ফিরে পান কাশীবাঈ। চিন্তাসূত্রের খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন যেখানে সেখানেই ফিরে যান আবার।

মনে পড়েছে। সহমরণের প্রশ্ন তুলেছিলেন ত্র্যম্বকজী। সেই কথাটা ভাবতে ভাবতেই বহু দূর এসে পড়েছেন।

না, তিনি যেতে পারবেন না। যাওয়াই উচিত, বিশেষত জীবনের শেষ ক'টি দিন বিষময় ক'রে তুলে স্বামীর কাছে যে অপরাধ করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত করতেও অন্তত যাওয়া উচিত ছিল সঙ্গে। ইহলোকের পাপ পরলোকে নিত্য অশ্রুজলে স্খালন করতে পারতেন। স্বামীর প্রতি আর কোন ক্ষোভ, কোন অভিমান নেই—আজ বরং তিনিই অপরাধী মনে করছেন নিজেকে। তবু মরা হবে না তাঁর এখনই। মরার কোন অধিকার নেই তাঁর। ছেলে এখনও বালক, তার হাতেই হয়ত এই বিপুল সাম্রাজ্য শাসন, রক্ষা ও প্রসারের ভার পড়বে। ছেলের পিছনে সে সময় তাঁর থাকা দরকার, নইলে বড় অসহায় বোধ করবে সে নিজেকে। কে জানে পিতার এই শোচনীয় মৃত্যু দেখে তার মনে কোন অনু-শোচনা দেখা দিয়েছে কিনা ইতিমধ্যেই। সেক্ষেত্রে তিনি যদি চলে যান—সমস্ত অপরাধের গুরুভার নিয়ে সে বিব্রত হবে, হয়ত সেও অসুস্থ হয়ে পড়বে। তিনি থাকলে সান্ত্বনা দিতে পারবেন, সাহস দিতে পারবেন, অভয় দিতে পারবেন।

আর যদি বালক বলে শাহু ছত্রপতি তার দাবী উপেক্ষা করেন, তাকে লঙ্ঘন ক'রে অপরকে অগ্রাধিকার দেন—তা হলেও কাশীবাঈ-এর থাকা প্রয়োজন। অত সহজে তিনি ছেলের দাবী ছেড়ে দেবেন না, শেষ পর্যন্ত লড়বেন—ছেলের ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে যাতে সে বঞ্চিত না হয় তার জন্য চেষ্টা করবেন।

শুধু এই ছেলের প্রশ্নই নয়—আরও তিনটি ছেলে আছে তাঁর। বড়টিই তো বালক, এগুলি আরও ছোট, শেষেরটি জনার্দন পন্থ তো নেহাৎই শিশু। এদের শিক্ষা, এদের কর্মে ও সংসারে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বও আছে। চিমনজী আপ্পার ওপর যদি এই ভরসাটুকু করতে পারতেন তাহলেও আজ নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারতেন তাঁর প্রিয়তমের সঙ্গে। চিমনজী সৎ লোক, ধর্মভীরু, বীর। চিমনজী তাঁর ছেলেদের ঠকাত না। কিন্তু চিমনজী দুর্বল। চিমনজী রুগ্ন। তার মুখেও মৃত্যু-পাণ্ডুরতার ছায়া পড়েছে। আর কেউ না দেখলেও কাশীবাঈ দেখতে পাচ্ছেন। প্রত্যহ ঘুষঘুষে জ্বর হয় তাঁর, দেহ দিন-দিন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, এখনও যে যুদ্ধ করছে—সে শুধু একটা অভ্যাসে আর মনের জোরে।

বোধ হয় আর এক বৎসরও টিকবে না সে। এই অবস্থায় বৃদ্ধা শাশুড়ী এবং এই অপোগণ্ড শিশুদের ভার কার ওপর ছেড়ে যাবেন তিনি ?

কাশীবাঈ মন স্থির ক'রে অথবা মনের কাছে জবাবদিহি শেষ ক'রে স্থির দৃষ্টিতে চাইলেন ত্র্যম্বকজীর চোখের দিকে। শান্ত স্থির কণ্ঠেই বললেন, 'না ত্র্যম্বকজী, স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবার দুর্লভ ভাগ্য আমার নয়। আপনি আপনার যা কাজ সেরে ফেলুন, মহামান্য পেশোয়ার সৎকারে অযথা বিলম্ব করার আর প্রয়োজন নেই।'

'তাই হবে মা। যা আপনার আদেশ। আমি এখনই শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করছি। বালাজীকে তাহলে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি—'

ত্র্যম্বকজী ফিরে এসে চিতার পাশে দাঁড়ালেন। একজনকে ইঙ্গিত করলেন বালাজীকে ডেকে আনার জন্য।

উপস্থিত জনতার মধ্যেও ঈষৎ একটু চাঞ্চল্য জাগল। যা হোক এবার একটা কিছু হবে। শেষ হবে এতক্ষণের এই প্রাণান্তকর প্রতীক্ষা। চিতার চারপাশে প্রহরারত রক্ষীর দলও উসখুস ক'রে উঠল, তাদেরও অসহ্য হয়ে উঠেছে, তারাও অব্যাহতি চাইছে একমনে।

রক্ষীর দলে আরও একটু চাঞ্চল্য জাগল। চিমনজী আর বালাজী আসছেন। রক্ষী-বেষ্টনী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পথ করে দিল তাঁদের।

সেই দিকেই চেয়েছিলেন কাশীবাঈ। ছেলের জন্যই যেন বিশেষ একটু উদ্বেগ বোধ করছেন। ওর কিশোর মনে যে কত বড় আঘাত লেগেছে পিতার কংকালসার দেহটা দেখে—তা তাঁর অবিদিত নেই।···

'কাশীবাঈ!'

অকস্মাৎ পিছন থেকে এই সম্মানহীন সম্বোধনে চমকে উঠলেন পেশোয়া-মহিষী। চমকেই পিছন ফিরে চাইলেন। চেয়ে আরও চমকে উঠলেন।

পিছন থেকে ডাকছে তাঁকে মস্তানী। কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে রাক্ষসী। তাঁর সর্ব দুঃখের সর্ব সর্বনাশের মূল।

দেখা মাত্র যে প্রতিক্রিয়া হ'ল তা নিদারুণ ক্রোধের।

কী দুঃসহ স্পর্ধা! এখানে এসেছে—আবার তাঁকে নাম ধরে ডাকছে! সাহস তো কম নয়।

কে ছেড়েই বা দিল ওকে। কার এত দুঃসাহস যে তাঁকে না জানিয়ে—

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল যে তিনিই তো এ আদেশ দিয়েছিলেন। প্রহরিণী এসে যখন খবর দিল যে রুদ্ধদ্বারে মাথা কুটছে সে—শেষ দেখা পাবার জন্য আকুল হয়ে মিনতি জানাচ্ছে, গর্বিতা উদ্ধতা মস্তানী সামান্য ভিখারিণীর মতো দয়া প্রার্থনা করছে তাঁর কাছে—তখন তিনিই বলেছিলেন ছেড়ে দিতে, চাবিও দিয়ে দিয়েছিলেন। এখন তো আর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না—আর কেন!

মিছিমিছি শুধুমাত্র নিষ্ঠুরতার আনন্দে নিষ্ঠুর ব্যবহার ক'রে যাওয়ার

পক্ষপাতী তিনি নন।

তাই বলে এত কাছে এসে এইভাবে তাঁকে সম্বোধন করতে এতটুকু সংকোচ হ'ল না ওর? এ কি অসহনীয় ধৃষ্টতা?

আর, আর এসব কি—?

আরও বিস্ময় বোধ করেন তিনি ওর দিকে চেয়ে।

এ কি বেশ ওর?

এ তো বৈধব্যের কাল বলতে গেলে। বাজীরাও স্পর্ধা ক'রে বলতেন—'মস্তানী আমার ধর্মপত্নী—ঈশ্বরের সামনে দেবতার সামনে ওকে গ্রহণ করেছি স্ত্রী বলে'—তা এই বুঝি তার নিদর্শন! এই কি ওদের বৈধব্যের বেশ! কে জানে, বিজাতীয়া বিধর্মী তার ওপর নর্তকী—ওদের ধর্ম ওদের রীতিনীতিই বুঝি আলাদা।

তবু একটা মনুষ্যত্বের প্রশ্নও তো আছে। আর সেটা তো মানুষের সর্বস্তরেই এক বলে জানেন কাশীবাঈ। লোকলজ্জা, লোকাচার এগুলোও তো অন্তত মানতে হয় সমাজে থাকতে গেলে।...সদ্য-বিধবা সদ্য-বিগতদয়িতের এই বেশ! সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সুবর্ণ-সূত্র-নির্মিত বেনারসী তাসার পোশাক তার পরনে, আপাদ-মস্তক মণি-মাণিক্যমণ্ডিত, সেই প্রখর দিবালোকে সে রত্নালঙ্কারের দীপ্তি প্রজ্বলিত অগ্নিকণার মতোই চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে বার বার। অলংকার একটিও বাদ দেয় নি বোধ হয় সে, কেয়ূর, কঙ্কন, চন্দ্রহার, মুক্তার সপ্তলহরী থেকে পায়ের নূপুর অঙ্গুলিত্র পর্যন্ত কিছুই ভুল হয় নি ওর। একেবারে নব-বধূর বেশ। তবে কি ওর ভয় হয়েছে যে এগুলো এবার কাশীবাঈ কি বালাজী কেড়ে নেবেন, তাই সর্বাঙ্গে বহন ক'রে পাহারা দিতে চায়?

ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নেন কাশীবাঈ।

মুখ ফিরিয়েই প্রশ্ন করেন, 'কী চাই? আরও কি চাই তোমার? এতেও কি সাধ মেটে নি?'

হয়ত বলা উচিত ছিল না কথাগুলো। বলে নিজের মর্যাদারই হানি হ'ল হয়ত। তবু নিজেকে সামলাতেও পারলেন না কাশীবাঈ। অন্তরের জ্বালাটা আপনিই বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

'সাধ!' মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ হাসিতে যেন ফেটে পড়ে মস্তানী, সে হাসি সেই স্থানকালের সঙ্গে এমনই বেমানান যে, উপস্থিত শ্রোতাদের কানে তা চাবুকের মতোই আঘাত করে। মস্তানী বলে, 'সাধ তো তোমার মেটাবার কথা গো পট্ট-মহাদেবী! আমার সাহচর্যে, আমার আসঙ্গে পেশোয়ার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলেই না তোমরা—তাঁর স্ত্রী, তাঁর মা, ছেলে, ভাই সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠে আমাকে সরিয়ে দিয়েছিলে! অন্তত সেই কথাই তো বলেছিলে তখন, সেই অজুহাতই দেখিয়েছিলে। শরীর ভাল হয়েছে তো তাঁর? সুস্থ হয়ে উঠেছেন তো?...তাকিয়ে দেখেছ স্বামীর দেহটার দিকে মহিষী কাশীবাঈ—কি অবস্থা হয়েছে তাঁর অমন সুন্দর কান্তি অটুট স্বাস্থ্যের? আমাকে তো সরিয়ে এনেছিলে তাঁর কাছ থেকে, তাঁর সেবা থেকে; কৈ, সে স্থান পূর্ণ

করতে তো কাছে যেতে পারো নি ? সে সাহসে বোধ হয় কুলোয় নি—না ? নাকি প্রবৃত্তি হয় নি অমন স্বামীর সেবা করবার ?'

আবারও হাসে মস্তানী। চাপা লঘু হাসি, তবু সে হাসির শব্দ যেন কানের মধ্য দিয়ে বুকের বহু দূর পর্যন্ত কাটতে কাটতে যায়।

কাশীবাঈ কোন উত্তর দিতে পারেন না চেষ্টা ক'রেও। বোধ হয় ওর দুঃসাহস আর স্পর্ধায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

'শোন কাশীবাঈ, আমার জন্য আর বিব্রত হ'তে হবে না, তোমাদের কণ্টক বিদায় হচ্ছে এবারে। জীবনেই তোমার অধিকার, মরণ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার সাহসও তোমার নেই—তা ছাড়া ইহলোকের সংস্কার আর বিধি-নিষেধের পরলোকে কোন মূল্য নেই, তোমার মন্ত্রপড়া অধিকারের দাবী পেশ করতে সেখানে যেতে পারবে না, গেলেও লাভ হবে না। যেখানে জাত নেই, ধর্ম নেই, বিবাহের প্রশ্ন নেই—সেইখানেই আমি যাচ্ছি আমার মালিকের পাশে, প্রভুর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। সেইখানেই আমাকে তাঁর প্রয়োজন বেশী। এখানে রাজ্য ছিল, রাজকর্ম ছিল—সেখানে শুধু ভালবাসার রাজ্য। সেখানে আমিই তাঁর রানী। সেখানে আমাদের মিলনে কোন বাধা থাকবে না ; ঈশ্বরের রাজত্বে তাঁর মঙ্গলময় আশীর্বাদে ঘেরা বেহেস্তে চলবে আমাদের নিত্য বিহার। কোন ঈর্ষাতুর স্ত্রী-পুত্র-জননীর সাধ্য নেই যে আমাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, সরিয়ে আনে তাঁর পাশ থেকে।...কাশীবাঈ, জ্ঞানত কোন পাপ করি নি, তোমরা আমাকে বহুবার গণিকা বলে গাল দিয়েছ—কিন্তু কৈশোরের প্রথম উন্মেষে যাঁকে প্রভু বলে জেনেছি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে কোনদিন মনে স্থান দিই নি, ঈশ্বর সাক্ষী। মান ও প্রাণরক্ষাকরী পেশোয়াকে পিতাজী পুত্র বলে স্বীকার সম্বোধন করেছিলেন, অতখানি উপকারের বদলে নিজের অন্তঃপুরের শ্রেষ্ঠরত্ন হিসেবেই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, পুত্রকে প্রতারণা করেন নি, কোন বাপই করে না। তবু যদি অজ্ঞাতসারে কোন পাপ কোনদিন স্পর্শ করে থাকে তো সেটুকুও আগুনে পুড়িয়ে অগ্নিশুদ্ধা হয়ে যাবো তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে, আশা করি তোমাদের ভগবান গণপতিরও আপত্তি হবে না তাতে।'

এতক্ষণে অনেকেই মুখের ভাষা আর মনের জোর খুঁজে পেয়েছে। আশপাশে কাশীবাঈ-এর মুখাপেক্ষিণী যে সব পরভৃতিকার দল ছিল তাদের মধ্যে থেকেই কে যেন ব'লে উঠল তীক্ষ্ণবিদ্রূপ মেশানো তিরস্কারের সুরে, 'তুমি মুসলমানী হয়ে যাবে ব্রাহ্মণের চিতায় সহমরণে বসতে! তোমার সাহস তো কম নয়!'

মস্তানী রাগ করে না, সে হাসে। বলে, 'চিতা জ্বলবার পর আর জাত থাকে না। তখন সে অগ্নি, সে পাবক। জিজ্ঞাসা করো গে যাও তোমার ঐ পুরোহিতকেই। আর তাতেও যদি আপত্তি থাকে—বেশ, চিতা জ্বলুক, তারপরই আমি তাতে প্রবেশ করব। নইলে ঐ আগুনে শাড়ি ধরিয়ে আমি পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পুড়ব—তাতে আমার আপত্তি নেই।'

তবু চারিদিকে একটা গুঞ্জন ওঠে। চাপা রোষ ও ধিক্কারের। খুব চাপাও

নয়—কারণ সেটা কাশীবাঈকে শোনানো প্রয়োজন।…বারবিলাসিনী নর্তকীর এত স্পর্ধা সে চায় সহধর্মিণীকে ডিঙিয়ে সহমরণে বসতে! বাস্তবিক কাশীবাঈ-এর ধৈর্যের তারিফ করতে হয় যে তিনি এখনও দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনছেন, চিরকালের মতো ওর রসনা নিস্তব্ধ করার আদেশ দিচ্ছেন না। এ দুঃসাহস প্রকাশ করার জন্যই তো শুধু ওর মৃত্যুদণ্ড পাওয়া উচিত।

কিন্তু আশ্চর্য, কাশীবাঈ-এর মুখ থেকে রোষ ও ক্ষোভের শেষ বিন্দুটুকুও মুছে গেছে। সে জায়গায় একটা বিচিত্র ভাব ফুটে উঠেছে। সে কি অনুশোচনার? সে কি ঈর্ষার? সে কি পরাজয় স্বীকারের—নাকি বিস্ময়েরও। যে বিস্ময় মুগ্ধ প্রশংসার মনোভাব থেকে প্রকাশ পায়?

তিনি মুখ তুলে তাকান ওর দিকে, মন দিয়ে শোনেন ওর কথাগুলো। তারপর আশ্চর্য রকম কোমল কণ্ঠে বলেন, 'কিন্তু তাহলে তোমার এ বেশ কেন ভাই?'

ভাই! উপস্থিত সকলেই চমকে ওঠেন এ সম্বোধনে। চমকে ওঠে মস্তানীও। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে সে বিস্ময় প্রকাশ পায় না। সহজভাবেই বলে, 'ওমা, এ যে আমার বধূবেশ।…এই বেশেই একদিন পান্নার প্রাসাদ থেকে শিবিকায় রওনা হয়েছিলাম প্রভুর সঙ্গে। শুনেছি বধূবেশেই সহমরণে যেতে হয়—তাই না!'

'তা হয়। ঠিকই শুনেছ। তোমার ভুল হয় নি। কিছুই ভুল হয় নি। আমারই ভুল হয়েছে। আমারই মনে ছিল না। কিন্তু…তোমার ছেলে? তোমার বালক পুত্রকে এই শত্রুপুরীতে ফেলে যাচ্ছ—তোমার ভয় হচ্ছে না একটু?

'ভয়! মানে মায়া—এই তো! কাশীবাঈ, ঐখানে তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ। তুমি যত বড় ঘরেরই মেয়ে হও, তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা। ব্রাহ্মণ লক্ষপতি হ'লেও ভিখারী-মনোভাব ত্যাগ করতে পারে না শুনেছি। ছোট ছোট আশা, ছোট ছোট ভয়, ছোট ছোট কামনা তাদের। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হিসেব, অতি সূক্ষ্ম বিচার। তোমাদের বুকখানাই আসলে ছোট। আমি যা ই হই, ভুলে যেও না রাজা ছত্রশাল বুন্দেলার রক্ত আছে আমার ধমনীতে। রাজরক্ত। আমরা জীবনপ্রাণ একজনকেই দিই, সর্বস্বপণ-করা পাশা খেলার দানের মতো। সে-ই আমাদের মালিক। এ জীবনের ওপর, এ মনের ওপর আর কোন দাবী নেই, আর কারুর কথাই ভাবতে আমরা অভ্যস্ত নই। আমাকে তাঁর প্রয়োজন, তাঁর কাছে যাচ্ছি, আর কোন কথা ভাববই বা কেন? ছেলে? তাকে ঈশ্বর দেখবেন।'

কাশীবাঈ হাসলেন। মিষ্ট মধুর হাসি—সর্বপ্রকার তিক্ততাহীন। এগিয়ে এসে দুটি হাত ধরলেন মস্তানীর, বললেন, ঈশ্বর তো দেখবেনই, সাধ্যমতো আমিও দেখব। যাও ভাই, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে আমাদের স্বামীর সেবা করতে যাও। তুমি ধন্য। তোমার প্রেম তোমাকে জাতি-ধর্ম-সংস্কারের ঊর্ধ্বে নিয়ে গেছে, আজ তুমি আমার প্রণম্য।…তবে, তুমি ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যা বলেছ সব মেনে নিলাম, কেবল একটা কথা ছাড়া। বুক তার ছোট নয়। আশা করি মৃত্যুর আগে তুমিও সেটা স্বীকার ক'রে যাবে। এসো—আমি তোমাকে হাত ধরে তোমার এবং আমার স্বামীর চিতায় তুলে দিই।…পারো তো আমাকে

ক্ষমা ক'রো, আর—চাইবার মুখ নেই—তবু যদি সম্ভব হয় তো তাঁর কাছেও আমার হ'য়ে ক্ষমা চেয়ে নিও।'

বলতে বলতেই দরদর ধারায় তাঁর এতক্ষণের শুষ্ক চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি উপস্থিত জনতা, আত্মীয় ও পরিজনমণ্ডলী, ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও মাওলী সৈন্যদের বিস্মিত ক'রে মস্তানীর হাত ধরে এগিয়ে গেলেন স্বামীর প্রজ্বলিত চিতার দিকে।

বিধিলিপি

(নাটক)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

বরদা	...	জ্যোতিষী
উপেন	...	কাশীর যাত্রীতোলা বাড়ির মালিক
সন্তোষ	...	বরদার জ্ঞাতি ভাই—সহকারী ও শিক্ষার্থী
বিমল	...	পাড়ার জনৈক বেকার অসচ্চরিত্র যুবক
সচ্চিদানন্দ ভাদুড়ী	...	কাশীর জ্যোতিষী—বরদার গুরুস্থানীয়
হারাধন	...	মুদি—বরদার ভাড়াটে
রাখাল	...	বরদার নতুন চাকর
সরমা	...	উপেনের কন্যা
মা	...	বরদার মা
গুপীর মা ও চাঁপার মা	...	ঝি
লতুর মা	...	প্রতিবেশিনী—বিমলের মা
লতিকা	...	ঐ কন্যা

মক্কেলগণ, আগন্তুকগণ, কাশীর ঘাটে স্নানার্থীগণ, গুণ্ডাদ্বয়, জনৈক বৃদ্ধ বাঙ্গালী ও জনৈক প্রৌঢ় হিন্দুস্থানী যাত্রী, রাজমিস্ত্রী ইত্যাদি।

শ্রীরমণীমোহন মিত্র

করকমলেষু—

'বিধিলিপি' আমার 'জ্যোতিষী' গল্পের নাট্যরূপ। গল্পটিকে প্রথম নাট্যরূপ দিয়েছিলাম বেতারের প্রয়োজনে। 'বিধিলিপি' নাটক বহুবার 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' বা আকাশবাণীর নাট্যকে দল কর্তৃক অভিনীত হয়েছে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেতার নাটক হিসেবে ভারত সরকার নাটকটি ছেপে প্রকাশও করেছেন। কিন্তু বেতার নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার অনেক অসুবিধা আছে। অনেক সময় অনেক অ্যামেচার দল পৃথক ভাবে আমাকে এসে অনুরোধ করেন—এটি রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করে সাজিয়ে দিতে। প্রধানত সেই প্রেরণাতেই বর্তমান নাটকটি রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করে নতুনভাবে লিখিত হল। বলাবাহুল্য বেতারে অভিনীত নাটক এবং 'জ্যোতিষী' চলচ্চিত্রের সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য লক্ষিত হবে। ইতি—

—লেখক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বরদা জ্যোতিষীর বাইরের অফিস ঘর। বরদা ভ্রূ কুঞ্চিত করে বসে একখানা ঠিকুজি দেখছেন। চৌকিতে তাঁরই সামনা-সামনি ও'র ছোট ডেস্কটার অপর দিকে বসে আছে সন্তোষ, তাঁর সহকারী ও ছাত্র। দূর সম্পর্কের কী একটা আত্মীয়তা আছে বরদার সঙ্গে। জ্যোতিষে অনুরাগ থাকায় শিক্ষানবিসি করছে ও'র কাছে। ভারি কড়া এবং রাশভারী লোক বরদা। তিন-চার জন মক্কেল স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন ভয়ে। এমন সময়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল একটি ছোকরা। এত ব্যস্ত যে কোন দিকে লক্ষ্য করারই সময় নেই। বরদাকে তার নজরেই পড়ল না। সন্তোষকেই জ্যোতিষী মনে করে ওর সামনে হাত জোড় করে বললে—]

ছোকরা। এক মিনিট স্যার, ভেরি প্রাইভেট। দয়া করে যদি একটু আড়ালে আসেন।

[সন্তোষ একটু অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে চাইল। তার পর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিঃশব্দে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বরদার দিকে। ছোকরাটি তৎক্ষণাৎ বরদার সামনে গিয়ে হাত জোড় করে বলল—]

ছোকরা। স্যার, শুনছেন!

বরদা। আমি তো আপনার অফিসের ছোট সাহেব নই—আমি জ্যোতিষী, পণ্ডিত,—স্যার বলে সম্বোধন না করলেও চলবে।

ছোকরা। আজ্ঞে স্যার—মানে পণ্ডিতমশাই—একটুখানি টাইম যদি আমাকে দেন। ভেরি প্রাইভেট, বড্ড গোপনীয় আর জরুরী।

বরদা। গোপনীয় কোন প্রশ্ন থাকলে আগে থেকে এনগেজমেণ্ট করতে হয়। বাইরে সাইন-বোর্ডে লেখা আছে, দেখেন নি?

[অকস্মাৎ একেবারে ও'র পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পায়ে হাত দেবার ভঙ্গী করল ছোকরাটি।]

ছোকরা। একটুখানি সময় দিন স্যার! এবারের মত! জীবন-মরণ সমস্যা। আপনার পায়ে পড়ি।

[অগত্যা জ্যোতিষী উঠলেন। সদর থেকে বাড়ীর মধ্যে ঢোকবার যে চলনটা সেটা এই ঘরেরই লাগোয়া। মধ্যে একটা দোরও আছে। সেই দোর দিয়ে চলনে ঢুকে দোরটা সাবধানে ভেজিয়ে দিলেন।]

বরদা। বলুন।

ছোকরা। আজ্ঞে স্যার, এই খেলার খবরটা।

বরদা। খেলা?

ছোকরা। আজকের ম্যাচ। সেমি-ফাইন্যাল স্যার। ঈস্টবেঙ্গল মোহন-বাগান—জানেন না? এইটেই বড় গাঁট। এটা পেরোলেই আর পায় কে! মোহনবাগানের শীল্ড নেওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। কে জিতবে স্যার—দয়া করে যদি বলে দেন।

[কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন বরদা।]

বরদা। আপনি কি এই জন্যেই ডেকে আনলেন এখানে?

ছোকরা। না স্যার। ইস্—মানে পণ্ডিত মশাই, আরও একটু কথা আছে। যদি মনে করেন যে ঈস্টবেঙ্গল জেতবার চান্স্ মানে সম্ভাবনা বেশী তা হলে দয়া করে এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ওদের সেণ্টার ফরোয়ার্ড আর ঐ ব্যাকটার পা ভেঙে যায়—এই মানে গুরুতর কিছু না হলেও চলবে, ধরুন খেলতে শুরু করে একটা স্প্রেন—পা-টা একটু মচ্‌কে গেল কি ফিক্-ব্যথা ধরল, এমনি আর কি—। একটা যাগ-যজ্ঞি কিংবা কবচ, কিছু একটা করে দিতেই হবে স্যার!

[ছেলেটি কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় ও'র পায়ের কাছে বসে পড়ে পায়ে হাত রাখল।]

ছোকরা। অনেক দূর থেকে এসেছি স্যার আপনার কথা শুনে। বাঁচান স্যার, নইলে মরে যাব। পাড়ায় আর মুখ দেখাতে পারব না।

বরদা। ফি জানেন কত আমার?

ছোকরা। আজ্ঞে? ফি? না তো!

বরদা। আট টাকা। টাকা এনেছেন?

ছোকরা। এই যে স্যার। মানে মাস্টার মশাই। আর যজ্ঞের খরচটা, সেটা কত বললেন না তো!

[টাকাটা ওর হাত থেকে নিয়ে বরদা নিঃশব্দে সদর দরজা দেখিয়ে দিলেন।]

বরদা। সিধে চলে যাও! ইয়ারকি করার আর জায়গা পাও নি? অতগুলো লোক বসে আছে, উনি আমাকে বাইরে ডেকে এনে ছেলেখেলা করছেন? যাও শিগ্‌গির, নইলে পুলিস ডাকব।

ছোকরা। আজ্ঞে স্যার, ফিটা তা হলে—?

বরদা। ওটা আমার সময় নষ্ট করার জরিমানা।

[ছেলেটি মাথা চুলকোতে চুলকোতে চলে গেল। ওখান থেকে ফিরে বরদা আবার বাইরের ঘরে এসে বসলেন। চৌকির পাশের চেয়ারে যে লোকটি বসেছিল সে হাতটা বাড়িয়ে দিলে তাড়াতাড়ি।]

বরদা। (কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ন ও নিষ্ঠুর) কী জানতে চান ?

প্রথম মক্কেল। এক বার দেখুন তো স্যার হাতটা। টাইমটা বড্ডই খারাপ যাচ্ছে কিনা, কিছু টাকা কোথাও থেকে না পেলে একদম চলছে না। তাই মনে করছি আসছে ভাইসরয়ের কাপে—হে"—হে"—আপনারা তো সব জানেন—ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, কোন্ ঘোড়াটা জিতবে দয়া করে বলে দেন—

বরদা। তা হলে ঘোড়ার হাত দেখতে হয়। কোন্ ঘোড়া রেসে জিতবে তা মানুষের হাত দেখে কি করে বুঝব ? ঘোড়ার হাত দেখতে শিখি নি। আপনি যেতে পারেন। (পাশের মক্কেলকে) হ্যাঁ, আপনার কি চাই ?

১ম মক্কেল। কাইণ্ডলি অন্তত এইটে যদি দেখে দেন যে কোন দৈবাৎ অর্থ-প্রাপ্তি যোগ আছে কিনা—

বরদা। (অসহিষ্ণুভাবে) না, না, না। কোন অর্থপ্রাপ্তির যোগ আপনার নেই। বিশেষত ঘোড়া ধরেছেন যখন—মা লক্ষ্মী আপনার ত্রিসীমানায় থাকবেন না। সন্তোষ ও"র ফি-টা নিয়ে যাও। আটা টাকা। ধন্যবাদ। (দ্বিতীয় মক্কেলকে) হ্যাঁ—বলুন।

[মুখ বিকৃত করে প্রথম মক্কেলের প্রস্থান।]

২য় মক্কেল। সময়টা বড্ড খারাপ যাচ্ছে ঠাকুরমশাই, একটু যদি দেখে দেন এমন আর কতদিন চললে।

বরদা। হুঁ (হাত দেখে), আমার কথা আপনি কার কাছে শুনলেন ?

২য় মক্কেল। (কতকটা ভয়ে ভয়ে) কেন বলুন তো ?

বরদা। যে বলেছে সে সবটা বলেছে কি না আমার সম্বন্ধে—তাই জানতে চাইছি। আমি বড় দুর্মুখ। বুঝলেন ? ঐ যারা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে একেবারে চাঁদ তুলে দেয় হাতে, আমি তাদের দলে নই। মিছে করে বানিয়ে বলতে পারব না যে, পরের সম্পত্তি হঠাৎ হাতে পড়বে কিংবা অপুত্রকের ছেলে হবে। ওতে আমার বড্ড ঘৃণা বোধ হয়। (এক বার চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে) বুঝেছেন ? হাতে যদি খারাপ লেখা থাকে তো মুখের ওপরই বলে দেব। সেটা সইতে পারবেন ? না পারেন তো এখনও সময় আছে, সরে পড়ুন।

২য় মক্কেল। আজ্ঞে, সে কি কথা, সত্যি কথাটা জানব বলেই তো এসেছি—!

বরদা। (হাত দেখতে দেখতে কতকটা স্বগতোক্তির সুরে) এমনিই অদৃষ্ট, ভাল হাত কি একটাও আমার কাছে আসতে নেই—! শুনবেন আপনার ভাগ্যের কথা ? ঠিক শুনতে চান ? হাত আপনার মোটেই ভাল না। আরও খারাপ দিন আসবে আপনার।

২য়। (জড়িয়ে জড়িয়ে) আজ্ঞে, তা হলেও—তবু ঠিক কি রকম—

বরদা। তিন-চারটি গ্রহ বিরূপ—আমি কি করব বলুন! সামনের এক বছরের মধ্যে অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটবে। অর্থনাশ, স্বজন-হানি—মানে বিশেষ কোন প্রিয়জনের মৃত্যু, তার ওপর স্বাস্থ্যের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়বে। আর কত বলব ?

২য় মক্কেল। তা—তা—এর কি কোন প্রতিকার নেই? গ্রহ-পূজা বা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-টস্ত্যয়ন?

বরদা। না, দয়া করে ওসব কথা এখানে বলবেন না। তা হলে যান ঐ বুজরুকদের কাছে, যারা বোকা বুঝিয়ে আপনাকে আড়াই শ টাকার নবগ্রহ কবচ গছাবে কিংবা যজ্ঞ করবার খরচা নেবে দেড় শ দু শ টাকা। আমি জেনে শুনে অমন করে ঠকাতে পারব না। আচ্ছা, আপনার কমন্ সেন্স কি বলে, হাজার হাজার মাইল দূরে বসে যে সব গ্রহ এমন করে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন, যার সুস্পষ্ট ও অভ্রান্ত নির্দেশ রয়েছে আপনার হাতে আঁকা। তাঁদের হারিয়ে দেবেন তুচ্ছ একটা কবচ পরে কিংবা আগুনে একটু ভেজাল ঘি ঢেলে? অতই সোজা!

২য় মক্কেল। (প্রায় আর্তনাদের মত শোনায় তাঁর কণ্ঠ) আজ্ঞে তা হলে, তা হলে কি কোন উপায় নেই?

বরদা। ঈশ্বরকে ডাকুন। তাঁর নাম জপ করুন। যদি দীক্ষা হয়ে থাকে তো ইষ্ট নাম জপ করুন, হাজার, দশ হাজার, লক্ষ বার। জপতে জপতে ইচ্ছাশক্তি বাড়বে, পুরুষকার জাগবে। পুরুষকার দৈবকে লঙ্ঘন করে বৈকি। কত স্বল্পায়ু লোককে বেশীদিন বাঁচতে দেখলুম। দেখুন চেষ্টা করে, ক্ষতি কি।

২য় মক্কেল। আচ্ছা, নমস্কার, এই আপনার ফিটা—

[প্রস্থান।]

বরদা। চলল আহাম্মকটা ছুটে। এখনই কোন বুজরুককে ধরে দু শ আড়াই শ টাকা গুণে না দেওয়া পর্যন্ত ওর শান্তি নেই। অথচ এক বার করে আমার কাছেও আসবে ঠিক! (৩য় মক্কেলকে) হ্যাঁ দেখি আপনার কি ব্যাপার। জন্মতারিখ এনেছেন।

৩য় মক্কেল। আজ্ঞে না, দেখুন ওটা খুঁজে পাচ্ছি না কিছুতেই।

বরদা। তাতে আটকাবে না। গণনা করে বার করে নেব। ফি-টা দিয়ে যান, কাল আসবেন।

[সকলে চলে গেল।]

বরদা। সন্তোষ! তুমি কিছু বলবে মনে হচ্ছে?

সন্তোষ। যদি কিছু মনে না করেন তো একটা প্রশ্ন করি।

বরদা। না, মনে করব কেন—বল না।

সন্তোষ। আচ্ছা, অত দুঃসংবাদ আপনি মানুষের মুখের ওপর শোনান কি করে? আপনার দুঃখ হয় না?

বরদা। সত্য কথা জানতেই যে ওরা আসে আমার কাছে। নইলে জ্যোতিষী তো ঢের আছে শহরে। জানে যে এখানে এলে সত্য কথাটা পাবেই।

সন্তোষ। আর যত খারাপ ফল কি আপনারই নজরে আসে? অন্য জ্যোতিষীরা তো এমন বলেন না। তাঁরা কি জানেন না এত—?

বরদা। ওটাই আমার বিশেষ শিক্ষা। অন্যরা বলে না বলেই আমার কাছে

লোক আসে। বিশেষ সাধনা করে মানুষের হাতের অমঙ্গলকর রেখাগুলি, মানুষের জন্মকুণ্ডলীর অশুভ যোগাযোগগুলি চিনতে শিখেছি। ঐ হল আমার টোপ। আর প্রথম থেকেই কি এসেছিল? অনেক দুঃখ করেছি, দিনের পর দিন বসে থেকেছি আসর সাজিয়ে, একটি লোকও এ ঘর মাড়ায় নি। ডেস্কের ওপর বাজে ঠিকুজি একখানা খুলে বসে থাকতুম, কান পাতা থাকত বাইরে পায়ের শব্দের দিকে। কতদিন মনে হয়েছে জুতোর আওয়াজ বুঝি আমার দোরেই এসে থামল—সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়েছি ঠিকুজির ওপর, কিন্তু অভিনয় ব্যর্থ হয়েছে বার বার! তাই যখন দু-এক জন এসেছে এমন করেই তাদের চোখের সামনে ভাবী অমঙ্গলের ছবি তুলে ধরেছি, এমন নিষ্ঠুর ভাবে সর্বনাশের কথা শুনিয়েছি যে, অনেকেই তা সইতে পারে নি, ছুটে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তারাই আবার এসেছে। শুধু নিজেরা আসে নি, লোক টেনে এনেছে। মিষ্টি কথা তো অনেকেই বলে, কোনটা ফলে তার কোনটা ফলে না—এমন সাংঘাতিক কথা তো কেউ বলে না। তবে এর ভেতর জিনিস আছে তাই মিছে কথা বলে মন ভোলায় না—এই হল তাদের বিশ্বাস।

সন্তোষ। আশ্চর্য।

বরদা। ঐ থেকেই আমার পসারের সূত্রপাত। দুঃখ পায়, তবু আসে। জানে যে নিষ্ঠুর হলেও আসল সত্যটা শুনতে পাবে। বিশ্বাসও করে, যদিও হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে না। তা থাকা সম্ভবও নয়—তা হলে পাগল হয়ে যেত মানুষ।

সন্তোষ। আচ্ছা তা যখন জানেনই তখন ঐ মাদুলি বা যজ্ঞের টাকাটা হাতছাড়া করেন কেন?

বরদা। না না—ওতে আমার বড় ঘৃণা বোধ হয়। জানি যা দুর্লঙ্ঘ্য, যা কিছুতেই নিবারণ করতে পারব না—তার জন্যে হাত পেতে টাকা নেব! ছি! ও যে প্রবঞ্চনা।

[এই সময়ে ভেতরের দরজা দিয়ে ওঁদেরই দোকানঘরের ভাড়াটে মুদি প্রবেশ করল।]

বরদা। কী ব্যাপার? হারাধন, এমন অসময়ে?

হারাধন। ঐ মাস-কাবারিটা পেঁছে দিয়ে গ্যালাম। এই বেলা ঝামেলা কম, বোঝেন না! আপনাদের তো ঘরের ব্যাপার, ধীরি-সুস্থি দিলি চুকে যায়। (তার পরই হাত পা নেড়ে) বাবু, আসছে মাস থেকি আর ভাড়া দেব না তা বলি দ্যালাম। উল্‌টি আপনারা আমায় কিছু কিছু মাইনে দেবেন 'অনে।

বরদা। কেন কেন, কি হ'ল আবার তোমার?

হারাধন। হবে আবার কি! দিন নেই রাত নেই, ইদীক যত লোক আসবে সবারে খবর দ্যাও জ্যোতিষী ঠাকুরের দরোজাটা কনে। কেন আমি ছাড়া কি লোক নেই এ চত্তরি! লোকের ভিড়ি আমার কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে!

বরদা। (হেসে) ও, এই ব্যাপার! আচ্ছা আচ্ছা হবে 'খন। কতই বা লোক আসে, ওতেই এত ব্যস্ত হলে চলবে কেন?

হারাধন। শুধু কি রাস্তা জিজ্ঞেসা করা? ওটা তো ছুতো। আসল কথা কেমন গোনেন জ্যোতিষী ঠাকুর, কত টাকা ন্যান—হ্যান্ ত্যান সাত-সতেরো, দু ঝুড়ি কথা। অত কথার উত্তর দিতে গেলি চলে?

বরদা। আচ্ছা, আচ্ছা তুমি যাও।

হারাধন। মা ঠাকরোন আপনারে ভিতরে ডাকে বাবু—যান গা এক বার শিগ্গিরি।

[হারাধনের প্রস্থান ও মার প্রবেশ।]

মা। হ্যাঁরে, তোদের কী ব্যাপার? খাওয়া-দাওয়া কি ছেড়ে দিলি সব?

বরদা। কেন মা, এরই মধ্যে এত তাগাদা?

মা। এরই মধ্যে কিরে? চেয়ে দেখ্ দিকি কটা বাজল? দেড়টা যে বেজে যাচ্ছে।

বরদা। দেড়টা? বল কি? সন্তোষ চল চল—আজ আবার মার দ্বাদশী, ভুলেই গিয়েছিলুম।

মা। তোর না হয় পয়সা পয়সা করে আহার-নিদ্রা জ্ঞান নেই—ঐ দুধের ছেলেটাকে টাঙিয়ে রাখিস কী বলে এত বেলা অবধি?

বরদা। কে, সন্তোষ? ভুলে যাচ্ছ কেন মা, ও শিক্ষার্থী। এখানে এসেছে ও শিখতে। সেকালে ছাত্ররা গুরুগৃহে কত কষ্ট করত তা ভুলে যাচ্ছ কেন? বুঝলে সন্তোষ, মনে রেখ কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। আমি কি ছিলুম, পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের মাষ্টারি করতুম বৈ তো নয়। নেহাৎ এই পৈতৃক বাড়িটা ছিল তাই। তাও পঁয়ত্রিশ টাকা কি ঘরে আসত? পুরনো বই কেনার বাতিকে যে কত পয়সা চলে যেত তার ইয়ত্তা নেই। তার পর, সব ছেড়েছুড়ে এই জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে যখন পড়লুম, কম দুঃখ গেছে! বাড়িটা সুদ্ধ বাঁধা পড়েছিল, সে জন্যে মা ঠাকরুন উঠতে বসতে কথা শুনিয়েছেন। তবু হাল ছাড়ি নি। আর কী পরিশ্রমটা না করেছি! কোমর বেঁকে গেছে বলতে গেলে, হেঁট হয়ে বসে পড়তে পড়তে। সাধনা চাই বই কি, নইলে সিদ্ধি মেলে না।

মা। তা তো হল বাছা, ভগবান যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, মা-লক্ষ্মীও কৃপা করেছেন একটু একটু করে—তখন বাবা এই বার ঘরের লক্ষ্মীও একটি নিয়ে আয়।

বরদা। হুঁ।

মা। হুঁ কি রে? যখনই বলি তখনই হুঁ?

বরদা। দুটো বাজে যে মা—চল, চল,—খেতে দেবে চল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দু'টি ঘর পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে। বরদা ভেতরের পড়বার ঘরে। চৌকির উপর ছোট ডেস্ক। ডেস্কের ওপর একটি কোষ্ঠী খোলা। একটা বড় লেন্স দিয়ে কোষ্ঠীটা দেখছেন।]

বরদা। যেমন করেই দেখি না কেন, এক ফল। জাতক মাতৃঘাতী। জাতকের স্ত্রী কুলত্যাগিনী। হে ভগবান। এ কি করলে! কেনই বা আমি নিজের কোষ্ঠী দেখতে গেলাম!

[সন্তোষের প্রবেশ।]

সন্তোষ। বাইরে মক্কেল এসেছে। দোর খুলে দেব?

বরদা। (যেন ক্ষিপ্তের মত) চুপ। না, আসবে না। কেউ আসবে না। পারব না কারুর হাত দেখতে! তুমিও বাইরে যাও। যাও! যাও শিগগির—।

[সন্তোষের প্রস্থান। বরদা সজোরে দরজা বন্ধ করে দিলেন। কিছু পরে—রুদ্ধ দ্বারের বাইরে সন্তোষ ও মার প্রবেশ]

মা। সনু, বরদা এখনও দোর খোলে নি?

সন্তোষ। না মা।

মা। কোন জরুরী কাজ আছে নাকি রে?

সন্তোষ। কিছুই তো জানি নে মা। এমন কোন কাজের বরাত থাকলে অন্তত আমি তো জানব।...সেই যে তখন আপনি ডাকলেন, উনি এক বার উঠে গেলেন, ব্যস—তার পর ফিরে এসে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজা বন্ধ করেছেন। কত লোক এল—সবাইকে ফিরিয়ে দিলুম।...তখন আপনার সঙ্গে রাগারাগি হয়েছিল নাকি মা?

মা। না রে, সে সামান্য ব্যাপার। পাশের বাড়ির রায়-গিন্নী এসেছিলেন তাঁর ভাগ্নীকে সংগে করে। মেয়েটি বেশ, আমাদেরই পাল্‌টি ঘর, তাই মনে করলুম এক ছুতোয় বরদাকে দেখিয়ে দিই। ওকে ডেকে পাঠিয়েছি, এমন সময় বাতাসে দরজার কপাট দুটো দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। ও আসছে মনে করে আমি তাড়াতাড়ি উঠে খুলতে গেছি, ঠিক সেই সময়ে বরদাও বাইরে থেকে এসে ধাক্কা দিয়েছে। কপাটটা সজোরে লেগে আমার কপালের এইখানটায় কেটে গেল একটুখানি। সে সামান্যই—কিন্তু সেই যে ওর কি হল, একটা কথাও না করে তখনই ফিরে চলে এল। তার পর থেকে তো এই শুনছি দোর বন্ধ করে বসে আছে। বিকেলে চা পর্যন্ত খায় নি, জল খাবার তো নয়ই। এধারে রাত নটা বাজে।

সন্তোষ। আপনি একবার ডাকুন না মা।

মা। ডাকব? রাগ টাগ করবে না তো?

[দরজায় ঘা দিলেন।]

বরদা। (ভিতর থেকে, রুক্ষ স্বরে) কে, কে ওখানে?

মা। আমি রে, দোর খোল।

বরদা। ওঃ, মা। (দরজা খুলে বাইরে এলেন।)

মা। কী ব্যাপার রে? দুপুর থেকে দোর বন্ধ করে করছিস কি?

বরদা। ও তুমি বুঝবে না মা। জ্যোতিষেরই একটা নতুন হিসেব নিয়ে বড় ব্যস্ত ছিলুম। আচ্ছা মা, তুমি তীর্থবাস করতে চেয়েছিলে, এখন যাবে? এখন তো যা হোক অবস্থা একটু সচ্ছল, তোমার খরচা দিতে পারব। কাশীতে গিয়ে থাকো না—

মা। তীর্থবাস করতে কার না সাধ যায় বল, বিশেষ বুড়ো বয়সে। কিন্তু তুই যে সংসারী হলি নে, তোকে ভাত-জল দেবার একটা লোক না হলে—

বরদা। (অসহিষ্ণুভাবে) সে ভাবনা আর কত কাল ভাববে মা? তুমি মরে গেলে কে দেখবে?

মা। সে তখন আলাদা কথা। যত দিন বেঁচে আছি—।

বরদা। তা হলে তুমি যাবে না?

মা। তুই একটা বিয়ে করিস তো যাই—

বরদা। আঃ—কতদিন তো বলেছি মা যে সে আমি পারব না।

মা। তা হলে আমিও যাব না। তা ছাড়া এই বুড়ো বয়সে একা কোন্ নির্বান্ধব পুরীতে গিয়ে থাকব বল দেখি। অসুখ-বিসুখ হলে দেখবে কে?

বরদা। যদি সঙ্গে লোক দিই—

মা। কেন বল দেখি আমাকে তাড়াবার জন্যে এত তাগিদ? আমি বিদেয় না হলে বুঝি বিয়ে করবি নি? বৌকে কষ্ট দেব ভাবছিস?

বরদা। (বিচিত্র হাসি হেসে) নিয়তি! আচ্ছা যাও মা, তুমি আমার ভাত বেড়ে রেখে শোও গে, আর একটু পরে যাচ্ছি আমি। সন্তোষ তুমিও যাও, খেয়ে-শুয়ে পড় গে—

[উভয়ের প্রস্থান।]

বরদা। আমি আমার মাকে হত্যা করব! আমি মাতৃঘাতী। আমার স্ত্রী কুলত্যাগিনী! তাই তো! হে নারায়ণ এ কী করলে।

[মার পুনঃপ্রবেশ]

বরদা। কী—মা!

মা। আমার একটা কথা রাখবি খোকা?

বরদা। বিয়ে করা ছাড়া আর যা বলবে তাই শুনব মা।

মা। যাক, ভালই হল, তুই কথা দিয়েছিস। তীর্থবাস না করি, বয়স তো হচ্ছে, আমার সঙ্গে চল—গোটাকতক বড় বড় তীর্থ করে আসি, এই কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার—

বরদা। আমাকে কেন টানছ মা, এখন বাইরে গেলেই তো লোকসান। বরং লোক দিচ্ছি সংগে—

মা। সে হয় না বাবা। বিদেশ বিভুঁয়ে যাওয়া, যদি মৃত্যু হয়, মরণকালে একটা ছেলের হাতের জল পাব না।

বরদা। এরই মধ্যে মরবার কথা কেন আসছে মা?

মা। জীবন-মরণের কথা কি বলা যায় বাবা। তা ছাড়া তুই-ই তো সেদিন বলছিলি কী সব ফাঁড়া আছে আমার। তুই নিজে বিশ্বাস করিস না, তবু একটা কবচ পরিয়ে দিলি হাতে—তবে? নিশ্চয়ই বড় কোন ফাঁড়া দেখেছিস! তা ছাড়া এমনিও—মরণের কথা কেউ বলতে পারে?

বরদা। লক্ষ্মীটি মা, আমি বরং সন্তোষকে সংগে দিচ্ছি, টাকা যত চাও দিচ্ছি, আমাকে টেনো না।

মা। এই যে তুই কথা দিলি খোকা।

বরদা। মা, আমার কথাটা শোন আগে—

মা। (কঠিন হয়ে উঠলেন) না বাপু। চিরকাল কথা শুনিয়েই তো রেখে দিলি। কখনও কিছু মুখ ফুটে চেয়েছি তোর কাছে? জীবনের শেষ কাজ বুড়ো মাকে তীর্থ করানো, যদি মন হয় সংগে করে নিয়ে চলু, নইলে দরকার নেই।

বরদা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) নিয়তি কেন বাধ্যতে। তাই হবে মা। কবে যেতে হবে বল, আমি প্রস্তুত।

তৃতীয় দৃশ্য

[কাশী। উপেন চক্রবর্তীর বাড়ি। স্টেজের বাঁ দিকে ভেতরের ঘর দেখা যাচ্ছে। ডান দিকে রাস্তা ও বাড়ির সদর। উপেন চক্রবর্তী মেরজাইটা কাঁধে ফেলে নিতান্ত অপ্রসন্ন মুখে বার হচ্ছেন। বরদার প্রবেশ।]

বরদা। মশাই, এখানে কোথায় উপেন চক্রবর্তী মশাইয়ের যাত্রী-তোলা বাড়ি আছে বলতে পারেন?

উপেন। বিলক্ষণ! একে বলে যোগাযোগ! সবই বাবা বিশ্বনাথের কৃপা। সাধ করে কি আর বাবার চরণের তলায় পড়ে আছি। (হাত তুলে উদ্দেশে নমস্কার) কথাটা বুঝতে পারলেন না বুঝি? আপনি সকালে বেরিয়েছেন কোথায় একটা ঘর ভাড়া পাওয়া যায় খুঁজতে আর আমিও বেরোব ভাবছি কোথায় একটা ভাড়াটে পাওয়া যায় দেখতে—একেবারে ঠিক সেই দুটি লোকেরই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল—এ বাবার যোগাযোগ ছাড়া কি বলব বলুন?

বরদা। আপনিই তাহ'লে উপেন চক্রবর্তী! তা ভাড়া কত আপনার ঘরের?

উপেন। কিছু না, কিছু না। ঠিক যেমনটি চান। বামুনের গরু আর কি, অল্প খাবে বেশী দুধ দেবে আবার নাদবেও বেশী। দৈনিক চার আনা করে ভাড়া দেবেন আর কি, তাতেই আমি খুশী। নাম মাত্র, নাম মাত্র।

বরদা। দৈনিক চার আনা করে হলে মাসিক সাড়ে সাত টাকা হয়, সেটা কি আর কাশীর হিসাবে নাম মাত্র হল?

উপেন। বিলক্ষণ! হল বৈ কি। সে আপনার ধরুন মাসের হিসেব ধরলে তো চলবে না। এ হল গে খুচরো। আজ আছেন কাল নেই। একটু বেশী দিতে হবে বৈকি।

বরদা। না, আমরা বহু তীর্থ ঘুরে ক্লান্ত। এখানে একটু বিশ্রাম করব। অন্তত আট-দশ দিন।

উপেন। ঐ হল। মাস তো আর নয়। সে আপনি ভাববেন না। কৈ, আপনার মালপত্র কৈ? ঐ মুটের মাথায় বুঝি? এই যে মা ঠাকরুনও রয়েছেন। চলুন চলুন নিয়ে আসি গে।

বরদা। (চারিদিকে তাকিয়ে) আমরা কিন্তু গংগাতীরে বাড়ি খুঁজছিলুম। এক জন আপনার নাম করলে—কিন্তু এ তো দেখছি—

উপেন। বিলক্ষণ! গংগাতীর কি বলছেন। গংগাগর্ভে বলতে পারেন। তোফা ঘর, দেখলেই আপনার পছন্দ হবে। জানলাটি খুলে ঘরে শুয়ে থাকবেন —মনে হবে যেন গংগার ওপরেই আছেন। শুয়ে শুয়ে দেখবেন বাবুভাইরা কেমন সব নৌকো করে বেড়াতে চলেছে।

বরদা। তা ঘরটা একটু দেখা হল না তো?

উপেন। কিছু না, কিছু না। কোন দরকার নেই।

বরদা। কোন ঘরে থাক্‌ব সেটা দেখারও দরকার নেই?

উপেন। বিলক্ষণ! সে ঘর দেখলেই আপনার পছন্দ হবে। খাসা ঘর। আপনারা কি? ব্রাহ্মণ! ব্যস্‌। ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতি, আপনাকে কি আর ঠকাতে পারি!

বরদা। তবে তাই হোক্‌। এই নিন্‌, দুটো টাকা রাখুন। আট দিনের ভাড়া আগাম।

উপেন। ও থাক্‌, পরে হবে। আমরা মানুষ দেখলেই চিনতে পারি বাবু। আগে মালগুলো—মা, এই যে, এদিকে আসুন মা—আমি আপনার ছেলে। বাবা বিশ্বনাথ একেবারে বেছে বেছে ঠিক ছেলের বাড়িটিতেই এনে হাজির করেছেন। এই বাবা, আরে এ মোটওয়ালা লে আ বাবা, সামান্‌ ইধার লে আ।

[ব্যস্ত হয়ে মাল তুলতে গেলেন। বরদা ও মা ভেতরে প্রবেশ করলেন।]

মা। যাক্‌! ব্রাহ্মণের বাড়ি। ভালই হ'ল। দুটো দিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচব তবু। আর ঘুরতে পারছি না।

বরদা। বেশ তো, তুমিও খানিক বিশ্রাম কর, আমিও জ্যোতিষটা একটু ঝালিয়ে নিই। কাশীতে বিস্তর পুঁথি-পত্তর আছে।

[উপেনের প্রবেশ।]

উপেন। মালপত্র সব আপনার ওপরের ঘরে তুলে রেখে এসেছি বাবু। দিয়ে দিন এবার ওর মজুরিটা চুকিয়ে। ঘর ধোওয়া-মোছা আছে, কোন কিছু দেখতে হবে না। এই যে এসে উঠলেন, একেবারে নিশ্চিন্ত—বাঘের পেটে ঢুকলেন।

বরদা। কী সর্বনাশ! বলেন কি?

উপেন। বিলক্ষণ! তবে আর বলছি কি। আমার নাম উপেন চক্কোত্তি, কাশী সুদ্ধ লোক চেনে। কে, কোন ব্যাটা পান্ডা এসে ভোগা দিয়ে নিক্ দিকি একটা পয়সা! টুঁটি চেপে ধরব না!

মা। আপনার আর কে কে আছে এখানে চক্কোত্তিমশাই?

উপেন। আমার মা? সবাই ছিল—বাবার ইচ্ছা, আসল যে তাকেই টেনে নিলেন। আজ পুরো দু বছর হল পরিবার নেই। আছে একটি মেয়ে আর দুটি ছেলে। বড় ছেলেটা মনোহারীর দোকানে চাকরি করে, ছোটটা চিন্তামণির ইস্কুলে পড়ে। আর মেয়েটা—(হাঁক পাড়লেন) ওমা সরমা, কোথায় গেলি মা? ওপরে বোধ হয় আপনাদেরই বিছানা করছে। আপনাদের কিছু করতে হবে না। সব আমার মেয়ে করে দেবে। আপনারা একটু সুস্থ হোন্। ঐ বারান্দায় জল আছে, আগে মুখে হাতে দিন। একটু বরং শরবৎ করে দিক—কী বলেন?

[সরমার প্রবেশ। বরদা কৌতূহলী হয়ে মেয়েটির দিকে তাকালেন। বেশ সুশ্রী মেয়েটি, যৌবনে ও স্বাস্থ্যে টলোমলো। ময়লা কাপড়ে ও নিরাভরণ অবস্থাতেও সে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।]

উপেন। এই যে মা ঠাকরুন, ইটিই আমার মেয়ে। বড় লক্ষ্মী মেয়ে মা। কী বলব বড় গরীব আমরা, নইলে রাজারাজড়ার ঘরে পড়বার মত মেয়ে।

[সরমা চোখ নত করে দাঁড়ায় ওঁর কথা শুনে।]

উপেন। পেন্নাম কর্ মা, পেন্নাম কর্। ওঁরাও ব্রাহ্মণ।...হ্যাঁ, যা বলছিলাম—বড় লক্ষ্মী মেয়ে মা। উনি তো আজ দু বছর নেই, তার আগেও প্রায় বছরখানেক ভুগেছেন—সংসারটার ভার সবই তো ওর মাথায় বলতে গেলে। ভাইবোনদের দেখা, আবার তেমনি যাত্রী যদি আসে, খেতে চায় খোরাকি দিয়ে, সে সব রান্না-বান্না—ওকেই সব করতে হয়!

বরদা। বলেন কি? ওকে দিয়ে হোটেলের রান্না রাঁধান?

উপেন। কী করব বাবু, বড় গরীব আমরা! বোঝেন তো, খোরাকি যা দেয় তা থেকেও দু পয়সা বাঁচে! এমনি করে যোগেযাগে সংসার চালানো।

নইলে এই তো বাড়িটুকু সম্বল, বারো মাস কিছু ভাড়াটে থাকে না। আমার আবার দুর্দান্ত হাঁপানির ব্যায়রাম। শীতকালে অকর্মণ্য হয়ে পড়ি একেবারে। কষ্ট হয় ওর খুবই, শুধু কি খাওয়া, চা জলখাবার, তার ওপর সতেরো রকম টাইস !...তবে শুধু বাসাড়ে বেটাছেলে ভাড়াটে রাখি না। আর তেমন লোক দেখলে ওকে বেরোতেও দিই না তাদের সামনে। কিন্তু করতে ওকেই তো সব হয়। (দীর্ঘশ্বাস) ঐ তো ভাবনা হয়েছে মা ঠাকরুন—গাছের মত মেয়ে হয়ে রয়েছে, আপনার কাছে বলতে কি, বয়সও উনিশ-কুড়ি হল—কী করে যে পাত্রস্থ করব এই এখন ভাবনা। জানি না বাবা বিশ্বনাথের মনে কি আছে!

মা। আহা! তা তো বটেই—ভাবনা হবে না! বাপ-মায়ের কী ঘুম হয়! (সহানুভূতির স্বরে) তা বাবা তুমি ভেবো না—এই ছেলে আমার খুব বড় জ্যোতিষী, ও তোমার মেয়ের হাত দেখে দেবে'খন।

উপেন। বিলক্ষণ! তাই নাকি, তাই নাকি! এ একেবারে সাক্ষাৎ বাবার যোগাযোগ।

[উপেন হাত তুলে উদ্দেশে নমস্কার করেন। সরমা ততক্ষণে কাজে লেগে গিয়েছিল। মা গায়ের চাদর খুলছিলেন দেখে নিঃশব্দে তাঁর হাত থেকে সেটা খুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা মাদুর বিছিয়ে হাত ধরে বসাল। পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। বরদা সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। বোধ হয় লক্ষ্য করছিলেন ওর কর্ম-নিপুণ সুডৌল ও সুগৌর হাত দুটি ; সহসা চমক ভাঙ্গল উপেনের কথায়। উপেন মেয়ের হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ওঁর সামনে এনে বাঁ-হাত খানা তুলে ধরে বললেন—]

উপেন। দেখবেন বাবু একটু—? আমি রাত্রে ঘুমোতে পারি না, মুখে অন্নজল ওঠে না ওর কথা ভেবে। যদি আজ চোখ বুঝি তো কাল ওকে বাজারে নাম-লেখাতে হবে হয়তো।

মা। ছি ছি, কী যে বল!

বরদা। এখনি কেন, এর পর ভাল করে দেখে দেব'খন।

উপেন। সে তো ভাল করে দেখবেনই বাবু, এখন যদি একটু চোখ বুলিয়ে দেন—।

[বরদা তবুও হাতটা ধরলেন না। একটু কঠিন দৃষ্টিতে উপেনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—]

বরদা। কিন্তু আমি বড় দুর্মুখ—যা সত্যি তাই বলব হয়তো। সইতে পারবেন ?

উপেন। আজ্ঞে, বিলক্ষণ! এতই সইছি আর আপনার কথাটুকু সইতে পারব না ?

বরদা। (আর কথা না বলে সরমার হাতখানা তুলে ধরলেন চোখের সামনে—একটু পরে) না, এ তো হাত ভালই। সতী, সৌভাগ্যবতী হবে আপনার কন্যা।···আচ্ছা, এর পর ভাল করে দেখব এক দিন।

উপেন। যে আজ্ঞে, তাই দেখবেন। চলুন এখন মুখ-হাতটা—

[বরদা ও উপেনের প্রস্থান।]

মা। তা তোমার বাবা মিছে কথা বলেন নি মা। সত্যিই তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে। তোমরা কোন শ্রেণী মা?

সরমা। (মুখ নত করে) রাঢ়ী শ্রেণী।

মা। আমরাও তাই। (একটু পরে) তোমাদের পদবী কি জান মা?

সরমা। ঐ যে বাবা বললেন, চক্রবর্তী।

মা। পাগলী মেয়ে—ওটা পদবী নয়, ওটা উপাধি। চক্রবর্তী ভট্টাচার্য রাঢ়ী বারেন্দ্র সব শ্রেণীতেই থাকে—উপাধি ওটা। গোত্র কি মা তোমাদের?

সরমা। শাণ্ডিল্য।

মা। তবে বাঁড়ুয্যে। আমরা হলুম মুখুয্যে—ভরদ্বাজ গোত্র।

[একটু এগিয়ে এসে ওর মুখখানি তুলে ধরলেন আলোর দিকে। লজ্জায় সরমার চোখের পাতা দুটি বুজে এসেছে। লজ্জায় ও পরিশ্রমে মুখখানি লাল—ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।]

মা। তোমার বাবা ঠিকই বলেছেন মা, এমন মেয়ে রাজারাজড়ার ঘরেই মানায়।

চতুর্থ দৃশ্য

[কাশী। মণিকর্ণিকার ঘাট। মার শবদেহ পড়ে। বরদা চুপ করে পাথরের মত বসে। বহুলোক ভিড় করে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আলো জ্বলবার সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাচ্ছে বহু লোকের মিলিত কণ্ঠ—হ্যাঁ। সে কি! প্রাণ নেই? বলেন কি?]

১ম ব্যক্তি। কি, ব্যাপার কি মশাই? কি হয়েছে?

২য় ব্যক্তি। ঐ যে, ঐ ভদ্রলোকের বুড়ো মা। স্নান করতে এসেছিলেন। বড্ড পেছল দেখে ছেলেকে ডাকলেন একটু ধর বলে—ভদ্রলোক যেমন নেমে ধরতে যাবেন উনিও পা পিছলে গিয়ে পড়লেন মার ওপরে, ব্যস! মা তলিয়ে গেলেন একেবারে। তার পর বিস্তর লোক লাগিয়ে তোলা গেছে বটে কিন্তু শুনছি প্রাণ নেই।

১ম ব্যক্তি। কী সর্বনাশ। ভদ্রলোক কি এখানকার লোক?

২য়। কি জানি। সেই থেকে তো গুম্ খেয়ে বসে আছেন। কোন কথাই বলছেন না। তবে মনে হচ্ছে নতুন লোক, যাত্রী।…ও মশাই, এখানে কোথায় উঠেছেন বলুন না। আপনার আত্মীয়-স্বজন এখানে কেউ আছে?

বরদা। (যেন ঘুম ভেঙে) আত্মীয়-স্বজন? না আত্মীয়-স্বজন তো কেউ নেই সঙ্গে, তবে যে বাড়িতে আছি, সেই বাড়িওলাকে যদি একটু খবর দেন—আমি তো কাউকে চিনি না।

১ম। বেশ তো, বাড়িওলার নাম ঠিকানা দিন না—

বরদা। চৌষট্টি যোগিনীর গলি। উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

২য়। কে, কী নাম বললেন? উপেন চক্কোত্তি? আরে, তাঁকে যে এই দিকেই দেখছিলাম। দাঁড়ান দেখছি—ঐ যে, (চীৎকার করে) অ উপেনবাবু, উপেনবাবু—

[ব্যস্ত হয়ে উপেনের প্রবেশ।]

উপেন। বিলক্ষণ! এ কী সর্বনেশে কথা শুনলুম বাবু! কী করে এমন সর্বনাশ হল? হ্যাঁ! এই যে দেখলুম মা ঠাকরুন আমার সুস্থ মানুষ, কথাবার্তা কইছেন! হ্যাঁ! হায় হায়, এ কী সর্বনাশ হল। আমারই দুর্বুদ্ধি, সেই এলুম নাইতে, যদি সঙ্গে আসি তো এমনটা হয় না।

[ভিড় ঠেলে সরমাও এসে দাঁড়াল। মুহূর্ত কয়েক স্থির হয়ে চেয়ে রইল মার দিকে। দেখতে দেখতে চোখে জল ভরে এল। কোন মতে মুখ ফিরিয়ে প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে একেবারে বরদার পাশে এসে দাঁড়াল।]

সরমা। শুনছেন, আপনি একটু শক্ত হোন্। এখন এমন বিহ্বল হলে তো চলবে না। মায়ের শেষ কাজ আপনাকেই করতে হবে যে! এঁরা তো শুধু জটলা করছেন—আপনি না লাগলে তো কাজ কিছু হবে না।

বরদা। হ্যাঁ। তা বটে। কিন্তু তোমার বাবা? তিনি কৈ? আসেন নি?

উপেন। বিলক্ষণ। এই যে আমি।

বরদা। চক্কোত্তি মশাই, এ নিয়ে কি আবার পুলিস-হাঙ্গামা হবে? মায়ের মৃতদেহটা নিয়ে কাটা-ছেঁড়া হলে বড্ড আঘাত পাব।

উপেন। বিলক্ষণ! আমার নাম উপেন চক্কোত্তি, কাশীতে আমার জন্ম-কর্ম, আটচল্লিশ বছর কাটল। তবে বাবু, কিছু যে খরচা আছে। আমি তো বড় গরীব জানেনই—

বরদা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তার জন্য ভাববেন না। বলুন, কত দেব—।

উপেন। এ ধারেও তো খরচ ঢের। খাটিয়া চাই—কাপড় একটা কিনতে হবে, ঘাট-খরচা আছে—দ্যান গোটা ত্রিশেক টাকা! আপনি ততক্ষণ জামা-

টামাগুলো খুলে একটু ছুঁয়ে বসুন। বসতে হয়। আমি এক বার চট করে সরযুপ্রসাদ দারোগার বাসাটা ঘুরে আসছি।

[উপেনের প্রস্থান।]

সরমা। (একটু পরে) আপনার কি কান্না পাচ্ছে না? কাঁদবারই তো কথা। মা মারা গেছেন, একটু পরে তাঁর চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও থাকবে না—

বরদা। (রুক্ষ স্বরে) কে বললে থাকবে না। কে বলেছে তোমাকে? মোছা যাবে না সে চিহ্ন, সেইটেই তো সমস্যা! চিরকাল, চিরদিন থাকবে—আমরণ।

সরমা। আমি কিন্তু—

বরদা। ও, সরমা! হ্যাঁ, কান্না পেলে যে ভাল হত তা বুঝি। কিন্তু কান্না যে পাচ্ছে না, বুকের মধ্যেটা জ্বলে যাচ্ছে শুধু!

সরমা। এ নিয়তি! মিছিমিছি আপনি নিজেকে দায়ী করছেন কেন?

বরদা। নিয়তি। তাই বটে! তাই বটে—। নিয়তি! নিয়তি।

পঞ্চম দৃশ্য

[উপেনবাবুর বাড়ি। বরদা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে খেতে বসেছেন। সরমা সামনে বসে বাতাস করছে। বরদার সদ্য অশৌচান্ত চেহারা।]

সরমা। না না, ও কটি ভাত আপনাকে দুধ দিয়ে খেতেই হবে। কিছুতে ফেলে উঠতে পারবেন না। উঠুন দেখি কেমন উঠতে পারেন—আমি অনর্থ করব বলে দিলাম।

বরদা। (হেসে) কী অনর্থ করবে?

সরমা। (হেসে ফেলে) সে তখন দেখবেন! না, না, আপনার এ ভারি অন্যায়। কদিন কি ধকলটা গেল বলুন দিকি শরীরের ওপর দিয়ে।

বরদা। কিছুই ধকল যায় নি, তোমার সামনে তখনও কি কম খেতে পেরেছি।

সরমা। ছাই! আমার কথা তো কত শুনেছেন।

বরদা। আচ্ছা, খাওয়ার জন্য কেন অমন কর বল তো!

সরমা। আহা, চেহারাটা কি দাঁড়িয়েছে তা তো আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আমাদের দেখতে হচ্ছে যে।

বরদা। চেহারাটা আমার চিরদিনই ঐ রকম সরমা। তা ছাড়া আজ না হয় তুমি জোর করে খাওয়ালে—কিন্তু এর পর? কলকাতায় ফিরে তো রাঁধুনী

বামুনের রান্না খেতে হবে—নয় তো স্বপাক। কোন মতে সেদ্ধপক্ক, ভাতেভাত! তখন কে খাওয়াবে এত যত্ন করে, চেহারার দিকেই বা কে নজর রাখবে?

[বরদার অসহায় ভাবে বলার ভঙ্গীতে সরমার চোখে জল এসে গেল।]

সরমা। (অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে) যত্ন করে খাওয়াবার, নজর রাখবার লোক একটা নিয়ে এলেই তো পারেন?

বরদা। (যেন জোর করেই হাসেন) তা বটে। এবার দেখছি তাই আনতে হবে। যা আরামের অভ্যাস তুমি করে দিলে। কিন্তু যাকে তাকে ধরে আনলেই কি আর সে তেমন করে দেখবে তোমার মত?

সরমা। আমি তো ছাই দেখছি! কিন্তু বাড়ি গিয়েও যা খুশি তাই করতে পারবেন না, ভাল করে খাবেন পেট ভরে। আমি মাথার দিব্যি দিয়ে দেব কিন্তু।

বরদা। যদি সে দিব্যি না মানি! তুমি গিয়ে পাহারা দেবে?

সরমা। (হঠাৎ ঝোঁকের মাথায়) হ্যাঁ দেব তো!

[বলে ফেলেই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।]

বরদা। তাই যদি যাও তো দিব্যি দেবার আর দরকার কি? তুমিই গিয়ে খাইও। তোমার বাবার চাকরি ছাড়িয়ে আমার চাকরিতেই না হয় তোমাকে বহাল করা যাবে।···ওকি, ওকি যাও কোথায়? আরে, হাতে জল দিয়ে যাও।

[সরমার প্রস্থান, উপেনের প্রবেশ।]

উপেন। এই যে বাবু। কী বলছিলেন? ও, হাতে জল? সরমা নেই বুঝি? আচ্ছা আমিই দিচ্ছি নেন—

[আচমনের পর—]

উপেন। বাবুর তো যাওয়ার সময় হয়ে গেল। এতদিন ছিলেন, আপনার লোকের মতই হয়ে গিয়েছিলেন,—ক'দিন বাড়িটা খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। আর যা ক্ষতি হল আপনার, দু দিন যে আরো থেকে যেতে বলব সে সাহসও নেই।

বরদা। ফাঁকা ফাঁকা আমারও সেখানে লাগবে উপেনবাবু। আমি যে বাড়িতে নেই, সেটা এক বারও মনে হয় নি এখানে।

উপেন। কী যে বলেন! কীই বা করতে পেরেছি আপনার।

বরদা। না না। আপনাদের ঋণ শোধ হবার নয়। · তবু যদি কিছু করবার থাকে তো বলুন। আপনাদের সামান্য কিছু উপকার করতে পারলেও খুশী হব।

উপেন। (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে) সত্যিই উপকার করতে চান? করবেন?

বরদা। নিশ্চয় করব! অবশ্য সাধ্যে কুলোলে।

উপেন। কথা দিচ্ছেন?

বরদা। হ্যাঁ দিচ্ছি।

উপেন। তা হলে আমার কন্যাটিকে দয়া করে গ্রহণ করুন। ও আপনার খুব অনুপযুক্ত হবে না।

বরদা। (শিউরে উঠলেন) হ্যাঁ। সে কি?

উপেন। বিলক্ষণ! ব্রাহ্মণের কন্যাদায়ের কাছে আর কি আছে বলুন? আর আপনিও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতি।

বরদা। কিন্তু উপেনবাবু, বিবাহ যে আমি কখনই করব না স্থির করেছি!

উপেন। ওঃ! স্থির করেছেন। সেটা কোন বাধা নয়। আমাকে আপনি কথা দিয়েছেন যে সম্ভব হলেই আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন, এক্ষেত্রে অসম্ভব কোন বাধা তো নেই।

বরদা। আপনি, আপনি সে সব কথা বুঝতে পারবেন না উপেনবাবু, সে হবার নয়।

উপেন। (মধু-তিক্ত কণ্ঠে) হবার যে নয় তা আমি জানি। তাই তো চুপ করেই ছিলাম। গরীবের মেয়েকে কে আর নিতে চাইবে বলুন। নেহাৎ আপনি কথাটা তুললেন বলেই—

বরদা। (অস্ফুট কণ্ঠে) নিয়তি।

উপেন (ব্যগ্রভাবে) কি বললেন?

বরদা। না, কিছু না। তা হবার নয় উপেনবাবু, মাপ করবেন আমাকে। আমার সময় হয়ে এল। একটা গাড়ি ডেকে আনি।

উপেন। আপনি কেন যাবেন, আমিই আনিয়ে দিচ্ছি—

[প্রস্থান, সরমার প্রবেশ।]

বরদা। তোমার বাবা গাড়ী আনতে গেছেন, বাক্স-বিছানাগুলো—

সরমা। হ্যাঁ। সে সব ঠিক আছে। কিন্তু বিয়ে করবেন না কেন তাই শুনি? বিয়ের বয়স হয়নি আপনার?

বরদা। (বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে) এ—এসব কথা তোমাকে আলোচনা করতে নেই সরমা—

সরমা। আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আমার ঢের বয়স হয়েছে, কি কথা আলোচনা করতে আছে না আছে তা জানি।

বরদা। (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে—স্থির ভাবে) বিয়ের বয়স আমার হয়েছে বৈকি সরমা, হয়তো সে বয়স উত্তীর্ণ হয়েই গেছে।

সরমা। তবে কেন বিয়ে করবেন না? আমি আপনার উপযুক্ত নই? আরো কত ভাল মেয়ে আশা করেন আপনি?

বরদা। ছি সরমা, তুমি হঠাৎ বড় উত্তেজিত হয়েছ, কী বলছ তাই তুমি জানো না। তুমি আমার উপযুক্ত নও! তোমার মত মেয়ে পেলে যে কেউ তার জীবন সার্থক বোধ করবে।

সরমা। তবে ? তবে কেন আপনি রাজী হচ্ছেন না ? বলুন জবাব দিন।

বরদা। তুমি বিশ্বাস কর, সে কারণ কাউকে জানাবার নয়। কিন্তু সত্যিই আমি অপারগ। আমাকে মাপ করো।

সরমা। (হঠাৎ যেন মুখ দিয়ে বার হয়ে গেল) তবে—তবে আপনি আমাকে আশা দিয়েছিলেন কেন ? কেন আমাকে বলেছিলেন—

বরদা। তোমাকে আশা দিয়েছিলাম ? কী সর্বনাশ। কি বলেছিলাম তোমাকে ?

সরমা। জানি না। মনে করে দেখুন। সেরকম আশা না পেলে আমার বাবা কখনও উপযাচক হয়ে আপনার কাছে একথা পাড়তেন না। বাবা গরীব হতে পারেন, ভিখিরী নন। আর আমিও এমন কিছু তাচ্ছিল্যের জিনিস নই যে দু দিন খুশি-মত, প্রয়োজন-মত দুটো মিথ্যে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে খেলা করবেন, তার পর ছেঁড়া জুতোর মত ফেলে দিয়ে চলে যাবেন।

বরদা। (ব্যাকুল ভাবে) সরমা, কী বলছ তুমি ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

সরমা। থামুন। আপনার ও মিষ্টি কথার ন্যাকামি ঢের শুনেছি। কি মনে করেন আমাদের ? গরীব হতে পারি কিন্তু ব্রাহ্মণের মেয়ে। যান—আপনি বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু এও বলে রাখছি আপনাকে, যদি আমি সতী মায়ের মেয়ে হই, আমার বাবা যদি এখনও পর্যন্ত প্রত্যহ গায়ত্রী জপ করে জল খেয়ে থাকেন তো ছ মাসের মধ্যে আবার এখানে এসে সেধে আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বরদা জ্যোতিষীর অফিস-ঘর। মক্কেলরা বসে আছেন। বরদা বাইরের দিকে দৃষ্টি স্থির-নিবদ্ধ করে ডেস্কের সামনে বসে।]

১ম মক্কেল। (চুপি চুপি) উনি অত কি ভাবছেন মশাই ? আমরা হাঁ করে বসে আছি সবাই—একঘর লোক—আর উনি দিব্যি সামনে একটা কাগজ মেলে চুপচাপ বসে আছেন।

২য় মক্কেল। (তেমনি চুপি চুপি) চাল ! চাল ! দেখাচ্ছে যে আমি কত বড় জ্যোতিষী। অত গুনে গেঁথে হয় তো কচুপোড়া, কোনটাই মেলে না শেষ পর্যন্ত। ও কত জ্যোতিষী দেখলাম।

বরদা। (হঠাৎ শুনতে পেয়ে) তা হলে এখানে এসেছেন কেন ? কী করতে এসেছেন ?

২য়। না মানে, এই তবু ও—

বরদা। আমি আপনার হাত দেখব না। যান আপনি চলে যান—

২য়। না না, আপনি রাগ করবেন না, ওটা কথার কথা।

বরদা। বুঝেছি, কিন্তু আমি আপনার হাত দেখব না।

২য়। (রেগে) আপনি মশাই টাকা নেবেন, হাত দেখবেন। আমি কাকে কি বলেছি না বলেছি তাতে আপনার দরকার কি ? আপনার মত জ্যোতিষীর অভাব আছে ? ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব ? দুটো পয়সার জন্যে হা-পিত্যেশ করে তো বসে আছেন—তার আবার এত তেজ কেন ? এই তো শুনলাম কাশীতে আপনার মা অপঘাতে মরেছেন, আপনি জ্যোতিষী, সেটা আগে গুনে দেখতে পেরেছিলেন ?

বরদা। (যেন ক্ষেপে উঠলেন) যান যান—এখনি বেরিয়ে যান বলছি।

২য়। আচ্ছা যাচ্ছি। কিন্তু এত তেজ ভাল নয়।

[২য় মক্কেল গজ গজ করতে করতে চলে গেলেন।]

বরদা। (কিছুক্ষণ পরে) আপনারা আমাকে মাপ করবেন, আজ আর কাজ করতে পারব না। মনটা সুস্থ নেই।

১ম। আপনার মশাই অমন আচরণটা করা ঠিক হয় নি। তার পর আবার আমাদের এমন করে ডিসমিস করে দিচ্ছেন। আপনার এটা ব্যবসা, আমরা খদ্দের—এত মেজাজ দেখালে চলবে কেন ?

বরদা। (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে) হ্যাঁ, কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে। আমাকে মাপ করবেন। সত্যিই মাথাটার ঠিক নেই. কাজ করতে গেলে ভুল হবে। আমার অপরাধ নেবেন না।

৩য়। শুনছেন।

বরদা। কী ?

৩য়। আমার যে তিন-চারটে জমি বায়না করার কথা, আজই বিকেলে।

বরদা। তা আমি কি করব বলুন !

৩য়। জমি কি আমি ঘিয়ে ভেজে খাব। আচ্ছা লোক তো আপনি মশাই।

বরদা। আজ্ঞে আপনার কথা তো—

৩য়। তা কেন বুঝবেন ! ন্যাকা।

বরদা। (ধমক দিয়ে) দেখুন যা বলবেন ভদ্র ভাষায় বলুন।

৩য়। ইস—! গেল বুঝি সব মাটি হয়ে ! না না—মাপ করবেন আমার মুখটাই ঐ রকম। সে কথা নয়—বলছিলুম কি—জমিতে কিছু কিছু স্পেকুলেশন করে থাকি কিনা, তারই তিনটে বায়না আজ। তা, ঐ মানে হাতটা যদি একটু দেখতেন—সময়টা কি রকম যাচ্ছে এই আর কি। আজই বায়না কিনা।

বরদা। ও, হাত দেখতে হবে ? মাপ করবেন। আজ আর পারব না।

৩য়। একটুখানি। স্লাইট্লি ? একটা গ্ল্যান্স্ আর কি !

বরদা। না-না-না ! কেন বিরক্ত করছেন এমন করে ?

৩য়। ও বাবা—এ যে ফোঁস করেই আছে। কিন্তু আমারও যে বড্ড গরজ।

বরদা। আপনারাই তো এমনি করে আমাকে অপ্রকৃতিস্থ করে তোলেন। বলছি আজ মাথার ঠিক নেই। ভুল দেখব সেইটে ঠিক হবে?

তন্ন। আজ্ঞে না। ভুল আবার ঠিক হয় কী করে?…তা নয়। তবে তিনটে বায়না কিনা।…ব্যাটারা কি আর শুনবে।

[প্রস্থান। সন্তোষ উসখুস করছিল। এবার কথা বলল—]

সন্তোষ। উনুনে তা হলে আঁচ দিই?

বরদা। আজ আর ভাল লাগছে না সন্তোষ, বরং কিছু চিঁড়ে-টিড়ের ব্যবস্থা দেখ।

সন্তোষ। আমিই না হয় চেষ্টা করি না রাঁধবার? চিঁড়ে খেয়ে আর কদিন কাটবে। আপনার যা চেহারা হয়েছে। আমরা যে আর তাকাতে পারছি না।

বরদা। (অস্ফুট স্বরে) কে যেন বলেছিল এই কথাগুলো, সরমা? এমন করে আর কদিন চলবে।…তাই তো। আচ্ছা, তাই যাও সন্তোষ, দেখ যদি পার দুটি ভাতে-ভাত নামাতে।

[সন্তোষের প্রস্থান। বরদা অধীরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন।]

বরদা। পত্নী কুলত্যাগিনী হবে। জন্মলগ্নের স্পষ্ট নির্দেশ। তাই তো। কিন্তু কিছুতেই যে চলা সম্ভব নয় আর, সরমা না হলে! দেখা যাক। সন্তোষ! সন্তোষ!

[সন্তোষের প্রবেশ।]

সন্তোষ। আমাকে ডাকছিলেন?

বরদা। হ্যাঁ! আমি আর এক বার অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করব স্থির করলাম।

সন্তোষ। আজ্ঞে কথাটা ঠিক—মানে বুঝতে পারলুম না!

বরদা। ও, না। আমি আজই রাত্রের ট্রেনে কাশী যাব। কিছু সঙ্গে নেব না, শুধু একটা সুটকেসে দু-একটা কাপড়-জামা আর কিছু টাকা।

সন্তোষ। বিছানা?

বরদা। কিছু না, কিছু না। সেখানে গিয়ে পড়লে আমার আর কিছুরই অভাব থাকবে না। তুমি রইলে তা হলে—ঘর-দোর দেখো। আমি, আমি হয়তো দু-এক দিনের মধ্যেই, হয়তো বা পরের দিনই ফিরব—নইলে বড় জোর দিন দশেক।

সন্তোষ। যে আজ্ঞে। কিন্তু আজই যাবেন, আপনার শরীরটা যে কদিন মোটে ভাল যাচ্ছে না।

বরদা। না, আজই যেতে হবে। কাল, কাল মায়ের মৃত্যুর ছ মাস পূর্ণ হবে। আজই যাওয়া চাই।

সন্তোষ। ওখানে একটা শ্রাদ্ধ করবেন বুঝি?

বরদা। শ্রাদ্ধ।…হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ধরেছ। শ্রাদ্ধ তো করতেই হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কাশী। উপেনবাবুর বাড়ি। সরমা গুন গুন করে গান গাইছিল। হাতে একটা শেলাই। বাইরে থেকে বরদার গলা শোনা গেল—]

বরদা। (বাইরে) চক্কোত্তি মশাই বাড়ি আছেন ?

সরমা। (চমকে উঠে অস্ফুট স্বরে) কে ? কার গলা ?

উপেন। (নেপথ্যে) বিলক্ষণ। আসুন, আসুন, বাবু আসুন। ওমা, সরমা !

[বরদা ও উপেনের প্রবেশ।]

উপেন। এই যে মা সরমা, বাবু এসেছেন রে, বাবু।···আমি বরং একটু জল এনে দিই মুখ-হাত ধোবার—তুই বাতাস কর্—

[সরমা এগিয়ে এসে প্রণাম করল। উপেনের প্রস্থান।]

বরদা। থাক থাক, পায়ে হাত দিও না, ছি !

সরমা। দিন আমাকে সুটকেসটা। ঐ চৌকিটায় বসুন দেখি—কি চেহারা হয়েছে আপনার ? কাল রাত্রে ট্রেনে বুঝি কিছুই খান নি ?

বরদা। (ম্লান হাসিয়া) অনেকদিনই ভাল করে কিছু খাই নি সরমা।

সরমা। (অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে) দাঁড়ান, একটু শরবৎ করে আনি।

[প্রস্থান। উপেনের প্রবেশ।]

উপেন। এই যে জল এনেছি বাবু। বিলক্ষণ ! এখনও জামা ছাড়েননি ? নিন নিন উঠুন—

বরদা। দাঁড়ান, আগে একটা কথা সেরে নিই। দেখুন আজ আপনার কাছে আমি প্রার্থী হয়ে এসেছি। আপনার কন্যাকে প্রার্থনা করছি—যদি আপত্তি না থাকে।

উপেন। বিলক্ষণ ! এ তো আমার ভাগ্য। এমন কপাল কি আর হবে সরমা মায়ের ? আমার তো ওর জন্যে ভাবনায় ঘুম হয় না।

বরদা। আমার বংশ বা বাড়িঘর সম্বন্ধে যদি কিছু খোঁজ করতে চান—

উপেন। বিলক্ষণ ! আমার নাম উপেন চক্কোত্তি। আটচল্লিশ বছর কাশীতে কাটল। মানুষ দেখলেই আমরা চিনতে পারি। সে সব কিছু ভাববেন না, বিশ্রাম করে সুস্থ হোন।

বরদা। তা হলে তার আগে মার এই কটা মাসিক আর সপিণ্ডকরণটা সেরে ফেলতে হয় যে ! সে ব্যবস্থাটাও আপনাকেই করে দিতে হবে। আমি দিন দেখেছি বিবাহের, আসছে সপ্তাহেই এ মাসের শেষ দিন।

উপেন। হবে বৈ কি। সব হবে। আপনি কিছু ব্যস্ত হবেন না। তবে

বাবু, একটা কথা—। আমি বড় গরীব, জানেন তো। বিবাহে কিছুই ব্যয় করবার সঙ্গতি নেই—

বরদা। তা জানি। ব্যয় সব আমারই—

উপেন। বাবা বিশ্বনাথের কৃপা। (উদ্দেশে নমস্কার) সবই তাঁর যোগাযোগ। ওমা সরমা—!…দেখি সে বেটি আবার গেল কোথায়—

[উপেনবাবু একরকম ছুটে বেরিয়ে গেলেন। অন্য দিক দিয়ে সরমা ঢুকল।]

সরমা। ওকি, আপনি এখনও মুখে-হাতে জল দেন নি ?

বরদা। তোমার কথাই সত্যি হল সরমা। আমি সেধেই এসেছি।

সরমা। (লজ্জিত কণ্ঠে) ওসব কথা আর তুলবেন না। ওতে আমার অপরাধ হয়। তখন ঝোঁকের মাথায় পাগলের মত কি বলেছি—

বরদা। কিন্তু তুমি আমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে তো ? ভাল করে ভেবে দেখ। বয়সে তোমার চেয়ে আমি ঢের বড়, চেহারাও তো এই—

সরমা। জানি না, যান—

বরদা। না না, পালালে চলবে না। ভাল করে চেয়ে দেখ। এর পর অনুতাপ করবে না তো ? ভাল করে চাও আমার দিকে, ঘর করতে পারবে আমার সঙ্গে ? ঘেন্না করবে না ?

সরমা। ছি ছি, কী বলেন আপনি যা তা! (গাঢ় স্বরে) অনেক শিব পুজো করে বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢেলে আপনাকে পেয়েছি। এ সৌভাগ্য যে কোন দিন হবে তা ভাবতেও পারি নি—

[সরমার পলায়ন। উপেনের প্রবেশ।]

উপেন। (নেপথ্যে) ও মা-সরমা ? (ভেতরে এসে) বিলক্ষণ! বেটি ছুটে পালাল কেন এমন করে—শুনেছে বুঝি ?

বরদা। আচ্ছা, দেখুন—ওর ঠিকুজী কুষ্ঠী—কিছু আছে ? নিদেন জন্মের তারিখ আর সময়টা।

উপেন। তারিখটা কোথায় একটা লেখা ছিল বটে কিন্তু সেটা আপাতত খুঁজে পাওয়া কঠিন। তা তাতে কি—

বরদা। না না—এমন কিছু নয়। ওর হাত আমি দেখেছি, আর সেই সঙ্গে আমারও। ভাগ্যের সঙ্গে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করব আমি, জন্মলগ্নে আর দরকার নেই।

উপেন। কী বললেন ?

বরদা। না কিছু নয়। কালই তো অমাবস্যা, শ্রাদ্ধটা কাল না করলে তো—

উপেন। বিলক্ষণ! এখনই বাজার করে ফেলছি আমি। এ কাশী শহর, পয়সা ফেললে বাজারের দেরি হয় ?

বরদা। টাকাটা তা হলে—

উপেন। বিলক্ষণ। বাজারটা করে আনি আগে। হিসেব করে টাকা নেব তখন।…মোদ্দা আপনি হাতমুখ ধুয়ে সুস্থ হোন। আমি বরং ঘুরে আসি। একাই তো সব করতে হবে!

[প্রস্থান।]

বরদা। সরমা—

সরমা। (প্রবেশ করে) ডাকছিলেন?

বরদা। এ সৌভাগ্য আমার কাছে এখনও অবিশ্বাস্য ঠেকছে। তাই বার বার ডেকে দেখছি যে, সত্যিই তুমি আমার কাছে আছ কিনা। এ ছ মাস যে কী করে কেটেছে আমার—তা তুমি কোন দিনই বুঝবে না। সমস্ত অন্তরটা যুদ্ধ করে করে ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত।

সরমা। তবু তো আমাকে পুরনো জুতোর মত ফেলে চলে গেলেন। আচ্ছা, আপনি তো জ্যোতিষী, সবই নাকি আপনারা দেখতে পান, আমার সঙ্গেই যে আপনার বিয়ে হবে তা কি দেখতে পান নি?

বরদা। হ্যাঁ, সবই দেখতে পাই। তাই সেই জন্যেই তখন ছুটে চলে গিয়েছিলাম সরমা। কিন্তু যেতে পারলাম কৈ, নিয়তি অপ্রতিহত বলে টেনে নিয়ে এল। সরমা, একটা কথা আমাকে তুমি দাও, বলো যে কোন দিন কোন অবস্থাতেই আমাকে ত্যাগ করবে না।

সরমা। আপনার আজ কী হয়েছে বলুন তো? এ সব কী বলছেন আপনি! যে আরাধনার বস্তু, তাকে কি কেউ ত্যাগ করে? আপনি স্নান করবেন চলুন। না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে আপনার মাথা ঠিক নেই—

তৃতীয় দৃশ্য

[বরদা জ্যোতিষীর বাড়ি। শাঁখ ও উলুর শব্দ। বর-বধূ বরণ করা শেষ হল। লতিকার মা (এক প্রতিবেশিনী) ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন।]

লতিকার মা। ওমা, বরণ শেষ হয়ে গেল। আমি বলে ছুটতে ছুটতে এলুম। আহা, দিব্যি বউ হয়েছে। খাসা বউ।…তা বাবা, সবই হল, দিদি বেঁচে থেকে ব্যাটার বউ দেখে যেতে পারলেন না—এইটুকু যা দুঃখ রইল। সেই করলি, যদি দু দিন আগে করতিস—

লতিকা। আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে মা। এখন চলে এসো দিকি, ওদের একটু বিশ্রাম করতে দাও। বৌদি ভাই, এবার চললুম তা হলে আমরা; আপদ-বালাই বিদায় হই—দুটি পায়রা এখন নিরিবিলি বসে মনের সুখে বকবকুম করো—

সরমা। তোমার নাম কি ভাই?

লতিকা। লতু লতিকা, যা খুশি।

সরমা। আবার এসো ভাই।

লতিকা। নিশ্চয়ই আসবো। এত বেশী আসবো যে এর পর তুমিই তাড়াতে চাইবে।

বিমল। (ভিড়ের মধ্যে থেকে অর্ধস্ফুট স্বরে) বাই জোভ। হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়!

লতিকা। (চাপা গলায় তর্জন) দাদা!

দ্বিতীয়া প্রতিবেশিনী। ভালই হল। পাড়ার মধ্যে সব চেয়ে রূপসী বলে ন বৌয়ের দেমাকে পা পড়ত না। এবার সে দেমাক ঘুচল।

লতিকা। তাতে তোমাদের কি সুবিধে হল মণিমাসী? নাও নাও চল।

[প্রস্থান।]

সরমা। (স্বামীকে চুপিচুপি) ও ছেলেটা কে গো?

বরদা। কোন্ ছেলেটা?

সরমা। ঐ যে সিল্কের জামা গায়ে, সুন্দর মত দেখতে।

বরদা। ও বিমল। লতুর দাদা।.. এত লোক থাকতে ওর কথাই বা জিজ্ঞেস করছ কেন?

সরমা। ছেলেটি ভারি অসভ্য!

বরদা। হুঁ!

সরমা। তোমার ঘরকন্নাগুলো বুঝে নিই এই বার। কি বল? তোমার ছাত্রের নামটা কী যেন? সন্তোষ না? ও সন্তোষবাবু, শুনছেন।

সন্তোষ। (কাছে এসে) আমাকে ডাকছেন?

সরমা। রান্নাঘরটা একটু দেখিয়ে দেবেন। আর ভাঁড়ার-টাঁড়ারগুলো। চা করে দিই আপনাদের—

সন্তোষ। চায়ের জল তো আমি চাপিয়ে দিয়েছি, আবার আপনি কেন এরই মধ্যে রান্নাঘরে যাবেন? লতিকাদিও নিচে আছেন এখনও, আপনাদের জলখাবার সাজিয়ে দিয়ে যাবেন বলেছেন।

সরমা। তা কি হয়! চলুন আমিও যাই, বুঝে নিই। আমি নিচে চললুম, বুঝলে?···কী হল তোমার—হঠাৎ? অত গম্ভীর?

বরদা। কৈ, না তো—কিছু না—

চতুর্থ দৃশ্য

[বরদা জ্যোতিষীর ভেতরের অফিস-ঘর। বরদা একা বসে কাজ করছেন। সরমার প্রবেশ।]

সরমা। হ্যাঁ গো শুনছ।

বরদা। (মুখ না তুলেই) কী ?

সরমা। কাল আমি রাজমিস্ত্রীকে আসতে বলেছি—

বরদা। ও, তা হবে।

সরমা। হ্যাঁ, হবে বৈকি! ফের যদি তুমি এমনি অন্যমনস্ক ভাবে আমার সঙ্গে কথা কইবে তো দেখতে পাবে মজা! তোমার ঐ ঠিকুজি কুষ্ঠীগুলো আমি যদি সব ছিঁড়ে না ফেলে দিই তো আমার নাম নেই—।

বরদা। কী, কী ? ব্যাপার কি ?

সরমা। কা-ল আ-মি রা-জ-মি-স্ত্রী-কে আ-স-তে ব-লে-ছি—। বুঝেছ ? কানে গেছে ?

বরদা। রাজমিস্ত্রী ? সে আবার কি ?

সরমা। মানুষ। যারা বাড়ি-ঘর তৈরি করে।

বরদা। তা জানি। কিন্তু তোমার এখানে তারা কি করবে ?

সরমা। বাড়ি সারাবে। চুনকাম করবে, তেতলার সিঁড়ির ঘরটা সারিয়ে উনুন পেতে দেবে। ঐখানে রান্না করব এর পর। নিচের রান্নাঘরে বালি খসিয়ে নতুন করে বালি-চুন ধরাবে, ওখানে রান্না করলে সারা বাড়িটায় ধোঁয়া হয়—ও-ঘরটা অন্য কাজে লাগাব।

বরদা। সে যে বিস্তর টাকা খরচ।

সরমা। তা হবে বৈকি। বিয়ের সময় সবাই বাড়ি সারায়, তুমি সারিয়েছ ? দেখ না এবার সব চেহারা পালটে দেব আমি, সব নতুন করে ফেলব। সন্তোষকে বলেছি জানলার জন্যে কটা পর্দা আনতে। আলোর শেড্‌ চাই কয়েকটা। ফুলগাছের টব—

বরদা। (স্নিগ্ধ কণ্ঠে) সবই পালটাবে সরমা, আমাকে তো আর পালটাতে পারবে না। তোমার ঐ ঝকঝকে নতুন গৃহসজ্জার মধ্যে বেচারা বৃদ্ধ পুরনো স্বামী তোমার বেমানান ঠেকবে না ?

সরমা। যাও! সব তাতেই ঐসব বিশ্রী কথাগুলো না বললে বুঝি হয় না ? আমার ঘাট হয়েছে এসব করতে যাওয়া। কিচ্ছু করতে হবে না তোমায়—

বরদা। আরে—আরে—শোন—যাও কোথায় ? ও সরমা—

সরমা। (ফিরে এসে) তুমি তো আমার নিত্য নতুন গো ? তোমাকে এই পুরনোর মধ্যে মানাচ্ছে না বলেই তো সব নতুন করা।

বরদা। সত্যি বলছ ? এ তোমার মনের কথা ?

সরমা। নয় তো কি তোমার সঙ্গে তামাশা করছি!

বরদা। না—তা নয়। বলছিলুম যে এত খরচা করবে—টাকাটা আসবে কোথা থেকে ?

সরমা। সে আমি বুঝব। ভয় নেই, ধার করব না। কিন্তু তুমি একটু তাড়াতাড়ি নাও, বেলা যে ঢের হল।

বরদা। বোধ হচ্ছে আমার আরও একটু দেরি হবে। তুমি স্নানাহার সেরে নাও, সন্তোষকেও সেরে নিতে বল—

সরমা। থাক্, আমাদের কথা অত ভাবতে হবে না তোমাকে। তুমি একটু চট্‌পট্ নাও দিকি। (প্রস্থানোদ্যত)

বরদা। আর শোন—

সরমা। কি ? কিছু বলবে ?

বরদা। না, এমন কিছু দরকারী কথা নয়। বলছিলুম কি যে—বিমল ছেলেটা কিন্তু ভাল নয়।

সরমা। কেন, কি করলে ও ?

বরদা। কী করলে বলে নয়—বরং বলা যায় যে কি করে বেড়ায়। ওর স্বভাব-চরিত্র ভাল নয় শুনেছি—।

সরমা। কে বললে তোমাকে ? তুমি আবার এসব কথা নিয়ে আলোচনা কর নাকি ? আমার কিন্তু বাপু ছেলেটাকে বেশ লাগে। কেমন হাসি-খুশী আমুদে—

বরদা। হুঁ—

সরমা। তা জ্যোতিষী ঠাকুর, ওর হাতখানা তো দেখলেই পার, সত্যিই ওর স্বভাব খারাপ কিনা ! তুমি তো সবই গুণতে পার—

বরদা। হ্যাঁ, ঐসব বাজে কাজ করে বেড়াবারই সময় বটে আমার।

সরমা। তোমরা বাপু বড় মিছিমিছি দুর্নাম দাও লোকের—

[প্রস্থান।]

বরদা। মানুষকে বিশ্বাস করব—না বিধিলিপিকে ? এই এক সমস্যা। কী করব। কী করব। সন্তোষ ! সন্তোষ !

[সন্তোষের প্রবেশ।]

সন্তোষ। ডাকছেন ?

বরদা। তুমি আজ কাল থাক কোথায় ? দিনরাতই কি অন্তঃপুরে তোমার কাজ থাকে নাকি ? তুমি শিক্ষার্থী—সেটা স্মরণ রেখো। অধ্যয়নই তোমার তপস্যা। অত গৃহস্থালিতে মন দিতে গেলে লেখাপড়া করা চলে না।

সন্তোষ। আজ্ঞে, আমি তো অতটা বুঝতে পারি নি—আপনি কাজে ব্যস্ত আছেন বলেই—

বরদা। আচ্ছা, এখন যাও—

[সন্তোষের প্রস্থান। বরদা কাজ করতে লাগলেন। কিছু পরে সরমার প্রবেশ। সরমা কাছে এসে ঠিকুজিখানায় মারলে টান। খানিকটা ছিঁড়ে গেল।]

বরদা। হাঁ—হাঁ—করলে কি। ওটা যে পরের জিনিস, ছিঁড়ে দিলে?

সরমা। বেশ করেছি। কেবল কাজ আর কাজ। খেতে-দেতে হবে না বুঝি? আড়াইটে বেজে গেছে—সে হুঁশ আছে?

বরদা। তা না হয় হল। কিন্তু এই জন্যে ঠিকুজিখানা জখম করে দিলে? কী বলব আমি তাদের? আর তোমারই মুখ অত শুকনো কেন? তুমি খাও নি?

সরমা। হ্যাঁ—বয়ে গেছে আমার।

বরদা। দেখ দিকি কাণ্ড। আমি যে অত করে বলেছিলুম—তুমি ছেলেমানুষ, এত বেলা অবধি—। সন্তোষ কোথা গেল, সন্তোষ—

সরমা। থাক্। ঢের হয়েছে। আমাদের জন্যে আর ভাবতে হবে না। তোমার শরীরটা বুঝি শরীর নয়? তার জন্যে বুঝি আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই? খেটে খেটে চেহারাটা কি হয়েছে দেখেছ? আয়নাতে কি মুখও দেখ না?

বরদা। সত্যিই আমি আয়নাতে বিশেষ মুখ দেখি না। মনে হয় এই তো চেহারা। তোমার কথা মনে পড়ে মনে বড় সংকোচ জাগে। মনে হয় কেনই বা বিয়ে করলুম—মিছি মিছি এ প্রায়-বৃদ্ধ একটা লোকের হাতে পড়ে জীবনটাই বোধ হয় তোমার মাটি হয়ে গেল।

সরমা। আবার! ঐ কথাগুলো না বললে বুঝি যথেষ্ট আধিক্যেতা হয় না? চল—চল—আবার দাঁড়াচ্ছ কেন?

পঞ্চম দৃশ্য

[সরমার শয়নকক্ষ। বিমল ও সরমার হা-হা—হাসির শব্দ।]

সরমা। আবার! বিমল ঠাকুরপো! কি হচ্ছে অসভ্যতা—

বিমল। না সত্যি বলছি বৌদি। বিশ্বাস কর—ওঃ, এই যে—।

বরদা। (নেপথ্যে) সরমা।

[বরদার প্রবেশ। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।]

সরমা। কী ভাগ্যি? এমন অসময়ে যে!

বরদা। এমনি।

বিমল। আচ্ছা—আমি তা হলে আসি।

[প্রস্থান।]

সরমা। (কাছে এসে) কী হয়েছে গো? তোমার মুখ অত গম্ভীর কেন?

বরদা। মেয়েদের হাসির শব্দ বাইরের বৈঠকখানা পর্যন্ত পেঁছিলে পাঁচটা

ভদ্রলোক যাঁরা আসেন, তাঁরা কি মনে করেন? আর কাজই বা করা যায় কি করে? এত কিসের হাসি?

সরমা। হাসির শব্দ নিচের ঘর থেকে পাওয়া গেছে? ছি—ছি—ভারি অন্যায় হয়ে গেছে তো? সত্যিই ও'রা কি মনে করলেন। অত বুঝতে পারি নি। এমন সব আজগুবি কথা বলে ঐ বিমলটা (কাছে এসে) তুমি আমাকে মাপ করো—আর এমন হবে না কখনও।

বরদা। (অপেক্ষাকৃত সহজ ভাবে) ও ছোঁড়া আমাকে দেখে এমন করে পালাল কেন।

সরমা। কি জানি, তোমার যা মুখের চেহারা, ভয় পেয়ে গেল বোধ হয়।

বরদা। হুঁ।···সরমা।

সরমা। কি গো?

বরদা। কিছু না—

সরমা। বল না কি, লক্ষ্মীটি—

বরদা। না এমনি। তোমাকে কি মাঝে মাঝে ডাকতে সাধ যায় না?

সরমা। যাও, যাও। ওসব কথা আর মুখে এনো না। ডাকেন তো কত!

বরদা। আমি ডাকলে তুমি সুখী হও?

সরমা। না, খুব দুঃখিত হই। কথার ছিরি দেখ না।

বরদা। এক দিন তোমার হাতটা দেখতে হবে ভাল করে।

সরমা। ওগো দেখ না গো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। এক বার দেখ না—।

[বরদা প্রসারিত হাতের দিকে চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ।]

সরমা। কৈ, বললে না কিছু?

বরদা। সরমা, তোমাকে একটা কবচ করে দেব—

সরমা। কবচ? সে কি, তুমি তো ওসব বিশ্বাস কর না!

বরদা। করি না ঠিকই—তবু, কে জানে যদি কিছু থাকে—

সরমা। কেন গো? আমার ফাঁড়া আছে বুঝি? কবে মরব বল না—

বরদা। মরার কথা কে বলছে!

সরমা। ও হরি। মরব না! তবে?

বরদা। আর এক দিন বলব, আমার এখন কাজ আছে যাই—

[বরদার প্রস্থান। সরমার গুণ গুণ করিয়া গান।]

গুপীর মা। বৌদি কোথায়? বৌদি!

সরমা। কী গো? হঠাৎ এমন হন্তদন্ত হয়ে?

গুপীর মা। ও মা, এই যে!···না, বলছিলুম ঐ ও বাড়ির ঐ নতুন দাদার কথা, বেশ মানুষটি—না?

সরমা। (হেসে) কেন বল দেখি? কী করলে তোমার? বকশিশ দিয়েছে নাকি কিছু?

গুপীর মা। ঠিক ধরেছ তো! আমি নিচে কাজ করছি, আমাকে যেতে যেতে ডেকে বললে—গুপীর মা, তুমি বড় ভাল লোক। এই একটা টাকা রাখ, মিণ্টি কিনে খেয়ো।

[বরদার প্রবেশ।]

বরদা। গুপীর মা।

গুপীর মা। ওমা, এ যে দাদাবাবু।

সরমা। ব্যাপার কি, কী হয়েছে গো? মুখ চোখ লাল, একেবারে অগ্নি শর্মা! শরীর খারাপ হল নাকি? বল বল—

বরদা। বলছি। গুপীর মা, শোন—এই নাও তোমার দু মাসের পুরো মাইনে। এক মাসের মাইনে বেশীই দিলুম। খাওয়া দাওয়া করে ওবেলা বাড়ি চলে যাবে। অন্য কাজ খুঁজে নিও, এখানে আর সুবিধে হবে না!

[কিছুক্ষণ সবাই স্তব্ধ।]

গুপীর মা। কেন বাবু আমার কি অপরাধ হল?

বরদা। না এমনি। আমারই সুবিধা হচ্ছে না। তুমি যাও।

[গুপীর মার প্রস্থান।]

বরদা। একটা নতুন লোক দেখতে বলেছি সন্তোষকে, সে এখনই কোথাও থেকে ধরে নিয়ে আসবে'খন—

সরমা। হ্যাঁ গো, কী হয়েছে? ওকে অমন করে হঠাৎ তাড়ালে যে?

বরদা। আমার খুশি! আমার বাড়ীতে কাকে ঝি রাখব না রাখব সে স্বাধীনতাও কি আমার নেই?

সরমা। (মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে) এতকালের ঝি তোমাদের, এক কথায় জবাব দিলে? কী করেছে কি? অন্যায় যদি কিছু করেই থাকে তো এ বারের মত মাপ কর। আমি তোমাকে মিনতি করছি।

বরদা। (রূঢ় স্বরে) হ্যাঁ, তা করবে বৈকি। ও না থাকলে বুঝি তোমাদের সুবিধা হয় না?

সরমা। কিসের সুবিধা? কী বলছ কি?

বরদা। কিছু বলছি না। শুধু বলছি আমার বাড়িতে ওকে আর রাখব না। ব্যস, আর কিছু বলবার আছে?

[মেঝেতে একটা জলখাবারের রেকাবি ছিল। বরদা যাবার সময় রেকাবিটা সজোরে পা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে গেলেন, ফলে সেটা দূরে দেওয়ালে গিয়ে পড়ে ঝন ঝন করে উঠল। সরমা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আস্তে আস্তে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[বরদার শয়ন ঘর। বরদা ও সরমা।]

সরমা। (বরদার গলা জড়িয়ে) তুমি যেন আজকাল কী রকম হয়ে যাচ্ছ। সত্যি, আমার বরাতটাই খারাপ।

বরদা। চমকে উঠে বরাত! কী করে জানলে? বরাতের কি দোষ?

সরমা। কী দোষ নয়? একে তো তোমার দিনরাত কাজ আর কাজ, দন্ড স্থির হয়ে বসবে তার জো নেই। তার ওপর যাও বা খেতে শুতে আসবার সময়ে একটু দেখা পাই—কী রকম গম্ভীর হয়ে থাকো। আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাব। ভাল করে কথা কও না, হাসো না—আদর তো করই না। কী রকম যেন। আমি যে কি অপরাধ করলুম তাও বুঝি না। হ্যাঁগো, কেন অমন কর বল তো, আমার বুঝি কষ্ট হয় না?

বরদা। কষ্ট? (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) আমারই কি কষ্ট কম!

সরমা। অমন নিঃশ্বেস ফেললে যে। কী যে তোমার দুঃখ তাও তো বল না। আমি ম'লে তুমি সুখী হও? আমিই কি তোমার দুঃখের কারণ তা হলে?

বরদা। ছি সরমা! ও কথা ঠাট্টা করেও বলো না।

সরমা। তবে?

বরদা। সে তোমাকে বলবার নয়, তুমি বুঝবে না। (একটু পরে) আসলে বড় ভয় করে, বুঝলে?

[যেন তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সরমার মুখের দিকে।]

সরমা। কিসের এত ভয়? বল না খুলে—

বরদা। বড় সুখে আছি তোমাকে পেয়ে সরমা। স্বপ্নেরও অতীত এ সুখ। ভাবি এত সুখ কি সইবে?

সরমা। সইবে কেন? কী হয়েছে বল তো! নিশ্চয় তুমি কিছু একটা জানো, বলছ না! আমার ফাঁড়া-টাড়া দেখেছ বুঝি? সত্যি করে বল না গো। আমি কি মরে যাব?

বরদা। দূর পাগল! না না, আমি এমনিই বলছিলুম। তুমি বসো, আমি নিচে যাই। অনেক কাজ বাকী।

সরমা। না, এখন যেতে দেব না তোমাকে। বলে যেতে হবে কী ব্যাপার!

বরদা। ব্যাপার আবার কি। ছাড়ো ছাড়ো, ছেলেমানুষি করো না। নিচে সন্তোষ অপেক্ষা করছে।

[প্রস্থান। বিমলের প্রবেশ।]

বিমল। বৌদি—

সরমা। কে?

বিমল। ওঃ, অনেক কণ্টে কর্তার চোখে ধুলো দিয়ে এসেছি,—

সরমা। কেন, লুকিয়ে আশারই বা এত চেষ্টা কেন। তুমি তো কোন অপরাধ কর নি—অত ভয় কিসের?

বিমল। বাব্বা! বাড়িওলার যা কড়া মেজাজ, মুখের দিকে চাইলেই বুকের মধ্যে গুর গুর করে। উঃ, কত দিন তোমার হাতে চা খাই নি বল তো। কাল তো দেখলুম এক বাড়ি লোককে চা খাওয়ালে, কৈ আমার কথা এক বারও তো মনে পড়ল না।

সরমা। সে তো শুধু চা ভাই, চা একটা এমন কি জিনিস যা লোককে ডেকে খাওয়াব। কাল সব ওঁরা দয়া করে বেড়াতে এলেন বলে তাই—

বিমল। শুধু কি চা বৌদি! ও যে তোমার হাতের চা, তার বিশেষ মূল্য। (হঠাৎ মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। দ্বারপথের দিকে চেয়ে) এ কি। কর্তা যে!

সরমা। আরে আরে, কী হল! পালাচ্ছ কোথায়?

[বিমল একরকম ছুটে বেরিয়ে গেল। বরদার প্রবেশ।]

বরদা। (কঠিন কণ্ঠে) এটা কাশীর বাঙ্গালীটোলার হাফ-গেরস্ত বাড়ি নয়, এটা কলকাতার ভদ্রপল্লী আর ভদ্রলোকের বাড়ি। ভবিষ্যতে কথাটা মনে রাখলে সুখী হব।

সরমা। (ঠোঁট কাঁপছে) তা—তার মানে?

বরদা। (অধিকতর রূঢ় কণ্ঠে) ঐ জন্যেই আমাদের বাপ-দাদারা বলতেন যে সমান ঘর থেকে বড় বংশ দেখে মেয়ে আনবে। দয়া করে ভিখিরীর মেয়েকে কুড়িয়ে এনেছিলুম কাশীর রাস্তা থেকে, এখন তার ফল বুঝছি হাড়ে হাড়ে—

[সরমা আর দাঁড়াতে পারে না। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করে।]

বরদা। (হিংস্র কণ্ঠে) শোন। দাঁড়াও চুপ করে। কথার উত্তর দিলে না যে?

সরমা। (অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে) যখন ভদ্রভাবে ভদ্রলোকের মত কথা কইবে তখন জবাব দেব, এখন নয়। ছাড়ো—

বরদা। হুঁ! ভদ্রতার জ্ঞান তো খুব। ভদ্রলোকের মেয়ে ভদ্রলোকের বউ—ঠিক দুপুরে বেলা একটা লম্পট ছোঁড়ার সঙ্গে ঢলাঢলি করাটাই বুঝি খুব ভদ্রতা?

সরমা। ঢলাঢলি?

বরদা। রূপসী তরুণী পরস্ত্রীর হাতের বিশেষ মধুময় চা খেতে অমনি এক ছোকরা তার স্বামীর অজ্ঞাতে গোপনে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করে যখন—তখন সেটাকে কি বলব মহাশয়া?

সরমা। (যেন মরিয়া হয়ে) সেই রূপসী তরুণী পরস্ত্রীর যদি বৃদ্ধ, কুৎসিত এবং ছোটলোক স্বামী হয় এবং সে স্বামীরও দর্শন দুর্লভ হয়ে উঠে

তো সে স্ত্রীর দিন কাটে কি করে বলতে পারেন মহাশয় ? অগত্যা তাকে পাড়ার লম্পট ছেলে ধরে বেড়াতে হয়।

বরদা। (জোর করে হাতটা চেপে ধরলেন। সরমার অস্ফুট আর্তনাদ—"উঃ"।) কিসের এত তেজ তোমার ! বাপের তো ঐ অবস্থা ! বলে উদ খেতে ক্ষুদ নেই, চাটগেঁয়ে বড়াই ! ওসব চলবে না এই বলে দিলুম ! আমার বাড়ি, আমার ঘর, এখানে থাকতে গেলে আমার খুশিমত আমার হুকুমমত ভদ্রলোকের মত চলতে হবে।

সপ্তম দৃশ্য

[রান্নাঘরের সামনে। সরমা ও সন্তোষ।]

সন্তোষ। সত্যি বৌদি, দাদা যেন কীরকম হয়ে গেছেন। শরীরও মোটে ভাল যাচ্ছে না ওঁর। দিন দিন কীরকম রোগা হয়ে যাচ্ছেন—লক্ষ্য করেছেন ? এমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহারা ভাব, মক্কেলদের সঙ্গেও দিনরাত খিট্‌-খিট্‌ করেন, মনে একটুও শান্তি নেই বলে মনে হয়।

সরমা। সেই জন্যেই তো ভাই লোকটার ওপর বেশীক্ষণ রাগ রাখতে পারি না। বেশ বুঝতে পারি কি একটা দুঃখে ওর অন্তরটা পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু কি করব—এমন চাপা লোক ! প্রাণপণে সব ব্যথা নিজেই ধরে রাখে, কাউকে একটু ভাগ দিতে চায় না। বুক ফেটে গেলেও মুখ খোলে না। সময় সময় রাগ হয়—আবার মনে করি ও লোকটা কি আমার চেয়ে কম কষ্ট পাচ্ছে !

সন্তোষ। কি কুক্ষণে যে কাশী গেলেন, সেই থেকেই (জিভ কেটে) মাপ করবেন বৌদি—

সরমা। মাপ করার কি আছে ভাই, সত্যিই তো, আমি অভাগী যে দিন থেকে ওঁর জীবনে এলুম সেইদিন থেকে একটুও শান্তি নেই।

সন্তোষ। আপনাকে কিন্তু সত্যিই বড় ভালবাসেন, দেখুন না—কখনও এইসব যাগযজ্ঞ কবচে বিশ্বাস করেন না, অথচ আপনার জন্যে কী কবচ করতে বসলেন, কাল থেকে উপোস করে আছেন, আজ এই এতটা বেলা পর্যন্ত হোমই করছেন। কী নিষ্ঠা, নিজে ঘরে মাখন তুলে ঘি করলেন—গাওয়া ঘি। প্রত্যেকটি জিনিস নিজে ঝেড়ে বেছে ধুয়ে—

সরমা। সেই তো আরও দুঃখের কথা ভাই, আমি হতভাগিনী, আমার জন্যেই ওঁর এত দুঃখ, এত দুশ্চিন্তা বোধ হয়—

[বরদার প্রবেশ। সন্তোষের প্রস্থান।]

বরদা। কৈ গো,—কোথায় গেলে। এসো এসো। এই যে, এই দিকে মুখ করে একটু দাঁড়াও দিকি। এই কবচটা তোমার হাতে বেঁধে দিই—

সরমা। যাও—কী কর, লজ্জা করে।

বরদা। লজ্জা আবার কি, কবচ বাঁধছি।

সরমা। কিসের কবচ তা তো বললে না?

বরদা। ফাঁড়া আছে।

সরমা। কি ফাঁড়া? মৃত্যুযোগ?

বরদা। না মৃত্যু নয়—অন্য কিছু—।

সরমা। অন্য কি গো?

বরদা। সে আর একদিন বলব। এখন কিছু খেতে দেবে চল। বড় ক্লান্ত। কাল থেকে খাই নি কিছু—

সরমা। এসো। এসো। এ ঘরেই বসো। আগে একটু শরবৎ মুখে দাও।

অষ্টম দৃশ্য

[বরদার বাড়ি। শয়ন-ঘরের সামনে।]

রাজমিস্ত্রী। ও মাঠান্—কোথা গেলেন?

সরমা। (নেপথ্যে) কে? (প্রবেশ) কে তুমি? কি চাও। আরে—মিস্ত্রী যে। হঠাৎ কি মনে করে মিস্ত্রী? পাওনা আছে নাকি কিছু?

রাজমিস্ত্রী। আজ্ঞে না মা, বাবু খবর দেছেন ঐ ছাদের ওপর যে একটুনু পাঁচিল গাঁথা হবে।

সরমা। পাঁচিল?…(সামলে নিয়ে) ও হ্যাঁ, তা মিস্ত্রী, কি কি কাজ হবে তা মনে আছে তোমার?

রাজমিস্ত্রী। কী যে বলেন মা ঠাক্রোন্—ছাদের ওপর ঐ পশ্চিম দিকটায়—ঐ যে কোন্ বাড়ি থেকে দেখা যায় নাকি—পাঁচিল গাঁথা হবে। মানুষ-সমান উঁচু পাঁচিল। আর দোতলায় আপনাদের শোবার ঘরে ঐ পশ্চিমের জানলাটা খুলে একেবারে দ্যাল গেঁথে দিতে হবে। এই তো? না আর কোন কাজ আছে?

সরমা। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) না, আর কিছু কাজ নেই।

রাজমিস্ত্রী। তা মা ঠাক্রোন—ইঁট চুন সুরকি কি এসেছে?—

সরমা। ঠিক তো জানি নে—খোঁজ নাও গে। নিচে, নিচে তুমি বরং বাবুকে জিজ্ঞাসা করো। উঃ বিশ্বনাথ! বিশ্বনাথ! আর কত সইব!

[মিস্ত্রীর প্রস্থান। সন্তোষের প্রবেশ।]

সন্তোষ। বৌদি, রান্নাঘরে আপনার উনুন ছাই হয়ে যাচ্ছে দেখে এলুম।

সরমা। (তাড়াতাড়ি চোখ মুছে) তুমি রান্নাঘরে কেন গিয়েছিলে? নিশ্চয়ই লুকিয়ে চা খেতে?

সন্তোষ। অপরাধী দোষ স্বীকার করছে,—শাস্তি যা দিতে হয় দিন। কিন্তু অফিস-ঘরের আবহাওয়া এমনই হয়ে উঠেছে যে একটু জোর না পেলে চলছে না। যাই বৌদি—কর্তা আবার হয়তো এখনই ক্ষেপে উঠবেন—বিস্তর কাজ।

সরমা। আর একটু থাকো না ভাই ঠাকুরপো।—কাজ আর কাজ। দিনরাত সেই ঠিকুজী-কুষ্ঠীর হিসেব, ও তো আছেই। আমি যে আর পারছি না, হাঁপিয়ে মরে গেলুম।

সন্তোষ। সত্যি বৌদি, আপনার অবস্থাটা বুঝি, কিন্তু বাইরের মক্কেল-গুলিও যে এক-এক অবতার। তার ওপর দাদার যা মেজাজ হয়েছে, দু তরফ সামলাতে সামলাতে আমার প্রাণান্ত।

সরমা। তোমার দাদার মেজাজের কতটুকুই-বা জানো ঠাকুর পো। বাড়িতে লোকজন আসা বন্ধ তো হয়েছেই—একটু অবকাশ ছিল ছাদে, তাও আজ হুকুম হয়েছে—মানুষ সমান পাঁচিল গেঁথে আড়াল করবার। শোবার ঘরের জানলাও গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে! এর চেয়ে পাথরের কারাগারও যে ঢের ভাল ছিল—তাতে কষ্ট আছে কিন্তু লজ্জা নেই।

সন্তোষ। বলেন কি বৌদি—ছি, ছি, এ যে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

সরমা। নিচে মিস্ত্রী বসে আছে দেখ গে দাও—

[নেপথ্যে রুষ্ট কণ্ঠস্বর—'সন্তোষ।']

সন্তোষ। ঐ, দাদা আসছেন।

[বরদার প্রবেশ।]

বরদা। এতক্ষণ ধরে কিসের চা খাওয়া তাই শুনি। আর এতই বা কি দিনরাত অন্তঃপুরে বসে মেয়েদের সঙ্গে গল্প! এধারে এতগুলো লোক বসে—রাশি রাশি কাজ বাকি, সব ফেলে ওপরে বসে হাসি-ঠাট্টা! এতটুকু রেস্পন্সিবিলিটি জ্ঞান নেই। জানোয়ার কোথাকার! বেইমান।

সন্তোষ। হাসি-ঠাট্টা? হাসির শব্দ পেয়েছেন আপনি?

সরমা। চুপ কর, ঠাকুরপো। চুপ কর। ও এত নীচ, ওর অভিযোগ এত মিথ্যা যে প্রতিবাদ করলে নিজেকেই অপমানিত করা হয়। তুমি যাও—

[দ্রুত প্রস্থান।]

নবম দৃশ্য

[অন্তঃপুর। বরদা ও নতুন ঝি।]

বরদা। চাঁপার মা, শোন।

চাঁপার মা। কী বলছেন বাবু।

বরদা। বিমলবাবু তোমাকে ডেকে কি বলছিল আজ?

চাঁপার মা। বিমলবাবু? কে বিমলবাবু?

বরদা। ঐ যে, পাশের বাড়ির বিমলবাবু? ঐ লতুর দাদা!

চাঁপার মা। কৈ, তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি তো।

বরদা। বাজার থেকে আসবার সময়?

চাঁপার মা। না বাবু, তার সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি।

বরদা। ও, আমার যেন মনে হল—আচ্ছা—(প্রস্থান)।

চাঁপার মা। ওমা, মাগো।

[সরমার প্রবেশ।]

সরমা। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) কি?

চাঁপার মা। বাবুর মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে মা! কি দেখতে কি দেখে—

সরমা। সব শুনেছি। তুই চুপ কর্, চুপ কর্ চাঁপার মা। বিষ আমার গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে—আর পারছি না। তুই যা। শোন্—তুই তো বাজার যাচ্ছিস? যাবার সময় চুপি চুপি এক বার সন্তোষবাবুকে ডেকে দিতে পারিস! (ঝিয়ের প্রস্থান)—আগুন জ্বালব। আগুন জ্বালব। বিষে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। সেই বিষে ওকেও পোড়াব।

[প্রস্থান। কিছুক্ষণ পরে আশমানী রঙের শাড়ী পরে, পরিপাটী প্রসাধন করে পুনঃপ্রবেশ। অপর দিক থেকে সন্তোষের প্রবেশ।]

সন্তোষ। এ কি!…কী ব্যাপার বৌদি!

সরমা। হ্যাঁ ভাই। একেই বোধ হয় কবিরা বলেন—রূপের আগুন? না? খুব ভাল দেখাচ্ছে?

সন্তোষ। এ যে সত্যি সত্যিই অগ্নিশিখা। বিদ্যুতের মত চোখ-ধাঁধানো, বোধ হয় বিদ্যুতের মতই সর্বনাশা সজ্জা তোমার। কিন্তু এ দাহনের আয়োজন কার জন্যে?

সরমা। জানি না। শোন, আমাকে তোমার পছন্দ হয়?

সন্তোষ। (যেন দু পা পিছিয়ে) তা—তার মানে?

সরমা। বাংলা কথারও মানে বোঝ না নাকি? আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে? ওকি—মুখ শুকিয়ে উঠল কেন? এইতেই এত ভয়। মনের কথাটা

মনে করতেও ভয় করছে। বল বল, আমার বেশী সময় নেই। না কি হ্যাঁ—যা হয় একটা বল। আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে?

সন্তোষ। কোথায়? (কণ্ঠস্বর কাঁপছে)

সরমা। যেখানে হোক্। খুব দূর দেশে কোথাও, শুধু তুমি আর আমি—

সন্তোষ। কিন্তু, কিন্তু আমার টাকা-পয়সা কিছু যে নেই বৌদি—

সরমা। তার জন্যে চিন্তা নেই। এই যে এত গহনা রয়েছে আমার। কিছু দিন তো চলবে—তারপর কি আর কোনমতে কিছু রোজগার করতে পারবে না?

সন্তোষ। উনি, উনি আমাকে বড় অসময়ে আশ্রয় দিয়েছেন। কেউ ছিল না, আমার—উনি বহু দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি, ও'র কোন দায়ই ছিল না, তবু আশ্রয় শুধু নয়, নিজের ভাইয়ের মত করেই রেখেছেন।

সরমা। তেমনি ভূতের মত খাটিয়ে নিয়েছেন তোমাকে, এখনও নিচ্ছেন। তার ওপর এই অকারণ গালাগালি। বিকেলের অপমানটা ভুলে গেলে?

সন্তোষ। (যেন ভূতগ্রস্তের মত বিহ্বলভাবে) ক—কখন যেতে চান?

সরমা। এখনি, এই মুহূর্তে। ও ব্যস্ত আছে। চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ি চলো।

সন্তোষ। কিন্তু, কিছু নেব না? কাপড়-জামা?

সরমা। কিছু না। দরকার নেই। কিনে নেবে। সে যা হয় হবে। এখন তো চল। এখনই—এখনই।…হ্যাঁ দাঁড়াও, এই ওর কবচ, খুলে রেখে যাই। এইটে দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিল আমাকে—হা হা—

[প্রস্থান। কিছু পরে নেপথ্যে বরদার আহ্বান। "সন্তোষ—চাঁপার মা। সন্তোষ।" বরদার প্রবেশ।]

বরদা। সন্তোষ! চাঁপার মা? কেউ নেই!…সরমা! সরমা!! সরমা!!!

[দ্রুত প্রস্থান। দূর থেকে ডাক শোনা যাচ্ছে 'সরমা! সরমা!!' পুনঃপ্রবেশ।]

বরদা। সরমা! সরমা!!

[এবার ঘরে ঢুকতেই নজরে পড়ল টেবিলের ওপর কবচখানা আর চাবির গোছা। পাগলের মতন ছুটে গিয়ে তুলে নিলেন সেগুলো। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন চারিদিকে। স্খলিত ভগ্নকণ্ঠে আর এক বার ডাকবার চেষ্টা করলেন,—'স—সরমা।' তার পরই কবচখানা দূরে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাগলের মত হেসে উঠলেন। 'হা—হা। হা—হা।']

বরদা। নিয়তি! নিয়তি! ঠিক দেখেছি, কিছু ভুল হয় নি! হা-হা! অভ্রান্ত গণনা। আমার মত জ্যোতিষী কে আছে! হা-হা! জাতক মাতৃঘাতী! জাতকের স্ত্রী কুলত্যাগিনী! অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে! হা-হা!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মোগলসরাই রেল স্টেশন। সরমা ও সন্তোষ]

সন্তোষ। এ আমরা কোথায় নামলাম, এ তো এলাহাবাদ নয়!

সরমা। না। এটা মোগলসরাই। এলাহাবাদ আরও পশ্চিমে।

সন্তোষ। তবে আমরা এখানে নামলাম কেন? আমাদের তো এলাহাবাদের টিকিট। আপনি যে কাল বললেন এলাহাবাদ যাবেন—

সরমা। আমরা ফিরব।

সন্তোষ। ফিরব?

সরমা। হ্যাঁ, ফিরব। হিসেবে বড় ভুল হয়ে গেছে ঠাকুরপো, তোমার সঙ্গে যদি বেরিয়ে যাই তা হলে তো ওর ঐ নীচ আশঙ্কাটাই সত্য প্রমাণ করা হবে। তা হলে তো ওরই জয় হবে শেষ পর্যন্ত। তা আমি হতে দেব না কিছুতেই। ওকে বড় মুখ করে বলেছিলুম—আমি সতী মায়ের মেয়ে, আমার বাবা ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী করেন এখনও!...ওর এত দিনের এত রূঢ় আচরণ, এত অপমান—ওরই গৌরব হয়ে দাঁড়াবে—আমারই অহঙ্কার মিথ্যা হবে! না, ঠাকুরপো—ও পশুটার কাছে ছোট হতে আমি পারব না!

সন্তোষ। তোমার মাথার ঠিক নেই বৌদি, তোমার সঙ্গে আসাই আমার ভুল হয়েছে। এ ছেলেখেলা নয়—জীবন-মরণের ব্যাপার।

সরমা। মাথার ঠিক থাকলে কেউ এ কাজ করে? এত ভুল করে? কিন্তু এখন আমার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে—এখন যা বলছি ভেবেই বলছি!

সন্তোষ। আমার আর ফেরবার পথ নেই বৌদি, আমার এ অপরাধেরও মার্জনা নেই। এ পাপ ঈশ্বর কোন দিন ক্ষমা করবেন না।

সরমা। সব অপরাধেরই মার্জনা আছে ঠাকুরপো—সব ভুলই সংশোধন করা যায়। এ তো সামান্য জিনিস। তুমিও তোমার ভুল বুঝেছ, আমিও তাই—এক্ষেত্রে ভুল সংশোধন করাই শ্রেয়। আর দেরি করো না—এখনই দুখানা টিকিট কেটে আনো গে কলকাতার, আর ফিরতি ট্রেন কখন আছে সেটাও জেনে এসো। দেরি হলে সে অন্য রকম বিশ্বাস করবে, তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে আমি অবিশ্বাসিনী নই।...যদি না বোঝে—মৃত্যুর পথ তো খোলা রইল। মরব কিন্তু কুলত্যাগ করব না—তাকে আত্মপ্রসাদ ভোগ করতে দেব না। যাও, যাও ঠাকুরপো!

সন্তোষ। (মাথা চুলকে) বেশ, তা হলে তু—আপনি ওয়েটিংরুমে বসুন গে—আমি টিকিট কিনে আনছি।

[হাত পেতে টাকা নিয়ে সন্তোষ চলে গেল। সরমা ওয়েটিং

র্মের ভেতরে ঢুকল। রঙ্গমঞ্চের সব আলো নিভে গিয়ে আবার যখন জ্বলে উঠল তখন দেখা গেল সরমা উদ্বিগ্ন মুখে ঘর-বার করছে। দু-চার জন লোক এল, চলে গেল। সরমা প্রশ্ন করতে গিয়েও পারল না। শেষ পর্যন্ত দুশ্চিন্তা, উপবাস, উত্তেজনা, রাত্রি-জাগরণ, তার পর এই একান্ত অসহায় অবস্থার আঘাত—সইতে না পেরে মাথা ঘুরে সে মেঝেতেই বসে পড়ল। সেই সময়ে জন-দুই গুণ্ডা ধরনের লোক প্রবেশ করল।]

১ম গুণ্ডা। (হাত ধরে তুলতে গেল) কেয়া হুয়া বহিনজী? কী হয়েছে আমাকে বোলেন, আমি সব ঠিক করিয়ে দিব। তবিয়ত খারাপ মালুম হচ্ছে? চলেন চলেন—এই ইস্টাশিনের বাইরে আমাদের বাসা আছে—কুছু ভাবনা নেই —সেখানে আমার জরু আছে, বহিন আছে—চলেন—

[সরমা এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়িয়ে নিল। ঠিক সেই সময় ওপাশ থেকে এক বৃদ্ধ গোছের বাঙালী ভদ্রলোক মুটের মাথায় মোট চাপিয়ে এসে ঢুকলেন। তাঁর কাছে গিয়ে—]

সরমা। বাবা দেখুন, আমার সঙ্গের লোকটি টিকিট কাটতে গেছে—এখনও ফিরছে না। বড় বিপদে পড়েছি। এরা—এরা—এই লোকগুলোর মতলব ভাল ঠেকছে না।…আমায় একখানা টিকিট কেটে দিয়ে যদি সঙ্গে করে নিয়ে যান! ভাড়ার টাকা অবশ্য আমিই দেব—

বৃদ্ধ। (ভ্রূ-কুঞ্চিত করে) সঙ্গের লোক? কী রকম লোক? সে কে হয় তোমার? কোথা যাচ্ছিলে? তোমার কপালে তো সিঁদুর দেখছি! স্বামী কোথায়? 'লোক' নিয়ে যাচ্ছিলে কেন?

[সরমা নিরুত্তর। মাথা হেঁট করে দাঁড়াল।]

বৃদ্ধ। (যেন বিজয়গর্বে) হুঁ, হুঁ, বাব্‌বা! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা খুঁজতে এসেছিলে! ওসব আমি বুঝি! আমারও ঢের বয়স হল। এখান থেকে সরে পড় দিকি বাছা। ও চালাকি এখানে খাটাতে এসো না! আমাদের ঘাড়ে চাপতে পারবে না।…(অপেক্ষাকৃত নিচু সুরে—অর্ধ-স্বগতোক্তি) বুড়ো মেরে খুনের দায়ে পড়ি আর কি। থানাপুলিস করবে কে বাবা? তায় একেবারে সাক্ষাৎ আগুনের খাপ্‌রা।

[সরমার এতক্ষণের এত কষ্ট যদি বা সহ্য হয়েছিল, এ অপমান সহ্য হল না। সে কেঁদে ফেলল। একটি প্রৌঢ় হিন্দুস্থানী এর ভেতর এক পাশে এসে বসেছিল, সে সবই লক্ষ্য করেছে। এই বার এগিয়ে এসে বললে—]

প্রৌঢ়। কেয়া হুয়া বহিনজী?

সরমা। (চোখ মুছে) আমার সঙ্গে এক কর্মচারী ছিল, কোথায় হারিয়ে গেছে খুঁজে পাচ্ছি না। আমি কলকাতায় যাব কেমন করে? বড্ড ভয় করছে আমার।

প্রৌঢ়। কুছ ডর নেহি বহিনজী। আপ আইয়ে, হামারে মাতাজী ভী যা রহী হৈঁ কল্‌কাত্তা। আপ উন্‌কি সাথ চলা যাইয়ে—বে-ফিক্‌র! আইয়ে—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বরদার অফিস-ঘর। বরদার উদ্‌ভ্রান্তের মত অবস্থা। কাগজপত্র চারিদিকে ছড়ানো, অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন। হঠাৎ যেন অসহিষ্ণু হয়ে ডেস্কের ওপর থেকে একখানা ঠিকুজি ধরে মারলেন টান—দুখানা করে ছিঁড়ে ফেললেন। নতুন চাকর রাখাল একখানা চিঠি হাতে করে ঢুকল।

রাখাল। এই নেন্‌ একখানা চিঠি আছে আপনার!

বরদা। (অন্যমনস্ক ভাবে) চিঠি? কার? আমার? কৈ দেখি!··· (অন্যমনস্ক ভাবেই চিঠি খুলতে খুলতে) এ কী হল! এ কী হল! কেমন করে হল!

[বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ। বরদা গিয়ে দোর খুললেন।]

আগন্তুক। এটা কি বরদা জ্যোতিষীর বাড়ি?

বরদা। আজ্ঞে না।

আগন্তুক। না কী রকম? এই তো তাঁর সাইনবোর্ড রয়েছে!

বরদা। তা হবে। কিন্তু এখন তাঁর দেখা পাওয়া যাবে না।

[সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন তাঁর মুখের ওপরই।]

বরদা। রাখাল! রাখাল!

[রাখালের প্রবেশ]

বরদা। এই—আমি ওপরে যাচ্ছি, যদি কেউ ডাকে তো বলিস বাবুর শরীর খারাপ—দেখা হবে না।

রাখাল। (অবাক হয়ে) আজ্ঞে বাবু কাল থেকে মা ঠাকরুনকে দেখছি না কেন? কাল সারা রাত আপনি খেলেও না, খেতে দেলেও না—কাজ করতেছ বলে আমিও আর ডাকিনি—ব্যাপারটা কি বল দিকি?

বরদা। ও, ওদের কথা জিজ্ঞেস করছিস? আমার, মানে আমার শ্বশুরের বড় অসুখ। তাই সন্তোষকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি ওদের কাশীতে। আমার জরুরী কাজ ছিল বলে যেতে পারি নি। ওরাও তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাম পেয়েই চলে গেছে—রান্না-বাড়া করে যেতে পারে নি।

রাখাল। কে বললে বাবু, আমাঘরে সব থরে থরে চাপা দেওয়া অয়েছে—

বরদা। তাই নাকি ? তবে তুই খেলি না কেন ?

রাখাল। আপনি না খেলে খেতে পারি ?

বরদা। দেখ—এখন যা পারিস্ খেয়ে নে—খাবার মত যদি থাকে কিছু !

রাখাল। আর আপনি ?

বরদা। আমার শরীর সত্যিই ভাল নেই—এখন আর কিছু খাব না।

[বরদার প্রস্থান। বাইরে আবার কড়া নাড়ার শব্দ। রাখাল দোর খুলে দিল।]

২য় আগন্তুক। ঠাকুর মশাইকে একটু ডেকে দাও না ভাই !

রাখাল। আজ্ঞে আজ আর ও কম্ম হবে নি। আজ ভেসে পড়।

২য় আগন্তুক। আমাদের যে বড্ড দরকার ভাই। একটি বার ডেকে দাও।

রাখাল। তেনার শরীর খারাপ।

২য় আগন্তুক। শরীর খারাপ বললে চলবে কেন। বাইরে টাইম লেখা রয়েছে সকাল ৮টা থেকে ১১টা ! ঘরে বসি একটু, খবর দাও গে যে বাবুরা শুনছে না।

রাখাল। বলছি তেনার সঙ্গে দেখা হবে না, ঝামেলা করো নি—কী রকম ভদ্দরনোক বাবু আপনারা !

২য় আগন্তুক। আ মলো, এ ব্যাটা তো আচ্ছা ছোটলোক ! বলছি ঠাকুর মশাই আমাকে আজকে আসতে বলেছিলেন—।

রাখাল। দেখ বাবু, ছোটনোক ছোটনোক করো নি বলছি। ভাল হবে না !

বরদা। (নেপথ্যে) রাখাল !

রাখাল। যাই বাবু।

[দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে রাখাল ভেতরে এল। বরদার প্রবেশ।]

বরদা। রাখাল, আমি এখনই কাশী যাচ্ছি। ফিরতে দিন-তিনেক দেরি হবে বোধ হয়। তুই থাক, চাল-ডাল যা আছে তুই রেঁধে খাস। এই দুটো টাকা রাখ আপাতত। যদি অন্য কোন খরচা করতে হয় তো করিস।

রাখাল। এখনই কোথায় যাবে বাবু। আগে ছ্যান্-ট্যান করো, যা হয় দুটো ফুটিয়ে নিয়ে মুখে দাও—

বরদা। না রে, গাড়ির সময় হয়ে গেছে। তা ছাড়া বলছি না শরীর ভাল নেই ! হারাধনকে একবার ডাক্ তো।

[রাখালের প্রস্থান।]

বরদা। নিশ্চয়ই সে কাশীতে চলে গেছে। কাশীতেই গেছে। সতী

সৌভাগ্যবতী সে। অন্য কিছু—না না সে অসম্ভব। আমি যে তার কররেখা দেখেছি। তার দ্বারা একাজ হবে না। হতে পারে না।

[হারাধনের প্রবেশ।]

বরদা। এই চাবিগুলো রাখো তো হারাধন। ওপরের ঘরের চাবি এগুলো।

হারাধন (অবাক হয়ে) কী ব্যাপারডা হল ঠাকুর মশাই?

বরদা। শ্বশুরের বড় অসুখ। তার পেয়ে কাল ও চলে গেছে, আমিও যাচ্ছি আজ। দিন তিনেক পরে ফিরব।

হারাধন। এই রে! সেরেছে। এমনিই তো বাবু আপনার সব লোক-জনের জন্যি আমার কাজ-কারবার হবার উপায় নেই, তার উপর আপনি থাকছেন না—এত লোকজন তাড়াবে কেডা?

বরদা। (হাসবার চেষ্টা করে) কেন, তুমি তো রইলে হারাধন।

হারাধন। আমিও কি আর থাকতি পারব? আমাকেও পালাতি হবে আপনার খদ্দেরের জ্বালায়। তা চাবিটা কেন দেচ্ছেন আমাকে?

বরদা। থাক চাবি, আমার যা মনের অবস্থা, হয়তো হারিয়ে ফেলব। চাকরটা একেবারে নতুন, ওর কাছে তো সব চাবি রেখে যাওয়া যায় না। তুমি একটু দেখোশুনো, বুঝলে?

তৃতীয় দৃশ্য

[কাশী—উপেন চক্রবর্তীর বাড়ি। বরদা এসে কড়া নাড়ছেন। উপেন দোর খুলে দিলেন।]

উপেন। বিলক্ষণ! বাবাজী যে—এমন হঠাৎ। মুখখানা এমন শুকনো কেন বাবাজী, চোখের কোণে কালি, সারা দেহে যেন কে কালি মেড়ে দিয়েছে! খবর সব ভাল তো? সরমা ভাল আছে?

[বরদা অনেক আশা করে এসেছিলেন। এখন যেন অকস্মাৎ তাঁর মেরুদণ্ডে একটা শৈত্য অনুভব করেন।]

বরদা। সরমা—সরমা এখানে আসে নি?

উপেন। সরমা? সরমা এখানে আসবে? বিলক্ষণ! কেন, কী হয়েছে? কার সঙ্গেই বা আসবে সে? কী বলছ বাবাজী, কিছুই যে বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা কি?

বরদা। সরমা তা হলে আসে নি এখানে?

উপেন। (আর্তকণ্ঠে) সরমার কী হয়েছে বাবাজী খুলে না বললে তো কিছুই বুঝতে পারছি না! তুমি এমন ধুলোর ওপর বসে পড়লে কেন? এমন চেহারাই বা কেন তোমার? সরমা বেঁচে আছে তো?

বরদা। (কঠিন বিদ্রূপের হাসিতে) সে ভয় নেই আপনার, বেঁচে আছে বৈ কি! ওসব মেয়ে মরে না—

উপেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি তাই খুলে বল না। কী করলে সরমা?

বরদা। না, বিশেষ কিছু করে নি। শুধু সন্তোষের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে।

উপেন। কী—কী করেছে বললে?

বরদা। গৃহত্যাগ করেছে। বাংলা বোঝেন না? সন্তোষের সঙ্গে।

উপেন। সন্তোষ কে?

বরদা। আমার দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। অসময়ে আশ্রয় দিয়েছিলুম, জ্যোতিষ-শাস্ত্র শেখাচ্ছিলুম যত্ন করে।

উপেন। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল না তোমার হল বাবাজী, সেইটেই বুঝতে পারছি না। আমার মেয়ে সরমা গৃহত্যাগ করেছে—পরপুরুষের সঙ্গে? এ যে অসম্ভব!

বরদা। (নির্লিপ্ত শুষ্কস্বরে) তা হবে।

উপেন। (অকস্মাৎ ওঁর হাত-দুখানা চেপে ধরে) দোহাই বাবাজী ঠিক করে বল—এ কি সত্যি বলছ?

বরদা। নইলে কি তামাশা করছি? এসব কথা নিয়ে অন্তত গুরুজনের সঙ্গে কেউ তামাশা করে না।

উপেন। কিন্তু—তা কেমন করে হবে বাবাজী। আমার মার পায়ের ধুলো কাশী শহর সুদ্ধ লোক খুঁজে এসে মাথায় নিত। স্ত্রী আমার সতী-সাধ্বী ছিলেন—একথা যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই বলবে। আমিও গরীব বটে বাবা, কিন্তু এখনও ত্রি-সন্ধ্যা আহ্নিক করি—জ্ঞানত কারুর অনিষ্ট করি না। আট বছর বয়স থেকে শিবরাত্রি করছি, বাবা বিশ্বনাথ মা অন্নপূর্ণা বুড়ো বয়সে এমন আঘাত দেবেন? তাঁদের রাজত্বে তো কোন অপরাধ করি নি বাবা! (উপেনের চোখে জল এসে গেল) মা সরমাকেও আমি জানি বাবা, সে-ও তো তেমন মেয়ে নয়। ঝগড়া-ঝাঁটি করে আর কোথাও যায় নি তো?

বরদা। কোথায় যাবে বলুন। সেই ভরসাতেই তো কাশী এসেছিলাম। কারুর কাছে যাবার মত আত্মীয়স্বজন আমার কেউ নেই। আপনার আছে কিনা জানি না।

উপেন। সন্তোষের সঙ্গে তাদের বাড়ি-টাড়ি যায় নি?

বরদা। তাদের বাড়ি বলতে কিছু নেই।

উপেন। তা হলে মা আমার নিশ্চয় আত্মহত্যা করেছে। আমি বলছি বাবাজী, কোন নীচ কাজ সে কখনও করবে না।

বরদা। আমি কেন প্রথমে আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে চাই নি জানেন? যে জন্যে আপনি এবং আপনার মেয়ে দুজনেই আমাকে অকৃতজ্ঞ ভেবেছিলেন?

উপেন। কেন বাবা, তা তো জানি না।

বরদা। আমার জন্মকোষ্ঠীতে ঐ যোগই ছিল—স্ত্রী কুলত্যাগিনী হবে।

উপেন। হা ভগবান! (ললাটে আঘাত করলেন) কিন্তু বাবা তুমি তো ওর হাত দেখেছিলে? তাতে কি লেখা ছিল?

বরদা। (কিছুকাল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন) না, ওর হাতে তেমন কিছু পাই নি বটে, কিন্তু হল তো তাই। (তার পর সহসা উঠে দাঁড়িয়ে) আমি তা হলে যাই এখন।

উপেন। বিলক্ষণ! মনে পড়েছে—তুমি এক বার ওর জন্মকুণ্ডলীটা দেখতে চেয়েছিলে, তখন খুঁজে পাই নি। মাস দুই আগে হঠাৎ একটা পুরনো পাঁজির মধ্যে থেকে সেটা খুঁজে পেয়েছি। ওর জন্মের সময় এক জ্যোতিষী—খুব বিখ্যাত জ্যোতিষী—তিনি ওর মাকে বড় স্নেহ করতেন, তিনিই একটা ছক করে দেন। সেটা আছে—দেখবে বাবাজী এক বার?

বরদা। (ক্লান্ত সুরে) আর কি কিছু লাভ আছে দেখে?

উপেন। তা হোক বাবাজী, একবারটি তুমি দেখ। আমি বলছি—এ হতে পারে না। কোনও একটা বড় রকমের ভুল হচ্ছে কোথাও। দেখ এক বার।

[ছুটে উপরে উঠে গেলেন। একটু পরেই একটা কাগজ হাতে করে নেমে এলেন। বরদা কতকটা তাচ্ছিল্য ভরেই সেটা খুলে চোখের সামনে ধরলেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন তিনি। অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। চোখে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল—দৃষ্টি হয়ে উঠল তীক্ষ্ন। কী সব গণনা করলেন মনে মনে—তার পর—]

বরদা। (উত্তেজিত কণ্ঠে) ঠিক জানেন আপনি এ ছক্ ওর? ঠিক জানেন, কে করে দিয়েছিল?

উপেন। সচ্চিদানন্দ ভাদুড়ী—এখানকার বিখ্যাত জ্যোতিষী—

বরদা। জানি—তিনি আমারও গুরুস্থানীয়—

উপেন। তিনিই করেছিলেন—জন্মের দিনই। বলেছিলেন পরে কুষ্ঠী করে দেবেন। সে আর আমার তাগাদা দিয়ে করানো হয়ে ওঠে নি।

বরদা। তাই তো!

উপেন। (সাগ্রহে) কী দেখলে বাবাজী? কী দেখলে ওতে?

বরদা। (ধীরে ধীরে বিহ্বলের মত) যার এই জন্মকুণ্ডলী, এই জন্মলগ্ন—কোন দিন কোন মালিন্য তাকে স্পর্শ করবে না। সতী ও সৌভাগ্যবতী এ নারী!

উপেন। জয় বাবা বিশ্বনাথ! (উদ্দেশে নমস্কার) এ আমি জানতাম বাবাজী। এ আমি জানতাম। বুড়ো বয়সে মা সতীরাণী এত বড় শাস্তি আমাকে দেবেন না!

বরদা। কিন্তু—

উপেন। আর কিন্তু নয়—চল বাবা এখন ওপরে চল। একটু বিশ্রাম কর

—স্নানাহার করে সুস্থ হও। শরীরের কী অবস্থা হয়েছে দেখ তো!

বরদা। কিন্তু ওর কী হল—

উপেন। বিলক্ষণ! সে তো আমারও কন্যা বাবা! তার খোঁজ করতে হবে বৈকি! তবে থামকা ছুটোছুটি করে তো লাভ নেই। সুস্থ হও আগে—তার পর ভেবে দেখা যাবে এখন।

চতুর্থ দৃশ্য

[বরদার বাড়ি। রাখাল এসে দোর খুলে দিয়ে দাঁড়াল। সরমার প্রবেশ।]

রাখাল। এই নাও কাণ্ড! কখন এলে মা? আপনার বাবা কেমন আছে, দাদামশাই?

সরমা। (অবাক হয়ে) আমার বাবা?

রাখাল। তবে যে শোনলাম আপনার বাবার খুব অসুখ, তার এয়েছেন—আপনি আর সন্তোষবাবু গেছ।

সরমা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই তো! ও, সেই কথা বলছ? আমার আর কি মাথার ঠিক আছে? বাবা এখন একটু ভাল—তাই আমি চলে এলুম। বাবুর অসুবিধা হচ্ছে এখানে খাওয়া-দাওয়ার—আমি কি আর থাকতে পারি? একবার দেখেই যেমন বুঝলুম প্রাণের ভয় নেই, অমনি রওনা দিলুম—

রাখাল। আর দেখ বাবু আবার ছুটল কাল। বাবুর সঙ্গে দেখা হয় নি, হ্যাঁ মা?

সরমা। (কণ্ঠে যেন স্বর বার হয় না) বাবু গেছেন? কোথায়?

রাখাল। বাবুও তো কাশী গেছে। বললে জরুরী কাজ ছিল আমি তো কাল আপিরে যেতে পারি নি রাখাল, তা তুই অইলি, খাওয়া-দাওয়া করিস—আমি তিন দিনের মধ্যেই ফিরব। তা বাবুর সঙ্গে দেখা হয় নি?

সরমা। কেমন করে হবে? আমিও তো কাল রওনা হয়েছি ওখান থেকে।

রাখাল। তা বটে। মরুগ গে! এখন ছ্যান-ট্যান করো বাপু; আমি উনুনটায় আঁচ দিই। (তার পরেই বোধ হয় কথাটা মনে পড়ে যায়) ত হ্যাঁ মা, সন্তোষবাবু এল নি?

সরমা। না-না—সন্তোষবাবু ওখানেই রইল। দিনকতক পরে আসবে। ওদের ওখানে পুরুষমানুষেরই দরকার কি না। আমার ভাইরা তো ছেলেমানুষ।···তা তুমি আঁচ দেবে কেন? চাঁপার মা?

রাখাল। চাঁপার মাকে বাবু পরশুদিনই ছাড়িয়ে দেছে। তাকে ওনার পছন্দ নয়।

সরমা। ও। তাই বুঝি!

[উপরে যেতে গিয়ে থমকে—]

সরমা। হ্যাঁ রাখাল, তা ওপরের চাবি?

রাখাল। আজ্ঞে সে মা-ঠাকরুন, ধরো বাবুর বুঝি থুব। হারাধন মুদির কাছে চাবিটা থুয়ে গেছে!

সরমা। যা, হারাধনকে আমার নাম করে বল্ গে যা—না হয় ডেকে আন্ এখানে।

পঞ্চম দৃশ্য

[কাশী। উপেন চক্রবর্তীর বহির্বাটি। উপেন ও বরদা।]

বরদা। অনেক দিন তো দেখলেন। এবার আমায় বিদায় দিন—

উপেন। কী আর বলব বাবাজী, এখানে তোমাকে বেশী দিন ধরে রাখব সে জোর কৈ! তবে একটা কথা রাখ বাবা, তোমার জীবনটা নষ্ট করো না। ঘরে ফিরে যাও, আর একটি বিবাহ কর। আমার কন্যার জন্যে ঢের দুঃখ পেলে, এবার যেন সুখী হতে পারো, বাবা বিশ্বনাথের কাছে এই প্রার্থনাই করি।

বরদা। (কেমন একটা অবসাদ-ক্লিষ্ট শূন্যদৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে) কে জানে হয়তো আমারই অন্যায়, হয়তো আমিই তাকে এই পথে ঠেলে দিলাম—

উপেন। বিলক্ষণ। এমন কথা বলো না বাবাজী। তোমার আবার অন্যায় কি? তুমি যদি-বা কিছু রূঢ় ব্যবহার কর—তা বলে সে বেরিয়ে যাবে? না না, তুমি তাকে ক্ষমা করলেও আমি তার এই আচরণ ক্ষমা করব না। কাশী শহরে সবাই আমাকে চেনে বাবাজী, সবাই আমাকে সৎব্রাহ্মণ বলে জানে। সেই মুখটা আমার সে পুড়িয়ে দিয়ে গেল চিরকালের মত।

[বরদা যাবার জন্য পা বাড়ালেন। এমন সময় বাইরে থেকে আহ্বান এল।]

নেপথ্যে। উপেন! উপেন আছ নাকি?

[উপেন বিস্মিত হয়ে বরদার মুখের দিকে তাকালেন।]

উপেন। জয় বিশ্বনাথ!

[উপেন ছুটে গিয়ে দোর খুলে দিলেন। সচ্চিদানন্দ ভাদুড়ীর প্রবেশ।]

সচ্চিদা। আরে বরদা যে! কী ব্যাপার? তুমি এখানে? দাড়ি-ফাড়ি কামাও নি, পাগলের মত চেহারা, তুমিও সন্ন্যাসী হয়ে গেলে নাকি?

[বরদা যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেন। তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে প্রণাম করলেন।]

বরদা। আপনি এখানে? আমি যে খোঁজ করতে গিয়ে শুনলাম—আজকাল এখানে থাকেন না?

সচ্চিদা। হ্যাঁ, কিছুকাল থেকে কন্‌খলে আছি। আর বয়স হচ্ছে তো, মধ্যে মধ্যে কিছুদিন নির্জনে থাক্‌তে ইচ্ছা করে। নইলে পরকালের কাজ কিছুই হয় না। বড় ঝামেলা কাশীতে। এবার হঠাৎ একটা কাজে আসতে হল। তাই ভাবলাম একবার উপেনদের খবরটা নিয়ে যাই। তার পর, তুমি কি করছ, শুনেছি তুমি খুব বড় জ্যোতিষী হয়েছ—খুব নাকি দুর্মুখ জ্যোতিষী—লোকে যেতে ভয় পায়!

বরদা। এসব কথা আবার কোথা থেকে শুনলেন?

সচ্চিদা। আছে হে, আছে। সোর্স আছে বৈকি। কলকাতার লোক কি আর কাশীতে আসে না, না কাশীর লোকের কাছে হাত দেখায় না। আমাদেরও মক্কেল আছে হে দু-চার জন!

বরদা। কী যে বলেন আপনি। আপনি তো জ্যোতিষ-সম্রাট। কিন্তু আমারও যে আপনাকে খুব দরকার। আমি বড় বিপন্ন।

সচ্চিদা। কেন হে, কী আবার হল?

বরদা। সে দীর্ঘ ইতিহাস। বসুন আপনি—বলছি।

সচ্চিদা। তা তুমি এখানে বসতে বলছ—? ও হো—হো—হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি বটে—উপেনের মেয়ের বে হয়েছে খুব বড় এক জ্যোতিষীর সঙ্গে। তুমিই তা হলে উপেনের জামাই!

উপেন। (এগিয়ে এসে প্রণাম করে) আপনি—আপনাকে বোধ হয় বাবা বিশ্বনাথই পাঠিয়েছেন কাকাবাবু। কি সংশয়ে যে জ্বলছি তা আপনাকে বোঝাতে পারব না।

সচ্চিদা। কেন, কেন, কী ব্যাপার? সরমা কোথায়?

উপেন। সে—সে আমাদের এই বাবাজীর এক জ্ঞাতি ভাইয়ের সঙ্গে কুলত্যাগ করেছে—

সচ্চিদা। সরমা কুলত্যাগ করেছে! কিন্তু যত দূর আমার মনে পড়ছে—এমন তো তার ভাগ্যে নেই। ওর একটা জন্মকুণ্ডলী আমি তখন করে দিয়েছিলাম না? সেটা আছে?

বরদা। এই যে—আমার পকেটেই আছে।

সচ্চিদা। তুমি তো জন্মকাল, তিথি তারিখ হিসেব করে বার করতে পারো, এটা দেখেছ? ঠিক আছে তো?

বরদা। তা আছে।

[জন্মকুণ্ডলীটা পকেট থেকে বার করে দিলেন।]

সচ্চিদা। (অনেকক্ষণ ধরে দেখে) কী বলছ! এই মেয়ে অসতী? বরদা তুমি কি পাগল? এ মেয়ে কুলত্যাগিনী হ'লে বুঝব মা সতীরাণীও কুলত্যাগিনী হবেন। এ হ'তে পারে না বরদা। তুমি মস্ত একটা ভুল করেছ কোথাও।

বরদা। কিন্তু আমি যে—আমার ভাগ্যলিপি? সেও তো আপনি জানেন।

সচ্চিদা। এমন হয়। মানুষের জীবন নিয়ে বিধাতা এমনি বিচিত্র রসিকতাই করেন মধ্যে মধ্যে। এসব ক্ষেত্রে যার গ্রহের জোর বেশী তার ভাগ্য অপরের ভাগ্যকে লঙ্ঘন করে। তোমার এই মনোকষ্টেই তোমার জন্মকুণ্ডলীর নির্দেশ ফলে গেছে। কিন্তু এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাও।

বরদা! কিন্তু—

সচ্চিদা। আবার কিন্তু! এর ভেতর কিছু কিন্তু নেই বরদা। তিনি এখন, এই মুহূর্তে তোমার গৃহে আছেন। না হলে বুঝব জ্যোতিষ-শাস্ত্রই মিথ্যা। এ যদি না হয় সচ্চিৎ ভাদুড়ী জীবনে আর কোন গণনাই করবে না।

[বরদা আর একটি কথাও কইলেন না। কোন মতে ও'র পায়ের ধুলো নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।]

উপেন। বিলক্ষণ! আরে আরে—ট্রেন তো সেই সন্ধ্যায়। কোথা যাও, কোথা যাও, ও বাবাজী—

[পিছু পিছু ছুটলেন।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[বরদার বাড়ি। অফিস-ঘরের সংলগ্ন ঘর। সরমা উদ্বিগ্ন শুষ্কমুখে বসে। রাখালের প্রবেশ।]

রাখাল। জানি নে বাপু, এ সব কী ব্যাপার তা তো বুঝি নে! আপনিই বা কোথায় চলে গেলে চুপি চুপি, বাবু তো পাগলের মত হয়ে উঠল একেবারে। তার পর আবার বাবু চলে গেল, বলে গেল দু-তিন দিনে ফিরবে, আজও তার পাত্তা নেই! আপনিই বা কোথা থেকে এক কাপড়ে হুপ করে এলে জানি না। না, এসব ধরণ-ধারণ আমার ভাল লাগে না। আমার মাইনে-পত্তর মিটিয়ে দাও বাপু, আমি বাড়ি চলে যাই।

সরমা। সে হবে। কিন্তু জিনিস কৈ সব।

রাখাল। জিনিস! ঐ লাও! দোকানি যে জিনিস দিলে নি!

সরমা। জিনিস দিলে না! কেন?

রাখাল। ট্যাকা চায় সে! ট্যাকা! নগদ দাম ছাড়া মাল দেবে নি। বলে আমার কাছে যা ভাড়া পাওনা তার চেয়ে ঢের বেশী মাল দিয়েছি। আর আমি পারব নি! অকম-সকম নাকি ওর ভাল লাগছে না।

সরমা। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে) হারাধনকে এক বার আমার নাম করে ডেকে দিবি রাখাল!

রাখাল। তা আর দুব নি কেন, এ আর এমন কি শক্ত কাজ—তবে আসবে কিনা তা বলতে পারব নি।

[রাখাল চলে গেল। সরমা অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগল। একটু পরে মুখ অন্ধকার করে হারাধন এসে দাঁড়াল।]

সরমা। হারাধনবাবু আপনাকে আর দুটো দিন সবুর করতেই হবে—বাবু না আসা পর্যন্ত!

হারাধন। সবুর আর আমি করতে পারব না মা-ঠান্। আর কত সবুর করব? টাকা না হয় না নেলাম, কিন্তু মাল আর আমি বাকিতে দিতি পারব না।

সরমা। (কিছুক্ষণ মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে থেকে) বেশ তা হলে আমার একটা গয়না বিক্রি করিয়ে দিন, আপনাদের টাকা চুকিয়ে দিচ্ছি।

হারাধন। বাপ্ রে! ওসব হাঙ্গামে যাবে কেডা! ও মুই পারব না। তা ছাড়া এসব কী ব্যাপার তাও তো বুঝি না। পাড়ার লোকে নানা মন্দ বলতিছে। বলতিছে আপনি নাকি কে এক ছোঁড়ার সাথে কোথা চলি গিইছিলেন। তাইতি বাবু পাগল হয়ে দেশান্তরী হয়েছেন।...বাবু চাবি দিয়ে চাবিডা আমার কাছে রেখে গেল, আপনি তো এসে জেঁকি বসলেন! এখন যে বাবু কি বলবেন তা তো বুঝি না।

সরমা। (চোখে আগুন জ্বলে উঠল) এত বড় আস্পদ্দা তোমার! কী যা তা বলছ? তুমি আমার বাড়ির ভাড়াটে একথা ভুলে যেও না।

হারা। না না তা বলতিছি না। আপনারে তাড়ায় কেডা; তা—তা আমি তো মা-ঠান্ মুখ্যু মানুষ—হাঙ্গামা-হুজ্জুতির বড় ভয় আমার। যাই আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না—দণ্ডবৎ হই।

[হারাধনের প্রস্থান, রাখালের প্রবেশ।]

সরমা। (নিজেকে একটু সামলে নিয়ে) রাখাল তুই কোন পোদ্দারের দোকানে আমার দু গাছা চুড়ি বাঁধা দিয়ে কি বিক্রি করে কিছু টাকা আনতে পারিস?

রাখাল। (এতখানি জিভ কেটে) সে আমি পারব না মা। ওসব বড় গোলমেলে ব্যাপার আমি শুনেছি। এর পর যদি থানা-পুলিস হয়।

সরমা। অ। আচ্ছা থাক।

রাখাল। তা তো হইল। এবারে বাজার-পত্তরের কি হবে খোলসা করে বল। আজ কদিন তো শুধু নুন দিয়ে ভাত খাচ্ছি। এত কষ্টের খাওয়া খেয়ে থাকতে পারব নি বাবু! আমার মাইনে-পত্তর চুকিয়ে দেওয়া হোক্—এ বাড়ির কাজ আর করব নি।

সরমা। আমার হাতে তো কিছুই নেই বাবা রাখাল। অন্তত একটা গহনা বিক্রি না করলে—। তুমি একটা কাজ করো বাবা বরং—এক বার ও-বাড়ির মাসীমাকে ডেকে দাও। বল বিষম বিপদে পড়ে তাঁকে ডাকছি।

রাখাল। সে তো সকালে এক বার বলে এলুম মা। আপনি ভুলে যাচ্ছ। ঐ তো তিনি এসতেছে। মোদ্দা আমি চললুম। দোষ-মন্দ কিছু ধরো না। এমন করে উপোস করে থাকতে পারব নি তো।

[রাখালের প্রস্থান, লতুর মার প্রবেশ।]

লতুর মা। কেন বাছা অত ডাকাডাকি করছ? বলি মতলবটা কি খুলে বল দিকি?…অত বড় পণ্ডিত লোকটা তো তোমার জ্বালায় দেশান্তরী হল, আবার আমাদেরও কি এপাড়া ছাড়াতে চাও? তোমার গুণ জানতে আর কার বাকী আছে বল, দেশসুদ্ধ তো ঢি-ঢিক্কার! আমাদেরও বাছা সোমত্থ ছেলে নিয়ে ঘরকরা—ভয় করে তোমার বাতাস গায়ে লাগাতে। তা ছাড়া এমনিও তোমার মত নষ্ট মেয়েমানুষের বাড়ি এসে কথা বলতে দেখলে পাড়ার লোক আমাদের মাথায় কাদা ছিটোবে! যাই। আর ডেকো না এমন করে, আসতে পারব না।

[এক নিঃশ্বাসে সমস্ত বিষ উদ্গার করে লতুর মা চলে গেলেন। সরমা একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল। বহুক্ষণ তেমনি একভাবে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ওর দৃষ্টি যেন ক্রমশ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল। আপন মনেই অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলতে লাগল—]

সরমা। আমার বাতাস গায়ে লাগাতে ভয় করে? আমি নষ্ট মেয়েমানুষ? কিন্তু কেন, কেন? আমি কী করেছি?…আর সে? আমার জন্যে সে দেশান্তরী হয়েছে? সেও এই কথা বিশ্বাস করলে? তাই এমন করে শাস্তি দিচ্ছে আমাকে? সে না জ্যোতিষী, সে না ভুত-ভবিষ্যৎ সব দেখতে পায়? এই তার জ্ঞান, এই তার শিক্ষা?

[চোখের দৃষ্টি ওর প্রখর থেকে প্রখরতর হয়ে উঠছে ক্রমশ। ওষ্ঠের প্রান্তে বক্র, ক্রূর হাসি কেমন একরকমের। সে ছুটে বরদার বাইরের ঘরে গেল। পাগলের মত ওঁর জ্যোতিষের পুঁথি আর বইগুলো নিয়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে মাটিতে ফেলতে লাগল। তার মধ্যে একখানা ছিল বরদার

[নিজের রচিত একটা বইয়ের পাণ্ডুলিপি,—করকোষ্ঠি বিচারের ওপর এই বইখানা লিখছিলেন তিনি—সেটার দিকে চোখ পড়াতে সরমা হা-হা করে হেসে উঠল—]

সরমা। জ্যোতিষের বই লিখেছেন! জ্যোতিষের সব জেনে গেছেন একেবারে। ওঃ, মহাপণ্ডিত!

[তারপরে পাগলের মত কুটি কুটি করে সেখানা ছিঁড়তে লাগল—প্রতিটি টুক্‌রোকে অণু-পরমাণুতে ভাগ না করতে পারলে যেন শান্তি নেই। সে কাজও একসময় শেষ হয়ে গেল, তবু সরমা শান্ত হতে পারল না। ওর মাথায় যেন খুন চেপে গেছে—দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আপন মনেই বললে,—]

সরমা। খুন করব ওদের—সবাইকে খুন করব।

[পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই বরদার প্রবেশ।]

বরদা। রাখাল। (সাড়া না পেয়ে) সরমা!

[এতক্ষণে তাঁর নজরে পড়ল চারিদিকে ছেড়া কাগজ। মুহূর্তকাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই ব্যাপারটা অনুমান করতে পারলেন তিনি। ছুটে দোরের কাছে এসে ডাকলেন।]

বরদা। (চীৎকার করে) হারাধন। হারাধন।

[হারাধনের প্রবেশ।]

বরদা। হারাধন, তোমার মা—মানে উনি কোথায় গেছেন জান?

হারা। আজ্ঞে না। তিনি তো বাড়িতেই ছেলেন। আমার কাছ থেকি ঘরের চাবি নেলেন তিনি একরকম জোর করেই, না বলতি পারলাম না। তবে কদিন তাঁর বড়ই অভাব যাচ্ছিল, এক দিন ডেকি বললেন—হারাধনবাবু, একটা গয়না বিক্রি করি দিতি পার?—তা সে বাবু আমি সাহস পেলাম না। এর পর যদি আপনি আমারে মন্দ বলেন। থানা-পুলিস করবে কেডা? রাখালটাও বোধ হয় সরে পড়েছে—মায়না পায় না, খেতিও পায় না—থাকবে কেন?

বরদা। (অগ্নিদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে) মালপত্র দিয়েছিলে তাঁকে?

হারা। পাগল হয়েছেন? সেই চীজ আমি! নেহাৎ বাড়িতে ঢোকলেন জোর করি, তাও তখন আমি অত কথা জানি নে তাই—নইলে কি আর ঢুকতি দিই—

বরদা। তা দেবে কেন? তার বাড়িতে ভাড়াটে আছ মনে নেই? অসময় দুটো চাল-ডাল দিলে মরে যেতে? কটা পয়সা খেত সে? ভাড়া কাটা যেত

না হয় এর পরে। বেইমান নিমকহারাম কোথাকার। যাও দূর হয়ে যাও—কালই ঘর ছেড়ে দেবে আমার! বেচারীর হয়তো উপোস করেই কেটেছে, হায় হায় হায়! সে কি আর আছে? হয়তো গঙ্গায়—

[বরদা আর দাঁড়ালেন না, তিনিও ছুটে বেরিয়ে গেলেন।]

হারা। ঐ লাও, এ আবার এক কাণ্ড! বলে যার জন্যি চুরি করা সেই বলে চোর।

[হারাধন দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে—মুখ ও হাতের একটা বিচিত্র ভঙ্গী করে বেরিয়ে গেল। রঙ্গমঞ্চ কয়েক মুহূর্ত শূন্য রইল। আলোগুলো ম্লান হয়ে এল। এরই মধ্যে বাইরে একটা কোলাহলের মত শোনা গেল। 'পাগলী রে! পাগলী! হি-হি!' রব শোনা যেতে লাগল। তার পরই, আবার আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, সরমা ঢুকল ঝড়ের মত।]

সরমা। না, না—বাইরে নয়। এ বাড়ির বাইরে যাওয়া হবে না। ঐ পণ্ডিতমূর্খটার কথা সত্যি হতে দেব না কিছুতেই। এখানেই আমি মরব। তবে এমন ভাবে তিলে তিলে নয়, শুকিয়ে শুকিয়ে একটু একটু করে মরতে পারব না! জ্বলে-পুড়েই যদি মরতে হয় তো—তার আগে সব জ্বালাব। আগুন লাগাব। এই ঘর-বাড়ি—ওর বড় সাধের পুঁথি সব পুড়িয়ে দেব—

[পাগলের মত দেশলাই খুঁজতে লাগল। একটা র‍্যাকেটে গণেশের মূর্তির পাশে দেশলাই ছিল, ছুটে গিয়ে পেড়ে দেখল সেটা খালি। ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—]

সরমা। রান্নাঘরে—রান্নাঘরে নিশ্চয় আছে।

[বরদার প্রবেশ]

বরদা। সরমা!

সরমা। কে তুমি? দেশলাই আছে? একটা দেশলাই দিতে পার?…

বরদা। সরমা! সরমা! এসব—এসব কী বলছ! আমাকে চিনতে পারছ না?

সরমা। জানি না। দেশলাই চাই। আগুন লাগাব। সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেব।…এবাড়ি ছেড়ে যে যেতে পারব না কোথাও। এখানেই মরব। পুড়ে মরব। কিন্তু তার আগে পোড়াতে হবে যে সব। গোটা বাড়িটায় আগুন লাগাব—সেই আগুনেই পুড়ে মরব।

বরদা। সরমা। সরমা। আমি—চেয়ে দেখ আমি এসেছি।

সরমা। (ছাড়াবার চেষ্টা করে) কে তুমি। তোমাকে চিনি না যাও!

বরদা। আমি সরমা। আমি! আমি!…চেয়ে দেখ—আমি এসেছি।

আর কখনও এ অন্যায় করব না—এবারের মত আমাকে মাপ কর। সরমা!

[এবার যেন সরমা একটু প্রকৃতিস্থ হল। এতক্ষণ ধস্তাধস্তি করছিল বরদার হাত ছাড়াতে। এবার সে চেষ্টা ছেড়ে যেন বিহ্বল ব্যাকুল হয়ে চেয়ে রইল বরদার মুখের দিকে—তার পর ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ল বরদার গায়ের ওপর। বরদা তাকে ধরে বসিয়ে দিলেন—]

সরমা। (বিহ্বল কণ্ঠে) তুমি! তুমি এসেছ! তুমি—তুমি আমাকে ত্যাগ কর নি? আমাকে অবিশ্বাস কর নি!

বরদা। (সুগভীর স্নেহ ও অনুতাপের সুরে) তুমি—তুমি একটু স্থির হয়ে বসো সরমা—আমি তোমার জন্যে একটু গরম দুধ নিয়ে আসি!

সরমা। (ও'র হাত ধরে) না, না। তুমি আর কোথাও যেও না আমাকে ছেড়ে।···বল আর কোথাও যাবে না? আর—আর আমাকে ভুল বুঝবে না? বল, বল।

বরদা। না, আর কখনও না। কিন্তু তুমি, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?

সরমা। ছিঃ! ওকথা কোন দিন মুখে এনো না। আমার কাছে তোমার কোন অপরাধ কখনও হতে পারে না।

[এই বার ওর সেই কুচনো কাগজগুলোর দিকে নজর পড়ল—]

সরমা। ইস! কিন্তু আমি এ কী করেছি! রাগে দুঃখে আমার জ্ঞান ছিল না একেবারে—তোমার এতদিনের সাধনা আর পরিশ্রম অভাগী আমি বুঝি দিলুম নষ্ট করে—

বরদা। (জোর করে ওর মুখ সেদিক থেকে ফিরিয়ে আনলেন) ভালই করেছ সরমা। যে পাণ্ডিত্য জগৎটাকে শুধু পুঁথির পাতার মধ্যে দিয়ে দেখে —মানুষের দিকে চেয়ে দেখতে শেখায় না, তার কোন দাম নেই। ও বইটা ছিল আমার ফাঁকা অহংকারের বুদ্বুদ—ফুটো হয়ে গিয়ে ভালই হয়েছে।

॥ যবনিকা ॥